উদ্বোধন

উদ্বোধন—সূচী পত্র।

(২৪ বর্ষ, ১৩২৮ মাঘ—১৩২৯ পৌষ)

নববর্ষে।

সুদীর্ঘ ত্রয়বিংশবর্ষ পূর্ব্বে শীতঋতুতে মাঘের এমনি এক পুণ্যদিবসে বঙ্গবাণীর পুণ্য-অঙ্গনে এক নব-শিশুর জন্ম হয়। সে দিন সেই শুভ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন-উৎসবের উপযুক্ত যোগ্যপুরোহিত ছিলেন—প্রেমিক-সন্ন্যাসী আচার্য্য শ্রীবিবেকানন্দ ও তাঁহার সহচরবর্গ। সে যুগে বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে আলোচনা পত্রের একান্ত অভাব ছিল—এবং ঐ সঙ্গে কোন নূতন প্রয়াসকে বাঁচাইয়া রাখাও তখন বিশেষ কষ্টসাধ্য ছিল একথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু আচার্য্যের জলন্ত আত্মবিশ্বাস অদম্য উদ্যম-উৎসাহ অটল ধৈর্য্য ও কার্য্যকারিতার নিকট সকল বাধা, সকল বিপদ-বিপত্তি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছিল।

বাঙ্গালার, তথা ভারতের জীবন আজ এক সন্ধিক্ষণে উপস্থিত—নবযুগের এই নব জাগরণের দিনে 'উদ্বোধনের' জীবনোদ্দেশ্য নববর্ষের নবীন আলোকে তাই আজ আপনারা পুনরালোচন করিতে চাহি এবং গ্রাহকবর্গকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাহি। ভারতীয় জীবনের মূলমন্ত্র ত্যাগ-বৈরাগ্যের জীবন্ত বাণী বাঙ্গলার নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে ধ্বনিত করাই আমাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য—মনুষত্বের পূর্ণ-বিকাশ সাধন করিতে হইলে তপস্যা ও আত্মসংযম আজি বিশেষভাবে একান্ত আবশ্যক। ভারতের বৈশিষ্ঠ্য এই আধ্যাত্মিকতায়, এই ধর্ম্মে; কাজেই আমাদিগের সকল উন্নতির কেন্দ্র ও উৎসকে আরও দৃঢ়তর ভাবে ধরিয়া রাখিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া আবশ্যক। সেই জন্যই সত্ত্বগুণের নামে উন্নতির পরিপন্থী সকল তন্দ্রালস্য, জড়তা ও তমোগুণের তীব্র প্রতিবাদ আমাদিগকে করিয়া আসিতে হইয়াছে।

সমন্বয় ও মৈত্রীভাব পরিচালিত হইয়া আমরা ধর্ম্মবিৎ, দার্শনিক, কবি, সমাজসেবী, পর্য্যটক, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক সকলকেই আপনাপন প্রতিভা অঞ্জলি লইয়া মাতৃ-অর্চ্চনা পূর্ণ করিতে আহ্বান করিয়াছি, বর্ত্তমানেও করিতেছি। যে যে ব্রতী 'উদ্বোধনের' পরিচালনায় ও সৌষ্ঠব সাধনে প্রাণপাতী পরিশ্রম করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই আমাদিগের পূজ্য—প্রশংসার্হ।

'উদ্বোধন' কার্য্যক্ষেত্রে কতদূর তাহার উদ্দেশ্য সফল করিতে সক্ষম হইয়াছে, সে বিচার আমাদিগের নহে। বাঙ্গলার শিক্ষিত সমাজ ইহা ধার্য্য করিবার উপযুক্ত পাত্র। দোষ-ত্রুটী, ভুল-ভ্রান্তি আমাদিগের যথেষ্ট—কিন্তু গ্রাহকগণের সহায়তা ও সাহায্যে আমরা ভবিষ্যতে আরও উৎকর্ষ ও সাফল্য লাভে সমর্থ হইব সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ আমাদের নাই।

আচার্য্য আজ অশরীরী—কিন্তু সূক্ষ্মভাবে তিনি এখনও আমাদিগের ভিতর বর্ত্তমান—তাঁহার শুভেচ্ছা ও আশীর্ব্বাদই আমাদিগের আঁধারে শ্রেষ্ঠ আলোক, বিপদে একমাত্র রক্ষাকবচ। নববর্ষের নূতন দিবসে নব-পরিচ্ছদে বিভূষিত হইয়া আমরা আজ তাঁহার জলন্ত মন্ত্র আবৃত্তি করিতেছি—

'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' নিঃস্বার্থভাবে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে 'উদ্বোধন' সহৃদয় প্রেমিক বুধমণ্ডলীকে আহ্বান করিতেছে, এবং দ্বেষবুদ্ধি বিরহিত—ব্যক্তি সমাজ বা সম্প্রদায়গত কুবাক্য প্রয়োগে বিমুখ হইয়া সকল সম্প্রদায়ের সেবার জন্যই আপনার শরীর অর্পণ করিতেছে।

কার্য্যে আমাদের অধিকার, ফল প্রভুর হস্তে; কেবল আমরা বলি—হে ওজঃস্বরূপ! আমাদিগকে ওজস্বী কর; হে বীর্য্যস্বরূপ! আমাদিগকে বীর্য্যবান কর; হে বলস্বরূপ! আমাদিগকে বলবান কর।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

কথাপ্রসঙ্গে।

(১)

নবযুগের নবসূর্য্যোদয়ে, নবীন কিরণ সম্পাতে লক্ষ্য প্রতীয়মান হইয়াছে—কিন্তু পথ বড় বন্ধুর। হে গৈরিকী! জগতের চিরকালের নেতা তুমি; তুমিই আজ পথ প্রদর্শকরূপে নিযুক্ত। দারিদ্র্য-লাঞ্ছনার ছিন্ন কন্থায় নিজ অঙ্গ দৃঢ় আবদ্ধ করিয়া সত্যের দণ্ড কঠিন কর-সঞ্চালনে তোমাকেই আজ লক্ষ্যের দুর্গম পথ দেখাইয়া চলিতে হইবে।

"যদি গহন পথে যাবার কালে
কেউ ফিরে না চায়—
তবে পথের কাঁটা
ও তুই রক্ত মাখা চরণতলে একলা দল রে॥
যদি আলো না ধরে—
যদি ঝড় বাদলে আঁধার রাতে
দুয়ার দেয় ঘরে—
তবে বজ্রানলে
আপন, বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা জ্বল রে॥"

* * *

হে জগদ্‌গুরু! নিষ্কাম তুমি, এস দেখি আজ শিষ্যের প্রীতির নিমিত্ত জগদ্ধিতায় সকল আকাঙ্ক্ষা-লালসা, সকল প্রতারণা ত্যাগ করিয়া—মানস-কমল মধ্যে মণিকাঞ্চিপুরে প্রাণের প্রাণ জগন্মাতার সমক্ষে ত্যাগাগ্নিতে আহুতি দেও দেখি তোমার সকল জড়ত্ব, স্বার্থ-মলিনতা—জাতিবর্ণ আশ্রমের অভিমান অহঙ্কার। বিধ্বস্ত উৎপীড়িত-জগদ্ধিতায় এস গৈরিকী! কে আছ কোথায় পর্ব্বত কন্দরে, সমুদ্রের তীরে হোমাগ্নি সংঘাত বিজয় তিলক-গর্ব্বে ত্যাগের দ্বারা ভোগকে জয়, অহিংসার দ্বারা নিষ্ঠুরতার বিলয়, প্রেমের দ্বারা অশান্ত জগতে শান্তি আনয়ন করিতে—নেতৃত্বের দ্বারা জগদ্‌গুরুর আসন ও আদর্শ বজায় রাখিতে।

"ভাঙ্গ বীণা প্রেমসুধাপান, মহা আকর্ষণ, দূর কর নারীমায়া।
আগুয়ান, সিন্ধুরোল গান, অশ্রুজল পান, প্রাণপণ, যাক কায়া॥
জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে
দুঃখ ভার, এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাঁহার প্রেতভূমি চিতামাঝে॥
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা॥"

* * *

ধ্যান-গম্ভীর অদ্রি-কিরীটিনী গঙ্গাম্বু-শুভ্র-জপমালা-ধারিণী মহাদেবীর পাদমূলে "ভারতের মহামানবের সাগর তীরে" এস আর্য্য-অনার্য্য, হিন্দু-মুসলমান! মুক্ত কর তোমার হৃদয় বীণার সঙ্কীর্ণ পুরাতন তন্ত্রী, বাজাও উৎসাহের দুন্দুভী, সে ধ্বনিতে আজ দেবীর যজ্ঞশালা উদ্বোধিত হউক। ত্যাগের অগ্নিতে প্রজ্জলিত কর পবিত্র হোমানল—সেই দুঃখের লোহিত-শিখায় আহুতি দাও সকল আমিত্ব, স্বার্থ, সকল রিপুগণ। হৃদয়ের রুদ্র বীণার নবতন্ত্রীর ঝঙ্কারে তোল বিপুল প্রণব ধ্বনি, একত্বের ভৈরব রাগের আলাপনে বহুত্বের ক্ষীণ রাগরাগিণী ম্রিয়মাণ হউক। হের ঐ ভক্তের আহ্বানে হরহর-জপরতা আকাশ-গঙ্গা বিচিত্র ভাবলহরীসহ আজ আমাদের চিত্ত-ঘট পূর্ণ করিয়া সকল তীর্থের সহিত অবতীর্ণ হইতেছেন। এস "রিক্তভূষণ দীন-দরিদ্র সবার পিছে সবার নীচে যারা" শান্তিবারি স্পর্শে দেবতার ন্যায় মহিমাময় হও।

"এস হে পতিত, হোক অপনীত
সব অপমান ভার।
মার অভিষেকে এস এস ত্বরা
মঙ্গল ঘট হয়নি যে ভরা,
সবার পরশে পবিত্র করা
তীর্থ নীরে
আজি ভারতের মহা মানবের
সাগর তীরে।"

* * *

হে আর্য্য! আজ তোমার স্পর্শ-দোষের গুটিকা ভেদ করিয়া উজ্জ্বল মহিমাময় হও। আচণ্ডালে প্রীতির আলিঙ্গন দিয়া তোমাদের ঈশ্বর রামকৃষ্ণ-বুদ্ধ-চৈতন্য বাক্যের অনুসরণ কর। নারায়ণ যে আজ জেলে-মালা মুচি মেথরের মধ্য দিয়া স্বীয় মহিমায় প্রকাশিত হইতেছেন। বিশ্বালোড়নকারী কর্ম্মরথের ঘর্ঘর ধ্বনির সহিত শোন তাঁহার বেদান্তের গভীর পাঞ্চজন্য—সোঽহং, সোঽহং—অয়মাত্মা ব্রহ্ম। এস আজ আমরা গণচৈতন্যের মন্ত্রদ্রষ্টার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া ধ্বনিত কর বিশ্বকে অভিঃমন্ত্রে। বল,—

স্থাপকায় চ ধর্ম্মস্য সর্ব্ব ধর্ম্ম স্বরূপিনে
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। হরি ওঁ

(২)

(শ্রীসুব্রহ্মণ্য মিত্র, বি, এ)

আজ বিস্মিত নেত্রে সমগ্র ইউরোপ দেখিতেছে বিগত মহাযুদ্ধের ফলে তাহার বহুবর্ষের সযত্নরোপিত শিক্ষা-সাধনা-সভ্যতার মহামহীরুহটী সমূলে ছিন্ন, বিপর্য্যস্ত ও বিনষ্ট হইতে বসিয়াছে। প্রতীচীর ইতিহাসে পাঁচ ছয় বৎসরের সংগ্রামের ফলে এরূপ অভাবনীয় পরিবর্ত্তন আর কোথাও খুঁজিয়া পাই না। ইহা সম্পূর্ণ অভূতপূর্ব্ব—এক হিসাবে মনুষ্য কল্পনাতীত অপরূপ সংহারলীলা!

* * *

ইংলণ্ড-ফ্রান্সে মধ্যযুগে তথাকথিত শতবর্ষ ব্যাপী সংগ্রাম সকলের নিকট সুপরিচিত—পরবর্ত্তী যুগে মহামতি লুথরের নবীনতন্ত্রে দীক্ষিত জার্ম্মাণগণ নূতন শক্তিতে বলীয়ান হইয়া দেশের ব্যাধিগ্রস্ত, ব্যাভিচারপূর্ণ ধর্ম্মানুষ্ঠানগুলিকে ঢালিয়া সাজিতে বদ্ধপরিকর হইয়া ত্রিংশবর্ষ ব্যাপী সমরানলে সমগ্র ইউরোপকে অনুলিপ্ত ও আশঙ্কিত করিয়াছিল—পরে আরও আধুনিক নেপোলিয়নীক্ যুগে ইউরোপের বহুবর্ষ সমরসজ্জা—

এ সকল অতীত দৃষ্টান্ত পঞ্চবর্ষমাত্র স্থায়ী বর্ত্তমানের ভীষণ মহাসমরের তুলনায় অতি তুচ্ছ—নগণ্য।

* * * * *

নৃমুণ্ডমালিনী, ভীমা-ভৈরবী, করালী-কালিকার উগ্রমূর্ত্তি ইউরোপের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—অনন্ত লীলার আকর আমার লীলাময়ীর এও এক ভীতিপ্রদ অভিনবলীলা! তাই আজ দিশেহারা পশ্চিমের মানুষ অবশ্যম্ভাবী বিক্ষোভের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশায় একান্ত ক্ষুব্ধ—বিব্রত—ত্রাস্ত।

ধ্বংসাবতার রুদ্রের এ প্রচণ্ড উচ্ছেদ-লীলার অবসান কোথায়?

নরহত্যার সংস্কৃত-সুষ্ঠু উপায় উদ্ভাবনে ইউরোপ অন্ধের ন্যায় তার সমস্ত অধুনার্জ্জিত বৈজ্ঞানিক প্রতিভা নিয়োজিত করিয়াছিল। এখন প্রকৃত জয়-পরাজয় নির্দ্ধারণ করিতে যাইয়া সে দেখিতেছে বিজেতা-বিজিত উভয়েই সমভাবে বিনষ্ট হইবার উপক্রম!

আজ আত্মচিন্তার কিঞ্চিৎ অবসর পাইয়া ইউরোপের মহামানব-মন আপনাকে ধিক্কার দিতেছে।

রব উঠিয়াছে ইউরোপকে নূতন আদর্শে গড়িতে হইবে—'ঢাকি শুদ্ধ বিসর্জ্জন' দিয়া কল্যাণের নব্যপন্থানুসরণের আশায় আজ কেহ কেহ সেখানে ব্যগ্র। বেলজিয়াম্ এবং ফ্রান্সের মনোরম ক্ষেত্রগুলির উপর দিয়া ঝঞ্ঝা সর্ব্বাপেক্ষা প্রবলভাবে বহিয়াছিল—তাই বিপুল আবর্জ্জনাস্তূপের ভিতরে পূর্ব্বের সরলসৌন্দর্য্যময় পল্লী ও নগরীর সকল স্মৃতি বুঝি বা চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত! এদিকে রুশিয়ার দুর্ভিক্ষের করালছায়া সকল প্রাণে ভীষণ ভীতি আনিয়াছে—তাই জনৈক পাশ্চাত্য পত্র লিখিতেছেন—"সমগ্র মানবজাতি আজ পর্য্যন্ত যে যে ভীষণ ঐতিহাসিক দুর্ঘটনার ভাগী হইয়াছে তন্মধ্যে রুশিয়ার এই দুর্ভিক্ষ একটী বিরাট ব্যাপার" (New Republic).

সর্ব্ব-জাতীয়-সঙ্ঘের (League of Nations) মহামিলন-ভূমিতে তাই সকলে সমবেত। উদ্দেশ্য—সুখ শান্তিময় জীবন স্থাপন।

এখন উপায় কি ?

* * *

'War to end war'—যুদ্ধনিরসনের জন্য শেষযুদ্ধ—এখন কথার কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাস্তবে ইহার সূচনামাত্রও লক্ষিত হইতেছে না। সমরাগ্নি আপাতদৃষ্টিতে, নির্ব্বাপিত হইয়া গেলেও ভস্মরাশির মধ্যে এখনও দাহিকাশক্তি লুক্কায়িত—তাই মধ্যে মধ্যে জাজ্বল্য স্ফুলিঙ্গ দৃষ্ট হইতেছে। যুদ্ধ শেষ হইল বলিতেছ তবু এখনও অস্ত্রের ঝনৎকার শুনেতেছি কেন ?

* * *

পৃথিবী হইতে চিরদিনের মত সমর-রাক্ষসীকে বিতাড়িত করিবার সুখ-স্বপ্ন বিগত শতাব্দীর অনেক সদাশয় পাশ্চাত্য-মনীষী দেখিয়া আসিতেছেন। ঐ মহান আদর্শ বাস্তবে পরিণত করিবার উপযুক্ত সামর্থ্য-আয়োজন চাই।

রাষ্ট্রক্ষেত্রে ভাগ-যোগের সকল উচিত-ব্যবস্থা বিবাদ মিটাইতেছে কৈ ? সভ্যতার মদগর্ব্বে আত্মহারা পশ্চিমের মানুষ আজ বেশ বুঝিতেছে যে জড়জগতের উপর তার সকল আধিপত্য, তার নবোদ্ভাবিত যন্ত্র-কলকারখানাদি ক্রমশঃ তাহার অভাব-অভিযোগ বাড়াইয়াই চলিয়াছে। 'কোথা শান্তি!'—'কোথা শান্তি!'—বলিয়া পাশ্চাত্যের সভ্যসমাজ এ যুগে বিশেষ বিক্ষুব্ধ। এখনও দর্প, ঈর্ষা, আত্মগরিমা পুরামাত্রায় বর্ত্তমান। তাই মার্কিণপত্র মুক্তপ্রাণে কহিয়াছেন—"যতদিন পৃথিবীতে ক্রোধ-লোভাদি (বর্ত্তমানের ন্যায়) প্রবল রহিবে ততদিন বিভিন্ন জাতির আত্মরক্ষার অত্যধিক আয়োজন অনুষ্ঠানাদির হ্রাসকরণ কেবলমাত্র অত্যাচারকে এক হিসাবে নিয়মিত করিয়া পুরস্কার করা হইবে।"—(Current Opinion).

* * *

তাই বলিতে চাই পরস্পরের ভিতর প্রীতি-সৌহার্দ্য-হৃদ্যতা আনিবার

অন্য হৃদয়ের নিভৃত মণিকাঞ্চিপুরে সকল জ্বালাময়ী জিঘাংসা ভস্মীভূত করিয়া সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার পূর্ণাধিষ্ঠাত্রীদেবীর আসন প্রস্তুত করা। তাহা হইলেই সর্ব্বজাতীয় সঙ্ঘের মিলন সার্থক হইবে! নতুবা কে কয়খানি জাহাজ এবং কয়টী কামান রাখিতে পারিবে, ইহা লইয়া মাথাঘামানই সার হইবে—শান্তিদেবী চিরকালই সুদূরপরাহত থাকিবেন। কনফুসিয়সের সেই সত্যবাণী মনে পড়ে—"তোমরা নিজ আবাসে বিষাক্ত ও বিনষ্ট কোন দ্রব্য রাখ না। তবে কেন মানবের সকল সুখহর বিষাক্ত কুচিন্তা তোমার হৃদয় মধ্যে স্থান দিবে?"

কিন্তু একথা শুনিবে কে?

* * *

পশ্চিমের প্রাসাদসদৃশ অত্যুচ্চ বিলাস-শোভাময়ী অট্টালিকায় সমাসীন হইয়া ভারতের মানুষ ইউরোপের শূন্য-অন্তরের করুণধ্বনি শুনিতে পাইয়াছেন—রব উঠিয়াছে—বাহিরের সকল ঐশ্বর্য্য সকল বিভূতি ত অর্জ্জন করিয়াছি তবু আমরা এত অশান্ত কেন?

* * *

উপনিষদের ঋষি যে ইহার শ্রেষ্ঠ উত্তর দিয়া গিয়াছেন—'ভূমৈব সুখং।' এই ভূমাকে মনুষ্য জীবন হইতে সম্পূর্ণ সরাইয়া রাখিলে ঐরূপ ভাবরাহিত্য অবশ্যম্ভাবী—যাহার ফলে সমাজ-সভ্যতা সবই নিরয়গামী হইতে থাকিবে।

এই আধ্যাত্মিক নিঃসারতা এবং অভাবের কথা লণ্ডন মহানগরীর যাজক (Bishop of London) Morning Post নামক পত্রে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। দেশের নৈতিক অবনতির দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—'দাম্পত্য-বন্ধন বিচ্ছেদার্থ আদালতগুলিতে অত্যন্ত জনতা'—'মাদকতার ভয়াবহ বৃদ্ধি।'

* * *

ডারহাম সহরের বিশপ Henly Hensen ঐ কথা আরও বিশদ-ভাবে Daily Telegraphএ কহিয়াছেন—"আমার মনে হয়, আমরা এমন যুগে বাস করিতেছি যাহা ধর্ম্মকে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতভাবে বর্জ্জন

করিয়াছে।" আবার—"জড়বাদ স্থূলতঃ বলিতে গেলে বিজয়ী হইয়াছে —ইহার একমাত্র পরিণতি ধ্বংস। মানুষ যখন তাহার আত্মাকে পরিত্যাগ করে তখনই সে বিনষ্ট।" Daily Expressএ James Douglas বলেন—"ভগবানের জন্য ইংলণ্ডের আর সময় নাই দেখিতেছি। * * বাস্তবিক পক্ষে জাতির আত্মাই আজ শূন্য।"

* * *

পাশ্চাত্যের আসল ব্যাধি এমন সুন্দরভাবে বুঝি আমরা নির্ণয় করিতে পারিতাম না—ব্যথিত ব্যক্তিদিগের করুণবাণী সেইজন্যই শুনাইলাম। তাই আজ বলিতে ইচ্ছা হয়—

হে নবসভ্যতা! হে নিষ্ঠুর সর্ব্বগ্রাসি,
দাও সেই তপোবন পুণ্য ছায়ারাশি,
গ্লানিহীন দিনগুলি * *
মগ্ন হয়ে আত্মমাঝে নিত্য আলোচন
মহাতত্ত্বগুলি।"

ভারতেও তাই পশ্চিমের খাঁটী মানুষ বলিতেছেন—"একটী বিষয় ইউরোপ অপেক্ষা ভারতে আমি সুন্দরভাবে উপলব্ধি করিতেছি—প্লেটো হইতে ওয়েলস্ (H. G. Wells) পর্য্যন্ত সকল মনীষী কল্পনার নবরাজ্যে সন্ন্যাসীদের নির্দ্দিষ্ট পৃথক্ আসন পাতিয়া রাখিয়া ঠিক করিয়াছেন।" (C. F. Andrews).

* * *

ইউরোপের শশ্মানভূমিকে আবার নন্দনকাননে পরিণত করিতে হইলে ভারতবর্ষের সনাতন-সত্য ঋষি-বাক্য শুনাইতে হইবে। প্রাচীন ভারতের তপোবনের বাণী পশ্চিমের একমাত্র সঞ্জীবনী মন্ত্র। বিশ্ব-সভ্যতাকে উহা শুনাইবার জন্যই যুগযুগান্তের সকল ঝঞ্ঝা—সকল ওলট-পালট শুভ্রশীর্ষ হিমাচলের ন্যায় অচলভাবে সহিয়া আমার জন্মভূমি আজিও বর্ত্তমান। প্রাচীন ইজিপ্ট, ব্যাবিল, অ্যাসীরীয় সভ্যতা কোথায়? বর্ত্তমানের সকল অবনতির ভিতরও প্রাচীন ভারতের বীরমন্ত্রের সাধককুল এখনও রহিয়াছেন—সেদিন Mount

Everst Expeditionএর উদ্যোগী পাশ্চাত্য ব্যক্তিগণ ইহার অদ্ভুত নিদর্শন পাইয়া চমৎকৃত হইয়াছেন—অত্যুচ্চ হিমশিখরে হেমময়ী হিমাদ্রিদুহিতা আপন সন্তানদিগকে এখনও সাদরে ক্রোড়ে রাখিয়া দিয়াছেন।"

ভারতে ঋষি-মহাপুরুষের অভাব কখন হয় নাই—এখনও অভাব নাই। কিন্তু পশ্চিমের সে সেকেন্দর ও মিলিন্দ কোথায়—যাঁরা ভুবনজয়ী হইয়াও দ্বিধাশূন্যভাবে ভারতের ঋষির নিকট করযোড়ে কৃতাঞ্জলিপুটে জীবন্তবাণী ভিক্ষা করিয়া আপনারা স্বয়ং ধন্য হইবেন এবং ঐ সঙ্গে নিজ নিজ জাতীয় জীবনের কল্যাণপথ সুগম করিয়া দিবেন। মধ্যযুগে একবার ইউরোপের ত্যাগী সন্ন্যাসিবৃন্দ শ্রীবুদ্ধের বাণী আপনাদিগের জীবনে সফল করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন—তাহার ফলে পশ্চিমের মাটীতে মঠনির্ম্মাণ—অজ্ঞাননাশে ও পরমাশান্তিদানে এতগুলি আর্ত্তজনের প্রাণ শীতল করিয়াছিল। বর্ত্তমান যুগেও ভারতের জীবন্তবাণী পশ্চিমে বহিয়া লইয়া যাইবার জন্য কর্ম্মীর ও সাধকের অভাব আমার হয় নাই—রামমোহন, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ, মোহিনীমোহন, প্রতাপচন্দ্র, ধর্ম্মপাল, রামতীর্থ, বাবা ভারতী, তুরীয়ানন্দ, সারদানন্দ, নির্ম্মলানন্দ, রবীন্দ্রনাথ-প্রমুখ সকল ব্রতীরই প্রচেষ্টা শ্লাঘনীয়। বিগত পঞ্চবিংশতিবর্ষ যাবৎ ভারতের প্রাণের বার্ত্তা পশ্চিমে প্রচার করিয়া অধুনা অভেদানন্দ আবার মাতৃক্রোড়ে উপস্থিত।

* * *

তাই বলিতে ইচ্ছা হয়, ভারতে আজিও নাগসেন রহিয়াছেন কিন্তু উপদেশ লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে তৎপর পশ্চিমের একনিষ্ঠ শিষ্যকুল কই? তাঁহাদের মিলন হইলে ইংরাজ-কবির কল্পনার নূতন জগৎ বাস্তবে পরিণত হইবে—পৃথিবীতে শান্তি-মন্দাকিনী ত্রিধারায় বহিয়া সকল প্রাণ শীতল করিবে—আর আমরা আনন্দে বিরাজ করিতে থাকিব—

"In the Parliament of Man

The Federation of the World"—সর্ব্ব-মানব-মিলন-মহা-সঙ্ঘে। তখনই শ্রীঈশার উপদেশ সফল হইবে—

"Seek ye, first the Kingdom of God, and everything else will be added unto you."*

বিবেকানন্দ। (কবিতা) †

(শ্রীআশুতোষ সেনগুপ্ত এম্, এ)

হে মহান্! হে অনন্ত জ্যোতিঃ! হে সুন্দর কল্পনার ছবি!
মধ্যাহ্নে কি লুকাইলে ভারতের সমুজ্জ্বল রবি?
একদিন মহাসুপ্তিময় স্থির গভীর নিশীথে,
ধ্যানময় জীবন-বিহঙ্গ উড়ি গেল কোন্ গুপ্ত পথে!
কার আসে কার পাশে, দেব! কেমনে হে গেলে তুমি উড়ি,
সাধের পিঞ্জরখানি রহিল যে শূন্য ঘরে পড়ি!
তখনও ত কুসুমিত বসন্তের নিকুঞ্জ কাননে,
পিকবর, মধুপ নিকর গাহে নাই সুললিত তানে;
তখন যে বন তরুরাজি সাজে নাই নব কিসলয়ে
খেলে নাই হেলিয়া দুলিয়া সুরভিত মৃদুল মলয়ে;
প্রলয় জড়তা ঘোর শিশিরের মায়ানিদ্রা বশে,
সুপ্ত ছিল নিখিল জগৎ অজ্ঞানতা আঁধার-পরশে।
সে অব্যক্ত প্রলয়ের ঘন ঘন ঘন কম্বুনাদে,
জাগাইয়া সারা বিশ্ব প্রণবের উজ্জ্বল প্রসাদে,
উচ্ছ্বসিয়া তপ্ত সিন্ধুজল, উদ্ভাষিয়া ভূধর কন্দর,
কাঁপাইয়া ঘনশ্বাসে মরুময় ভুবনের পঞ্জর,

---

* গত ৪ঠা অগ্রহায়ণ বিবেকানন্দ সমিতির মাসিক অধিবেশনে শ্রীমৎ স্বামী শুদ্ধানন্দের সভাপতিত্বে পঠিত।

† স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে লিখিত।

তুমি নিয়ে কমল কোরক, বাস্ত-করে কম কলেবরে,
পাদযুগ নিক্ষেপিলে শান্তিহীন ধরণীর' পরে।
লজ্জা ঘৃণা মান অভিমান ক্রোধ হিংসা দলিয়া চরণে,
সুবিশাল শালবৃক্ষ সম তুমি সংসার কাননে,
পরশিয়ে উচ্চশির নীল ঘন আকাশের গায়,
সত্য শ্যাম পল্লবশোভায়, প্রেমরস পরিপূত কায়,
ধীরে ধীরে হইলে উন্নত, দৃঢ়মূলে হ'য়ে প্রতিষ্ঠিত,
শান্ত দীর্ঘ করুণার ছায়া চতুর্দ্দিকে করি প্রসারিত।
অতঃপর জাহ্নবী সেবিত মহাসিন্ধু গভীর গর্জ্জনে,
নেমেছিল হিল্লোল কল্লোলে চিরতপ্ত ধরণীর পানে,
নাহি আদি, নাহি অন্ত তার, সেই সিন্ধু চলিল ধাইয়া,
ফেনিল উচ্ছ্বাস তুলি স্বচ্ছ জলে দুকূল প্লাবিয়া ;—
তার মাঝে হে উদার! ধীর শান্ত বিশাল হৃদয়!
মধুময় প্রতিবিম্বচলে সেই দিন লভিল আশ্রয়,
বসুন্ধরা মুহূর্ত্ত মাঝারে থর থর উঠিল কাঁপিয়া,
স্বর্গ হ'তে দুন্দুভির সনে জয়ভেরী উঠিল বাজিয়া,
সে নির্ম্মল সলিল কম্পনে বসুন্ধরা নাচিল হরষে,
হে উজ্জ্বল! হে চিরমঙ্গল!—তব অই মধুর পরশে।
হে যোগিন্! রম্য অঙ্গে তব সৌম্যবেশ করি পরিধান,
ছুটীলে কি অনন্তের পানে সাথে লয়ে উদ্দেশ্য মহান্?
প্রলয়ের ঘন ঘটারবে জগতের ধর্ম্ম-সভা দ্বারে,
দাঁড়াইয়া বেদান্তের বাণী তুমি প্রচারিলে ধীরে,
লেলিহান অনলের শিখা, দীপ্তিময় দামিনীর মালা,
তমোময় হৃদয়-কন্দরে অবিরল করেছিল খেলা,
নীরব নিথর গৃহে, শুধু এক স্তব্ধিত মোহনে,
মুগ্ধ হ'য়ে ক্ষণতরে, ছিল তারা সুষুপ্তি শয়নে।
শিখাইলে, বুঝাইলে তুমি, দর্পভরে ঢালি নিজ প্রাণ,
পূর্ব্ব দিকে উদিয়া তপন পশ্চিমেরে রশ্মি করে দান।

নন্দনের দেব! পারিজাত-হার, তুমি পরিয়া গলায়,
খেলিবারে আসিলে কি ফিরি ভারতের পবিত্র ধূলায়?
নেত্র তব সুশোভিত মহিমার পুলক অঞ্জনে,
শির তব উদ্ভাসিত গৌরবের মুকুট-লম্বনে,
করে শোভে বেদান্তের বীণা, পদে পদে কত শতদল,
ফিরি আসি বহুদিন পরে, ধরিলে হে মায়ের অঞ্চল।
নব যুগ প্রবর্ত্তন-তরে, নব মঠ করিলে গঠন,
শিষ্যসনে বেদান্তের কথা, নিশিদিন কর আলাপন,
'সন্ন্যাসীর গীতি'র ঝঙ্কার, তব কণ্ঠে উঠিল ফুটিয়া,
'বীর বাণী' নিখিল অম্বরে, মহানন্দে চলিল ছুটিয়া।
'প্রাচ্য' সনে 'পাশ্চাত্য'-মিলন, তুমি দেব করি বীর-বর,
অভিনব সাগর-সঙ্গম রচিলা হে দিব্য মনোহর।
চিরদিন অভয়-সঙ্গীত সাগরের তরঙ্গে মিশিয়া
যত সব তীর্থবাসিদলে কাণে কাণে দিবে সে বলিয়া,
বীর তুমি, হে মূঢ় মানব, ব্রহ্ম হ'তে লয়েছ জনম,
শূন্য, ভীরু, কাপুরুষ হৃদে কেন আজি কর বিচরণ?
বু'ঝে লও, চি'নে লও তুমি, কত শত কর্ত্তব্যের ভার,
তুমি নহ ক্ষুদ্র নরজাতি, তুমি শুধু অংশ মাত্র তাঁর॥

মূলের কথা।

(বিমলানন্দ)

দিন যায় দিন আসে তায়
দিন যায় নাহি যায়
যায় কি আসে কি থাকে কি তায়
দিন তার পানে চায়।
ডুবে থাকে সে যে অকূল আলোকে
ভেসে থাকে সেই যে জলে
তাহারই উপর যে বটপত্র
সে থাকে তাহারই মূলে।

স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্ত্তমান যুগ।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার।

(১)

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ৩রা মার্চ্চ স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগো হইতে তাঁহার জনৈক শিষ্যকে লিখিয়াছিলেন, * * * "সর্ব্বোপরি আমার বা তোমাদের কৃতকার্য্যতায় অহঙ্কারী হইও না। বড় বড় কাজ এখনো করিতে বাকী। যাহা ভবিষ্যতে হইবে তাহার সহিত তুলনায় এই সামান্য সিদ্ধি অতি তুচ্ছ। বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর; প্রভুর আজ্ঞা—ভারতের উন্নতি হইবেই হইবে। সাধারণে ও দরিদ্র ব্যক্তিরা সুখী হইবে, আর আনন্দিত হও যে, তোমরাই তাঁহার কার্য্য করিবার নির্ব্বাচিত যন্ত্র। ধর্ম্মের বন্যা আসিয়াছে। আমি দেখিয়াছি, উহা পৃথিবীকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে, কিছুতেই উহাকে বাধাদিতে পারিতেছে না—অনন্ত সর্ব্বগ্রাসী; সকলে সমান চাও, সকলের শুভেচ্ছা উহার সহিত যোগ দাও, সকল হস্তে উহার পথের বাধা সরাইয়া দিক্। জয় প্রভুর জয়!" (পত্রাবলী ১ম ভাগ, ৬৮ পৃঃ)

ছাব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে বিবেকানন্দ যে ধর্ম্মবন্যায় জগত-উপপ্লাবী অপ্রতিহত গতিবেগ লক্ষ্য করিয়াছিলেন, কত বিচিত্র পথে বিচিত্র ভঙ্গীমায় কত বিচিত্র বিকাশের মধ্যদিয়া সেই ধর্ম্মবন্যা কখনো ব্যক্ত কখনো বা গুপ্তভাবে আজ পর্য্যন্ত সমভাবে বহিয়া চলিয়াছে; যাহার পরিসমাপ্তি এখনো বহুদূরে, যাহা এখনো অধিকাংশব্যক্তি অনুভবই করিতে পারে নাই; তাহার গতি ও প্রকৃতিবিকার বা বিশ্লেষণ করিবার দিন এখনো আসে নাই। বিশেষতঃ বিভিন্নদেশে বিভিন্ন রূপান্তরের মধ্যদিয়া, এমন কি অনেক স্থলে স্ববিরোধী ভাব নিচয়ের ঘাত-সংঘাতে ফেনিল ও আবর্ত্তসঙ্কুল হইয়া, ইহার পৃথক পৃথক পথ-প্রস্থানের বিভক্ত ও বিভিন্ন স্রোতাবর্ত্তে যে সমস্ত আদর্শ একে একে

ভাসিতেছে, ডুবিতেছে তাহার মধ্যে একটা সার্ব্বজনীন ঐক্যসূত্র আবিষ্কার করা এক সুকঠিন ব্যাপার। বর্ত্তমানের প্রশ্নসঙ্কুল কণ্টকারণ্যে পথহারা হইয়া বুদ্ধি বিমূঢ় হইয়া যায়। মনে হয়, প্রলয়ের তুফান বুঝি বা উঠিয়াছে, বুঝি বা এই রুদ্র-ঝঞ্ঝার-মুখে বিক্ষিপ্ত বিছিন্ন মেঘের মত সমগ্র মানবজাতি একটা অনিবার্য্য ধ্বংসের মুখে বহিয়া চলিয়াছে। কিন্তু যিনি বিবাদ ও বিরোধের মধ্যদিয়াও এক পরমাশ্চর্য্য ঐক্যকে গড়িয়া তোলেন, যিনি ধ্বংসের দগ্ধবক্ষে নূতন সৃষ্টিকে মুঞ্জরিত ও বিকশিত করিয়া তোলেন, সেই আদ্যাশক্তির অনির্ব্বচনীয় মহিমা, বাঙ্গালী আমরা, হিন্দু আমরা, কোনমতেই তো অবিশ্বাস করিতে পারি না। এই বিশ্বাসের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া আজ আমাদিগকে ভাবিতে হইবে—বর্ত্তমানের বিশৃঙ্খল বিরোধ ও উচ্ছৃঙ্খল অন্যায়ের কোন প্রতীকার আছে কিনা?

(২)

ইতিহাস পথে পর্য্যটন করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, এক একটী জাতি তাহাদের বিশিষ্ট আদর্শকে জাতীয় জীবনে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য এক একটী ভাব লইয়া সাধনায় অগ্রসর হইয়াছে। তাহাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক নিয়মাবলীও ঐ ভাবসাধনার অনুকূল করিয়া রচনা করিয়াছে। প্রাচীন পদ্ধতির মধ্যে যাহা সাধারণ পরিপন্থী তাহা পরিহার করিতে চেষ্টা পাইয়াছে; এমনি করিয়া ভাঙ্গা ও গড়ার মধ্যদিয়া জাতীয় জীবন যুগে যুগে নব বৈচিত্র্যে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে। কি সমষ্টিগত কি ব্যষ্টিগত কোনভাবেই মানবজাতি একটানা একঘেয়ে পথে চলে নাই। তবে সময় সময় এক একটী জাতি আদর্শ হারাইয়াছে, ভাবসাধনায় অক্ষম হইয়া ব্যভিচার করিয়াছে। উচ্ছৃঙ্খল ছিন্নবল্গা অশ্বের মত ধাবিত হইয়া নিজেকে অপঘাতের গভীর গহ্বরে নিক্ষেপ করিয়াছে। এইরূপ আদর্শভ্রষ্ট কোন কোন জাতির বিলয়ের সাক্ষ্য ইতিহাস প্রদান করিয়া থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষে যখনই জাতীয় জীবন কলুষিত ও পঙ্কিল হইয়া উদ্দেশ্য ও উপায়কে বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হইয়াছে, তখনি এক একজন মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া প্রকৃত কল্যাণের পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

একটী প্রদেশে বা একটী জাতির নয়, সমগ্র পৃথিবীরই এইরূপ একটা সঙ্কটাপন্ন মুহূর্ত্তে—ঊনবিংশ শতাব্দীর ভাঙ্গা গড়ার যুগে নব নব ভাবে উদ্দীপ্ত ও অনুপ্রাণিত হইয়া নব নব জাতি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছিল—পৃথিবীর ইতিহাসে ইহা এক নবীন অধ্যায়ের সূচনা, কেহই ইহা অস্বীকার করিবে না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাব বিনিময়ের মধ্যদিয়া উভয় ভূখণ্ডের জাতীয় জীবনে যে নব নব সমস্যা তৎকালে দেখা দিয়াছিল, তাহার একটা মীমাংসার প্রয়োজন অতি অপরিহার্য্য রূপেই অনুভূত হইতেছিল।

তখন ইউরোপের অবস্থা কি ?

সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার নামে উন্মত্ত হইয়া দুর্দ্ধর্ষ ফরাসি জাতি যে বিরাট যজ্ঞানল প্রজ্বলিত করিয়াছিল, সমগ্র অষ্টাদশ শতাব্দীতে যাহা ইউরোপে বিভীষিকাময় রক্তাক্ত কিরণ বিতরণ করিয়াছে, যে হোমানল হইতে বৃত্রাসুরের ন্যায় এক একটী দিক্‌পাল বীর আবির্ভূত হইয়া জগতকে ভীত, চমকিত ও সন্ত্রস্থ করিয়াছে—ঊনবিংশ শতাব্দীতে সেই ফরাসী জাতির ভূম্যবলুণ্ঠিত মহিমা মহানিদ্রায় শায়িত। বিদ্রোহে বিপ্লবে ইউরোপের জাতীয় জীবনের যুগ যুগ সঞ্চিত আদর্শ ও সাধনা সমস্তই ছিন্নভিন্ন, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। সাহিত্য হিংস্র-ক্ষুধার উত্তেজনায় কলুষিত, কবিতা রুদ্ধকণ্ঠা। একটা আসন্ন ঝটিকার পূর্ব্বে প্রকৃতির মৌনগম্ভীর ভ্রূকুটী কুটিল রূপের মত সমগ্র ইউরোপ স্তম্ভিত। বিভিন্ন দেশের মনীষী-গণ সঙ্কাজড়িত উৎকণ্ঠায় অধীর। একদল বলিতে লাগিলেন, সাবধান হও, সমাজ বিপন্ন। বিপ্লববাদ মাথা তুলিতেছে, নির্ব্বিবেক বর্ব্বরতা দ্বারদেশে দণ্ডায়মান। বিদ্রোহ সমস্ত শৃঙ্খলা চূর্ণ করিয়াছে, ক্রমাগত নানাপ্রকার অবস্থান্তরের মধ্য দিয়া আমরা ধ্বংসের পথে অগ্রসর হই-তেছি। আমরা যথেষ্ট হারাইয়াছি, আর না। এখন আমাদিগকে ফিরিতে হইবে; যেমন করিয়া হউক শক্তি সংগ্রহ করিতে হইবে। জন-সাধারণের মুক্তির নামে যে সমস্ত সামাজিক আচার, নিয়ম আমরা নির্ব্বিকারে পরিহার করিতে উদ্যত হইয়াছি। মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম-বুদ্ধির উপর ক্রমাগত আঘাত করিয়া, উহা বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছি,

তাহা কি প্রকৃত কল্যাণের পথ? আর একদল অসহিষ্ণু উত্তেজনা-ক্ষুব্ধ-কণ্ঠে উত্তর দিতে লাগিলেন, ভাবিয়া চিন্তিয়া গ্রহণ বর্জ্জন করিবার আর অবসর নাই, বর্ত্তমান উচ্চ নীচের বৈষম্যমূলক সমাজ, মৃত, অসাড়, কলুষিত। যত শীঘ্র সম্ভব ইহাকে মাটির নীচে পুঁতিয়া ফেলিতে হইবে। প্রাচীন পুরাতন আদর্শের সম্যক বিপরীত আদর্শের উপর আমরা নূতন সমাজ গড়িব, নূতন উপাদানে নূতনভাবে গঠিত স্বরাজজগতের মুক্তি আনিবে। এইরূপে নূতন আদর্শের নামে যাহা ইউরোপে মাথা তুলিল তাহা নিরীশ্বর জড়বাদ ও স্বার্থোদ্ধত ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা। ফলে স্বাধীনতার নামে ব্যক্তির স্বেচ্ছাচার, জাতীয়তার নামে পরস্ব ললুপতা, ধর্ম্মের নামে পরধর্ম্মের প্রতি অযথা আক্রমণ। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পাশ্চাত্য সাহিত্য ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। গ্রীক ও রোমের উত্তরাধীকারসূত্রে ইউরোপ যাহা পাইয়াছিলেন, যীশুখৃষ্ট যাহা দিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই বিপ্লবের যজ্ঞ হুতাশনে আহুতি দিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই সমগ্র ইউরোপ আশ্চর্য্য কৌশলময়ী জড়বিজ্ঞান সহায়ে সমগ্র জগতের উপর এক বিচিত্র পরিবর্ত্তন আনিয়া দিল। তথাপি এই আধুনিক সভ্যতার প্রচুর বাহাড়ম্বর, নব নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, 'কালচার' (kultur) ও 'সিভিলিজেশন' civilisation সত্বেও ইউরোপ তাহার ক্ষুধিত আত্মার ক্রন্দনধ্বনি থামাইতে পারিল না। আভিজাত্য-সম্প্রদায় ও জনসাধারণের মধ্যে আত্যন্তিক ভেদ, ঘৃণা ও বিদ্বেষ ইউরোপ দূর করিতে বহুলাংশে সফলকাম হইলেও সমস্যা নূতন আকারে মাথা তুলিল। জড়বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতিও অবাধ বাণিজ্যের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে নরনারী সমাজসংহতি চূর্ণ করিয়া সহরের কলকারখানায় হাজির হইল। ইন্দ্রিয় ভোগমূলক সভ্যতার উপর প্রকৃতির চরম প্রতিশোধ—ভয়াবহ ও জঘন্য দারিদ্র্য। সভ্য মানবের দুঃসহ বর্ব্বরতা সমাজকে ক্লিষ্ট করিতে লাগিল। প্রচুর ঐশ্বর্য্য, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ করায়ত্ত করিয়া বণিকগণ সমগ্র পৃথিবীতে অবাধলুণ্ঠনের সুবিধা বা শান্তি প্রতিষ্ঠা করিল। বণিক পরিচালিত রাষ্ট্রশক্তির হৃদয়হীন ব্যবস্থায় লক্ষ লক্ষ নরনারীর কণ্ঠোত্থিত 'শ্মশান-কুক্কুরদের কাড়াকাড়ি-গীতি'-মুখর ইউরোপের শোচনীয় দুরবস্থা

দেখিয়া মনীষী অধ্যাপক হক্সলি Huxley মর্ম্মান্তিক ক্ষোভের সহিত বলিয়া উঠিয়াছিলেন—

Even the best of modern civilisations, appears to me to exhibit a condition of mankind which neither embodies any worthy ideal nor even possesses the merit of stability. I do not hesitate to express the opinion that if there is no hope of a large improvement of the condition of the greater part of the human family, if it is true that the increase of knowledge, the winning of a greater dominion over nature which is its consiquence, and the wealth which follows upon that dominion, are to make difference in the extent and the intensity of want with its concomitant physical and moral degradation among the masses of the people. I should hail the advent of some kindly comet which would sweep the whole affair away as a desirable consummation."

অর্থাৎ বর্ত্তমান সভ্যতার সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশেও মানবজাতির যে অবস্থা দেখা যায়, তাহার মধ্যে কোন প্রশংসনীয় আদর্শ নাই, কোন দৃঢ়তা নাই। যদি ইহার মধ্যে মানব-পরিবারের সুবৃহৎ অংশের বর্ত্তমান অবস্থার উন্নতির কোন আশা না থাকে, যদি ইহা সত্য হয় যে, মানুষের জ্ঞানগরিমা বৃদ্ধি, জড় প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব এবং আনুসঙ্গিক ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি, মানুষের দুঃখ কষ্ট দূর করিতে পারে নাই এবং দৈহিক ও মানসিক অবনতি নিবারণ করিতে পারে নাই, তাহা হইলে আমি অসঙ্কোচে বলিতে পারি, যদি একটী ধূমকেতু পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে এই সমস্ত ধ্বংসযোগ্য কর্ম্মপ্রতিষ্ঠানগুলি পুঁছিয়া ফেলে, তাহাকে আমি সাদর অভ্যর্থনা করিব।

এ সঙ্কট কেবল ইউরোপেই নয়; পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঊনবিংশ শতাব্দী সমগ্র পৃথিবীতেই একটা সঙ্কটের যুগ। অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে সহসা মোগলের সুপ্রতিষ্ঠিত ময়ূরসিংহাসন যখন দস্যু কর্তৃক লুণ্ঠিত হইল, যখন নববলদৃপ্ত মহারাষ্ট্র জাতির গৌরবময় অভ্যুত্থানের উন্নত মস্তক বিধাতার নির্ম্মম বজ্রদণ্ডে চূর্ণ হইয়া গেল, যখন বণিক ইংরাজের মানদণ্ড সহসা ভারতবাসীর মস্তকের উপর রাজদণ্ড হইয়া দেখা দিল, অমিতবীর্য্য শিখজাতি মস্তক নত করিল, পর্য্যুদস্ত ইস্‌লাম-শক্তি ইংরাজের

পদানত হইল, যখন এই রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনে ভারতবর্ষ সমগ্র পৃথিবীর পণ্যশালা হইয়া উঠিল তখন হইতেই ভারতবর্ষের ইতিহাস এক অভিনব অধ্যায়ের সূচনা। দুই শতাব্দীর সেই সুদীর্ঘ ইতিহাস বিগত নিরপেক্ষভাবে সমালোচনা করিবার দিন এখনো আসে নাই সত্য কিন্তু তথাপি এটুকু অসঙ্কোচে বলা যায় যে অর্থগৃধ্নু বণিকসম্প্রদায়ের সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধায় ভারতবাসী কেবলমাত্র তাহার ঐশ্বর্য্য ও শিল্পবিদ্যাকে আহুতি দিয়াই পরিত্রাণ পায় নাই—জাতীয়-জীবনের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যেরও অনেকখানি সঁপিয়া দিতে হইয়াছিল। তাই ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই, পরাধীন বিজিত জাতি আমরা ইংরেজী শিক্ষা সভ্যতার প্রতি একান্ত উচ্ছৃঙ্খল ও অসংযতভাবে ঝুঁকিয়া পড়িলাম। সমগ্র শতাব্দী ভরিয়া ধর্ম্মে, সমাজে, পারিবারিক জীবনে ইউরোপকে নকল করিবার আয়োজন চলিতে লাগিল। অপর দিকে ইউরোপ হইতে কেবল সাহিত্য ও বিজ্ঞানের মধ্য দিয়া নব নব চিন্তা-ধারার সহিত আসিল নাগরিক সভ্যতা, আসিল কলকারখানা—আর আসিল পল্লীর বুক শূন্য করিয়া সহস্র সহস্র শ্রমজীবী। একালে যাঁহারা স্বদেশের হিতসাধনে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা মনে করিতে লাগিলেন যে ভারতবর্ষকে ইউরোপের একটা সুলভ সংস্করণে পরিণত না করিতে পারিলে এ জাতির শ্রেয়ঃ নাই। ফলে পশ্চিম হইতে আগত ফেরঙ্গ-বিষ ভারতের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়া শোণিত বিষাক্ত হইয়া উঠিল। সমাজের সংহতি শক্তি বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িতে লাগিল। নানাপ্রকার বিরোধের আবর্জ্জনা চারিদিকে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল।

(৩)

পাশ্চাত্যের ইন্দ্রিয়-ভোগমূলক সভ্যতার আদর্শ যখন দুর্ব্বল ভারতবর্ষকে সকলদিক দিয়া আক্রমণ করিল; তখন তাহার স্বভাবধর্ম্ম প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়াই উহার প্রতিবাদ আবশ্যক বোধ করিল। এমন একটা মহান সার্ব্বজনীন আদর্শের প্রয়োজন হইয়া উঠিল, যাহার সঙ্গে সর্ব্বজাতির ক্ষুদ্র ও বৃহৎ আদর্শগুলি স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া নির্ভয়ে অবস্থান করিতে পারিবে। সেই দুর্য্যোগের ঘনঘটার অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন-

শতাব্দীর আকাশে মাঝে মাঝে যে বিদ্যুৎস্ফুরণ দেখা দিয়াছে, তাহাতে ইহাই প্রমাণ করিয়াছে যে, আলো আছে, এ অন্ধকারেরও বুঝি বা শেষ আছে,—কিন্তু কোথায়?

সমগ্র জগদ্ব্যাপী এই ভাববিপ্লব সমুখ অ-ভাবের মধ্যে চারিদিকে স্বার্থান্ধ ললুপতা ও বলদর্পে অন্ধ দানবীয় শক্তির স্বেচ্ছাচারের দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের মধ্যে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীমূলে এক দীনদরিদ্র পূজারী ব্রাহ্মণ এই মহাসমস্যার মীমাংসায় উপবিষ্ট. হইয়াছিলেন ইহা আশ্চর্য্য—কিন্তু সত্য! লোকলোচনের অন্তরালে অনুষ্ঠিত সে সুমহান প্রয়াস বিবেকানন্দরূপে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সমগ্র জগতের সম্মুখে ঘোষণা করিল—

(১) বর্ত্তমান জড়সভ্যতা, তাহার কলকারখানা লইয়া লৌহচক্রজাল প্রতিনিয়ত মনুষ্যত্বকে ক্লিষ্ট ও পিষ্ট করিতেছে। মানুষ যন্ত্র হইয়া উঠিয়াছে। মানবজাতিকে মুক্ত ও স্বাধীন করিবার জন্য সকল দেশের মনীষীগণের মধ্যে যে আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা দেখা যাইতেছে, তাহা একমাত্র ধর্ম্মবলেই সম্ভব। রাজনীতি সমাজনীতি বা বাণিজ্যনীতি সম্বন্ধীয় কোন প্রকার আদর্শই মনুষ্যকে শান্তি দিতে পারিবে না।

(২) মানুষে মানুষে ভেদদ্বন্দ্বের অবসানকল্পে, বিশ্বমানবের মধ্যে চরম ঐক্য স্থাপনের জন্য যাঁহারা সমগ্র মানবজাতিকে একধর্ম্মাবলম্বী করিবার দুঃস্বপ্ন দেখিতেছেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। এই চেষ্টা যে কেবল অসম্ভব তাহা নহে, পরন্তু অন্যায়। প্রত্যেক সম্প্রদায় বা জাতি নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিবে, পরস্পরের সহিত ভাববিনিময় করিবে। প্রত্যেকেই নিজ ধর্ম্মমত ও সামাজিক নিয়মগুলির উপর যতটুকু শ্রদ্ধা পোষণ করে, ঠিক ততখানি শ্রদ্ধা অপরের ধর্ম্মমত ও সামাজিক নিয়মগুলির প্রতিও প্রদর্শন করিতে হইবে।

(৩) এই উদারতম ভিত্তির উপর হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ ইত্যাদি বিভিন্ন জাতির ও ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রত্যেক মানবকে দণ্ডায়মান হইয়া স্ব স্ব অন্তর্নিহিত শক্তির অনুপাতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার অবাধ সুযোগ প্রদান করিতে হইবে। এই সার্ব্বজনীন ঐক্যভূমির উপর

মানব-সভ্যতাকে প্রতিষ্ঠা না করিতে পারিলে বর্ত্তমান বিরোধ, অশান্তি ও উপদ্রবের বিরাম হইবে না।

উনবিংশ শতাব্দীর দেহাত্মবাদমূলক সভ্যতা ও স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ামূলক সমন্বয়-যুগ-প্রবর্ত্তক স্বামী বিবেকানন্দের জগতের সম্মুখে ইহাই ঘোষণা। আর ইহাই অধুনাতন সমাজ ও ধর্ম্ম-বিজ্ঞানের অন্ততঃ আজ পর্য্যন্ত শেষ কথা।

এই যে আদর্শ, বিবেকানন্দ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় জগতের সম্মুখে ধরিয়াছিলেন, কোন দেশের মানব সমাজই আজ পর্য্যন্তও ইহাকে কর্ম্ম-পরিণতরূপ প্রদান করিতে পারে নাই। কেননা, মহাপুরুষগণ উপযুক্ত সময়ের বহুপূর্ব্বে আসিয়া প্রকৃত কল্যাণের পথ নির্দ্দেশ করিয়া যান। দুই একজন মানব প্রেমিক মহৎব্যক্তি ইহা বুঝিতে পারিলেও, ভাবগত আদর্শ সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, গ্রহণ করিতে পারে না। বিপদ সকল দিক দিয়া আসন্ন হইয়া আসিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও মানুষ গতানুগতিক পন্থা পরিহার করিবার প্রয়োজন বোধ করে না। বিশেষ স্বার্থললুপ বর্ত্তমান যুগের সভ্যমানবের অভ্যস্ত চিন্তা ও রুচিকে পরিবর্ত্তিত করা বড় সহজ কায নহে। প্রতিনিয়ত চক্ষের উপরে দেখিতেছি, প্রত্যেক দীন, দরিদ্র, দুর্ব্বলের মনুষ্যত্ব ও হৃদয় ঘৃষ্ট ও পিষ্ট করিয়া ধনী ও বণিকের বাণিজ্যরথ অপ্রতিহতগতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। জড়বিজ্ঞানের কৃপায় সমগ্র পৃথিবী একটা বিরাট কারখানা রূপে গড়িয়া উঠিতেছে, আর অসহায় মানুষ অনিচ্ছাসত্ত্বেও উদরান্নের জন্য লালায়িত হইয়া যন্ত্রেরই অঙ্গবিশেষ শ্রমজীবীতে পরিণত হইতেছে। জীবনসংগ্রাম আর কোন যুগেই এত ঐকান্তিক হইয়া উঠে নাই, সময় এত দুর্ল্লভ কোন কালেই ছিল না। মানুষ স্নেহ, দয়া, প্রীতি, পরকল্যাণ কামনা ইত্যাদি উচ্চতম বৃত্তির উৎকর্ট সাধন ও বিদ্যার্জ্জন করিবার যথেষ্ট সময় পাইত। কিন্তু আজ দেখিতেছি!—সহরের রাজপথপার্শ্বে দাঁড়াইয়া জনসমষ্টির উৎকণ্ঠাপূর্ণ গমনভঙ্গী দেখিয়া মনে হয়, যেন এক অদৃশ্য হস্ত ইহাদের সহিষ্ণু পৃষ্ঠে বিরামহীন কশাঘাত করিতেছে, আর এই সমস্ত হতভাগ্যগণ আশাহীন, আনন্দহীন, হৃদয়হীন কর্ম্মযজ্ঞে নিরুপায় হইয়া আত্মাহুতি

দিবার জন্য ছুটিয়া চলিয়াছে। আর এই সমস্ত হতভাগ্য নরনারীর ধ্বংসের উপর ধনীর বিলাসভবন গড়িয়া উঠিতেছে। একটী তৈমুরলঙ্গ, একটী নীরো, একটী চেঙ্গিস্ খাঁর নিষ্ঠুরতা ইতিহাসে পাঠ করিয়া আমরা শিহরিয়া উঠি; কিন্তু আজিকার দিনের সহস্র সহস্র তৈমুর, নীরো ও চেঙ্গিস্ খাঁর বীভৎস বর্ব্বরতা দেখিয়া ভৎর্সনা করিবার কথা আমাদের মনেও উঠে না—প্রতিবাদ করা তো দূরের কথা! সভ্যতার নামে এই বর্ব্বরতা সকল দেশের সকল সমাজের সর্ব্বস্তরে অবাধে প্রবেশ করিয়াছে ও করিতেছে। এই পাশবিক ভোগবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে যাইয়াই বিবেকানন্দ ভারতের সুপ্রাচীন আদর্শ সন্ন্যাসের, ত্যাগের গৈরিক পতাকাখানি উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। পুরাতনের উপর নবীনের প্রতিষ্ঠা এতবড় একটা বিরাট ব্যাপার একদিনে সাধিত হইবে না—এক শতাব্দীতেও হইবে কি না সন্দেহ, আবার কে জানে, কে বলিতে পারে যে ভগবান্ কোন্ পথে, কেমন করিয়া তাঁহার ঈপ্সিত যুগাদর্শ প্রকট করিবেন?

(৪)

আমরা শুনিয়াছি—এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ!

কেমন করিয়া সম্ভব? এই ক্ষুধিত নিরন্নের দেশ, এই শত রোগ মহামারীর দেশ, এই পরাধীন বিশ্বে উপেক্ষিত জাতির দেশ—এই দেশের অপহৃত মনুষত্ব, হতশ্রী মানব সমগ্র জগতে আধ্যাত্মিকতার ভিত্তির উপর স্থাপিত সাম্যের মঙ্গলময়ী বার্ত্তা জগতে প্রচার করিবে ইহা অসম্ভব!

এই সমস্যা দ্বারা বিবেকানন্দের ব্রহ্মচর্য্য-বজ্রে গঠিত হৃদয়ও বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল! একদিকে মূঢ় অন্ধ পশুপ্রায় জনসমষ্টি জীবন্মৃত, অপর দিকে জাতির একটা অংশ ফেরঙ্গ-সভ্যতার গিলিতচর্ব্বণ উদ্বমন করিতে করিতে ভারতের বৈচিত্র্যময় রঙ্গমঞ্চে এক বীভৎস করুণ প্রহসণের অভিনয়ের স্ফুচনা করিয়া দিয়াছে। এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থার মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া স্বামী বিবেকানন্দ দেখিলেন, "বাহ্যজাতির সংঘর্ষে ভারত ক্রমে বিনিদ্র হইতেছে। এই অল্প জাগরুকতার ফলস্বরূপ, স্বাধীন চিন্তার কিঞ্চিৎ উন্মেষ। একদিকে প্রত্যক্ষ শক্তিসংগ্রহরূপ প্রমাণ-বাহন

শতসূর্য্যজ্যোতিঃ আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দৃষ্টি-প্রতিঘাতিপ্রভা; অপরদিকে স্বদেশী বিদেশী বহু মনীষী উদ্‌ঘাটিত, যুগযুগান্তরের সহানুভূতি-যোগে সর্ব্বশরীরে ক্ষিপ্রসঞ্চারী, বলদ-আশাপ্রদ, পূর্ব্বপুরুষদিগের অপূর্ব্ব বীর্য্য, অমানব প্রতিভা ও দেবদুর্ল্লভ অধ্যাত্মতত্ত্ব কাহিনী। একদিকে জড়বিজ্ঞান, প্রচুর ধনধান্য, প্রভূত বলসঞ্চয়, তীব্র ইন্দ্রিয়সুখ বিজাতীয় ভাষায় মহা কোলাহল উত্থাপিত করিয়াছে; অপরদিকে এই মহা-কোলাহল ভেদ করিয়া, ক্ষীণ অথচ মর্ম্মভেদী স্বরে পূর্ব্বদেবদিগের আর্ত্তনাদ কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। সম্মুখে বিচিত্র যান, বিচিত্র পান, সুসজ্জিত ভোজন, বিচিত্র পরিচ্ছেদে লজ্জাহীনা বিদুষী নারীকুলের নূতন ভাব, নূতন ভঙ্গী অপূর্ব্ব বাসনার উদয় করিতেছে; আবার মধ্যে মধ্যে সে দৃশ্য অন্তর্হিত হইয়া, ব্রত, উপবাস, সীতা, সাবিত্রী, তপোবন, জটাবল্কল, কাষায়, কৌপীন, সমাধি, আত্মানুসন্ধান উপস্থিত হইতেছে। একদিকে পাশ্চাত্য সমাজের স্বার্থপর স্বাধীনতা, অপরদিকে আর্য্যসমাজের কঠোর আত্মবলিদান। এ বিষম সংঘর্ষে সমাজ যে আন্দোলিত হইবে তাহাতে বিচিত্রতা কি?"

এই আন্দোলনের ফল কি?

প্রাণে অবিশ্বাস, দেহে ক্লান্তি ব্যবহারে ভণ্ডামী সর্ব্বোপরি বাক্‌সর্ব্বস্ব নেতৃগণের প্ররোচনায় দিগ্বিদিকে নানাপ্রকার আন্দোলনের নীরস খোসা চর্ব্বণ—শতাব্দীর শেষ ভাগে বিবেকানন্দ ইহাই দেখিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন জনসাধারণ বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিয়াছে। সেই অগ্নিময় বিশ্বাস, যাহার প্রেরণায় মানুষ জীবন বলি প্রদান করে—সে মহত্তম বিশ্বাস নহে—একটু আত্মবিশ্বাস; যাহা অধঃপতনের পঙ্কশয্যায় নিশ্চিত শয়নে বাধা দেয়, আত্মবিশ্বাসঃ—যাহা পর-পদলেহন হইতে নিবৃত্ত করিয়া মানুষকে নিজের পায়ে নিজের অধিকারে দাঁড়াইবার প্রেরণা দেয়, আত্মবিশ্বাস—যাহা মনুষ্যত্বের প্রতিষেধক আচার-নিয়ম রীতি-নীতির বিরুদ্ধে পীড়িত প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি একত্র করিয়া সমষ্টিগত চেষ্টায় ঐ সকল তিরোহিত করিবার প্রেরণা দেয় সেই বিশ্বাসটুকু পর্য্যন্ত নাই। জাতির অন্তরে

বাহিরে একটা বিপ্লব বহিয়া চলিয়াছে। এক দুঃসহ উত্তেজনার ঘাত প্রতিঘাত স্তম্ভিত হৃদয়ে মুমূর্ষুর মত মাথা তুলিয়া সকলেই 'অসহায় ভাবে পার্শ্বস্থ প্রতিবেশীর পতন স্থির দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতেছে। স্বাধীন চিন্তার নামে বুদ্ধির বিদ্রোহ সমাজ বন্ধন চূর্ণ করিয়া ফেলিতেছে। এই প্রবল বিভীষিকা তাঁহার জন্মভূমি বাঙ্গালা দেশেই তিনি অধিক দেখিয়াছিলেন।

এইরূপে সমগ্র দেশ যে অনিবার্য্য ধ্বংসের মুখে ছুটিয়াছে, বিবেকানন্দ প্রতিক্রিয়ার মুখে তাহা প্রতিষেধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ভারতীয় শিক্ষা সভ্যতা ও সাধনার মর্ম্মকথাকে পুনরায় যুগোপযোগী সুরে ও রূপে প্রকট করিয়া বিবেকানন্দ দৃঢ় পদে দণ্ডায়মান হইলেন। পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্মোহিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে একটা প্রতিবাদ উত্থিত হইল। তাঁহারা বলিলেন, পাশ্চত্য ভাব ভাষা, আহার পরিচ্ছদ ও আচার অবলম্বন করিলেই আমরা পাশ্চাত্য জাতিদের ন্যায় বল বীর্য্য সম্পন্ন হইব।"

স্বামিজী উত্তর দিলেন—"মূর্খ অনুকরণ দ্বারা পরের ভাব আপনার হয় না, অর্জ্জন না করিলে কোন বস্তুই নিজের হয় না; সিংহচর্ম্মে আচ্ছাদিত হইলেই কি গর্দ্দভ সিংহ হয়?

তাঁহারা বলিলেন, পাশ্চাত্য জাতি যাহা করে, তাহাই ভাল; ভাল না হইলে উহারা এত প্রবল কি প্রকারে হইল?

স্বামিজী উত্তর করিলেন,—বিদ্যুতের আলোক অতি প্রবল, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী, বালক, তোমার চক্ষু প্রতিহত হইতেছে সাবধান!

তন্দ্রাচ্ছন্ন ছত্রভঙ্গ জাতি পাশ্চাত্যের বিলাস স্বপ্ন-সম্মোহিত চিত্তে বিবেকানন্দের তীব্র তীক্ষ্ণ উক্তি পুনঃ পুনঃ সবলে সকল হৃদয় আঘাত করিয়া বলিতে লাগিল, হে ভারত! সর্ব্বপ্রকার সংশয় দ্বিধা, দ্বন্দ্ব দলিত করিয়া সর্ব্বান্ধ জড়বাদের লালসা-ললুপ নর্ত্তন-লীলার উর্দ্ধে, তোমার সুপ্রধান জাতীয় পতাকাখানি সমুন্নত মহিমাময় করিয়া তুলিয়া ধর, আর তাহাতে লিখিয়া দাও তোমার চিরন্তন আদর্শ—ত্যাগ ও সেবা।

সিংহ প্রতিম সন্ন্যাসীর সিংহ গর্জ্জনে আহ্বান বিফল হইল না—

একদল মুষ্টিমেয় ব্যক্তি আত্মসমাহিত স্বদেশ সেবক খ্যাতিহীন কর্ম্ম-গৌরবে' ক্লান্তিহীন সেবাপ্রসারিত বাহুদ্বয় সম্বল করিয়া দরিদ্র, পতিত উৎপীড়িতের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল। রাজ বাড়ীর লৌহ কপাটে পুনঃ পুনঃ মাথা ঠুকিয়া আর্ত্তনাদ করাকেই যাঁহারা দেশোদ্ধারের একমাত্র পন্থা বলিয়া স্থির নিশ্চয় করিয়াছিলেন, তাঁহারা এই উৎসাহী যুবক দলকে 'কল্পনারাজ্য সঞ্চারণশীল ভাবুকের দল' বলিয়া বিদ্রূপ করিলেন, আর যাহারা সাতেও নাই পাঁচেও থাকেন না, অথচ অপরকে সর্ব্বদা অযাচিত উপদেশ দিতে উন্মুখ হইয়া থাকেন, এমন সব অভিজ্ঞব্যক্তি শিরসঞ্চালন-পূর্ব্বক করুণাকাতরকণ্ঠে উপদেশ দিলেন,—কল্পনাপ্রিয় ভাবুক যুবকগণ, এই কঠোর কর্ম্ম সন্ন্যাসের তীব্র তপস্যায় কেন জীবনকে অনর্থক শুষ্ক করিয়া আত্মপ্রতারণা করিতেছ? কে বুঝিতে চায় তোমার বেদবেদান্ত—কে 'আমি সর্ব্বশক্তিমান আত্মা, আমি মানুষ' বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবে? সে দিন চলিয়া গিয়াছে। সে বিশ্বাসের যুগ আর নাই। জনসাধারণ স্থবির! জীবন্মৃত! সহস্র বৎসর ধরিয়া সামাজিক ও রাজনৈতিক অধীনতার ফলে হতভাগাগণ চলিবার শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে। নানাপ্রকার পৈশাচিক অত্যাচারের পীড়ন, ইহাদিগকে পশুবৎ হিংস্র, ভীরু স্বার্থপর জড়পিণ্ডে পরিণত করিয়াছে। এই দাসবৎ পরপদলেহী নরকের জীব লইয়া তোমরা কি করিবে? এই যে মানবের জন্মলব্ধ অধিকার গ্রহণ করিবার জন্য তোমরা ইহাদিগকে ক্রমাগত আহ্বান করিতেছ, তাহার ফল কি? সুপ্তিশয্যা হইতে অলস শিথিল মস্তক তুলিয়া বিরক্তি-বিকৃতনেত্রে যে তোমাদের প্রতি চাহিতেছে, তাহা কেবল পুনরায় অভ্যস্থ' নিদ্রায় ঢলিয়া পড়িবার জন্য। তোমরা কেহ কেহ ইহাদের কল্যাণকামনায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছ,—ইহারা বিস্মিত নয়নে যে মহৎ আত্মত্যাগ দেখিয়াছে, শ্মশানে শবানুগমন করিয়াছে, কিন্তু বুঝিতে পারে নাই যে ঐ কর্ম্মবীরের দেহের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, অধিকার ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতও দগ্ধ হইতেছে। একমুষ্টি অন্নের জন্য, এক টুক্‌রা বস্ত্রের জন্য ইহাদের লালায়িত কাতরতা তোমরা দেখিয়াছ, কায়ক্লেশে কেবলমাত্র বাঁচিয়া

থাকিবার অসহায় কাতরতা দেখিয়া তোমরা কাঁদিয়াছ। দুর্ভাগ্যের কবলে পড়িয়া এই সমস্ত নর-নারীর মর্ম্মান্তিক হাহাকার তোমাদের সাধনাসংযত বীরহৃদয়কেও দীর্ণ বিদীর্ণ করিয়াছে; এমন কি তোমাদের বরেণ্য নেতা এই ভয়াবহ দৃশ্যের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "যে ভগবান ইহলোকে একটুক্‌রা রুটি দিতে পারে না, সে পরকালে স্বর্গের ব্যবস্থা করিবে?"

এই তো অবস্থা—কি করিবে তুমি?

দেশে উৎসাহাগ্নি একেবারে নিভিয়া গিয়াছে—পুনঃ প্রজ্জ্বলিত করা দুঃসাধ্য। ইহাদের অবস্থা উন্নত না করিতে পারি, ইহাদের জন্য মরিতে তো পারি—আমরা মরিব!—কোন ফল হইবে না বন্ধু! তোমরা মরিতে পার কিন্তু জয়লাভকরিতে পারিবে না। তোমরা মানব-মহত্বের সুদক্ষ সেনাপতি হইতে পার কিন্তু তোমাদের সৈন্যদল নাই।

শুনিয়াছি তোমাদের আচার্য্যদেব জীবনসন্ধ্যায় একদিন মেঘমন্দ্রে বলিয়াছিলেন, "বৎসগণ, আমার গুরুদেব আসিয়াছিলেন মানব-কল্যাণব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়া দিতে। আমিও তাঁহার কার্য্যেই তিল তিল করিয়া রক্তদান করিলাম—তোমাদিগকেও করিতে হইবে। বিশ্বাস কর—আমাদের প্রত্যেক রক্তবিন্দু হইতে মহাশূরবীরগণ আবির্ভূত হইয়া এই নবভাবের বন্যায় জগত ভাসাইয়া দিবে!"—তুমি কি ইহা বিশ্বাস কর? যদি সত্য হয়, তবে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া যাও মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর! কিন্তু তোমাদের ভাগ্যের অংশী করিবার জন্য দেশের যুবকদিগকে ডাকিও না যদি তাহাদের প্রাণে তোমাদের বিশ্বাস, তোমাদের আশা, তোমাদের কর্ম্মশক্তি না থাকে! আত্মোৎসর্গ? উত্তম কথা! কিন্তু উহা ব্যষ্টির ধর্ম্ম, সমষ্টির নয়। সে শক্তি হয়তো বা একদিন অদূর ভবিষ্যতে প্রয়োজন হইবে, তাহা এমনি করিয়া মহৎ পাগ্‌লামীতে নিঃশেষ করিয়া দিও না। সাফল্যহীন চেষ্টায় আপনাকে রিক্ত করিয়া আত্মপ্রতারণা করিও না! একটা বহুদিনের প্রাচীন পুরাতন জাতির স্বাভাবিক বিলোপ—বিধাতার অভিপ্রেত। অতএব এই ধ্বংসের বিরুদ্ধে হস্ত উত্তোলন করিয়া মূঢ়তার পরিচয় প্রদান করা

অনাবশ্যক। অসম্ভবকে সম্ভব করিবার ব্যর্থচেষ্টা হইতে বিরত হইয়া যে কয়টা দিন বাঁচি, সুখে না হউক শান্তিতে থাকি।

চমৎকার উপদেশ সন্দেহ নাই; কিন্তু যদি ইহা সত্য হয়, তবে এই শোচনীয় পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে শান্তিতে বাসকরা কি সম্ভব? একটা জাতি ক্ষুধার যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিয়া মরিয়া যাইবে—কেহ দেখিবে না? তবে কি বিবেকানন্দ অরণ্যে রোদন করিয়া গেলেন?

"বিসূচিকার বিভীষণ আক্রমণ, মহামারীর উৎসাদন, ম্যালেরিয়ার অস্থিমজ্জাচর্ব্বন, অনশন অর্দ্ধাশন সহজভাব, মধ্যে মধ্যে মহাকালরূপ দুর্ভিক্ষের মহোৎসব, রোগ-শোকের কুরুক্ষেত্র, আশা উদ্যম আনন্দ উৎসাহের কঙ্কাল পরিপ্লুত মহাশ্মশানে" নবীন ভারতের মন্ত্রগুরু যে নবীন সৃষ্টিকে উদ্বোধিত করিয়া তুলিবার জন্য সাধনায় উপবিষ্ট হইয়াছিলেন,—নৈরাশ্যের বিফলতায় তাঁহার মধ্য হইতে আজ আমরা কি তেজ ও বীর্য্য আহরণ করিতে পারিব না? সেই নির্ভীক বিপুল মনুষ্যত্বের মহিমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, আমরা কি এই মনে করিব যে ভারতের অতীত আধ্যাত্মিক গরিমার একটা আগ্নেয় উচ্ছ্বাস সহসা দিক্ উদ্ভাসিত করিয়া উদ্গীরিত হইয়াছিল—তারপর সব শূন্য, সব নিষ্প্রভ, সব অন্ধকার?

এমনি করিয়া নানাপ্রকার অসার কল্পনা ও দ্বিধা সংশয় আমাদের উন্মেষিত-প্রায় কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিতে লাগিল, কি করিব ভাবিয়া উঠিতে পারিলাম না, তখন অকস্মাৎ স্বদেশী আন্দোলনের বন্যায় বাঙ্গলা দেশ কূলে কূলে ভরিয়া উঠিল। উত্তেজনাক্ষুব্ধ জাগরণের প্রথম চাঞ্চল্য ধীরে ধীরে কমিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত বাঙ্গালী আত্মস্থ হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তখন সে বুঝিল, বিবেকানন্দের প্রত্যেক বাণীতে কি অমোঘ সত্য ও বজ্রগর্ভ বিদ্যুৎ লুকাইয়া আছে। রজনীর অন্ধকার যেমন রাশি রাশি নক্ষত্রপুঞ্জকে অকস্মাৎ প্রকাশিত করিয়া তোলে, তেমনি জাতীয় দুর্দ্দিনের অন্ধকারে চরম সত্যগুলি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আমরা বুঝিলাম বিবেকানন্দের—সাধনা কি, সিদ্ধি কোথায়?

পশ্চাতে শ্মশান—সম্মুখে সুতিকাগার; পশ্চাতে ধ্বংসমূলক সংস্কার, সম্মুখে আত্মপ্রতিষ্ঠ সমন্বয়! তবুও ভারতবাসী বহুদিনের অভ্যস্থ সংস্কার-বশে আবার পাশ্চাত্যেরদিকে করুণ নেত্রে চাহিল।—সত্যই কি এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ?

(৫)

এমন সময়ে ইউরোপে ভীষণ সমরানল জ্বলিয়া উঠিল। অন্যায়, অনিয়ম ও ব্যভিচারের উপর ন্যায়ের রুদ্র বজ্র নামিয়া আসিল। পরাধীন পতিত জাতি আমরা—গৃহকোণে বসিয়া কত কথাই না শুনিলাম। শুনিলাম, নিপীড়িত ও পরাধীন জাতি সকল হৃত স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইবে, জগতে আবার সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইবে, জাতিতে জাতিতে ঈর্ষা, বিদ্বেষ ও স্বার্থদ্বন্দ্ব চিরদিনের মত পৃথিবী পৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইবে। এমন কি ন্যায়, নীতি ও ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য, পৃথিবীকে বলদর্পিত দানবীয় শক্তির স্বেচ্ছাচারের হস্ত হইতে মুক্ত ও নিরাপদ করিবার জন্য—এই দীন দরিদ্র জাতিকেও আহ্বান করা হইল। আমরা সগৌরবে আহ্বান শিরোধার্য্য করিলাম। ভাবিলাম, এই অনলে ইউরোপের শক্তির অভিমানজনিত সমস্ত হীনতা, সমস্ত স্বার্থপরতা পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে। নবীন ইউরোপ সেই পবিত্র ভস্ম সমাধির উপর তাহার মিলন-মন্দির রচনা করিয়া তুলিবে। 'যে বিদ্যার জোরে তারা বিশ্ব জয় করেছে' সেই বিদ্যার মহিমা তো আমাদের প্রাণের পরতে পরতে গাঁথা—অতএব সেই বিদ্যার জোরেই পাশ্চাত্যের লোকেরা 'বিশ্ব মানবকে' এক সার্ব্বভৌমিক উদার আলিঙ্গনে বক্ষে তুলিয়া লইবে। যুদ্ধ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের স্বয়ং নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ রাজবাড়ীতে গিয়া হাজির হইলেন। ইচ্ছা ঘরে-জমিনে দাঁড়াইয়া চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিবেন। কিন্তু হায়রে দুরাশা! হায়রে League of Nations (জাতিসঙ্ঘ) 'ভারতবর্ষের ধনমানহীন একটী সন্তান' (?) পীড়িত হৃদয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন;—"League of nations is a league of robbers. It is founded on force. It has no

spiritual foundation. "অর্থাৎ এই 'জাতিসঙ্ঘ' প্রকৃত প্রস্তাবে 'দস্যু-সঙ্ঘ' মাত্র। ইহা দৈহিক বলের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহার কোন আধ্যাত্মিক ভিত্তি নাই।"

আমরাও বুঝিলাম এই ভয়াবহ যুদ্ধে রাজনৈতিক ও ভৌগলিক পরিবর্ত্তন ব্যতীত আর বিশেষ কিছুই হইল না। মানব জাতির দুঃখদৈন্য কমা তো দূরের কথা—আরও দ্বিগুণিত হইল। তাহার উপর এই যুদ্ধে তাহার পৈশাচিক বর্ব্বরতা এমন জঘন্যভাবে উলঙ্গ করিয়া দেখাইল যে, ইউরোপ সম্বন্ধেই আমাদের একটা ঘৃণা জন্মিয়া গেল। যে ইউরোপ এতদিন আমাদের নিকট যাবতীয় মহৎ আদর্শের স্বপ্নরাজ্যস্বরূপ ছিল—এতদিনে বুঝিলাম ইন্দ্রিয়ভোগমূলক সভ্যতার নিকট যে এমনি করিয়াই আত্ম বিক্রয় করিয়াছে, ধর্ম্মের কথা, ঈশ্বরের কথা, তাহার অভিশপ্ত মনে ভ্রমেও উদয় হইবে না। শান্তি ও শৃঙ্খলার (Peace and order) নামে সমগ্র জগতে বাণিজ্য-ব্যপদেশে অবাধ লুণ্ঠনের ব্যবস্থাটা অব্যাহত থাকিলেই হইল। ইউরোপের প্রায়শ্চিত্য শেষ হইল না—নানাপ্রকার 'ইজিম্'এর আবর্ত্তে তাহাকে আরও কিছুদিন ঘুরপাক খাইতে হইবে—কতদিন কে বলিতে পারে?

সুদূর ভবিষ্যতের অন্ধ-যবনিকা তুলিয়া বিবেকানন্দের ধ্যানশুদ্ধ দিব্যদৃষ্টি বহু পূর্ব্বেই এই করুণ দৃশ্য দেখিয়াছিল, তাই তিনি পুনঃ পুনঃ দৃঢ়তার সহিত বলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন—এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ!

এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ! উদ্দেশ্য সার্ব্বভৌমিক ভিত্তির উপর মহা-মানব সমন্বয়—উপায় ত্যাগ ও সেবা, নারায়ণ জ্ঞানে জনসাধারণের সেবা। অনেকদিন ধরিয়া ভারতবর্ষ 'যত্র জীব তত্র শিব' এই মহামন্ত্র জপ করিয়াছে; আজ সেই ধ্যানময় ভাবগত আদর্শকে বাস্তবরূপ দিবার সময় আসিয়াছে। ভারতীয় যুবক! তুমি ইহা বিশ্বাস কর, এই আদর্শকে অবিকৃত রাখিবার জন্য তুমি প্রাণপণ কর, উহার বিশ্বজনীন উদার বিস্তৃতিকে কেহ যেন বুদ্ধির ক্ষুরধার দিয়া খণ্ডিত না করে। তথাকথিত বিজ্ঞানের ভাষ্য ও ব্যাখ্যায় যদি সত্য অস্পষ্ট হইয়া উঠিবার উপক্রম হয় তথাপি তুমি সত্যকে আংশিকভাবে সমর্থন

করিয়া উহার অপমান করিও না। বরং ব্যক্তিগত ধারণার সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণতা যাহাতে উহা কলুষিত না করিতে পারে তজ্জন্য স্বীয় প্রবুদ্ধ আত্মসম্বিতকে প্রহরীর সঙ্গিনের মতো উদ্যত করিয়া রাখো। যদি কোন অল্প-বিশ্বাসী বা অর্দ্ধবিশ্বাসী মদান্ধ, এই সমন্বয় যুগের বিস্ময়কর বিরাট কার্য্য-প্রণালীকে ভুল করিয়া ফেলে বা বুঝাইবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে তুমি ক্ষুব্ধ হইও না, চঞ্চল হইও না। কর্ম্মার্জ্জিত বিলাতী বিদ্যার মোহ-জর্জ্জর বুদ্ধি ও হৃদয়ের দৌরাত্ম্য হইতে আদর্শকে রক্ষা করিবার পবিত্র-দায় বিনম্র ও দৃঢ়তার সহিত স্বীকার কর।

"আমি তোমাদের নিকট গরীব, অজ্ঞ, অত্যাচার পীড়িতদের জন্য এই সহানুভূতি এই প্রাণপণ চেষ্টা দায়স্বরূপ অর্পণ করিতেছি। * * * তোমরা সারাজীবন এই ত্রিশকোটী ভারতবাসীর উদ্ধারের ব্রত গ্রহণ কর যাহারা দিন দিন ডুবিতেছে।"—স্বামিজীর ঐ মর্ম্মান্তিক আহ্বান বাণীর গভীর ব্যাপক ও আধ্যাত্মিক অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা কর। যাহা সকলের কায তাহা সকলে মিলিয়া করিতে হইবে। নিজকে দুর্ব্বল ভাবিয়া অক্ষম ভাবিয়া নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিও না। তোমার মধ্যে যে কি শক্তি নিহিত আছে তাহা তুমি জানো না। তুমি দীন, দুর্ব্বল, পদমর্য্যাদাহীন ক্ষুদ্র হইতে পারো। কিন্তু ক্ষুদ্র বলিয়া তো তুচ্ছ নহ। তুচ্ছ বলিয়াই তোমাকেও এই ধর্ম্মের বিরাট 'প্রজাসূয়' যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, তোমার পরিগৃহীত ব্রতের মহিমায়, পবিত্রতায় বিশ্বাস কর, সত্যের সর্ব্বসংশয়চ্ছেদী শক্তিতে বিশ্বাস কর। বিশ্বাসী হও, বিজয়ী হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

(ইংরাজীর অনুবাদ—জনৈক পাশ্চাত্য মহিলাকে লিখিত)

হোটেল, বেলভু,
বেকন ষ্ট্রীট, বোষ্টন।
১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪।

(৭)

মা,

আমি তোমাকে মোটেই ভুলে যাইনি। তুমি কি মনে কর, আমি কখন এতটা অকৃতজ্ঞ হতে পারি? তুমি আমাকে তোমার ঠিকানা দাওনি, তবু আমি মিস ফিলিপ্‌স্‌ ল্যাণ্ডসবার্গের কাছে যা সব খবর দেয়, তাই থেকে তোমার খবর পাচ্ছি। বোধ হয় মান্দ্রাজ থেকে আমায় যে অভিনন্দন পাঠিয়েছে, তা তুমি দেখেছ। আমি তোমাকে পাঠাবার জন্য খানকতক ল্যাণ্ডসবার্গের কাছে পাঠাচ্ছি।

হিন্দুসন্তান কখন মাকে টাকা ধার দেয় না, মার সন্তানের উপর সর্ব্ববিধ অধিকার আছে, সন্তানেরও মার উপর তাই। সেই তুচ্ছ ডলার কয়টা আমাকে ফিরিয়ে দেবার কথা বলাতে তোমার উপর আমার বড় রাগ হয়েছে। তোমার ধার আমি কোন কালে শুধ্‌তে পারব না।

আমি এখন বোষ্টনের কয়েক জায়গায় বক্তৃতা দিচ্ছি। আমি এখন চাই এমন একটা জায়গা, যেখানে বসে আমার ভাবরাশি লিপিবদ্ধ করতে পারি। বক্তৃতা যথেষ্ট হল, এখন আমি লিখ্‌তে চাই। আমার বোধ হয় তার জন্য আমাকে নিউইয়র্কে যেতে হবে। মিসেস গার্ণসি আমার প্রতি বড়ই সদয় ব্যবহার করেছিলেন এবং তিনি সদাই আমায় সাহায্য করতে ইচ্ছুক। আমি মনে করছি, তাঁর ওখানে গিয়ে বসে বই লিখ্‌বো।

তোমার সদা স্নেহাস্পদ—
বিবেকানন্দ

পুঃ—

অনুগ্রহপূর্ব্বক আমায় লিখ্‌বে, গার্ণসিরা সহরে ফিরেছে, না, এখনও ফিশ্‌স্কিলে আছে।

ইতি—

বি।

(৮)

(ইংরাজীর অনুবাদ।)

যুক্তরাজ্য, আমেরিকা।

২১শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪।

প্রিয় কিডি,

তোমার এত শীঘ্র সংসার ত্যাগের সংকল্প শুনে আমি বড়ই দুঃখিত হলাম। ফল পাক্‌লে আপনিই গাছ থেকে পড়ে যায়। অতএব সময়ের অপেক্ষা কর। তাড়াতাড়ি কোরো না। বিশেষ, নিজে আহাম্মকি কোন কায করে কারও অপরকে কষ্ট দেবার অধিকার নেই। সবুর কর, ধৈর্য্য ধরে থাক, সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে।

বালাজি, জি জি ও আমাদের অপর সকল বন্ধুকে আমার বিশেষ ভালবাসা জানাবে। তুমিও অনন্তকালের জন্য আমার ভালবাসা জান্‌বে।

ইতি—

বিবেকানন্দ।

(৯)

(ইংরাজীর অনুবাদ।)

হোটেল, বেলভু,

ইউরোপীয়ান প্লান,

বেকন ষ্ট্রীট, বোষ্টন।

২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪।

প্রিয় মিসেস বুল,

আমি আপনার কৃপালিপি দুখানিই পেয়েছি। আমাকে শনিবারে মেলরোজি ফিরে গিয়ে তথায় সোমবার পর্য্যন্ত থাক্‌তে হবে। মঙ্গলবার

আপনার ওখানে যাবো। কিন্তু ঠিক কোন্ জায়গাটা আপনার বাড়ী আমি ভুলে গেছি আপনি অনুগ্রহ করে যদি আমায় লেখেন। আমার প্রতি অনুগ্রহের জন্য আপনাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না—কারণ, আপনি যা দিতে চেয়েছেন ঠিক সেই জিনিষটাই আমি খুঁজ্‌ছিলাম—লেখ্‌বার জন্য একটা নিজ্জন যায়গা। অবশ্য আপনি দয়া করে যতটা জায়গা আমার জন্য দিতে চেয়েছেন, তার চেয়ে কম জায়গাতেই আমার চলে যাবে। আমি যেখানে হয় গুড়িসুড়ি মেরে পড়ে আরামে থাক্‌তে পার্‌বো।

আপনার সদা বিশ্বস্ত

বিবেকানন্দ।

(১০)

(ইংরাজীর অনুবাদ)

যুক্তরাজ্য, আমেরিকা,

৩০শে নবেম্বর, ১৮৯৪।

প্রিয় কাড,

তোমার পত্র পেলাম। তোমার মন যে নানা দিকে এদিক্ ওদিক্ করেছে, তা সব পড়লাম। সুখী হলাম যে, তুমি রামকৃষ্ণকে ত্যাগ করনি। তাঁর জীবনের অদ্ভুত গল্পগুলি সম্বন্ধে বক্তব্য এই, আমি তোমাকে পরামর্শ দিচ্ছি, তুমি সেগুলি থেকে—আর যে সব আহাম্মক ওগুলি লিখ্‌ছে, তাদের থেকে তফাত থাক্‌বে। সেগুলি সত্য বটে, কিন্তু আমি নিশ্চিত বুঝ্‌ছি, আহম্মকেরা সবগুলো গণ্ডগোল পাকিয়ে খিচুড়ি করে ফেল্‌বে। তাঁর কত ভাল ভাল জ্ঞানরাশি শিক্ষা দেবার ছিল—তবে সিদ্ধাই রূপ বাজে জিনিষগুলির উপর অত ঝোঁক দাও কেন? অলৌকিক ঘটনার সত্যতা প্রমাণ কর্‌তে পার্‌লেই ত ধর্ম্মের সত্যতা প্রমাণ হয় না—জড়ের দ্বারা ত আর চৈতন্যের প্রমাণ হয় না! ঈশ্বর বা আত্মার অস্তিত্ব বা অমরত্বের সঙ্গে অলৌকিক ক্রিয়ার কি সম্বন্ধ? তুমি ঐ সব নিয়ে মাথাঘামিও না, তুমি তোমার ভক্তি নিয়ে থাক আর এটী নিশ্চিন্ত থেকো যে, আমি তোমার সব

দায়িত্ব গ্রহণ করিছি। এটা ওটা নিয়ে মনটাকে চঞ্চল কোরো না। রামকৃষ্ণকে প্রচার কর। যে পেয়ালা খেয়ে তোমার তৃষ্ণা মিটেছে, তা অপরকে খাইয়ে দাও। তোমার প্রতি আমার আশীর্ব্বাদ—সিদ্ধি তোমার করতলগত হোক্। বাজে দার্শনিক চিন্তা নিয়ে মাথা ঘামিও না—অথবা তোমার গোঁড়ামী দিয়ে অপরকেও বিরক্ত কোরো না। একটা কাজই তোমার পক্ষে যথেষ্ট—রামকৃষ্ণকে প্রচার করা, ভক্তি প্রচার করা। এই কাজের জন্য তোমায় আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি—করে যাও। যদি আরও নির্ব্বোধের মত প্রশ্ন তোমার মনে আসে, জানবে—তোমার উদ্ধারের আর বাকি নেই, তোমার সিদ্ধ হবার আর বাকি নেই। এখন গিয়ে প্রভুর নাম প্রচার করোগে।

সদা আশীর্ব্বাদক

বিবেকানন্দ

ভিক্ষু ও দাতা।

(ব্রহ্মচারী ত্যাগচৈতন্য)

ভিক্ষু কহে দান পেয়ে
শুন ওহে দাতা
চিরদিন প্রকাশিব
এই কৃতজ্ঞতা।
দাতা কহে শুন ভিক্ষু
কি বলিছ তুমি
তুমি যে শিখালে দান
কৃতজ্ঞ যে আমি।

বুদ্ধ ও যশোধারা।*

(নিবেদিতা)

(অনুবাদক—শ্রীকেশবচন্দ্র নাগ বি, এ,).

পুরাতন রাজধানী কপিলবাস্ত্ত সুদূর উত্তর ভারতের হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত। তথায় প্রায় পঞ্চবিংশ শতাব্দী পূর্ব্বে একদিন শিশুরাজকুমার গৌতমের জন্ম উপলক্ষে সমগ্র নগর ও রাজপুরী আনন্দ কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিল। যে সকল ভৃত্য এই শুভ সংবাদ আনয়ন বা এ বিষয়ে সামান্য কিছুও করিয়াছিল রাজা তাহাদের সকলকেই প্রচুর উপহার প্রদান করিলেন। এক্ষণে তিনি অন্দরের এক প্রকোষ্ঠে উদ্বিগ্ন ভাবে অপেক্ষা করিতে ছিলেন, আর একদল বিজ্ঞ পণ্ডিত কাগজ পুস্তক ও অদ্ভুত যন্ত্রাদি লইয়া নিবিষ্টচিত্তে কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন।

তাঁহারা করিতেছিলেন কি ?—সে এক অতি কৌতুকপ্রদ ব্যাপার। তাঁহারা ঐ ক্ষুদ্র শিশুটীর জন্মকালিন নক্ষত্ররাজির অবস্থান নির্ণয় ও তদ্দ্বারা তাহার ভবিষ্যৎ জীবন-গতি গণনায় নিযুক্ত ছিলেন। অতি অদ্ভুত মনে হইলেও ভারতবর্ষের ইহা একটী অতি পুরাতন প্রথা এবং অদ্যাপি উহা সমভাবে প্রচলিত। এই নাক্ষত্রিক ভবিষ্যৎগণনকে কোষ্ঠী বা জন্ম পত্রিকা বলে। এখনও এরূপ সব হিন্দু আছেন যাঁহাদের ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্বকার পিতৃপুরুষের নাম ও কোষ্ঠী বর্ত্তমান আছে।

শিশু রাজকুমারের কোষ্ঠী নির্ণয় করিতে কপিলবাস্তুর সেই পণ্ডিত মণ্ডলীর বহু সময় লাগিল। কারণ তাঁহারা এরূপ অসাধারণ লক্ষণ দর্শন করিয়াছিলেন যে কোষ্ঠী ঘোষণা করিবার পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে

---

* ইংরাজী হইতে অনূদিত।

সম্পূর্ণ নির্ভুল ও একমত হইতে হইয়াছিল। অবশেষে তাঁহারা রাজ সমীপে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

রাজা ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "শিশু বাঁচিবে ত?" বয়োজ্যেষ্ঠ জ্যোতিষী উত্তর করিলেন "বাঁচিবে মহারাজ।" ইহা শুনিয়া রাজা আশ্বস্ত হইলেন এবং ভাবিলেন এক্ষণে তিনি অবশিষ্টাংশের জন্য স্থিরভাবে অপেক্ষা করিতে পারেন। জ্যোতিষী পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন "হাঁ বাঁচিবে, কিন্তু যদি এই কোষ্ঠী নির্ণয় ঠিক হইয়া থাকে তবে অদ্যাবধি সপ্তম দিবসে ইহার জননী মহারাণী মায়াদেবী মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন। হে রাজন্! এই সূচনাই আপনাকে নির্দ্দেশ করিয়া দিবে যে, হয় আপনার পুত্র পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্রাট কিংবা মানবের শোক দুঃখে ব্যথিত হইয়া সংসার ত্যাগ পূর্ব্বক এক মহান ধর্ম্মগুরু হইবেন।" তৎপরে পত্রিকা গুলি রাজার হস্তে অর্পণ করিয়া তিনি সঙ্গিগণের সহিত চলিয়া গেলেন

যখন একাকী বসিয়া রাজা গণনার বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন তখন "রাণী মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন", "শ্রেষ্ঠ সম্রাট কিংবা একজন ধর্ম্মগুরু" এই কথাগুলি নৃপতির কর্ণে পুনঃ পুনঃ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। 'ধর্ম্মগুরু' অর্থাৎ ভিক্ষুক। (উভয়ই ত একার্থ বোধক)—এই শেষের কথা গুলি তাঁহার মানসপটে যেরূপ ভীষণ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিল সূচনায় ঘটনাটি সেরূপ বলিয়া মনে হয় নাই। এক্ষণে নৃপতি কাঁপিয়া উঠিলেন। আচ্ছা স্থির হও! তাঁহারা ত বলিয়াছেন "মানবের শোক দুঃখে ব্যথিত হইয়া সংসার ত্যাগ করিবে।" পিতা দৃঢ় স্বরে বলিয়া উঠিলেন "আমার পুত্র মানুষের শোক দুঃখ কখনও অবগত হইবে না।" মনে করিলেন এইরূপে তিনি স্বেচ্ছানুসারে কুমারের ভাগ্যকে প্রতাপশালী নরপতি হইতে বাধ্য করিবেন।

জ্যোতিষীদের গণনানুযায়ী সপ্তম দিবসে রাজমহিষী মায়াদেবীর শুদ্ধাত্মা ইহধাম ত্যাগ করিল। এই শেষ সময়ে তাঁহার যতদূর সম্ভব সেবা যত্ন করা হইয়াছিল কিন্তু কোনই ফল হয় নাই। পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট দিনে তিনি হৃষ্ট শিশুর ন্যায় নিদ্রিতা হইলেন আর উঠিলেন না।

তৎপরে রাজা শুদ্ধোধন তাঁহার এই শোকের উপর এক উদ্বেগ অনুভব করিলেন, কারণ এখন তিনি নিশ্চিত বুঝিলেন যে দৈবজ্ঞগণের গণনা সত্য ও নির্ভুল। এক্ষণে তিনি পুত্রকে ভিক্ষুকের ভাগ্য হইতে রক্ষা করিয়া তৎপরিবর্ত্তে তাঁহাকে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমৃদ্ধি ও শক্তি-শালী ভূপতি করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন।

রাজ কুমারের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যাহারা তাঁহার সহিত থাকিত তাহারা বেশ বুঝিয়াছিল যে তাঁহার ভবিষ্যৎ অতি অদ্ভুত। তিনি এত প্রফুল্ল ও কৌতুক প্রিয়, ক্রীড়া ও অধ্যয়নে এরূপ পারদর্শী এবং একটী কথায় ও দৃষ্টিতে এত ভালবাসা প্রকাশ করিতেন যে তিনি সমীপবর্ত্তী সকলেরই অনুরাগভাজন হইয়াছিলেন। সকলেই বলিত তাঁহার হৃদয় দয়ায় পূর্ণ ছিল। তিনি অসীম যত্নসহকারে ভগ্নপক্ষ বিহগের প্রাণদান করিতেন এবং কপিলবাস্তুর সম্রান্তবংশীয় যুবক বন্ধুগণের মত ক্রীড়াচ্ছলে কখনই মূক প্রাণীবর্গকে হত্যা করিতে পারিতেন না। তিনি বলিতেন, এই ক্ষুদ্র ভ্রাতৃগণের দুঃখবেদনায় আনন্দ প্রকাশ করা মনুষ্যোচিত নহে। সুতরাং শরাহত হইলে কি যন্ত্রণা হয় তাহা তিনি বুঝিতেন কিন্তু অন্য কোনরূপ দুঃখের বিষয় কখনও শ্রবণ করেন নাই। রাজপ্রাসাদছিল তাঁহার বাসস্থান; তাহার চতুর্দ্দিকে এক উদ্যান ও তৎপরে রাজধানীর উত্তরে বহুদূর বিস্তৃত এক পুরোদ্যান বা বৃক্ষ-বাটিকা (Park)। বাল্যকালে তিনি কখনও এই সীমা অতিক্রম করেন নাই। এইস্থানে তিনি অশ্বারোহণ ও ধনুর্ব্বিদ্যা অভ্যাস করিতেন এবং পর্য্যবেক্ষণরত চিন্তা ও কল্পনায় মগ্ন হইয়া বহুক্ষণ বিচরণ করিতেন। এখানে দুঃখের চিহ্নছিল না, অন্ততঃ যে কখনও দুঃখকষ্ট কাহাকে বলে জানে না তাহার চিত্তবিক্ষেপ করিতে পারে এরূপ কিছুই এখানে ছিল না। এই স্থানটী যেন একটী সমগ্ররাজ্য; ইহার সীমার বাহিরে ভ্রমণ করিবার চিন্তা কখনও তাঁহার মনে উদিত হয় নাই। তাঁহার পিতা তাঁহার সমক্ষে মৃত্যু বা শোকের কথা বলিতে সকলকে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। অতএব ঐরূপ কিছু যে হইতে পারে তাহা কুমারের ধারণা ছিল না। 'মানবের দুঃখে ব্যথিত হইয়া'

এই কথাগুলি শুদ্ধোধনের স্মৃতিপটে সতত জাগরূক ছিল এবং এই দুঃখ-কষ্টের জ্ঞান হইতে তিনি তাঁহার পুত্রকে রক্ষা করিতে যত্নবান ছিলেন।

ত্রিংশবর্ষ পর্য্যন্ত ভারতীয় যুবকগণের শিক্ষাকাল। তৎপরে তাহারা স্বাধীন হয়। গৌতম এইবার এই বয়ঃক্রমে উপনীত হইয়া গৃহত্যাগপূর্ব্বক অন্যান্য দেশ পর্য্যাটনের বাসনা করিতে পারেন। ইহাতে কোন ব্যক্তির এমন কি রাজারও বাধাদিবার ক্ষমতা নাই,—কারণ, তিনি এখন স্বাধীন পুরুষ। এই সময়ে সকলে তাঁহাকে যেন এক মধুর পুষ্পপাশে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন। তাঁহারা গৌতমকে জানাইলেন যে এক্ষণে তাঁহার বিবাহ করিয়া সংসারী হইবার সময় হইয়াছে। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে ইহাতে নিশ্চয়ই কালক্রমে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফল হইবে। যদি তিনি প্রণয়িনী ভার্য্যা ও স্নেহভাজন সুকুমার পুত্রকন্যা দ্বারা পরিবৃত থাকেন তাহা হইলে সর্ব্বদা এই অনির্ব্বচনীয় আনন্দসাগরে নিমগ্ন ও নানা কার্য্যে এরূপ ব্যাপৃত থাকিবেন যে আর কখনই তিনি সংসার ত্যাগ করিতে সক্ষম হইবেন না। বরং সন্তানগণের জন্য উত্তরোত্তর অধিকতর ধনশালী হইবার বাসনা জন্মিবে ও অবশেষে কোষ্ঠী অনুসারে পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তি ও ঐশ্বর্য্যশালী নৃপতি হইবেন।

গৌতম কিন্তু এক বিষয়ে কৃত সঙ্কল্প ছিলেন—তিনি স্বয়ং দেখিয়া পাত্রী নির্ব্বাচন করিবেন। অতএব সম্ভ্রান্ত যুবকগণ তাঁহাদের ভগিনীগণের সহিত কপিলবাস্তুর রাজসভায় এক সপ্তাহ অতিবাহিত করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইলেন। প্রতিদিন প্রাতঃকালে গদাচালন অসিচর্য্যা, অশ্বারোহণ প্রভৃতি নিপুণ ক্রীড়া এবং সায়ংকালে প্রাসাদ নাট্যশালায় যাদুবিদ্যা, মন্ত্রদ্বারা সর্পবশীকরণাদি প্রদর্শিত হইতে লাগিল। সকলেই এই আনন্দ বিশেষ উপভোগ করিলেন।

একটী কুমারী সম্বন্ধে রাজা স্বয়ং, অমাত্যবর্গ এমন কি নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণও ভাবিয়াছিলেন যে রাজকুমার তাঁহাকেই মনোনীত করিবেন। কারণ, তাঁহার সৌন্দর্য্য, প্রতিভা ও বংশমর্য্যাদা সমবেত মহিলাগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল।—এই কুমারীর নাম যশোধারা।

শেষদিন উপস্থিত হইলে গৌতম দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া এই শুভাগমনের স্মরণ চিহ্নস্বরূপ কুমারীগণের কাহাকেও কণ্ঠহার, কাহাকেও কঙ্কণ কাহাকেও বা উজ্জ্বলমণি প্রভৃতি উপহার প্রদানপূর্ব্বক মধুর সম্ভাষণের সহিত সকলকে বিদায় দিতেছিলেন; কিন্তু যশোধারার জন্য স্বীয় ভূষণস্থিত একটী পুষ্প ব্যতীত তাঁহার আর কিছু দিবার ছিল না। দর্শকগণ এই অবহেলা লক্ষ্য করিয়া অনুমান করিলেন যে তিনি অপর কাহাকেও মনোনীত করিয়াছেন, এবং যশোধারা ব্যতীত সকলেই অতিশয় দুঃখিত হইলেন। যশোধারার নিকট এই একটী পুষ্পই তাঁহার সঙ্গিনীদিগের সমগ্র রত্নরাজি অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান বলিয়া মনে হইল এবং পরদিন যখন কপিলবাস্তপতি তাঁহাকে নিজ পুত্রবধূরূপে পাইবার জন্য স্বয়ং তাঁহার পিতার নিকট প্রস্তাব করিলেন তখন ব্যাপারটী তাঁহার নিকট আদৌ বিস্ময়জনক বলিয়া বোধ হয় নাই। হয়ত তিনি পূর্ব্বেই কতকটা উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে দীর্ঘ জন্মপরম্পরায় বরাবরই তিনি গৌতমের সহধর্ম্মিনীর আসন পাইয়া আসিতেছেন।

কিন্তু যশোধারার নামে বহু প্রণয়প্রার্থী আকৃষ্ট হইয়াছিল। সুতরাং মর্য্যাদা ও শিষ্টতা রক্ষার জন্য গৌতমকে উন্মুক্ত মল্লভূমিতে অন্যান্য পাণিপ্রার্থীদের মধ্যে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়া যশোধারাকে লাভ করিলেন।—ইহাই রাজবংশের রীতি ছিল। এই সত্ত্বে রাজকুমারীর পিতা উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

গৌতম ইহাতে আনন্দিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে সকল প্রতিদ্বন্দ্বীকে তাঁহার সহিত মল্লভূমিতে প্রবেশ করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। তাঁহার আত্মীয়গণ বলিতে লাগিলেন "হায়, তুমি উড্ডীয়মান পক্ষীকে কিম্বা পলায়নপর মৃগকে শরবিদ্ধ করিতে সতত অস্বীকার করিয়াছ, তুমি কিরূপে এই ক্রীড়াযুদ্ধে দ্রুত পলায়নপর বরাহকে শরাঘাত করিতে সক্ষম হইবে? আর এই বিশাল ধনুতে জ্যারোপণে প্রসিদ্ধ ধনুর্দ্ধরগণের সহিত কিরূপেই বা প্রতিযোগিতা করিবে?" কিন্তু গৌতম উত্তরে কেবল মৃদু হাস্য করিলেন। তিনি ভয় কাহাকে বলে জানিতেন না

এবং অন্তরে অসীম শক্তিপুঞ্জের অস্তিত্ব অনুভব করিতেন। নির্দ্ধারিত কাল উপস্থিত হইলে তাহার আত্মপ্রতীতির যাথার্থ্য প্রমাণিত হইল—তিনি সকল প্রতিযোগিতায় অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে পরাভূত করিয়া সর্ব্ববিষয়ে জয় পুরস্কার লাভ করিলেন। তৎপরে যশোধারার সহিত রাজকুমার গৌতমের শুভপরিণয় সম্পন্ন হইল।

বরকন্যার নূতন আবাস পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সুন্দর ও রমণীয় করা হইল। এক ক্ষুদ্র জল প্রণালীর উভয় তীর হইতে বৃহৎ বৃহৎ থিলান গাঁথিয়া গোলাপী রঙের প্রস্তর ও কারুকার্য্যে শোভিত কাষ্ঠদ্বারা এক নূতন প্রাসাদ নির্ম্মিত হইল। তৎসংলগ্ন উদ্যানের প্রান্তে এক নৃত্যশীলা স্রোতস্বিনী শ্বেতপ্রস্তর গঠিত এক দ্বীপের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়াছিল। দ্বীপোপরি শুভ্র ও শীতল কক্ষাবলী শোভমান এবং ঐ গ্রীষ্মভবনের চারিদিকে ইচ্ছামত জলস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিবার জন্য নদীগর্ভে বহুসংখ্যক উৎস সংরক্ষিত। যাহাতে বায়ু প্রবেশ, ছায়া ও নির্জ্জনতার বাধা না জন্মে অথচ অনায়াসে নিম্নের ফলফুলযুক্ত বৃক্ষ বিশিষ্ট ও পুষ্প পূর্ণ প্রান্তর শোভিত বিস্তৃত তৃণক্ষেত্র দর্শন করা যায় তজ্জন্য বাতায়ন পথে সছিদ্র প্রস্তর সংলগ্ন ছিল। প্রত্যেক বৃহৎ কক্ষের এক এক প্রান্তে উপর হইতে বৃহৎ শিকলের সাহায্যে দুইটী গদির আসনযুক্ত দোলা লম্বিত ছিল। গ্রীষ্মের দিনে ইহাতে বসিয়া দুলিলে গৃহের শীতল বায়ুস্পর্শ অনুভব করা অথবা আরামে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া পরিচারিকাগণের ব্যজন সেবন করা যাইত। মন্ত্রিগণ অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও বিশেষ সাবধানতার সহিত পরীক্ষা করিয়া তবে ইঁহাদের জন্য প্রিয়দর্শন ও প্রফুল্লচিত্ত ভদ্রবংশীয় সহচর ও পরিচারিকা নিযুক্ত করিতেন।

রাজার কঠোর আদেশ ছিল—কখনও যেন মানবের অশ্রু বা আর্ত্তনাদ কুমারের দৃষ্টি বা কর্ণগোচর না হয়, যেন তিনি কখনও কোনরূপে ব্যাধি বা ক্ষয় না দেখিতে পান। যদি তিনি নগরভ্রমণে বাহির হইতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে যেন কোন নূতন রঙ্গরস বা আমোদপ্রমোদে তাঁহাকে তাঁহার উদ্দেশ্য হইতে বিরত করা হয়। কিন্তু হায়, বিধিলিপি

কেহ কখন পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। রাজা স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে যোগ্যকাল উপস্থিত হইলে তাঁহার এই সকল চেষ্টাই, কুমারের যে দৃঢ়সঙ্কল্পকে তিনি এত ভয় করিতেছেন, তাহাকেই আরও শক্তিসম্পন্ন করিয়া তুলিবে। তিনি তাঁহার পুত্রকে যাহাদ্বারা ঘিরিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা ত জীবন নহে—সে যে একটা খেলা! একটা স্বপ্ন! মিথ্যা অপেক্ষা সত্যই শক্তিশালী এবং শীঘ্রই হউক বা কিছু বিলম্বেই হউক সত্যের তৃষ্ণা কুমারের অন্তরে জাগিয়া উঠিবেই।

ঘটিয়াছিলও ঠিক তাহাই। একদিন গৌতম রথ প্রস্তুত করিতে বলিলেন এবং প্রাসাদ-প্রাচীরের বহির্দ্দেশস্থ নগরার অর্থাৎ তাঁহার ভাবী রাজধানী কপিলবাস্তর মধ্য দিয়া গমন করিবার জন্য সারথিকে আদেশ করিলেন। বিস্মিত সারথি আদেশ পালন করিল—সে ত এস্থলে অস্বীকার করিতে পারে না! কিন্তু তাহার ভয় হইল কারণ রাজা ইহা শুনিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইবেন।

কপিলবাস্তর মধ্য দিয়া রথ চলিতে লাগিল। সেইদিন গৌতম প্রথম দেখিলেন—প্রকৃত জীবন কি! তিনি দেখিলেন—ক্ষুদ্র বালক-বালিকারা পথের উপর খেলা করিতেছে; বাজারের উন্মুক্ত বিপণিশ্রেণীতে ব্যবসায়ীরা বসিয়া ক্রেতাদের সহিত তাহাদের সম্মুখস্থিত পণ্যদ্রব্যের মূল্য চুক্তি করিতেছে; শিল্পকার, কুম্ভকার, বাসনবিক্রেতা সকলেই নিজ নিজ বিক্রয়স্থানে বসিয়া কার্য্যরত আর তাহাদের ভৃত্যগণ তাহাদিগকে নানারূপে সাহায্য করিতেছে; ক্লান্ত বাহকগণ গুরুভার স্কন্ধে লইয়া অতিকষ্টে যাতায়াত করিতেছে; কোথাও বা দীর্ঘ দণ্ডধারী ভস্মমণ্ডিত উজ্জ্বলকায় কোন সন্ন্যাসী পথ অতিক্রম করিতেছেন; এবং অভুক্ত সারমেয়গণ খাদ্যখণ্ডের জন্য পরস্পর কলহ করিতেছে, গ্রামাগত তুলা, ফল, শস্য ভারবাহী গোযানের ঘড় ঘড় শব্দেও বিচলিত হইতেছে না। তথায় স্ত্রীলোক অতি অল্পই ছিল, তাহারাও অল্পবয়স্কা নহে, কারণ তখন প্রায় মধ্যাহ্ন এবং প্রাতঃস্নান প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছিল। তথাপি মধ্যে মধ্যে এক একটী অবগুণ্ঠন নত বালিকা বৃহৎ পিত্তল-কলসে জল লইয়া গৃহে ফিরিতেছিল।

ইহা সত্ত্বেও পথগুলি কিন্তু বিচিত্র রঙে ভূষিত ছিল। কারণ স্কন্ধদেশে লম্বমান রেশম বা পশম নির্ম্মিত উজ্জ্বলবর্ণের শাল বা চাদর এদেশের পুরুষগণের পরিচ্ছদের একটী অংশ বিশেষ। সহরের রাজপথে স্ত্রীলোকদিগের চরণাভরণের মধুর শিঞ্জন শ্রুত না হইলেও তথায় পীত লোহিত গোলাপী, নানাবর্ণের প্রাচুর্য্য ও চলমান জনস্রোতের উজ্জ্বলতা বিশেষরূপে দৃষ্ট হয়। গৌতম সারথির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন "আমি এখানে দেখিতেছি শ্রম, দারিদ্র্য ও বুভুক্ষা—তথাপি উহাদের সহিত কত সৌন্দর্য্য, ভালবাসা ও আনন্দ মিশ্রিত রহিয়াছে—কিন্তু ওসকল সত্ত্বেও বাস্তবিক জীবন কত মধুর!" তিনি চিন্তিত ভাবে যেন নিজের সহিত কথোপকথন করিতে করিতেই উহা বলিলেন এবং ঐ কথাগুলিতেই মানবের ত্রিতাপ—অবসাদ, ব্যাধি ও মৃত্যু—তাঁহার জ্ঞানগম্য হইল। এইরূপে ধীরে গৌতমের জীবনের সেই চিরস্মরণীয় মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইল।

প্রথমে আসিল অবসাদ। উহা কেশহীন মস্তক, দন্তবিহীন তুণ্ড ও শ্লথ হস্তপদ বিশিষ্ট এক বৃদ্ধের মূর্ত্তিতে আসিয়া দেখা দিল। তাহার অন্ধ ও দৃষ্টিহীন চক্ষুতে আলোকের লেশমাত্র নাই, শ্রবণদ্বয় একেবারে বধির অবসাদ তাহাকে যেন একটী জীবন্ত কঙ্কালে পরিণত করিয়াছে। আশ্রয়-দণ্ডে ভর দিয়া ভিক্ষার জন্য সে তাহার বিকল হস্তটী প্রসারিত করিল। রাজকুমার সম্মুখে ঝুঁকিয়া ব্যগ্রভাবে তাহাকে অর্থ দান করিলেন—বৃদ্ধ স্বপ্নেও যাহা প্রত্যাশা করিতে পারে নাই তিনি তাহার অধিক দান করিলেন। তাঁহার মনে হইল যেন তাহার আত্মা ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া আসিতেছে। তিনি চীৎকার করিয়া সারথিকে বলিয়া উঠিলেন "একি! একি! ছন্দক! কিসে এ কষ্ট পাইতেছে?" ছন্দক সান্ত্বনাস্বরে বলিল "না, ইহা কিছুই নহে। লোকটী অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছে মাত্র।" গৌতম পিতার পলিতকেশ এবং প্রাচীন রাজমন্ত্রীগণের কথা চিন্তা করিয়া বলিলেন "বৃদ্ধ! কিন্তু বৃদ্ধ ব্যক্তিরা সকলেই ত এরূপ নহে?" সারথি উত্তর করিল "হাঁ, অতিশয় বৃদ্ধ হইলে সকলেই এরূপ হয়।" "আমার পিতা?" গৌতমের বলিতে প্রায় কণ্ঠরোধ হইতেছিল "আমার পিতা? যশোধারা? আমরা?" সারথি গম্ভীরভাবে উত্তর করিল "সকল

মনুষ্যই বার্দ্ধক্যের অধীন এবং অতি বার্দ্ধক্যেই এই অবস্থা হইয়া থাকে।”

গৌতম ভীত ও অনুকম্পায় অভিভূত হইয়া মৌনাবলম্বন করিলেন; কিন্তু এভাব মুহূর্ত্তকাল মাত্র স্থায়ী হইল। কারণ তাঁহার বিমানপার্শ্বে তখন ভীষণদর্শন এক ব্যক্তি আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গে ত্বকের উপর ঈষৎ পাটলবর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিসের দাগ এবং সে যে হস্তপ্রসারিত করিল তাহা প্রায় গ্রন্থিচ্যুত হইয়াছে। তদ্দর্শনে আমরা অনেকেই বোধহয় চক্ষু আবৃত করিয়া দ্রুতবেগে সে স্থান পরিত্যাগ করিতাম; কিন্তু কুমারের মানসিক অবস্থা তখন সেরূপ ছিল না। তিনি তাহাকে একটী মুদ্রা দান করিবার সময় শ্রদ্ধা ও অনুকম্পাকম্পিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন “ভাই আমার!” গৌতমের করুণাসিক্ত কোমল কণ্ঠস্বরে মনুষ্যটী যখন বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিল তখন ছন্দক বলিল “এ একজন কুষ্ঠরোগী, চলুন আমরা অগ্রসর হই।” গৌতম জিজ্ঞাসা করিলেন “সে আবার কি, ছন্দক!” “প্রভু, এই ব্যক্তি ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছে।” “ব্যাধি! ব্যাধি! ব্যাধি কি?” “মহাশয়, উহা শরীরের বিপত্তি বিশেষ এবং কখন কিরূপে ঘটে তাহা কেহ জানে না। ইহা মানবের শান্তি নষ্ট করে, হয়ত প্রচণ্ড নিদাঘে মানুষকে শীতলাঙ্গ কিম্বা পর্ব্বততুষারের মধ্যেও তাহাকে উত্তপ্ত করে; ইহার প্রকোপে কেহ প্রস্তরের ন্যায় নিস্পন্দভাবে নিদ্রা যায় কেহ বা উত্তেজনায় উন্মত্ত হইয়া উঠে; কখনও কখনও এই দেহটাই একটু একটু করিয়া খসিয়া পড়ে; আবার কখন হয়ত ইহার গঠনটী বজায় থাকে কিন্তু ইহা ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া অস্থিগুলি নয়নগোচর হইয়া পড়ে; আবার হয়ত উহা স্ফীত হইয়া ভীষণাকার ধারণ করে—ইহার নাম ব্যাধি। ইহা কোথা হইতে আসে ও কোথায় চলিয়া যায় তাহা কেহই জানে না এবং কখন আমাদিগকে আক্রমণ করিবে কেহই বলিতে পারে না।” গৌতম কাতরভাবে বলিলেন “এই জীবন!—এই জীবন আমি এত মধুর ভাবিয়াছিলাম!” তিনি কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন, তৎপরে জিজ্ঞাসা করিলেন “কিরূপে মানুষ এই জীবন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে?

তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে পারে এমন কে তাহাদের সুহৃদ আছে?” ছন্দক বলিল “মৃত্যু! ঐ দেখুন শববাহকেরা একজনকে দাহ করিবার জন্য নদীতীরে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে।”

গৌতম চাহিয়া দেখিলেন চারিজন বলিষ্টব্যক্তি একটী অনুচ্চ খট্বা স্কন্ধে বহন করিতেছে এবং তদুপরি শুভ্র বস্ত্রাবৃত মনুষ্যাকৃতি একটী কি শায়িত রহিয়াছে। বাহকগণের কাহারও পদস্খলন হইলেও আচ্ছাদনের ভিতর সেটী একটুও নড়ে না বা তাহারা প্রতি পদক্ষেপে ভগবানের নাম লইয়া চিৎকার করিলেও, প্রার্থনার কোন লক্ষণই প্রকাশ করে না।

সারথি ব্যাকুলভাবে বলিতে লাগিল “কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মনুষ্যগণ মৃত্যুকে ভালবাসে না। ইহাকে তাহারা বন্ধু বলিয়া ভাবে না বরং ইহাকে জরা ও ব্যাধি অপেক্ষা ভয়ঙ্কর শত্রু বলিয়া মনে করে। ইহা অতর্কিতভাবে তাহাদিগকে আক্রমণ করে এবং সকলেই ইহাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করে ও ইহা হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে।

গৌতম তখন আরও নিবিষ্টচিত্তে সেই শোক গম্ভীর শবযাত্রা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অন্তরে যেন কি এক দৃশ্য উন্মুক্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল এবং মানুষ মৃত্যুকে ঘৃণা করে কেন তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন; যেন ক্রমান্বয়ে এক দীর্ঘ চিত্রপরম্পরা তাঁহার মানসনেত্রের সম্মুখদিয়া অতিক্রম করিতেছিল। তিনি দেখিলেন—অদূরবর্ত্তী ঐ মৃত ইতিপূর্ব্বে বহুবার মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে এবং প্রত্যেকবারই আবার জন্মগ্রহণ করিয়াছে—দেখিলেন, এখন সে মরিয়াছে কিন্তু আবার সে নিশ্চয়ই এই সংসারে ফিরিয়া আসিবে। তিনি বলিলেন “জাতস্যহি ধ্রুবো মৃত্যুঃ ধ্রুবং জন্ম মৃতস্যচ। ওঃ, এই জীবনচক্রের আবর্ত্তনের আদি নাই, অন্ত নাই—ছন্দক, গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কর।”

সারথি আদেশ মত গৃহাভিমুখে শকট চালনা করিল, কিন্তু কুমার আর কোন প্রশ্ন করিলেন না। তিনি চিন্তামগ্ন হইয়া বসিয়া রহিলেন, ক্রমে তাঁহারা পুনরায় প্রাসাদে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। কিন্তু পূর্ব্বে যাহা অতি সুন্দর ও মনোহর বলিয়া মনে হইয়াছিল এক্ষণে তাহা অতি

শূন্য বলিয়া বোধ হইল—শস্যশ্যামল প্রাঙ্গন, মুকুলিত পাদপশ্রেণী ও নৃত্যশীলা স্রোতস্বিনী শিশুকে সত্যানুসন্ধান হইতে ভুলাইয়া রাখিবার উপযুক্ত কতকগুলি ক্রীড়নক ভিন্ন আর কি? যশোধারা আর তিনি যেন দুইটীশিশু তাঁহাদের ক্রীড়ার সামগ্রী লইয়া আগ্নেয় গিরির উপর রচিত এক রম্য কাননে অবস্থান করিতেছেন, আর ঐগিরি যে কোন মুহূর্ত্তে বিদীর্ণ হইয়া তাঁহাদিগকে ধ্বংস করিতে পারে। সকল নরনারীই তদবস্থ, তবে তাঁহাদের ন্যায় সকলের হয়ত এই ক্রীড়া উপভোগ করিবার সুযোগ ঘটে নাই।

গৌতমের হৃদয় যেন এক বিশাল করুণাসিন্ধু। উহা যেন মানব-জাতির দুঃখে আজ উদ্বেলিত, শুধু মানবজাতির কেন, মনুষ্য ভাষাহীন হইলেও ভালবাসিবার ও যন্ত্রণাভোগ করিবার শক্তিবিশিষ্ট যে কোন প্রাণী আছে, তাহাদের সকলের জন্য আজ সেই হৃদয়সিন্ধু করুণায় কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে। তিনি মনে মনে বলিতে ছিলেন "জীবন ও মৃত্যু একত্রে একটী বিরাট দুঃস্বপ্ন! কিরূপে আমরা এই স্বপ্ন ভঙ্গ করিয়া জাগরিত হইব?"

এইরূপে জ্যোতিষীদের গণনানুযায়ী তিনি ত্রিতাপজ্বালা জ্ঞাত হইলেন। তখন তিনি আহার ও বিশ্রাম করিতে পারিলেন না। গভীর রজনী, পরিবারবর্গ নিদ্রিত, তিনি গাত্রোত্থান করিয়া স্বীয়কক্ষে পাদচারণ করিতে লাগিলেন এবং একটী বাতায়ন উন্মুক্ত করিয়া বাহিরের ঘোরা যামিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। সেই সময় বৃক্ষ-রাজির শীর্ষ দিয়া এক প্রবল বাত্যা বহিয়া গেল—পৃথিবী যেন কাঁপিয়া উঠিল। ইহা প্রকৃতপক্ষে এই বিশ্বের মহান আত্মা সকলের কণ্ঠস্বর—যেন উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে "কে আছ চেতন, ঘুমায়ন আর—উঠিয়া ঘুচাও ভবদুঃখভার।" কুমারের আত্মা উহা শ্রবণ করিয়া উহার যথার্থ অর্থবোধ করিলেন। তৎপরে তিনি যখন তারকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্বীয় অন্তরের মধ্যে এই জীবনস্বপ্নভঙ্গের কোন উপায় অন্বেষণ করিতেছিলেন, যাহাতে মানবগণ অদৃষ্টের অভিনয় হইতে রক্ষাপায়, তখন হঠাৎ হিন্দুজাতির অতীত জ্ঞানের কথা তাঁহার স্মরণ হইল।

তিনি বলিয়া উঠিলেন "অহো, ইহার অন্বেষণেই মানবগণ গৃহত্যাগ করিয়া থাকেন এবং ভস্মাচ্ছাদিত হইয়া অরণ্যে বাস করেন। তাঁহারা নিশ্চয়ই কিছু জানেন। উহাই ঠিক পথ। আমিও ঐ পথাবলম্বী হইব। কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের জ্ঞানের বিষয় জানাইবার জন্য কখনও ফিরিয়া আসেন না, উহা নিজেদের মধ্যে গুপ্ত রাখেন কিম্বা বিদ্বানগণের সহিত উপভোগ করেন। আমি যখন সেই রহস্য অবগত হইব তখন ফিরিয়া আসিয়া সমগ্র মানবজাতির নিকট তাহা প্রকাশ করিয়া দিব। মহতের ন্যায় হীনাদপিহীনও সমভাবে উহা অবগত হইবে—নির্ব্বাণের পথ নিখিল বিশ্বের নিকট উন্মুক্ত হইবে।"

এই কথা বলিয়া তিনি বাতায়ন রুদ্ধ করিয়া নিদ্রিত ভার্য্যার শয্যাপার্শ্বে নিঃশব্দে গমন করিলেন এবং ধীরে ধীরে যবনিকা উত্তোলন করিয়া যশোধারার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। এই সময়েই তাঁহার প্রথম সংগ্রাম আরম্ভ হইল। "ইহাকে পরিত্যাগ করিবার অধিকার আমার আছে কি? আমি হয়ত আর কখনও ফিরিব না। একটী রমণীকে বিধবা করা কি অতি গর্হিত ও নিষ্ঠুর কার্য্য নহে? আমার শিশু-পুত্রও পিতৃস্নেহে বঞ্চিত হইয়া প্রতিপালিত হইবে। জগতের জন্য আত্মবলি দেওয়া খুব ভাল কিন্তু অপরকে বলি দিবার কি অধিকার আছে?"

তিনি যবনিকা পরিত্যাগ করিয়া বাতায়নের নিকট ফিরিয়া গেলেন। তখন আবার আলোক পাইলেন—তাঁহার স্মরণ হইল যশোধারার আত্মা তাঁহার নিকট সতত কত মহৎ ও উদার বলিয়া মনে হইয়াছে, এবং তিনি উপলব্ধি করিলেন যে তিনি যাহা করিতে উদ্যত হইয়াছেন তাঁহার সহধর্ম্মিণীও তাহার অংশভাগিনী। "তাহার বিরহযাতনার জন্য এই আত্মদানের এবং গৌরব ও জ্ঞানের অর্দ্ধাংশ তাহার প্রাপ্য।" আর তিনি ইতস্ততঃ করিলেন না—পুনরায় বিদায় লইতে গেলেন। সেই রেশমী যবনিকা উত্তোলন করিয়া তিনি আর একবার অবলোকন করিলেন যশোধারাকে জাগাইতে সাহস করিলেন না এবং ধীরে ধীরে তাঁহার পদচুম্বন করিলেন।—যশোধারা নিদ্রায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন—গৌতম প্রস্থান করিলেন।

নিম্নতলে আসিয়া তিনি ছন্দককে ধাক্কা দিয়া উঠাইলেন এবং অবিলম্বে রথ প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন। তৎপরে তাঁহারা গোপনে নিঃশব্দে প্রাসাদ দ্বার অতিক্রম করিলেন, রাজপথে আসিয়া অশ্বগণ পবনবেগে ছুটিতে লাগিল। শীঘ্রই কুমার পিতৃভবন হইতে বহুদূরে আসিয়া পড়িলেন। রজনী প্রভাত হইলে তিনি রথ হইতে অবতরণ করিলেন। এক্ষণে তিনি স্বীয় অঙ্গ হইতে একে একে বসন ও মণিমাণিক্যাদি রত্নরাজি উন্মোচন করিয়া এক একজনকে তাঁহার প্রেমবাণীর সহিত এক একটী দান করিবার জন্য ছন্দকের হস্তে অর্পণ করিলেন। এবং স্বয়ং লোহিতবস্ত্র, ভস্ম, দণ্ড ও ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করিয়া ভিক্ষুকের বেশ ধারণ করিলেন। ছন্দক সাশ্রুনয়নে তাঁহার চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন। "পিতাকে বলিও আমি পুনরায় ফিরিব" এই বলিয়া গৌতম সামান্য কথায় বিদায় লইয়া অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

রাজকুমার দৃষ্টির বহির্ভূত হইবার পরও ছন্দক বহুক্ষণ তথায় দাঁড়াইয়া রহিল এবং নৃপতিকে এই সংবাদ দিবার জন্য প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে অতীব ভক্তিভরে প্রণত হইয়া কুমার যে পথোপরি দণ্ডায়মান ছিলেন তাহার ধূলি লইয়া নিজ মস্তকে ধারণ করিল।

দীর্ঘ সপ্তবর্ষব্যাপীয়া গৌতম অরণ্যে স্বীয় অভীষ্টের সন্ধান করিলেন। অবশেষে একদিবস নিশাযোগে এক বোধিদ্রুমের পাদদেশে ধ্যান নিমগ্ন হইয়া তিনি সেই মহারহস্য উদ্ঘাটন ও পরাজ্ঞানলাভ করিলেন। সেইদিন হইতে তাঁহার পূর্ব্ব নাম লোপপাইল এবং তিনি বুদ্ধ নামে পরিচিত হইলেন।

সেই শুভ মুহূর্ত্তে যখন তাঁহার অন্তর স্বর্গীয় জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত তখন তিনি উপলব্ধি করিলেন যে জীবনের তৃষ্ণাই সকল দুঃখের কারণ এবং আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বাসনা মুক্ত করিতে পারিলেই মানব মুক্তি লাভ করিতে পারে। তিনি এই মুক্তির নাম দিলেন নির্ব্বাণ এবং ইহার জন্য জীবনের উদ্যম ও প্রচেষ্টার নাম দিলেন শান্তিপথ।

আধুনিক বুদ্ধ-গয়ার গভীর অরণ্য মধ্যে এই ব্যাপার সংঘটিত হয়। তথায় আজিও একটী প্রাচীন মন্দির ও পূর্ব্বোক্ত বৃক্ষজাত

দ্বিতীয় এক বিশাল বোধিদ্রুম বিদ্যমান। বুদ্ধদেব নানা বিষয়ে গভীর চিন্তা করিবার জন্য তথায় কিছুদিন অপেক্ষা করেন এবং পরে অরণ্য ত্যাগ করিয়া কাশীধামে আসিয়া বর্ত্তমান ডিয়ার পার্কে (Dear park) পাঁচশত সন্ন্যাসীর নিকট তাঁহার প্রথম ধর্ম্মবাণী প্রচার করেন। এই সময় হইতে চতুর্দ্দিকে তাঁহার যশ ঘোষিত হইল ও দলে দলে শিষ্যবর্গ আসিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিল। কপিলবাস্তুগামী প্রথম যে বণিকদ্বয়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় তাহাদিগের দ্বারা তিনি যশোধারা ও পিতার নিকট সংবাদ পাঠান যে তিনি শীঘ্রই গৃহে ফিরিতেছেন।

তাঁহার সংবাদ পাইয়া সকলের আনন্দের সীমা রহিল না। বৃদ্ধ রাজা ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে তাঁহার পুত্র রাজকীয় সমারোহে নগরে প্রবেশ করেন। কিন্তু যখন নগরের দ্বারদেশে অসংখ্য নরনারী সমবেত, সৈন্যগণ সুসজ্জিত চতুর্দ্দিকে ধ্বজ পতাকা উড্ডীয়মান ও অশ্বগণের হ্রেষারবে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত তখন আপাদকণ্ঠ পীতবস্ত্রাবৃত ও মধ্যে মধ্যে জনতা হইতে খাদ্য সংগ্রহকারী এক ভিক্ষুক রাজশিবিরের নিকট দিয়া গমন করিলেন।—ইঁনিই তাঁহার পুত্র!—যিনি সপ্তবর্ষ পূর্ব্বে নিশাযোগে গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন এবং এক্ষণে বুদ্ধদেবরূপে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

তিনি যতক্ষণ না রাজপ্রসাদে প্রবেশ করিয়া নিজকক্ষ মধ্যে স্বীয়ভার্য্যা ও পুত্রের নিকট দণ্ডায়মান হইলেন ততক্ষণ কোথাও অপেক্ষা করিলেন না। যশোধারাও পীতবস্ত্র পরিহিতা ছিলেন! যেদিন প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া তিনি শুনিয়াছিলেন যে রাজকুমার সংসার ত্যাগ করিয়া অরণ্যবাসী হইয়াছেন, সেই প্রভাত হইতেই তিনি স্বামীর জীবনের অংশভাগিনী হইতে বিশেষ যত্নবতী ছিলেন। তিনি কেবলমাত্র ফলমূল আহার ও কক্ষ-ভূমির উপর শয়ন করিয়াছেন এবং অঙ্গ হইতে রাজকুমারীর সমস্ত সজ্জা ও অলঙ্কার পরিত্যাগ করিয়াছেন।

এক্ষণে তিনি ভক্তিভরে নতজানু হইয়া স্বামীর পরিচ্ছদের বামপ্রান্ত-ভাগ চুম্বন করিলেন। উভয়েই নির্ব্বাক। বুদ্ধদেব তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন। তখন তাঁহার চমক ভাঙ্গিল—তিনি যেন

স্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিলেন। অনন্তর দ্রুতবেগে তাঁহার পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন "যাও, তোমার পিতার নিকট তোমার উত্তরাধিকারীর প্রাপ্য মাগিয়া লও।" বালক মুণ্ডিত মস্তক ও পবিত্রবর্ণ রঞ্জিত জনতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ভীতভাবে বলিল "মা, কে আমার পিতা?" তিনি অন্য কোন পরিচয় না দিয়া বলিলেন "ঐ যে পুরুষসিংহ দ্বারদেশ অতিক্রম করিতেছেন উনিই তোমার পিতা।"

বালক বরাবর তাঁহার নিকট গমন করিয়া বলিল "পিতঃ, আমায় আমার পৈতৃক ধন দান করুন।" তিনবার প্রার্থনা করিবার পর প্রধান শিষ্য আনন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন "আমি দিতে পারি কি?" বুদ্ধদেব বলিলেন "দাও।" তখন একখানি পীতবস্ত্র বালকের কমনীয় অঙ্গে জড়াইয়া দেওয়া হইল।

অনন্তর তাঁহারা ফিরিয়া দেখিলেন পশ্চাদ্ভাগে বালকের মাতা—অবগুণ্ঠনবতী এবং নিশ্চয়ই স্বামিসঙ্গের অভিলাষিণী কোমলহৃদয় আনন্দ বলিলেন "প্রভো, কোন স্ত্রীলোক কি আমাদের এই সঙ্ঘে প্রবেশ করিতে পারে না? ইনি কি আমাদের সঙ্গিনী হইতে পারেন না?" বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন "কেন পারিবেন না? পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকেও কি সংসারের ত্রিতাপ ভোগ করে না? তাহারাও কেন শান্তির পথে চলিবে না? আমার ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ সকলের জন্য—তথাপি, আনন্দ, তোমায় এই প্রার্থনা করিতে হইল?"

তৎপরে যশোধারাও সেই পবিত্র সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত হইলেন এবং স্বামীর নিকট তাঁহার উদ্যানে বাস করিবার জন্য গমন করিলেন। এইরূপে তাঁহার দীর্ঘ বৈধব্যের পরিসমাপ্তি এবং তাঁহার চরণদ্বয় শান্তির পথে, নির্ব্বাণের পথে চালিত হইল।

পুরাণ-মাতা ঋগ্বেদ। *

(স্বামী বাসুদেবানন্দ)

আর্য্যদের আদিম নিবাস সম্বন্ধে নানা পণ্ডিত নানা মত প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ বা মধ্য এসিয়া, কেহ বা স্কান্দেনেভিয়া, কেহ বা উত্তর মেরু প্রভৃতি নানা স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত উক্ত স্থান সকলের সঠিক নির্দ্দেশ না হইতেছে ততদিন পর্য্যন্ত আর্য্য সভ্যতার আদিম ইতিহাস যাহা অদ্যাবধি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তদুক্ত সপ্তসিন্ধু † স্থানকেই আমরা আর্য্যদের প্রকৃত আদিম নিবাস বলিতে বাধ্য হইব এবং এই সভ্যতা কেন্দ্র হইতেই ব্যাসার্দ্ধের ন্যায় জগতের চতুর্দ্দিকে আর্য্য শাখার বিস্তারে, রূপান্তরিত হইয়া বিশ্ব-পুরাণের সৃষ্টি হইয়াছে। আর্য্যদের ভারতাগমন সম্বন্ধে আচার্য্য বিবেকানন্দের মত আমরা এস্থলে উল্লেখ করিতে পারি। "কোন্ বেদে, কোন্ সূক্তে, কোথায় দেখেছ যে, আর্য্যেরা কোন্ বিদেশ থেকে এদেশে এসেছে? কোথায় পাচ্ছ যে, তাঁরা বুনোদের মেরে কেটে ফেলেছেন? ‡ খামাকা

---

* ঋক্ ও অবস্থার অনুবাদগুলি শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের অনুবাদ হইতে গৃহীত হইয়াছে।

† ঋ, ১ম, ৭১ সূ, ৭ ঋ কে—সমুদ্রংনস্রবতঃ সপ্ত যহ্বীঃ—"সপ্তনদী সমুদ্র অভিমুখে প্রধাবিত হয়।" ইহারা সরস্বতী, শুতুদ্রী, বা শতদ্রু পরুষ্ণী বা ইরাবতী (যাস্ক) মরুদ্বৃধা বা দৃষদ্বতী, অসিক্নী বা চন্দ্রভাগা, বিতস্তা, আর্জ্জীকীয়া বা বিপাশা (যাস্ক) সুষোমা বা সিন্ধু (যাস্ক)। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৭৫ সূক্তের ৫ম ঋকে—গঙ্গে যমুনে সরস্বতি শুতুদ্রি স্তোমং সচত পরুষ্ণ্যা অসিক্ন্যা মরুদ্বৃধে বিতস্তয়া আর্জ্জীকিয়ে শৃণুহি আ সুষোময়া—দশটী নদীর নাম আছে। কিন্তু ঋগ্বেদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব মণ্ডলে গঙ্গা এবং যমুনার নামোল্লেখ নাই। অতএব উপর্যুক্ত (সিন্ধু বাদে) সাতটী নদীই সপ্তনদী বা প্রাচীন পারসীকদের 'হপ্তহিন্দু'।

‡ মাত্র ঋগ্বেদের দুই এক স্থলে ক্ষেত্র কাড়িয়া লইবার কথা আছে যথা,—দস্যূঞ্ছিম্যূংশ্চ পুরুহূত এবৈর্হত্বা পৃথিব্যাং শর্বানি বর্হীত্। সনৎ ক্ষেত্রং সখিভিঃ শ্বিত্ন্যেভিঃ সনৎ সূর্য্যং সনদপঃ সুবজ্রঃ॥" "তিনি অনেকের

আহাম্মকির, দরকারটা কি? আর রামায়ণ পড়া ত হয় নি, খামাকা এক বৃহৎ গল্প রামায়ণের উপর কেন বানাচ্ছ?

"রামায়ণ কি না আর্য্যদের দক্ষিণি বুনো বিজয়!! বটে—রামচন্দ্র আর্য্য রাজা সুসভ্য, লড়ছেন কার সঙ্গে?—লঙ্কার রাবণ রাজার সঙ্গে। সে রাবণ, রামায়ণ পড়ে দেখ, ছিলেন রামচন্দ্রের দেশের চেয়ে সভ্যতায় বড় বই কম নয়। লঙ্কার সভ্যতা অযোধ্যার চেয়ে বেশী ছিল কম ত নয়ই। তার পর বানরাদি দক্ষিণি লোক বিজিত হলো কোথায়? তারা হলো সব রামচন্দ্রের বন্ধু মিত্র। কোন্ গুহকের, কোন্ বালির রাজ্য রামচন্দ্র ছিনিয়ে নিলেন—তা বল না?

"হতে পারে দু এক যায়গায় আর্য্য আর বুনোদের যুদ্ধ হয়েছে, হতে পারে দু একটা ধূর্ত্ত মুনি রাক্ষসদের জঙ্গলের মধ্যে ধুনি জ্বালিয়ে বসেছিল। মটকা মেরে চোখ বুজিয়ে বসেছে কখন রাক্ষসে ঢিল ঢেলা হাড় গোড় ছোড়ে। যেমন হাড় গোড় ফেলা, অমনি নাকি কান্না ধরে রাজাদের কাছে গমন। রাজা লোহার জামা পরা লোহার অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে ঘোড়া চড়ে এলেন; বুনো হাড় পাথর ঠেঙ্গা নিয়ে কতক্ষণ লড়বে? রাজারা মেরে ধরে চলে গেল। এ হতে পারে; কিন্তু এতেও বুনোদের জঙ্গল কেড়ে নিয়েছে কোথায় পাচ্ছ?

"অতি বিশাল নদ নদী পূর্ণ, উষ্ণ প্রধান, সমতল ক্ষেত্র—আর্য্য সভ্যতার তাঁত। আর্য্য প্রধান, নানাপ্রকার সুসভ্য, অর্দ্ধ সভ্য, অসভ্য মানুষ—এ বস্ত্রের তুলো; এর টানা হচ্ছে—বর্ণাশ্রমাচার। এর পোড়েন—প্রাকৃতিক দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ নিবারণ।

দ্বারা আহূত হইয়া এবং গমনশীল (মরুৎগণের) দ্বারা যুক্ত হইয়া পৃথিবী নিবাসী দস্যু ও শিম্যুদিগকে প্রহার করিয়া হননকারী বজ্র দ্বারা বধ করিলেন; পরে আপন শ্বেত বর্ণ মিত্রদিগের সহিত ক্ষেত্র ভাগ করিয়া লইলেন; শোভনীয় বজ্র যুক্ত ইন্দ্র সূর্য্য এবং জল সমুদয় প্রাপ্ত হইলেন।" সায়ন 'দস্যু' অর্থে 'শত্রু', 'শিম্যু' অর্থে 'রাক্ষস' এবং 'শ্বেতবর্ণ মিত্র' অর্থে 'দীপ্তাঙ্গ মরুৎগণ' ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু এই শ্বেতবর্ণ মিত্রেরা আর্য্য ছাড়া আর কিছুই নহে। কিন্তু ইহা সামান্য মারপিট বা দাঙ্গা বলিয়া বোধ হয়। পাশ্চাত্যদের ন্যায় জাতিকে জাতি উজাড় করিয়া দেওয়া কোথায়ও দৃষ্ট হয় না।

"তুমি ইয়োরোপী, কোন্ দেশকে কবে ভাল করেছ, অপেক্ষাকৃত অবনত জাতিকে তোলবার তোমার শক্তি কোথায়? যেখানে দুর্ব্বল জাতি পেয়েছ, তাদের সমূলে উৎসাদন করেছ, তাদের জমিতে তোমরা বাস করছ, তারা একেবারে বিনষ্ট হয়ে গেছে। তোমাদের আমেরিকার ইতিহাস কি? তোমাদের অষ্ট্রেলিয়া নিউজিলণ্ড, পাসিফিক্ দ্বীপপুঞ্জ, তোমাদের আফ্রিকা?

"কোথা সে সকল বুনো জাত আজ? একেবারে নিপাত; বন্য পশুবৎ তাদের তোমরা মেরে ফেলেছ;—সেখানে তোমাদের শক্তি নাই, সেথা মাত্র অন্য জাত জীবিত। আর ভারতবর্ষ তা কস্মিন কালেও করেন নাই। আর্য্যেরা অতি দয়াল ছিলেন, তাঁদের অখণ্ড সমুদ্রবৎ বিশাল হৃদয়ে অমানব প্রতিভা সম্পন্ন মাথায়, ওসব আপাত রমণীয় পাশব প্রণালী কোনও কালে স্থান পায় নাই। স্বদেশী আহাম্মক! যদি আর্য্যরা বুনোদের মেরে ধরে বাস করত, তা হলে এ বর্ণাশ্রমের সৃষ্টি কি হত?

"ইয়োরোপের উদ্দেশ্য—সকলকে নাশ করে, আমরা বেঁচে থাকবো। আর্য্যদের উদ্দেশ্য—সকলকে আমাদের সমান করবো, আমাদের চেয়ে বড় করবো। ইউরোপের সভ্যতার উপায়—তলওয়ার; আর্য্যের উপায়—বর্ণবিভাগ। শিক্ষা সভ্যতার তারতম্যে, সভ্যতা শিখিবার সোপান, বর্ণবিভাগ। ইউরোপে বলবানের জয়, দুর্ব্বলের মৃত্যু; ভারতবর্ষের প্রত্যেক সামাজিক নিয়ম দুর্ব্বলকে রক্ষা করবার জন্য।" *

স্বামীজির বাক্যের শেষের তিন অংশ এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আর্য্য ইতিহাস বুঝিবার মূল তত্ত্ব বলিয়া এখানে উল্লেখ করিলাম। পরে আর একটী মত এই যে আর্য্যেরা ভারতীয় অপরাপর আদিম জাতির সংমিশ্রনে নিজেদের সুশ্রী হারাইয়াছিল। সে সম্বন্ধে স্বামীজির মতামত উদ্ধৃত করিয়া আমরা আমাদের প্রকৃত প্রস্তাবে নামিব।

"এখন আমাদের শাস্ত্রকারদের মতে, হিন্দুর ভেতর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,

* প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—পঞ্চম সংস্করণ—পৃষ্ঠা ১১২—১১৫।

বৈশ্য, এই তিন জাত, এবং চীন, হূন, দরদ, পহ্লব, যবন এবং খশ, এই সকল ভারতের বহিঃস্থিত জাতি, এরা হচ্ছেন আর্য্য। শাস্ত্রোক্ত চীন জাতি, এ বর্ত্তমান 'চীনেম্যান' নয়; ওরা কস্মিন্ কালে নিজেদের 'চীনে' বল্‌তেই না। 'চীন' বলে এক বড় জাত কাশ্মীরের উত্তর-পূর্ব্ব-ভাগে ছিল; দরদ্‌রাও যেখানে এখন ভারত আর আফগানের মধ্যে পাহাড়ি জাত সকল, ঐখানে ছিল। প্রাচীন চীন জাতির দু দশটা বংশধর এখনও আছে। দরদিস্থান এখনও বিদ্যমান। রাজতরঙ্গিনী নামক কাশ্মীরের ইতিহাসে বারম্বার দরদ্‌রাজের প্রভুত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। হূন নামক প্রাচীন জাতি অনেক দিন ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাংশে রাজত্ব করিতেছিল। এখন টিবেটিরা নিজেদের হূন বলে; কিন্তু সেটা বোধ হয়, "হিউন"। ফলে, মনুক্ত হূন আধুনিক তিব্বতীয় নয়; তবে এমন হতে পারে যে, সেই আর্য্য হূন এবং মধ্য এসিয়া হতে সমাগত কোন মোগলাই জাতির সংমিশ্রণে বর্ত্তমান তিব্বতীর উৎপত্তি। প্রজাবলস্কি এবং ড্যুক্‌ড আরলিআঁ নামক রুষ ও ফরাসী পর্য্যটকদের মতে, তিব্বতের স্থানে স্থানে এখনও আর্য্যমুখ-চোখ বিশিষ্ট জাতি দেখতে পাওয়া যায়। যবন হচ্ছে গ্রীকদের নাম; এই নামটার উপর অনেক বিবাদ হয়ে গেছে। অনেকের মতে যবন এই নামটা 'যোনিয়া' নামক স্থানবাসী গ্রীকদের উপর প্রথম ব্যবহার হয়, এজন্য মহারাজা অশোকের পালিলেখে 'যোন' নামে গ্রীক জাতি অভিহিত। পরে 'যোন' হতে সংস্কৃত যবন শব্দের উৎপত্তি। আমাদের দিশি কোনও কোনও প্রত্ন-তত্ত্ববিদের মতে যবন শব্দ গ্রীকবাচী নয়। কিন্তু এ সমস্তই ভুল। যবন শব্দই আদি-শব্দ, কারণ শুধু যে হিন্দুরাই গ্রীকদের যবন বল্‌ত, তা নয়; প্রাচীন মিসরী ও বাবিলরাও গ্রীকদের যবন নামে আখ্যাত করত। পহ্লব শব্দে, পেহলবি ভাষাবাদী প্রাচীন পারসী জাতি। খশ শব্দে এখনও অর্দ্ধ সভ্য পার্ব্বত্য দেশবাসী আর্য্য জাতি; এখনও হিমালয়ে ঐ নামে, ঐ অর্থে ব্যবহার হয়। বর্ত্তমান ইউরোপীরাও এই অর্থে খশদের বংশধর। অর্থাৎ যে সকল আর্য্য জাতিরা প্রাচীনকালে অসভ্য অবস্থায় ছিল, তারা সব খশ।

"আধুনিক পণ্ডিতদের মতে আর্য্যদের লাল্‌চে সাদা রঙ্গ, কাল বা লাল্‌চে চুল, সোজা নাক চোক্ ইত্যাদি; এবং মাথার গড়ন, চুলের রঙ্গ ভেদে একটু তফাৎ। যেখানে রঙ্গ কাল, সেখানে অন্যান্য কাল জাতের সঙ্গে মিশে এইটী দাঁড়িয়েছে। এদের মতে হিমালয়ের পশ্চিম প্রান্তস্থিত দুচার জাতি এখনও পূরো আর্য্য আছে, বাকি সমস্ত খিচ্‌ড়িজাত, নহিলে কাল কেন হল? কিন্তু ইউরোপী পণ্ডিতদের ভাবা উচিৎ যে, দক্ষিণ ভারতেও অনেক শিশুর লাল চুল জন্মায়, কিন্তু দুচার বৎসরেই চুল ফের কাল হয়ে যায় এবং হিমালয়ে অনেক লাল চুল, নীল বা কটা চোখ।" *

অতএব শক্, হূন, দরদ্, চীন পারসীক বা যবনদের সহিত আমাদের রক্তের সংমিশ্রণ হইলেও আমাদের আর্য্যত্ব একেবারে "আর্য্যামী" নয়। এক ভয় ভারতীয় আদিম বুনোদের সহিত সংমিশ্রণ। কিন্তু ভারতীয় আর্য্যেরা চাতুর্ব্বর্ণ সৃষ্টির দ্বারা নিজেদের আর্য্যত্ব এবং প্রাচীন বুনোদের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াছেন। অপর দিকে যখন ভারতীয় আর্য্যদের অপর দেশ হইতে আগমনের কোনও উল্লেখ বা নিদর্শন পাওয়া যায় না তথা অপরাপর আর্য্যশাখীয়দের পূর্ব্বদেশ হইতে আগমনের বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায় তখন আমাদের বাধ্য হইয়া মানিয়া লইতে হয় আর্য্য শিক্ষা দীক্ষার আদিকেন্দ্র ভারতবর্ষ। কৃষ্ণবর্ণ ঘৃণাপ্রযুক্তই বোধ হয় ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা আর্য্যদের আদিম নিবাস অন্যত্র স্থির করিতে এত প্রচেষ্ট।

ঋক্‌বেদের একটি ঋকে আছে, "সমর্য্যো গা অজতি যস্য বষ্টি" (১ম, ৩২সূ, ৩ঋ) অর্থাৎ স্বামিরূপ ইন্দ্র যাঁহাকে ইচ্ছা করেন তাঁহার নিকট গাভী প্রেরণ করেন।" আচার্য্য সায়ণ 'অর্য্য' অর্থে স্বামিরূপ করিয়াছেন। কিন্তু ঋ ধাতু (চাষ করা) হইতে আর্য্য বা আর্য্য শব্দের বুৎপত্তি হইয়াছে। কৃষিব্যবসায়ী পুরাতন হিন্দুগণ নিজেদের আর্য্য এবং যজ্ঞহীন অপর জাতিদের দস্যু বলিতেন। ইরাণী, গ্রীক, লাটিন, কেল্ট, টিউটন প্রভৃতি বিভিন্ন আর্য্যশাখীয়েরা নানা দেশে উপনিবেশ স্থাপনের পূর্ব্বেই এই আর্য্য নাম গ্রহণ করেন। আর অনার্য্যেরা মেষাদির প্রতিপালন করিত এবং নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়

* প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্য—পঞ্চম সংস্করণ—পৃঃ

বলেন "তাঁহারা নিজের ত্বরিতগতির গৌরব করিয়াই বোধ হয় আপনারা "তুরাণীয়" নাম ধারণ করিয়াছিলেন।" যাহাহউক• এই আর্য্য শব্দের অপভ্রংশ আমরা দেখিতে পাই, ইরান, আরমেনীয়, আলবেনীয়, ককেসসের উপত্যকায় আইরন, গ্রীসের উত্তরে আরীয়, জার্ম্মানদিগের মধ্যে আরিয়াই, এবং এরিন বা আয়রলণ্ড প্রভৃতি দেশের নাম। *

এ সম্বন্ধে আচার্য্য বিবেকানন্দের মতামত আমরা এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া বিষয়টী আরও প্রাঞ্জল করিতে ইচ্ছুক। "সমাজ সৃষ্টি হতে লাগল। দেশভেদে সমাজের সৃষ্টি। সমুদ্রের ধারে যারা বাস করতো, তারা অধিকাংশই মাছ ধরে জীবিকা করতো; যারা সমতল জমীতে, তাদের চাষবাস; যারা পার্ব্বত্যদেশে, তারা ভেড়া চরাত; যারা মরুময় দেশে, তারা ছাগল, উট চরাতে লাগল। কতকদল জঙ্গলের মধ্যে বাস করে, শীকার করে খেতে লাগলো। যারা সমতল দেশ পেলে, চাষবাস শিখলে, তারা পেটের দায়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে চিন্তা করবার অবকাশ পেলে, তারা অধিকতর সভ্য হতে লাগল। কিন্তু সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে শরীর দুর্ব্বল হতে লাগল। শিকারী বা পশুপাল বা মৎস্যজীবী, আহারের অনাটন হলেই, ডাকাত বা বোম্বেটে হয়ে সমতলবাসীদের লুটতে আরম্ভ করলে। সমতলবাসীরা আত্মরক্ষার জন্য, ঘন দলে সন্নিবিষ্ট হতে লাগলো, ছোট ছোট রাজ্যের সৃষ্টি হতে লাগলো।

"দেবতারা † ধান চাল খায়, সুসভ্য অবস্থা, গ্রাম নগর, উদ্যানে বাস, পরিধান বোনা কাপড়; আর অসুরদের ‡ পাহাড়, পর্ব্বত, মরুভূমি বা সমুদ্র তটে বাস, আহার বন্য জানোয়ার, বন্য ফলমূল, পরিধান

* Max Müller's 'Science of Language' (1882), Vol I. pp. 274 to 284.

† আর্য্যেরা দেবতাদের উপাসনা করিতেন বলিয়া দেবতা বলা হইয়াছে।

‡ অসুর অর্থে বলশালী অনার্য্যেরা। ইরাণীদের উপাস্য অসুর মেজদা নয়। কারণ তাঁহারাও আর্য্য এবং যজ্ঞাদি করিতেন। ইহা পরে আমরা দেখাইব। স্বামিজী যাহাদের বর্ণনা করিয়াছেন তাহারাই ঋগ্বেদোক্ত দস্যু। এবং "আর্য্য প্রতিবাসী তুরাণী" (রমেশ দত্ত)।

ছাল; আর বুনো জিনিষ বা ভেড়া ছাগল গরু দেবতাদের কাছ থেকে বিনিময়ে যা ধান চাল। দেবতার শরীর শ্রম সহিতে পারে না, দুর্ব্বল। অসুরের শরীর উপবাস, কৃচ্ছ্র, কষ্ট সহনে বিলক্ষণ পটু।

"অসুরের (অনার্য্যদের) আহারাভাব হইলেই, দল বেঁধে পাহাড় হতে, সমুদ্র কূল হতে, গ্রাম নগর লুটতে এলো। কখনও বা ধন ধানের লোভে দেবতাদের আক্রমণ করতে লাগলো। দেবতারা বহুজন একত্র না হতে পারলেই অসুরের হাতে মৃত্যু। আর দেবতার বুদ্ধি প্রবল হয়ে নানাপ্রকার যন্ত্র তন্ত্র নির্ম্মাণ করতে লাগলো। ব্রহ্মাস্ত্র, গরুড়াস্ত্র, বৈষ্ণবাস্ত্র, শৈবাস্ত্র সব দেবতাদের; অসুরের সাধারণ অস্ত্র, কিন্তু গায়ে বিষম বল। বারম্বার অসুর দেবতাদের হারিয়ে দেয়, কিন্তু অসুর সভ্য হতে জানে না। চাষ বাস করতে পারে না, বুদ্ধি চালাতে জানে না। বিজয়ী অসুর যদি বিজিত দেবতাদের স্বর্গে রাজ্য করতে চায় ত সে কিছু দিনের মধ্যে দেবতাদের বুদ্ধি কৌশলে দেবতাদের দাস হয়ে পড়ে থাকে।"*

এক্ষণে আর্য্য সভ্যতার আদি ধর্ম্মগ্রন্থে যে দেবতাদের উল্লেখ আছে তাহা কিভাবে রূপান্তরিত হইয়া নানাজাতীয় পুরাণের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা আমরা পাঠকবর্গের নিকট বিবৃত করিয়া দেখাইব।

(১) ঋগ্বেদের প্রথম সূক্তেই অগ্নিদেবতার উল্লেখ আছে। ইনি ইরাণী (প্রাচীন পারসিক), গ্রীক, রোমক প্রভৃতি জাতির নিকট পুরাকালে পূজা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইরাণীরা তাঁহাকে অহুরোমজদের পুত্র এবং অতর নামে উপাসনা করিতেন। কারণ ঋ, ১৩ সূক্তের ৩য় ঋকে—নরাশংসমিহ প্রিয়মস্মিন্যজ্ঞ উপহ্বয়ে—"এই যজ্ঞে প্রিয় নরাশংস নামক অগ্নিকে আহ্বান করি।" 'নরাশংস' অর্থে 'মানব প্রশংসিত' (রমেশ দত্ত)। ইরাণী ধর্ম্মপুস্তক জেন্দ্ অবস্থায় অগ্নিকে 'অতর' নাম দেওয়া হইয়াছে। পুনরায় উহাতে অগ্নিকে 'নৈর্যোসজ্ঘ' বলা হইয়াছে। উহা বৈদিক 'নরাশংস' শব্দেরই রূপান্তর মাত্র। জেন্দ্ অবস্থা, দ্বিতীয় সিরোজের একটি স্তুতিতে আছে,—

* প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—ষষ্ঠ সংস্করণ—পৃঃ ১০০।

"আমরা অহুরোমজদের পুত্র অতরকে যজ্ঞ প্রদান করি, আমরা সকল অগ্নিকে যজ্ঞ প্রদান করি, রাজাদিগের নাভিতে যিনি বাস করেন সেই নৈর্যোসজ্বকে আমরা যজ্ঞ প্রদান করি।"

পুনশ্চ ঋগ্বেদে, ১ম ম, ১২ সূ, ৬ ঋকে অগ্নিকে—কবির্গৃহপতি র্যুবা অর্থাৎ "তিনি মেধাবী, গৃহপালক যুবা" বলা হইয়াছে এবং ২২ সূ, ১০ ঋকে—অগ্ন ইহাবসে হোত্রাং যবিষ্ঠ ভারতীং। বরূত্রীং ধিষণাং বহ—"হে যুবক! হোত্রা, ভারতী, বরণীয়া ধিষণাকে আনয়ন কর" এই রূপে 'যবিষ্ঠ' শব্দে অগ্নিকে আহ্বান করা হইয়াছে। সায়ণ 'যবিষ্ঠ' শব্দের অর্থ 'যুবতম' করিয়াছেন। এক্ষণে গ্রীকদের বিশ্বকর্ম্মার নাম 'Hephaistos (Vulcan in Latin) এই 'Hephaistos' শব্দটি 'যবিষ্ঠ' শব্দের রূপান্তর।

Coxএর মতে অগ্নির সংস্কৃত 'প্রমন্থ' (কাষ্ঠ ঘর্ষণ বা মন্থনে উৎপন্ন বলিয়া) নাম—গ্রীকদিগের Prometheus (ইনি স্বর্গ হইতে অগ্নি চুরি করিয়া আনেন), 'ভরণ্যু' গ্রীকদিগের 'অগ্নিদাতা ও সদাচারনিয়ন্তা' Phoroneus, 'উল্কা' রোমকদিগের Vulcanএ রূপান্তরিত হইয়াছে।

Muirএর মতে সংস্কৃত 'অগ্নি' লাটিন Ignis, এবং স্লাভদিগের Ogniতে রূপান্তরিত হইয়াছে। +

কিন্তু Prometheus শব্দের যথার্থ উৎপত্তি আমরা বেদের অন্যত্র

'In this name Yavishtha, which is never given to any other Vedic god, we may recognize the Hellenic Hephaistos. Note. —Thus with the exception of Agni all the names of the fire and the fire god were carried away by the western Aryans; and we have Prometheus answering to Pramantha, Phoroneus to Bharanyu, and the Latin Vulcanus to the Sanskrit Ulka."—Cox's Mythology of the Aryan Nations. Vol II Chapter IV, section I.

+"Agni is the god of fire; the Ignis of the Latin, the Ogni of the Slavonians".—Muir's Sanskrit Texts, Vol. V (1884), P. 199.

দেখিতে পাই। ঋ, ১ম ম, ৬০ সূক্তে ১ম ঋকে—প্রাতিং ভরদ্ভৃগবে মাতরিশ্বা—"মাতরিশ্বা এই অগ্নিকে মিত্রের ন্যায় ভৃগুবংশীয়দিগের নিকট আনিলেন" এইরূপ আছে। যাস্কও শায়ণ 'মাতরিশ্বা' শব্দের অর্থ করিয়াছেন —"মাতরি অন্তরিক্ষে শ্বসিতি প্রাণিতি বর্ত্ততে ইতি যাবৎ ইতি মাতরিশ্বা বায়ুঃ।" Titan Iapetus এর পুত্র 'Promethus', যিনি স্বর্গ হইতে অগ্নি চুরি করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন, এই বৈদিক 'বায়ু' বা 'মাতরিশ্বা' শব্দের রূপান্তর। কিন্তু ঋ, ১ম ম, ৯৬ সূ, ৪ ঋকের 'মাতরিশ্বা' শব্দের অর্থ—"মাতরি সর্ব্বস্য জগতো নির্মাতর্য্যন্তরীক্ষে শ্বসন্ বর্ত্তমানঃ"—(সায়ণ)। এখানে অগ্নি অর্থই স্বীকৃত হইয়াছে। আবার ঋ, ৩য় ম, ২৬ সূ, ২ ঋকে 'মাতরিশ্বা' শব্দের অর্থ "অন্তরীক্ষরূপ মাতৃক্রোড়ে বিদ্যুৎরূপে গমনাগমন করেন বলিয়া অগ্নির আর একটি নাম মাতরিশ্বা"—সায়ণ। বেদার্থ-যত্নের অর্থে এই রূপকটি আরও পরিষ্কার রূপে বুঝিতে পারা যায়—"মাতরিশ্বা বিদ্যুতাগ্নি, স্বর্গলোক হইতে ভূমিতে পতিত হইয়া পার্থিব অগ্নি উৎপন্ন করে।" কিন্তু ঋ, ১ম ম, ৬০ সূ, ১ ঋকের 'মাতরিশ্বা' শব্দের 'বায়ু' অর্থ আমাদের যথার্থ বলিয়া বোধ হয়, কারণ আকাশ হইতে বিদ্যুতাগ্নিকে বায়ু-মণ্ডলের মধ্যদিয়াই আগমন করিতে হয়। * আর 'মাতরিশ্বা' শব্দের অগ্নি অর্থ গ্রহণে Prometheusএর সহিত রূপক ঠিক যোজিত হয় না।

পুনশ্চ ঋ, ১ম ম, ১২৮ সূ ২ঋকে আছে— যং মাতরিশ্বামনবে পরাবতো দেবং ভাঃ পরাবতঃ—"মাতরিশ্বা মনুর জন্য দূর হইতে অগ্নিকে আনিয়া দীপ্ত করিয়াছিলেন, (সেইরূপ) দূর হইতে (আমাদের যজ্ঞ-শালায় তিনি আইসুন)। এবং ১ম ম, ৭১ সূ, ঋকেআছে—বীলু চিদ্দৃড়্হা পিতরো ন উক্থৈরদ্রিং রুজন্নংগরসো রবেন—"আঙ্গিরা নামক

* Bothlingk ও Roth তাঁহাদিগের জগদ্বিখ্যাত অভিধানে বলেন যে মাতরিশ্বার দুইটী অর্থ বেদে দেখা যায়। প্রথম, মাতরিশ্বা একজন দেব যিনি বিবস্বানের দূতরূপে আকাশ হইতে অগ্নি আনিয়া ভৃগুবংশীয়দিগকে দেন। দ্বিতীয় মাতরিশ্বা অগ্নিরই একটি গুপ্ত নাম। তাঁহারা আরও বলেন যে মাতরিশ্বা বায়ু অর্থে বেদের কুত্রাপি ব্যবহৃত হয় নাই।"—

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

আমাদের পিতৃগণ মন্ত্র দ্বারা অগ্নির স্তুতি করিয়া বলবান ও দৃঢ়াঙ্গ পণি (নামক অসুরকে) স্তুতি শব্দ দ্বারাই বিনাশ করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতামত টিকায় উদ্ধৃত করিলাম। *

* "This and the preceding stanza are corroborative of the share borne by the Angirasas in the organisation if not in the origination, of the worship of fire"—Wilson.

"That priestly family or school (Angirasas) either introduced worship with fire or extended and organised it in the various forms in which it came alternately to be observed."—Wilson's Introduction to the RigVeda.

Muirএর মতেও মনু, অঙ্গিরা, ভৃগু, অথর্ব্বা, দধীচি প্রভৃতি বংশীয়রাই, ভারতে প্রথম অগ্নি-হোমাদির বিস্তার করেন। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও ১ম, ১২৮ সূ, ৬ ঋকের টিকায় একই মত পোষণ করিয়াছেন।

দুঃখের শিক্ষা।

"সজল চোখে জল গ্রহণ করেনি সে জন,
কাটায় নি যে দীর্ঘ নিশি উষার পথ চাহি,
ডাকতে যারে হয়নি কভু 'ত্রাহি, ত্রাহি, ত্রাহি,'
হা ভগবান! মোটে তোমায় চেনেনা সে জন।

—গেটে।

সৎকথা।

(স্বামী অদ্ভুতানন্দ)

শরীর ছাড়বার সময় যে ভগবানের নাম লয় তার বহু তপস্যার ফল। সে নিশ্চয়ই সজ্জন।

যে জিনিষের ব্যবহার জান না তার দোষ ধরা খারাপ।

যে পাঁচজনকে অন্ন দিয়া খায় সেই ত বাবু, বাবু হওয়া ভাগ্য বৈ কি।

সংসারে অর্থের জন্য দাসত্ব করে কিন্তু ভগবানের জন্য কেউ দাসত্ব করতে পারে না, অথচ কোন খরচা নেই। যে ভগবানের জন্য দাসত্ব করে সে ভাগ্যবান।

চৈতন্যদেবের হুকুম যে গরীবকে ভূলো না, গরীবকে রক্ষা করলে ভগবান খুসী হন ও কল্যাণ হবেই।

মানুষ বিয়ে করে স্ত্রী-পুত্রতে আসক্ত হয়ে যায়। ভগবান ত ছেলে-স্ত্রী ফেলে দিতে বলছেন না, তবে আসক্ত হওয়া খারাপ। আসক্ত হইলেই কষ্ট পাবে।

কার ইচ্ছে নয় যে সুখে থাকে। সুখে থাকবার জন্য কত ফন্দি, মতলব; ফন্দি করলে দুঃখ পাবে। এও এক ভগবানের মায়া, ভগবানের মায়া বুঝা কঠিন।

শ্রীকৃষ্ণ ভগবান অর্জ্জুনকে বলেছেন যদি আমার উপদেশ ঠিক ঠিক গ্রহণ কর তা হলে তুমি বেঁচে যাবে। ওতে যদি তোমার সংশয় হয় তা হলে সাধুসঙ্গ কর, তাহলে বুঝতে পারবে।

মানুষ আপন আপন কর্ম্ম নিয়ে জন্মায়। এ জগতের জিনিষ ভোগ করা ভগবানের দয়া চাই। থাকতে ভোগ হয় না আবার অদৃষ্টে থাকলে কোথা হতে ভোগ হয় বলা যায় না।

ভগবানে প্রীতি থাকলে বিষয়, মান, অপমান, লোকলজ্জা ছুড়ে ফেলে দিতে হয়। এ সব মিথ্যা মায়ার খেলা। প্রীতিই হলো প্রধান।

আপন দুঃখ যেমন বুঝ তেমন পরের দুঃখ বুঝতে হয়। গৃহস্থেরা কেবল পরের দোষ খুজে বেড়ায়।

গুরু-মুখে শাস্ত্র-মুখে শুনেছি যে আত্মা দুঃখ পায়। এমন কর্ম্ম করতে হয় যাতে আত্মা সুখে থাকে।

জীবনের উদ্দেশ্য সৎ হওয়া। সুখে-দুঃখে জীবন একরকম কেটে যাবে।

ভগবান সৎকে ভাল বাসেন। সৎ হলে পরস্পর পরস্পরে বিশ্বাস হয়। বিশ্বাসের মত দুনিয়ায় আর কি আছে সংশয় জীবনে জীব দুঃখ পায়। নিঃসংশয় জীবন সুখী।

ভগবানকে আপনার করে লও। আর কেউ আপনার হলো না।

হাজার টাকা—যদি রোজগার কর—আত্মা যদি সুখে না থাকে—দুঃখ পায়, তা হলে টাকা রোজগার বৃথা! আত্মা সুখে থাকলে ভগবান খুসী হন। আত্মা সুখে থাকলে ভগবান প্রেরণা করেন। দেবতারা দান করতে আসেন। মুক্ত আত্মাকে, পবিত্র আত্মাকে ভগবান ভাল বাসেন। ভগবান বলছেন হে জীব! যে আত্মা আত্মাকে জানে তার সঙ্গ কর। যে আমায় না জানে তার সঙ্গ করো না।

শ্রীকৃষ্ণ ভগবান বলছেন, যে আমার মায়ায় ভোলে সেই দুঃখ পাবে। আমার মায়ায় ভুলো না, আর যে আমাকে জানে সে সুখে থাকবে। শ্রীকৃষ্ণ-ভগবানের কত রকম খেলা আছে। যদি আমাকে ভগবান বলে মনে কর তা হলে বেঁচে যাবে। না হলে নানারকম সংশয়ে মানুষ দুঃখ পাবে।

Jesus Christ বলেছেন দোষী আত্মা ভগবানের কাছে যেতে পারে না, নির্দ্দোষী আত্মা পবিত্র আত্মা আমার কাছে যেতে পারে। তার কাছে ভগবান প্রকাশ হন।

কর্ম্মফলে কেউ গুরু হয় আবার কেউ শিষ্য হয়।

পরস্পর পরস্পরকে দুঃখ দিচ্ছে জানে না আবার তাকে বুড়ো হতে হবে। এ সব মায়ার খেলা।

শ্রীকৃষ্ণ-ভগবান, ভগবান রামচন্দ্র এঁদের জীবন দেখলে, সে বাপ মাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করবেই। এঁরা জীবের শিক্ষার জন্য বাপকে পূজা করেছেন। চৈতন্য মহাপ্রভু, শঙ্করাচার্য্য, বুদ্ধদেব সব অবতার তাঁদের হুকুম প্রতিপালন করেছেন। এঁরা বাপ মাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করতে জানেন। যে বলে আমি বাপকে মাকে শ্রদ্ধাভক্তি করি না, সে পশু।

যারা ভগবানের জন্য যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করেছে ভগবান তাদের প্রতি বড়ই খুসী হন। তাদের আত্মা বড়ই সুখে থাকে। কিন্তু সংসারীরা তাকে ঘৃণা করে আর ভগবান খুব আদর করেন যে আমার জন্য তুমি সব ত্যাগ করেছ।

এ সংসারে লেখা পড়া শিখে টাকা রোজগার না করতে পারলে লোকে তাকে বেকুব বলে।

অভ্যর্থনা।

(শ্রীনরেশভূষণ দত্ত)

ওগো বাজাগো শাঁক বাজা—
আজকে ওরে আমার ঘরে
আস্‌ছেরে মোর রাজা।
দে তুলে দে শতেক বাঁশি,
শতেক সুরের নিবিড় হাসি;
পথেঘাটে দে খুলে আজ
সানাই বংশী বাজা;
আস্‌ছেরে মোর রাজা॥
(ওরে) রেখে দেরে গৃহের কর্ম্ম
আস্‌ছেরে মোর রাজা।

আজকে শুধু প্রাণ খুলে তোর
　　　　ভাবের বংশী বাজা ।
জ্বেলে দে তোর শতেক বাতি,
নিবিড় গন্ধে উদাস দ্যুতি ;
ঘরখানি তোর হৃদয় পাতি,
　　　　স্বপ্ন দিয়ে সাজা ;
　　　　বাজাগো শাঁক বাজা ॥
খুলেদেরে জানলা দুয়ার
　　　　বাইরে এসে দাঁড়া ;
প্রাণের সকল তন্ত্রী রে আজ
　　　　দিয়ে উঠুক সাড়া ;
ধর্ তারে আজ উঁচু করে,
মুগ্ধ গীতির গন্ধ ভারে ;
আকাশ পাতাল বন্ধ ছিঁড়ে,
　　　　বাজারে আজ বাজা ;
　　　　আসছেরে তোর রাজা ॥
আয়রে ছুটে আয়রে আজি
　　　　সকল বন্ধ খুলে ;
সপ্ত সুরের ছন্দেরে তোর
　　　　মর্ম্মখানি তুলে ;
আলোক দোলে তালে তালে,
মরণ পাড়ি ধরছে হেলে ;
বাজা আজ তোর সকল সুরে
　　　　বাজারে শাঁক বাজা ।
আজকে আমার প্রাণের দ্বারে,
　　　　এসেছে মোর রাজা ॥

সমালোচনা ও পুস্তক পরিচয়।

স্বরাজ গীতা—শ্রীঅনন্তকুমার সেনগুপ্ত সঙ্কলিত। উপনিষদ, গীতা প্রভৃতি মহতী শাস্ত্র-বাণী তথা যুগনায়ক বিবেকানন্দ এবং ইদানীংএর গান্ধী প্রমুখ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মহাপ্রাণ সকলের মর্ম্ম কথা ইহাতে গ্রথিত আছে। আগামী পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া ইহা শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার তুল্য স্থান অধিকার করিবে। মূল্য আট আনা।

মহর্ষি দধীচি—শ্রীহরিদাস মজুমদার বি. এল, প্রণীত। এই ত্যাগের মূর্ত্ত বিগ্রহকে হিন্দু মাত্রেই অবগত আছেন। ইঁহার অস্থি নির্ম্মিত বজ্রের দ্বারা বৃত্রাসুর বধ হয়। আত্মত্যাগের দ্বারা সকল অত্যাচার-অবিচাররূপ অসুর বিধ্বস্ত হয়—নিজ দেহাস্থি দান করিয়া ইনি এই সত্য বিশ্বকে দান করিয়া গিয়াছেন। মূল্য পাঁচ আনা।

রামদাস স্বামী—শ্রীকিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। যাঁহার বিপুল তপস্যা বলে ছত্রপতি শিবাজি সামান্য জায়গীরদারের পুত্র হইয়াও আউরঙ্গজেবের ন্যায় পরাক্রান্ত ভারত-সম্রাটের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন—ইহা সেই শিবাজি-গুরু রামদাস স্বামীর সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার পাঠ্য। মূল্য ছয় আনা।

গুরু গোবিন্দসিংহ—শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। শিখেদের দশম-গুরুর সংক্ষিপ্ত জীবনী। এই গ্রন্থ তাঁহার অভূতপূর্ব্ব কর্ম্মোন্মাদনা জড়প্রায় বাঙ্গালী জীবন অনুপ্রাণীত করুক। মূল্য দশ আনা।

মহিম্ন স্তোত্র—শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী কৃত—অন্বয়, অনুবাদ ব্যাখ্যা সহ। মূল্য দুই আনা।

প্রাপ্তিস্থান—সরস্বতী পুস্তকালয়। ৯ নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

সংবাদ।

আগামী ৫ই মাঘ, ইংরাজী ১৯শে জানুয়ারী বৃহস্পতিবার কৃষ্ণাসপ্তমী (জন্ম তিথি) বলুড় মঠে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ গতপ্রাণ বিশ্ববিজয়ী যুগ-নায়ক আচার্য্য শ্রীবিবেকানন্দ স্বামীজির জন্মোৎসব হইবে। বিশেষ অঙ্গ—দরিদ্র-নারায়ণ সেবা।

কথা প্রসঙ্গে।

(১)

আজ কাল গ্রাম্য-সঙ্ঘ (Village organisation) লইয়া খুব আন্দোলন চলিতেছে এবং পল্লীর উন্নতিকল্পে নানা প্রকারের বিধান ও উপায় সাধারণের অবগতির নিমিত্ত পুস্তিকাকারে প্রচারিত হইতেছে। এই সচ্চেষ্টার সাফল্য কতদূর লাভ করা গিয়াছে সে বিষয়ে আলোচনা না করিয়া শস্য-শ্যামলা, কানন-কুন্তলা, চির উৎসব-মুখরিতা বঙ্গ পল্লীর শান্তি ও সভ্যতা নষ্ট হইয়া তাহা ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ, ব্যভিচার ও বিষাদের নরককুণ্ডে পর্য্যবেসিত হইল কি করিয়া, তাহাই আমরা এ স্থলে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে চাই।

* * *

প্রাচীন বঙ্গীয় পল্লী-সমাজ তিন অঙ্গে বিভক্ত ছিল—(১) ব্রাহ্মণাদি বিদ্বজ্জন, (২) জমিদার ও ব্যবসায়ীকুল এবং (৩) কৃষাণাদি কর্ম্মীসকল। (১) ধর্ম্ম, সাহিত্য, দর্শন-বিজ্ঞানের আলোচনা ও প্রচার ব্রাহ্মণের উপরই ন্যস্ত ছিল। নানা দেশীয় ছাত্রেরা গুরু-গৃহে বাস করিয়া, সেবা তিতিক্ষা, পারিবারিক শিক্ষা এবং ধর্ম্ম, সাহিত্য ও সঙ্গীত বিদ্যায় জ্ঞান লাভ করিতেন। পূজা, কথকতা এবং পণ্ডিত-সভার মধ্য দিয়া অতি বড় রাজা-মহারাজা হইতে কৃষক-কুলের ভিতর ধর্ম্ম, সাহিত্য, সঙ্গীত, বাদ্য, কলা প্রসার লাভ করিত। পল্লীর মস্তিষ্ক এই ব্রাহ্মণকুল প্রতিপালিত হইতেন ধনী জমিদার ও ব্যবসায়ীদের দ্বারা।

* * *

(২, ক) জমিদারেরা পল্লীর ছোট বড় সকল বিবাদ বিসম্বাদ মীমাংসা

করিতেন। তাঁহারাও অত্যাচারী অবিচারী হইলে, কঠোর সমাজ-শাসন প্রবল থাকায় এবং পরকাল সম্বন্ধে অবিশ্বাসী না হওয়ায়, ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদিগকে শীঘ্রই ধর্ম্ম ও সমাজ শাসনে বশীভূত করিতেন। জমিদারেরা পল্লীর ক্ষত্রিয়—তাঁহারা দাঙ্গা-হাঙ্গামা মিটাইতেন, ভিন্ দেশীয় দস্যুদের আক্রমণ হইতে স্বীয় সমাজান্তর্গত পল্লী সমূহের রক্ষা করিতেন। দোল-দুর্গোৎসব, উৎসব-পার্ব্বণাদি তাঁহাদিগকর্তৃক সম্পাদিত হইত। এই সকলের মধ্য দিয়া সাধারণের উপযোগী ধর্ম্ম-সাহিত্যের আলোচনা, ভিন্ন সমাজ ও পল্লীর সহিত ভাবের আদান-প্রদান ও মেলা-মেশা, শিল্প কলার প্রদর্শনী, শারীরিক বল ও অস্ত্র-বিদ্যার পরীক্ষা সম্ভব হইত। পূর্ব্ব পুরুষগণের জন্য স্বর্গকামী হইয়া ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত তাঁহারা রাস্তা, ঘাট, কূপ, পুষ্করিণী, বাগান পান্থ-নিবাস, অতিথিশালা, বিদ্যালয়, মন্দির প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতেন। এইরূপে সাধারণে তাঁহাদের কল্যাণে কল্যাণিত হইত। তাহা ছাড়া ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত তাঁহারা বৃক্ষ-রোপন, অন্নসত্র, জলসত্র প্রভৃতি নানা মহদনুষ্ঠানের দ্বারা দেশের ও দশের স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য ও অভাব দূর করিতেন।

(খ) অপর দিকে ধনাঢ্য বণিকেরা ভিন্ দেশীয় শিল্প-কলা বিজ্ঞানাদি স্বদেশে প্রবর্ত্তন করিয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিতেন। তাঁহাদিগ-কর্ত্তৃক গো-কৃষি শিল্পাদি রক্ষিত হইয়া বহু লোক প্রতিপালিত হইত এবং তাহা ছাড়াও ইষ্ট-পূর্ত্তাদি ধর্ম্ম-কর্ম্মে মতিগতি থাকায় পরলোকের সম্পদ লাভ ও নিজ সমাজের স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি ও অভাবের পূর করিতেন।

* * *

(৩) ধনীর বিলাসিতায় এবং সাধারণের নিত্য-নৈমিত্তিক অভাবে শিল্পী, কৃষক ও শ্রমজীবিকুল পরিপুষ্টিলাভ করিত। ছুতার, কামার কুমার, স্বর্ণকার, শাঁখারী, তাঁতি, পটো, মিস্ত্রি, ধোপা, নাপিত, জেলে, মুচী, বাদ্যকর, মালী, বারুই, চাষী, শিউলি, ডোম, মজুর প্রভৃতি সকল কর্ম্মীই স্ব স্ব কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া অভাব ও অশান্তি হইতে মুক্ত

থাকিত। শান্তি ও দস্যু হইতে স্বীয় গ্রাম ও সম্পদ রক্ষার নিমিত্ত ধনিকুল আর এক শ্রেণীর লোক প্রতিপালন করিতেন, তাহারা—বরকন্দাজ, তীরন্দাজ, দ্বারবান, পাইক, লাঠিয়াল প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু দৈহিকবল এবং অস্ত্র-বিদ্যা যে কেবল ইহাদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল তাহা নহে—উচ্চবংশীয়দের মধ্যে ঐ সকলের যথেষ্ট অনুশীলন ছিল।

* * *

কিন্তু যখন উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞান ধীরে ধীরে ভারতে প্রসার লাভ করিয়া নগর-সভ্যতার প্রতিষ্ঠা করিল, তাহার ক্ষণিক বিদ্যুতালোকে গ্রামের ধনাঢ্য ও ব্যবসায়িকুলের চক্ষু ঝলসিত হওয়ায় পল্লী-সভ্যতার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল। কলকারখানা প্রস্তুত বিলাস ও নিত্য-ব্যবহার্য্য জিনিষ সস্তায় পাইয়া ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি হীন অস্মদ্দেশীয় ধনী এবং মধ্যবিত্ত সকলেই তাহাতে মুগ্ধচিত্ততার ফলে গ্রাম্য শিল্প একেবারে মুছিয়া যাওয়ায় পল্লীর কর্ম্মীরা নিরুপায় হইয়া স্ব স্ব গ্রাম চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিয়া সহরের মসিজীবী দলভুক্ত কিম্বা কলকারখানা পরিত্যক্ত সাধারণ উন্নতি হীন কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া কালাতিপাত করিতে লাগিল। ধনীরা বিলাস-কেন্দ্র সহরে বাস-স্থাপন করিলেন, বণিকেরা বিদেশীয় ব্যবসায়ীদের সহিত সহযোগীতা করায় তাঁহাদেরও পক্ষে সহর বাস অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিল। কর্ম্মহীন-হস্ত শ্রমজীবিকুল সহরের কলকারখানার চতুঃপার্শ্বে আড্ডা লইয়া কিম্বা কুলী ডিপোর আড়কাটির নিকট নাম লিখাইয়া চিরদিনের জন্য জন্মভূমি ত্যাগ করিল। পাশ্চাত্য বিদ্যার প্রচলনের সহিত ধনী ও মধ্যবিত্তের সন্তানেরা বুঝিয়া বসিল যে তাহাদের বাপ-পিতামহ ও ঋষি-মুনিরা মুর্খ ও ভণ্ড। আমাদের সমাজে যথার্থ ধর্ম্মের সহিত কুসংস্কারও যথেষ্ট বিজড়িত ছিল। জড়-বিজ্ঞানের তীব্র আলোকে সে সকল অন্ধ বিশ্বাস সাধারণের চক্ষু হইতে বিদূরিত হইতে লাগিল। তথা বিজ্ঞানের লোক-চমৎকার ক্রীড়াকৌশল সন্দর্শনে সমাজের সকল স্তরের লোকই প্রাচীন ধর্ম্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য এবং কলা

সম্বন্ধে সন্নিহান হওয়ায় পল্লীস্থ ব্রাহ্মণকুল উৎসন্ন প্রায় হইয়া উঠি-।। তাঁহারাও ধীরে গ্রাম ত্যাগ পূর্ব্বক নগরের পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষায় নিজেদের গঠিত করিয়া সহরের কেরাণী বা দালাল সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িলেন। পল্লী-শ্মশানে রহিল মাত্র শিবরাত্রের সলিতার মত চাষীর দল—বিদেশীর নিকট পেট চালাইবার মত স্বল্প মূল্যে, কঠিন পরিশ্রমে মাটি খুঁড়িয়া কাঁচামাল যোগাইবার জন্য।—আর রহিল অলস-প্রকৃতি অহিফেনসেবী জন কয়েক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক, যাহারা ধূমপান করিতে করিতে উদয়াস্ত পরনিন্দা পরচর্চ্চায় কালাতিপাত করিতে পারে।

* * *

মূর্খ, পশুপ্রায় কষ্ট-সহিষ্ণু, নৈতিক ও ধর্ম্মাদর্শ হীন, পাশ্চাত্য বিলাস-বিষে জর্জ্জরিত, নগরস্থ জমিদার ও মহাজন কর্ত্তৃক কর-দন্তে অস্থি-মজ্জা চর্ব্বিত কৃষককুল কি করিয়া পল্লী স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য ও অভাব রক্ষা করিবে! মূর্খ সরল চাষী সহরে পাট বিক্রয় করিতে গিয়া দেখিল বাবুরা কেমন সুন্দর সুন্দর রঙ্‌ বে-রঙের কাপড় পরে, গন্ধ, সাবান, রুমাল ব্যবহার করে, মাদক দ্রব্যের ব্যবহার করিয়া চুরুট টানিতে টানিতে থিয়েটার, নাচ, গান শুনিয়া ফূর্ত্তি করে—সেই বা কি করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। সেও মাল বিক্রয় করিয়া কাঁচা টাকার কিছু নিজ পরিবার প্রতিপালনে, কিছু ইলিস মাছ, বারবণিতা ও মাদক দ্রব্যে নষ্ট করে এবং বাঁকি টাকা—কাঁচা-মাল কিনিয়া বিদেশী যে টাকা তাহাকে দিয়াছিল, বিলাস-বসন-ভূষণ তাহার নিকট বিক্রয় করিয়া সুদে আসলে সেই টাকা আদায় করিয়া লইয়া যায়—ফলে তাহাকে চিরকালই জমিদার ও মহাজনের কষাঘাত সহ্য করিতে হয়। এক্ষণে খড়ের চাল, তালপাতার ছাতা, তামাক, গামছা, লাটি খড়ম প্রভৃতির স্থলে তাহারা বিলাতী টিনের ছাত, রেলীর ছাতি, হোলি-হাওয়াগাড়ী সিগারেট, তোয়ালে, ছড়ি, জুতা গ্রহণ করিতে শিখিয়াছে এবং গ্রামের কথকতা, যাত্রা, পূজা পার্ব্বন ধীরে ধীরে অন্তর্ধান হইতে থাকায় এই কৃষককুল ধর্ম্ম-হীন অর্দ্ধ পশু প্রায় জীবন যাপন করিতেছে। পল্লী স্বাস্থ্যের তত্ত্বাবধানের

এভাবে খাল, বিল, নালা, পুকুর মজিয়া যাওয়ায় ও অত্যন্ত জঙ্গল বৃদ্ধি হওয়ায় ধীরে ধীরে ম্যালেরিয়া ও বিসূচিকা রঙ্গস্থলে অবতীর্ণ হইয়া, যাহারা সহরে বাস করিয়াও গ্রাম্য ভিটা রক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহাদিগকেও গ্রাম ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছে। এইরূপে প্রাসাদ মন্দির সকল শৃগাল-ব্যাঘ্রাদির বাস-স্থানে পরিণত।

*   *   *

পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রারম্ভে, সহরে সমাজ শাসন না থাকায়—অবাধে ব্যভিচার বাহাদুরীর কার্য্য হইয়া দাঁড়াইল। মদ্যপান, গোমাংস ভক্ষণ এক্ষণে গঙ্গাজল মহাপ্রসাদের ন্যায় পবিত্র জ্ঞানে আভিজাত্যকুল-সমাজ সংযম দূর করিয়া দিলেন এবং যুক্তি দেখাইলেন—এই সকল রাজ-খাদ্য এবং ইহারই বলে রাজা এত বড়। নৈতিক অবনতিও যথেষ্ট ঘটিল ; কারণ সহরে কে কাহাকে চিনে, কে কাহার খবর রাখে, কে কোন্ সমাজ মানিয়া চলিবে, কোন সমাজ কাহাকেই বা জাতিচ্যুত করা প্রভৃতি অসহযোগীতা (Non co-operation) প্রভৃতি দণ্ডের দ্বারা সংশোধিত করিবে? উকীল, ব্যারিষ্টার, মহাজন, দালালেরা নিশ্মম ভাবে ধন সঞ্চয় করিয়া বিপুল প্রাসাদ, উদ্যান, রাস্তা ঘাটে সহরকে সুসজ্জিত করিতে লাগিলেন,—পক্ষান্তরে স্বদেশপল্লী ম্যালেরিয়া, কলেরা, বন-জঙ্গলে যে উৎসন্ন যাইতেছে, তাহার দিকে কিঞ্চিন্মাত্রও দৃক্‌পাত না করায়, তথা পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা ধর্ম্মভিত্তি শিথিল করিয়া দেওয়ায়, ভদ্রাসন বাটি ভগ্নস্তূপে, মন্দিরাদি পশু-পক্ষীর বাসস্থলে পরিণত হইল এবং দেব বিগ্রহাদি গঙ্গাজল, তুলসী, বিল্বপত্র হইতে পর্য্যন্ত বঞ্চিত হইলেন।

*   *   *

ত্যাগের উপরই সকল মহৎ কার্য্য প্রতিষ্ঠিত। দুই এক শত বর্ষ সহর-সভ্যতার ক্ষণিক সুখ ভোগ করিতে গিয়া যে পাপ অর্জ্জন করা হইয়াছে তাহার প্রতিফল ভোগ আরম্ভও হইয়াছে এবং এই দুর্ব্বিসহ কর্ম্মফল হইতে পরিত্রাণের একমাত্র উপায়, ত্যাগ।—বিলাস ত্যাগ, কুব্যবহার ত্যাগ, দুর্ব্বল নিষ্পেষিত অর্থলিপ্সা ত্যাগ। সহর নূতন ভাবে গঠিত হইতেছে, স্থানের সঙ্কুলান হইতেছে না, ইউরোপীয় যুদ্ধের পর বিলাস

দ্রব্যের অভাব ঘটিয়াছে, কিন্তু বিলাস আমাদের স্বভাবে পরিণত হওয়ায় তাহা ত্যাগ করা অসম্ভব। নিত্যনৈমিত্তিক ব্যবহার্য্য ও খাদ্য দ্রব্যের অত্যন্ত দৌর্ম্মূল্য, সাধারণের দারিদ্র্যে ব্যবসায়ের মন্দা, এতদিনের ঘৃণ্য নিম্ন সম্প্রদায় স্বরূপ জ্ঞাত হইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠার নিমিত্ত বাবুয়ানির অন্য উপকরণ পাচক, চাকর, ঝি, মুটিয়া, গাড়োয়ান প্রভৃতি এখন নিজের যথার্থ পাওনা জ্ঞাত হওয়ায় সকল উচ্চ বংশীয়দের বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত কুলের—সহরবাস সর্ব্বনাশে পরিণত হইতে চলিয়াছে; পক্ষান্তরে স্বীয় পল্লীতে বসবাসের উপায়ও হৃত, কারণ, পিতৃ-পিতামহ নিসেবিত ভদ্রাসন বাটী যে এক্ষণে বাঘ ভাল্লুকের আবাস স্থল।

—তবে উপায়?

* * *

উপায় ধনীর আত্মত্যাগে। তিনি যদি সহরের মোহ কাটাইয়া, জামতাড়া, মধুপুরে গৃহ নির্ম্মাণ না করিয়া, পল্লীস্থ নিজ ভদ্রাসন বাটী, মন্দির, বাগানের পুনঃ সংস্কার করেন। পল্লী সংস্কার করিতে গেলে বিপুল অর্থের প্রয়োজন, সে অর্থ দরিদ্র-সাধারণ সমাজ-সেবীদের কোথায়? পল্লীর অস্বাস্থ্য অজ্ঞতা দূর করিবার প্রচেষ্টায়, পাহাড়ে মুষ্ঠাঘাতের ন্যায়, এক পক্ষ মাত্রেই ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন; পক্ষান্তরে ধনীর অর্থ ও সমাজসেবীদের পরিশ্রম সমবায়ে বঙ্গপল্লী এক নূতন সভ্যতার জনয়িত্রী হইতে পারে। ম্যালেরিয়া, কলেরার কারণ অযত্ন-উপেক্ষা। মনে করুন একগ্রামে পাঁচজন ধনী ব্যক্তি বাস করেন। তাঁহারা সহস্র সহস্র অর্থ ব্যয়ে সহরে এবং স্বাস্থ্যকর স্থানে যে সকল প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন সেই অর্থ ব্যয়েই স্বদেশ বঙ্গপল্লীর স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্য 'স্বর্গাদপি গরিয়সী' করিতে পারেন।

* * *

অন্তরশক্তিদ্বারাই আমাদের জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইবে। বাহির হইতে সাহায্য দুরাশা মাত্র। বাহির হইতে ভাল অপেক্ষা মন্দই বেশী আসিয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও অনুশীলন আমরা অতি অল্পই আয়ত্ব করিয়াছি—পরন্ত এদেশে জাঁকিয়া বসিয়াছে পাশ্চাত্য অপচার,

ব্যভিচার এবং বিলাস। ইউরোপ ও আমেরিকায় তথাকথিত বহু শিক্ষিত ব্যক্তির সহিত আলাপে বুঝা যায়, যে ভারতে আগমন করিবার পূর্ব্বে তাঁহারা এদেশকে মহাবর্ব্বর জ্ঞানে ঘৃণা করিতেন বা দুঃখিত হইতেন। এ বিষয়ে আচার্য্য বিবেকানন্দ স্বামীর পাশ্চাত্য-বাসীদের ভারতপল্লী অভিজ্ঞতা কিরূপ, যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্বোধন পাঠকদের নিকট উদ্ধৃত করিব।

"আমি কোন ধর্ম্মের বিরোধী, এ কথা সত্য নহে। আমি ভারতীয় খ্রীশ্চিয়ান মিশনরীদের বিরোধী, এ কথাও তদ্রূপ সত্য নহে। তবে আমি আমেরিকায় তাঁহাদের টাকা তুলিবার কতকগুলি উপায়ের প্রতিবাদ করি।

"বালকবালিকার পাঠ্য পুস্তকে অঙ্কিত ঐ চিত্রগুলির অর্থ কি? চিত্রে অঙ্কিত যে হিন্দুমাতা তাহার সন্তানগণকে গঙ্গায় কুম্ভীরের মুখে নিক্ষেপ করিতেছে। জননী কৃষ্ণকায়া, কিন্তু শিশু শ্বেতাঙ্গরূপে অঙ্কিত; ইহার উদ্দেশ্য শিশুগণের প্রতি অধিক সহানুভূতি আকর্ষণ ও অধিক চাঁদাসংগ্রহ। ঐ ছবিগুলির অর্থ কি, যাহাতে একজন পুরুষ তাহার স্ত্রীকে নিজ হস্তে একটী কাষ্ঠস্তম্ভে বাঁধিয়া পুড়াইতেছে; উদ্দেশ্য—সে ভূত হইয়া তাহার স্বামীর শত্রুগণকে পীড়ন করিবে।"

"বড় বড় রথ রাশি রাশি মনুষ্যকে চাপিয়া মারিয়া ফেলিতেছে—এ সকল ছবির অর্থ কি? সেদিন এখানে (আমেরিকায়) ছেলেদের জন্য একখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। তাহাতে একজন পাদরি ভদ্রলোক তাঁহার কলিকাতা দর্শনের বিবরণ বর্ণন করিয়াছেন। তিনি বলেন, তিনি কলিকাতার রাস্তায় একখানি রথ কতকগুলি ধর্ম্মোন্মত্ত ব্যক্তির উপর দিয়া চলিয়া যাইতে দেখিয়াছেন।

"মেমফিস নগরে আমি একজন পাদরী ভদ্রলোককে প্রচারকালে বলিতে শুনিয়াছি, ভারতের প্রত্যেক পল্লীগ্রামে ক্ষুদ্র শিশুদের কঙ্কালপূর্ণ একটী করিয়া পুষ্করিণী আছে।

"হিন্দুরা খ্রীষ্ট-শিষ্যগণের কি করিয়াছেন যে, প্রত্যেক খ্রীশ্চিয়ান বালকবালিকাকেই হিন্দুদিগকে দুষ্ট, হতভাগা ও পৃথিবীর মধ্যে ভয়ানক দানব বলিয়া ডাকিতে শিক্ষা দেওয়া হয়?

"বালকবালিকাদের রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষার এক অংশই এই ;—খ্রীশ্চিয়ান ব্যতীত অপর সকলকে, বিশেষতঃ হিন্দুকে ঘৃণা করিতে শিক্ষা দেওয়া, যাহাতে তাহারা শৈশবকাল হইতেই মিশনে তাহাদের পয়সা চাঁদা দিতে শিখে।

"সত্যের খাতিরে না হইলেও অন্ততঃ তাঁহাদের সন্তানগণের নীতির খাতিরেও খ্রীশ্চিয়ান মিশনরীগণের আর এরূপ ভাবের প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। এরূপ বালকবালিকাগণ যে বড় হইয়া অতি নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুর নরনারীতে পরিণত হয়, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? কোন প্রচারক যতই অনন্ত নরকের যন্ত্রণা এবং তথাকার জ্বলমান অগ্নি ও গন্ধকের বর্ণনা করিতে পারেন, গোঁড়াদিগের মধ্যে তাঁহার ততই অধিক প্রতিপত্তি হয়। আমার কোন বন্ধুর একটী অল্প বয়স্কা দাসীকে 'পুনরুত্থান' সম্প্রদায়ের ধর্ম্মপ্রচার শ্রবণের ফলস্বরূপ, বাতুলালয়ে পাঠাইতে হইয়াছিল। তাহার পক্ষে জ্বলন্ত গন্ধক ও নরকাগ্নির মাত্রাটী কিছু অধিক হইয়াছিল।

"আবার মান্দ্রাজ হইতে প্রকাশিত, হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে লিখিত গ্রন্থগুলি দেখ। যদি কোনও হিন্দু খ্রীষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধে এরূপ এক পংক্তি লেখেন, তাহা হইলে মিশনরীগণ স্বর্গমর্ত্ত্য তোলপাড় করিয়া ফেলেন।

"স্বদেশবাসিগণ, আমি এই দেশে এক বৎসরের অধিক হইল রহিয়াছি। আমি ইঁহাদের সমাজের প্রায় সকল অংশই দেখিয়াছি। এখন উভয় দেশের তুলনা করিয়া তোমাদিগকে বলিতেছি যে, মিশনরীরা জগতে আমাদিগকে যে দৈত্য বলিয়া পরিচয় দেন; আমরা তাহা নহি, আর তাঁহারাও আপনাদিগকে দেবতা বলিয়া ঘোষণা করিলেও প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা দেবতা নহেন। মিশনরীগণ হিন্দু বিবাহ প্রণালীর দুর্নীতি, শিশুহত্যা ও অন্যান্য দোষের কথা যত কম বলেন, ততই ভাল। এমন অনেক দেশ থাকিতে পারে, যথাকার বাস্তবিক চিত্রের সমক্ষে মিশনরীগণের অঙ্কিত হিন্দু সমাজের সমুদয় কাল্পনিক চিত্র নিষ্প্রভ হইয়া যাইবে। কিন্তু বেতনভুক্ নিন্দুক হওয়া আমার জীবনের

লক্ষ্য নহে। হিন্দু সমাজ সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, এ দাবী, আর কেহ করে করুক, আমি ত কখন করিব না। এই সমাজের যে সকল ত্রুটি অথবা শত শত শতাব্দীব্যাপী দুর্ব্বিপাক বশে ইহাতে যে সকল দোষ জন্মিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে আর কেহই আমা অপেক্ষা অধিক জ্ঞাত নহে। বৈদেশিক বন্ধুগণ, যদি তোমরা যথার্থ সহানুভূতির সঙ্গে সাহায্য করিতে আইস, বিনাশ তোমাদের যদি উদ্দেশ্য না হয়, তবে তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হউক, ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা।

---

(২)

(শ্রীসুব্রহ্মণ্য।)

আধুনিক অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের এই ভারতবর্ষ শিক্ষা-বিস্তারে বড়ই পিছাইয়া পড়িয়াছে—ইহা আজ সকলেই বেশ বুঝিতেছেন। পৃথিবীর অপরাপর জাতিদিগের শিক্ষিতের সংখ্যার সহিত আমাদিগের অবস্থা তুলনা করিয়া স্বতঃই বলিতে ইচ্ছা হয়—

"দিন আগত ঐ, ভারত তবু কৈ? সে কি রহিবে শুধু সবজন—পশ্চাতে?"

তাই আজ দেশের হিতকামী সকলেই বেশ বুঝিতেছেন ভারতবর্ষের উন্নতির পথ সুগম ও সুচারু করিতে হইলে শিক্ষাক্ষেত্রে সবিশেষ মনোযোগ দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। ভারতবর্ষের অতীত ইতিবৃত্তের পৃষ্ঠা উল্টাইলে দেখিবেন, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে আমাদিগের জন্মভূমি যে যে কারণে মহীয়ান ও সর্ব্বাংশে উন্নত হইয়াছিল তাহার সর্ব্বপ্রধান কারণ তত্তৎকালে শিক্ষা জনসমাজে বিশেষ বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল বলিয়া। সেই জন্যই পুনর্ব্বার আধুনিক জাতীয়জীবনের নবজাগরণের দিনে শিক্ষার কথা সবিশেষ আলোচিত হইতেছে দেখিয়া, বড় আশা হইতেছে আমাদিগের ভবিষ্যৎ বুঝি আরও ভাস্বরোজ্জ্বল হইবে! তাই হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে আজ প্রশ্ন উঠিতেছে—প্রকৃত শিক্ষা কাহাকে বলিব?

*   *   *

বর্ত্তমান যুগের পাশ্চাত্য-প্রবর্ত্তিত শিক্ষা-পদ্ধতি যে আমাদিগের কিছু-

মাত্র উপকার করে নাই, একথা আমরা বলিতে চাহি না। তবে ইহার মধ্যে যে অনেক গলদ্ আছে সে বিষয় আজ সকলেই, মুখে যত তর্কবিতর্ক করুন্ না কেন,—প্রাণে প্রাণে স্বীকার করিবেন। উক্ত পদ্ধতির বিরুদ্ধে এই যে দেশব্যাপী আন্দোলন—ও এক প্রকার বিপ্লব চলিতেছে সেই সকল অভিযোগের সত্যকার মূলসূত্র এই যে, ইহা আমাদিগের জীবনের সহিত ঠিক খাপ খাইতেছে না। আসল শিক্ষা তাহাকে বলিব যাহা আমার জীবন আমার জাতির বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া নিয়ন্ত্রিত ও উন্নত করিতে পারিবে। সেই জন্যই বোধ হয় সেবার বাঙ্গালার লাট বাহাদুরের সরল-সত্য উক্তি শুনিয়া ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত শিক্ষিত যুবক-সম্প্রদায় স্তম্ভিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করিতেছিল—"A system of education that tries to make out of an Indian student an *imitation European* is fundamentally false !" এরূপ জোরের কথার অনুবাদ নিষ্প্রয়োজন।

* * *

তাই সেদিন একজন বাঙ্গালী মনের খেদে বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, আমাদের ছেলেরা, বিবাহের কুহকে ভুলাইয়া ইংলণ্ডের রাজ্ঞী এলিজাবেথ কোন্ কোন্ ব্যক্তির দ্বারা স্বার্থসাধন করাইয়া লইয়াছিলেন, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ কণ্ঠস্থ করিয়া থাকে, কিন্তু ভারতবর্ষের রাণী অহল্যাবাইয়ের সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ। ইঁহার কথা বর্ণে বর্ণে সত্য না হইলেও অনেক পরিমাণে সত্য।

তাই পুনঃ প্রশ্ন—শিক্ষিত কাহাকে বল ?

* * *

দীর্ঘ দশবৎসর পর আবার রাজকীয় আদমসুমারী বর্ত্তমান ভারতের দ্বারে উপস্থিত। এবার শিক্ষিতের সংখ্যা দেখিতেছি, পুরুষ—শতকরা দশ, রমণী—শতকরা দুই ! এই গণনা সম্বন্ধে আজ একটী কথা স্বতঃই মনে উঠিতেছে। ভারত-ভারতী উভয়েরই নিকট আমাদিগের সবিনয় নিবেদন—তাঁহারাও আমাদের সহিত বিষয়টী একটু স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে ভাল হয়। এই প্রকার আদমসুমারী অনেক পরিশ্রমের ফল, প্রভূত

উদ্যমের পরিচায়ক এবং একান্ত কার্য্যকরী—আমাদিগের ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহাও বলিয়া রাখি—স্ত্রী-পুরুষ উভয়শ্রেণীর শিক্ষিতের সংখ্যা আরও বাড়াইবার সকল প্রচেষ্টা, সকল অনুষ্ঠান আমাদের সবাকার প্রশংসার্হ।

* * *

তবে, এই যে গণনা—ইহার মূলসূত্রটী কোথায়? সাধারণভাবে বলা যাইতে পারে যাঁহাদের আনুষঙ্গিক জ্ঞানসহ ভাষাবিশেষ (এস্থলে অবশ্য বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বাঙ্‌লা—তা প্রায়শঃ স্বীয় নামমাত্র স্বাক্ষর করিতে পারিলেই যথেষ্ট—এবং বাকি অল্প সংখ্যকের পক্ষে ইংরাজী।) আয়ত্ত আছে তাঁহাদেরই আমাদের সবাকার কাঙ্ক্ষিত 'শিক্ষিত'মণ্ডলীমধ্যে আসন হইয়াছে। অবশ্য, বাহির হইতে গণনা করিতে গেলে ইহা ছাড়া আর উপায় কি?

* * *

কিন্তু শিক্ষার আসল কথাটী কি? আদর্শের পূর্ণ—মনোরম আলেখ্য সম্মুখে রাখিয়া আপনাপন জীবনপট প্রস্তুত করিতে হইবে। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য মানুষের ভিতরে যে দেবত্ব সুপ্তভাবে রহিয়াছে—সান্তের নিগড়ে নিবদ্ধ সেই অনন্তকে জাগ্রত করিয়া তাহাকে মহীয়ান করিয়া তোলা। অবশ্য, একথা সম্পূর্ণ স্বীকার্য্য যে ভাষাবিশেষ-শিক্ষা ঐ উচ্চাদর্শে পৌঁছিবার পথ—উপায়। উহার কাজ ঐ মাত্র।

* * *

শিক্ষা শরীর-মন উভয়েরই উৎকর্ষসাধনে আমাদিগকে সচেষ্ট ও তৎপর করুক্। প্রাচীন আচার্য্যগণ আমাদিগকে তাঁহাদের উপলব্ধির ওজস্বী ভাষায় বুঝাইয়াছেন—মনুষ্যত্বের যে পূর্ণ আদর্শ স্বভাবে পাইয়াছি, শিক্ষা তাহাকে বাস্তব করিবে—স্বভাবে যাহা কেবল সুন্দর, শিক্ষায় তাহা সত্য ও শিব হইয়া উঠিবে—স্বভাবে যাহা কেবল আকাঙ্ক্ষা, শিক্ষায় তাহা পরিপুষ্ট জীবন-নীতি—স্বভাবে যাহা প্রেরণা, শিক্ষায় তাহা সার্থকতা, স্বভাবে যাহা অল্প, শিক্ষায় তাহা বৃহৎ ও ভূমা। ইহাই শিক্ষার ভাবগত প্রকৃত তাৎপর্য্য।

তাই দেখিতেছি, আমাদের অনেকের ঘরে এখনও প্রাচীনা হিন্দুরমণী রহিয়াছেন—যাঁহাদের ভগবদনুরাগময় চরিত্র, যাঁহাদের সুমিষ্ট ব্যবহার, যাঁহাদের আত্মসংযম, যাঁহাদের কর্ত্তব্যে একপ্রাণতা, যাঁহাদের প্রবল সহিষ্ণুতা, যাঁহাদের পরহিতে আত্মোৎসর্গ-সাধনা, যাঁহাদের প্রগাঢ় পুরাণ-কাব্যজ্ঞান (তাহা গুরুমুখী হইলেও), আজি ভারতের নানারূপ ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের, অগণন লাঞ্ছনা-ব্যর্থতা-অপমানের ভিতরও আমাদের ন্যায় মূঢ়জনকে বারবার স্মরণ করাইয়া দিতেছে—'হে ভারত! ভুলিও না তোমার নারীজাতীর আদর্শ—সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তী!'

* * *

কিন্তু হায়! ইঁহাদের যে ভাষা-জ্ঞান নাই! তাই তথাকথিত অনেক শিক্ষিতের মুখে ইঁহাদের নিন্দা, গালিগালাজ শুনিতে হয়—ভাষাজ্ঞরা কোনরূপ কুণ্ঠাবোধ না করিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন যে—প্রাচীনারা আমাদের সব উন্নতির শত্রু, কারণ তাঁহারা নাকি, কুসংস্কারাচ্ছন্না—যেহেতু 'অশিক্ষিতা'!

* * *

দোষ কাহাকে দিব?

তবে, আমরা বলি, ভুলিও না ভাই, মানুষ-করা শিক্ষা ইঁহাদের মধ্যে বিদ্যমান। বাহির ভুলিয়া একবার ভিতরে চাও। আদমসুমারীতে নাই বা স্থান হইল? মনে হয়, হিন্দুর ঘরে দীপাধারের শেষ-শিখার ন্যায় আমাদের প্রাচীন গৌরব-প্রদীপের এই সকল শেষ-রশ্মি ক্ষীণ—ম্লান হইয়া আসিলেও ইঁহারাই আমার জাতির পরমশ্লাঘা। ইঁহাদিগের সন্তানসন্ততি বলিয়া পরিচয় দিতে বুক গর্ব্বে, আত্মশ্লাঘায় ভরিয়া উঠে। বাঁচিতে হইলে ইঁহাদের যোগ্য আধুনিক রমণী চাই। অবশ্য বলা বাহুল্য, ভাষা-সাহিত্য ইত্যাদি শিক্ষার প্রতি আমাদের কোন আপত্তি নাই। তবে শিক্ষিত-অশিক্ষিতের সংখ্যা নির্ণয়কালে মনুষ্যত্বশিক্ষায়-শিক্ষিত যাঁহাদিগের পূতচরিত্র আলোচিত হইল—আদমসুমারীর মুদ্রিত পৃষ্ঠে যাঁহাদের খবর মিলে না, তাঁহাদের কথা বিস্মৃত হওয়া কি বাঞ্ছনীয়?

স্ত্রীশিক্ষিতের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প বলিয়াই ইঁহাদের কথা বিশেষ করিয়া কহিলাম। অলমিতি।

চিন্তার অভিব্যক্তি।

(শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী)

মানুষের সেই অবস্থাটাই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বিসহ ও দুস্থ হইয়া দাঁড়ায় যখন আর তার কোন কিছুই চিন্তা বলিতে অবলম্বন থাকে না, যখন সে আর কোনরূপেই চিন্তা ও কর্ম্মের জীবন্ত আহ্বান শুনিতে বা বুঝিতে পারে না। এই চিন্তা ও কর্ম্মের সহিত মানুষ অন্তরে বাহিরে এমনি ওতপ্রোত বিজড়িত যে ইহার সহিত যখনি তার সম্বন্ধ-বিচ্যুতি ঘটে, মানবত্বের দিক হইতে তখনি তার সমস্ত আখ্যা নিঃশেষ হইয়া যায়; যেটা থাকে সেটা তার বিকৃতাবস্থা—পশুত্বের নামান্তর ধারা মাত্র।

মানুষের বিভিন্ন চিন্তার সমষ্টি হইতেই যে এই সৃষ্টি সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব বিকাশ সেটা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। চিন্তার আকারে মানুষ যে সঙ্গীত হৃদয়ের কোণে কোণে বিচিত্র করিয়া তোলে, তাই তো আবার তুলির ফলায় বহির্জগত নানা বর্ণে নানা গন্ধে অপূর্ব্ব হইয়াই দেখা দেয়,—চিন্তার চক্ষে মানুষ যে ঈর্ষা যে প্রেরণা মনের উপর স্তরে স্তরে ফুটাইয়া তোলে, তাই তো আবার বিশ্বের দ্বারে কর্ম্মের বেশে আসিয়া সার্থকও হইয়া উঠে। চিন্তার সজীব মত্ততায় মানুষ যখন বিভোর হইয়া যায়; তখনি না অতুল্য আবেগে তার ভাব মানব-জগতের শ্রেষ্ঠ বিস্ময় অধিকার করিয়া লয়। মানুষের এই মিলিত চিন্তার ধারা হইতেই সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি, বৈচিত্র্যের উদ্ভব, মাধুর্য্যের জন্ম।

কোন্ মাহেন্দ্রক্ষণে যে এই বিশ্ব জন্মদাতা চিন্তার সৃষ্টি, কোন্ অবস্থার আলোড়নে এই চিন্তা যে মানুষের মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিয়াছিল, তা কে নিরূপণ করিবে?—যখনি করুক, সে মুহূর্ত্ত—সে দিন মানুষের প্রতি এক অপূর্ব্ব মহিমান্বিত দান,—ভগবানের দিপ্ত আশীর্ব্বাদ—সৃষ্টির এক উজ্জ্বল গরিমাময় পরিবর্ত্তন।

মনের উপর চিন্তা আধিপত্য করে, কি চিন্তার উপর মন আধিপত্য করে, সে এক বিরাট সমস্যা!, মন এবং চিন্তা, মনে হয় ইহার কোনটাই মানুষের নিজস্ব নয়। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ চিন্তা ও মন উভয়েরই বহু দূরে অবস্থান করে, তখন যেটা থাকে, সেটা অনুভূতির দুর্বোধ্য

সত্তা। তারপর অলক্ষ্যে কবে কোন্ মুহূর্ত্ত যে স্নেহময়ী জননীর মত করুণার শত পক্ষ বিস্তার করিয়া মানুষকে আদরে শান্তির প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া কোলে তুলিয়া লয়—পাণ্ডিত্যের দিক ছাড়িয়া দিলে, সে প্রশ্নের সমাধান চেষ্টা সুনিশ্চিত ব্যর্থ প্রয়াশ। মাতৃস্তন্য পীযূষের বিন্দুতে বিন্দুতে যার অবস্থান—জননীর অমল স্নেহের ব্যগ্র মঙ্গল আশীষে যার বিকাশ, তার সৃষ্টি সময় নিরূপণ করা বাস্তবিকই এক দুঃসাধ্য প্রচেষ্টা।

মানসিক বৃত্তি যে চিন্তার ধারানুযায়ী গঠিত হইতে থাকে—সেটা খুবই সুস্পষ্ট। চিন্তার প্রচণ্ড উদ্বেলিত চরিত্র যখন সংযত ভাব ধারণ করে, ঠিক তখনি মানুষ মানসিক বৃত্তির সম্যক বিকাশ আশা করিতে পারে—তার পূর্ব্বে তো নয়-ই। আর এই চিন্তার সংযমই যোগের চরম এবং পরম লক্ষ্য। এই চিন্তা সংযত করিতে একনিষ্ঠ তাপস আহার নিদ্রা ভুলিয়া যায়—বাহ্যজগৎ হইতে দূরে সরিয়া যায়—এক অচপল উন্মত্ততা বুকে ধারণ করিয়া তার লক্ষ্য সাধনে তন্ময় হইয়া পড়ে। তার পর এই কেন্দ্রীভূত চিন্তার ধারা হইতে সে বিশ্বামিত্রের মত অভিনব বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করিয়া বসে। এই চিন্তার মিলিত শক্তি হইতেই প্রত্যেক দেশের দারুণ অধঃপতনের সময়ও এক একজন করিয়া দিব্য-তেজা অতিমানব প্রায় কর্ম্মীর সৃষ্টি হয়—যার পায়ের উপর বিস্ময়ে অবাক হইয়া দেশের গণবিগ্রহ লুটাইয়া পড়ে—পরিত্রাণের আশায়, মুক্তি পাইবার আকুল আকাঙ্ক্ষায়। এমনি করিয়াই চণ্ডিকার সৃষ্টি—অব-তারের উদ্ভব। আর এইখানেই চিন্তার সার্থকতা—চিন্তার সজীবতা—চিন্তার কৃচ্ছ্র তপস্যার সিদ্ধি।

চিন্তা শাশ্বত, অবিনশ্বর, নিত্য, জাগ্রত। যুগ যুগান্তর ধরিয়া একই প্রবাহে সে ছুটীয়া চলিয়াছে মানবের মনকে অখণ্ড ভাবে গঠিত করিয়া—মানবের মনে অজ্ঞাত সমস্যার সৃষ্টি করিয়া। নির্মেঘ স্বচ্ছ আকাশের কোলে সূর্য্য সমুদিত হইয়া বিশ্বের উপর তার নিস্কলঙ্ক রজত-প্রবাহ ঢালিয়া দেয়, আবার সেই সূর্য্যই কৃষ্ণ মেঘের আবরণে বিশ্বের কাছে নিষ্প্রভ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এ পার্থক্য আধারের—আকাশের! সূর্য্য কিন্তু অক্ষয় অব্যয় সৌর্য্য লইয়াই নভোমণ্ডলে বিচরণ করে। চিন্তার

ধারাও সেইরূপ। সে চলিয়াছে তার নিজস্ব গতি লইয়া—নিজস্ব ভাব লইয়া। মানুষ যেরূপে যে ভাবে তাহাকে চাহিয়াছে—সেইরূপেই সে নিজেকে প্রকটিত করিয়া দিয়াছে।

চরিত্রের উপর যে চিন্তার কতখানি প্রভাব তা আলোচনা করিলে বাস্তবিকই বিস্ময়ে অবাক হইতে হয়। এই আলোচনা—প্রসঙ্গের সর্ব্বপ্রথমেই মনে পড়ে ভারতের সেই অত্যুজ্জ্বল অতুল-গৌরব দিনের কথা। সম্মুখে অগণিত রণোন্মুখ ভারতবীর—চারিদিকে সশঙ্কবিস্ময়ের গম্ভীর ধৈর্য্য, আসন্ন মৃত্যুর নির্ব্বাক জয়ধ্বনি, আর তার মধ্যে গীতা সিংহনাদকারী প্রদীপ্ত অবতার পাঞ্চজন্যের উন্মাদক নির্ঘোষে অস্থির অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"। যুগের পর যুগ কাটিয়া গেল মানুষ অচঞ্চল মুগ্ধহৃদয়ে সমাধান করিতেছে আজও এই একই বাণী—তার গানে প্রাণে, দর্শনে-ইতিহাসে। কত বিচিত্র ছন্দে, কত বিচিত্র বর্ণে মানুষ আজ এই একই বারতা বিশ্বের দ্বারে ঘোষণা করিতেছে।

চিন্তা যে শুধু নিজের চরিত্রের উপরেই প্রভাব বিস্তার করে এমন নহে; এই চিন্তার অপ্রতিহত আধিপত্যের সংসর্গে যে আসিবে, তারই চিন্তা—তারই ভাব পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া যাইবে। মানুষ মাত্রেরই মনে রাখা উচিত, তার চিন্তা শুধু তাতেই নিবদ্ধ থাকিবে না; তার সমাজের উপর—তার দেশের উপর—তার মনের উপর তার চিন্তা প্রভাব বিস্তার করিবেই। প্রতি ব্যক্তিগত চিন্তা অজ্ঞাতে গঠন করিয়া যাইবে—তার সমাজ, তার দেশ, তার জনমন। ন্যায়ত ধর্ম্মত সমষ্টির চিন্তার ধারার জন্য ব্যষ্টিই দায়ী।

আজ মনে পড়ে, সেই দিন দেশের সূচনা—সেইদিন ভারতের অধঃ-পতনের প্রারম্ভ, যেদিন সমষ্টির চিন্তা শূন্যে মিশাইয়া গেল—তন্ময় বিভোর হইয়া ব্যষ্টি করিতে লাগিল স্বার্থগন্ধ বিজড়িত অসংলগ্ন কল্পনা, গঠন করিতে লাগিল স্বতন্ত্র ইচ্ছা,—আর পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল দুঃখ-দুর্দ্দশার এক বিরাট বিয়োগ কাব্য।

দেশের কাজে দেশীয় নারী।

(শ্রীমতী সত্যবালা দেবী)

ভগিনী নিবেদিতা My Master as I saw Him গ্রন্থে শ্রীমায়ের প্রসঙ্গে বলেছেন—is she the last of an old order or the beginning of a new? In her, one sees realised that wisdom and sweetness to which the simplest of women may attain. অধ্যাত্ম জ্ঞান এমন কিছু প্রবল পুরুষোচিত বিষয় নহে, যাহাতে নারীপ্রকৃতির স্বাভাবিক কোমলতা ও মাধুর্য্য নষ্ট হইতে পারে। আবার অধ্যাত্মজ্ঞান সত্যই কিছু এমন দুর্ব্বোধ্য বিষয় নহে যে সরল প্রকৃতির ও মোটামুটী বুদ্ধির মেয়েরা তাহা আয়ত্ত করিতে পারিবে না। পাশ্চাত্য মহিলা নিবেদিতার ঠিকটীকে ঠিক ভাবে বুঝিয়া তলাইয়া দেখিয়া চিনিয়া লইবার শক্তি শ্রীমায়ের মধ্যে চরিত্রের দিক হইতে এমন আদর্শকে চিনিয়া লইয়াছিল যে, তাঁহার কাছে মাথা নত করিয়া সে দিক হইতে হিন্দু মহিলাকে শিখাইবার মত, পাশ্চাত্য মহিলার মধ্যে কিছু নাই, বরং শিখিবারই যথেষ্ট আছে, তাহাই তিনি সারা জীবনের কর্ম্মে দেখাইয়া গিয়াছেন। সেই জন্যই তিনি অমন খোলসা মনে তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়া যাইতে পারিয়াছেন যে অতি সরল প্রকৃতির,—চলিত কথায় যাহাকে ভাল মানুষ বলে,—নারী হইয়াও শ্রীমা জীবনে জ্ঞান এবং অমায়িকতাকে একসঙ্গে ফলাও করিয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার দেবজীবনে নিরহঙ্কার এবং উদারতার মধ্যে যে প্রাণের সাড়া পাওয়া যাইত তাহার প্রভাব তাঁহার সন্ন্যাস জীবনের প্রভাব অপেক্ষা নিবেদিতার চক্ষে কম বিভ্রম বাধায় নাই। বোধ হয় সেইজন্যই তাঁহার মনে অমন প্রশ্ন উঠিয়াছিল যে শ্রীমায়ের জীবন নারীত্বের প্রাচীন আদর্শের শেষ দৃষ্টান্ত অথবা নূতন আদর্শের প্রথম দৃষ্টান্ত।

নিবেদিতার এই সংশয়ের উত্তর আজ শ্রীমার স্মৃতিসভায় একটু

খানি দিবার চেষ্টা করিব। অতএব সর্ব্বাগ্রে সেই মহিয়সী পাশ্চাত্য মহিলার স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমরা একবার সসম্ভ্রমে প্রণত হই আসুন। শ্রীমা আপনার চরিত্রগুণে তাঁহার সম্ভ্রম আকর্ষণে সমর্থা সত্য, কিন্তু সম্ভ্রম করার মধ্যে তাঁহার চরিত্রেরও মহত্ব অনেকখানি পরিস্ফুট হইয়াছে। ঐশ্বর্য্য এবং গর্ব্বকেই লোকে মহত্ব বলিয়া ভ্রম করে। সত্যকার মহত্ব চিনিতে হইলে অন্তরে মহত্ব থাকা চাই। শ্রীমায়ের মধ্যে ভাগবত ষড়ৈশ্বর্য্য অথবা সাধারণ বিদ্যা বুদ্ধি কিছুই ছিল না, ছিল মানুষের যেটুকু খাঁটী মনুষ্যত্ব অকলঙ্ক সেইটুকখানি। তাহাই চিনিয়া লইয়া কর্ম্মযোগিনী বিদুষী ভগিনী শ্রীমায়ের মধ্য দিয়া হিন্দুর মাতৃজাতিকে মাথা নত করিয়া সম্ভ্রম দিয়া গিয়াছেন।

ভারতের নিজস্ব সত্য বলিয়া একটা আদর্শ আছে, সেই আদর্শ টীকে আমাদের ছাড়িবার উপায় নাই। আমরা ভগবানের হাতে সেই আদর্শের ছাঁচে গঠিত হইয়াই জগতে প্রেরিত হইয়াছি। আমাদের এই হিন্দুজাতি বড় প্রাচীন জাতি। কত সহস্র সহস্র বৎসর হইতে যে এই জাতি,—মানুষ কি?—কোথা হইতে আসিয়াছে?—এই চক্ষের সম্মুখের পরিদৃশ্যমান পৃথিবী সত্যই বস্তুটী কি?—এই সমস্ত প্রশ্নের চরম মীমাংসা করিয়া বসিয়া আছে, তাহা, ইতিহাস লেখক পণ্ডিতেরা এখনও স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই। আর এই সমস্ত প্রশ্নের সুস্পষ্ট মীমাংসা পাইলে মানুষ যে ভাবে চলে সেই ভাবে চলিবার প্রতিজ্ঞা এবং পদ্ধতিই আমাদের আদর্শ,—ভারতের নিজস্ব সত্য। এই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া হিন্দু দেখিয়াছে তাহার দেশের চারিপাশে পৃথিবী বক্ষে কত জাতি উঠিল উন্নত হইল, কীর্ত্তিতে গৌরবে সকলকে উঁচাইল আবার ধীরে ধীরে অবনত অস্তমিত হইয়া কাল বক্ষে মিলাইয়া একেবারে নিশ্চিহ্ন হইল। হিন্দুজাতি বার বার এ জিনিষটা পরীক্ষা করিয়া লইয়াই বুঝিয়াছে যে আপনার নিজস্ব সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই তাহারা মরে নাই। সেইজন্যই হিন্দুর সংস্কার আপনার এই নিজস্ব সত্য আদর্শকে ছাড়িতে পারে নাই। অসভ্য বলিয়াই: পরিচিত হই আর জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতির অনুকরণে

আপনাদের গড়িবার সুযোগেই বঞ্চিত হই, এ আদর্শ কিছুতেই ছাড়িতে নাই।

সেই জন্যই বোধ হয় ইতিহাস পড়িলে দেখিতে পাই ভারতবর্ষ মুসলমানের হাতে পড়িয়া মুসলমান হয় নাই, খৃষ্টানের হাতে পড়িয়া খৃষ্টান হয় নাই। দেশ গিয়াছে মান সম্ভ্রম অন্ন বস্ত্র সমস্তই গিয়াছে,—ধর্ম্মকে সে ছাড়ে নাই। যেমন করিয়া পারে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। হিন্দুজাতিটাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া মিলাইয়া মিশাইয়া লইতে অনেকেই চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু হিন্দুর আপনার অন্তরেই আত্মরক্ষার এমন এক প্রবল চেষ্টা বিদ্যমান ছিল, আপনার আদর্শের উপর এত বড় দৃঢ় বিশ্বাস ও নির্ভর ছিল, আপনার স্বাতন্ত্র্যের জন্য এমন এক দুর্জ্জয় স্পর্দ্ধা ছিল যে তাহাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে ভারতবর্ষ একটা ধর্ম্মের যুদ্ধভূমি। দেশের মাটী লইয়া ধন ঐশ্বর্য্য লইয়া মারামারি কাটাকাটি একেবারে হয় নাই তাহা নহে, হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে দেশের লোক অন্তরিক ভাবে কখনই যোগদান করে নাই। প্রাণপণ করিয়া সে ক্ষেত্রে জয়লাভ করিতে কখনই হিন্দু দাঁড়ায় নাই। দেশের সিংহাসন বিদেশী কাড়িয়াছে সে ক্ষতি কোনও দিনই তাহাদের মর্ম্মান্তিক হয় নাই। ইতিহাসে বরাবরই দেখিতে পাই যে কাড়াকাড়ি মারামারি পাঠানে পাঠানে, পাঠানে মোগলে, মোগলে মোগলে, ইংরাজে ফরাসীতে হইতেছে দেশের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত কোনও দিনই সে, ঘটনায় আলোড়িত হইয়া উঠে নাই। মেবারের রাজপুত, মহারাষ্ট্রের হিন্দু, পঞ্চনদের শিখ যে মোগলের সহিত জীবন-মরণ সংগ্রাম করিয়াছিল নিছক রাজনীতি তাহার কারণ নহে। ক্ষুণ্ণ ধর্ম্মের ক্রুদ্ধ অভিমানই মর্ম্মান্তিক হইয়া তাহাদের রাজ্যরক্ষা বা গঠনে যত্নবান করিয়াছে।

আমাদের এই জাতি তরবারি অপেক্ষা মনটাকেই অধিক যত্নে শানাইয়া আসিয়াছে। কই, ভারতবাসী ত আপনাদের জয় ঘোষণার জন্য কোনও রণ-নিনাদ ধ্বনি গড়িয়া তোলে নাই! গড়িয়া তুলিয়াছে যে বাণী তাহার নাম তপঃ অর্থাৎ আপনার উচ্চ প্রবৃত্তিকে তাপ

দিয়া জাগাইয়া তোলা। শিখ মহারাষ্ট্র রাজপুত যুদ্ধ করিয়াছে, রাজত্ব লইয়া সে যুদ্ধের পরিণতি ও নিষ্পত্তিই বটে, কিন্তু, তথাপি সে যুদ্ধ জার্ম্মাণীর যুদ্ধ নহে। মারামারি কাটাকাটি আর বাহুবলেরই জয় সেখানে যোদ্ধাদিগের লক্ষ্য হয় নাই। একটা কিছু মানসিক উচ্চ প্রবৃত্তিকে বাহুবলের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করাই লক্ষ্য ছিল।

ভারতবর্ষ তাহাই করিয়াছে। সে আপনার মনকে সকল চাপ হইতে সকলের প্রভাব হইতে মুক্ত রাখিয়া আসিয়াছে, এই মন অপরের কাছে যখনই নীচু হইয়া পড়িল বলিয়া তাহার সন্দেহ হইয়াছে তখনই তাহার জাতীয় অন্তঃপ্রকৃতি আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছে, সারা ভারতব্যাপী বিপ্লব তখনই আরম্ভ হইয়াছে। ভারতবর্ষের সংস্কার এই মন অজেয় দুর্দ্ধর্ষ হইয়া খাড়া থাকিলে জাতির মরণের ভয় নাই। নিজস্ব সত্য হইতে ভারত কিছুতেই আদর্শচ্যুত হইবে না। ভ্রম অন্যায়কে অবলম্বন করিয়াও সে মনকে যুগে যুগে যেমন করিয়া পারে অন্ততঃ সকলের সংস্রব হইতে সরাইয়াও খাড়া করিয়া রাখিয়া আসিয়াছে।

এইরূপে বিচিত্র সংঘাতের মধ্যে বিচিত্র সংগ্রাম বাধিয়াছে বলিয়াই আমাদের জাতীয় আদর্শকে আমরা সমস্তের উপরে তুলিয়া তাহাকে দূরস্থিত লক্ষ্যের মত দেখিতে শিখিয়াছি। নাম দিয়াছি প্রাচীন। বস্তুতঃ প্রাচীন সনাতন। প্রাচীনও নহে নূতনও নহে। জাতির মন বিশ্ব হইতে স্বতন্ত্র, আপনার ধারণায় সকল হইতে উচ্চ একটা কিছুকে আপনার মধ্যে স্থান দিয়াছিল, সেটার প্রভাবকে তুচ্ছ করিবে না তাহার এই প্রবল জিদ ছিল, তাই মন মরিয়াছে কিন্তু নীচু হয় নাই। দেখিবে আমাদের আছে একটা বস্তু, জাতির নিজস্ব সত্য আপনার বিশিষ্ট মূর্ত্তি। সেইটা যাইবার নহে যাইবেও না। সেইটাই আমাদের ভাগবত রূপ। দেখিবে তাহা হইতে অনেক দূরে যখন আমাদের মন পড়িয়া গিয়াছে, তখন, শত শত ভ্রম-প্রমাদ শুদ্ধ মনকে তাহারই অভিমুখে খাড়া করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছি। দূরস্থিত গন্তব্য স্থানের মত সে যত চক্ষে অস্পষ্ট তাহার প্রতি সম্ভ্রমটাও আমাদের তত

চমৎকার। আবার কাছে আসিলে সম্ভ্রম যত থর্ব হইতে থাকে ততই সনাতনের প্রাচীনত্ব নূতনত্বে দাঁড়াইয়া যায়।

সনাতনকে বুঝিতে পারিলে নূতন ও পুরাতনের ভ্রান্তি কাটিয়া যায়, কারণ নূতন এবং পুরাতন এক সনাতনেরই যে দুইটী প্রান্ত। নিবেদিতা শ্রীমায়ের মধ্যে সেই সনাতনীকেই দেখিয়াছিলেন। সেই সনাতনীকে দেখিয়াই সমস্যার ভাষায় ঐ কথা বলিয়াছিলেন— Is she the last of an old order or the begininng of a new? অর্থাৎ শ্রীমায়ের জীবন হিন্দুনারীত্বে প্রাচীন আদর্শের শেষ দৃষ্টান্ত অথবা নূতন আদর্শের প্রথম দৃষ্টান্ত?

ভগিনীগণ! আজ শ্রীমায়ের স্মৃতির উৎস আপনারা কোন্ মাকে স্মরণ করিতে চান? শ্রীমায়ের জীবনকে না তাঁহার জীবনের মধ্য দিয়া যে সনাতনী ফুটিয়া উঠিয়াছেন তাঁহাকে? কোন্ মায়ের প্রতি আপনাদের টান বেশী? আপনারা যথাসম্ভব উত্তর দিতে পারেন কিন্তু আমি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি না স্বীকার করিতেছি। মায়ের জীবনে যে সনাতনী ফুটিয়া উঠিয়াছেন, জীবনটাকেও তিনিই ত ফুটাইয়াছিলেন। তাঁহাকে ত জীবন হইতে আলাদা করিয়া দেখা যায় না! শ্রীমায়ের জীবন স্মরণ করিয়া সেই জীবনের সহিত সনাতনীর যোগ স্পষ্টরূপে মনের মধ্যে অনুভব করাই তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রেষ্ঠ পূজা। আজিকার এই সম্মিলন মধ্যে সেই টুকুই যদি সম্ভব হইয়া থাকে তবেই সম্মিলন সার্থক।

গত সে দিনেও ভারতের উপস্থিত মুহূর্ত্তের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ মহাত্মা গান্ধী ইয়ং ইণ্ডিয়াতে (Young India) প্রকাশ করিয়াছেন ধর্ম্ম এবং সঙ্ঘের ক্ষেত্রে মেয়েদের স্থান চিরকালই বড়। একথা আমিও বরাবর অনুভব করিয়া আসিতেছি। আমার বরাবরই ধারণা আছে যে রাজনৈতিক কলহ ও ফন্দী-বাজীর পর যখন সত্যকার কাজ আসিবে,—আমাদের জাতীয় জীবন গড়িতে হইবে অথবা জাতীয় জীবন গড়িবার শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে তখন, মেয়েদের কাযে নামিতেই হইবে! ভগবানই তখন আমাদের অন্তঃপুরের অন্তরাল ভাঙ্গিয়া দিবেন।

আমরা স্বামী পুত্র প্রভৃতির মধ্যে এবং সংসারের মধ্যে আমাদের স্থানটা যে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে নিশ্চয়ই তাহা না বুঝিয়া এবং তদুপযোগী না হইয়া আর থাকিতে পারিব না।

কিন্তু অবশ্য সে এখনই নহে। তার পূর্ব্বে আমাদের আত্ম-প্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠা চাই। মেয়েদের শক্তিময়ী স্বরূপের 'স্ব' টা মেয়েদের মনের ধারণায় পরিষ্কার হইয়া ফুটিয়া উঠা চাই। আর বাহিরের কর্ম্ম-ক্ষেত্রেও ভারতের নিজস্ব কর্ম্ম-ধারাটাও পরিস্ফুট হইয়া উঠা চাই।

মেয়েদেরও আছে অনন্ত সম্ভাবনা। দেখুন না আপনারা, পাশ্চাত্য মহিলা নিবেদিতার উপর শ্রীমায়ের আধ্যাত্মিক জয়ে ইহাই কি প্রমাণিত হইতেছে না যে মেয়েদের গণ্ডীর মধ্যে হিন্দু মেয়েরা পাশ্চাত্য দেশের মেয়ে অপেক্ষা হীনা নহেন। হয়ত আমাদের দেশের নবীন সমালোচকেরা সূক্ষ্ম বিচার করিয়া জগৎটাকে এখনও তলাইয়া বোঝেন নাই। এখনও ধোঁকার টাটীতে বসিয়া আছেন—কর্ম্মক্ষেত্র কাহাকে বলে বুঝিতে পারেন নাই। পুরুষের কাযগুলাকে কায মনে করেন আর সেগুলা পারে না বলিয়াই মেয়েদের কোনও কাযের নয় বলিয়া ঠিক করিয়া ফেলিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশেরও সমস্ত জাতীয় জীবনটা তাঁহারা তলাইয়া বোঝেন নাই। সেখানেও মেয়েদের গণ্ডি ও পুরুষের গণ্ডি আলাদা আছে সে সব তাঁহাদের চোখে পড়ে নাই। মেয়েদের বাহিরের দিককার কতকগুলা চাকচিক্যের প্রাচুর্য্য দেখিয়াছেন, কর্ম্মক্ষেত্রে কতকগুলা নৈপুণ্য ও তৎপরতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়াছেন তাহাতেই অবাক হইয়া ভাবিতেছেন আমাদের মেয়েরা শত বর্ষেও অমনটা হইতে পারিবে না। তাঁহারা স্থির মস্তিষ্ক হইলে ঠিকটাই বুঝিতেন, বুঝিতেন শত শত বৎসর ধরিয়া ঐরূপ হওয়াটা অভ্যাস করিয়াই পাশ্চাত্য মেয়েরা ঐরূপ হইয়াছে আর শত শত বৎসর ধরিয়া ঐরূপ না হওয়াটা অভ্যাস করিয়াছি বলিয়াই আমরা ঐ রূপ নহি।

কিন্তু পরিতাপ করিবার কি আছে? অভ্যাসে যাহা হয় তাহাতেই আমরা তাঁহাদের অপেক্ষা পশ্চাদ্বর্ত্তিনী। স্বভাবের দিক দিয়া উচ্চত্বের

পর্দ্দায় যখন তাঁহারা জাতি হিসাবে আমাদের অপেক্ষা উঠিয়া নাই তথন কেন স্বীকার করিব যে তাঁহারা স্বর্গে, আর আমরা নরকে।

এখন কথা হইতেছে ঐ রূপ না হওয়ার মধ্যে মেয়েরা অথবা মেয়েদের ঐ রূপ না করার মধ্যে জাতি কি কোনও সাধনা করে নাই? সনাতনের উদ্দেশ্যে মনকে খাড়া করাইবার জন্য খুঁটী খোঁটার স্বরূপ অনেক ভুলের উপরই সে তাহাকে ভর করাইয়াছে সত্য, কিন্তু লতা-গাছের উপর উঠিয়া গেলে গাছে তুলিবার জন্য ব্যবহৃত অবলম্বন গুলি জীর্ণ হইয়া ধসিয়া পড়িবার মত সনাতনের বিকাশের পর মনের সমস্ত ভুলেরই চলিয়া যাইবার পথ আছে। ভ্রমগুলা যে জঞ্জাল সে নিশ্চয়ই, কিন্তু সেগুলার অপসারণের জন্য আলাদা ঝগড়ার প্রয়োজন হইবে না যদি ঐ লতাকে গাছে তুলিবার উদাহরণ বুঝিতে পারি! শ্রীমায়ের জীবন আদর্শ ধরিয়া যদি হিন্দু-ভাবে হিন্দু-মেয়ের মনকে সনাতনের সহিত যোগ করিয়া দিতে পারি তবে ত নবীনা প্রাচীনা সকলেই আমরা একযোগে একমতে সমাজ সংস্কার, দেশের কায সকল সমস্যারই মীমাংসা করিয়া ফেলিতে পারিব।

দেশের অবস্থা ও মেয়েদের বর্ত্তমান মনস্তত্ব দেখিয়া প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় বটে যে মেয়েদের স্বভাবের আমূল পরিবর্ত্তন না হইলে তাহারা স্বদেশের উন্নতি বিধান বা জাতীয় জীবন গঠনের কোনও কাযেই লাগিবে না। ঐ আমূল পরিবর্ত্তন জিনিষটা কি তলাইয়া বুঝিলে তখন সেই রূপে অল্প দিনের মধ্যেই পরিবর্ত্তন লাভে অক্ষমা বলিয়া নারীকে অশ্রদ্ধা করিবার কিছুই দেখি না। যে মুহূর্ত্ত হইতে যে ভাবে সে পরিবর্ত্তন আরম্ভ হওয়া তাহার স্বভাবের নিয়ম সঙ্গত —তাহার অভাবে কিই বা করিতে পারে তাহারা? আমার মনে হয় আমূল পরিবর্ত্তনের নামে মেয়েদের মধ্যে দুঃসাধ্য সাধন বলিয়া কিছুই করিতে হইবে না, তাহাদের কর্ত্তব্যের ডাককে তাহাদের স্বভাবের উপযুক্ত করিতে পারিলেই অর্থাৎ তাহাদের স্বভাব ও তাহাদের কর্ত্তব্য দুয়ের একটা সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারিলেই তাহারা জাতীয় জীবনের জাগ্রত উপাদান হইয়া দাঁড়াইবে। আমূল পরিবর্ত্তনটা কাযের

ক্ষেত্রেই হইয়া যাইবে। তাহার জন্য আর ক্ষেত্র রচনা চাই না। যাহাই হউক অবরোধ অধঃপতন অধীনতার মধ্যেও মেয়েদের মধ্যে এখনও একটা কিছু গচ্ছিত হইয়া আছে। সেটা একদিন কাজে লাগিবেই। সেটা এমন কিছু মূল্যহীন পদার্থও নহে যে জাতি তুচ্ছ বলিয়া সেটাকে পায়ে ঠেলিতে পারে ?

এমনি হয় ত এতদিনকার পরাজয়ে জাতির অন্তরেও একটা কিছু গচ্ছিত হইয়া থাকিতে পারে। দুনীয়ার হাটে সেইটাই আমাদের মূল ধন। ধার করিয়া কোনও দিক হইতে পুঁজি আমরা তুলিতে পারিব না—অবশেষে মাটী খুঁড়িয়া সেইটাকে বাহির করিতে হইবে। রাজনৈতিক জগতের আন্দোলন আকিঞ্চন কলহের মধ্যে যতটুকু জাতি নিজেকে চিনিতে পারিয়াছে, ততটুকুর কাছে সে দিক এখনও আমাদের চরিত্রের অজ্ঞতার অন্ধকারের দিক। এখনও আমাদের চরম পথ চরম উপায় আমাদের মধ্যে নিহিত আছে। সেই উপায় যে দিন জাতি অবলম্বন করিবে সেই দিন মেয়েরা আপনাদের মূল্য বুঝিবে। মেয়েদের মূল্যও সকলের নিকট পরিমিত হইবে।

সমস্ত জিনিষ স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে হইলে সনাতনের রহস্যটা বুঝা চাই! সত্যই বস্তু-তন্ত্র হিসাবে সেটা কি ? আরও বুঝা চাই আমাদের জীবনের সনাতন ধারা, জাতীয় ইতিহাস, ধর্ম্ম-যুদ্ধ, আত্ম-রক্ষা, আত্মপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতির মধ্যে কি কোন সত্য, কোন solid fact নিহিত আছে কি না ?

আধ্যাত্মিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ সত্য বিধৃত সত্তাকে, সনাতন বলিতে পারি, বোধ হয় তত্ত্বজ্ঞের তাহাতে আপত্তি হইবে না। এই হিন্দু-জাতি পৃথিবী ছাড়া কিছু নহে। পৃথিবী হইতে আমরা যে স্বতন্ত্র হইয়াছি আমাদের ছুঁৎমার্গই তাহার জন্য দায়ী, সত্যই দায়ী কিন্তু এই দায় ছুঁৎমার্গের ঘাড়ে চাপাইয়া তাহাকে আসামীর কাঠগড়ায় টানিয়া আনিয়া দণ্ডাদেশের জোরে এখনও আমরা দেশ হইতে তাড়াইতে পারি নাই। পারি নাই বলিয়া অবশ্য সমাজ সংস্কারকেরা হতভাগ্য জাতিকে অভিশাপ পর্য্যন্ত দিয়াছেন, সমাজ পরিত্যাগ করিয়া নূতন নূতন সমাজও গড়িয়াছেন। ঠিক

বুঝিতে গেলে ব্যাপারটাতো চোরের উপর রাগ করিয়া মাটীতে ভাত খাওয়া। ঠিক বুঝিতে গেলে দায়ী ছুঁৎমার্গকে দণ্ডাদেশ দিয়া নির্ব্বাসিত করিতে পারি কই? প্রকৃতির কার্য্য-বিধি ধারায় এমন আইন কই? যে দায়ী তাহাকে শাস্তি দেওয়াতো প্রতিশোধ লওয়া, সে তো উত্তেজনার কার্য্য, তাহাকে দিয়া দায় উদ্ধার করাই ত সকল দিক বজায় রাখা বুদ্ধির কার্য্য। এই ছুঁৎমার্গে চলিয়াই আমরা পৃথিবী হইতে স্বতন্ত্র হইয়াও নিজেদের খাড়া রাখিয়াছি।—এবার ছুঁৎমার্গের ধারণা পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে এবার ছুঁৎমার্গের সহায়ে সকল দুষ্প্রবৃত্তি সকল ভ্রম হইতে স্বতন্ত্র হইয়া আমরা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইব সনাতনকে লাভ করিব।

আমরা অনেক খানি গৌরবের সহিত অধ্যাত্ম জ্ঞানের সাহায্যে অনুভব করিয়াছি যে হিন্দু সম্মিলিত বিশ্ব-মানবের একটা উপাদান। অপরাপর জাতি হইতে সে শ্রেষ্ঠ পথই বাছিয়া লইয়া জীবন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে। বিশ্ব-মানব যখন একটা জাতি তখন তাহার কালও অনন্ত—দুই এক হাজার বৎসরে তাহার ইতিহাস সম্পূর্ণ হইবার নহে। বহু দিনের হিন্দুজাতি, এই অনন্তকাল ব্যাপিনী বিশ্ব-মানবের ইতিহাসে আপনার নিজস্ব দান দিয়া একটা অধ্যায়ের পত্তন করিতেছে এ কম গৌরবের কথা নহে। এই জন্যই সে আপনার নিজস্ব সত্য আপনার বৈশিষ্ট্য হারাইতে চাহে না। এই জন্যই সে ছুঁৎমার্গের ভুলকে ধরে, এমন অনেক ভুলকে ধরে।

অধ্যাত্ম জ্ঞানের সাধিকা হইলেও 'আমি' পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানকে অবজ্ঞা করি না। জড় জগতের সকল সত্যকেই তাহাদের জড়-বিজ্ঞান নির্ভুল ভাবে প্রচার করে। মানুষ জড়-জীব, আর জড়-বিজ্ঞান বলে সে একদিনেই এমনটা, একেবারে গোটা মানুষটা হইয়া উঠে নাই। প্রত্যেক লোকের জীবনে যেমন দেখিতে পাই ক্ষুদ্র একটী ভ্রূণ হইতে সে দিনে দিনে একটু একটু করিয়া পরিণতি লাভ করিবার পর তবে যৌবনে পরিপূর্ণ মানুষটা দাঁড়ায়, তেমনি এই মনুষ্য, ক্ষুদ্র পরমাণুবৎ একপ্রকার প্রাণী হইতে ক্রমে ক্রমে পরিণত হইয়া এবং প্রত্যেক

পরিণতিতে এক এক প্রকার বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীতে পরিণত হইয়া তবে সর্ব্বশেষ তাহার চরম পরিণতি এই মানুষে দাঁড়াইয়াছে। জড়ের দিক অর্থাৎ দেহের পরিণতির দিকের কথা এই পর্য্যন্ত, হয়ত আর এদিকে অধিক পরিবর্ত্তন না হইতেও পারে, এই পরিণতির বৈজ্ঞানিকেরা নাম দিয়াছেন ক্রমবিকাশ বা Evolution

এইরূপ এই দেহছাড়া আমাদের মন বলিয়া আর একটা যে জিনিষ আছে সেও যখন পরিণতি সাপেক্ষ তখন, মনকেও ক্রমবিকাশ বা এভলিউশনের নিয়মে ফেলিতে আপত্তি দেখি না। খুব নিম্নস্তরের অসভ্য মানুষ হইতে আরম্ভ করিয়া সভ্যতার উচ্চস্তরের জাতি পর্য্যন্ত সকলকে পর পর দেখিলে মানসিক ক্রমবিকাশকেও সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এই মনেরও একটা চরম পরিণতি আছে সে বিকাশ জগতে এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই।

দৈনিক বিবর্ত্তন শেষ হইয়া প্রাণীরাজ্যে মানুষের আবির্ভাব এই এসিয়ারই কোনও দেশে নাকি হইয়াছিল। মনের শেষ বিকাশ সেও এই এসিয়াতেই হইবে আর ভারতবর্ষই তাহার জন্য মনোনীত স্থান। এই মনটাই আমাদের চিন্তা করাইতেছে, জানাইতেছে, অনুভব করাইতেছে সুতরাং মনের চরম পরিপুষ্টি হইলে চিন্তা সমুদ্রের পারে মানুষ পৌঁছিবেই—জানার শেষ তাহাতে আসিবেই—অনুভবের তাহার আর সীমা থাকিবে না, কারণ মনের ধর্ম্মই নাকি তাহাকে যতদূর টানিয়া বাড়াও সেও ততদূরই বাড়িবে তাহার স্থিতিস্থাপকত্বের (elasticity) শেষ নাই। আর মন এইরূপ অবস্থায় আসিলে ইচ্ছাশক্তিকেও তখন আপনার বশে আনিতে পারিবে। হিন্দুর অধ্যাত্ম এইগুলিই কিনা!—সত্য বিশ্রুত সত্তা ঠিক এমনই একটী সত্তা কিনা! তা যদি হয়, তবে মানসিক ক্রমবিকাশের চরম ভারতবর্ষে হইয়াছে বলিতে হইবে। এই ক্রমবিকাশই মনুষ্যজাতির শেষ লক্ষ্য। এই দান দিয়াই ভারতবর্ষ মনুষ্য সভ্যতাকে পূর্ণ করিবে, জগতে এক বিরাট সভ্যতার পত্তন করিবে। ভারতবর্ষ এই মহান গৌরবকে লক্ষ্য করিয়াই সনাতনকে গ্রহণ করিয়াছে। হিন্দু এই সনাতনের জয় বিশ্বের উপর প্রতিষ্ঠিত করিবে বলিয়াই তাহারা

আপনার বিচিত্র উপায়ে বিশ্বের সহিত জীবন সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে।

উপায় সত্যই বিচিত্র; আর তাহার একই ভঙ্গীর অবিচ্ছিন্ন প্রবাহই হিন্দুর জীবন-ধারা। পরিণত মন প্রবল মানসিক বল প্রয়োগে ভারতের ইতিহাসকে উচ্চ প্রবৃত্তির দিকে ঠেলিয়া রাখিয়াছে সেই একটী ধারাকে ভগ্ন হইতে দেয় নাই। অপরিণত মন যখন জীবনকে চালায় তখন সে দেহ ও দেহের আনুষঙ্গিক বিষয়গুলির নিয়মের অধীন হইয়াই জীবনকে চালাইয়া থাকে। তাহাদেরই কর্তৃত্বাধীনে তাহাদের ভৃত্যবৎ হইয়াই তাহাকে জীবনের কাজ নির্ব্বাহ করিতে হয়। আর এইরূপে চলিবার ফলে অবশেষে দেহের নিয়মই তাহার আপনার নিয়ম হইয়া দাঁড়ায়। তখন সে জড়-ধর্ম্মী হইয়া পড়ে। চৈতন্যের দ্বারাই মনের পরিণতি। মন জড়-ধর্ম্মী হইলেই মনের বিবর্ত্তন বন্ধ হইবার কথা।

ভারতের জীবন সংগ্রাম জগতের সকল প্রভাবেরই সহিত এই মানসিক সংগ্রাম। চৈতন্যের যোদ্ধা হইয়া জড়-ধর্ম্মের বিরুদ্ধে মানুষকে পরিণত ও প্রতিষ্ঠিত করাই তাহার ধর্ম্মযুদ্ধ বা জীবন-সংগ্রাম। ইতিহাসে দেখিব সে সমস্তই ছাড়িতে পারিয়াছে কেবল আপনার অন্তর্নিহিত এই উদ্দেশ্যটীকে কখনও ছাড়িতে পারে নাই। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির তেজ ও বল সে আপনার অন্তরের সত্যানুভূতির নিকট হইতে লইয়াছে, ততদূর পর্য্যন্ত যখন পৌঁছিতে পারে নাই, তখন কল্পনা সৃষ্ট স্বর্গ নরকের সাহায্য লইয়াছে, তাহাতেও যখন কুলায় নাই তখনই তাহার জাতীয় জীবনে বিবিধ ভ্রমের অবতারণা।

লৌকিক সত্যের দিক হইতে অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন তবে কি আমাদের মধ্যে জড়-ধর্ম্ম ঢুকে নাই? ঢুকিতে পারে সেটা সেইস্থানে জড়-ধর্ম্মের সাময়িক জয়। গ্লানিতে যে হিন্দুর চরিত্র পঙ্ক-চর্চ্চিত—সে সুবিধা খুঁজে, স্বার্থপরতা দেখায় সত্য, কিন্তু ইতর যবনটার মত স্বার্থপরতা এবং সুবিধা খোঁজা তাহার অন্তরের সত্য নহে। তাহারও বিবেক নিয়তই হিংসার প্রতিবাদ করিতে থাকে। বিবেকের চেয়ে তাহার অন্তরে গ্লানিটারই বল বেশী।—সেইটাই জিতে।

বাহিরের জগতে রাজনৈতিক বা সমাজ-নৈতিক ব্যবস্থায় তখনই হিন্দুর অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত আন্দোলিত হইয়া উঠে যখন সে দেখে যে সেই ব্যবস্থায় জড়-ধর্ম্মই জাঁকিয়া বসিয়াছে। সে ব্যবস্থাকে মানিয়া চলিতে গেলে জীবনটা অনিবার্য্যরূপেই গ্লানিতে পঙ্ক-চর্চ্চিত হইয়া উঠে; উদাহরণ, ভারতে অনেক বিপ্লব হইয়া গিয়াছে, ইতিহাস হইতে দেওয়া চলিতে পারে। বর্ত্তমানে যে রাজনৈতিক আন্দোলন চলিতেছে তাহাকেই ঠিক স্বরূপে বুঝিয়া দেখুন।

দারুণ দুঃখ লোকের মনের পর্দ্দায় পর্দ্দায় কাটিয়া বসায় অধীনতাকে উপলক্ষ্য করিয়া জড়বাদী সভ্যতার বিরুদ্ধে অভিযান উপস্থিত হইল। কিন্তু যতদিন এই জাগরণ মাত্র গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে হইবে ততদিন পর্য্যন্ত ইহা ভারতের নিজস্ব পদ্ধতি অবলম্বন করিবে না। যাহারা গবর্ণমেণ্টের অধীন করিয়া রাখার মধ্যে যেমন শয়তানের কারখানা দেখিতেছেন তেমনি আবার আমাদের অধীনতার মধ্যেও শয়তানের কারখানা আছে সেটাও দেখিয়াছেন কি? অত্যাচারী অত্যাচার দ্বারা পাপ করিতেছে, কিন্তু ভগবানের বিধানে সে অত্যাচার পীড়িতের একটা প্রায়শ্চিত্তেরও উপলক্ষ্য। এই শুদ্ধি বিধানের দিকটাতে যেদিন জাগরণ হইবে সেই দিনই আন্দোলন ভারতের নিজস্ব পদ্ধতি ধরিবার পথে আসিবে।

আর সেই দিনই প্রকৃত পরিবর্ত্তন এবং প্রকৃত দেশের কাজ আরম্ভ হইবে। দেশের লোকের মনে এর মধ্যেই গঠনের কাজ Constructive work বলিয়া কার্য্য ক্ষেত্রে আর একটা নূতন পদ্ধতির অভাব বোধ জাগিয়াছে। বুদ্ধির দিক দিয়া সেই কাজ এবং বর্ত্তমানের রাজনৈতিক কাজ উভয়ের মধ্যে মেরুর ব্যবধান বলিয়া মনে হইবার কথা বটে, কিন্তু দেশের কাজ ছাড়া ইহাদের কাহারই আর দ্বিতীয় নাম দেওয়া যায় না। এ প্রকার কাযে গবর্ণমেণ্টকে আমরা অগ্রাহ্য করিতেছি সে কাযে গবর্ণমেণ্টকে আমরা ক্রমশঃ জয় করিতে থাকিব। এ কাযে আংলোইণ্ডিয়া আমাদের শত্রু মধ্যে পরিগণিত হইতেছে, সে কাযে আমাদের এই আংলোইণ্ডিয়ান শত্রু পদে পদে জগতের সমক্ষে আপনার পশুত্বকে প্রমাণিত করিতে থাকিবে। এবং তাহার

মধ্যে যে সর্ব্বশেষ পশুত্বটুকু ঠেক খাইয়া যাইবে, সেটুকুর আর সংশোধন নাই, মহামানবকে সাক্ষী রাখিয়া ভারতের নিজস্ব ধর্ম্মের যে যজ্ঞ-শালা সেখানে আমরা তাহার প্রতি যথাযথ ব্যবস্থা করিতে পারিব। ভারতের নিজস্ব পদ্ধতিতে কার্য্যের ধারা বিশ্ব-জগৎ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়াই আমাদের বলিতে হইতেছে তাহার জন্য স্বভাবের আমূল পরিবর্ত্তন চাই। তবে চিন্তা নাই স্বভাবের আমূল পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক ভাবেই হইবে। নিরুপদ্রব অসহযোগ নীতির গভীর স্তরে যে জিনিষটা এখনও প্রচ্ছন্ন, গঠনের কাযের খেই তাহা হইতেই মিলিবার সম্ভাবনা।

কার্য্যের সেই অবস্থায় যখন ধড়া-চূড়াধারী অনর্গল ইংরাজি বক্তা অপেক্ষা জাতির অতি নিম্নস্তর পর্য্যন্ত আপন প্রভাব বিস্তারে সমর্থ খাঁটী স্বদেশী-কর্ম্মী অধিক উপযোগী হইবে—তখন শ্রীমায়ের আদর্শের মহিলা অধিক উপযোগিনী না কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধিধারণী অধিক উপযোগিনী—সে জিনিষটা বুঝা বেশী কষ্টসাধ্য নহে সুতরাং বিস্তারিত বুঝাইবার প্রয়োজন নাই।

গোপন দেবতা।

(শ্রীনরেশভূষণ দত্ত)

অসীম হয়ে রয়েছ বেশ গুম্‌রে,
আড়াল পেয়ে বসেছ বেশ গভীরে,
নয়ত কি এই রাত্রি দিনে,
এমন করে টেনে হেনে,
শিউলি বনের উদাস ঘ্রাণে,
টান্‌তে পার আমারে ?
অসীম হয়ে রয়েছ বলে গুম্‌রে॥
বিশ্ব ভরে রূপের ঝলক বিছায়ে,
দেখতে চেলেই নীরালে যাও সরিয়ে ;

নয়ত কি আর এত কারে,
ব্যর্থ আশায় ঘুরে ঘুরে,
নেশার ঘোরে ফিরে ফিরে,
আবারও যাই ছুটিয়ে ?
রূপের ঘোরে পাগল আঁখি তুলিয়ে
দাও না ধরা তাইত এমন আড়ালে,
মোহন সাজে চোখের চমক লাগালে,
এলিয়ে পড়া আশা গুলি,
শিশির ধোয়া কনক কলি
সকল ফেলি কেমন রাজা
এমন করে ভুলালে,
গোপন ভূমে আছ বলে আড়ালে॥
নয়ত কি আর ঈপ্সাটুকু বহিয়ে,
সারা আকাশ পাতাল মরি ঘুরিয়ে ;
যবনিকার ভিন্ন পাশে,
বারেক যদি বসতে এসে ;
নিত্য নূতন ভাবটা তোমার
দিতাম করে পরিচয় ;
সবার সনে হেথায় দিতাম গুথিয়ে॥
এখনো ওই মোহন বংশী বাজায়ে,
নূপুর পায়ে চূড়াটী বায়ে হেলায়ে ;
ডাকছ কেন কদম তলে
আকুল ডাকে আত্মা ভোলে।
পাই না খুঁজে, চমক দিয়ে,
ফিরছ শুধু মজায়ে ;
নিত্য নূতন অসীম ভাবটী জাঁকায়ে
রওনা অসীম রতন যতই গোপনে
তবুও তোমা বাঁধব এই জীবনে
নয়ত তোমার নামটী নিয়ে
ঝাঁপ দিব ওই অসীম চেয়ে,
দেখব তখন কোথায় থাক গোপনে ?
গোপন ভূমে বাঁধব তোমায় যতনে॥

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

যুক্তরাজ্য, আমেরিকা,

৩০শে নবেম্বর, ১৮৯৪।

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

ফনোগ্রাফ ও পত্রখানি তোমার কাছে নিরাপদে পৌছেছে জেনে আনন্দিত হলাম। আমাকে খবরের কাগজ থেকে কেটে আর পাঠাইবার দরকার নেই, কাগজের বন্যায় আমায় ভাসিয়ে দিয়েছে—এখন যথেষ্ট হয়েছে, আর আবশ্যক নাই। এখন সঙ্ঘটার জন্য খাটো। আমি ইতি মধ্যেই নিউইয়র্কে একটা সমিতি স্থাপন করেছি, উহার উপ-সভাপতি (Vice President) শীঘ্রই তোমাকে পত্র লিখ্‌বেন—তুমিও যত শীঘ্র পার তাদের সঙ্গে পত্র-ব্যবহার করতে আরম্ভ কর। আশা করি, আমি আরও কয়েক জায়গায় সমিতি স্থাপন করিতে সমর্থ হব।

আমাদিগকে আমাদের সব শক্তি সঙ্ঘবদ্ধ করতে হবে—আধ্যাত্মিক বিষয়ে একটা সম্প্রদায় গড়্‌বার জন্য নয়, উহার বৈষয়িক দিক্‌টাকে প্রণালীবদ্ধ কর্‌বার জন্য। জোরের সহিত প্রচার কার্য্য খুলে দিতে হবে। তোমাদের সব মাথাগুলো একত্র কর ও সঙ্ঘবদ্ধ হও।

রামকৃষ্ণ কৃত অলৌকিক ক্রিয়া সম্বন্ধে কি পাগ্‌লামি হচ্ছে? আমার অদৃষ্টে সারা-জীবন দেখ্‌ছি গরু তাড়ান বিড়ম্বনা। মস্তিষ্ক হীন আহাম্মক-গুলো কেন যে এই বাজে আজগুবিগুলো লেখে তা জানিও না, বুঝিও না। মদকে ডি, গুপ্তের ঔষধে পরিণত করা ছাড়া—রামকৃষ্ণের কি জগতে আর কোন কার্য্য ছিল না? প্রভু আমাকে এই ছটাকে-মাথা আহাম্মকদের হাত থেকে রক্ষা করুন! এই সব লোক নিয়ে কায কর্‌তে হবে!!! যদি এরা রামকৃষ্ণের একখানা যথার্থ জীবন চরিত লিখ্‌তে পারে—তিনি যে জন্য এসেছিলেন, যা শিক্ষা দিতে এসেছিলেন, সেই দিক লক্ষ্য রেখে যদি ইহা লিখা হয়, তবে লিখুক—তা না হলে

এই সব অ্যাবোল-তাবোল লিখে ভাল লোকদের লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়ে যেন না দেয়। এই সব লোক ভগবান্‌কে জান্‌তে চায়—এদিকে রামকৃষ্ণের ভিতর বুজরুকি ছাড়া আর কিছু দেখ্‌তে পায় না! খাজা আহাম্মকি! এ রকম আহাম্মকি দেখ্‌লে আমার রক্ত টগবগ ছুটতে থাকে। কিডি তাঁর ভক্তি, তাঁর জ্ঞান, তাঁর সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের কথা এবং অন্যান্য উপদেশ সব তর্জ্জমা করুক না। এই ঢোলে লিখ্‌তে হবে, তাঁর জীবনটা একটা অসাধারণ আলোকবর্ত্তিক, যার তীব্র রশ্মি-সম্পাতে লোকে হিন্দু-ধর্ম্মের সমগ্র অবয়ব ও অংশগুলি বুঝ্‌তে সমর্থ হবে—শাস্ত্রেতে যে সব জ্ঞান মতবাদ আকারে মাত্র রয়েছে, তিনি তার মূর্ত্ত দৃষ্টান্তস্বরূপ—ঋষিও অবতারেরা—যা বাস্তবিক শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন, তিনি নিজের জীবনের দ্বারা তা দেখিয়ে গেছেন। শাস্ত্রগুলি মতবাদ মাত্র—তিনি ছিলেন তার প্রত্যক্ষ অনুভূতি। এই ব্যক্তিটী এক পঞ্চাশৎ বর্ষব্যাপী একটা জীবনে পঞ্চসহস্র বর্ষব্যাপী জাতীয় আধ্যাত্মিক জীবন-যাপন করে গেছেন এবং ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের জন্য একটী মূর্ত্ত শিক্ষাপ্রদ দৃষ্টান্ত-স্বরূপে আপনাকে গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর ভিন্ন ভিন্ন মত এক একটা অবস্থাভেদ করে—এই মতবাদ দ্বারা বেদের ব্যাখ্যা ও শাস্ত্রসমূহের সমন্বয় হোতে পারে। পরধর্ম্ম বা পরমতের প্রতি শুধু দ্বেষভাব থাক্‌লে চল্‌বে না, আমাদিগকেও ঐ ঐ ধর্ম্ম বা মত অবলম্বন করে জীবনের সাধনা করে আপনার করে ফেল্‌তে হবে—সত্যই সকল ধর্ম্মের ভিত্তি ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সব ভাব নিয়ে তাঁরা একখানি সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী জীবন-চরিত লেখা যেতে পারে। সময়ে সবই ঠিক হবে। নরনারী ঘটিত এবং দৈহিক ক্রিয়াদি ঘটিত অশ্লীল ও অসাধু ভাষা সব পরিহার কর। অন্যান্য জাতিরা ঐ ব্যাপারগুলার সামান্য উল্লেখ পর্য্যন্ত চূড়ান্ত অশ্লীলতা জ্ঞান করে—তাঁর ইংরাজী জীবন-চরিত সমগ্র জগৎ পড়্‌বে—সুতরাং সাবধান, আমাদের কোন প্রকার অসভ্যতা যেন ওর ভিতর প্রবেশ না করে। আমি একখানা জীবন-চরিত পড়্‌লাম—তাতে এইরূপ বহু শব্দের প্রয়োগ আছে। হিন্দু আমাদের এই ভাবের কুরুচিটার কখনও বিকাশ হয়নি। কিন্তু

এই সব ভাবের বা ভাষায় অভাস পর্য্যন্ত দেখ্‌লে অপর জাতিরা তাকে ঘোরতর অশ্লীলতা জ্ঞান করে। সুতরাং খুব সাবধান—খুব সাবধান হয়ে এরূপ ভাষা বা ভাব বাদ দেবে। ঐ সব লোকের এদিকে একবিন্দু ক্ষমতা নেই অথচ জাঁকবড়াইটা খুব আছে—তারা নিজেদের এতবড় মনে করে যে, অপরের পরামর্শ শুন্‌তে একদম নারাজ। এই অদ্ভুত ভদ্রমহোদয়গুলিকে নিয়ে যে কি কর্‌ব, তা বুঝি না—তাদের কাছ থেকে আমার বেশী কিছু আশা নেই। তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হোক। তারা যে বইখানা পাঠিয়েছিল, তার জন্য লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হচ্ছে। লেখক হয়ত ভেবেছেন যে, তিনি খোলাখুলি ভাবে সত্য লিপিবদ্ধ করে যাচ্ছেন--পরমহংসদেবের ভাষা পর্য্যন্ত বজায় রাখ্‌ছেন—কিন্তু আহাম্মক এটা ভাবেনি যে, তিনি স্ত্রীলোকদের সাম্‌নে কখনও এরকম ভাষা ব্যবহার কর্‌তেন না—কিন্তু লেখক আশা করেন, তাঁর বই নরনারী উভয়ে পড়্‌বে। প্রভু আহাম্মকদের হাত থেকে আমায় রক্ষা করুন!! তারা আবার মনে করে, আমরা সকলেই তাঁকে সাক্ষাৎ দেখেছি! দূর ছাই, এরূপ মস্তিষ্ক-হীনদের ভিতর দিয়া যা কিছু বেরোয়, ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে। নিজেরা ভিখারী—রাজার মত চালচলন কর্‌তে চায়—নিজেরা আহাম্মক, মনে করে আমরা মস্ত জ্ঞানী—ক্ষুদ্র দাস সব মনে কচ্ছে আমরা প্রভু—এইত তাদের অবস্থা, কি যে কোর্‌বো, কিছু বুঝ্‌তে পারি না। প্রভু আমায় রক্ষা করুন! আমার সব আশা-ভরসা—র উপর—কায করে যাও—লোকদের মতানুসারে চলো না—কেবল তাদের না চটিয়ে খুসী রেখে যাও—এই আশায় যে তাদের মধ্যে কেউ না কেউ এক জনও ভাল দাঁড়াতে পারে। কিন্তু স্বাধীনভাবে তোমাদের কাযে অগ্রসর হয়ে যাও। ভাত রান্না হলে অনেকে পাত পেতে খেতে বসে। সাবধান—কায করে যাও। সদা আমার আশীর্ব্বাদ জান্‌বে।

ইতি—

বিবেকানন্দ।

মীরাবাই।

(স্বামী প্রবোধনন্দ)

এ জগতে উন্নতমনা ও ভক্তিমতী রমণী বিরলা। অনেকের ধারণা যে স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম-আসন বড় উচ্চে প্রতিষ্ঠিত নয়, পুরুষ না হইলে ধর্ম্মজগতে উচ্চ আসন অধিকার করিতে পারে না। বাস্তবিক কিন্তু তাহা নহে। ধর্ম্মজগতে স্ত্রী ও পুরুষের সমান অধিকার। যাঁর মন-মধুকর শ্রীভগবানে আকৃষ্ট হইয়াছে, যিনি একবার ভাগবতী লীলার অমৃতময়-রস আস্বাদ করিয়া প্রমত্ত ও আত্মহারা হইয়াছেন, যিনি প্রেমমাখা হরিনামে একবার ডুবিয়াছেন, তিনি স্ত্রী হউন অথবা পুরুষ হউন; ভক্ত অথবা জ্ঞানীর সর্ব্বোচ্চ আসনে তিনি সর্ব্বদা বিরাজিত। এ জগতে প্রেমময়ের লীলা ব্যতীত তিনি আর কিছুই দেখিতে পান না। সেই প্রেমিক অথবা জ্ঞানীর নিকট লিঙ্গভেদ থাকে না। তিনি পার্থিব জগৎ এককালে ভুলিয়া যান।

আবহমান কাল হইতে এ পর্য্যন্ত ভারতে অসংখ্য ধর্ম্মপ্রাণা হিন্দুরমণী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ও করিতেছেন। হিন্দুরমণী ব্যতীত ধর্ম্মপ্রাণা মহিলা বাস্তবিকই বিরল। অসংখ্য ভক্তিমতী হিন্দু মহিলা আছেন যাঁহাদের সম্বন্ধে জগৎ কিছুই জানেন না, জানিবার উপায়ও নাই। কারণ ধর্ম্ম নির্জ্জনে গোপনে অর্জ্জন করাই সম্ভব। অনেকে মীরাবাইয়ের কথা শুনিয়া থাকিবেন। তিনি বীরপ্রসবিনা-চিতোরের মহারাণী হইয়া প্রকাশ্য রাজ-পথে হরিগুণ গান করিয়া বেড়াইতেন; তিনি হরিপ্রেমে উন্মাদিনী হইয়াছিলেন। অন্তরে গোপী-ভাবে সাধনা ও নিজেকে একজন ব্রজ-গোপী জ্ঞান করিতেন। এই প্রাতঃস্মরণীয়া হিন্দুরমণীর নাম ইতিহাসে জ্বলন্ত অক্ষরে রহিয়াছে। ইনি কে মানবী না দেবী? এই কৃষ্ণানুগতা ধর্ম্মপ্রাণা হিন্দুরমণীর নাম শুধু যে সুদূর রাজপুতানায় শুনিতে পাওয়া যায় তাহা নহে, পুণ্যভূমি ভারতের প্রায় সমগ্র অঞ্চলে আবালবৃদ্ধ বনিতার নিকট

তিনি জ্ঞাত। তিনি ছিলেন আদর্শ হিন্দুরমণী। এ জগতে শ্রীভগবান কৃপা করিয়া যাঁহাকে বড় করেন তিনিই বড়, যাঁহার দ্বারা ধর্ম্মপ্রচার করান তিনিই ধন্য হন। প্রভু ইচ্ছাময়! তাঁহার যেরূপ ইচ্ছা তিনি সেইরূপই করেন, যাঁহাকে তিনি যন্ত্র করিয়া লইয়াছেন এ জগতে তিনিই জ্ঞানী বা মহাপুরুষ। কৃপা—কৃপা—কৃপা তাঁর কৃপা ব্যতীত কিছুতেই কিছু হয় না।

"মুকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং।
যৎ কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম॥"

যাঁর অপার কৃপাবলে বোবা বাচাল হয় এবং পঙ্গুও উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ উল্লঙ্ঘন করে সেই পরমানন্দ মাধবের শ্রীচরণ কমল বন্দনা করি।

মীরা কৃষ্ণানুগতা ধর্ম্মপরায়ণা বীর-প্রসবিনী চিতোরের রাজ-মহিষী। তিনি মাড়োবারের একজন সঙ্গতিপন্ন রাঠোর সামন্তের কন্যা ছিলেন। ১৪২০ খৃষ্টাব্দে মেরাতাগ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ভুবন-মোহিনী রূপ দর্শনে ও কিন্নর কণ্ঠের হরিনাম গান শ্রবণে সকলেই মুগ্ধ হইতেন। আশৈশব তিনি অতিশয় ভক্তিমতী ছিলেন। পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত ভগবদ্ভক্তির প্রেরণায় তিনি শৈশবকাল হইতেই সুমধুর হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে উন্মত্ত হইয়া পড়িতেন। বালিকা মীরা নির্জ্জন-প্রিয় ছিলেন; তাঁহার বালসুলভ চপলতার অভাব ছিল না, কিন্তু যখনই তিনি নাম গান করিতেন তখন আর কে বলিবে যে তিনি চঞ্চল স্বভাবা। যখন সঙ্গিনী-গণ ক্রীড়ায় মত্ত থাকিত তিনি বেণুবিনিন্দিত কোকিল কণ্ঠে সুমধুর হরিনাম গান করিতেন ও আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িতেন। তাঁহার আহার নিদ্রার অবসর থাকিত না। বাহ্যজগতের সমস্তই ভুলিয়া যাইতেন। অলৌকিক রূপগুণে বিভূষিতা কুমারী মীরা যখন মধুমাখা হরিনাম কীর্ত্তন করিতেন তখন তথাকার সকল নরনারী আপন আপন কার্য্য ফেলিয়া সকলেই তাঁহার কিন্নর কণ্ঠের অপূর্ব্ব স্বরলহরী শ্রবণ করিবার জন্য দৌড়িয়া আসিতেন ও সঙ্কীর্ত্তনরসে বিভোর হইয়া বসিয়া থাকিতেন। সকলেই কি যেন এক স্বর্গীয় আনন্দে অধীর হইয়া পড়িতেন। ঐরূপে প্রতিনিয়তই সকলে চপলা বালা মীরাকে মধ্যস্থলে বসাইয়া

অতৃপ্তনয়নে তাঁহার স্বর্গীয়রূপ দর্শন করিতেন ও কলকণ্ঠ নিঃসৃত সঙ্গীত সুধায় শ্রবণলালসার পরিতৃপ্তি সাধন করিতেন। ক্রমে ক্রমে কুমারী মীরার যশ দেশ দেশান্তরে প্রচারিত হইয়া পড়িল। বহুদূরদেশ হইতে লোক সমাগম হইতে লাগিল। ধীরে ধীরে মীরার অনিন্দ্য-সুন্দর-রূপ-মাধুরী ও কলকণ্ঠ নিঃসৃত অপূর্ব্ব স্বরলহরীর কথা পুণ্যভূমি বীরপ্রসবিনী চিতোরের মহারাণা কুম্ভের কর্ণগোচর হইল। তিনি মারবারে মাতুলালয়ে যাইবার নাম করিয়া ছদ্মবেশে চিতোর হইতে ঐ রাঠোর সামন্তের গৃহে উপনীত হইলেন। তিনি কুসুমদাম অলঙ্কৃতা চন্দন-চর্চ্চিতা ভক্তিমতী ধর্ম্মপ্রাণা মীরার সুমধুর হরিনাম কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া স্তম্ভিত হইলেন। এরূপ অলৌকিক রূপগুণের অপূর্ব্ব সমাবেশ ইতিপূর্ব্বে তাঁহার নয়নগোচর হয় নাই। তিনি বিজলীবালা সদৃশ কুমারী মীরাকে একদিন মাত্র দর্শন করিয়া ও তাহার গান শ্রবণ করিয়া তৃপ্ত হইতে না পারিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। মীরার পিতা তাঁহাকে কোনও সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভব মনে করিয়া তাঁহার গৃহে কিছুদিন বাস করিয়া গান শুনিতে অনুরোধ করিলেন। রাণা কুম্ভ সেই স্থানে বাস করতঃ পুনঃ পুনঃ কুমারী মীরার বীণাবিনিন্দিত কোকিল কণ্ঠের সুমধুর গীত-লহরী শ্রবণ ও তাঁহার অনুপম রূপমাধুরী সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার অতৃপ্ত লালসা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। যে মধুমাখা নামসুধায় জগৎ মাতিয়া উঠে, যে কিন্নর-কণ্ঠীর স্বরলহরী শুনিবার জন্য যোগী ঋষিরাও ধ্যানভঙ্গ করেন, যে রূপলাবণ্য দর্শন করিলে স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রও মুগ্ধ হয়েন, সেই অদ্ভুত মণিকাঞ্চনসংযোগ দেখিয়া রাণা কুম্ভ আকৃষ্ট হইবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি ?

রাণা কুম্ভ আর অধিক দিন থাকিতে পারিলেন না। বিদায়কালে তাঁহার অঙ্গুলি হইতে হীরকাঙ্গুরীয় খুলিয়া কুমারী মীরাকে দিলেন এবং নিজ-মনভাব গোপন করিতে না পারিয়া নিজের পরিচয় প্রদান করিলেন। মীরার পিতা পরিচয় জানিবামাত্র রাণার যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে পারেন নাই বলিয়া পদ-ধারণ পূর্ব্বক ক্ষমা-ভিক্ষা করিলেন, এবং কন্যাকেও ক্ষমা-ভিক্ষা করাইলেন। রাজপুতনায় যাহা

কিছু সুন্দর ও উৎকৃষ্ট সমস্তই যেন চিতোরের সোভাসন্দর্শনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। একণে সেই প্রস্ফুটিত শতদল চিতোর রাণার অঙ্ক-শায়িনী হইলেন। অচিরেই মীরার পিতা মীরাকে রাণা কুম্ভের হস্তে সম্প্রদান করিলেন। কিন্তু স্বাধীন স্বচ্ছন্দবিহারিণী ভক্তিমতী আনন্দময়ী কুমারী মীরা আজ চিতোর রাজ-প্রাসাদের প্রমোদ ভবনে পরাধীনা বন্দিনী ভাবিয়া অত্যন্ত কাতরা হইলেন। রাজ-মহিষী মীরা আজ আর কুমারী নহেন। মীরাকে পাইয়া রাণা যেন স্বর্গসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। রত্নাগর্ভা বীরপ্রসবিনী-চিতোরের অতুল ঐশ্বর্য্যে মীরা পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না। ভোগবিলাস তাঁহার নিকট বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল। রাজ-মহিষী হইয়া এখন আর তিনি উদার উন্মুক্তহৃদয়ে হরিনাম-সুধা পান করিতে পারেন না। পরাধীন হইয়া অন্তরের ভাব গোপন করিতে লাগিলেন। মর্ম্মাহত শুষ্ক পদ্মের ন্যায় তিনি দিন দিন মলিন হইতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয় বল্লভ গোবিন্দকে অন্তরে কাতর ভাবে ডাকিতে লাগিলেন এবং বন্দিনী হইয়া আছেন বলিয়া কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। ভক্ত-হৃদয়ের ব্যথা শ্রীভগবানের অন্তরে বিঁধিল। মীরা কঠিন রোগাক্রান্তা হইলেন। মীরার পরিবর্তন রাণার অগোচর রহিল না। এরূপ পুণ্যবতী ভক্তিমতী রমণী কত দিন আর চিতোরে আবদ্ধ থাকিতে পারেন। রাণা মীরাকে অসুখের কারণ জিজ্ঞাসা করায় মীরা কহিলেন "মহারাজ! এ নশ্বর জগতের কোন বস্তুতেই আমার মন আকৃষ্ট হইতেছে না, সংসার আমার নিকট বিষবৎ বোধ হইতেছে, আত্মীয়দের কাল সর্পসম বোধ হইতেছে—প্রভুর নাম-গান ব্যতীত এ সংসার আমার কণ্টকময় বোধ হইতেছে, আহার নিদ্রা চলিয়া গিয়াছে। আমি প্রভুর জন্য উন্মাদ হইয়া পড়িতেছি, বারম্বার মনকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি কিন্তু মন ভগবৎ-গুণগান ব্যতীত আর কিছুই চাহে না, আর কিছুই ভাল লাগে না। পূর্ব্বে আমি স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতাম ও আনন্দে মধুমাখা হরিনাম গান করিতাম এখন রাজ-মহিষী হইয়া সে সব কিছুই করিতে পারি না।" ব্যাধি সাংঘাতিক জানিয়া রাণা চিন্তিত হইলেন ও রাজ-বৈদ্য

দেখাইলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। রাণা বুঝিলেন যে একমাত্র হরিগুণগান ব্যতীত মীরার চিত্ত শান্ত হইবে না। রাণা আরও বুঝিলেন যে মীরাকে লইয়া তিনি সুখী হইতে পারিবেন না, তথাপি তাঁহার মন ভুলাইবার জন্য বারম্বার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রাণা সুকবি ছিলেন, তিনি সুন্দর কাব্য রচনা করিতে পারিতেন, মীরাও সামান্য সামান্য জানিতেন। তিনি মীরাকে উত্তম কবিতা ও কাব্য রচনা করিতে শিখাইলেন। ভাবিলেন যে, কাব্যরসে বোধ হয় মীরার মন পরিবর্ত্তন হইবে ও তাঁহাকে লইয়া সুখী হইবেন। কিন্তু সে আশা দুরাশা মাত্র।

যাঁর হৃদয়ে ভগবৎপ্রেম বা বিশ্বপ্রেম জন্মিয়াছে তিনি কি আর সামান্য একব্যক্তির প্রেমে আকৃষ্ট হইতে পারেন? মীরা কাব্যের মোহিনী শক্তিতে মুগ্ধ না হইয়া প্রতিভাবলে অল্পকাল মধ্যে সুন্দর কবিতা রচনা করিতে শিখিলেন। রাণার অপেক্ষা তাঁর কবিতা অধিক চিত্তাকর্ষক ও মধুর হইতে লাগিল। তাঁর উপাস্যদেব "রঙ্গোড়" নামক বালগোপাল। সকল কবিতাই তিনি ভক্তবৎসল নন্দ-নন্দন গোপালের উদ্দেশেই রচনা করিতেন।

এইরূপ স্তবস্তুতি গীতি বা কবিতা রচনা করিয়াও তিনি আনন্দিত হইতে পারিলেন না। দিন দিন ম্লান হইতে লাগিলেন। রাণা পুনরায় জিজ্ঞাসা করায় মীরা কহিলেন "মহারাজ! আমার ইচ্ছা যে আমি স্বাধীন মুক্তকণ্ঠে দিবারাত্র আমার প্রাণপ্রিয় গোবিন্দের গুণকীর্ত্তন করি। সেই প্রভুই আমার একমাত্র প্রেমাস্পদ, সেই প্রিয়তমের জন্য আমার প্রাণ অধীর হইয়া পড়িয়াছে। সংসারের সকল ব্যক্তিকে সেই পথে লইয়া যাইবার জন্য আমার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া পড়িতেছে।"

ইহা শুনিয়া কুম্ভ কুপিত হইয়া কহিলেন "চিতোর রাণীর মুখে এ কথা শোভা পায় না। মীরা অগত্যা নীরবে ক্ষমা-ভিক্ষা করিলেন। তিনি দিন দিন নীরস তরুবরের ন্যায় মলিন হইয়া দুঃখিত অন্তঃকরণে রোদন করিতে লাগিলেন। বারম্বার তিনি তাঁহার উপাস্যদেবতাকে মনের বেদনা জানাইতে লাগিলেন। বৈরাগ্য ও ব্যাকুলতা দিন দিন

অধিকতর হইতে লাগিল। ক্রমে উহা শ্রীভগবানের সমীপে পৌঁছিল। তিনি অসীম অনন্তস্বরূপ তিনি মীরার প্রেমের বাঁধনে ধরা পড়িলেন।

মীরার এইরূপ অসাধারণ প্রেমোন্মত্ততা দেখিয়া রাণা কুম্ভ অগত্যা মীরার জন্য রাজ-প্রাসাদের মধ্যে "রঞ্ছোড়" নামক বাল গোপালের মূর্ত্তি স্থাপন করাইয়া দিলেন। মীরা অকুণ্ঠিত চিত্তে সকল বৈষ্ণব সঙ্গে লইয়া মন্দির প্রাঙ্গণে প্রেমমাখা হরিনাম সংকীর্ত্তন করিয়া দিবানিশি আনন্দে বিভোর হইতে লাগিলেন। তিনি নিজেকে একজন ব্রজগোপী জ্ঞান করিয়া কৃষ্ণ প্রেমে উন্মাদিনী হইয়া উঠিলেন। এইরূপ সকল বৈষ্ণবের সহিত প্রেমানন্দে নৃত্য-গীত করিতে দেখিয়া রাণা অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। দিন দিন তাঁহার অশান্তি বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ক্রমে কুম্ভের নিকট ইহা অসহ্য হইয়া পড়িল। মধ্যে মধ্যে তিনি রাণীর চরিত্রে সন্দিহান হইতে লাগিলেন।

এদিকে মীরা স্বাধীনভাবে মুক্তকণ্ঠে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে গাইয়া জগৎ ভুলিয়া যাইতে লাগিলেন এবং দিবানিশি হরিগুণ গানে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ইষ্টদেবের জন্য তিনি স্বহস্তে রন্ধন করিয়া নিজে অগ্রভাগ আস্বাদ করিয়া উত্তম হইলে তবে তিনি তাঁহার প্রিয়তম জগন্নাথকে ভোগ দিতেন। তিনি বলিতেন, যে জিনিষ আমার নিজের ভাল লাগে না তাহা প্রভুকে কেমন করিয়া প্রদান করিব। এইরূপে দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল। মীরা হরিগুণ গানে এতই উন্মত্তা হইলেন যে, তিনি রাণার নিকট প্রায়ই আসিতে পারিতেন না। যে মিছরির পানার আস্বাদ পাইয়াছে সে কিরূপে আর চিটে গুড় ভালবাসিতে পারে?

রাণা কুম্ভ একবার মীরাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। মীরা আসিলে তাঁহাকে কহিলেন "মীরা, তুমি কি নিশিদিন নাম সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত থাক? স্বামী-সেবা কি তোমার কর্ত্তব্য নয়?" মীরা কহিলেন "মহারাজ! স্বামী সেবা আমার কর্ত্তব্য বটে কিন্তু আমি অশেষ চেষ্টা করিয়াও ভগবৎ-গুণগান হইতে বিরত হইতে পারিতেছি না—কতবার মনে করি এইবার গিয়া স্বামী-সেবা করিব কিন্তু মনের কথা মনেই রহিয়া যায়। আমি

শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে এতই উন্মত্ত হইয়াছি যে আমি আর আপনার সেবা করিতে সক্ষম হইতেছি না। অতএব আমায় ক্ষমা করুন।

রাণা কহিলেন "মীরা আমি পুনরায় বিবাহ করিলে তুমি কি সুখী হইবে"? মীরা করজোড়ে কহিলেন "মহারাণা। আপনি বিবাহ করিলে আমি আনন্দিত হইব, কারণ আমি আপনার কিছুই সেবা করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। কৃপা করিয়া অপর একটী দাসী আনিলে আমি পরম সুখী হইব।"

এ কথায় রাণা মীরার চরিত্রে সন্দিহান হইলেন। মনে মনে নানারূপ কল্পনা-জল্পনা করিতে লাগিলেন। অনেক পুরুষ ও স্ত্রী অনুচর নিযুক্ত করিয়াও তিনি মীরার সম্বন্ধে কিছুই স্থির করিতে সক্ষম হইলেন না।

একদিন নিশিশেষে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, মীরা হরিগুণ গান করিতে করিতে উন্মাদিনী হইয়া প্রভু গোপাললালের ক্রোড়ে অবস্থান করিলেন। গোবিন্দজী তাঁহাকে স্বপ্নে কতই আদর করিলেন, পরে রাণাকে বজ্রগম্ভীর স্বরে কহিলেন "তুমি বৃথা মীরার প্রতি সন্দেহ করিতেছ, এরূপ পরম ভক্তিমতি রমণী ত্রিভুবনে বিরল, মীরা শাপভ্রষ্টা গোপী, কৃষ্ণপ্রেম শিখাইবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে। অমূলক সন্দেহ দূর করিয়া তাহার সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ কর। তোমার কল্যাণ হইবে। তুমি তাহাকে পত্নীরূপে পাইয়া ধন্য হইয়াছ। তোমার কুল তাহার পাদস্পর্শে উদ্ধার হইয়াছে।"

নিদ্রা ভঙ্গ হইলে মহারাণা সানন্দে মীরাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মীরা নিকটে আসিলে কুম্ভ স্বপ্নে যাহাকিছু দেখিয়াছিলেন সমস্তই তাহাকে বলিলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে মীরার চরিত্রে সন্দেহ করিয়াছিলেন সেইজন্য দুঃখিত হইয়া ক্ষমা চাহিলেন। তিনি আরও কহিলেন "মীরা, আমি তোমার সমুদয় বাসনা পূর্ণ করিব।"

সেই অবধি মীরা অবাধে অহোরাত্র বৈষ্ণবগণের সহিত যোগদান করিয়া সানন্দে হরিপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া গোবিন্দজীউর মন্দিরে সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। বহুদেশ দেশান্তর হইতে বিভিন্ন

সম্প্রদায়ের লোক ছদ্মবেশে চিতোর রাজ-প্রাসাদের মন্দিরে উপনীত মীরার কাঁচা সোণার ন্যায় গৌরবর্ণ কান্তি সন্দর্শন ও কিন্নর কণ্ঠে অপূর্ব্ব প্রেম সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং তাহাকে কোনও দেববালা জ্ঞানে ভক্তি করিতে লাগিলেন। মীরা সমস্ত ভক্তগণকে স্বহস্তে সম্বর্দ্ধনা করিতেন। তিনি সকলকে স্বহস্তে প্রসাদ ভোজন করাইয়া অবশেষে নিজে কিঞ্চিৎ পারণ করিতেন।

এদিকে রাণা কুম্ভ মীরাকে লইয়া সুখী হইতে পারিলেন না জানিয়া, দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় আলোয়ারের রাজ-কুমারীর সহিত মন্দর রাজ-কুমারের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। রাণা কুম্ভ বিবাহ রজনীতে আলোয়ার রাজ-কুমারীকে বরণ করিয়া আনিয়া তাহাকে বিবাহ করিলেন। কিন্তু ঐ কন্যা মন্দর রাজ-কুমারের প্রতি আসক্ত ছিলেন সেইজন্য কুম্ভকে তিনি ভালবাসিতে পারিলেন না। বলপূর্ব্বক প্রণয় অসম্ভব।

একদিন মন্দর রাজ-কুমার ছদ্মবেশে মীরার নিকট গোবিন্দ জীউর মন্দিরে আসিলেন। মীরা সমস্ত বৈষ্ণবদের প্রসাদ ভোজন করিলেন কিন্তু নবীন বৈষ্ণব কিছুই খাইলেন না। মীরার বারম্বার অনুরোধে রাজ-কুমার কহিলেন "মহারাণী! আমার একটী প্রার্থনা আছে নির্জ্জনে কহিব এইরূপ বাসনা"। উদার স্বভাবা মীরা অগত্যা সম্মত হইলেন। মন্দর রাজ-কুমার নিজের পরিচয় দিয়া মীরাকে কহিলেন "আমি আলয়ারের রাজ-কুমারীর প্রেমাসক্ত আপনি যদি দয়া করিয়া একবার জন্মের মত আমার সহিত তাহার সাক্ষাৎ করাইয়া দেন তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হইব।"

মীরা কহিলেন "মন্দর রাজ-কুমার, চতুর্দ্দিকে সমগ্র প্রহরীগণ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে আপনার প্রাণ সংশয় হইতে পারে অতএব নিরস্ত হউন। রাজ-কুমার তাহা শুনিলেন না, কহিলেন "মহারাণী! মরিতে ভয় পাই না কেবল মাত্র একবার জন্মের মত আমার প্রণয়িণীকে দেখিয়া মরিতে ইচ্ছা করি।"

মীরা অবশেষে আলবনের মধ্যস্থ একটী গুপ্তদ্বার উন্মোচন করিয়া

দিলেন, মন্দর রাজ-কুমার আলয়ার রাজ কুমারীর শয়ন গৃহের সমীপবর্ত্তি হইলে রাণা কুম্ভ বাতায়ন পথ হইতে বজ্রগম্ভীর স্বরে কহিলেন "মন্দর রাজকুমার! আলবনে প্রবেশ করিলেও আলয়ার রাজকুমারীর সাক্ষাৎ পাইবে না। হঠাৎ এই কথা শুনিয়া মন্দর রাজকুমার বাত্যাহত কদলীর ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। রাণা কুম্ভ ক্রোধ প্রজ্জ্বলিত হইয়া তৎক্ষণাৎ মীরার নিকট আগমন করিয়া কহিলেন "আলবনের গুপ্ত দ্বার নিশ্চয় তুমিই খুলিয়া দিয়াছ।"

মীরা অকপট চিত্তে মুক্তকণ্ঠে কহিলেন "মহারাজ, হাঁ আমিই ঐ দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছি" রাজা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন।

মীরা করোজোড়ে কহিলেন "মহারাজ! বলপূর্ব্বক প্রণয় লাভ করা সম্ভব নয়, পর-মত্ত-চিত্ত মহিলাকে রাজ প্রসাদে রুদ্ধ করিয়া আপনি সুখী হইতে পারিবেন না।"

এরূপ সগর্ব্বে নির্ভীক অন্তঃকরণে মীরা উত্তর করিলেন যে রাণা কুম্ভ ইহা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

কুম্ভ কিঞ্চিৎ ক্রোধ সম্বরণ করিয়া মীরাকে কহিলেন "মীরা, তুমি জান এরূপ বীর পুরুষকে অন্তঃপুরের গুপ্ত দ্বার খুলিয়া দিলে কি শাস্তি পাইতে হয়?"

মীরা স্থির ধীর শান্তচিত্তে উত্তর করিলেন 'মহারাণা! মন্দর রাজ-কুমারকে অত্যন্ত কাতর দেখিয়া এরূপ অন্যায় কার্য্য করিয়াছি অপ-রাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। দাসী শাস্তি গ্রহণেও কাতর নহে জানিবেন। কিন্তু পুণ্যভূমি বীরপ্রসূ চিতোরের অকলঙ্ক যশোরাশি কলুষিত হইবে, ইহা আমি জীবিত থাকিতে হইতে দিব না।

রাণা কুম্ভ ক্রোধে অধীর হইয়া কহিলেন "মীরা, তোমায় কিছুই বলি না তাই তোমার এত স্পর্দ্ধা বাড়িয়াছে, তুমি আমাকেও মানিতে চাহ না। তুমি চিতোরের মহারাণী হইয়া লজ্জাশীলতা বিসর্জ্জন দিয়া সাধারণ প্রজাবৃন্দের সহিত মিলিত হইয়া কীর্ত্তন করিতে চাহিলে তোমার সে প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছি। রাজ অন্তঃপুরে গোবিন্দজিউর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছি। কিন্তু তুমি আমার শত্রু মন্দর

রাজ কুমারের সহিত গোপনে নিভৃত অন্ধকারে অঙ্গ ঢালিয়া চিতোরের রাজার আশ্রিতা মহিলাকে বাহির করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া 'কি অন্যায় ও বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য করিয়াছ। একবার ভাবিয়া দেখিলে না পরিণামে কি হইবে। তুমি কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী হইয়া থাক মন্দিরে অবস্থান করিয়া হরিগুণ গান কর। এ তোমার কিরূপ কৃষ্ণভক্তি আমি বুঝিতে পারি না। আর আমি তোমায় দয়া বা ক্ষমা করিব না, তুমি অবিলম্বে আমার সম্মুখ হইতে দূর হইয়া যাও। চিতোর পরিত্যাগ করিয়া যথা ইচ্ছা চলিয়া যাইতে পার আমার কোনও আপত্তি নাই। ভক্তির ভাণ করিয়া কলঙ্কের প্রশ্রয় দিতে পারি না। আমার চিত্ত অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছে এ কার্য্য ক্ষমার অযোগ্য। এখনই দূর হও নচেৎ বিলম্বে মমতার বশবর্ত্তী হইয়া ক্ষমা করিয়া কালসাপিনীকে পুনরায় রাজ ভবনে আশ্রয় দিতে পারি। তোমার সৌন্দর্য্যে, রূপে, গুণে বা ভক্তিতে আর আমি মুগ্ধ নহি।"

আর কোনও উপায় নাই ভাবিয়া মীঁরা ধীরে ধীরে অবনত মস্তকে প্রসন্ন মনে স্বামীকে প্রণাম করিয়া তথা হইতে বিদায় লইলেন। নিস্তব্ধ গভীর নিশীথে কর্ত্তব্য পরায়ণা ভক্তিমতি মীরা প্রভু "রঙ্গোড়জীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া ভক্তি গদগদচিত্তে কহিলেন "হে প্রভো! তুমি যেথা নিয়ে যাবে যাইব তথায় জীবন তরী বাহিয়া" মীরা কি করিবেন ঠিক করিতে পারিতেছেন না, একবার ভাবিলেন একাকিনী স্ত্রীলোক কোথায় যাইব কিন্তু পরমুহূর্ত্তে মনে বল আসিল ভাবিলেন সে কি প্রভু যাঁর অন্তরে বিরাজ করিতেছেন তাঁর আর ভাবনা কি। পুনরায় মন্দিরে গিয়া বারম্বার গোপালকে প্রণাম করিয়া কহিলেন "প্রভু তুমি আমার অন্তরে থাক, বাহিরের সেবায় তুমি আর সন্তুষ্ট নয় দেখিতেছি প্রেমময় তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।" এইরূপে ধীর পদবিক্ষেপে পুণ্যবতী সাধ্বী মীরা প্রভুর নাম লইয়া চিতোর ছাড়িয়া গভীর অন্ধকার রজনীতে কোথায় গেলেন তাহা কেহ জানিল না। চিতোর কুললক্ষ্মী এইরূপে অপমানিত হইয়া বিদায় হইলেন। দুর্ব্বুদ্ধিবলে সাধ্বী-সতী মীরাকে তাড়াইয়া রাণা ক্রমেই অসুখী হইতে লাগিলেন। প্রজাগণ এই সংবাদে মর্ম্মাহত

হইলেন এবং রাণার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য সকলেই তাঁহাকে ধিক্কার দিতে লাগিল। অনেকে চিতোর ছাড়িয়া মীরার অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। মীরা চলিয়া গেলে রাজপুরী অন্ধকার হইল। আর সে আনন্দস্রোত নাই। আর সে প্রাণ মাতান কোকিল-কণ্ঠে মধুর হরিনাম কেহ শ্রবণ করিতে পান না। গোবিন্দ মন্দিরের সে অবিরাম আনন্দ-স্রোত কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। মন্দির প্রায় নির্জ্জন নিস্তব্ধ মনুষ্য সমাগম শূন্য হইয়া উঠিল। মন্দিরে আর কেহ প্রবেশ করিতে সাহসী হয় না। যদি কেহ ভ্রমক্রমে মন্দির-প্রাঙ্গনে আইসে তখনই বিষন্ন মনে ফিরিয়া যায়—সকলেই ভাবে আহা সেই প্রেমময়ী মীরা এখন কোথায়? সেই দেববালা হঠাৎ চকিতের ন্যায় দুদিনের জন্য আসিয়া কোথায় অন্তর্দ্ধান হইলেন কে বলিতে পারে। এইরূপে রাজপুরী নিরানন্দময় হইয়া উঠিল। সমস্ত আনন্দ এককালে রুদ্ধ হইল। রাণা রাহুগ্রস্ত সূর্য্যের ন্যায় দিন দিন হীনপ্রভ হইয়া অতি কষ্টে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

এদিকে মীরা চিতোর ছাড়িয়া রাজ-পুতনার নানা স্থানে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পাদস্পর্শে রাজপুতানার সকল স্থানই পবিত্র হইল। সকলেই কি যেন এক পবিত্র স্বর্গীয় ভাবে বিভোর হইয়া আনন্দ-স্রোতে ভাসিতে লাগিল। তাঁহার বেণু বিনিন্দিত কলকণ্ঠের অপূর্ব্ব স্বর্গীয় সঙ্গীতে সুধাবর্ষন হইতে লাগিল। মীরা এখন আর পরাধীনা নহেন—স্বাধীন মুক্ত কণ্ঠে হরিনাম গান করিয়া সকলকে ভক্তিরসে ডুবাইতে লাগিলেন। তাঁহার প্রেমের হিল্লোলে রাজপুতানা টলমল করিতে লাগিল। সেই সুধামাখা হরিনাম শ্রবণে সকলেই আনন্দাশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র নরনারী তাঁহার অনুপম ভুবন-মোহিনীরূপ ও অপূর্ব্ব নাম সঙ্কীর্ত্তনের মত্ততা দর্শনে তাঁহাকে শাপভ্রষ্টা দেবী জ্ঞান করিতে লাগিল।

ক্রমে এ সংবাদ রাণা কুম্ভের কর্ণগোচর হইল, তিনি তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। যিনি নাম সুধায় সমগ্র রাজপুতানাবাসীকে মাতাইয়া তুলিয়াছেন তিনি রাণা কুম্ভকে মুগ্ধ করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? রাণা যারপর নাই অনুতপ্ত হইলেন। রাজগৃহে নিরানন্দ

তাঁহার আর সহ্য হইল না। পুনরায় নিশীথে স্বপ্ন দেখিলেন যে স্বয়ং বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণ মীরাকে অঙ্গে ধারণ করিয়া মুখ-চুম্বন করিতেছেন। রাণা ইহা দেখিয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছেন। পরে নন্দ-নন্দন রাণাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "কুম্ভ! তুমি তোমার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য কষ্ট পাইতেছ, যদি মঙ্গল চাও পুনরায় অভিমানশূন্যা মীরাকে ব্রাহ্মণগণের দ্বারা লইয়া আইস"। পরদিন রাণা সানন্দে ব্রাহ্মণগণকে দূতরূপে প্রেরণ করিলেন। পরম বৈষ্ণবী মীরা পুনরায় অসঙ্কোচে রাজ-ভবনে রাণা কুম্ভের সমীপে উপস্থিত হইলেন।

মীরা চিতোরের তোরণ দ্বারে পৌঁছিলে রাণা আনন্দে অধীর হইয়া তাঁহাকে সসম্ভ্রমে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। রাজ-অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া কুম্ভ মীরার নিকট বারম্বার ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। মীরা পতিপদতলে পড়িয়া কহিলেন "মহারাণা, আজ আপনার চির-অনুগত দাসীকে অপরাধী করিবেন না। আপনি প্রভু আপনার যেরূপ ইচ্ছা করিতে পারেন, আমার বাধা দিবার কিছুই নাই। আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

কুম্ভ রাণা কহিলেন "মীরা, অদ্য হইতে চিতোরের রাজ-পথে, যথা ইচ্ছা সর্ব্বসাধারণের সহিত যোগদান করিয়া আনন্দে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন কর আর তোমায় কোন বাধা দিব না"।

ইতিপূর্ব্বে মীরা সর্ব্বসাধারণের সহিত যোগদান করিয়া হরি-সঙ্কীর্ত্তন করিতে পারিতেন না—কেবল বৈষ্ণবগণের সহিত নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে অনুমতি পাইয়াছিলেন। মীরার অনিন্দ্য-সুন্দর রূপ-লাবণ্য ও অপূর্ব্ব স্বর-লহরী শ্রবণ করিবার জন্য অনেকেই ঘনঘন আগমন করিয়া নিজেকে কৃতার্থলাভ করিতে লাগিল।

চিতোরের রাজ-পথে প্রকাশ্যভাবে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন হইতেছে দেখিয়া দেশ দেশান্তর হইতে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সমবেত হইয়া সঙ্গীত শুনিতে আসিলেন। নিত্যই মীরার অলৌকিক সঙ্গীত-সুধা পান করিবার জন্য জনস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। সর্ব্বজাতীয় সর্ব্ব-সাধারণ কৌতূহলক্রান্ত হইয়া দিবা-রাত্র হরিনাম সুধা পান করিয়া

আনন্দে বিভোর হইলেন। লোকে আহার নিদ্রা বিলাস সুখ দুঃখ সকল ভুলিয়া অবিরামগতিতে আনন্দ-স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিলেন। ভক্তিমতী কৃষ্ণ-প্রেমানুরাগিনী মীরার পাদস্পর্শে পুনরায় চিতোর অপূর্ব্বশ্রী ধারণ করিল—আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা দলে দলে সমবেত হইয়া মীরার সহিত যোগদান করিয়া নিজের নিজের গৃহকার্য্য প্রভৃতি সমস্ত ভুলিয়া গিয়া নিশি-দিন হরিপ্রেমে ভাসিতে লাগিলেন। এইরূপে বীর প্রসবিনী পুণ্যভূমী চিতোরে, কৃষ্ণপ্রেম-উন্মাদিনী মীরার মধুমাখা হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে পুনরায় প্রেম ভক্তি ও আনন্দের বন্যা বহিতে লাগিল। মীরাও নিজেকে এককালে ভুলিয়া গিয়া নাম-সুধায় আত্ম-বিস্মৃত হইয়া পড়িলেন।

কথিত আছে এই সময় কোনও রাজা, সন্ন্যাসী বেশে সুন্দরী মীরার রূপমাধুরী দেখিয়া ও মনমুগ্ধকর অভূতপূর্ব্ব স্বরলহরীতে হরিনাম গান শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া বহুমূল্য মুক্তামালা মীরাকে দিতে আসিয়াছিলেন। কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী মীরা মুক্তামালা লইয়া কি করিবেন, কাজেই তিনি উহা লইতে অসম্মত হইলেন। শেষে ঐ সন্ন্যাসী গোবিন্দজিউর কণ্ঠে ঐ মালা পরাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন। মীরা সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি সন্ন্যাসী হইয়া এরূপ মূল্যবান মালা কোথায় পাইলেন? ছদ্মবেশী রাজা উত্তর করিলেন "মহারাণি, আমি যমুনাতে স্নান করিবার কালে উহা কুড়াইয়া পাইয়াছি এবং শ্রীশ্রীগোবিন্দজিউর জন্য সযত্নে রাখিয়া দিয়াছিলাম। "মীরা সন্তুষ্ট হইয়া ঐ মালা তাঁহার ইষ্টদেব গোপালের কণ্ঠে পরাইয়া আনন্দিত হইলেন। *

* ইতিহাস অনভিজ্ঞ জীবনী লেখকগণ মীরার সম্বন্ধে নানা অসত্য অবাস্তব ঘটনা লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা ভ্রমক্রমে লিখিয়াছেন যে সম্রাট আকবর তানসেনকে লইয়া মীরার সঙ্গীত শুনিতে আসিয়াছিলেন। আকবর মীরার রূপগুণে মুগ্ধ হইয়া দশ লক্ষ টাকার মুক্তামালা প্রদান করেন। রাণা কুম্ভ ইহা জানিতে পারিয়া দুশ্চরিত্রা বোধে মীরাকে তরবারির আঘাতে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন ও বিষ প্রয়োগ দ্বারা অশেষ প্রকার নির্য্যাতন করিয়াছিলেন! আকবর ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে এবং মীরাবাই ১৪২০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। অতএব কি প্রকারে তিনি মীরার সঙ্গীত শুনিতে আসিলেন। নিশ্চয় অপর কোনও রাজা হইবে।

উক্ত ঘটনা অতিরঞ্জিত হইয়া রাণা কুম্ভের কর্ণগোচর হইল। কুম্ভ রাণা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মুক্তামালা দর্শন করিতে আসিলেন। জহুরীগণ মুক্তামালা দেখিয়া উহার মূল্য দশ লক্ষ মুদ্রা নির্দ্ধারণ করিল। কেহ কেহ বলিল ঐ উদাসীন সন্ন্যাসী স্বহস্তে মীরার কণ্ঠে মুক্তমালা পরাইয়া দিয়াছেন। এই সব ব্যাপারে রাজার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। তিনি মীরাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না—নিজ মনে মনে ভাবিলেন, শুধু গান শুনিয়া কেহ কখনও দশ লক্ষ মুদ্রার মুক্তামালা দিতে পারে না—মীরার রূপগুণে মুগ্ধ হইয়া নিশ্চয় তাহাকে প্রলোভিত করিয়াছে। দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ রাজা সরলা মীরার সতীত্ব সম্বন্ধে সন্দীহান হইতে কুণ্ঠিত হইলেন না। "আত্মবৎ মন্যতে জগৎ" তিনি একবার বিবেচনা করিয়া দেখিলেন না যে, রাজরাণী হইয়াও যিনি স্বেচ্ছায় পথের ভিখারিণী সাজিয়া হরিপ্রেমে উন্মাদিনী হইয়াছেন, চিতোরের মণিমাণিক্য ভূষিত রত্ন-সিংহাসন যিনি হেলায় পদাঘাত করিয়াছেন, রাজভবনের ভোগবিলাস যাহার কাছে অতি তুচ্ছ, তিনি কি প্রকারে সামান্য এক ছড়া মুক্তার মালার লোভে অমূল্য স্বর্গীয় সম্পদ সতীত্বরত্ন বিক্রয় করিতে পারেন।

হরিপ্রেম উন্মাদিনী মীরাকে কি করিয়াই বা রাজা বুঝিতে পারিবেন। শ্রীভগবানের বিশেষ কৃপা ভিন্ন তাঁর লীলা-সহচরী গোপীগণকে বুঝা অসম্ভব। যদিও তিনি ইতিপূর্ব্বে দুইবার স্বপ্ন দেখিয়া বুঝিয়া ছিলেন যে মীরা সামান্যা রমণী নহেন এবং সেই কারণেই তিনি মীরাকে অবাধে সকলের সহিত সঙ্কীর্ত্তন করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন, তথাপি তিনি পুনরায় নির্ব্বুদ্ধিতা প্রযুক্ত সন্দেহ দূর করিতে সক্ষম হইলেন না। দিবানিশি তিনি অসংখ্য বৃশ্চিক দংশন জ্বালা অনুভব করিতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি মীরার নাম এমন কি মীরার স্মৃতি পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারিলেন না। কিরূপ শাস্তি মীরার উপযুক্ত তাহা তিনি নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেন না। একবার স্থির করিলেন যে তিনি

ভক্তমাল গ্রন্থে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, সম্রাট আকবর সঙ্গীতাচার্য্য তানসেনকে সঙ্গে লইয়া মীরার গান শুনিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা সত্য নহে।

মীরাকে চিতোর হইতে চিরতরে নির্ব্বাসিত করিবেন, কিন্তু পরক্ষণেই বুঝিলেন যে তাহা হইলে পূর্ব্ববৎ প্রজাগণ তাহার অনুগমন করিবে। এইরূপ দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। কুম্ভ কি শাস্তি দিবেন স্থির করিতে না পারিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। ঐ সময়ে বৈষ্ণবগণ রাজপথে মীরার ভনিতা গাহিতে লাগিল—তাহার শেষ চরণ "মীরা কহে বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা"। ক্রমে রাজা ভাবিলেন যে জনসাধারণ তাঁহাকে স্ত্রৈন ভাবিতেছে তিনি আরও মনে করিলেন যে জনসাধারণ সকলেই তাঁহার ন্যায় মীরার রূপগুণে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। এই সমস্ত মিথ্যা ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া মূঢ় রাণা মীরার প্রাণ নাশে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। প্রতিদিনই মীরার স্মৃতি তাঁহাকে অধিকতর কাতর করিয়া ফেলিল। তিনি জানিতেন যে ভক্তিমতী বৈষ্ণবী মীরা তাঁহার আজ্ঞা অম্লান বদনে অক্ষরে অক্ষরে পালন করিবেন। নির্ব্বোধ রাজা কিছুতেই বুঝিলেন না যে যাঁর মন প্রাণ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণে গত হইয়াছে তাঁহাকে কি প্রকারে বিনাশ করিবেন। ব্রজবালক শ্রীভগবান যে, মীরার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন এ কথা বিকৃতচিত্ত রাণা কিরূপেই বা জানিতে পারিবেন ? (ক্রমশঃ)

প্রচারশীল হিন্দুধর্ম্ম। *

(ভগ্নী নিবেদিতা)

সমষ্টিগত জাতীয় জীবন ধারার অনুসরণ করিয়াই ব্যষ্টি মানব পরিপুষ্ট ও বিকশিত হইয়া উঠে, নবযুগের মানব প্রকৃতির এই সার্ব্বজনীন অমূল্য সত্যটী ফরাসি বিপ্লবের সময় প্রথম আবিষ্কৃত হয়। প্রত্যেক নরনারী প্রকৃত শিক্ষা সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে প্রাপ্ত হইলে তাহার জাতীয় ইতিহাসের অথবা সমগ্র মনুষ্যত্বের আদর্শরূপে গড়িয়া উঠে। পাশ্চাত্যদেশে বিংশ শতাব্দীর গুরু ও শিক্ষাদাতা ঋষিকল্প পেষ্টালজির (Pestalozzi) চেষ্টায় এই মহান অনুভূতি অভিনব শিক্ষাপ্রণালীর অন্যতম সুনিশ্চিত উপাদান-রূপে পরিগৃহীত হইয়াছে। পেষ্টালজি দেখিয়াছিলেন, জনসাধারণকে উন্নত করিতে হইলে আধুনিক ভাবানুযায়ী শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তন করিতে হইবে, যাহা উদার, মনবিজ্ঞানসম্মত এবং মানব-জীবনের ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির সহিত দৃঢ়সম্বদ্ধ।

ফরাসী বিপ্লবের অব্যবহিত পরে জনসাধারণের প্রতিনিধি স্থানীয় তরুণ ছাত্র মানবপ্রেমিক পেষ্টালজীকে সুইজারলণ্ডে যে সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, স্বদেশ ও স্বজাতি প্রেমিক ভারতসন্তান বর্ত্তমানে যে সমস্যার দ্বারা আলোড়িত হইতেছেন, তাহার সহিত তুলনায় পূর্ব্বোক্ত সমস্যা অকিঞ্চিৎকর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু তথাপি মূলতঃ এতদুভয়ের মধ্যে গভীর ঐক্য আছে। উপর উপর ভাসা ভাসা শিক্ষার দোষগুলি পরিহার করিয়া জনসাধারণের মস্তিষ্ক নূতন ভাব গ্রহণের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিবার অন্তরায়গুলি উভয়ক্ষেত্রেই সমভাবে বিদ্যমান। যে ক্ষেত্রে আম্র ইত্যাদি সুমিষ্ট ও মূল্যবান ফল উৎপন্ন হইয়া আসিতেছে, তাহা তরিতরকারীর বাগানে পরিবর্ত্তিত করা উচিত নহে। সেইরূপ বেদ ও জ্ঞানযোগের জন্মভূমি অবনতি প্রাপ্ত হইয়া

---

* শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার কর্ত্তৃক ইংরাজী Aggressive Hinduism হইতে অনূদিত।

কেবলমাত্র ইউরোপীয় সাহিত্যিকগণের অন্ধ-অনুকারক এবং সমালোচক-রূপে পর্য্যবসিত হইবে ইহা একান্ত অসঙ্গত।

কিন্তু ভারতীয় শিক্ষাপ্রণালীর ইহাই বর্ত্তমান অবস্থা, এবং মনে হয়, যে পর্য্যন্ত না ভারতীয় মন জাতীয় ইতিহাসের দিক দিয়া সংযত-দৃঢ়তায় সুশৃঙ্খলভাবে শিক্ষিত না হইয়া উঠিতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত অবস্থা এইরূপই থাকিবে। ইহা যেন কতকটা কোন ব্যক্তিকে অভিনব কার্য্যক্ষেত্রে লইয়া যাওয়ার মত। যে সমস্ত ভাবনিচয় এতদিন ভারতীয় মনে সুপ্ত অবস্থায় ছিল, তাহা এক মুহূর্ত্তেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে। যাহা লক্ষ্যহীন সহজাত সংস্কারের ন্যায় এতকাল অজ্ঞাতসারে পরিচালিত হইতেছিল তাহা সহসা লক্ষ্যকে সুনিশ্চিতরূপে নির্ব্বাচন করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইবে। মুসলমান ধর্ম্মের ন্যায় হিন্দুধর্ম্মেও সামাজিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শগুলির পার্থক্য নির্ণয় করা এতদিন দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। অবশ্য দার্শনিক ভাবে বিচার করিতে গেলে দেখা যায়, একজন অনভিজ্ঞ শিক্ষার্থীও ঐ উভয় শ্রেণীর আদর্শগুলি সম্পূর্ণ পৃথকভাবে অনুষ্ঠান করিতে পারে, কিন্তু তথাপি উহারা স্বরূপতঃ এক এবং পরস্পরকে পৃথক করা যাইতে পারে না। সেই জন্যই আমরা মনে করিতাম আহারের বিশেষ প্রণালী, নির্দ্দিষ্ট বস্ত্রাদি পরিধান এবং পবিত্রতা লাভের জন্য এক নির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠান গুলির আচরণ ধর্ম্মবিধিসঙ্গত। সহসা বর্ত্তমান বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া তুলনামূলক বিচার, বিরোধ ও প্রতিভাসিক সত্যের আলোক সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। আমরা বুঝিলাম, কতকগুলি আচার প্রতিপালন করিয়া আমরা ধর্ম্মজীবনের বিশেষ যোগ্যতা লাভ করিতেছি না; কেবল কোন প্রকারে সর্ব্বোচ্চ পবিত্রতা লাভের আদর্শের সমীপবর্ত্তী হইয়া রহিয়াছি মাত্র। শুদ্ধাচার, পবিত্রতা প্রভৃতি মানব জীবনের উন্নততর কামনাগুলি আমাদের আচার প্রণালী সহায়ে যেমন লাভ করা যাইতে পারে, তদ্রূপ অন্যান্য ধর্ম্মসমাজের আচার প্রণালী পালন করিয়াও লাভ করা যাইতে পারে। এইরূপে লক্ষ্যকে সুস্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া, আমরা বিবিধ প্রকার উপায় সমূহ তুলনা ও বিশ্লেষণ করিতে সমর্থ হই-য়াছি এবং আমাদের আচার প্রণালীর দোষগুলি পরিহার এবং অন্যান্য

সমাজের সদাচারগুলি গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছি। সর্ব্বোপরি সামাজিক আদর্শের সহিত ধর্ম্মের পার্থক্য নির্ব্বাচন করিবার সুনিশ্চিত প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছি। এই সমস্ত কারণগুলির জন্যই "প্রচারশীল হিন্দুধর্ম্মের" বিষয় আলোচনা করা সম্ভব হইয়াছে সন্দেহ নাই।

সদাজাগ্রত সংগ্রাম সহায়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার উন্মুখ আগ্রহ" বিদ্যালয়ের কক্ষ হইতেই ভারতবাসীর চরিত্রের একটী প্রধান লক্ষণ হউক! বীরের মত প্রতিষ্ঠা ও প্রসারতা লাভ করিবার আদর্শ ও চিন্তা চাই। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের পরিবর্ত্তে প্রবল কর্ম্মশীলতা, দৌর্ব্বল্যের পরিবর্ত্তে শক্তির চর্চ্চা, ক্রমশঃ পরাজিত আত্ম রক্ষার পরিবর্ত্তে—বিজয়োন্মুখ সৈন্য দলের উল্লাস মুখরিত গর্ব্বিত পদক্ষেপে অগ্রগমন। কেবলমাত্র মানসিক অবস্থার এইরূপ পরিবর্ত্তন ও পদক্ষেপে একটা বিদ্রোহকে সফল করিয়া তোলার মত। এইরূপ কতকগুলি পরিবর্ত্তনের প্রারম্ভ দ্বাদশ বর্ষের মধ্যেই আমাদের মধ্যে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

কিন্তু প্রথম সোপানে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে মূল সত্যগুলি সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। প্রত্যেক ধর্ম্ম-প্রণালীরই উদ্দেশ্য চরিত্র গঠন করিয়া তোলা। ব্যক্তিগত অভ্যাসগুলিকে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া চরিত্র-গঠন করিয়া তোলাই স্মৃতির অনুশাসনের মুখ্য উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ চরিত্র-সৃষ্টিই উহার মূল লক্ষ্য—অভ্যাসের ক্রীতদাস গড়িয়া তোলা নহে। ভারতের সর্ব্বত্র বিরাজিত সদাচার অপেক্ষাও তাহার জাতীয় জীবনের আদর্শ যে হিন্দুধর্ম্মের এক গৌরবময় ফল, তৎসম্বন্ধে কোন মতদ্বৈধ নাই। ইহা সত্য যে পৃথিবীতে ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ, যেখানে সামাজিক আভিজাত্যে একজন কপর্দ্দকহীন ভিক্ষুক, অনেক রাজা অপেক্ষাও উচ্চে অধিষ্ঠিত। কিন্তু সেই রাজা একজন "জনক" এবং সেই ভিক্ষুক একজন "শুকদেব" হইতে পারেন, ইহা তদপেক্ষাও মহিমান্বিত ঘটনা।

এক্ষণে তুলনামূলক পর্য্যবেক্ষণ সহকারে দেখা যাউক চরিত্রের বিকাশের পথে সাহায্যকারিরূপে অভ্যাসের মূল্য কতদূর। আমরা ভারতবর্ষে দেখিতে পাই, সমাজ প্রত্যেক মানবকেই আজীবন নিপুনভাবে লক্ষ্য

করে, স্নান, আহার, প্রার্থনা, তীর্থ-ভ্রমণ ইত্যাদির নির্দ্দিষ্ট সময় ও প্রণালী সম্বন্ধে সমালোচনা করে; বোধ হয় কেশ বিন্যাস বা কেশ রক্ষা করিবার বিশেষ প্রণালীর ব্যক্তিত্রয়ের উপর কটাক্ষপাত করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। বিবাহ বা শিক্ষা ইত্যাদি সামাজিক নিয়মের কোন প্রকার গুরুতর সংস্কার চেষ্টায় জন-মত যেন বিচলিত হইয়া উঠে। সাধারণের দৃষ্টিতে উহা কেবলমাত্র স্বার্থপরতা নহে, পরন্তু ঘোরতর অধর্ম্ম। এই প্রকার সমালোচনার দৌরাত্ম্যে পল্লী ক্রমে জনশূন্য হইয়া নগরগুলি জনবহুল করিয়া তুলিতেছে। যে ক্ষুদ্রায়তন সমাজে স্বীয় প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতে ইচ্ছুক সে বৃহত্তর মানব-সমাজে আসিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাকে ঔদ্ধত্য বলিয়া মনে করে। এইরূপে জনাকীর্ণ নাগরিক জীবনের দৌর্ব্বল্য ও কলঙ্করাশি ক্রমশঃ পুঞ্জীভূত হইতে থাকে। এই প্রকার দুর্ব্বল ও বিকৃত সিদ্ধান্তের প্রভাবই সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত।

এক্ষণে আদর্শকে কর্ম্মজীবনে পরিণত করিবার জন্য সচেষ্ট উদ্যমশীল কোন সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাউক। ভারতবর্ষ যেমন প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবনে একটা আদর্শ চাহে এখানেও তদ্রূপ আত্মোৎকর্ষ সাধনার বিশেষ আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান। জনমত কেবলমাত্র প্রত্যেক সংস্কার চেষ্টাকে বিনষ্ট করিতেই পারে কিন্তু ধৈর্য্য সহকারে কোন বিষয় বিচার করিতে পারে না। জনমতকে অগ্রাহ্য করিয়া মনুষ্যত্ব বিকাশের প্রণালী শৈশব জীবনে জননীকুলই শিক্ষা দিবেন। এইরূপ শিক্ষার মধ্যদিয়া বৰ্দ্ধিত বীর সহসা জনমতের সম্মুখে মস্তক অবনত করিবে না; আদর্শকে দৃঢ়তার সহিত অনুসরণ করিবে। যদি সেই ব্যক্তি উন্নততর আদর্শকে পরিহার করিয়া জনমতের অনুকূল পন্থা গ্রহণ করে তাহা হইলে সেই গতানুগতিক ব্যক্তির অস্তিত্ব সমাজ শীঘ্রই বিস্মৃত হয়; এবং ইহাই তাহার সর্ব্বোচ্চ শাস্তি। যে শক্তি সহায়ে সে আত্মোৎকর্ষ সাধনে সক্ষম হইত তথাকথিত সমাজের অন্যান্য কার্য্যে সেই শক্তি নিয়োগ করিয়া নিষ্ফলে অপব্যয় করে। কারণ বর্ত্তমানে আমরা শিক্ষাদান প্রণালীর এক অভিনব আদর্শরাজি দেখিতে

পাইতেছি। পাশ্চাত্য জগতে শিশু মাতৃক্রোড় পরিহার করিবা মাত্র তদ্দেশীয় শিক্ষক ও অভিভাবকবর্গ তাহাকে শান্ত নিরীহ, পরমুখাপেক্ষী এবং একান্ত বাধ্যরূপে গড়িয়া তুলিবার জন্য চেষ্টা করেন না বরং তাহার মধ্যে বীর্য্য, উদ্ভাবনী শক্তি, দায়িত্ববোধ, এবং বিদ্রোহ করিবার মত শক্তি জাগ্রত করিয়া তুলিতে তৎপর হন। রুচির স্বাতন্ত্র্য ও নিরপেক্ষ ইচ্ছাশক্তি, পাশ্চাত্য শিক্ষকগণের মতে শিশুজীবনের অমূল্য সম্পদ, যাহা কোন প্রকারেই ধ্বংস বা বিনষ্ট করা উচিত নহে। কেবল মাত্র তাহা সাধারণের কল্যাণকর কার্য্যে নিয়োগ করিবার উপযোগী করিয়া সুনিয়ন্ত্রিত করাই বাঞ্ছনীয়। সেই জন্যই তদ্দেশে বালকগণকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার উৎসাহ প্রদান করা হয়; পরস্পরের সহিত আপোষে এইরূপ হাতাহাতি তথায় নির্দ্দোষ ক্রীড়া বলিয়া গণ্য। তাঁহারা মনে করেন শারীরিক ক্লেশ বা দুঃখজনক কার্য্য হইতে শিশুকে বিরত করিলে তাহার আত্মবিশ্বাস ও সাহস পঙ্গু হইয়া পড়িবে। কিন্তু যদি কোন সবল বালক দুর্ব্বলের প্রতি নিষ্ঠুর ভাবে অত্যাচার করে তাহা হইলে সে বালক-সমাজে নিন্দিত ও উপহাসাস্পদ হইয়া থাকে।

অর্থাৎ এসিয়ায় যে প্রকার সামাজিক উন্নতি সাধনের চেষ্টায় শতাব্দীর পর শতাব্দী বহিয়া যায়, পাশ্চাত্য দেশে তাহা শিশুগণ দশবৎসরের মধ্যেই আয়ত্ত করিয়া বীরের মত কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। অবশ্য যদি অনেকে মনে করেন বিষ্ণুর দশ অবতার একই পূর্ণতম জীবনের বিভিন্ন প্রকার অবস্থান্তর মাত্র; তাহা হইলে ভারতবর্ষও এই শিক্ষাই প্রদান করিতেছে। কারণ মৎস, কূর্ম্ম, বরাহ এবং নৃসিংহ এই সমস্ত অবস্থার মধ্যে শিশু "বামন" বা "ক্ষুদ্র মানব" মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। তারপর তাহাকে "বুদ্ধ" হইবার পূর্ব্বে দুইবার "ক্ষত্রিয়ত্বের" অভিনয় করিতে হয়। ইহাই কি সমষ্টিগত জাতীয় জীবন ধারার অনুসরণ করিয়া ব্যষ্টি মানবের পরিপুষ্টি ও বিকাশের ইতিহাস নহে? এবং সর্ব্বশেষ অবতার মহিমান্বিত কল্কীর সম্ভাবনার মধ্যেও কি আমরা আরও উন্নততর বিকাশের ভবিষ্যদ্বাণী শুনিতে পাইতেছি

না—যাহাতে বুদ্ধত্ব আরও একবার প্রেম ও দয়ার অতলে ডুবিয়া সার্ব্বজনীন মুক্তি কামনায়, গভীর পাঞ্চজন্য নিনাদে আমাদিগকে স্বধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার কর্ম্ম-মন্ত্রে দীক্ষা প্রদান করিবেন।

আমরা হিন্দুধর্ম্মকে কেবলমাত্র কতকগুলি আচারের রক্ষকরূপে দেখিব না; হিন্দু চরিত্র গঠনের শক্তিরূপে অনুভব করিব। এই নিশ্চিত ধারণার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্নমুখী আমূল পরিবর্ত্তন চিন্তা করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। অতঃপর কোনপ্রকার সামাজিক বা আধ্যাত্মিক আদর্শের পরিবর্ত্তন আমাদের চিন্তাকে ভয় বা হিংসায় পীড়িত করিবে না। বস্তুতঃ পরিবর্ত্তনে আমরা ভীত হইব না, কারণ বর্ত্তমানে কেবলমাত্র কায়ক্লেশে আত্মরক্ষা করাই আমাদের কর্ত্তব্য নহে, পরন্তু অপরকেও কোলে টানিয়া লইতে হইবে। ক্রমে ক্রমে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইব,—কেবলমাত্র যাহা আমাদের আছে তাহা রক্ষা করিবার জন্য নহে, বরং যাহা আমাদের নাই, তাহা অর্জন করিবার জন্য। অপরে আমাদের সম্বন্ধে কি ধারণা করে তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার আবশ্যক নাই, বরং অপরকে আমরা কি ভাবে দেখিব তাহাই প্রশ্ন। আমাদের কতটুকু কি ছিল, বিচার করিবার প্রয়োজন নাই, বরং কতটুকু আমরা জাতীয় জীবনে নূতন সংযুক্ত করিতে পারিয়াছি তাহাই দেখিব। এক্ষণে আর পশ্চাৎপদ হইবার উপায় নাই, কারণ এই যুদ্ধকে আমরা ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করাইয়া লইয়া যাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছি। আমরা আর বন্দনের স্বপ্ন দেখিব না। কারণ, বন্ধন মুক্ত হইবার আগ্রহ চেষ্টাই এই যুদ্ধে জয়লাভের প্রথম সোপান।

পৃথিবীর কোন ধর্ম্মই হিন্দুধর্ম্মের মত এমন বৈদ্যুতিক রূপান্তর গ্রহণকরিতে পারে না। নাগার্জ্জুন এবং বুদ্ধঘোষ বহুকে সত্য বলিয়া মানিতেন এবং এককে অস্বীকার করিতেন। শঙ্করাচার্য্য এককেই সত্য এবং বহুকে অস্বীকার করিয়াছেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, এক এবং বহু উভয়ই বিভিন্ন অবস্থার সাধকগণ কর্ত্তৃক বিভিন্ন সময়ে অনুভূত সত্য মাত্র ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ইহার অর্থ কি আমরা চিন্তা করিব না? ইহার অর্থ—চরিত্রই আধ্যাত্মিক সম্পদ।

ইহার অর্থ, আলস্য ও পরাজয়ে সর্ব্বস্বান্ত অবস্থা বৈরাগ্য নহে। ইহার অর্থ, অপরকে রক্ষা করা, স্বীয় মুক্তিলাভাপেক্ষা শতগুণে শ্রেয়। মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে জয় করাই সর্ব্বোচ্চ মুক্তি। সর্ব্বত্র বিজয়লাভই সন্ন্যাসের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ। হিন্দুধর্ম্ম স্বমহিমায় জাগ্রত হইয়া আবার আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবে। কল্কীর আহ্বান-দুন্দুভি বাজিয়া উঠিয়াছে। আমাদিগের মধ্যে যাহা কিছু উন্নত, প্রিয়, বীর্য্যবান, ও তিতিক্ষা-সহিষ্ণু, তাহা লইয়া এমন এক যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে হইবে, যেখানে পশ্চাৎপদ হইবার জন্য ভেরীর ইঙ্গিত কখনই শ্রুতি গোচর হইবে না।

শ্রীহীন ব্রজ।

(শ্রীমণীন্দ্রনাথ ঘোষ)

১

আর কি ব্রজে বাজে না বাঁশী,
শ্রীহীন কিগো বৃন্দাবন,
গেছে কি থামি মাধবী-শাখে
আকুল অলি গুঞ্জরণ ?
কলাপী সুখে কলাপ তুলি,
নন্দ-সুত রূপেতে ভুলি,
আসে কি ছুটে তটিনী তটে,
হেরিতে শ্যাম চন্দ্রানন ?
শীকর নীরে পরশি কায়,
পরাগ রেণু মাখিয়া গায়,
সুরভি ধীর মলয়ানিল,
করে কি ব্রজে সঞ্চরণ !

২

প্রভাতে পীত বসন পরি
দোলায়ে গলে গুঞ্জাহার,
গোধন সনে বনবিহারী
ছুটে কি ব্রজ গোষ্ঠে আর ?

প্রখর রবি কিরণ রাশি
পড়ে কি কাল অঙ্গে আসি,
শ্রমজ-জলে যায় কি ভাসি,
মৃগমদেরি বিন্দু ভার ?
স্মরিয়া চাঁদবদন খানি,
বিবশা স্নেহে যশোদা রাণী,
থাকে কি চাহি সরণি পানে,
ভাবি ধরণী অন্ধকার ?

৩

পরশি শ্যাম চরণ রেণু,
শিহরে কি সে শস্পদল,
ফিরে কি শুনে মুরলী-তানে,
দুকূল প্লাবী যমুনা জল ?
মুকুলে নত মাধবী শাখে,
আরাবে পাখী বসি কি থাকে,
লেহে কি মদ ক্ষরিত মৃগ
ইন্দীবর চরণতল ?
বিসরি লাজ সরম ভয়
স্মরি সে রূপ মাধুরীময়
আসে কি ফিরি বিধুরা বধূ
গাগরী কাঁখে করিয়া ছল ?

৪

মুখরা শারী মদন গীতি,
গাহে কি এবে কুঞ্জে আর,
মঞ্জু তৃণ খায় কি গাভী
অথবা তারা অস্থি সার ?
দোহন ভুলি আহিরী প্রিয়া,
বাঁকায়ে গ্রীবা অধীরা হিয়া,

হেরিয়া মনমথন রূপ,
ফেলে না কিগো অশ্রুভার ?
সাজায়ে শেজ কমলদলে,
নিশীথে প্রিয় আসিবে বলে,
উন্মাদিনী থাকে কি গোপী
জাগিয়া নিশি পূর্ণিমার ?

৫

ফাগুনে নব হোরিতে মাতি
বিস্তারিয়া কুহকজাল,
ঈষৎ হাসি বিম্বাধরে
জড়ায়ে কেশে মালতীমাল,
অসহ সুখে আপন হারা,
ছড়ায়ে রাঙা আবির ধারা ;
করে কি এবে ব্রজ তরুণী,
শ্যামলা ধরা অশোক লাল ?
লোহিত অলি লোহিত ফুলে,
বসে কি ? লাল যমুনা কূলে
লোহিত শাখে লোহিত পিক
পঞ্চমে কি ধরেনা তাল ?

৬

সকলি কিগো ফুরায়ে গেছে ?
মধুপুরে কি গিয়াছে কালা
ঘনায়ে তাই এসেছে বুঝি
বৃন্দাবনে আঁধারমালা,—
চাহিলে নব নীরদ পানে
তাহারি স্মৃতি বহিয়া আনে
নারে বারিতে যমুনা বারি
মরণ সম বিরহ জ্বালা,
শ্রীহীন এবে সকলি তাই,
বৃন্দাবনে মাধুরী নাই,
বিলীনা সদা ধূলি শয়নে,
দলিত দীনা গোপের বালা।

সৎকথা।

(স্বামী অদ্ভুতানন্দ)

যে মহামূর্খ—টাকা রোজগার করলে তাকে খুব বুদ্ধিমান বলে।

তিনি বলেছেন খাবার সংস্থান থাকলে জোচ্চুরি কোন প্রবঞ্চনা না করে দুটো খাও দাও আর তাঁর নাম কর! তাহাতে আত্মা সুখে থাকে।

মনগড়া ধর্ম্ম কি থাকে! সে যে 'দায়' নেই।

যেখানে ধর্ম্ম থাকে সেথায় কি হিংসা থাকে!

ত্যাগ না হলে তাঁকে বুঝাবার যো নেই।

যে ভগবানকে জানবার চেষ্টা কচ্ছে তার সঙ্গে আলাপ করলে ভগবান খুসি হন।

যে ঠিক সন্ন্যাস লবে সে জীবকে অভয় দেবে সে আর কারও ভালবাসা চায় না!

স্বার্থ না থাকলে ভগবান ভার বহন করে থাকেন।

তাঁতে মন থাকলে সব কেটে যায়। তাঁর উপর মন থাকাই হলো প্রধান। তিনি যে কোথা থেকে বুদ্ধি জুটিয়ে দেন তা কি জীব বুঝতে পারে। তাঁর কাছে আন্তরিক প্রার্থনা করতে হয়। বাহিরে লোক দেখান না হয়। আন্তরিক প্রার্থনা হলে তিনি শোনেন।

দ্রৌপদী কি' ব্রত করে, লোকজন খাওয়াচ্ছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ ভগবান বলেছিলেন, 'সখি ঐ লোকটাকে খাওয়াও। দ্রৌপদী খুব আয়োজন করেছিলেন; তারপর লোকটী খেতে বসামাত্র শাঁখ-ঘণ্টা বাজতে লাগিল। ঐ লোকটার খাওয়ার ঠিক নাই, পর পর খাচ্ছে না, কখনও এটা কখনও সেটা। তাই দেখে দ্রৌপদী মনে ভাবছেন যে লোকটা এমন, খেতেও জানে না। মনে করবা মাত্রেই শাঁক-ঘণ্টা থেমে গেল, তখন শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীকে বল্লেন, তুমি কি ভাবছ? বলদেখি শাঁক-ঘণ্টা থেমে গেল কেন? তখন দ্রৌপদী ঐ বৃত্তান্ত বলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ বললেন, বড়ই অন্যায় করেছ, ওর কি খাওয়ায় পরায় মন আছে?

আমার উপর মন আছে। দ্রৌপদীর মত শিক্ষা। অহঙ্কার যেন না হয়।

কর্ম্ম না থাকা জন্য গুণীর গুণ বুঝতে পারে না, কেবল দোষই নজরে আসে।

যে সাধু ভগবান লাভ করেছে, সেই জানে বৈরাগ্য, ভগবান কি জিনিষ; সাধুর ভেক থাক্‌লেই হয় না। ভগবান লাভ করাই প্রধান।

শ্রীকৃষ্ণ ভগবান বলছেন, কর্ম্ম না থাকবার জন্যই সৎকে অসৎ বলে বোধহয়। এ মায়ার খেলা।

অসৎকাজ করলে, ভয় আসবেই, দুঃখ পাবে, সৎকাজ করলে ভগবানের দিকে মন যায় শান্তি পায়।

কর্ম্মের 'সাৎ' কারও মিল হয় না—তবে উদ্দেশ্য সকলেরই এক হয়, যে কর্ম্মের 'সাৎ' মিল করতে যায়, সে নির্ব্বোধ।

মান সম্ভ্রমের জন্য জীব কি না কচ্ছে! খবরের কাগজ লিখছে, যে এসব ফেলে দেয়, সে ভাগ্যবান, জানে এসব কিছু না, মিথ্যা, সব মায়ার খেলা।

কর্ম্ম না থাকলে ভীষ্ম দেবকে, বুদ্ধদেবকে কি করে বুঝবে।

ভগবানে মতিগতি শ্রদ্ধা, বিশ্বাস-ভক্তি থাকলে কি হয়—সে অসৎ করবেই না, সে জানে উপরওয়ালা একজন আছে। অসৎ কাজ করলেই ভুগতে হ'বে।

কামিনী-কাঞ্চন এদুটী ভয়ানক বন্ধনের কারণ, ও সংশয় করায়। এ দুটী ভগবানের পথে যেতে দেয় না। ভালবাসার কথা ছেড়েই দাও। এদুটী যেখানে থাকে, বিবাদ করাবেই। যে এদুটী ফেলে দিতে পারে, সে জীবন্মুক্ত—এও মায়ার খেলা।

গুরু শিষ্যের গুণ থাকলেও, শিষ্যের দোষ ধরে। বাপও ছেলের গুণ থাকলেও দোষ ধরে।

ভাইএ ভাইএ মিল থাকা খুব দরকার, এক সঙ্গে থাকতে গেলেই বকাবকি হয়। 'ভিতরসে' হওয়া খারাপ। তিনি বলতেন, "সতের রাগ, জলের দাগ"।

অসময়ের উপকারের মূল্য নেই। অভাব থাকতে মানুষ

ভগবানকে ঠিক ঠিক ডাকতে পারে না।' মানুষের অভাবের সীমা নেই। মানুষ ভগবানকে ডাকবে কি!

গুরু কে? যিনি সংস্কার বিহীন-পুরুষ, তাঁকে গুরু বলে মানতে হয়। চোরকে ভগবান ঘৃণা করেন।

দুঃখের সময়, গুরু-ভগবান-ঠাকুরকে মনে পড়ে।

যে গুরুর দোহাই দিয়ে খাচ্ছে, তার উপর আবার রাগ করে। এ আবার কি ব্যায়াকুবি। পাপাত্মারা সাধুকে বলে, আপনারা আমাদের পাপ ভুগুন।

অর্থ থাকতে সৎবুদ্ধি হ'বে, ভগবানের খুব কৃপা।

মেয়ে জাত হয়ে, অর্থ হয়ে, অহঙ্কার, অভিমান হয় না, খুব ভগবানের দয়া বৈ কি।

অসৎ লোকের জিনিষ খেতে নাই।

পুণ্যবান লোকদের দেখলে মন হরষিত হয়; আর পাপাত্মা দেখলে মনে হৃৎকম্প হয়।

সকলেই তাঁর সন্তান, যে ভগবানকে ভক্তি করবে, স্মরণ লবে, সেই সুসন্তান।

ভগবানই কর্ম্মে লাগিয়েছেন, ভগবানই কর্ম্ম কাটাতে পারেন; ভগবানকে অন্তরে জানাও, অবশ্য তিনি জানিয়ে দেবেন।

গুরু কৃপা না হলে, সংশয় যায় না।

তাঁর হুকুম কি মানে। তাহলে সকলেরই কল্যাণ হত।

শ্রীকৃষ্ণ ভগবানই এক অখণ্ড—আর কি কেও অখণ্ড হয়?

ভগবান কি তোমার বান্দা, যে তোমার নিয়মে চলবেন।

যাঁর দ্বারা উপকার হয়, যদি তাঁকে মানে, তবে ত নিজেরই কল্যাণ। ভগবানের কথা না মানলে সেই ভুগবে।

সৎ হলে, অনেক লোকে অন্ন পায়।

ভাই ভাই মিল হয় না, আবার ধর্ম্ম করবে কি?

শ্রীকৃষ্ণ ভগবান বলেছেন দয়া আমার কোথায়?—যেখানে যার দ্বারা কর্ম্ম করিয়ে নিই।

অসৎ সঙ্গ করলে, অসৎ বুদ্ধি আসবে, যেমন সঙ্গ কর, তেমন ফল পাবে। "

গুরুদেবকে জনক বলেছিলেন শেষে আর গুরু শিষ্যত্ব থাকে না তাই দীক্ষাউপদেশের পূর্ব্বেই দক্ষিণা নাও।

তুমি যে নামে ইচ্ছা তাঁকে ডাক না তবে গুরুর আদেশ মত চলবে।

জোর করে অদ্বৈত ভাব কি হয়? তিনি বলতেন ফল বড় হলে ফুল আপনি পড়ে যায়। ঘাসের উপর তিনি হাঁটিতে পারতেন না এমন অভেদ ব্রহ্মবুদ্ধি—আত্ম সাক্ষাৎ করে। তবে দ্বৈতাদ্বৈত বিচার করা চাই। ক্রমে উপলব্ধি হয়।

'গুরুর আদেশ মত তাঁকে সেই নামেই ডাকবে। তবে আরও যদি দশ রূপে তাঁকে ডাকতে হয় তবে মনে রাখবে সবই "ইষ্টের লীলা" সব নাম রূপ নিয়ে ডাকা কিনা, ডাকার কোন লাভ, ক্ষতি নাই। এতে আর বাদ দেওয়া কি? একজনকে ডাকলেই ত সকলকে ডাকা হল আবার সব রূপ আরোপ করে ডাকলেও তাঁকেই ডাকা। তাতে চাঞ্চল্য আসে না; তবে এক ছেলের ভিতরই যখন সব তখন আর নানারূপ এলেই বা কি—ওগুলি কেবল সন্দেহ।

প্রত্যক্ষ আত্ম-সাক্ষাৎকার না হলে ওটী একদম দূর হতে একটু কষ্ট লাগে, সন্দেহ থাকে। ও গুলি ভ্রম। সব তিনি।

গুরুর আদেশ মত চলবে। পেট ভরলেই হল আর কি চাই!

তিনি কোন নিয়ম বিধির অধীন নহেন, আবার নিজ মায়ায় বদ্ধ হলে স্বাধীনও নহেন। তার কোন নিয়মের "ইতি" করা আমাদের এ জ্ঞান বুদ্ধিতে হয় না। তদ্বৎ হলেই তাঁকে অথবা তাঁর ভক্তকে বুঝা যায়। নিয়ম বিধি 'তোমার, আমার' জন্য।

তাঁর কৃপা হলে পাপীকে বিনা প্রায়শ্চিত্তেও মুক্তি দেন। কাকে ঠোকরান ফলও আবার পূজোয় লাগে। তবে ডাকার মত ডাকিয়ে নেন। এটা কি প্রায়শ্চিত্তের অপেক্ষা কম, সব মন বুদ্ধির মোড় ক্রমে ফিরে যায়।

নিজ সাধন-ভজনের উপদেশ যার তার কাছে নিলে অনিষ্ট হতে পারে। গুরু অথবা গুরু স্থানীয় কেহ যিনি নিজ অবস্থাদি বিশেষ ভাবে জানেন তাঁর কাছে উপদেশ নিলেই মঙ্গল হয়। নচেৎ ভাব নষ্ট হতে পারে।

ঠাকুর—স্বামিজীকে আদর্শ করে চল। শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের মহাশক্তি। এদের ভিতরই সব দেবতা। শ্রীশ্রীমা স্বয়ং বলেছেন ও দেখেছেন। আবার সন্দেহ কি? এমন আদর্শ আর কোথায় পাবে! সাঙ্গো-পাঙ্গদের ভিতরও সেই একই শক্তি। নানা ভাবে লীলা করছেন। সবই ইষ্টের লীলা—এঁরা যে লোক শিক্ষক। কে বোঝে—যে বোঝে সেই মজে।

মাকে চিরদিনই মার মতই দেখতাম। মা আমাদেরই মা এতে আর সন্দেহ কি আছে? আমাদের ঠাকুর আমাদেরই বাপ—যথা-সর্ব্বস্ব। আর কোন ভয় ভাবনা ছিল না। বাপ মার কাছে যেন ছোট খোকার মত থাকতাম। সাধন-ভজন করতাম, খাবার সময় খেতাম। সাধন-ভজনে বিলম্ব হলে "নান ছল করে" ঠাকুর এনে খাওয়াতেন। বেশী ধ্যান করলে ঐরূপ করতেন, ফাঁকি দিয়ে ভুলিয়ে আনতেন।

স্ত্রীলোকদের বিবেক বৈরাগ্য খুব কমেরই হয়। বিলাতে অন্য রূপ। আমাদের স্ত্রীলোকদের "দয়া" করে উপদেশ দিতে গিয়ে শেষে "মায়ায়" পড়তে হয়। সাবধান! স্ত্রীলোকের অন্তরে এক আনা বৈরাগ্য বাহিরে দেখাবে ঢের। ওরা মায়া-জীব। অনেক সাবিত্রীও আছেন বটে। স্ত্রীলোকের স্বামীই গুরু—অন্যত্র যাওয়ার কি দরকার।

পূর্ব্বে ভোগী, উত্তরে যোগী।

এখন যে দুর্ভিক্ষ হচ্ছে ভগবানের মার। হিংসার জন্যে দেশে দুর্ভিক্ষ, ম্যালেরিয়া হচ্ছে। আগে সৎলোক জন্মে ছিলেন। কেশব সেন—বিজয় গোস্বামী, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগর মহাশয়, ঈশান মুখোর্জ্জি, বলরাম বসু প্রভৃতি। তখন চাউল তরিতরকারি সব জিনিস সস্তা ছিল, দেশে দুর্ভিক্ষ ম্যালেরিয়া ছিল না, লোকের মনে বেশ স্ফূর্ত্তি

ছিল। সৎ লোক থাকলেই এরূপ হয়। অসৎ লোক জন্মালে যত দুর্ভিক্ষ-ম্যালেরিয়া হয়। ভগবান বিনাশ করেন। হিংসা-দ্বেষ বেড়েছে—কেও কারও ভাল দেখতে পারে না।

দানের উপকারিতা কি?—ধ্যান-জপের সাহায্য হয়। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল কেটে যায়। যার পয়সা আছে দান করবে, যার পয়সা নেই জপ করবে। ভগবানের কাছে দুঃখ জানাবে।

সাধুকে, ভগবানকে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট দ্রব্য দেবে।

সমালোচনা ও পুস্তক পরিচয়।

অর্ঘ্য বা স্বরাজ সঙ্গীত—প্রকাশক শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ। বঙ্কিমবাবু, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সকল দেশপ্রাণ কবিগণের গানের দ্বারা এই অর্ঘ্য রচিত হইয়াছে। মূল্য ছয় আনা।

মহাত্মা গান্ধি—সঙ্ক্ষিপ্ত জীবনী—শ্রীমণীন্দ্রকুমার চৌধুরী প্রণীত। মূল্য দেড় আনা।

মৌলানা মহম্মদ আলী—সঙ্ক্ষিপ্ত জীবনী—শ্রীমণীন্দ্র কুমার চৌধুরী প্রণীত। মূল্য দেড় আনা।

স্বদেশী ও স্বরাজ—অধ্যাপক শ্রীঅনিলবরণ রায় প্রণীত। মহাত্মা গান্ধীর নিরুপদ্রব-অসহযোগীতার উপকারিতা ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। মূল্য চারি আনা।

স্বরাজের পথে—অধ্যাপক শ্রীঅনিলবরণ রায় প্রণীত। মহাত্মা গান্ধীর নিরুপদ্রব-অসহযোগীতা কার্য্যকরী করিবার উপায় চিন্তিত হইয়াছে। মূল্য চারি আনা।

সহযোগীতা বর্জ্জন প্রস্তাব—শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মজুমদার, এম্-এ, বি-এল প্রণীত। ইহাতে সশস্ত্র-প্রতিরোধ নিন্দিত এবং নিরস্ত্র প্রতিরোধের উপযোগীতা, শান্তিভঙ্গ নিবারণের উপায়, সহযোগীতা বর্জ্জন ও তাহার অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আলোচিত হইয়াছে। মূল্য তিন আনা।

দেশসেবা ও সাধনা—শ্রীহরিদাস মজুমদার প্রণীত। ইহাতে আদর্শ স্বদেশী চরিত্র আলোচিত হইয়াছে। মূল্য-ছয় পয়সা।

স্বরাজ—শ্রীশরৎকুমার ঘোষ প্রণীত। স্বরাজ সম্বন্ধে আলোচনা। মূল্য চারি আনা।

স্বাধীন মিশর—মঈন উদ্দীন হোসায়ন, বি, এ, সঙ্কলিত। বর্ত্তমান মিশরের স্বাধীনতা লাভের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। মূল্য চারি আনা।

এই পুস্তিকাগুলির প্রাপ্তিস্থান—সরস্বতী পুস্তকালয়, ৯নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অতীতের ব্রাহ্মসমাজ—শ্রীত্রৈলোক্যনাথ দেব প্রণীত। তমসাচ্ছন্ন হিন্দু গগনে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ব্রাহ্মধর্ম্মই শুকতারা রূপে জাতিকে আশান্বিত করিয়াছিল। এই পুস্তকে সরল ভাষায় রাজা রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ সকল ব্রাহ্ম ভক্তগণের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণিত আছে। রামকৃষ্ণ পরহংস ও ব্রাহ্মসমাজ শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক লিখিয়াছেন "আমার বোধ হয়, কেশবচন্দ্রই তাঁহাকে পরমহংস উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন" কিন্তু একথা ঠিক নহে। শ্রীযুক্ত কেশব চন্দ্র তাঁহার ঐ আখ্যা কলিকাতা সহরে সর্ব্ব প্রথম প্রচারিত করেন মাত্র। কারণ, তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞ গুরু শ্রীমৎ পরমহংস তোতাপুরী শিষ্যকেও ব্রহ্মজ্ঞ নির্ণয় করিয়া "পরমহংস" এই শাস্ত্রীয় উপাধিতে ভূষিত করেন। পরে অপরাপর সন্ন্যাসী এবং গৃহস্থ জ্ঞানীদিগের নিকট তিনি ঐ আখ্যায়, শ্রীযুক্ত কেশব সেন মহাশয়ের বহু পূর্ব্ব হইতেই পরিচিত ছিলেন। আমাদের আর একটী বক্তব্য এই যে, যখন "তিনি কালী ভক্ত ছিলেন" তখন "আমি শালীর মুখ আর দেখি না" একথাটা নিশ্চয়ই তিনি তাঁহার চিন্ময়ী মাকে (যদি তিনি বলিয়া থাকেন), তাহা রামপ্রসাদ প্রমুখ দেবী ভক্তগণের ন্যায় আব্দার বা অভিমানেই বলিয়াছেন। কিম্বা তাঁহার ঐ "শালী" কথার কোনও অর্থই নাই, যেমন লেখকের ভাষায় "তিনি 'শালা' কথাটা প্রায়ই সকল ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসু লোকদিগের প্রতি ব্যবহার করিতেন।" আমাদের চিন্তায় আর একটী বিরোধ উপস্থিত হয় এই

যে, তিনি যখন "কালী ব্রহ্ম যেনে মর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম সব ছেড়েছি" বলিয়া গান গাহিতেন তখন তিনি কি করিয়া বলিলেন "অনেক দিন ধরিয়া ঐ শালী আমাকে পথ ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছিল, আমাকে ঠিক পথ দেখাইয়া দেয় নাই, সেই জন্য আমি আর ওর মুখ দেখি না।" লেখকের লেখা পড়িয়া বোধ হয় শ্রীশ্রীঠাকুর যে তাঁহার নিকট একটী অনুভূতির কথা—"আমি দেখিলাম যে, এক অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় রূপ আমার প্রাণ মনকে এক আশ্চর্য্য জ্যোতিঃতে পরিপূর্ণ করিল"—ইহাই একমাত্র সত্য। "কিন্তু সাম্প্রদায়িক গণ্ডির ভিতর" না বসিয়া, "অপরা শক্তিদ্বারা পরিচালিত না হইয়া" 'চিন্ময়ী' মায়ের অপরাপর লীলাবিলাসও সত্য বলিয়া জানিতে হইবে; নচেৎ "এই সিদ্ধ পুরুষকে কেহ চিনিতে পারিবেন না"—"যত মত তত পথ" রূপ তাঁহার এই বিশাল বিরাট ধর্ম্ম যাহা সমুদ্র অপেক্ষা গভীর, আকাশ অপেক্ষা বিস্তৃত—উপলব্ধি করা দুঃসাধ্য হইবে। "তিনি কীর্ত্তন করিতে করিতে ভাবাবেশে একেবারে অজ্ঞান হইয়া পড়িতেন"—একথারও অর্থ আমরা বুঝিতে পারি না। চৈতন্যের ভাবে "অচেতন" হইতেন এবং জড়জগতে ফিরিয়া আসিলে "সচেতন" হইতেন এ কিরূপ কথা "সমাধি" ও "অচেতন" অবস্থা এক কি?

সংবাদ।

আগামী ১৬ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার, শুক্লা দ্বিতীয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথি-পূজা এবং ২১শে ফাল্গুন, রবিবার, বেলুড়মঠে তাঁহার জন্মোৎসব সম্পাদিত হইবে।

প্রাপ্তি স্বীকার।

৪৫, নাজিরাবাদ, লাক্ষ্ণৌ হইতে আমরা আউদ ওয়াচ কোম্পানীর ১৯২২ সালের ক্যালেণ্ডার প্রাপ্ত হইয়াছি।

রামকৃষ্ণ নামাষ্টকং।

(শ্রীশ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়)

অবতার বরিষ্ঠায় বরপুত্রায় চ দেব্যাঃ।
সদারাধানপরায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ ॥১॥
বিশ্বপ্রেমোন্মাদায় চ শ্রীচৈতন্যস্বরূপিনে।
কামাদি পারঙ্গতায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ ॥২॥
জ্ঞানীনামগ্রগণ্যায় সর্ব্বভূতস্থমাত্মনে।
তথাহেশাবতারায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ ॥৩॥
লোকমহেশ্বরায় চ নিত্যমনন্তরূপিনে।
বিকারাদিরহিতায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ ॥৪॥
বরাভয়দায়কায় ভূতহিতরতায় চ।
তথাভক্তবৎসলায় রামকৃষ্ণায় তে নঃ ॥৫॥
ত্রিভিগুর্ণময়ায় চ সর্ব্বত্র সমদর্শিনে।
পরদুঃখকাতরায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ ॥৬॥
ভক্তানাং মুক্তিদানায় নিজপুণ্যপ্রদায়িনে।
পরমেশমীড্যায় চ রামকৃষ্ণায় তে নমঃ ॥৭॥
ধর্ম্মসংস্থাপকায় চ অজ্ঞানজ্ঞানদায়িনে।
সুকঠোরসাধকায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ ॥৮॥

কথা প্রসঙ্গে।

রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য দেশে হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু সেই উদ্দেশ্য সাধনের উপায় সম্বন্ধে দেশবাসীর মতভেদ আছে। বিশ্ব-বিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল, টোল দেখিয়া মনে হয়, সাধারণের অজ্ঞতা দূর করিবার জন্য মানসিক অনুশীলনের একটা বিপুল সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু দেশবাসীকে শিক্ষিত করিতে হইবে প্রাচ্য না পাশ্চাত্য অনুকরণে—সে বিষয়েও মতভেদ আছে। দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবন প্রভৃতি আকস্মিক প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা প্রতিরোধের জন্য দেশবাসী নানা প্রকারের মিশন, ব্রাদারহুড, সোসাইটী নির্ম্মাণ করিয়াছেন কিন্তু জাতিকে জাতি উজাড়-কারী কলেরা এবং ম্যালেরিয়াকে বাঙ্গলা দেশ হইতে নির্ম্মূল করিবার জন্য কয়েটি মিশন স্থাপিত হইয়াছে, কয়জন ক্রোরপতি তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন? অথচ ইহার প্রতিষেধ সম্বন্ধে অস্মদ্দেশীয় সকল সম্প্রদায় একমত।

* * *

ধ্বংস ক্রীড়া কিরূপ ভাবে চলিতেছে, বাঙ্গলা দেশের ১৯১৯ সালের জন্ম মৃত্যুর হার দেখিলেই উদ্বোধন পাঠকেরা উহার ভীষণতা উপলব্ধি করিবেন।

	জেলার নাম	হাজার করা জন্মের হার।	হাজার করা মৃত্যুর হার।
	বৰ্দ্ধমান বিভাগ :—		
১।	বৰ্দ্ধমান	২১.২	৫০.৫
২।	বীরভূম	২৩.৭	৬২.৩
৩।	বাঁকুড়া	২৫.০	৩৬.৫
৪।	মেদিনীপুর	২৪.২	৪০.১
৫।	হুগলী	২১.৫	৩৬.১
৬।	হাওড়া	২৭.০	৩৫.১

	প্রেসিডেন্সী বিভাগ :—		
৭।	২৪ পরগণা	২২·৫	৩৩·৪
৮।	কলিকাতা	১৮·৫	৪২·২
৯।	নদীয়া	২৫·৬	৪৫·০
১০।	মুর্শিদাবাদ	২৮·৯	৪৭·৩
১১।	যশোহর	২১·০	৩০·২
১২।	খুলনা	২৭·৮	৪১·২
	রাজসাহী বিভাগ :—		
১৩।	রাজসাহী	৩১·৮	৪১·৫
১৪।	দিনাজপুর	৩১·৬	৪৩·৭
১৫।	জলপাইগুড়ি	৩২·৪	৪২·৬
১৬।	দারজিলীং	৩০·০	৪৮·৪
১৭।	রংপুর	৩২·৪	৩৩·৪
১৮।	বগুড়া	২৮·৫	২৭·৯
১৯।	পাবনা	২৫·৭	৩৬·১
২০।	মালদহ	৩০·৫	৩৯·০
	ঢাকা বিভাগ :—		
২১।	ঢাকা	৩০·৫	২৭·৮
২২।	ময়মনসিংহ	২৭·৩	২৭·৭
২৩।	ফরিদপুর	৩০·১	২৮·৯
২৪।	বাখরগঞ্জ	২৯·৮	৩৪·৭
	চট্টগ্রাম বিভাগ :—		
২৫।	চট্টগ্রাম	৩০·৩	৪১·৪
২৬।	নোয়াখালি	৩২·৮	৪২·৪
২৭।	ত্রিপুরা	২৭·৮	২৯·৪

বঙ্গদেশের মোট জন্ম মৃত্যুর হারের সহিত ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, ওয়েল্‌স, ও আয়রলণ্ডের জন্ম মৃত্যুর হারের সহিত তুলনা করিলে দাড়ায়,—

	হাজার করা জন্মের হার।	হাজার করা মৃত্যুর হার।
বৃটীশ দ্বীপপুঞ্জ	১৯'৩	১৪'৩
বঙ্গদেশে	২৭'৫	৩৬'২

এই ভীষণ মৃত্যুর প্রতিষেধ কল্পে পাবনা জিলা বোর্ড কন্‌ফারেন্স কার্য্যের এক উত্তম তালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যিনি যতটুকু উহা কর্ম্মে পরিণত করিতে পারেন তাহার নিমিত্ত উহা এখানে উদ্ধৃত করিলাম,—

পানীয় জল শুদ্ধির নিমিত্ত।

(১) পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করিতে হইবে।

(২) যে সকল নদী খাল ভরিয়া আসিয়াছে সেই গুলির সংস্কার করিতে হইবে।

(৩) কূপ খনন করিতে হইবে

(৪) নূতন পুষ্করিণী কাটা হইবে।

(৫) বিলগুলিকে সুপেয় জল পূর্ণ হ্রদে পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

ম্যালেরিয়া দমন জন্য।

(ক) বিনামূলে কিম্বা অল্পমূল্যে কুইনাইন বিতরিত হইবে।

(খ) পানিহাটি মিউনিসিপালটীর অনুকরণে পল্লী কো-অপারেটিভ সমিতি স্থাপন করিয়া ম্যালেরিয়া দমনের চেষ্টা করা হইবে।

(গ) জঙ্গল কাটা, কচুরী বিনাশ, বদ্ধ জলের ডোবা ভরাট, বাঁশবন বিনাশ ইত্যাদি করা হইবে।

* * *

ব্যবস্থা চমৎকার, কিন্তু অর্থ কোথায়? এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট কতদূর সাহায্য করিতে পারেন তাহা আমাদের জানা নাই। তবে যদি বল ঋণ গ্রহণের দ্বারা ঐ সকল সৎকার্য্য সম্পাদিত করা যাইতে পারে;—কিন্তু ঐরূপ লক্ষ লক্ষ টাকার ঋণ সাহস করিয়া দিবার লোকও নাই এবং

অধিকাংশ মিউনিসিপালিটী প্রভৃতির অবস্থা ও কার্য্যকলাপ দেখিয়া মনে হয় উহা শোধ করিবার উপায় তাহাদের কোনও কালেই হইবে না।

তবে উপায়?

*

একমাত্র প্রতিষেধ জমিদার ও ব্যবসায়ী কুলের সহর মোহ-ত্যাগ করিয়া পুনরায় স্ব স্ব গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন। এবং সেখানেই জন-সাধারণের হিতকর কার্য্য সকল সম্পাদন করা, যাহা তাঁহারা নামের আকাঙ্ক্ষায় সহরে করিয়া থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল, টোল, পাঠশালা, হাঁসপাতাল, দাতব্য-চিকিৎসালয়, বিজ্ঞানাগার, চিত্রশালা, পুস্তকাগার প্রভৃতি সকল সৎকর্ম্ম তাঁহারা গ্রামেই প্রতিষ্ঠিত করুন, মন্দির, উদ্যান (park) পথ, ঘাট, পুষ্করিণী, মহজ্জনের প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতির দ্বারা গ্রামের শোভা-সম্পদ বৃদ্ধি করুন। প্রতি গ্রাম্য সমাজের দশজন বড়লোক ও সাধারণের সমবেত চেষ্টায় স্বদেশ অন্নমূর্ত্তি ধারণ করিবে। আমরা কাহাকেও একেবারে নগর ত্যাগ করিতে বলিতেছিনা—উহা ব্যবসায় ও রাজকার্য্যের নিমিত্ত ব্যবহৃত হউক। নচেৎ পল্লী শ্মশানের মধ্যে সহরের নন্দন-কানন নির্ম্মাণ করিয়া কি হইবে। কৃষাণাদি শ্রমজীবিকুলের উন্নতিতেই জমিদার ও ব্যবসায়ী কুলের উন্নতি। প্রথম পক্ষ যদি ধ্বংস হয় অপর পক্ষেরও ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী—কারণ নীচ জাতিই আভিজাত্য-কুলের প্রতিপালক মাতাপিতা। দুষ্ট বালক যেমন মাতাপিতার উপর অসদ্ব্যবহার করিয়া থাকে, অথচ তাহারা জানে না যে তাঁহাদের অকরুণায় তাহাদের পক্ষে একদিনের জন্যও জীবনধারণ অসম্ভব—সেইরূপ আভিজাত্যকুলেরও জানা উচিৎ যে তাঁহাদের অত্যাচার-অবিচার-সম্ভূত নীচ জাতির ক্রোধানল যদি একবার প্রজ্জলিত হয় তবে ক্ষণেকে তাঁহারা ভস্মীভূত হইয়া যাইবেন।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি।

(শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার)

ষাট বৎসর পূর্ব্বে এমনি পৌষের এক কৃষ্ণা-সপ্তমী তিথিতে স্বামী বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বহুদিন পর এক তুষার ধবল গিরি শৃঙ্গ বাঙ্গলা দেশের বুকে মস্তক উত্তোলন করিয়াছিল—সেই সমুন্নত মহিমার বক্ষ হইতে ভাগীরথী ধারার মত বিপুল ভাবের বন্যা জগত প্লাবিত করিয়া গিয়াছে। দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটী হইতে যখন এই বেদান্ত কেশরী সহসা ভারতবর্ষের সাধনা ও সিদ্ধির জীবন্ত-মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া জগদ্বিজয়ে বহির্গত হইয়াছিলেন—তখন সে রুদ্রতেজে বিশ্বের বিস্মিত চক্ষু ঝলসিয়া গিয়াছিল। শ্যামলা বঙ্গমাতার ক্লান্ত কোমল বক্ষে এই প্রচণ্ড পৌরষদৃপ্ত সন্ন্যাসীর অত্যাশ্চার্য্য আবির্ভাবের পুণ্যস্মৃতি, আজ আমরা শুচি স্নাত হইয়া স্মরণ করিতে আসিয়াছি।

আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এই গৌরবময় দিবসটী শুদ্ধমাত্র উৎসবের বহ্বাড়ম্বরে ও শূন্যগর্ভ কোলাহলে ব্যয় করিবার দিন নহে—আজিকার দিনে দুর্ভাগা বাঙ্গালী জাতির মস্তকে বিধাতার যে মঙ্গল আশীষ নামিয়া আসিয়াছিল, তাহা উপলব্ধি করিবার দিন, তাহা গ্রহণ ও বরণ করিবার দিন। আজ বাঙ্গালীর লজ্জিত হইবার দিন, ক্ষোভে মস্তক অবনত করিবার দিন। বক্ষে উদ্ধত্য,কপটতা, মুখে নির্লজ্জ ভণ্ডামী লইয়া হাসিবার দিন নহে।

আজিকার জন্মোৎসবে এতগুলি মানুষ একত্র হইয়াছ যদি—তবে যে দেশে বিবেকানন্দের মত মহিমান্বিত মহাপুরুষের জন্ম সম্ভব হইয়াছিল সেই দেশের দগ্ধ ললাটের দিকে একবার ফিরিয়া চাও। বাঙ্গালার মেরুদণ্ডহীন কুব্জ যুবক-শক্তি আজ পর্য্যন্তও বিবেকানন্দকে দেশহিতব্রতে আত্মোৎসর্গকারী এক সহস্র সন্ন্যাসী দিতে পারে নাই? বাঙ্গালার শ্রীহীন পল্লীর পঙ্কিল পল্বল-সঞ্জাত পতঙ্গকুল আজ দলে দলে 'পরদীপশিখায়'

পুড়িয়া মরিবার জন্য সহরে উড়িয়া আসিয়াছে! পুড়িতেছ—পুড়িবে; মরিতেছ মরিবে! এমনি করিয়া শিক্ষাভিমানী অজ্ঞতার ও অশিষ্ট অক্ষমতায় সোনার বাঙ্গালা শ্মশান করিয়া তুলিয়াছে—তাই কি আজ এখানে ভূত প্রেতের এত উপদ্রব।

দরিদ্র বুভুক্ষু পতিতের দুঃখে এক মহত্ত্ব ও পৌরুষেয় বাণী বাঙ্গালা দেশে গর্জ্জিয়া উঠিয়াছিল—তাহা আজ রূপ-কথার কাহিনীতে পরিণত হইতে চলিয়াছে। তাই তো বিস্মিত হইয়া ভাবি, মানুষের জন্য মানুষের যে স্বাভাবিক মমত্ববোধ তাহা বাঙ্গালী যুবকগণের হৃদয় হইতে কোন্ যাদুমন্ত্রে অন্তর্হিত হইল? দুর্দ্দান্ত যৌবনের জীবন-মরণ তুচ্ছকারী উদ্দাম গতি বেগের অবাধ চাঞ্চল্য-লীলা—বাঙ্গালার বুক হইতে কে মুছিয়া লইয়াছে?

অবশ্য সমস্ত দেশটারই যে এত বড় দুর্গতি হইয়াছে এমনতর একটা মিথ্যা দুঃসংবাদ দিয়া আজিকার উৎসবানন্দকে ম্রিয়মাণ করিতে চাহি না, তবে জাতির স্বভাবধর্ম্মের বিপরীত এক অভিনব শিক্ষা ও সভ্যতার সংঘর্ষে যে বাঙ্গালী জাতির একটা বড় অংশের বুদ্ধি বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে; তাহাতে আর কোন সংশয় নাই। জাতির এই বিক্ষিপ্ত ও বহির্মুখ বুদ্ধিকে সংহত ও আত্মস্থ করিয়া উহাকে ভারতের জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্র্য ও লক্ষ্যের দিকে প্রয়োগ করিতে হইবে। বিবেকানন্দের জীবন তাহারই একটা মূর্ত্ত ইঙ্গিতরূপে ভারত বক্ষে অবতীর্ণ হইয়াছিল।

এই আদর্শকে চরিত্রের মধ্যে কর্ম্ম-পরিণতরূপ দিতে হইবে—আজিকার দিনে যদি আমরা তাহা পুনরায় নূতন করিয়া বিশেষ ভাবে উপলব্ধি না করি, তবে উৎসবের এই আয়োজন ব্যর্থ হইয়া যাইবে; আমরাও যেমন দীনভাবে এখানে আসিয়াছিলাম ঠিক তেমনি দীনভাবেই রিক্তহস্তে ফিরিয়া যাইব। যদি আজ বিবেকানন্দের জীবন হইতে আমরা কোন তেজ কোন শক্তি আহরণ করিতে না পারি, তাহা হইলেও অন্ততঃ আমাদের দুর্ব্বলতা অক্ষমতা ক্ষুদ্রতা বৎসরের মধ্যে এই বিশেষ দিনে যাচাই করিবার সুযোগ পাইব। তাহাও কি কম লাভ!

অপহৃত মনুষ্যত্ব পরশ্রীকাতর দুর্ব্বল আমরা, পরাজিত পতিত অধম আমরা, সমাজ সংহতি ছিন্ন করিয়া কালবৈশাখীর ঝড়ের মুখে মেঘের মত বিক্ষিপ্ত মুমূর্ষু আমরা—আমরা যে আজ এই মহাপুরুষের স্মৃতি-পূজা উপলক্ষে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যও সমস্ত প্রকার স্বার্থদ্বন্দ্ব ভুলিয়া একত্র মিলিতে পারিয়াছি, সেজন্য হৃষ্টচিত্তে স্বামিজীর পুণ্য-স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি। কেননা, মিলনের মধ্যেই প্রকৃত বল লাভ করা যায়। মানুষের সহিত মানুষের যে চিরন্তন ঐক্য সংসারের কেনা-বেচার হাটের আবর্জ্জনার তলে চাপা পড়িয়া যায়—মিলনের আনন্দ সেই আবর্জ্জনাকে সরাইয়া তাহাকে পুনরায় প্রত্যক্ষ করিয়া তোলে। তখনি আমরা নিঃস্ব নহি, একক নহি, ক্ষুদ্র নহি, তুচ্ছ নহি। বিবেকানন্দের মহান ভাব-সম্পদের প্রত্যেক উত্তরাধীকারি এবং সেই উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা সকলেই পরস্পরের ভাই—এই ভ্রাতৃত্বের অনুভূতি সমস্ত নৈরাশ্য ও ক্ষুব্ধতা-বিকার-ক্ষিপ্ত চিত্তের উপর যে প্রশান্ত গৌরব জাগ্রত করিয়া তোলে—তাহা যদি আমরা অনুভব করিতে না পারি তবে তামাদের মত হতভাগ্য আর কে?

* * *

নশ্বর সংসারে মায়ার পুতুল আমরা, খেলা করিয়া যাইতেছি। অনন্ত-কাল-সমুদ্রে জাতির উত্থান ও পতন মায়ার বুদ্বুদ্—ওঠে ভাসে ডোবে মিলাইয়া যায়। আমাদের জ্ঞানী গুণীরা এই মায়ার খেলা যে ভাবে খেলিতে বলিয়াছেন, আমাদের শাস্ত্র ও সংহিতাগুলি সমাজ রক্ষার নিমিত্ত যে শ্রেণীবিন্যাস করিয়াছিলেন, কালক্রমে আঘাতের পর আঘাতে বিপর্য্যস্ত হইয়াও যাহা মিশর, গ্রীস ও রোমের মত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই, সেই বিরাট প্রাচীন সভ্যতার মর্ম্মকথাকে, এই দুর্য্যোগের দিনে যে মনীষী পুনরায় যুগোপযোগী সুরে ও রূপে প্রকট করিয়াছিলেন, এতাবৎকাল পর্য্যন্ত যাঁহাকে সম্যক ধারণা করিতে গিয়া বহু বিজ্ঞব্যক্তির বুদ্ধি বিহ্বল হইয়া গিয়াছে, তাঁহার কথা আমি আপনাদিগকে অদ্য শুনাইব, এমন কি শক্তি আমার আছে? আমার এই ক্ষীণকণ্ঠে যদি সেই মহাভৈরবের আরাব থাকিত, তবে একবার প্রাণপণ-বলে সকলকে

ডাকিয়া বলিতাম, দেশের নিকট বিবেকানন্দের প্রথম ও প্রধান ভিক্ষালাভ হয় নাই, হে হতভাগ্য দেশের দুর্ভাগা সন্তানগণ, কোটী কোটী 'জায়স্ব ম্রিয়স্বে'র মধ্য হইতে এক সহস্র মানুষ মানব-কল্যাণব্রতে উৎসর্গ করিয়া যুগ যুগ সঞ্চিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর।

বড় পাপের বড় শাস্তি—অধঃপতন। একদিন পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতা-সম্মোহিত বাঙ্গালী একান্ত নির্লজ্জভাবে অপৌরুষের যে বেদবাণী তাহার কথা অস্বীকার করিয়াছিল, তাই আজ বিশ্ব বাঙ্গালীর কথা কেহই শুনে না। বর্ত্তমান সভ্যতার মাপকাঠিতে আমরা নগ্ন, অসভ্য; বর্ব্বর বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছি—এই ধিক্কৃত অবস্থার পরিবর্ত্তন ও প্রতিষেধকল্পে বিবেকানন্দের মত মহাপ্রাণ-সন্ন্যাসী অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়াই না আশা ও ভরসা লইয়া আজিও আমরা বাঁচিয়া আছি।

কিন্তু বাঁচিয়া থাকাটাই মনুষ্য জীবনে বড় কথা নয়—কায়ক্লেশে কোন প্রকারে একটা ম্রিয়মান অস্তিত্বকে জীর্ণ পঞ্জরতলে বহন করা কাপুরুষতার পরিচায়ক। স্বামীজিও তাঁর বাক্যের সহিত আমাদের জাতীয় চরিত্রের এই দুর্ব্বল ভাবটীকে সর্ব্বদা আঘাত করিতেন কাপুরুষ এবং অলসেরাই বাঁচিয়া থাকিতে চায়। নিশ্চিত মৃত্যুর কবলে পড়িয়াও মানুষের বাঁচিবার জন্য মর্ম্মান্তিক আগ্রহ জগতে এর চেয়ে শোচনীয় করুণাবহ দৃশ্য আর নাই। স্বামিজী বলিতেন, একটা বটগাছ পাঁচশ' হাজার বৎসর বাঁচে—তাহাতে কি আসে যায় এই যে লাঞ্ছিত, উপেক্ষিত অপমানিত জীবনকে বাঁচাইয়া রাখিবার হাস্যকর চেষ্টা—ইহাই জাতীয় জীবনের এক উৎকট ব্যাধি। তাই বলিয়া কেহ যেন না মনে করেন, যে যেনতেন প্রকারেণ মরিতে পারাটাই খুব একটা বড় কায। মানুষকে বাঁচিতেও হইবে, মরিতেও হইবে। কেমন করিয়া বাঁচিতে হয় আর কেমন করিয়া মরিতে হয়—বিবেকানন্দ নিজে আচরণ করিয়া জাতিকে তাহা শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। সেই অদ্ভুত কর্ম্মবীরের, অক্লান্ত শ্রান্তিহীন জীবন স্মরণ করিলে কি তেমনি করিয়া বাঁচিবার সাধ হয় না? বাঁচিয়া থাকিবার মধ্যে যে শান্ত গভীর আনন্দ—কয়জনের ভাগ্যে তাহা ঘটে? পরের জন্য, মানুষের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, দেশের জন্য,

মহত্ত্বের জন্য বাঁচিয়া থাকার যে গৌরব, যে সুকঠিন আনন্দ, যে গভীর তৃপ্তি—তাহাই তো বাঁচিয়া থাকা! সে বাঁচিয়া থাকার মধ্যে হয়তো ঐশ্বর্য্য, আরাম বিলাস না থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার মধ্যে ক্ষুদ্রতা থাকে না, অভাব থাকে না, দৈন্য থাকে না, যে বাঁচিয়া থাকা, মানুষকে মনুষ্যত্বের চেতনানন্দে সর্ব্বদা সঞ্জীবিত করিয়া রাখে। বিবেকানন্দ যত দিন জড়দেহে ছিলেন ততদিন মানুষের মতই বাঁচিয়াছিলেন। ধর্ম্মের রাজসূয়-যজ্ঞে ব্রতী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের নামাঙ্কিত এই যজ্ঞীয়-অশ্ব নদী পর্ব্বত সমুদ্র অতিক্রম করিয়া ছুটিয়াছিল, আট্‌লাণ্টিকের 'উভয়তীর' দিগ্বিজয়ের জয়-নির্ঘোষে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। তাঁহার জীবনে শ্রান্তি ও বিশ্রাম এ দুইএরই অবসর ছিল না। ভারতবর্ষের এক চরম দুঃসময়ে তিনি এই ছত্রভঙ্গ বিপথগামী জাতির মধ্যে আসিয়া গৌরবান্বিতশিরে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। দেশের দুর্দ্দশা, জাতির অধঃপতন, ধর্ম্মের গ্লানি দেখিয়া কেহ কখনো তাঁহার মুখে একটা বৈরাগ্যের ধ্বনি শুনিতে পায় নাই। তিনি ভারতের প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে নবযুগের নবজাগরণ-বার্ত্তা বহন করিয়া লইয়া গিয়াছেন। প্রাণহীন চলমান কঙ্কালসমষ্টির মধ্যে দাঁড়াইয়াও তিনি বৈরাগ্য-ক্ষুব্ধ যুবকবৃন্দকে পুনঃ পুনঃ বলিতেন—

"বেদান্তের অমোঘ মন্ত্রবলে এদের জাগাব। 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' এই মহাবাণী শুনাতেই আমার জন্ম! তোরা ঐ কার্য্যে আমার সহায় হ। যা—গাঁয়ে গাঁয়ে, দেশে দেশে, এই অভয়বাণী আচণ্ডাল ব্রাহ্মণকে শুনাগে। সকলকে ধরে ধরে বল্‌গে যা, তোমরা অমিতবীর্য্য—অমৃতের অধিকারী। এইরূপে আগে রজঃ শক্তির উদ্দীপনা কর—জীবনসংগ্রামে সকলকে উপযুক্ত কর, তারপর পরজীবনে মুক্তিলাভের কথা তাদের বল্। আগে ভিতরের শক্তি জাগ্রত করে দেশের লোককে নিজের পায়ের উপর দাঁড় করা, উত্তম অশনবসন উত্তম ভোগ—আগে করতে শিখুক। তারপর সর্ব্বপ্রকার ভোগের বন্ধন থেকে কি করে মুক্ত হতে পারবে—তা বলে দে।"

বেদান্তের সেই অমোঘমন্ত্র—অভীমন্ত্রে, হে আচার্য্য! আজ আমাদিগকে দীক্ষা দাও! তোমার রুদ্রতেজোদৃপ্ত ললাটের দিকে

নির্ভর দৃষ্টি রাখিয়া আমরা আজ গললগ্নী কৃতবাসে তোমাকে প্রণাম করিতেছি—

ওঁ নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-বেদান্তাম্বুজ ভাস্করং।
নমামি যুগকর্ত্তারং আর্ত্তনাথং বীরেশ্বরম্।

হে আর্ত্তনাথ! হে বীরেশ্বর! আমরা আর্ত্ত, আমাদিগকে আশ্রয় দাও, আমরা দুর্ব্বল, আমাদিগকে বীর্য্য দাও! তোমার অসমাপ্ত কর্ম্ম-ভারের যে মহা দায়ীত্ব তাহার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অংশও যাহাতে বহন করিয়া ধন্য হইতে পারি, সে শক্তি দাও!

অচেনা ফুল।

(মহম্মদ ইসমাইল)

চিনিনা তোমারে বটে, ওহে পুষ্পবর!
রূপে কিন্তু কর তুমি আকুল অন্তর।
স্বর্গীয় সুষমারাশি মাখিয়া বদনে,
দাঁড়ায়ে রয়েছ কেন হসিত বদনে,
ভাবিছ কাহার রূপ অপরূপ রূপে,
পবনে তাঁহার কথা কহি চুপে চুপে!
ওগো, ফুলরাণি! তুমি মধুর হাসিনি!
বলিতে কি পার মোরে, তোমা কোন্ ধনী
এহেন মোহিনীরূপে সৃজিয়া যতনে,
ধরারে শোভিতে আজি স্থাপিল এখানে?

আমার পল্লী-জননী।

(শ্রীশচীনাথ পাল)

শৈশবে সুজলা সুফলা শ্যামাঙ্গিনী পল্লী-জননীর দুগ্ধফেননিভ সুকোমল অঙ্কোপরি কত ধূলাখেলা, কত আমোদপ্রমোদ কত হাস্য কৌতুক করিয়া সুবর্ণ-মিহির-কিরণ-জড়িত দিবস প্রদেশ অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যা-নগরীতে পদার্পণ পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে শর্ব্বরীর সুপ্তি ক্রোড়ে নিমজ্জিত হইতাম, আবার কথনও বা ঐ দিবা দেশেই কাঁদিতে কাঁদিতে কোমল কমলোপম জননীর সুকোমল ও প্রেমের অফুরন্ত সিন্ধুবৎ, মধুময় স্নেহাপ্লুত ক্রোড়াসনে উপবেশন করিয়া নিদ্রাদেবীকে গাঢ় আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করিতাম—তাহাত এখনও ভুলি নাই। বরং সেই স্মৃতি-লতিকা যেন দিন দিনই হৃদয়দ্রুমকে দৃঢ়তর পাশে বাঁধিতেছে। ক্ষণে ক্ষণেই সেই জননীর পাদদেশ ধৌতকারিণী উত্তাল তরঙ্গায়িতা সুমধুর কুলু কুলু তানধারিনী সেই সুসলিলা পদ্মা তটিনীর মনোহর প্রাকৃতিক দৃশ্যপট, পাদপনিকর পরিশোভিত গহন কান্তারের অমিয়া জড়িত সুমধুর পিক-রব, বিবিধ বিহঙ্গের গীতি-নিঃসৃতি, বিকচ-কনক-কমল পূরিত প্রমোদ উদ্যানে অলির-গুঞ্জন—তাহাও ত কিছুই ভুলি নাই। সেই মৃদুমন্দ সমীরণ প্রতিঘাতে বেনুবন আনন্দোৎফুল্ল চিত্তে হেলিয়া দুলিয়া ক্রীড়া-চঞ্চল সঙ্গীর মত কি মধুর ক্রীড়ায় রত হইত, সেই তিন্তিড়ীর শাখা হইতে নব নব গুলঞ্চের হার ছিঁড়িয়া প্রিয় সহচরের গলে প্রীতি-উপহার দিয়াছি, সেই রসাল শাখা হইতে সুবর্ণলতিকা-পুঞ্জ চয়ন পূর্ব্বক, ধবলী শ্যামলী বুধি প্রভৃতি দুগ্ধবতী গাভীগণের গলে মাল্য দিয়া আপ্যায়িত করিয়াছি—তাহাও ভুলি নাই। কি ভুলিয়াছি! কিছুই ত ভুলি নাই!! ঐ যে তরুণ-অরুণ-কিরণ পরশে কৃষকগণ স্কন্ধোপরি জীবনের গতি হল-ধারণ করিয়া কর্ষণ কার্য্যে লিপ্ত থাকিত, নরনারীর নবোদ্যম-কর্ম্মকোলা-হল, দীন-দুঃখীর আর্ত্তনাদ, ধনাঢ্যের ধন কামনা-সম্ভূত কর্ম্ম-রোল, এসব কিছুই ত ভ্রমের গভীর কালিমাকূপে নিমজ্জিত হয় নাই; সকলই হৃদয়ের

অন্তঃস্থলে স্তরে স্তরে চিত্রপটের ন্যায় স্বর্ণাক্ষরে গ্রথিত আছে। উহা এখনও ভুলি নাই, এ জীবনে ভুলিতে পারিবও না। সেই দেবীর পীযূষ প্রমাণ প্রীতিকর নামামৃত আজীবন মানবদেহের প্রতি শিরায় শিরায় শ্রাবণের ধারার মত প্রবাহিত হয়, পরম করুণাময় পরমেশ্বর আমাদিগকে অমরাবতী হইতে কর্ম্ম-ক্ষেত্ররূপ দৃষ্ট নগরের যে প্রকোষ্ঠে সর্ব্বপ্রথম প্রেরণ করিয়াছেন সেই "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" প্রাতঃস্মরণীয়া দেবীকে ভুলিয়া যাওয়া কি ইহজন্মে সম্ভবপর? তবে যে পারে সে নিরেট পাষাণ অপেক্ষাও নির্ম্মম; হিমাদ্রী শৃঙ্গ নত হইলেও সেই জননী-বিদ্বেষী কুপুত্র কখনও নত হইবে না। নিজ মায়ের জন্যই যে না কাঁদে, সে যে পরের জন্য কাঁদিবে তার চিহ্ন কি? যতদিন মার্ত্তণ্ড-ময়ুখ-মালা ও সুবিমল কলানিধির রজতগিরিনিভ কলাকুল বসুন্ধরার সুপ্রশস্ত বক্ষোপরি পতিত হইবে, ততদিন স্নেহময়ী পল্লীজননীও তাঁহার বক্ষজ সন্তানের মধ্যে সম্বন্ধ থাকিবেই থাকিবে।

তাহে মাগো সুবরদে!
এ মিনতি করি পদে
অধম সন্তান বলে ঠেলিও না পায়
যদিও মা কুসন্তান,
পাব না কি পদে স্থান;
অপার করুণা হ'তে করিবে বিলয়?
কিন্তু ওগো স্নেহময়ি!
কুপুত্র বলিয়া আমি;
দিবে না কি ওগো মাতঃ তব পদাশ্রয়?
দিও দীনে পদধূলি,
সযতনে শিরে তুলি,
তোমার বিজয়-ভেরী বাজাই সদায়।
তবগুণ গাথা গান
নাহি কোন পরিমাণ
অজেয় অখণ্ড সেই গৌরব ধরায়;

অসীম করুণা বলে
ছল তুমি মহাছলে
অফুরন্ত সুধা তব কভু না ফুরায়!
গাহিতে গো সুললিতে!
তব গুণ গাথা চিতে
কাঁপিছে হৃদয় মোর পাছে ভুল হয়;
দাও শক্তি সঞ্জীবনী
মাগো! শক্তি-স্বরূপিণি!
সিন্ধু হ'তে এক বিন্দু বিতর আমায়।

আহা কি সুখ! কি শান্তি!! কি আনন্দ!!! আজ যে নন্দন কাননে পারিজাতের সৌরভ-হিল্লোলে নৃত্য করিতেছি, আজ যে আমি দেবরাজ আখণ্ডলের শান্তিপুর অমরাবতীতে অমিয়ধরের অক্ষয়, অফুরন্ত অমিয় ভাণ্ডার হইতে মধুমত্ত ভ্রমরের ন্যায় সুধাপানে মত্ত! ইহা অপেক্ষা সুখ আর কি আছে? কি আনন্দ! কি সুখ!! কি শান্তি!!! আজ যে আমি সেই পীযূষ-জননীর সুমধুর গুণ-গাথা-গানে লিপ্ত! আজ যে আমি মায়ের গৌরবে সহস্র গুণ গৌরবান্বিত হইতেছি।

কি আর গাহিব মাগো তব যশোগান?
তোমারি করুণা হ'তে,
আগমন এ মহীতে,
তুমিই দেখা'লে মোরে এ নব ভবন।
ভব রঙ্গ মঞ্চোপরি,
কত কিছু সারি সারি,
সকলি দেখা'য়ে মোর জুড়া'লে নয়ন,
মা ব'লে তোমায় স্মরি,
পাই যেন পদতরী,
পাড়ি দিব এ জলধি, ডরিনা শমন।

মাগো! এখন তোমার সেই স্নেহের সন্তানগণের নিকট চলিলাম; এবং তাহাদের গান একবার গাহিয়া দেখি, তাহাদের গুণ-গরিমা যদি

তোমার ঐ তরুণ অরুণিম চরণকমলের উপযুক্ত বহ্লাঞ্জলি হয় তবেই মাগো! তোমার "স্বর্গাদপি গরিয়সী" নামের মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে; সন্তান যদি উপযুক্ত না হয়, তবে মা তোমার "জননী" নাম ধারণের ফল কি?

"কুপুত্র অনেক হয় কুমাতা নয় কখন ত।" দেখি, নন্দনকাননের এই কুসুম স্তবকটির সুরসাল নামামৃতের অমর কীর্ত্তি পরিবর্দ্ধিত হয় কি না; কিসে হইবে? সেই পন্থা যে সুদূর অতীতের নিভৃত কলিকা কন্দরে বিলুপ্ত প্রায় রহিয়াছে, কেননা তোমার সন্তানগণ যে কুপুত্র, তাহারা অজ্ঞ, বিদ্যাহীন। তাহারা যে মা চিনে না, জননী যে স্বর্গ-দত্ত অমূল্য নিধি তাহা তাহারা জানেও না, জানিতে চায়ও না। তাহারা জননী—এমন কি নিজেকেও জাগাইতে চায় না। পল্লী-নিবাসি ভাইসক! তোমরা যে জগতের অন্যান্য সন্তানগণের সঙ্গে সমকক্ষে সুললিত "পল্লী-গাথা" তানে মত্ত হইয়া বিশ্ববাসীকে মজাইতে পারিতে, কিন্তু আজ তাহাও পার না—আর পারিবেও না। এখন চেষ্টা কর, সময়ের সূক্ষ্ম পুরোভাগ এখনও অতীত হয় নাই, কিন্তু অতি সূক্ষ্ম পশ্চাদ্ভাগ আসিয়া উপস্থিত হইলে আর উহাকে আকড়াইয়া ধরিতে পারিবে না। ঐ দেখ;—ঐ শোন;—

নবীন বঙ্গ, উজলে অঙ্গ,
জননী চিনিল তারা,
একা তোরা কিরে, রহিবি আঁধারে
দিবি না বিজয় সাড়া?
এক ডাকে তারা, সবে দেয় সাড়া,
মাতায় গাহিতে মুল;
তোরা কিরে এবে ঘুম ঘোরে ডুবে
মুলই ভাবিলি ভুল?
জাগ্ জাগ্ তোরা ডাকে দেরে সাড়া
ছাড়রে ছাড়রে ঘুম;
ঘুম ঘোরে ডুবে কত কাল রবে?
(এবে) উজল জনম ভুম।

এখন, কি হইলে এই স্বয়ংবর দান উন্নতিদেবী স্বেচ্ছায় তোমাদিগকে বরমাল্য প্রদান করিয়া তাঁহাকে চরিতার্থ মনে করিবেন ?

কোন্ পথ ধরি'
সাঁতারি সাঁতারি'
উঠিবে জলধি হ'তে ?
অজ্ঞান পাথার,
বিকট আকার
খেলে ঢেউ শতে শতে।

ভাই! আজ যে তোমরা উত্তাল-তরঙ্গ-মালা-সম্বলিত ভীষণ অজ্ঞান অম্বুধি মাঝে হাবুডুবু খাইয়া মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত হইয়াছ ঐ দেখ, অদূরে মনমাঝি উদ্যমহাল ধারণ করিয়া বাসনা-জলধি অতিক্রমের জন্য উন্নতি সৈকতাভিমুখে জ্ঞানতরীখানিকে চালাইয়া নিতেছে। এখনও কর প্রসারণে উহা সজোরে ধারণপূর্ব্বক উহাতে আরোহণ করে; সময় বহিয়া গেলে আর পাবে না।

"নদী আর কাল-গতি একই প্রমাণ ;
অস্থির গতিতে করে উভয়ে প্রয়াণ ॥"

* * *

"Golden opportunity never comes twice."

অজ্ঞানতা পরিহরি,
সুযোগ আঁটিয়া ধ'রে,
অজ্ঞান তিমির হ'তে [illegible]কে আয়!
আয় তোরা নেচে গেয়ে,
অই,—কর প্রসারিয়ে,
ডাকিছে' জননী আজ, আয় চলে আয়।
কুড়েমিতে হে'সে খে'লে;
সময় চলিয়া গেলে
কাঁদিবি আকুল হ'য়ে ব'লে হায়-হায়।

আজিই চলিয়া আয়,
সময় বহিয়া যায়,
দুখের পসরা শিরে নিস্‌না হেলায়।

হায়রে! কাহাদের কাছে এ মিনতি, তাহারা শ্রবণ যুগল থাকা সত্ত্বেও বধির। যত গম্ভীর জ্ঞান-নির্ঘোষই হউক না কেন,—কিছুই যে তাহাদের ঐ বধির কর্ণপুটে প্রবেশ করিতে পারে না—কেবল অরণ্যে রোদন, তাহারা যে এদিকে ভ্রুক্ষেপও করে না। স্বেচ্ছায় অপূর্ব্ব অচ্ছেদ্য, অপার শান্তিভাণ্ডারের পথে জলাঞ্জলি দিয়া, বিষধর, কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম মার্গোপরি পদসঞ্চালন করিতেছে। উন্নতি দেবীর কোমল-করস্পর্শ-সুখ অনুভবও করিতে পারে না এবং উহার মর্ম্মও জানে না। অমূল্য-ধন বিদ্যাখনিতে ডুবিতেও জানে না এবং সেই পরশমণি-লব্ধ জ্ঞান ধনও চিনে না, চিনে কেবল অনর্থের মূল অর্থ আর ঠক্‌বাজী। হায়রে! তাহারা এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবে না যে টাকা-পয়সা থাকিলেও গোল, না থাকিলেও গোল; অধিকন্তু "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি" এই বাক্যের সারমর্ম্ম বুঝিয়াও আবার অর্থের বশীভূত। যাহারা ইহা বুঝে না, জানে না এবং জানিতেও চাহে না, সেই মূর্খ দলের হৃদয় উদ্যানে কেবলমাত্র একটি সৌরভহীন পলাশ পুষ্পই বিকসিত হইয়া তাহার হেয়রাগ বিতরণ করিতেছে, এবং সেই রাগেই তাহারা মাতোয়ারা। কি সেই ফুল? ভোগবাসনা অর্থাৎ "ভোগের জন্যই এই জগৎ" এই বাস সতত্ই বিকীরণ করিতেছে। অন্নবস্ত্র দ্বারা "যেন তেন প্রকারেণ" জীবনটাকে অতিবাহিত করিতে পারিলেই যেন তাহাদের কর্ত্তব্যসাধন এবং জন্ম চরিতার্থ হইবে। তাহারা বুঝে না যে এই ভোগের দৌড় কতদূর। পূর্ব্ববর্ত্তী আশা-পলাশটি যে কতদূর হেয়রাগ নিপূরিত ও ভ্রমাত্মক তাহাদের মানস পটে ভ্রমেও একবার অঙ্কিত হয় না। তাহারা সকলে সমকণ্ঠে সমতানে কর্ণকুহর বিদ্বেষী কণ্টকাকীর্ণ এই কুতান গাহিতেছে;—

বেশ বুদ্ধিমান মোরা বেশ জ্ঞানবান্‌।
আর বুদ্ধি চাইনা মোরা এ'তেই আট্‌খান্‌

আহা! কেমন বুদ্ধিমান! ওরে মূঢ়গণ একবার মোহান্ধতার ছলনা

পাশ ছেদন করিয়া জগতের বিবরণ পটে জ্ঞান দৃষ্টিভরে, ন্যায়-নেত্র স্থাপন করিয়া দেখ্ দেখি, কোন্ নবীন জাগ্রত কিম্বা সুষুপ্তির ক্রোড়-শায়িত দেশ তোদের ন্যায় ঐ শ্রবণ-বিরোধী হেয়তানে মত্ত? কোন্ জাতি, কোন্ সমাজ, অথবাএমন কোন্ জন আছে যে জ্ঞান-জলধি-নীরে ঐ অক্ষয় ভাণ্ডারের মণি কাঞ্চন লালসায় ডুব না দেয়? তারা যে সমস্বরে মধুর বীণাঝঙ্কারে গাইতেছে;—

মুখ দেখা'তে আসিনি এ ভবে,
সাধিতে হ'বে সাধনা;
জ্ঞানাকর হ'তে তু'লে নিতে হ'বে
পূরাতে মন বাসনা।
সুযশ রটাব, এ বাসনা রবে,
হৃদয়-পিঞ্জর মাঝে;
করিব সুকায উড়িবে তবে
সুযশ কিরীট সাজে।

ঐ শোন্, ঐ শোন্ মন মজা'য়ে শোন্ কি মধুর গাণ :—

আয় চ'লে আয়
কি মধুর গায়
মোরাও মজিব এ মধুর তানে
ললিতা গাথায়,
গাথি চ'লে আয়
মজিব অমিয়া পানে,
আয় তোরা আয় আজি সুখের মিলনে।

আরো দেখ, ঐ জ্ঞান-তরুর বিটপ-রাজি কেমন সুন্দর ভাবে, বাহু প্রসারণে প্রসারিত; মধুর কলকণ্ঠ ঝঙ্কারে প্রকৃত মানব বিগহ-নিচয় ঐ তরুশাখে বসিয়া কেমন সুমধুর অমিয়ারাশি বর্ষণ করিতেছে। ভাইসব! তোরাও চ'লে আয় না!

ঐ দেখ, সাহিত্য, দর্শন, ন্যায়, গণিত; বিজ্ঞান, নীতি, প্রভৃতি কত শাখা প্রসারিত। তোরা উড়ে আয় না। ঐ বিটপাসনে উপবিষ্ট হইয়া

ঐ ঘ্রাণে মত্ত হ'য়ে দেখ্ না—কি শান্তি! কি সুখ!! কি আনন্দ!!! এই প্রসূন-মকরন্দের শেষ এইখানেই নহে, ইহার শেষ নাই। ঐ দেখ্ সংসারোপযোগী অর্থপ্রসূ শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি বিটপনিচয় দুলিয়া দুলিয়া ভ্রমান্ধ জগদ্বাসীকে আহ্বান-লিপি জ্ঞাপন করিতেছে। "আগে জ্ঞান-শাখে উপবিষ্ট হইয়া পরে ঐ শাখায় উড়িয়া আইস। জগত সতত তোমাদের ঐ গীতি-লহরী প্রভঞ্জন-হিল্লোলে আন্দোলিত করিয়া তুলিবে। নতুবা"—হে জ্ঞানান্ধ পশুগণ! আর পূর্ব্বের ন্যায় বক্ষস্ফীত করিয়া ঐরূপ দাম্ভিক বাক্য ঐ কলুষিত বদনে উচ্চারিত করিও না।

ত্যাজ হেন দম্ভপুর কলুষ বচন,
সরলতা ভরে সবে হও আগুয়ান;
তবে সে উন্নতি দেবী গ্রীবা-দেশ বেড়ি'
দানিবেন বরমাল্য, বাজাইয়ে ভেরী।

ভাই! ঐ অজ্ঞান কালিমা অকূল জলধির অতলতলে ডুবাইয়া দিয়া লুপ্ত জাতির গৌরব সঞ্জীবনী জ্ঞানামিয়তরে স্বর্গীয় স্ফুট আলোকে নবোল্লাসে, নবীন মানসে, নবীন সাহসে বীরের ন্যায় চলিয়া আয়। ঐ দেখ অদূরে সেই দ্যুতি-রেখা তোদের প্রতীক্ষায় অবস্থিতি করিতেছে। আয়রে আয়! দৌড়ে' আয় ঐ জ্ঞানালোকের সাহায্যে জ্ঞানামরাবতীতে চলিয়া যা। আর কাল বিলম্ব করিস্‌নি।

বহুক্ষণ যাবৎ ভাইদের নিকট জ্ঞানদেবীর অনুকম্পা প্রাপ্তির সম্বন্ধে ভাঙ্গা কাঁসির স্বরে 'সুর' মিলাইয়া বহু গান গাহিলাম, এখন স্থানীয় ও পার্থিব উন্নতি সম্বন্ধে কূপমণ্ডুকের তানে কিছু গাহিব। দেখি কতদূর কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে সমর্থ হই। যদি ইহাতে কোন উপকার হয় তাহা হইলেই নিজেকে যথেষ্ট কৃত-কৃতার্থ জ্ঞান করিব

লুপ্ত, অবনত, অজ্ঞান-তিমির-গহ্বর পার্শ্বে সুষুপ্ত নগরের জীবন-সঞ্জীবনী শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষি। ইহাদের মধ্যে বাণিজ্য ও কৃষিই প্রধান যেহেতু "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীস্তদর্দ্ধং কৃষি কর্ম্মণি"—অর্থাৎ বাণিজ্যেই লক্ষ্মীর পূর্ণমাত্রায় অধিষ্ঠান্ এবং বিকাশ, আর কৃষি কর্ম্মে তাহার অর্দ্ধেক অবস্থিতি। শিল্পেও তদ্রূপ।

ভাইগণ! তোমরা যে অতি হেয়, অতি অবনত। তোমরা একবার উপরোক্ত সঞ্জীবনী কয়টি, যার যে অজ্ঞানতা রোগানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ-পূর্ব্বক একবার মাত্র পান করিয়া দেখ না!—তোদের ঐ মৃতদেহেও জীবন সঞ্চার হইবে—না আসেত ঐ সঞ্জীবনীই সজোরে আকর্ষণ করিয়া আনিবে চুম্বক যেরূপ দূরস্থ বা অদূরস্থ লৌহপিণ্ডকে সজোরে টানিয়া আনে, ঐ সঞ্জীবনী চুম্বক তোমাদের জ্ঞান-লৌহপিণ্ডকেও সেইরূপ আনিবেই আনিবে। হায়! তোমরা ত তাহাও জান না, শিল্প, বাণিজ্য, দুইয়ের কোনটিই জান না, উহার মর্ম্ম বুঝ না লক্ষ্যও কর না।

ভাই সব!—

কিঞ্চিৎ কটাক্ষ-পাতে হের এই দেশে
অসভ্য ইংরেজগণ, জার্ম্মাণ, মার্কিণ,
রুষিয়া, ফরাসী আর নবীন জাপান
উন্নতি শিখরে বসি ধ'রেছে বিতান।
শিল্প বাণিজ্য আদি করিয়া গ্রহণ।
তোরা কিরে তবে শুধু অক্ষম জগতে
উড়াতে বিজয়-ধ্বজা, জাগাতে নিজেরে
জাগাতে মাতায়? বিশ্বাস না হয় তায়!
নগণ্য অসভ্য জাতি জাগিল, জাগাল
প্রাচীন সুসভ্য তোরা আর্য্যবংশধর
দেবতার লীলাভূমি পবিত্র ভারতে
জন্মিয়াছ কত পুণ্য ফলে; তোরাই অক্ষম
এবে জাগাইতে শির! হৃদয়-মন্দিরে
কেন হেন সয়তানে রাখিয়ে যতনে
ফুলদল-হারে তার পূজিছ চরণ?
ত্যজিয়া ভ্রমের দেশ আয় চলে আয়;—
ধর শিল্প ধর কৃষি বাণিজ্য ঔষধি
নাশিবে তোদের এই কঠিন পীড়ায়।

ভ্রাতৃবৃন্দ! শিল্পবাণিজ্যের কোমল কর ধারণ করিয়া ধনরাজ্যে চলিয়া

আইস, উন্নতি-সোপান অতিক্রম করতঃ যশোগিরি আরোহণ কর! অবশ্য জাগিবে—মৃতজননীর দেহেও নবজীবন সঞ্চার করিয়া তাহার অবনত শির উন্নত করিতে পারিবে। জগত তোদের নামামৃত পান করিয়া চরিতার্থ হইবে।

এখন আবার কৃষিতত্ত্বের মনোরঞ্জন গুণাবলী ঝিঁঝির কর্ণশূল রাগিনীতে পৃথক্‌ভাবে গাইয়া দেখি। কৃষির অপার, অছেদ্য ও দুর্দ্দম্য ক্ষমতা। কার সাধ্য আছে যে ইহার উপর হাত ধবে। এই মহাজন ইচ্ছা করিলে জনসমাজকে হাসাইতেও পারে, আবার কাঁদাইতেও পারে। এক বৎসর যদি এই সদাশয় ত্যাগী পুরুষ এ মর্ত্ত্যভূমে অবতীর্ণ না হইয়া বিলুপ্ত থাকেন, তবে দাম্ভিক, গর্ব্বিত মানবগণ অন্নবস্ত্রাভাবে অহোরাত্র কাঁদিতে কাঁদিতে আকুল হইয়া অবশেষে এত গরীমাব তাহাদের সেই সাধের দেশই ত্যাগ করিয়া নিরভিমানী গুপ্ত দেওয়ানজীর আলয়ে আথিত্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। বৎসরেক ধান্যাদি শস্য ও কার্পাসের চাষ না হইলে প্রাণ পায়রা লুব্ধ দুর্ভিক্ষ শ্যেন পক্ষীও শিকার অন্বেণষকারী ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দূলবৎ মর্ত্ত্যকাননে প্রবিষ্ট হইয়া অন্ন-বস্ত্ররূপী আত্মরক্ষণাসিহীন ব্যক্তিকে অকালে গুপ্তপুরে প্রেরণ করে। ঐ দেখনা সুবিস্তৃত রুষিয়া সাম্রাজ্যের অন্ন-বস্ত্র প্রপীড়িত জন সমাজ আজ কেমন ক্লেশভোগ করিতেছে। কত লোক কালের করাল-কবলে পতিত হইয়া এ ধরাধাম ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, যাইতেছে ও যাইবে। কি দুরবস্থা! কেন? গত পৃথিবীব্যাপী মহাসমরের ফলে ফসল হয় নাই; তাই তাহারা এরূপ দুঃখ সাগরে নিমগ্ন। তাই বলিতেছি তোমরা এখনও মনে প্রাণে 'কৃষি কার্য্য' আরম্ভ কর, কেন না তোমাদের এই ধনেরই সম্যক অভাব। তোমরা স্নেহময়ী পল্লীজননীর নিকট হইতে যে পরিমাণে খাদ্য চাহিয়া লইতেছ উহাতে চলিবে না। তোমরা বিদেশের দিকে তাকাইয়ে আছ, তাহারা অশন-বসন প্রেরণ করিলে তদ্দ্বারা জীবন ধারণ করিবে। এখনও এই আশা-কীটকে হৃদয়-প্রদেশ হইতে তাড়াইয়া দেও নচেৎ এই বিসদৃশ কীট ক্রমশঃ স্ববংশ বৃদ্ধি করতঃ তোমাদের হৃদয় প্রদেশেই সয়তানের রাজ্য পরিচালনা করিবে।

তোমাদের মন তখন ঐ প্রেত রাজ্যের প্রজা হইবে, তখন ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক মহারাজের মনস্তুষ্টি করতেই হইবে। সুতরাং এখনও উহাকে হৃদয় হইতে দূর করিয়া দেও। কেননা আজ যদি ঐ বিদেশ হইতে ধান চাউল রপ্তানি বন্ধ হইয়া যায়, তবে যে আমাদিগকে অনাহারেই প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইবে। আমাদের সুজলা সুফলা পল্লীভূমি থাকিতে আমরা অনাহারে অমূল্য জীবনকে অবহেলে যমপুরে প্রেরণ করিয়া কর্ম্মময় জীবনকে জবাবদিহী করিব কেন? ইংলণ্ডের পৌরাণিক প্রাকৃতিক কাহিনী স্মৃতি পথের সহচর করিয়া দেখদেখি; তাহারা আধুনিক কৃষি জগতে কিরূপ কল্পনাতীত উচ্চতম স্থান গঠন করিয়াছে। আবার দেখ, প্রাচীন পাঞ্জাব ও নবীন পাঞ্জাব ইহাদের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিবে তাঁহারা কঠোর কায়িক পরিশ্রম সাহায্যে অধুনা কৃষিতত্ত্ব বিষয়ে স্বপ্নাতীত উন্নতির পরাকাষ্ঠা মানব চক্ষের সাথী করিয়া দিয়াছে।

অবনত ছিল যারা সকলি জাগিল তারা
কৃষি ভার ল'য়ে শিরোপরে
অবহেলে কৃষি ছেড়ে, পরের আশায় ফিরে
কাঁদিও না শেষে দুঃখ ভ'রে।
আগেই কাঁদিয়া যাও শেষে যদি হাসি চাও
হাসিয়া যেওনা আগে ভাই;
আগে তায় ভালবাসি কাঁদি শেষে দিবানিশি
দুঃখরাশি ছাড়ান না যায়।

তাই পূর্ব্বে কঠোর ও ঐকান্তিক পরিশ্রম সহকারে কৃষিকার্য্য আরম্ভ কর—উন্নতি অবশ্যম্ভাবী; অন্নকষ্ট বিলীন হইয়া সুখের রাজ্য চলিয়া আসিবে!

হায়! কারকাছে এই কথা? তাহারা কলুষিত অজ্ঞান সাগরে নিমগ্ন! এমন অনেক আছে যাহারা এই শান্তির আকর কৃষিকে আবার বিবৃত শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতিকেও হেয় জ্ঞান করে কিন্তু তাহারা এইটুকু বোঝে না যে দুঃখবিনাশী হলধরের সেই হলযন্ত্রই তিনি জীবের

দুঃখ দেখিয়া তাহাদের আত্মরক্ষার্থে ভূমিকর্ষণ যন্ত্ররূপে তাহাদিগকে অনুগ্রহ দান করিয়াছেন। আবার ঐ যে শিল্প পণ্যদ্রব্য সম্ভারপূর্ণ জলযান, উহার ঐ দ্রব্য দ্বারা সাংসারিক দুঃখ বিনাশক তীক্ষ্ণধার অসি আনয়ন করিবে, তাহা তাহারা একবার ভ্রমেও ভাবিয়া দেখে না।

যাহার অভাব হ'লে প্রিয়প্রাণ পাখী
অকালে কালের মুখে হয় নিপতিত
তাহার সুনামে আজি ঘৃণার সঞ্চার
ইহা কিরে শোভে তোরে আর্য্য বংশধর?
ত্যজ অভিমান, ধর মূল মন্ত্র সার—
হল চালনেতে সবে হবে নিয়োজিত।
নাহি লজ্জা নাহি অপচয়; সম্পূরিত
হবে ধরা গুণ গরিমায়।

কেবল ইহা করিলেই সম্যকরূপে উন্নতি লাভ হয় না, সাধারণ পল্লী সংস্কার ও হিতকর কর্ম্ম পরিচালনার্থ একটি "পল্লী-সমিতি" গঠিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। সেখানে বিদ্যা বল, ধন বল, জন সম্বন্ধীয় বল অথবা স্থানীয় জন সাধারণের কল্যাণ কামনার্থ কার্য্য বল অথবা শান্তি বিধান বল সকলই এই সাধারণ সমিতিতে আলোচিত হইবে। ইহার অন্যনাম, জন সাধারণের কল্যাণ সাধনার্থ বলিয়া, "কল্যাণ-সমিতি" বলিয়াও অভিহিত হইতে পারে। আমার জন্মভূমি সেই পল্লীতে এই শান্তি সমিতিটি আছে, কিন্তু ইহার কোন কার্য্যই সুচারু রূপে পরিচালিত হইতেছে না। উহাতে সামাজিক ও সাংসারিক অনেক বিচার কার্য্য সম্পাদিত হয়। আর কোন বিষয়ই উহাতে পরিলক্ষিত হয় না। উন্নতি বল, সুখ বল, শান্তি বল কোন বিষয়ের প্রতিই সভ্যগণের লক্ষ্য নাই;—কেবল "সমাজ সমাজ" বলিয়া পল্লী জুড়িয়া উচ্চনাদ। যদি উন্নতি মূলক ও শান্তিবিধায়ক, কোন উপায় অবলম্বন না করে তবে কি শুধু সামাজিকতাতেই তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

আবার ঐ সমিতির নিকট কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে কর্তৃপক্ষগণ

উত্তর করেন যে তাঁহারা বেশ করিতেছেন এবং উহার কার্য্য সুন্দর রূপেই সাধিত হইতেছে। কেন তাঁহারা এরূপ ভুল করিতেছেন? তিমিরাবৃত আবর্জ্জনাময় ভবনের ন্যায়, তাঁহাদের ঐ জ্ঞানালোক রহিত, অবিদ্যা কালিমাজড়িত হৃদয়েও কামক্রোধাদি বিবিধ কীট ও তাহার বীজাঙ্কুর সৃষ্টি;—তাহারা উহার ধ্বংস সাধনও করিতে পারে না, জ্ঞানালোকেও আসিতে পারে না। তাঁহাদের মধ্যে বহু ভূরি ভূরি বিদ্বান ব্যক্তিও আছেন কিন্তু তাঁহাদের নিকট উপরোক্ত বিষয় প্রশ্ন হইলেও তাঁহারা ঐরূপই উত্তর প্রদান করিয়া থাকেন এবং স্বয়ং বিদ্বান বলিয়া দাম্ভিকতা প্রকাশ করেন পরন্তু তাঁহারা মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবেন না, যে, বলীবর্দ্দ বহনযোগ্য গ্রন্থরাশি গলাধঃকরণ করিয়াই যাহারা প্রকৃত বিদ্বান বলিয়া বড়াই করেন তাহারাই যথার্থ মূর্খ। তাহারা যে, নির্লজ্জের ন্যায় ঐরূপ মধুময় বাক্য তাহাদের শূন্য ভাণ্ডার হইতে নিঃসৃত করিতেছেন—তাহারা কি তদনুযায়ী কোন কার্য্য সাধন করিয়াছেন? ঐ যে আমার স্নেহময়ী পল্লী জননীর পুত্র, কত কত ভ্রাতাগণ বৎসর বৎসরই সংক্রামক ব্যাধির করাল কবলে নিপতিত হইয়া "হায় হায়রে" করুণ ক্রন্দন ধ্বনি করিয়া পরিশেষে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, উহা কি ঐ নিষ্কর্ম্মা কর্ত্তৃপক্ষগণের দৃষ্টিশক্তির অন্তরালে? তাঁহারা কি উহা দেখিতে পান না? হাঁ অবশ্যই পান। তবে তাঁহারা এই নর-মাংসলব্ধ ভীষণ শার্দ্দূলকে দেশ-বহির্ভূত করেন না কেন? করিবেন কি?—তাঁহারা যে ইহার উপায়ই জানেন না। স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানে যে তাঁহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। যে দিন তাঁহারা এই শান্তি শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়া সেই শাস্ত্রানুযায়ী, পল্লীখানির শান্তি বিধানে সমর্থ হইবেন, সেই দিন হইতে ইংলণ্ডের ন্যায় আমার জন্মভূমিও সুন্দররূপে উচ্চ আদর্শে গঠিত হইবে। তাই, ভাইদিগকে কৃতাঞ্জলি-পুটে এই নিবেদন স্থাপন করিতেছি,

ভাই সব!;—

ধর এ শাস্ত্র,
লভিবে অস্ত্র;
বধিয়ে ব্যাধি-শার্দ্দূলগণে;—

পাইবে শান্তি,
রবে না শ্রান্তি
ধর সবে "শৃঙ্খল বিধানে"।

যাক্ এই কথা। আবার এই যে বিগত ১৩২৬ সনের ভাদ্র মাসে এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ বিকট মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমার পল্লী জননীর পাদ প্রক্ষালন-কারিণী পদ্মাতরঙ্গিণী অতিক্রম করিয়া কোথা হইতে যেন অজানিত অভাবনীয় একটা কিসের ন্যায় হঠাৎ উপস্থিত হইয়াছিল,—সেই সময় অন্ন বস্ত্রাভাবে দীন দুঃখীর হাহাকারে, সাধারণের অত্যাচারে, আমার সেই পল্লী জননী শ্রীহীনা হইয়াছিল। অন্নাভাবে ২।৪ জন ভাই ও অন্য ভাইয়ের মুখপানে কাতর দৃষ্টিতে তাকাইয়া অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, আবার বস্ত্রাভাবেও ঐরূপ কত কত পুরনারীগণ দিগম্বরী সাজিয়া ব্রীড়াবনত হইয়া কতকদিন গৃহ মধ্যে কাটাইয়া অবশেষে আত্মহত্যা করিয়াছে। উহা কি তাহারা সাময়িক তন্ত্রানুযায়ী লক্ষ্য করেন নাই? ভ্রাতৃপ্রেমের ডুরি কি ঐ সামান্য বিপদ পাতেই ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল? সেই প্রেমডুরি স্বয়ং পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন পর্য্যন্ত খণ্ড করিতে পারেন না, সেই অখণ্ড প্রেমাকুসী সামান্য দুর্ভিক্ষাস্ত্র দ্বারা কর্ত্তিত হইয়াছিল। কপট প্রেমের বশবর্ত্তী হইয়া আত্মজ্ঞান পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছিল! ধনাঢ্যগণ কি এই ২।৪ জনের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতে পারিতেন না? তাঁহাদের ধন ভাণ্ডার কি শূন্য হইয়া যাইত? আমি বলি নিশ্চয়ই শূন্য হইত না। তবে? ভ্রাতৃ প্রেমের অভাব: ভাই সব! মনে রাখিও যে যিনি একবার ভ্রাতৃপ্রেমের স্বচ্ছ সুপেয় স্নেহ সলিল পূর্ণ ও দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি প্রস্ফুটিত কমলদল নিপূরিত সরোবরে মাত্র একবার ডুব দিয়াছেন, তিনি ইহার মর্ম্ম জানেন। একডোরে বদ্ধ হও পরিণাম অকূল শান্তি!

ঐ দুর্ভিক্ষের আর এক কারণ—কৃষির অভাব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি কৃষি ধারণ না করিলে ইহা স্বাভাবিক সুতরাং উহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

আবার পথঘাটের অসুবিধার প্রতিবিধান বলিতেছি। পথঘাটের

অসুবিধা হইলে অবনতী অবশ্যম্ভাবী, অতএব ইহার প্রতিবিধানার্থে গ্রাম্য দশজনে মিলিয়া চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

নদীর তীরস্থিত পল্লী বলিয়া ষ্টীমার ও নৌকার সর্ব্বদাই যাতায়াত আছে, সুতরাং ব্যবসা বাণিজ্যেরও বিশেষ সুবিধা আছে, কিন্তু এত সুযোগ সত্ত্বেও যে কেন ভাইগণ তাহাতে লিপ্ত হন না,—ইহার কারণ উপরি উক্ত বোকামি ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু তাঁহারা যে আদৌ ভাবেন না যে এইরূপ কার্য্য করিলে অবশ্য তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন, ইহাই দুঃখের বিষয়; অতএব ভাইদের সবিনয় নিবেদন করিতেছি এবং বিশেষ অনুরোধ করিতেছি যে ধর বাণিজ্য, ধর কৃষি—ভবিষ্যৎ সুবর্ণময় হইবে।

পূর্ব্ব কথিত সমিতিতে উপরোক্ত বিষয় কিছুই আলোচনা হয় না, ইহাতে দেশের দশের উন্নতি কল্পনা একান্ত আবশ্যক। আবার ঐ যে মধুভরা সামাজিক কুম্ভে "বাল্য-বিবাহ" নামে একটি রন্ধ্র রাখা হইয়াছে, ওটিকে বন্ধ করা হয় না কেন? উহার সংশোধন একান্ত আবশ্যক। হয় উহার সংশোধন কর নয় উন্নতির আশা ত্যাগ কর। আমরা এভবে আসিয়া যদি জন্মভূমিই পবিত্র করিতে না পারিলাম তবে এ ছার জীবনে কায কি? সংসারে আসিয়া শায়ক মার্গবৎ অচিহ্নিত ভাবেই যদি চলিয়া যাইতে হইল, জগতের চক্ষের সহচরই যদি এক মুহূর্ত্তের জন্যও হইতে না পারিলাম, তবে আমরা জন্মিয়াও যাহা না জন্মিলেও তাহাই হইত। 'মান' এবং 'হুঁস্' যদি আমাদের বজায় না থাকে, তবে আমরা কিসের মানুষ, আমরা মানবদেহধারী পশু বইত নয়? জগতই বা আমাদের পাপ নাম স্মরণ করিবে কেন? ধিক্ আমাদের জীবনে. ধিক্ আমাদের সমাজে, শত ধিক আমাদের শৌর্য্যোবীর্য্যে, সহস্র ধিক্ আমাদের পুত্র পরিচয়ে;—

> ধরিত্রীর অন্যদেশ জাগিয়া নবীন-
> যুগে, উচ্চশিরে ডাকে "মা,মা" ব'লে, হায়!
> মোরা কি মানুষ নহি কূপের মণ্ডুক,
> রহিব অজ্ঞাতসারে নীচুকরি শির?

ছাড় ঘুম ঘোর, কেশরী হুঙ্কারে শুবে
নব জাগরণ নাদ দিগন্ত ভেদিয়া
উঠা'য়ে সকলে, মেদিনী টলা'য়ে আয় !
জাগরে জাগারে অই অবনত শির
পশু নাম কর ত্যাগ, হও 'মান, হুঁস'
ধন্যবাদ-পারিজাত বর্ষিবে অমর
তোদের মাথায়, গাইবে গন্ধর্ব্বগণ
সুযশ তোদের গভীর জীমূতমন্দ্রে,
শান্তির আবাস-ভূমি হবে ভাবী কাল ।

ঐ শোন কাণের ভিতর বাহিয়া মরমে কেমন বাজিছে ;—

"সত্য, প্রেম, পবিত্রতা" এই বুঝেছি সার,
এরাই হবে মূলমন্ত্র মোদের পতাকার !
এই তিনটি লক্ষ্য করে যেন চলে যাই,
মানুষ হওয়া চাইরে মোদের মানুষ হওয়া চাই ।

একটী নমস্কার ।

(মহম্মদ ইসমাইল)

তুমি, যথায় সোণার রবি সোণালি কিরণ,
ঢেলে করিছে বিশ্বমোহন,
গাছপালাতে আলো ঠেকিয়ে,
অপরূপের মেলা বসিয়ে,
যেন, পাষাণেতে বুক বেঁধে,
ঐ বিদায় নিচ্ছে কেঁদে কেঁদে,
তথায় চরণযুগল ছড়া'য়ে রেখে,
একটিবার দাঁড়াও সখে !
আমি ভক্তিভরে নত হ'য়ে,
কায়মন প্রাণ ঢেলে দিয়ে,
তোমার, অই সোণালি পায়ে
প্রাণ সখে ! করি শুধু একটী নমস্কার ।

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(১২)

যুক্তরাজ্য, আমেরিকা।

২৬শে ডিসেম্বর, ১৮৯৪।

প্রিয়বরেষু—

শুভাশীর্ব্বাদ। তোমার পত্র এইমাত্র পেলাম। নরসিমা ভারতে পৌঁছেছে শুনে সুখী হলাম। ডাঃ ব্যারোজের ধর্ম্মমহাসভা সম্বন্ধে বিবরণ পুস্তকখানি তোমায় পাঠাতে পারিনি বোলে আমি দুঃখিত। পাঠাতে চেষ্টা কোর্‌বো। কথাটা হচ্ছে এই যে, ধর্ম্মমহাসভা সম্বন্ধে সব ব্যাপার এদেশে পুরোণো হয়ে গেছে। তিনি সম্প্রতি কোন বই লিখেছেন কি না জানি না আর তুমি যে কাগজখানির কথা উল্লেখ করেছো, তার সম্বন্ধেও কখন কিছু জানি নি। এখন ডাঃ ব্যারোজ, ধর্ম্মমহাসভা, ঐ সংক্রান্ত এইপত্র ও অন্য যা কিছু প্রাচীন ইতিহাস হয়ে দাঁড়িয়েছে সুতরাং তোমরাও ঐগুলিকে ইতিহাসের সামিল ভাব্‌তে পার।

এখন আমার সম্বন্ধে:—প্রায়ই শুনে থাকি, কোন না কোন মিসনরি কাগজে আমাকে আক্রমণ করে লিখে থাকে—আমার তার কোনটা দেখ্‌বার ইচ্ছাও হয় না। যদি ভারতের ঐ রকম মিশনরিদের আক্রমণ সম্বলিত কোন কাগজ আমাকে পাঠাও, তা হলে তা জঞ্জালের সঙ্গে ফেলে দেব। আমাদের কাসের জন্য একটু হুজ্জতের দরকার হয়েছিল—এখন যথেষ্ট হয়েছে। এখন আর লোকে এখানে বা সেখানে আমার পক্ষে বা বিরুদ্ধে ভালমন্দ কি বল্‌ছে, সে দিকে আর লক্ষ্য কোরো না। তুমি তোমার কায করে যাও আর মনে রেখো—

'নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি'

—গীতা—

—হে বৎস, সৎকর্ম্মকারীর কখন দুর্গতি হয় না।

এখানে দিন দিন লোকে আমার ভাব নিচ্ছে আর তোমাকে আলাদা বল্‌ছি, তুমি যতটা ভাব্‌ছো, তার চেয়ে এখানে আমার যথেষ্ট প্রতিপত্তি। সব জিনিষই ধীরে ধীরে অগ্রসর হবে।

বাল্টিমোরের ঘটনা সম্বন্ধে বক্তব্য এই, যুক্তরাজ্যের দক্ষিণ ভাগে লোকে নিগ্রো-শঙ্কর জাতের সঙ্গে অন্য কৃষ্ণকায় জাতির প্রভেদ জানে না। যখন জান্‌তে পারে, তখন দেখ্‌বে, তারা খুব আতিথেয়। টমাস স্মিথ-থ্রেম্পিসের কথা নিয়ে ব্যাপারটা আমার নিকটও নূতন সংবাদ বটে! আমি তোমায় পূর্ব্বেও লিখেছি, এখনও লিখ্‌ছি, আমি খবরের কাগজে সুখ্যাতি বা নিন্দায় কোন কান দিই না. ঐরূপ কিছু আমার কাছে এলে আমি অগ্নিদাহ করি, তোমরাও তাই কর। খবরের কাগজের আহাম্মকি বা কোন প্রকার সমালোচনার দিকে যোগ কোরো না। মনমুখ এক করে নিজের কর্ত্তব্য সাধন করে যাও—সব ঠিক হয়ে যাবে। সত্যের জয় হবেই হবে। দোহাই, আমাকে খবরের কাগজ বা সাময়িক কোন পত্র বা কোন বই পাঠিও না। আমি সর্ব্বদা ঘুরে বেড়াচ্ছি—সুতরাং ঐ সব জিনিষের বোঝা বইতে গেলে আমার কি কষ্ট তা বুঝ্‌তেই পাচ্ছ।

মিশনরিদের গ্রাহ্যের মধ্যেই এনো না—এখানে কোন ভদ্রলোকই তাদের গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। ভারতে তারা হাত পা চাপড়াক—ডাঃ ব্যারোজও যে এখানে একজন খুব বড় লোক, তা নয়। তাদের কথার উপরে আমি সম্পূর্ণ নীরব হয়ে থাকি, আমার ইচ্ছা—তোমরাও তাই কর। সর্ব্বোপরি আমাকে ভারতীয় খবরের কাগজের বন্যায় ভাসিয়ে দিও না—ওর ভিতর থেকে আমার যা দরকার ছিল, তা হয়ে গেছে—আর না—এখন কাযে মন দাও—আয়ারকে তোমাদের সভার সভাপতি কর। আমি তাঁর মত অকপট ও মহদাশয় লোক আর দেখিনি। তাঁর ভিতর হৃদয় ও বুদ্ধিবৃত্তির খুব সুন্দর সামঞ্জস্য আছে—তাঁকে সভাপতি করে কাযে অগ্রসর হয়ে যাও। আমার উপর বড় নির্ভর কোরো না—নিজেদের উপর নির্ভর করে কায করে যাও। এখনও আমি অকপট ভাবে বিশ্বাস করি, মান্দ্রাজ থেকেই শক্তিতরঙ্গ

উঠ্‌বে। আমার সম্বন্ধে কথা এই, কবে আমি ফিরে যাচ্ছি জানি না। আমি এখানে সেখানে দুজায়গায়ই কায কচ্ছি। আমি এই পর্য্যন্ত সাহায্য করতে পার্‌ব যে, মাঝে মাঝে কিছু কিছু টাকা পাঠাতে পার্‌ব। তোমরা সকলে আমার ভালবাসা জান্‌বে।

সদা আশীর্ব্বাদক
বিবেকানন্দ।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(১৩)

যুক্তরাজ্য, আমেরিকা।
১৮৯৪।

প্রিয় আলাসিঙ্গা,—

একটা পুরাতন গল্প শুন:—একটা লোক একটা রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে একটা বুড়োকে তার দরজার গোড়ায় বসে থাক্‌তে দেখে, সেইখানে দাঁড়িয়ে তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—ভাই, অমুক গ্রামটা এখান থেকে কতদূর? বুড়োটা কোন জবাব দিলে না। তখন পথিক বার বার জিজ্ঞাসা কর্‌তে লাগ্‌লো, কিন্তু বুড়ো তবু চুপ করে রইল। পথিক তখন বিরক্ত হয়ে আবার রাস্তায় গিয়ে চল্‌বার উদ্যোগ করলে। তখন বুড়ো দাঁড়িয়ে উঠে পথিককে সম্বোধন করে বল্লে—"আপনি অমুক গ্রামটার কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছিলেন—সেটা এই মাইল খানেক হবে।" তখন পথিক তাকে বল্লে, "তোমাকে এই একটু আগে কতবার ধরে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—তখন ত তুমি একটা কথাও কইলে না—এখন যে বোল্‌ছো —ব্যাপারখানা কি?" তখন বুড়ো বল্লে, "ঠিক কথা। কিন্তু প্রথম যখন জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলে, তখন চুপচাপ করে দাঁড়িয়েছিলে, তোমার ভাব দেখে তোমার যে যাবার ইচ্ছা আছে, তাই বোধ হচ্ছিল না—এখন হাঁট্‌তে আরম্ভ করেছ, তাই তোমাকে বল্লাম।"

হে বৎস, এই গল্পটা মনে রেখো। কায আরম্ভ করে দাও, বাকি সব আপনা আপনি হয়ে যাবে। গীতায় ভগবান্ বলেছেন,—

'অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।

তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং'

অর্থাৎ যিনি আর কারও উপর নির্ভর না করে কেবল আমার উপর নির্ভর করে থাকেন, তাঁর আর আর যা কিছু দরকার আমি সব যুগিয়ে দি।

ভগবনের এ কথাটা ত আর স্বপ্ন বা কবিকল্পনা নয়।

প্রথম কথা হচ্ছে, আমি সময়ে সময়ে তোমায় অল্প সল্প করে টাকা পাঠাব। কারণ, প্রথম কল্‌কেতাতেও আমাকে ঐ রকম কিছু কিছু বরং মান্দ্রাজের চেয়ে কিছু কিছু বেশী বেশী পাঠাতে হবে। তথায় আন্দোলন আমার কথায় নির্ভর করে কেবল রাস্তায় দাঁড়িয়েছে, তা নয়, রীতিমত নাচ্‌তে সুরু করেছে। তাদের আগে দেখ্‌তে হবে। দ্বিতীয়তঃ, কল্‌কেতা অপেক্ষা মান্দ্রাজে সাহায্য পাবার আশা বেশী আছে। আমার ইচ্ছা—এই দুটা কেন্দ্রই এক সঙ্গে মিলে মিসে কায করুক। এখন কিছু পূজাপাঠ প্রচার এই ভাবেই কায আরম্ভ করে দিতে হবে। একটা সকলের মেল্‌বার জায়গা কর, তথায় প্রতি সপ্তাহে কোন রকম একটু পূজাঅর্চ্চা করে সভাষ্য উপনিষদ্ পাঠ হোক—এইরূপে আস্তে আস্তে কায আরম্ভ করে দাও। একবার চাকায় হাত লাগাও দেখি—চাকাটী ঠিক ঘুরে যাবে।

আমি মিররে অভিনন্দনটা ছাপা হয়েছে দেখ্‌লাম—ওরা যে এটা ভালভাবে নিয়েছে, তা ভালই। যার শেষ ভাল, তার সব ভাল।

এখন কাযে লাগো দেখি। জি, জির প্রকৃতিটা ভাবপ্রবণ, তোমার মাথা ঠাণ্ডা—দুজনে এক সঙ্গে মিলে কায কর। ঝাঁপ দাও—এই ত সবে আরম্ভ। আমেরিকার টাকায় হিন্দুধর্ম্মের পুনরুজ্জীবনের আশা অসম্ভব—প্রত্যেক জাতকে নিজেকে নিজে উদ্ধার করতে হবে। মহীশূরের মহারাজা, রামনাদের রাজা ও আর আর কয়েক জনকে এই কাযের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন কর্‌বার চেষ্টা কর। ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে পরামর্শ করে কায আরম্ভ করে দাও। মান্দ্রাজে একটা জায়গা নেবার চেষ্টা কর—একটা কেন্দ্র যদি করতে পারা যায়, সেইটে একটা মস্ত জিনিষ

হল—তার পর সেখান থেকে ছড়াতে থাক। ধীরে ধীরে কায আরম্ভ কর—প্রথমটা কয়েকজন গৃহস্থ প্রচারক নিয়ে কায আরম্ভ কর, ক্রমশঃ এমন লোক পাবে, যারা এই কাযের জন্য সারা জীবনটা দেবে। কারও উপর হুকুম চালাবার চেষ্টা কোরো না—যে অপরের সেবা করতে পারে, সেই যথার্থ সর্দার হতে পারে। যত দিন না শরীর যাচ্ছে, অকপট-ভাবে কাযে লেগে থাক। আমরা কায চাই—নামযশ টাকাকড়ি কিছু চাই না। কাযের আরম্ভটা যখন এমন সুন্দর হয়েছে, তখন তোমরা যদি কিছু না করতে পার, তবে তোমাদের উপর আমার আর কিছুমাত্র বিশ্বাস থাকবে না। আমাদের আরম্ভটা বেশ সুন্দর হয়েছে। ভরসায় বুক বাঁধো। জি. জি, কে ত তার পরিবারের ভরণপোষণের জন্য কিছু করতে হয় না—সে কেন মান্দ্রাজে একটা জায়গার জন্য যাতে কিছু টাকার যোগাড় হয়, তার জন্য লোককে একটু তাতায় না। মান্দ্রাজে একটা কেন্দ্র হয়ে গেলে তার পর চারিদিকে কার্য্যক্ষেত্র বিস্তার করতে থাক—এখন সপ্তাহে সপ্তাহে একত্র হওয়া—একটু স্তবাদি হল—কিছু শাস্ত্রপাঠ হল—তা হলেই যথেষ্ট। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হও—তা হলেই সিদ্ধি নিশ্চিত।

নিজেদের কাযে স্বাধীনতা না হারিয়ে কল্‌কেতার ভ্রাতৃবর্গের উপর সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাভক্তি দেখাবে—কারণ, তারা যে সন্ন্যাসী।

কার্য্যসিদ্ধির জন্য আমার ছেলেদের আগুনে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে। এখন কেবল কায, কায, কায—বছর কতক বাদে স্থির হয়ে কে কতদুর করলে মিলিয়ে তুলনা করে দেখা যাবে। ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও পবিত্রতা চাই।

এখন আমি হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন বই লিখ্‌ছি না—এখন কেবল নিজের ভাবগুলো টুকে যাচ্ছি মাত্র—জানি না, কবে সেগুলো পুস্তকাকারে নিবদ্ধ করে প্রকাশ কোর্‌বো।

বইএ আছে কি ? জগৎ ত ইতিমধ্যেই নানা বাজে বইরূপ আবর্জ্জনা-স্তূপে ভরা হয়ে গেছে। কাগজটা বার করবার চেষ্টা কর—তাতে কারও হাতের সমালোচনার দরকার নেই—তোমার যদি কিছু ভাব দেবার থাকে, তা শিক্ষা দাও—তার উপর আর এগিও না। তোমার

যা ভাব দেবার থাকে, দিয়ে যাও—বাকি প্রভু জানেন। মিশনরিদের এখানে কে গ্রাহ্য করে? তারা বিস্তর চেঁচিয়ে এখন থেমেছে। আমি তাদের নিন্দাবাদের কখন উত্তর দিই নি—আর তার দরুন সাধারণে এখানে আমাকে ভালই বল্‌ছে। আমাকে আর খবরের কাগজ পাঠিও না—যথেষ্ট এসেছে। কাযটা যাতে চলে তার জন্য একটু চাউর হওয়ার দরকার হয়েছিল—খুব হয়ে গেছে। চেয়ে দেখ—অন্যান্য দলেরা কেমন এক স্কীম বিনা ভিত্তিতেই গড়ে তুলেছে। আর তোমাদের এমন সুন্দর আরম্ভ হয়েও তোমরা যদি কিছু করতে না পার, তবে আমি বড়ই নিরাশ হব। তোমরা যদি আমার সন্তান হও, তবে তোমরা কিছুই ভয় করবে না, কিছুতেই তোমাদের গতিরোধ করতে পারবে না। তোমরা সিংহতুল্য হবে। আমাদিগকে ভারতকে সমগ্র জগৎকে জাগাতে হবে। না কল্লে চলবে না কাপুরুষতা চলবে না—বুঝ্‌লে? মৃত্যু পর্য্যন্ত অবিচলিতভাবে লেগে পড়ে থেকে আমি যেমন দেখাচ্ছি করে যেতে হবে—তবে তোমার সিদ্ধি নিশ্চিত। গুরুভক্তি—মৃত্যু পর্য্যন্ত! গুরুর উপর বিশ্বাস—ইহাই রহস্য! এই গুরুভক্তি কি তোমার আছে? যদি ইহা তোমার থাকে—আর আমি হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস করি ইহা তোমার আছে; আর আমার যে এই বিশ্বাস আছে, তা তুমি তোমার প্রতি আমার নির্ভর ও বিশ্বাস দেখেই অবশ্যই জান—তবে কাযে লেগে যাও—তোমার সিদ্ধি নিশ্চিত। তুমি যে দিকে পদার্পণ করবে, তোমার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা ও আশীর্ব্বাদ তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাবে। মিলে মিশে কায কর—সকলের সঙ্গে ব্যবহারে পরম সহিষ্ণু হও। সকলকে আমার ভালবাসা জানাবে—আমি সর্ব্বদা তোমাদের গতিবিধি লক্ষ্য রাখ্‌ছি। এগিয়ে যাও এগিয়ে যাও। এই ত সবে আরম্ভ। এখানে একটু হৈ চৈ হলে ভারতে তার প্রবল প্রতিধ্বনি হয়—বুঝ্‌লে? সুতরাং তাড়াহুড়ো করে এখান থেকে চলে যাবার আমার দরকার নাই। আমাকে এখানে স্থায়ী একটা কিছু করে যেতে হবে—সেইটে আমি এখন ধীরে ধীরে করছি। দিন দিন আমার প্রতি এখানকার লোকের বিশ্বাস বাড়ছে। তোমাদের বুকের ছাতিটা খুব বেড়ে যাক্‌। সংস্কৃত

ভাষা বিশেষতঃ বেদান্তের তিনটা ভাষ্য অধ্যয়ন কর। প্রস্তুত হয়ে থাক। আমার অনেক রকম কাজ কর্‌বার মতলব আছে। উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা যাতে কর্‌তে পার তার চেষ্টা কর। যদি তোমার বিশ্বাস থাকে, তবে তোমারি সব শক্তি আস্‌বে। চিঠিতে এই কথা বল—ওখানে আমার সকল সন্তানকে এই কথা বল। তারা সকলেই বড় বড় কায কর্‌বে—দুনিয়াই তা দেখে তাক লেগে যাবে। বুকে ভরসা বেঁধে কাযে লেগে যাও। তোমরা কিছু করে আমায় দেখাও আমাকে একটা মন্দির, একটা ছাপাখানা, একখানা কাগজ, আমার থাক্‌বার জন্য একখানা বাড়ী করে আমায় দেখাও। যদি মান্দ্রাজে আমার জন্য একখানা বাড়ী কর্‌তে না পার ত তথায় গিয়ে কোথায় থাক্‌বে? লোকের ভিতর বিদ্যুদ্বেগে শক্তিসঞ্চার কর। টাকা ও প্রচারক যোগাড় কর। তোমাদের যা জীবনের ব্রত কোরেছো, তাতে দৃঢ়ভাবে লেগে থাকো। এ পর্য্যন্ত যা করেছো, খুব ভালই হয়েছে—আরও ভাল কর—তারচেয়ে ভাল কর—এইরূপে এগিয়ে চল, এগিয়ে চল। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, এই পত্রের উত্তরে তুমি লিখবে যে, তোমরা কিছু করেছ। কারও সঙ্গে বিবাদ কোরো না, কারও বিরুদ্ধে লেগোনা। রামা শ্যামা খৃষ্টান হয়ে যাচ্ছে। এতে আমার কি এসে যায়? তারা যা খুসি তাই হোক না। কেন বিবাদ বিসম্বাদের ভিতর মিস্‌বে? যার যা ভাবই হোক্ না কেন, সকলের সকল কথা ধীরভাবে সহ্য কর। ধৈর্য্য, পবিত্রতা ও অধ্যবসায়। ইতি—

তোমাদের
বিবেকানন্দ।

'ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ'।

(শ্রীসুব্রহ্মণ্য।)

"মিথিলায় আজ এ হাহাকার কেন? রাজপ্রাসাদ হইতে আরম্ভ করিয়া দরিদ্রের পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র এ বিলাপ কিসের, মহাশয়?"

নিষ্ঠবান ধার্ম্মিক দ্বিজের কৌতূহল নিবারণের জন্য নির্বৈর-নির্দ্বন্দ্ব ঋষিপুঙ্গব উত্তরিলেন—

"জানেন্ না, ঝড়ে মিথিলার বহুবিহঙ্গের আবাসস্থল মনোরমা নামক পুণ্য-বিটপীটি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে—সেই জন্যই পক্ষীকুল আপনা-দিগকে আশ্রয়-সম্বলহীন ভাবিয়া কাতর-কলরব করিতেছে?"

"তা ত' নয় মহাশয়,—আপনারই পরমপ্রিয় রাজপ্রাসাদ নাকি ভীষণ ঝঞ্ঝা ও অগ্নির কবলাক্রান্ত, তবে আজ কেন অন্তঃপুর রক্ষার জন্য আপনাকে ব্যগ্র দেখিতেছি না।"

* * *

একদিন দুগ্ধফেননিভ শয্যায় যাহার শয়ান ছিল, সুরক্ষিত শত-ব্যঞ্জন ব্যতীত যাঁহার আহার হইত না, বহুমূল্য হীরক-খচিত পরিচ্ছদ ব্যতীত যাঁহার অঙ্গের শোভা হইত না, বিলাস-কলহাস্যময়ী কামিনীকুলের কলুষ-সঙ্গ ব্যতীত যাঁহার স্বাচ্ছন্দ্য বোধ হইত না—তিনি আজ বিশ্ব-বাসী সকলের ঘৃণ্য, দারিদ্র্যকে বন্ধুভাবে আলিঙ্গন করিয়া, পথের ভিখারী সাজিয়াছেন—শ্মশানের পরিত্যক্ত কৌপীন আজ তাঁহার শ্রেষ্ঠ-সম্পদ, উহা তিনি ভগবানের দান বলিয়া মাথায় পাতিয়া লইয়াছেন—ভারতবর্ষ ছাড়া এ দৃশ্য আর কোথা পাইব?

পূর্ব্বের একটী জিনিষ সন্ন্যাসী ত্যাগ করিতে পারেন নাই—উহা তাঁহার সেই কমনীয়কান্ত বপু। তাই তাঁহাকে চিনিতে কাহারও বাকী রহিল না।

সন্ন্যাসী হাসিয়া কহিলেন—"কাহার রাজপ্রাসাদ? আমাদের মত

জগতে যাঁহাদের আপন বলিতে কিছু নাই তাঁহারা বড়ই সুখী। মিথিলা-পুরী অগ্নিদাহে ভস্মীভূত হইয়া গেলেও আজ আমার নিজের কোন জিনিষই বিনষ্ট হয় না। সংসারের তথাকথিত আপন-জনদিগের মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া যাঁহারা প্রবজ্যালন জগতের কোন ঘটনাই তাঁহাদের সুখকর বা দুঃখকর নহে।"

"নগরীর সুদৃঢ় প্রাচীর ও সিংহদ্বার আবার নির্ম্মাণ করুন্—একটী পরিখা উহার চারিপার্শ্বে খনন করান—'শতাঘ্নি' (নগর রক্ষার্থ প্রাচীন যন্ত্রবিশেষ) প্রস্তুত করান তবেই ত' ক্ষত্রিয় নামের উপযোগী হইবেন!"

"সন্ন্যাসীর দুর্গ—অপার বিশ্বাস। তপস্যা ও আত্মসংযম উহার অর্গল। ধৈর্য্য উহার সুদৃঢ় প্রাচীর—এই তিন ভাবে ঐ দুর্গ দুর্ভেদ্য। তাঁহার ধনু—ধর্ম্মানুরাগ। গমনাগমনে সাবধানতা উহার ছিলা। শান্তি উহার অটনী। এই ধনু তিনি সত্যসহায়ে তুলিয়া কঠোর তপস্যারূপ শর-দ্বারা কর্ম্মরূপ শত্রুর বর্ম্মভেদ করেন। এই অভিনব ভাবে তিনি সংগ্রামজয়ী—সংসারের সর্ব্ববন্ধন-বিমুক্ত।"

"আবার প্রাসাদ, বর্দ্ধমানগৃহ, চূড়া প্রভৃতি নির্ম্মাণে রত হউন—তবেই ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবেন।"

"যে ব্যক্তি পথে গৃহনির্ম্মাণ করে তাহার বিপদ সুনিশ্চিত।"

"হে ক্ষত্রিয়পুঙ্গব! চোর-গাঁটকাটা-ডাকাতদিগকে শাস্তি দিয়া রাজ্যে শান্তি স্থাপন কর।"

"মানুষে প্রায়শঃ অন্যায়ভাবে শাস্তিবিধান করিয়া থাকে। সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে কারাবাস করিতে হয় আবার ঘোর অত্যাচারীকেও মুক্তি পাইতে দেখা যায়!"

"রাজন! যে সকল সামন্তরাজ আজিও আপনার বশ্যতা স্বীকার করে নাই তাহাদের পরাজিত করুন।"

"সহস্র সহস্র বীরশত্রুজয়ে যাহা না হইবে, আত্মজয়ের ফল তাহা অপেক্ষা শতগুণে অধিক। আপনার সহিত যুদ্ধ কর—বহিঃশত্রু তোমার কি করিতে পারে? পঞ্চেন্দ্রিয়, ক্রোধ, লোভ, মোহ এগুলির উপর জয়ী হওয়া কি মুখের কথা? উহাতে সফল হইলেই সর্ব্বজয় হইল।"

"তবে মহারাজ, বড় বড় যজ্ঞ করুন, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ভোজন করান, দরিদ্রদিগকে অন্ন দিন—আর জীবনকে ভোগ করিতে থাকুন।"

"প্রতিমাসে সহস্র সহস্র গো-দান অপেক্ষা সংযম অধিক বাঞ্ছনীয়—নিত্য সংযম অভ্যাস করিতে পারিলে ভিক্ষাদি-দানের কোন আবশ্যকতা নাই।"

"রাজন! গৃহস্থাশ্রম ছাড়িবেন না—গৃহে থাকিয়া শমদম করুন না কেন?"

"সংসার-বন্ধন-বিমুক্ত না হইলে পরমপদ পাইব কেমন করিয়া?"

"নিজের স্বর্ণ-রৌপ্য-জহরতাদি বাড়ান—পোষাকপরিচ্ছদ—বিভিন্নযান ক্রয় করুন, তবে ত!"

"কৈলাসের ন্যায় অসংখ্য স্বর্ণরৌপ্যপূর্ণ পর্ব্বত পাইলেও লোভীর লোভ মিটিবে না। কারণ, লালসা দিগন্তের ন্যায় বিস্তৃত। পৃথ্বীর সকল শস্য-খাদ্য, রৌপ্যমাণিক্য, মানুষের তৃষ্ণা মিটাইতে পারে না—সেইজন্যই মুক্তিকামীর সাধন-মার্গ অবলম্বনীয়।"

"কি আশ্চর্য্য! রাজন! অগাধ ঐশ্বর্য্য পায়ে ঠেলিয়া আলেয়ার পিছু পিছু কেন ছুটিতেছেন? আশাই আপনার সর্ব্বনাশের মূল হইবে।"

"ভোগ কণ্টকের ন্যায় জ্বালাময়, বিষধর সর্পসম—উহা হইতে সুখ মাগিলেও সুখ আসে না—উহার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। শেষে ক্রোধ মানুষকে পতন-পথে লইয়া যায়, গর্ব্বে মানুষ আপনা ভুলে, মোহে অন্ধ হয়, লোভে বিপদগ্রস্ত হয়।"

* * *

প্রব্রজ্যার সেই পরম পুণ্যাহে বিদেহের পূর্ব্বাধিপ শান্ত-সৌম্যমূর্ত্তি রাজর্ষি সন্ন্যাসী-নমির অপূর্ব্ব বাণী শ্রবণে, মোক্ষপথের পথিকের শ্লাঘনীয় দৃঢ়তা ও স্থৈর্য্যের মনোজ্ঞ চিত্র দেখিয়া, ব্রাহ্মণ যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দে ভরপূর হইয়া আপন প্রকৃতমূর্ত্তি প্রকট করিল—রাজর্ষি নমি চকিত নয়নে চাহিয়া দেখিলেন—ব্রাহ্মণ নাই—তৎপরিবর্ত্তে দেবরাজ ইন্দ্র, আপনার সকল বিভূতি প্রকট করিয়া দাঁড়াইয়া—হস্তে তাঁহার আশীর্ব্বাদ—কণ্ঠে তাঁহার প্রশংসাবাণী—

"ধন্য ঋষি! তুমি ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য সকল জয় করিয়াছ। তোমার সরলতা, তোমার অমায়িকতা, তোমার ধৈর্য্য, তোমার মুক্তি—সকলই সুন্দর!

"ধন্য মহাশয়, শুধু আজ নয়, জগতে চিরদিন আপনি শ্রেষ্ঠ হইয়া রহিবেন—আপনাতে আর কোন কলুষকলঙ্ক নাই—সফল হইয়াছে আপনার সকল সাধনা।"

এই বলিয়া চক্র ও অঙ্কুশদ্বারা ঋষির পাদবন্দনা করিয়া সুধর্ম্মা রথারূঢ় হইলেন। *

"বাঁধাতরী"

(শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়)

জীবন-সমুদ্রে উঠে শত ঢেউ
সে ঢেউ নিবারি কেমনে।
তীরে যদি আসে, ফিরে যায় যেন
ঠেকিয়া তোমার চরণে॥
তব "চরণ-তরী" রাখিয়াছি প্রভু
বাঁধিয়া হৃদয় দুয়ারে।
কভু আসে যদি বান, ভাসায়ে "বেলা"
ছাড়িব না আমি তাহারে॥

---

* জৈন উত্তরাধ্যায়নের নবম-প্রসঙ্গ অবলম্বনে।

মীরাবাই।

(২)

(স্বামী প্রবোধানন্দ)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মীরা এ সকলের কিছুই জানিলেন না—তিনি পূর্ব্ববৎ ভগবৎ প্রেমোন্মত্ত হইয়া স্বাধীনভাবে সঙ্কীর্ত্তন করিয়া পূর্ব্ববৎ বিচরণ করিতে লাগিলেন।

অকস্মাৎ একদিন রাজদূত আসিয়া মীরার হস্তে একখানি পত্র দিল, মীরা পত্রখানি পড়িয়া দেখিলেন—রাণা লিখিয়াছেন "অভাগিনী মীরা, আমি তোমার জন্য নিশিদিন সহস্র বৃশ্চিক দংশন সহ্য করিতেছি। তুমি নদীতে ডুবিয়া মর তাহা হইলে আমি নিশ্চিন্ত হইব।"

পত্র পাঠান্তে মীরা একবার রাণার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন, পত্রবাহক কহিল "মহারাণী, আমায় ক্ষমা করিবেন রাণার সেরূপ আদেশ নাই।"

মীরা আর কোনরূপ উপায় না দেখিয়া যশোদানন্দন গোপালের লীলা বুঝিতে পারিয়া নিশ্চিন্ত মনে সেই নিস্তব্ধ গভীর নিশীথে একাকিনী ধীর পাদবিক্ষেপে বার বার শ্রীশ্রীগোবিন্দজীকে প্রণাম করিয়া রাজভবন ত্যাগ করিলেন। তিনি অলক্ষিতভাবে নদীতীর অভিমুখে চলিলেন—চিতোরের কেহই কিছু জানিল না। সেই মনুষ্য-সমাগমশূন্য স্তব্ধ রজনীতে কে যেন হঠাৎ মীরার পশ্চাৎ হইতে কহিলেন "মীরা, আয় আমি তোর জন্য এই গভীর রজনীতে নদীগর্ভে বসিয়া রহিয়াছি।" মীরা সচকিতে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন, কিন্তু কোথাও কিছু দেখিতে পাইলেন না। ধীরে ধীরে নদীতীরে উপনীত হইলেন। তরঙ্গসঙ্কুল নদী আপন মনে স্থিরভাবে অবিরাম নাচিয়া নাচিয়া সমুদ্রাভিমুখে চলিয়াছে। মীরা আর অপেক্ষা না করিয়া নদীগর্ভে ঝম্প প্রদান করিলেন। জ্ঞানশূন্যা হইয়া মীরা দর্শন করিলেন—তাঁর আরাধ্য দেবতা নটবর নবঘন

শ্যাম মুরলীবয়ান বনমালা বিভূষিত হইয়া গোপালরূপে তাহাকে অঙ্কে ধারণ করিয়া মুখ চুম্বন করিয়া কহিতেছেন "মীরা তুমি যথার্থ সতী, পতি আজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছ, তোমার কার্য্য এখনও শেষ হয় নাই, সেইজন্য আমি তোমায় পুনরায় ত্রিতাপদগ্ধ সংসারে প্রেরণ করিতেছি, তুমি যখনই আমায় দেখিতে চাহিবে দেখিতে পাইবে। তোমার চরিত্র তোমার প্রেমাভক্তি দেখিয়া জগতের লোক মুগ্ধ হইয়া আমার শরণাপন্ন হইবে। এই জগতের ধূলি যেন তোমায় স্পর্শ করিতে না পারে—তুমি স্বর্গের দেবী। উঠ, আমার আজ্ঞা পালন কর।"

মীরা চৈতন্যলাভ করিয়া দেখিলেন নদীপুলিনে শুইয়া আছেন। তিনি উঠিয়া বসিয়া অদ্ভুত দর্শনের কথা মনে মনে চিন্তা করিয়া, লীলাময়ের লীলা বুঝিয়া আনন্দে অধীর হইলেন। মনে মনে কহিলেন "হে আমার প্রিয়তমের বংশী, তুমি বাজতে থাক—তুমি যে দিকে চালাও আমি সেই দিকে চলেছি!" প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিলেন—"হে প্রভো! আমি যেন সুখে দুঃখে নির্ব্বিকার হইয়া থাকিতে পারি। জগতের লোক যাই বলুক না কেন আমি সে সব যেন গ্রাহ্যের মধ্যে আনি না—কেবল তুমিই আমার প্রেমাস্পদ হইয়া হৃদয়ে বিরাজ কর। তুমি আমার প্রাণের প্রাণ আমার প্রিয়তম হইয়া হৃদয়ে অবস্থান করতঃ পূজা গ্রহণ কর, আমি অবলা, কিছুই জানি না প্রভু!"

মীরা আর চিতোরে ফিরিলেন না, প্রভাতে ধীরে ধীরে শ্রীবৃন্দাবনধাম অভিমুখে চলিলেন। মধুমাখা হরিনাম গান করিতে করিতে তিনি নানাস্থান পরিভ্রমণ পূর্ব্বক অবশেষে প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল শ্রীবৃন্দাবনধামে উপনীত হইলেন। পথিমধ্যে মীরার হরিগুণগানে মুগ্ধ হইয়া অনেকেই সংসার ত্যাগ করিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনধামে আসিলেন। ঐ সঙ্গে কতকগুলি রাখালবালক তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনধামে আইসে—তাহারা মীরার ক্ষুধার সময় আহার সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিল। তাহাদের মীরার সঙ্গ এতই মধুর বোধ হইয়াছিল যে তাহারা শ্রীবৃন্দাবনধাম পর্য্যন্ত মীরার সঙ্গে সঙ্গে না আসিয়া থাকিতে পারে নাই। কথিত আছে যে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাখালবেশে মীরার সঙ্গে সঙ্গে

ঐরূপে গিয়াছিলেন। মীরা যে সকল স্থান অতিক্রম করিয়া আসিতেছিলেন, ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা তাঁহার সঙ্কীর্ত্তনে মুগ্ধ হইয়া প্রেমানন্দে ভাসিতে লাগিলেন—তাপিতচিত্ত ব্যক্তিগণ হরিনামরূপ শান্তিবারি পান করিয়া শীতল বোধ করিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনধামে আসিয়া মীরার আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি হরিপ্রেমে নৃত্য করিতে করিতে মাতোয়ারা হইয়া আত্মহারা হইলেন। তিনি নিজের পৃথক্ অস্তিত্ব এককালে ভুলিয়া গিয়া কৃষ্ণপ্রেমে ডুবিয়া গেলেন—কখন কখন তিনি নিজেকে মুরলীধারী শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান করিতে লাগিলেন। শ্রীবৃন্দাবনবাসিগণ তাঁহার সঙ্গে প্রেম তরঙ্গে উদ্বেল হইয়া উঠিল। নির্জ্জীব বৃন্দাবনধাম আজ পুনরায় সজীব হইয়া উঠিল। শ্রীবৃন্দাবনবাসিগণ মীরাকে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমানুরাগিণী ব্রজগোপী-জ্ঞানে আনন্দে বিহ্বল হইলেন। ভক্তির মূর্ত্তিমতী নিঝরিণী শ্রীবৃন্দাবন ধামে মীরার চিত্ত ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া উঠিল। শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র শ্রীবৃন্দাবনধামে মীরার ভ্রমর-নিন্দিত চক্ষু অবিরল অজস্রধারে প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। শ্রীবৃন্দাবনের সর্ব্বত্রই প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি স্মরণ করিয়া পুনঃ পুনঃ গড়াগড়ি দিয়া পরমানন্দে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে স্বচক্ষে দেখিতে লাগিলেন যে নানারূপ বর্ণে বিচিত্র অলঙ্কার ভূষিতা প্রেমময়ী গোপবালারা শ্রীকৃষ্ণকে বেড়িয়া বেড়িয়া নৃত্য করিতেছেন। আবার গোপবেশী শ্রীকৃষ্ণও সুমধুর বংশীনিঃস্বনে ব্রজাঙ্গনাগণের মন হরণ করিতেছেন। এই সকল দেখিতে দেখিতে মহোল্লাসে মীরা ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত হইতে লাগিলেন। ঐ সকল গোপীদের মধ্যে কখন কখন মীরা নিজেকে দেখিয়া ভক্তির আতিশয্যে তাঁহার নিত্যই ভাবাবেশ হইতে লাগিল। কেহ কেহ বলেন ঐ সময় তাঁহার মহাভাব হইত।

কথিত আছে শ্রীরূপ গোস্বামী এই সময় শ্রীবৃন্দাবনধামে বাস করিতেন। তিনি কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী পরম বৈষ্ণব ছিলেন। এমন কি তিনি নিয়ম করিয়াছিলেন যে স্ত্রী লোকের মুখ দর্শন করিবেন না। মীরা পরম ভাগবৎ ভক্ত শ্রীরূপ গোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ

করিবার ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু গোস্বামীজি স্ত্রী লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে রাজি হইলেন না। তখন মীরা তাঁহাকে পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে, 'ঠাকুর, আজও স্ত্রী পুরুষ ভেদ যায় নাই; ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবনধামে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই পুরুষ আর সব প্রকৃতি। যদি গোস্বামীজী নিজেকে গোপিনী না ভাবিয়া পুরুষ জ্ঞান করেন তবে শ্রীকৃষ্ণের এই লীলাক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া অবিলম্বে অন্যত্র চলিয়া যাউন নচেৎ অপর কোনও গোপিনী কর্তৃক অপমানিত হইতে পারেন।'

পত্রপাঠে শ্রীরূপ গোস্বামী বুঝিলেন যে মীরা সামান্য রমণী নহেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইলেন। ভক্তিমতী মীরার রূপ-গুণে ও অদ্ভুত হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে সহজেই তিনি বুঝিলেন যে সাপ-ভ্রষ্টা গোপী ভিন্ন এরূপ একত্র অপূর্ব্ব সমাবেশ সম্ভবে না। উভয়ে কিছুদিন শাস্ত্রালোচনায় ও সুমধুর হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে আনন্দ করিতে লাগিলেন। পরস্পর পরস্পরকে গুরু জ্ঞান করিতেন।*

ক্রমে ক্রমে মীরার অপূর্ব্ব পদাবলী সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচারিত হইয়া পড়িল। রাণা কুম্ভের নিকট এ কথা অজ্ঞাত রহিল না। এত দিনে কুম্ভ বুঝিলেন ও স্বপ্ন স্মরণ করিয়া ভাবিলেন যে মীরা কেবল-মাত্র চিতোরের রাণী নহেন সমুদয় মানবজাতি বিশেষতঃ ভগবানের

* মীরার জীবনী লেখকগণ সকলেই এক বাক্যে লিখিয়া গিয়াছেন যে শ্রীরূপ গোস্বামীর সহিত মীরা শ্রীবৃন্দাবনধামে সাক্ষাৎ করিয়া খুব আনন্দিত হইয়াছিলেন। মীরার ১৪২০ খৃষ্টাব্দে এবং শ্রীরূপ গোস্বামীর ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দ জন্ম হয়। ২৭ বৎসর বয়ক্রম কালে শ্রীরূপের বৈরাগ্য উদয় হয় অতএব তখন মীরার বয়স ৯৬ বৎসর হইয়াছিল। শ্রীরূপ গোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ যদি সত্য ঘটনা হয় তাহা হইলে মীরা অন্ততঃ ১০০ বৎসরকাল জীবিত ছিলেন। অতএব তাঁহার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ হওয়াও আশ্চার্য্য নয়। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীরূপ অপেক্ষা চার বৎসরের বড় ছিলেন অতএব এরূপ কৃষ্ণপ্রেম উন্মাদিনী মীরার সহিত শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের সাক্ষাৎ হইবার খুবই সম্ভাবনা ছিল।

হৃদয়ের রাণী। ধর্ম্ম জগতে তিনি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। সে সম্মানের নিকট রাজ-সম্মান অতীব হেয় বা তুচ্ছ।

রাজা ছদ্মবেশে শ্রীবৃন্দাবনধামে উপনীত হইলেন। কিছুদিন ধরিয়া মীরার অপূর্ব্ব নৃত্য গীত দর্শন করিলেন। এই অলৌকিক ভাব দেখিয়া তিনি বুঝিলেন যে মীরা এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃষ্ণ-প্রেমে উন্মাদিনী হইয়াছেন। অশ্রু চক্ষু ও পুলক দেখিয়া কৃষ্ণানুগতা গোপিনী বুঝিয়া মীরাকে আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন ও নিজ অপরাধ স্বীকার করিয়া বারংবার ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। মীরা তৎক্ষণাৎ রাজার পদতলে পড়িয়া কাতরকণ্ঠে ক্ষমা চাহিলেন। রাণা কহিলেন, মীরা আমি তোমায় অনেক কষ্ট দিয়াছি আর কোনরূপ কষ্ট দিব না'। 'মীরা বলিলেন, 'প্রভু আপনি আমার জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছেন এক্ষণে আপনার উপর শ্রীকৃষ্ণের কৃপা হউক ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা'। তখন উভয়ে কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া নৃত্যগীত করিতে করিতে আত্মহারা হইলেন। রাজা বারংবার অনুনয় করায় মীরা অগত্যা পুনরায় চিতোরে ফিরিয়া আসিলেন। রাণা রাজধানীতে মীরাকে আনাইয়া কৃষ্ণ-মন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন। মীরার সুখ ও শান্তি বিধানের জন্য তিনি অশেষ প্রকার চেষ্টা করিলেন। মীরা ঐ সকল মন্দিরে গিয়া নিত্যই আনন্দে গান করিতেন। কিন্তু তিনি অধিকাংশ সময়ই শ্রীবৃন্দাবনধামে বাস করিতেন। পরে মীরা শ্রীবৃন্দাবন হইতে দ্বারকা পর্য্যন্ত সমুদয় তীর্থে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়া আনন্দ স্রোতে সকলকে ভাসাইতে লাগিলেন। এইরূপে ভক্তের ভগবান মীরা অহৈতুকী ভক্তিতে আবদ্ধ হইলেন। প্রেমের দোকানদারী যেখানে নাই যিনি প্রেমের প্রতিদান কিছুই চান না সেখানে কেবলমাত্র ভালবাসা ভক্তবৎসল ভগবান সেই খানেই বাধা পড়েন। অতএব শ্রীভগবান যে মীরার প্রেমে বাধা পড়িবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি?

ক্রমশঃ মীরার প্রেমোন্মাদ এতই বর্দ্ধিত হইল যে কেহ তাঁহার হৃদয়কে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। ইষ্টদেবের জন্য তাঁর প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। মীরা স্বাধীন ভাবে মুক্তকণ্ঠে

প্রেমাবেশে পুনঃ পুনঃ শ্রীবৃন্দাবনধাম হইতে দ্বারকার পথে সমুদয় তীর্থে আনন্দে হরিগুণ গান কীর্ত্তন করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে শ্রীবৃন্দাবনধাম হইতে হরিগুণ গান কীর্ত্তন করিতে করিতে চিতোরে আসিতে লাগিলেন। এইরূপে চিতোর, বৃন্দাবন ও দ্বারকার পথে জনসাধারণ তাঁহার অপূর্ব্ব প্রেমভক্তি দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইতেন। সহস্র সহস্র নরনারী সংসার ত্যাগ করিয়া বৈরাগী হইয়া তাঁহার শিষ্য হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। অনেকেই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতে লাগিলেন। দ্বারকায় তিনি যখনই আসিতেন ইষ্টদেবের চরণ প্রেমাশ্রুতে ধৌত করিতেন। কথিত আছে অবশেষে দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ দর্শনকালে যখন তিনি প্রতিমার পাদপদ্ম প্রেমাশ্রুতে ধৌত করিয়া আত্মহারা হইয়া সংজ্ঞালোপ হইয়াছিল, সেই সময় ঐ প্রতিমা বিভক্ত হইয়া মীরাকে কোলে লইবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়া বলেন "আয় মীরা আমার কোলে আয়" এবং মীরাও প্রেমানন্দে ঐ প্রতিমা মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মতান্তরে মীরা চিতোরে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রণছোড় জীউর সহিত ঐ ভাবে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। রণছোড়প্রভু মীরার ভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া একদিন আলিঙ্গন করিবার মানসে হস্তদ্বয় প্রসারণ করিলে মীরা ভক্তিগদগদ চিত্তে দেব পদে লুটাইয়া পড়িলেন ও চিরদিনের জন্য শ্রীকৃষ্ণের কোলে অন্তর্হিত হইলেন।

এই প্রেমোন্মাদ বর্ণনা করা বড়ই কঠিন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমোন্মাদ হইয়াছিল। কথিত আছে শ্রীভগবান প্রায়ই মীরার নয়ন-পথে আবির্ভূত হইতেন, ইহা ছাড়া মীরার জীবনী সম্বন্ধে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। কোন্‌টী ঠিক এবং কোন্‌টী ঠিক নয় তাহা নির্দ্ধারণ করা বড়ই কঠিন, সেই জন্য এখানে আর ঐ সকলের উল্লেখ করা হইল না। মীরা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে যে সকল ভক্তিরসাত্মক পদাবলী রচনা করিয়া-ছিলেন তাহার নাম "রাগগোবিন্দ" উহা রাজপুত বৈষ্ণব সমাজে সুপরি-চিত। এতদ্ব্যতীত মীরা জয়দেবকৃত গীতগোবিন্দেরও একখানি টীকা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিরচিত বিবিধ ভক্তিরস মিশ্রিত গীত প্রায় ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। প্রায় প্রত্যেক গানের শেষাংশেই

"মীরা কহে বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা" লেখা আছে। এখনও চিতোরে রণছোড়জীউর সঙ্গে সঙ্গে মীরার পূজা হইয়া থাকে। তাঁহার ভক্তগণ মীরাবাই-সম্প্রদায় নামে পরিচিত। এই সম্প্রদায় এখনও বল্লভাচারীর একটী শাখা বলিয়া জনসমাজে পরিচিত রহিয়াছেন।

এই মধুর ভাবের সাধন বুঝা বড়ই কঠিন। কামগন্ধহীন ব্যক্তি ব্যতীত ইহা কেহ সহজে বুঝিতে সক্ষম হন না। খুব উচ্চাধিকারী না হইলে শ্রীরাধার মধুর ভাবের রস আস্বাদন করা অসম্ভব। শ্রীচৈতন্যদেব মহাপ্রভু ঠিক ঠিক শ্রীরাধার মধুর ভাবের সাধনে ডুবিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন শ্রীরাধাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ঠিক ঠিক মধুর ভাবের সাধন করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও শ্রীরাধার মধুর ভাবের সাধন করিয়াছিলেন। পরমহংস দেবের মধুর ভাব সাধনকালে তাঁহার শরীরে স্ত্রীচিহ্ন সকল পরিলক্ষিত হইয়াছিল। যিনি তন্ময় হইয়া ভাবসাধন করিতে করিতে তদগত হইয়া যাইতে পারেন, তাঁহার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। স্বামী বিবেকানন্দ মধুর ভাবের বর্ণনা করিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা এই স্থানে উদ্ধৃত করা হইল—"হে দার্শনিক তুমি আমায় তাঁর স্বরূপের কথা বলতে আসছ, তাঁর ঐশ্বর্য্যের কথা, তাঁর গুণের কথা বলতে আসছ? মূর্খ তুমি জাননা, তাঁর অধরের একটা মাত্র চুম্বনের জন্য আমাদের প্রাণ বার হবার উপক্রম হয়েছে। তোমার ওসব বাজে জিনিস পুঁটলি বেঁধে তোমার বাড়ী নিয়ে যাও—আমাকে আমার প্রিয়তমের একটী চুম্বন পাঠিয়ে দাও—পার কি?

"মূর্খ তুমি যাঁর সামনে ভয়ে হাতজোড় করে রয়েছ, যাঁর সামনে নত-জানু হয়ে ভয়ে প্রার্থনা করছ, আমি আমার হার নিয়ে বগলসের মত তাঁর গলায় দিয়ে তাতে একগাছি সূত বেঁধে তাঁকে আমার সঙ্গে সঙ্গে টেনে নিয়ে যাচ্ছি, ভয় পাছে এক মুহূর্তের জন্য তিনি আমার নিকট থেকে পালিয়ে যান।

"ঐ হার প্রেমের হার। ঐ সূত্র প্রেমের জমাট বাঁধা ভাবের সূত্র। মূর্খ তুমি তো এই সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝ না যে, যিনি অসীম অনন্তস্বরূপ তিনি প্রেমের

বাঁধনে পড়ে আমার মুষ্টির মধ্যে ধরা পড়েছেন। তুমি জান না যে, সেই জগন্নাথ প্রেমের ডোরে বাঁধা পড়েন—তুমি কি জান না যে যিনি এত বড় জগৎটাকে চালাচ্ছেন তিনি বৃন্দাবনের গোপীদের নূপুর ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে নাচিতেন ?"

কামগন্ধহীন উচ্চ অধিকারী ব্যক্তি ব্যতীত এই মধুরভাবের সাধন করিবার চেষ্টা করা উচিত নয়—পরন্তু উহা চেষ্টা করিলে অধঃপতন হইবারই সম্ভাবনা অধিক। মীরার স্বরচিত একটি সঙ্গীত নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল—

পাথর পূজনে হরি মিলে তো মৈঁ পূজে পাহাড়।
তুলসী পূজনে হরি মিলে মৈঁ পূজে ঝাড়॥
মালা পূজনে হরি মিলে তো মৈঁ পূজে কুণ্ডা।
নিত্ নাহেনে হরি মিলে তো জলজন্তু হোই।
ফলমূল খাকে হরি মিলে তো বাঁদর বাঁদরাই॥
দুধ পিনেসে হরি মিলে তো বহুৎ বৎস বালা।
মীরা কহে বীনা প্রেমসে নাহি মিলে নন্দলালা॥

"এই ফ্রীডমের চেয়ে উন্নততর, বিশালতর যে মহত্ত্ব, যে মুক্তি ভারতবর্ষের তপস্যার ধন তাহা যদি পুনরায় সমাজের মধ্যে আমরা আবাহন করিয়া আনি তবে ভারতবর্ষের নগ্নচরণের ধূলিপাতে পৃথিবীর বড় বড় রাজমুকুট পবিত্র হইবে।"

—রবি।

"ঊর্দ্ধে, অধে, ভিতর, বাহির, দেখ্‌ছ যা সব—মিথ্যা ফাঁক ; ক্ষণিক এ সব ছায়ার বাজী পুতুল-নাচের ব্যর্থ জাঁক। পৃথ্বীটাতো মায়ার খেয়াল—সূর্য্য বাতির ফানুস-খোল ;—ছায়ার পুতুল আমরা সবাই চৌদিকে তার ক'রছি গোল !"

—ওমর খৈয়াম।

স্বপ্ন-ভঙ্গ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(শ্রীহেমচন্দ্র দত্ত বি, এ)

প্রত্যেক কাজেরই দুইটি করে দিক্ থাকে। একটি উপায় অপরটি উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য আছে, তাই উপায়ের প্রয়োজনীয়তা। নতুবা উদ্দেশ্য-হীন উপায়ের কল্পনা নিরর্থক। অবশ্য উদ্দেশ্য লাভের জন্য অধিকারী ভেদে বিভিন্ন উপায় চিরদিনই অবলম্বিত হয়েছে এবং হবে।

তা' যে উপায়ই নেওয়া হোক্, তার নজর কিন্তু রাখ্‌তে হবে সর্ব্বদা ঐ উদ্দেশ্যের দিকে। এটি কখনও ভুলে গেলে চল্‌বে না। কারণ উপায়ের যা' কিছু সফলতার শক্তি রয়েছে ঐ তীব্রতাকে নিয়ে। তাই ঠাকুর বল্‌তেন, "রোক্ চাই", "যেন ডাকাত-পড়া ভাব"। এই নজর এত তীব্র রাখতে হবে, যেন উপায়গুলি উদ্দেশ্যের অনুরূপ হয়ে উঠে, যেন "যন্ সাধন্ তন্ সিদ্ধি" হয়ে যায়। সুতরাং "ভাবের ঘরে চুরি" একবারেই থাক্‌বে না।

এখন প্রশ্ন এই—তোমার বিধি নিয়ম ত ঢের দেখলুম্; এই সব ধর্ম্ম-কর্ম্মের উদ্দেশ্য কি? তর্ক বা ব্যাখ্যা ছেড়ে আদর্শভাবে এক কথায় কি এই বলা চলে না যে যাবতীয় ধর্ম্ম কর্ম্মের একমাত্র উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ? "অদ্য কিম্বা শতাব্দান্তে" যখনই হোক, ঈশ্বর লাভই উদ্দেশ্য। বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, ঋষি বা অবতার—সবাই যুগে যুগে এই শিক্ষাই দিচ্ছেন। ঈশ্বরই উদ্দেশ্য ঈশ্বরই গতি। যে যে উপায়ে পার যদি ধর্ম্ম কর্ম্মই করবে, তবে ঈশ্বরকে চাও, তাঁকেই উদ্দেশ্য কর। অসংখ্য দেশ থেকে, অসংখ্য পথে অসংখ্য নদী একই সমুদ্রে এসে পড়ছে। ঠিকই যখন পড়ছে, তখন পথের বিচার ছেড়ে দাও। কিন্তু যত গোল বেধে যায়, যখন সে পথ ছেড়ে সমুদ্রে না গিয়ে খাল বিলে এসে পড়ে বা চড়ায় লেগে আট্‌কে যায়। তখন সে যে

কেবল উদ্দেশ্যকেই হারিয়ে ফেলে এমন নয় সঙ্গে সঙ্গে কত অনর্থ পাক যে সে ঘঁরে বসে, তাও একবার ভেবে দেখ। এখন সেই কথাই বল্‌ব।

পূর্ব্বেই বলেছি আমাদের দেশ ধর্ম্মের দেশ। ধর্ম্ম-কর্ম্মে মতি হওয়া এ দেশের লোকের যেন জন্মগত অধিকার সত্ত্ব। সুতরাং সত্তাভেদে বহুভাবে বহুপথে এ দেশবাসী যে ঈশ্বরের দিকে এগুবে তাতে অস্বাভাবিকতা কিছুই নেই। আর এই ত এ দেশের গৌরব। পূজা, উৎসব, কীর্ত্তন, ব্রত, নিয়ম, প্রতিষ্ঠা এবং যত বিধিবাদীয় আচার এ দেশে প্রচলিত হয়েছে একমাত্র ঈশ্বরকে উদ্দেশ্য করেই ঋষিরা সে সকলের প্রচলন করেছিলেন। এগুলি ব্যবহারিক হলেও মূলতঃ আধ্যাত্মিক। ঈশ্বর লাভের প্রকৃষ্ট উপায় জেনেই আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন বিধিবাদ গুলিকে অহেতুক কৃপাসিন্ধু ঋষিগণ জনসমাজে প্রচলন করেছিলেন। এম্‌নি করে অনন্তের যাত্রী আরো কত পথের সন্ধান পাবে তা' কে জানে? যে বিধি নিয়মই হোক্‌, আধ্যাত্মিকতা হারিয়ে গেলে তখন তার অস্তিত্ব কিন্তু শুধু নামে এবং বাহ্যাড়ম্বরে এসে দাঁড়ায়। বা'র থেকে দেখতে তখন ওকে যত জমকালই দেখাক্‌ ভেতরে ওর কিছুই নেই বুঝতে হবে। কারণ, উদ্দেশ্যকে সে ভুলে গেছে। বাংলা দেশের ধর্ম্ম কর্ম্মে যত গলদ ঢুকেছে ঠিক এই জায়গায়। এরই সংস্কার আমরা চাই। সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্মে এই আধ্যাত্মিকতার জাগরণ আবার ফিরে চাই।

হাজার হাজার বছর চলে গেল, কত বিধি আচার এদেশে চল্‌ছে। সহজ স্বাভাবিক প্রেরণায় দেশবাসীও সে গুলিকে আক্‌ড়ে ধরে রয়েছে। এতে খুবই কল্যাণ হয়েছে সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে এই সকল বিধিবাদ নিয়ে ধর্ম্মের অবস্থা দেশে যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, তাতে বিধিবাদগুলি তাদের নিজ নিজ শক্তি নিয়ে জনসাধারণের ভিতরে আধ্যাত্মিকতা বিস্তার কর্‌ছে, এ কথা কিছুতেই বলা যায় না। বাইরে সবই ঠিক আছে শুধু আচারে কিন্তু সবই শক্তিহীন, আধ্যাত্মিকতা বর্জ্জিত। আচার আছে, কিন্তু ধর্ম্ম নাই। মাল নাই খোসা নিয়ে টানাটানি চল্‌ছে। আবার তারই সাময়িক উত্তেজনা পূর্ণ, কিন্তু প্রকৃত

পক্ষে নির্জীব, প্রভাব ছড়িয়ে পড়ছে সমস্ত দেশবাসীর সমাজে, তাদের কার্য্য কলাপে। যে ঈশ্বর সর্ব্বশক্তির কেন্দ্র, তাঁকে নিষ্ঠা বা ভক্তি শুধু আচারে দেখিয়ে, উদ্দেশ্যকে পেছনে রেখে গোবিন্দ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের দেশ দিন দিন হীনবীর্য্য হয়ে পড়ছে। আধ্যাত্মিকতা শূন্য আচারকে নিয়ে দেশ দিন দিন তমঃতে ডুবে যাচ্ছে। দেশময় পূজা পার্ব্বণ, আচার পদ্ধতি খুঁজে দেখ, দেখবে তা দের মহান্ উদ্দেশ্য গুলি হারিয়ে গেছে। পুরুষানুক্রমে চলে আসছে বলে লোকে যেন দায়ে পড়ে সে গুলি পালন করছে; কেউ বা এগুলোকে শুধু আমোদ বা উচ্ছৃঙ্খলতার হেতু করে নিয়েছে। পাশ্চাত্য জগতের মোহে ভুলে দেশবাসী নিজের ধর্ম্ম ক্রিয়ায় অবিশ্বাস এনে এক দারুণ অপমান করতে গিয়েছিল। যুগাবতার ভগবান রামকৃষ্ণের অভ্যুদয়ে দেশের সে মতি ফিরেছে সত্য কিন্তু সে যেন ভগবানের আজ্ঞা ভুলে আবদ্ধ জলের ন্যায় স্তব্ধ, নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে। যাবে দেশ প্রতিদিন ধর্ম্ম ক্রিয়ার ব্যবস্থা, সে যদি আধ্যাত্মিকতার প্রবাহ তাতে মিশিয়ে নেয়, দেশ তবে অচিরাৎ ধর্ম্ম বন্যায় ভেসে যেতে পারে। সুতরাং এই সুন্দর অনুষ্ঠান গুলিকে শুধু দেশাচারে, লোকাচারে না রেখে দেব-ভাবে পূর্ণ করে ঈশ্বরাচারে পরিণত করতে হবে।

(ক্রমশঃ)

ঋতু পর্য্যায়।

(শ্রী—)

গ্রীষ্ম।

বিবেক কহিল ধীরে মানব অন্তরে,
"নবীন জনম লভ এ নব-বৎসরে"
কাল বৈশাখীর মত দিশি আঁধারিয়া
উঠিল তুমুল ঝড় হৃদয় ভরিয়া।
ওলট-পালট করি পূর্ব্ব সংস্কার
দারুণ তাপেতে পূর্ণ হৃদয় আগার।

তাপদগ্ধ ম্রিয়মান শান্তির আশায়
উন্মত্তের প্রায় হায়—চারিদিকে ধায় ;
না দেখি উপায় কোন অস্থির হইয়া
"রক্ষ ভগবান্" বলি ফেলিল কাঁদিয়া।

বর্ষা।

অবিরাম বহে ধারা নেত্রদ্বার দিয়া
উষ্ণ প্রস্রবণ মত পাষাণ ভেদিয়া ;
আপন দুর্দ্দশা হেরি মধ্যে মধ্যে হায়
বিলাপি করুণ স্বরে ডাকে উভরায় ;
"কোথা দেব দয়াময় অগতির গতি
বিশ্বজীব ডাকে তোমা রক্ষ বিশ্বপতি।"
ডাকে আর কাঁদে কত বসিয়া বিরলে
প্রায় হ'ল দৃষ্টি হীন ভাসি আঁখিজলে।
তপ্ত অঙ্গ অশ্রুনীরে যবে সুশীতল
মেঘ-মুক্ত হৃদাকাশ হইল নির্ম্মল।

শরৎ।

সুনীল আকাশে আসি সুখের চন্দ্রমা
উদিল হরষে লয়ে পরগ সুষমা।
বিকসিত হৃদিপদ্ম যাদু মন্ত্র বলে
ঢলিয়া পড়িল প্রেমে বিভু পদতলে।
সহজে ছাড়েনা কিন্তু পূর্ব্ব সংস্কার
মাঝে মাঝে হৃদাকাশ করে অন্ধকার ;
করুণ প্রার্থনা সহ ঢালে অশ্রুজল
পুনঃ যাহে ফিরে পায় হৃদয় বিমল।
ক্ষণে হাঁসি ক্ষণে কান্না শিশুর মতন
ভাবের প্রবাহ হৃদে বহে অনুক্ষণ।

হেমন্ত।

ক্রমে হৃদি শান্তভাব করয়ে ধারণ
আশার সঞ্চারে লভে নবীন জনম।
পূর্ব্ব সংস্কার রেখা—ক্রমে হয় ক্ষীণ
কুআশা আচ্ছন্ন হৃদি না হয় মলিন।

আশা বায়ু বহে ধীরে স্নিগ্ধ সুশীতল
কুআশা কলুষ তাহে সতত চঞ্চল ।
গুণ গুণ গুণ স্বরে মনে অনুক্ষণ
বিভুর করুণা গাথা করয়ে স্মরণ ।
স্মরণ মননে সদা অতি ধীরে ধীরে
দেখা দেয় শান্ত ছবি হৃদয় মন্দিরে

শীত । হয় অঙ্গ সুশীতল সে ছবি পরশে
রোমাঞ্চ পুলক তাহে উঠয়ে হরষে
সযতনে আবরিয়া ভক্তি আবরণে
হৃদয় আগারে রাখে অতি সুগোপনে ।
করে ছবি সুপ্রকট অন্তর উজলি-
আশাপথ চাহি রহে আপনারে ভুলি
পাই পাই ধরি ধরি ভাবে অনুক্ষণ
আবেশে আচ্ছন্ন রহে জড়ের মতন ।
বহুদূর হতে পরে মৃদু মন্দগতি
ধীরে আসে কাছে যেন মিলনের পতি

বসন্ত । মঙ্গল মলয়বায় মিশি তার সনে
আকুল করিল প্রাণ শুভ সম্মিলনে ।
খুলিল হৃদয় দ্বার—মঙ্গল পবনে
রুদ্ধ আনন্দের স্রোত বহিল সঘনে
সুপ্রকট এত দিনে হৃদি সিংহাসনে
অন্তর দেবতা বসি সহাস্য আননে ।
মোহন মূরতি হেরি আনন্দে মগন
মুছে গেল ভেদাভেদ ভুলিল আপন ।
আনন্দে দু'বাহু তুলি—পাগলের প্রায়—
আলিঙ্গিতে বিশ্বজীবে প্রাণ সদা চায়

"বাল্মীকি-প্রতিভা।"

(শ্রীসাহাজী)

রামচন্দ্র প্রজারঞ্জনার্থ সীতা বর্জ্জন এবং পিতৃসত্যপালনার্থ বনগমন করিয়াছিলেন। আমরা জানি, এই দুই কার্য্যে তাঁহার চরিত্রের মাহাত্ম্যই প্রস্ফুটিত হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের অনেকেই (১) বলেন, "সীতাকে ধরিয়া লইয়া গেল রাবণ, অপরাধিনী হইলেন অকলঙ্ক-চরিত্রা সীতা। অশিক্ষিত অমার্জ্জিত-রুচি ক্ষুদ্রচিত্ত জনসাধারণের কথায় বিচলিত হইয়া রামচন্দ্রের ন্যায় সুশিক্ষিত ধার্ম্মিক ন্যায়-পরায়ণ রাজেন্দ্রসত্তমের সাধ্বী-সতীকে বর্জ্জন করা কি কর্ত্তব্য হইয়াছিল? যুগের নিন্দায় ভ্রূক্ষেপ করেন যিনি, তাঁহাকে কাপুরুষ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?" আবার, অনেকের মতে পিতৃসত্য পালনার্থে বনে যাওয়াও তাঁহার কর্ত্তব্য হয় নাই।— "কৈকেয়ী প্রভৃতি কুচক্রীর ষড়যন্ত্র সৃজিত দুর্জ্ঞেয় দুরভিসন্ধি-জালে প্রবীণ বয়সে পুত্র বিচ্ছেদরূপ কল্পনাতীত অসহনীয় মনোবেদনার অতর্কিত আক্রমণে বৃদ্ধ জরাজীর্ণ পিতার প্রাণনাশের সম্পূর্ণ আশঙ্কা, এরূপ স্থলে তুচ্ছ প্রতিজ্ঞার মূল্য কি এতই অধিক? পুত্রের নিকটে স্নেহময় পিতার প্রাণ কি এতই তুচ্ছ? সুতরাং রামচন্দ্রের বনগমন তাঁহার তরলবুদ্ধি ও অপরিণামদর্শিতারই পরিচায়ক।

এই ব্যক্তিতন্ত্রতার যুগে, এই প্রকার মন্তব্য শুনিয়া বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। স্বামী-স্ত্রীর অধীন নহে, স্ত্রীও স্বামীর অধীন নহে, ইহাই যে যুগের নীতি,—"বলসেবিক" বাদে যে নীতির চরম পরিণতি,— সেই যুগে, সেই নীতির শিক্ষাবৈগুণ্য, বাল্মীকি প্রভৃতি মহর্ষিগণের উপরেও এইরূপ "টেক্কা মারিবার" প্রবৃত্তি হওয়াই ঐ সকল লোকের পক্ষে স্বাভাবিক। অথবা,—

(১) সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্রের "উত্তর রামচরিতের সমালোচনা" এবং ১৩২৬ সালের কার্ত্তিক সংখ্যার "কায়স্থ সমাজ" পত্রের "বিবেক ব্যতায়" ইত্যাদি প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

খলোঽবলোকতে দোষান্ গুণপূর্ণেষু বস্তুষু।
বনে পুষ্পফলাকীর্ণে পুরীষমিব শূকরঃ॥

ফলতঃ, খলের নিকটে বাগ্মী বাচাল, ক্ষমাশীল ভীরু আখ্যা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে খলের মুখ কে বন্ধ করিতে পারে?

শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের ভাষ্যকার দরিদ্র রঘুনাথের মলিন মুখ দর্শনে ব্যথিত হইয়া শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার স্বকৃত অমূল্য ভাষ্যগ্রন্থ ভাগীরথী জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের ভাব প্রবণতায় (?) সেদিন ভারতের একটি উজ্জ্বলরত্ন অতল জলগর্ভে চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। আবার, মহারাজ হরিশ্চন্দ্র সত্যরক্ষার্থে নিজ স্ত্রী-পুত্রাদি পরিজনের এবং প্রজা সাধারণের অশেষ দুঃখের কারণ হইয়াছিলেন। সামান্য একটি মুখের কথার জন্য এই অজস্র অশ্রুপাত! সুতরাং ঐ শ্রেণীর লোকের মতে শ্রীচৈতন্যদেব এবং হরিশ্চন্দ্রও বোধ হয় অন্যায়কারী ও দোষী।

কিন্তু সত্যই কি এই সকল মহাত্মা অন্যায়কারী ও দোষী ছিলেন? রক্তেমাংসে, দোষেগুণে গঠিত এই পার্থিব মনুষ্য। সে অপার্থিব আদর্শ দেবতা নহে—সীমাবদ্ধ জীব সে—দৃষ্টিও তাহার সীমাবদ্ধ—তাহার ক্ষুদ্রদৃষ্টির সাহায্যে ভবিষ্যতের কতখানি দেখিতে সমর্থ সে? কিন্তু তাই বলিয়া মনুষ্য কি কর্ম্মই করিবে না? তাই গীতা বলেন, অনাসক্ত বুদ্ধিতে কার্য্য করিবে। ফল ভাল কি মন্দ হইবে তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই, দেখা সম্ভবপরও নহে। যে কার্য্য করিবে, তাহা স্বার্থ বুদ্ধিলেশ শূন্য বিবেকের বশবর্ত্তী হইয়া যাহাতে করিতে পারে, শুধু তাহারই দিকে লক্ষ্য রাখিবে। ফলতঃ, কর্ম্ম ভাল কি মন্দ, তাহা বিচার করিবার মাপকাঠি কর্ম্মের ফল নহে, তাহার ত্যাগ।

স্বার্থ কে না চাহে? পিতার প্রাণ তুচ্ছ কথা, স্বর্গও স্বার্থের কাছে দাঁড়াইতে পারে না। অন্তর্দর্শী রামচন্দ্র মানবমনের এই স্বার্থপ্রবণতার কথা বুঝিতেন, তাই তিনি সর্ব্বপ্রযত্নে স্বার্থকেই বর্জ্জন করিয়াছিলেন। সকলের প্রিয়দর্শন তিনি। রাজ্যের প্রধান অমাত্যগণ হইতে প্রজা-সাধারণ পর্য্যন্ত প্রায় অধিকাংশ লোকই তাঁহার স্বপক্ষে ছিলেন। এমন

কি, লক্ষ্মণ পর্য্যন্ত কৈকেয়ী প্রভৃতির প্রতি একান্ত বিরক্তি বশতঃ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায়, তিনি ইচ্ছা করিলে, রাজ্যপ্রাপ্তি বিষয়ে তখন তাঁহার কোন বাধাই উপস্থিত হইত না। কিন্তু করামলকবৎ সেই রাজ্য তিনি তুচ্ছ করিয়াছিলেন। * * * কৈকেয়ী তাঁহার দুরভিসন্ধি-জাল বিস্তার করিয়া যতই ষড়যন্ত্র করুন, তাঁহার পিতা যে তাঁহাকে অভীপ্সিত প্রদানে প্রতিশ্রুত ছিলেন, তাহা অস্বীকার করা যায় না। অন্যে আমার কথার সুযোগ অন্যায় ভাবে গ্রহণ করিতেছে বলিয়া আমিও যদি আমার কথা সম্পূর্ণ বা অল্পবিস্তর নড়চড় করি, তাহা হইলে তাহা সাধুনীতির অনুমোদিত হইতে পারে না। Tit for tat, এ নীতি সামান্য জনের উপযুক্ত। কিন্তু Whoever smiteth thee on thy right cheek, turn to him the other also, ইহাই মহাজনের নীতি। সুতরাং কৈকেয়ী যে দুরভিসন্ধি জাল বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহার সামান্যজনোচিত প্রতিশোধ লইতে সচেষ্ট হওয়া রামচন্দ্র অথবা দশরথের ন্যায় মহাপ্রাণ ব্যক্তিগণের পক্ষে সম্ভবপর হইতে পারে না। * * * কথার অপেক্ষা প্রাণের মূল্য যে অনেক বেশী তাহা নিঃসন্দেহ বিশেষতঃ, পুত্রের নিকটে স্নেহময় পিতার প্রাণ অমূল্যধন কিন্তু রামচন্দ্র যতই মহাপুরুষ হউন, তিনিও মনুষ্য। তিনি বনে গেলে তাঁহার বিচ্ছেদে পিতার মৃত্যু যে অনিবার্য্য, এ কথা তিনি কিরূপে বুঝিতে পারিবেন? তাঁহার স্নেহময়ী জননী কৌশল্যা পুত্র-বিচ্ছেদ-দুঃখ সহ্য করিয়াও কি বাঁচিয়াছিলেন না? পক্ষান্তরে, কৈকেয়ী, ভরত রাজা হউক, শুধু এই মাত্র প্রার্থনা করেন নাই। রামচন্দ্র বনে যাউক, ইহাও তাঁহার প্রার্থনা ছিল। সুতরাং কৈকেয়ীর দুরভিসন্ধি ও কৌশল অতি সুস্পষ্ট। এজন্য রাজ্যের অনেকেই কৈকেয়ীপক্ষীয়দিগের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় রামচন্দ্রকে নিকটে পাইলে তাঁহারা অধিকতর উত্তেজিত হইয়া অনর্থ ঘটাইতে পারিতেন। আবার, তিনি যদি সকলকে বুঝাইয়াও দিতেন, তিনি রাজ্য চাহেন না, শুধু বৃদ্ধ পিতার নিকট থাকিয়া তাঁহার সেবা করিবেন, তাহা হইলেও প্রজারা, বিশেষতঃ কৈকেয়ীপক্ষীয়েরা তাঁহাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতে ছাড়িতেন না।

তাহার পর, Candle kindleth candle ; তিনি যদি করামলকবৎ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ঐরূপ মহত্ত্ব না দেখাইতেন, তাহা হইলে ভরতের মনের ভাবই যে অন্যপ্রকার হইত না, তাহাই বা কে বলিতে পারে ? পিতার সেবা করিবার জন্য রাজ্যে থাকিতে গেলে, পাছে উভয় দলের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, এইরূপ আশঙ্কা করিবার কারণ তখন যথেষ্ট ছিল। সুতরাং যে স্থলে বহুলোকের প্রাণনাশের আশঙ্কা, রাজ্যব্যাপী বিপ্লবের সম্ভাবনা, সে স্থলে কয়েকজন লোকের আত্মবিসর্জন করা কি অসঙ্গত হইয়াছিল ? তিনি বনে না গেলে দশরথ নাও মরিতে পারিতেন, তাঁহাকেও হয়ত পিতার মৃত্যুর নিমিত্তের ভাগী হইতে হইত না। কিন্তু তিনি বনে না গেলে, ঘটনা যে দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতে যদি বিপ্লবের সৃষ্টি হইত, তাহা হইলে কি তাঁহার পিতার পক্ষে শান্তির কারণ হইত ? রাজ্যের পক্ষেও কি তাহা মঙ্গলের বিষয় হইত ? ফলতঃ, রামচন্দ্রের বনগমন তাঁহার তরলবুদ্ধি ও অপরিণামদর্শিতার পরিচায়ক নহে, বরং তাঁহার অসামান্য ধীশক্তি ও স্বার্থলেশ শূন্যতার উজ্জ্বল উদাহরণ।

এইরূপ রামচন্দ্রের সীতাবর্জ্জনও তাঁহার বীর হৃদয়েরই উপযুক্ত। সীতা তাঁহার সুখের সমগ্রী ! সীতার মিলনে তন্ময় সীতা। তাঁহার দেহ মনের প্রতি পরমাণু। বুকের ধন কে না বুকের মাঝে লুকাইয়া রাখিতে চাহে ? রাজ্যে ধিক, ঐশ্বর্য্যে ধিক, তাহার প্রাণ চাহিতেছিল সীতাকে লইয়া তিনি বনে চলিয়া যান। সীতাসহ বনবাস তাঁহার স্বর্গবাস ! আর সীতাহারা স্বর্গবাস তাঁহার সর্ব্বনাশ ; যাহার মাঝে হারের ব্যবধান সহে না, তাহারই মাঝে সারংসাগরের ব্যবধান, ইহা কি প্রাণ থাকিতে সহিবার কথা ? এই অনন্ত বিশ্বের কেন্দ্রই আমি। স্ত্রী-পুত্র আমার যতই আদরের হউক, এ জগতে আমার নিকটে আমার আমিত্বের মতো প্রিয় আর কিছুই নাই। সেই "আমারই" সুখ পরিত্যাগ করা কি এতই সহজ ? আত্মবলিদান কি মুখের কথা ? এই আত্মবলিদানে সমর্থ ছিলেন বলিয়াই রামচন্দ্র সীতা বর্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় পত্নীর প্রতি একনিষ্ঠ প্রেম যাহাদের নাই তাঁহারা তাঁহার এই ত্যাগের মাহাত্ম্য কি করিয়া বুঝিবেন ? * *

সত্য বটে, রামচন্দ্র নিরপরাধিনী সতীকে বর্জ্জন করিয়া তাঁহাকে শুধু অকারণ দুঃখভাগিনী করেন নাই, পরন্তু নিজেও স্বার্থধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন। সত্য বটে, প্রজারা সীতার শুভ চরিত্রে যে মিথ্যা কলঙ্ক লেপন করিয়াছিল তিনি স্বামী হইয়া সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রকারান্তরে সেই অলীক অপবাদের সত্যতাই প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। (২) কিন্তু এ স্থলে ইহাও ভাবিয়া দেখিবার বিষয় প্রজারা সীতার চরিত্র বিষয়ে শুধু সন্দেহ প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, তাহারা স্পষ্ট অক্ষরে বলিয়াছিল রামচন্দ্র রাজা হইয়াও যদি এইরূপ করেন তাহা হইলে অতঃপর আমাদের স্ত্রীদের শাসন করা সহজ হইবে না। ফলতঃ তাহারা সীতার পরীক্ষাপ্রার্থী ছিল। এরূপ ক্ষেত্রে তিনি—স্বামী, সীতা—পত্নী, এই হিসাবে সীতা তাঁহার নিকট নিরপরাধিনী হইলেও তিনি রাজা, সীতা প্রজা, এই হিসাবে সীতার বিচার করিয়া প্রজাদের সন্দেহ ভঞ্জন করা তাঁহার কর্ত্তব্য হইয়াছিল। সীতা না হইয়া অন্য কোন স্ত্রীলোক হইলে তিনি কি তাহার ন্যায্য বিচার করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন? সুতরাং এরূপ স্থলে তিনি যদি রাজপদ পরিত্যাগ করিতেন তাহা হইলে প্রজারা সীতার চরিত্রে যে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করিয়াছিল তাহার যথোপযুক্ত প্রতিবাদ হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার এ পথে যাইবারও উপায় ছিল না। রামচন্দ্র রাজ-সিংহাসন পরিত্যাগ করিলে তাহাতে তাঁহার ও সীতার অযোধ্যার প্রজা সামান্যত্বও কি রহিত হইয়া যাইত? তিনি রাজ-পদ ত্যাগ করিলে তাঁহার স্থানে যিনি রাজা হইতেন তিনিই সীতার পরীক্ষা লইতে বাধ্য হইতেন। কিন্তু মনস্বী রামচন্দ্র কোন অবস্থাতেই জগৎ-পূজ্য রঘু-কুল বধূকে সামান্য জনের ন্যায় বিচারার্থে সভায় আনীতা দেখিতে ইচ্ছা করেন নাই। সীতারও যে সেরূপ ইচ্ছা

(২) স্বামীও যখন পরিত্যাগ করিলেন, তখন সীতা নিশ্চিত কলঙ্কিনী। রামচন্দ্র সীতাকে বর্জ্জন করিয়া প্রকারান্তরে প্রজাদিগকে এই কথাই বুঝিতে দিয়াছিলেন।

থাকিতে পারে না তাহা বলাই বাহুল্য। (৩) দুর্ণাম যতই মিথ্যা হউক বীর যাঁহারা তাঁহারা তাহার অলীকত্ব প্রতিপাদনের জন্য কাহারও বিচারপ্রার্থী হইতে ঘৃণা বোধ করেন। তাঁহারা নিষ্পাপ অতএব জগতে কাহারও বিচারের অধীন নহেন, এইরূপ প্রদীপ্ত অভিমান বশতঃ তাঁহারা ঐরূপে বিচারপ্রার্থী হওয়াকে আপনাকে বিচারের যোগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করার তুল্য মনে করিয়া থাকেন। মিথ্যা কুৎসাকারীদিগের কথার প্রতিবাদ স্বরূপে তাঁহারা তাহাদিগকে বিচার করিবার অবসর না দিয়া পূর্ব্বাহ্ণেই যথানির্দ্দিষ্ট দণ্ড স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়া থাকেন। এ ক্ষেত্রেও সীতা যখন নিরপরাধিনী তখন রামচন্দ্র তাঁহার বিচার করিবার কে? যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগেরই কারণ নাই তাহার আবার বিচার কিসের? ফলতঃ সীতা রামচন্দ্রকে তাঁহার বিচার করিবার অবসর দেন নাই এবং রামচন্দ্রও সীতাকে বিচারার্থে সভায় আহ্বান করিয়া তাঁহার অধিকতর অপমান করিতে চাহেন নাই। ইহাতে রামেচন্দ্রের ন্যায়ধর্ম্মও রক্ষিত হইয়াছিল, পক্ষান্তরে স্বামী স্ত্রী উভয়ের পক্ষ হইতেই, প্রজাদের মিথ্যা অপবাদের যথার্থ বীরোচিত প্রতিবাদও হইয়াছিল, আবার, সীতা নিরপরাধিনী, দোষী প্রজারাই; এ কথা সত্য হইলেও, এ যাবৎ মনুষ্যজগতে যত কিছু অনর্থপাত হইয়াছে, মূর্খের মূর্খতাই তাহার প্রধান কারণ। মূর্খ প্রজারা অসন্তুষ্ট হইতে থাকিলে রাজ্যের পক্ষে তাহা মঙ্গলজনক হইতে পারে না। রামচন্দ্র রাজা, সীতা রাজ-সহধর্ম্মিণী, সুতরাং প্রজার মঙ্গলচিন্তা করা তাঁহাদের উভয়েরই কর্ত্তব্য। রাষ্ট্রবিপ্লব সহজ অনর্থপাত নহে। সুতরাং যেস্থানে অনেকের দুঃখের সম্ভাবনা, সেস্থলে দুইটি প্রাণীর, সীতা ও রামচন্দ্রের, আত্মবলিদান কি গর্হিত হইয়াছিল? মূর্খের মূর্খতার জন্য কত মহাত্মাই

(৩) ভবিষ্যতে বাল্মীকি কর্ত্তৃক সীতার বিচার-সভা আহূত হইলে তখনও এই তেজস্বিনী সীতা আপনার পবিত্রতা বিষয়ে পরীক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হন নাই। তখনও তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহার মর্ম্মার্থ এই, "যদি আমি কায়মনবাক্যে পতিপদে মতি রাখিয়া থাকি তাহা হইলে, মাতঃ বসুন্ধরে আমায় তোমার বক্ষে স্থান দাও"।

যুগে যুগে আত্মবলি দিয়াছেন। সীতা এবং রামচন্দ্র তাঁহাদেরই পথানুসরণ করিয়াছিলেন। জগতে, সকলকে সুখী করা সম্ভবপর নহে। To please every body is to please no body ; প্রজাদিগকে সুখী করিতে হইলে, সীতাকে দুঃখিনী করিতে হয়, আবার সীতার সুখসম্পাদন করিতে হইলে প্রজাদের দুঃখের কারণ হইতে হয়। কিন্তু এই উভয়-সঙ্কটে পড়িয়া বৈদেহীনাথ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সীতা তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গিনী, সহধর্ম্মিনী ও হৃদয়ের অর্দ্ধভাগিনী, সুতরাং তাঁহার হৃদয়ের ব্যথা, অন্তরের কথা তিনি যেমন বুঝিবেন, মূর্খ প্রজারা তাঁহাকে তেমন করিয়া বুঝিতে পারিবেন না, অথবা বুঝিতে চাহিবেন না। (৪) ফলতঃ, রাজা-প্রজার বাহ্য সম্বন্ধ, আর স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ আন্তরিক। সুতরাং এরূপস্থলে, প্রজাদের মনস্তুষ্টি সাধন করা তাঁহার স্বার্থবুদ্ধি শূন্যতারই যোগ্য হইয়াছিল। * * * অযোধ্যার এই সকল প্রজাদের ন্যায় অল্পবুদ্ধি ও অবিবেচক প্রজা জগতে সর্ব্বদা দৃষ্ট হয় না। ইহাদিগকে লইয়া রামচন্দ্রকে মহাসমস্যায় পতিত হইতে হইয়াছিল। সীতার সম্মান রক্ষা হওয়া চাই, নিজের ন্যায়-ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ থাকা চাই, অথচ রাজ্যের মঙ্গলের জন্য প্রজাদিগকেও সন্তুষ্ট করা চাই। তিনি এই ত্রিবিধ সঙ্কটের যেরূপ সুসামঞ্জস্য বিধান করিয়াছিলেন, তাহা চিন্তা করিলে তাঁহার চরণে ভক্তিতে মস্তক স্বতঃই নত হইয়া পড়ে। ফলতঃ, রামচন্দ্র সীতাকে দুঃখভাগিনী করিয়াছিলেন, স্বয়ং দুঃখভাগী হইয়া। এই যে "কাঁদিয়া কাঁদান", ইহার মূলে যে কতখানি ভালবাসা বিদ্যমান, তাহা লিখিয়া বুঝাইবার নহে। তিনি তাঁহাকে বনবাসে প্রেরণ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহাকে হৃদয় হইতে বিসর্জ্জন দেন নাই। তিনি সীতাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন না, পরন্তু নির্ম্মম হইয়া আপনাকেই সীতার সঙ্গসুখ হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। মনস্বিনী সীতাও তাঁহার স্বামীর মনের এ কথা বুঝিতেন, আর সেই জন্যই জন্মান্তরে তাঁহাকেই পতিরূপে পাইবার জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন।

---

(৪) প্রকৃত পক্ষেও, প্রজারা রামচন্দ্রকে বুঝিতে পারে নাই, নতুবা তাহারা সীতা গ্রহণ বিষয়ে তাঁহার প্রতি সন্দেহযুক্ত হইত না।

* * * যিনি একদিন পিতৃসত্য পালনার্থ করামলকবৎ সাম্রাজ্যকে তুচ্ছ করিয়াছিলেন তিনিই যে আজ সীতাশূন্য অভিশপ্ত-জীবনকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, সেই তুচ্ছ সাম্রাজ্যেরই লোভে, এ কথা চিন্তা করিতেও প্রবৃত্তি হয় না। একদিন তাঁহার সম্মুখে ছিল, একদিকে রাজ্য, অন্যদিকে পিতৃসত্য। এই দুইটির মধ্যে সাধারণের বাঞ্ছনীয় কি, তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু অসাধারণ তিনি, তাই তিনি সাধারণের ঈপ্সিত রাজ্যকে তুচ্ছ করত পিতৃসত্যকেই শ্রেষ্ঠ মনে করিয়াছিলেন। আর তাঁহার সম্মুখে ছিল, একদিকে রাজ ধর্ম্ম, অন্য দিকে পত্নীপ্রেম। পতির পক্ষে পত্নীকে ভালবাসা যতদূর স্বাভাবিক, রাজার পক্ষে প্রজাকে ভালবাসা ততদূর স্বাভাবিক নহে। আবার পত্নীও যেমন তেমন পত্নী নহেন, সাধ্বী, সতী, নিষ্কলঙ্কচরিত্রা, সর্ব্বগুণবতী, ছায়ার ন্যায় অনুগামিনী, হৃদয়ানন্দদায়িনী এবং নয়নের জ্যোতিঃস্বরূপিনী। এস্থলে সামান্য ব্যক্তি যাহা করিতেন, তিনি তাহার বিপরীত করিয়াছিলেন, কারণ তিনি অসামান্য। ভাটায় ভাসিয়া যাইতে পারে সকলেই। কিন্তু উজান-স্রোতে সাঁতার কাটিয়া যাইতে পারেন যিনি, তিনিই যথার্থ বলবান্।

ফলতঃ, বাল্মীকি রামচন্দ্রকে অন্তর্যামী ভগবান করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। এই রক্তমাংসময় পার্থিব মনুষ্যের মধ্যে কি পরিমাণ দেবত্ব প্রস্ফুটিত হইতে পারে, তিনি তাহারই পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন এই রাম-চরিতে। সুতরাং "খোদার উপর খোদকারি" করিতে চাহেন যে সকল বাল্মীকির লেখক, তাঁহারা যেন আদিকবির এই বস্তুতন্ত্রতা এবং গভীর অন্তর্দ্দর্শনের কথা ভুলিয়া না যান। ত্যাগ যাঁহাদের আদর্শ তাঁহাদের নিকটে রাঘবচরিত্র এক অপূর্ব্ব সামগ্রী। পরন্তু utility বাদী অর্থাৎ হিতবাদি-সম্প্রদায়ী (৫) যাহারা তাঁহারাও এই মহাপুরুষের চরিত্রে বিন্দুমাত্র ছিদ্র দেখিবার অবসর পাইবেন না। বড়ই দুঃখের বিষয়, পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহে আমরা এমনই অন্ধ হইয়া পড়িয়াছি যে, খাঁটী ভারতীয় আদর্শ আজ আর আমরা চিনিয়া উঠিতেও পারি না।

---

(৫) যাহাতে অধিক লোকের উপকার হয়, তাহাই ধর্ম্ম, ইহাই হিতবাদি-সম্প্রদায়ের মত। মিল, বেন্থাম প্রভৃতি এই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।

সৎকথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

(স্বামী অদ্ভুতানন্দ)

সংসারে সুখ নাই—বাঁচলেও সুখ নাই, মরার পর সুখ নাই; যতই অর্থ হোক না কেন, কুড়ি পঁচিশ লাক অর্থ থাকলেও সুখ নাই। তবে সুখী লোক আছে যাদের কোন দুঃখ নেই। কেবল শান্তি আছে। যেমন সনক—সনাতন সনৎকুমার। তাঁরা চিরকুমার চিরবালক যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পারেন। ব্রহ্মলোক হতে শিবলোকে যাচ্ছেন। শিবলোক হতে বিষ্ণুলোকে যাচ্ছেন। এঁদের মধ্যে ভগবানের সব শক্তি আছে।

যুধিষ্ঠির মহারাজ পরম সত্যবাদী ছিলেন।—মহারাজ ত যুধিষ্ঠির মহারাজ। শ্রীকৃষ্ণের উপর নিঃসংশয় ছিলেন। পাণ্ডবেরা জন্ম ধার্ম্মিক তাঁদের একটুও রাজ্যভোগ করার ইচ্ছা ছিল না। তাঁরা কৌরবদের বল্লেন যে দেখ আমাদের পাঁচ খানা গ্রাম দাও। শরীর যখন ধারণ করেছি তখন শরীরকে কোন রকমে বাঁচাতে হবে। আর উপায় নাই।

ভীষ্মের মত হতে পাল্লে মানুষের কথা থাকে—ভগবানের কথা মিছা হয়ে যায়। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান বলেছিলেন যে অস্ত্র ধরব না; ভীষ্মের জন্য, আপনার অস্ত্র মিছে করে অস্ত্র ধরলেন। ভীষ্মের কাছে ভগবান বাঁধা ছিলেন কেন—এইজন্য যে ভীষ্ম নিমকহারাম ছিলেন না। যার অন্ন খাইতেন তার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। শ্রীকৃষ্ণের দয়া সকল অবতারের চেয়ে বেশী। তিনি জোর করে বলতেন যে আমি ভগবান, আমায় মান্ তোদের কল্যাণ হবে। একদিকে ব্রাহ্মণের পা ধুইয়ে দিতেন আবার বলতেন আমায় মান—নচেৎ বিনাশ করব।

(ক্রমশঃ)

বাঁচা মরার সমস্ত গুরু দায়িত্বই আমাদের নিতে হইবে। কেবল আংশিক দায়িত্ব ও সুবিধা নিলে চলিবে না। তেমন শক্তির মালিক না হইলে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় পরমুখাপেক্ষী হইয়াই থাকিব—থাকিতেছিও এবং নির্দ্দিষ্ট দিবসের মধ্যে স্বরাজ পাইলেও থাকিব। সেই জন্যই সর্ব্বদিকে শক্তি সংগ্রহের কথা বলিয়াছিলাম।—এডুকেশন গেজেট।

*

জাতির মেরুদণ্ড তরুণ যুবারা। আর এই তরুণের দল সাধারণতঃ স্কুল কলেজের ছেলেরাই। কেননা—আমাদের ধারণা এই যে, লেখা পড়া শিখে এই তরুণ দলের প্রাণ তরুণ তো আছেই অধিকন্তু বুদ্ধিতে তারা প্রবীণ হ'য়েছেন। কিন্তু আমাদের এ ধারণা নিতান্তই ভুল, তা আমরা এখন বেশ বুঝতে পাচ্ছি। এঁরা কাঁচা বুদ্ধি পাকাতে কলেজে যান, কি কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরিয়ে আসেন,—সেইটে এখন ভাববার কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে।—বিজলী।

* * *

দুইটি মহিলা নারীর নির্ব্বাচনাধিকার কি এবং তাহার ফল কি হইবে সে বিষয় সুস্পষ্ট ভাষায় সকলকে বুঝাইয়া দেন।

একটী মহিলা কোনো ইমামবাড়ীর রক্ষয়িত্রী বলিয়া ট্যাক্স দেন। তিনি বলিলেন, "আমরা সব কাজ করিতে পারি, ইমামবাড়ী রাখিতে পারি, ধন সম্পত্তি রক্ষণ বেক্ষণ করিতে পারি আর ভোট দিবার বেলা বুঝি আমাদের বুদ্ধি গোলমাল হইয়া যায়? আমরা এত করিতে পারি, আর কাহাকে ভোট দিতে হইবে, এটুকু বুঝিতে পারি না? যাহারা এই কথা বলিয়া মেয়েদের ভোট দেয় নাই তাহারা মিথ্যা কথা বলিয়াছে। মেয়েদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া খাওয়া তাহাদের মতলব, সেই জন্য তাহারা ভোট দিতে এত আপত্তি করিয়াছে।

আর একটি মহিলা বলিলেন "আমাদের" ভোটের অধিকার দিলে আমাদের চোখ খুলিয়া গেলে, পুরুষেরা চার পাঁচটে স্ত্রী করিবে কিরূপে? কাজেই তাহাদের স্বার্থ সাধনের জন্য আমাদের অন্ধকারে রাখিতে তাহারা এত ব্যস্ত।"—সঞ্জীবনী।

যদি বাঁচতে হয়, শিরদাঁড়া সোজা করে' ধর্তে হবে। মাথা নুঁয়ে মাটির দিকে ঝুঁকে পড়্লে জীবন নিয়ে বাঁচার চেয়ে মরা ভাল। তোমরা ভাব বাহিরের অভাব মিটলেই জাতটা তাজা হয়ে উঠবে, টাকায় একমণ চাল, আর প্রচুর দুধ ঘিয়ের বরাদ্দ করতে পারলেই আমরা বেঁচে যাই! কথা একদিক দিয়ে মিথ্যে নয়, কিন্তু মূলে যে ঘুণ ধরেছে—তা না ঘোচাতে পারলে, চিন্তায় চিন্তায় মগজে মাকড়সার জাল তৈয়ারী হবে, ফলে আমরা এক পাও এগুতে পারবো না।—নবসঙ্ঘ।

সমালোচনা ও পুস্তক পরিচয়।

সেবিকা—শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। সুন্দর গল্পগুচ্ছ। ভাষা সরল ও নির্ম্মল। মূল্য এক টাকা।

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সিংহ প্রণীত। সর্ব্বজন সুপরিচিত সন্ধ্যা সম্পাদক কর্ম্মবীর ব্রহ্মবান্ধব মহাশয়ের বৈচিত্র-ময়ী জীবনী অতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সংগৃহীত হইয়াছে। মূল্য এক টাকা।

পরিত্যক্ত (নাটক)—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। মূল্য এক টাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণ গল্পলহরী—ঠাকুর ছোট ছোট গল্পের মধ্য দিয়া যে সকল ধর্ম্মোপদেশ করিতেন তাহারই একত্র সমাবেশ। প্রাপ্তি স্থানঃ—(১) সেক্রেটারী, রামকৃষ্ণ সেবাসমিতি পোঃ কলমা, ঢাকা। (২) সেন গুপ্ত এণ্ড কোং ৫নং কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা। মূল্য পাঁচ আনা।

সংবাদ ও মন্তব্য।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম—সোনার গাঁ, ঢাকা হইতে আশ্রমের ১৯১৫ হইতে ১৯২০ পর্য্যন্ত কার্য্য বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। অবৈতনিক বিদ্যালয়, দাতব্য ঔষধালয় এবং সেবকদের আবাস গৃহের বিশেষ প্রয়োজন। যাঁহারা এই সৎকার্য্যে দান করিতে

ইচ্ছুক তাঁহারা (১) শ্রীমৎ স্বামী ভবানন্দ বা (২) সম্পাদক সোনার গাঁ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, তাজপুর পোঃ, আমিনপুর, ঢাকা এই ঠিকানায় পাঠাইয়া সেবকদের বাধিত করিবেন।

সমন্বয়—শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অন্যতম কেন্দ্র মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষগণের ব্যবস্থায় শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের মহতী বাণী ও জীবনী প্রচারের নিমিত্ত "সমন্বয়" এই মহাভাবাখ্যায় গত মাঘ হইতে প্রকাশিত হইতেছে। সমাজ, সাহিত্য, শিল্পও ইহার উপাঙ্গ রূপে গৃহীত হইয়াছে। বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। প্রতি সংখ্যা চারি আনা। কার্য্যালয়, ২৮নং কলেজ ষ্ট্রীট, মার্কেট, কলিকাতা।

শ্রীরামকৃষ্ণাশ্রম ব্যাঙ্গালোরে—স্বামী বিবেকানন্দের ষষ্টিতম জন্মোৎসব হইয়া গিয়াছে। প্রায় দেড় হাজার দরিদ্র নারায়ণ প্রসাদ পান। পূজা, পাঠ, প্রসাদ বিতরণ, হরিকথা এবং বক্তৃতাদি উৎসবের সকল অঙ্গই সম্পন্ন হয়।

রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম—সোনার গাঁ—বিগত ১৫ই মাঘ রবিবার স্বামী বিবেকানন্দজির ষষ্টিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে এখানকার স্থানীয় প্রায় তিন সহস্র দরিদ্র-নারায়ণ ও ভক্ত আশ্রমে উপস্থিত হইয়া প্রসাদ গ্রহণ এবং কীর্ত্তনাদিতে যোগদান করতঃ মহানন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। অপরাহ্ণে আশ্রম-প্রাঙ্গনে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়, তাহাতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক উপস্থিত ছিল। অনেকেই স্বামীজি মহারাজের জীবনী এবং তাঁহার সেবাধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে মৌলবী আহাম্মদ হোসেনের সুদীর্ঘ বক্তৃতা অতীব হৃদয়গ্রাহী হয়।

রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম—গৌহাটী—ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভাশীষ মস্তকে লইয়া গত ৮ই মাঘ রবিবার গৌহাটী সহরে শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম গৃহপ্রতিষ্ঠা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব কার্য্য সুসম্পাদিত হইয়াছে। ৺কামাখ্যাধামস্থ পূজ্যপাদ স্বামীজির পাণ্ডা লক্ষ্মীকান্ত শর্ম্মা তদীয় পুত্রের দ্বারা পূজা ও অর্চ্চনার কার্য্য যথাবিধি সম্পন্ন করিয়াছেন। 'দরিদ্রনারায়ণ সেবা' উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সমিতি—ফরিদপুর—বিগত ৫ই মাঘ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময় স্থানীয় রাজেন্দ্র কলেজে বিশ্ব-বিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দের ষষ্ঠীতম জন্মোৎসব উপলক্ষে এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত হরিপদ বন্দোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, প্রথম সবজজ মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত মানদাশঙ্কর দাসগুপ্ত এম, এ, বি, এল সারগর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। প্রিন্সিপাল কামাখ্যা নাথ মিত্র এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র ঘোষ বি, এল, শ্রীযুক্ত ননীলাল দাস গুপ্ত সভায় স্বামীজির জীবনী সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন হইয়াছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, সরিষা—গত ২৫শে ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে ঐ আশ্রমে চারি খানি তাঁত ও কয়েকটি চরকার সাহায্যে কাপড় বোনা ও সূতাকাটা জন-সাধারণকে শিখান হইতেছে। গ্রামে গ্রামে চরকা ও তুলা দিয়া প্রতি সপ্তাহে সূতা সংগ্রহ করা হইতেছে। তাহারা যে পরিমাণে সূতা কাটে তাহার মজুরি দেওয়া হয় এবং ঐ মজুরি হইতে যৎকিঞ্চিৎ করিয়া চরকার দাম উসুল করা হয়। এই বয়ন বিদ্যালয়ে ১৫টী ছাত্রকে বেলুড় মঠের বয়ন বিদ্যালয় হইতে ঐকার্য্যে একজন সুদক্ষ সন্ন্যাসীর দ্বারা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। ইহার সহিত গরিব জন সাধারণের চিকিৎ-সার জন্য একটী হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। এই সকল কার্য্য শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের আরও দুই জন ব্রহ্মচারীর দ্বারা ব্যবস্থিত হইতেছে। যাঁহারা এই সৎকার্য্যে তাঁত, চরকা বা টাকা কড়ির দ্বারা সাহায্য করিবেন তাঁহারা উক্ত আশ্রমে সরিষা পোঃ, জেলা ২৪ পরগণা, এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ

কথা প্রসঙ্গে।

(ক)

আজ আট বৎসর পূর্ব্বে একবার জনসাধারণের মধ্যে ধূয়া উঠিয়াছিল যে, স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্ঘবদ্ধ প্রচারধর্ম্ম ও সেবাধর্ম্ম শ্রীরামকৃষ্ণ-মত সম্মত নয়। এক্ষণে জগতে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকান্দের পরিচয়ের সহিত এমন কি পাশ্চাত্য বিদ্বজ্জন মধ্যেও সেই একই সন্দেহ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ডাঃ জেমস্ বিসেট্ প্র্যাট্ তাঁহার "ভারতবর্ষ ও তাহার ধর্ম্মমত" নামক গ্রন্থ মধ্যে ঐ সন্দেহই উত্থাপন করিয়াছেন এবং বিগত স্বামীজির জন্মোৎসব উপলক্ষে ডাঃ মরেনো বিবেকানন্দ সোসাইটীতে যে বক্তৃতা করেন তাহাতে বলেন যে, প্রচারধর্ম্ম শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্য হইতেই বিবেকানন্দে সঞ্চারিত হইয়াছে কিন্তু তাঁহার সঙ্ঘবদ্ধ ভাব পাশ্চাত্য ভ্রমণের ফল।

* * * *

সাধারণতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজির এই কথাগুলিতে বিরোধ উপস্থিত হইয়া থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। "শম্ভু মল্লিক হাঁসপাতাল, ডাক্তারখানা, স্কুল, রাস্তা, পুষ্করিণীর কথা বলেছিল। আমি বোল্লাম, সম্মুখে যেটা পড়লো, না করলে নয়, সেইটাই নিষ্কাম হয়ে কর্‌তে হয়। ইচ্ছা ক'রে বেশী কাজ জড়ানো ভাল নয়, ঈশ্বরকে ভুলে যেতে হয়। কালীঘাটে দানই করতে লাগলো; কালী দর্শন আর হলো না! আগে যো সো করে ধাক্কাধুক্কি খেয়েও কালী দর্শন করতে হয়, তারপর দান যত করো আর না করো। * * * শম্ভুকে তাই বল্লুম, যদি ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হন, তাঁকে কি বলবে— কতক-

গুলো হাঁসপাতাল, ডিস্‌পেনসারি করে দাও? ভক্ত কখনও তা বলে না। বরং বলবে, ঠাকুর আমায় পাদপদ্মে স্থান দাও, নিজের সঙ্গে সর্ব্বদা রাখো; পাদপদ্মে শ্রদ্ধা ভক্তি দাও।"

"জগতের উপকার মানুষ করে না; তিনিই করছেন; যিনি চন্দ্র সূর্য্য করেছেন, যিনি মা-বাপের ভিতর স্নেহ দিয়েছেন, যিনি মহতের ভিতর দয়া দিয়েছেন, যিনি সাধু ভক্তের ভিতর ভক্তি দিয়েছেন।"

স্বামীজি। "আগামী পঞ্চশৎ বর্ষ ধরিয়া সেই পরম জননী মাতৃভূমি যেন তোমাদের আরাধ্যা দেবী হন, অন্যান্য অকেজো দেবতাগণকে এই কয়েক বর্ষ ভুলিলে কোন ক্ষতি নাই। অন্যান্য দেবতারা ঘুমাইতেছেন, এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত। * * * তোমরা কোন্ নিস্ফল দেবতার অন্বেষণে ধাবিত হইতেছ? * * * সকলেই যোগী হইতে চায়, সকলেই ধ্যান করিতে অগ্রসর! তাহা হইতেই পারে না।"

"সন্ধ্যাবেলা খানিকটা বসিয়া নাক টিপিলে কি হইবে? তিনবার নাক টিপিয়াছ, আর অমনি ঋষিগণ উড়িয়া আসিবে?'

"তোমরা সব ছুড়িয়া ফেলিয়া দাও, এমন কি, নিজের মুক্তি পর্য্যন্ত দূরে ফেলিয়া দাও;—যাও অপরের সাহায্য কর।"

* * * *

ঠাকুর বলিতেছেন,—ধ্যান ধারণার উপর জোর দাও, স্বামীজি উহাকে ঠাট্টা করিতেছেন; ঠাকুর বলিতেছেন,—তুমি উপকার করিতে পার না, ভক্তি মুক্তি লাভের অধিকারী হও; স্বামীজি বলিতেছেন,—মুক্তি ছুড়িয়া ফেল—যাও, সেবা কর; ঠাকুর দেবদেবীর প্রতি ভক্তিসম্পন্ন হইতে বলিতেছেন, আর স্বামীজি বলিতেছেন, অকেজো দেবতারা এখন পড়িয়া থাকুক্। আমরা ত দেখিতেছি, একটী মত অপরটীর ঘোর বিরোধী। এখন উপায় কি? কোন্‌টী গ্রহণ করিব?

* * * *

এই বিরোধের কারণ অধিকারী নির্ণয় না করা এবং দুই চারিখানি গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণের যে ব্যক্তিগত উপদেশ লিপিবদ্ধ করা আছে তাহাকেই

সার্ব্বজনীন করিয়া সকলের উপর আরোপ করা। ঠাকুর শম্ভু মল্লিককে হাঁসপাতাল, ডিস্‌পেনসারি প্রভৃতি কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিতেছেন, ইহার দ্বারা প্রতিপন্ন হয় না যে, তিনি সকলকেই কর্ম্মত্যাগ করিতে বলিতেছেন। ঠাকুরের বিশিষ্ট শিষ্যদিগের নিকটই শুনিয়াছি যে, ঐ কথা তিনি শম্ভু মল্লিককেই লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন। তিনি খুব উচ্চ থাকের ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছিল। কর্ম্ম কতক্ষণ? যতক্ষণ না চিত্তশুদ্ধ হয়।

* * * *

শাস্ত্রও বলিতেছেন, "কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরণ। ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে।"—কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল সংযম করিয়া যে মনে মনে কাম্যবস্তুর চিন্তা করে, সেই বিমূঢ়াত্মা কপট। সত্ত্বগুণী ব্যক্তিগণ ঈশ্বরের চিন্তা ছাড়া অন্য চিন্তা করিতে পারেন না। কিন্তু তাই বলিয়া যদি তমোগুণী ব্যক্তি দিবারাত্র জপ ধ্যান করিতে যায় তবে তাহার বাতুলতা অবশ্যম্ভাবী। বেদ বলিতেছেন, "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মানি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ। এবং ত্বয়ি নান্যথেতোহস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে॥"—শাস্ত্রোক্ত ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াই শতবৎসর বাঁচিয়া থাকিবে। তুমি যখন মনুষ্যত্বাভিমানী, তখন তোমার পক্ষে অন্য এমন কোনও উপায় নাই, যাহাতে কোন কর্ম্মই তোমাতে লিপ্ত না হইতে পারে। মহতেরা যাহা করেন, সাধারণে তাহারই অনুসরণ করেন। তাই শ্রীভগবান বলিতেছেন, "নমে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন। নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মাণি॥"—হে, অর্জ্জুন, ত্রিলোকে আমার করণীয় কিছুই নাই, কোন বস্তু অপ্রাপ্তও নাই; তথাপি আমি কর্ম্ম করিয়াই যাইতেছি।—লোক শিক্ষার জন্য। কেন?—"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্। যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মানি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্।—কর্ম্মাসক্তদিগের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না, বিদ্বান্‌ব্যক্তি নিজে যোগযুক্ত হইয়া কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া তাহাদিগকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবেন।

অধ্যাপক প্র্যাটের বুঝা উচিৎ যে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ is a man making principle—মানুষ গড়াই উহার কার্য্য। পরমহংস হইয়া সেখানে কেহ আসে না, উহা লাভ করিবার জন্যই আসে। অতএব 'প্রাচীন প্রথা ত্যাগ না করিতে পারিয়া' স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার সঙ্ঘে কেবল মাত্র শুদ্ধ-জ্ঞান-চর্চ্চা প্রবর্ত্তন না করিয়া, পূজা-অর্চ্চার ও সৎকর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন—এরূপ নহে, পরন্তু নানা অধিকারীকে নানা অবস্থার মধ্য দিয়া গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যেই তিনি ঐ সকলের প্রণয়ন করিয়াছেন। এবং এই সঙ্ঘে যদি কেহ যথার্থ জ্ঞানী থাকেন তাঁহারাও কর্ম্ম করিয়া শ্রীভগবানের কথাই সার্থক করিতেছেন—"কর্ম্মা-সক্তদিগের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না, বিদ্বান্ ব্যক্তি নিজে যোগযুক্ত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা তাহাদিগকে কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিবেন।"

* * * *

ঠাকুর বলিতেন "নরেন শিক্ষে দিবে।" তিনি শিক্ষা দিয়াছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের অভূতপূর্ব্ব তপোপূতঃ জীবনের "যত মত তত পথ" রূপ সমন্বয় ভাষ্য। তিনি শ্রীগুরুর জীবনকেন্দ্র হইতে কথা বলিয়াছিলেন—তাহা সকল ব্যাসার্দ্ধেই পৌঁছিয়াছিল। পরন্তু ব্যক্তিগত উপদেশ সকলের উপর চাপান চলে না—উহা তদ্রূপ অধিকারীর পক্ষে অমৃতস্বরূপ। শ্রীরামকৃষ্ণ কেবল জ্ঞান-ভক্তির অধিকারীদের মুক্তি-মার্গ দেখাইবার জন্য আসেন নাই। পাপী, তাপী, বদ্ধ, দাস প্রভৃতি সকলের উদ্ধারের পথ দেখাইবার জন্যই আসিয়াছিলেন এবং জীবনে তাহারই পরিণতি দেখাইয়াছিলেন এবং স্বামীজি তাহারই ভাষ্য প্রণয়নের জন্য রাজযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্ম্মযোগ জগতে বলিয়া গিয়াছেন।

বর্ত্তমান সমস্যা

(শ্রী—)

অতি প্রাচীন কালে পৃথিবীর কোন সুদূর বনরাজির অন্তরালে একটী বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল, এই নির্জ্জন প্রাসাদ যে কোন্ সময়ে কিরূপে কোন্ উদ্দেশ্যে এবং কাহা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল জগতের ইতিহাস তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ বক্ষে ধারণ করে না। এই অট্টালিকাতে কেবল মাত্র দুইটী জীব বাস করিত, কিন্তু তাহাদের মধ্যে সর্ব্বদাই একটা বিরাট বিচ্ছেদ, সকলের নিকট তাহাদের পরস্পরের জীবত্বের বিশেষত্বটুকু অতি স্পষ্টভাবে জানাইয়া তুলিত। জগতের লোক এই দৃশ্য দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া লইল যে উহাদের মধ্যে, পরস্পরের প্রতি এই যে বিরুদ্ধভাব তাহা উহাদের স্বভাবজাত বিশিষ্টতা। এই স্ব স্ব বিশিষ্টতা রক্ষা করিতে গিয়া আজ বর্ত্তমান জগৎ যে একটা বিরাট সংঘর্ষের নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাই বর্ত্তমান সমস্যার প্রধান বক্তব্য।

ঐ যে বনরাজির অন্তরালে সুরম্য প্রসাদ উহার নাম জগতের সভ্যতা; আর ঐ যে বিরুদ্ধভাবাপন্ন দুইটী জীব, উহাদের নাম "জড়বাদী' ও "চৈতন্যবাদী"; এই দুইটী জীব জানিত যে তাহাদের উভয়কেই অবশেষে একই লক্ষ্যে পৌছাইতে হইবে, কাজেই উভয়ে তাহাদের বিবাদ ক্ষণকাল স্থগিত রাখিয়া স্ব স্ব গন্তব্যপথ অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিল,—যিনি জড়বাদী বা প্রকৃতি উপাসক অর্থাৎ বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক তিনি সৃষ্টিতত্ব ফেলিলেন প্রথমে Matter তারপর Force—Engry Electricity অবশেষে Electronএর উপর; আর যিনি চৈতন্যবাদী অর্থাৎ ঈশ্বরোপাসক অর্থাৎ ধর্ম্মপ্রাণ তিনি স্রষ্টা এবং সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝিলেন কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি অবশেষে মোক্ষের মধ্যদিয়া। জড়বাদী তাহার পথে টানিয়া আনিল ইউরোপ ও আমেরিকাদের আর ধর্ম্মপ্রাণ চৈতন্যবাদী তাহার পথে টানিয়া আনিল এশিয়া ও ভারতবর্ষকে।

এই দুই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য স্ব স্ব বিশিষ্টতাকে রক্ষা করিতে গিয়া পরস্পর বিপরীতভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহারপর যখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সাক্ষাৎ হয় উভয়েই পরস্পরের দৃষ্টি বিশ্লেষণ করিয়া লইল। পাশ্চাত্য দেখিল,—"অনশন অর্দ্ধাশণ সহজভাব, মধ্যে মধ্যে কালরূপ দুঃর্ভিক্ষের মহোৎসব, রোগে শোকে জর্জ্জরিত, আশা আনন্দ উদ্যম উৎসাহহীন, তপোবন আর তাহার মধ্যে ধ্যানমগ্ন মোক্ষপরায়ণ ত্যাগী ও যোগী—এই আমাদের প্রাচ্যদেশ। এই ত্রিংশকোটী জীব, বহু শতাব্দি ধরিয়া স্বজাতি স্বধর্ম্মী বিধর্ম্মীর পদভরে নিষ্পীড়িত, দাসসুলভ—ইউরোপের চক্ষে এই আমাদের ছবি। আর নব-বল-মধুপানমত্ত, হিতাহিত বোধহীন হিংস্র, স্ত্রীজিত, কামোন্মত্ত সুরাসিক্ত, আচারহীন, সৌচহীন, জড়বাদী, জড়সহায়, পরলোকে বিশ্বাস হীন, ধর্ম্মহীন—প্রাচ্যের চক্ষে এই পাশ্চাত্য অসুর।"

এই উভয় পক্ষের বুদ্ধিহীন বহির্দৃষ্টির পশ্চাতে নিশ্চই একটা প্রধান সত্য নিহিত আছে। প্রাচ্যের আদর্শ—ত্যাগ ও দুঃখের মধ্যদিয়া ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতাকেই আদর্শ বলিয়া জানা, আর পাশ্চাত্যের আদর্শ ভোগ ও সুখের মধ্য দিয়া রাজনীতি ও জড়বিজ্ঞানকে জগতের সামক্ষে বড় করিয়া ধরা। এইরূপে প্রাচ্য তাহার সমস্ত জ্ঞান শিক্ষা সভ্যতা এবং কর্ম্মের আদর্শ করিল ধর্ম্মকে। তাই প্রাচ্যের সেই এক একটা অনুভূতি বেদ কোরান ও বাইবেলরূপে জগতের মধ্যে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল; তাই প্রাচ্য প্রেয় ত্যাগ করিয়া শ্রেয়কে গ্রহণ করতঃ আত্মশক্তির মধ্যে সেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাইয়াছিল। তাই প্রাচ্য অভিঃ অভিঃ বলিতে বলিতে পাপ ও পুণ্যের পরপারে, স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের পরপারে সেই জ্যোতির্ম্ময়ের সন্ধানে ছুটিয়াছিল; তাই প্রাচ্য "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ্নিবোধত" "নায়ম্ আত্মা বলহীনেন লভ্য" এই বাণী প্রচার করিয়া প্রত্যেক আত্মার মধ্যে একটা বিরাট শক্তি সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিল। তাই প্রাচ্য সর্ব্ব ব্রহ্মময়ং জগৎ মধ্যে ত্যাগের দ্বারা, বীর্য্যের দ্বারা, প্রেমের দ্বারা, সকলকে আপনার করিতে এবং সকলের মধ্যে আত্মার উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিল। তার

তাই সেদিন প্রাচ্যের কোন বৃদ্ধঋষির তরুণমূর্ত্তি সুদূর আটলান্টিকের পরপারে গমন করিয়া সেই স্থানের অধিবাসী বৃন্দের চক্ষুরুন্মিলিত করাইয়া, মানব সমাজের এবং মনুষ্যত্ববিকাশের যে প্রকৃত আদর্শ বেদান্ত ধর্ম্ম, তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিয়াছিল।

এই প্রাচ্য তাহার শিক্ষা ও সভ্যতার মধ্যদিয়া এমনভাবে একদিন গঠিত হইয়াছিল, যে সময়ে সে ধর্ম্ম বা আধ্যাত্মিকতাকে, জীবনের আদর্শ করিয়া ত্যাগ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল—বিশ্বের কল্যাণের জন্য। এই প্রাচ্য একদিন ধর্ম্মের জন্য—

"ছুটিয়াছে নির্ভীক পরানে সঙ্কট আবর্ত্তমাঝে,
দিয়েছে সে বিশ্ববিসর্জ্জন, নির্য্যাতন
লয়েছে সে বক্ষপাতি, মৃত্যুর গর্জ্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মত, দহিয়াছে
অগ্নি তারে, বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন
তারে করেছে কুঠার, সর্ব্বপ্রিয় বস্ত
তার অকাতরে চিরিয়া, চিরজন্ম জ্বেলেছে
সে হোম হুতাসন, হৃদপিণ্ড করি ছিন্ন
পদ্মরক্ত অর্ঘ্য উপহারে ভক্তিভরে জন্মশোধ
শেষ পূজা পূজিয়াছে তারে, মরণে কৃতার্থ করি প্রাণ"

তারপর মিসর, ব্যাবিলোনিয়া, আরব পারস্য প্রভৃতি কত রাজ্য পাশ্চাত্যের সেই রাজনীতিকে আদর্শ করিতে যাইয়া কতবার উঠিয়াছে কতবার পড়িয়াছে, সমাজতন্ত্র ও রাজনীতির পন্থা ধরিয়া কত রাজ্য বর্ত্তমান এই ইউরোপীয় সভ্যতার ন্যায় বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে; কিন্তু এই প্রাচ্য দেশে এমন একটী রাজ্য আছে যে ধর্ম্মের মধ্য দিয়া, আদান-প্রদান নীতি অবলম্বন করিয়া রাজনীতি ও সমাজতন্ত্রের সামঞ্জস্য করিয়াছিল এবং আজিও স্বীয় বিশিষ্টতাকে রক্ষা করিয়া একটা মহান আদর্শের দিকে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছে। ওদিকে গ্রীক, রোম, কার্থেজ, ফ্রান্স প্রভৃতি বড় বড় রাজ্য বিজ্ঞান ও রাজনীতির মধ্যদিয়া প্রকৃত শিক্ষা ও সভ্যতার আদর্শকে কতবার আহ্বান করিয়াছে,

আবার কতবার প্রত্যুত্তর না পাইয়া স্ব স্ব প্রকোষ্ঠমধ্যে সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে। এইরূপে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নূতনকে অনুকরণ করিতে যাইয়া স্ব স্ব অতীতের সেই মহান বিশেষত্বটুকু হারাইতে চলিয়াছে। আবার সেই আটলান্টিকের পরপারে সেই Republic আমেরিকা সমাজনীতিকে তাহার জাতীয় শিক্ষা ও সভ্যতার আদর্শ করিয়া সমগ্র পৃথিবীর উপর একটা বিরাট আধিপত্য বিস্তার করিতে অগ্রসর হইতেছিল, কিন্তু ভারতের আধ্যাত্মিকতার বাতাস, বেদান্তের বাতাস সেই অগ্রসরের পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইল। এইরূপে ইউরোপ ও আমেরিকা তাহার জাতীয় সভ্যতার আদর্শকে পদার্থবিজ্ঞান কৃষি, শিল্প বাণিজ্য, সমাজনীতি রাজনীতির মধ্যে ফেলিয়া প্রকৃতিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। France, Britain, Belgium, Germany, Austria এবং Russia প্রভৃতি একটা সত্য অনুসন্ধান করিতে যাইয়া প্রচার করিল যে প্রত্যেক জাতির সভ্যতার আদর্শ "Struggle for existence" অপর দিকে সেই Republic America, "Survival of the Fittest" এর মহিমা দেশে দেশে গাহিয়া বেড়াইতে লাগিল ক্রমে ক্রমে Aristocracy ও Democracy ইর হাওয়া পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই ছড়াইয়া পড়িল।

এদিকে যখন আমেরিকা ও ইউরোপ প্রবল বেগে পার্থিব উন্নতির সোপানে উঠিতেছিল, যখন ইউরোপ ভোগকে সংযমের সাথে বাঁধিতে না পারিয়া প্রকৃতিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া, স্বীয় সুখের জন্য কল কব্জা প্রস্তুত করিয়া, সমুদ্রে mine পাতিয়া এবং Torpedo ভাসাইয়া, আকাশে জাহাজ উড়াইয়া, উপর হইতে কামান দাগিয়া এবং Dynamite ফাটাইয়া, Bomb ফেলিয়া স্বীয় আসুরিক শক্তিতে গর্ব্বিত ও স্ফীত হইয়া তাহার সভ্যতার আদর্শকে সত্য বলিয়া প্রমান করিতে যাইতেছিল; সেই সময়ে প্রাচ্য দেশে তিনটী জাতি অতি ধীরে ধীরে বর্ত্তমান সমস্যার নিকট উপস্থিত হইবার জন্য পাশ্চাত্যকে অনুকরণ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেছিল। চীন, জাপান ও ভারত তাহাদের সেই প্রাচীন বিশেষত্বটুকু ত্যাগ করিয়া নূতনের আশায় ধর্ম্ম ছাড়িয়া

রাজনীতিকে, ত্যাগ ছাড়িয়া ভোগকে, গঠন ছাড়িয়া সংহারকে, সত্যের স্থানে মিথ্যাকে, সভ্যতার স্থানে স্বার্থপরতা বিলাসিতা ও অত্যাচারকে বসাইয়া প্রত্যেকে আপনাকে গৌরবান্বিত করিতেছিল।

যখন সমগ্র জগতের অর্থাৎ আমেরিকা ইউরোপ ও এসিয়ার এইরূপ অবস্থা তখন "Might is right" রূপ গভীর সমুদ্র হইতে একটা বৃহৎ মেঘ সৃষ্ট হইয়া পাশ্চাত্যের আকাশে দৃষ্টি গোচর হইল। সেই মেঘ Austria, Russia, Germany, Turky, Britain, France প্রভৃতির উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া আমেরিকার আকাশে বিদ্যুৎযুক্ত হইয়া অবশেষে ভারতের আকাশে একটা বিরাট বজ্রপাত সৃষ্টি করিয়াছিল। এই মেঘরূপ গত ইউরোপীয় যুদ্ধ পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে একটা পরিবর্ত্তন আনিয়া ফেলিল। জর্ম্মনীর Sience, বৃটেনের politics, আমেরিকার Socialism কোথায় অন্তর্ধান হইল, কিন্তু এই বজ্রপাতে বহুদিনের এই জড়প্রায় নিশ্চেষ্ট অন্ধকারে লুপ্ত, তমোভাবে সুপ্ত ভারত—আবার জাগিয়া উঠিল। এই জগৎব্যাপী পরিবর্ত্তনের পর সকল দেশে একটা গভীর সমস্যা উপস্থিত হইল। সমস্যা এই যে—বিশ্বকল্যাণের উদ্দেশ্যে Seince, Politics এবং Socialismএর জগতের সভ্যতা ভাণ্ডারে যাহার যাহা কিছু দেওয়া ছিল তাহা প্রমান করা সত্বেও কেন এই যুদ্ধের পর একটা বিরাট ধ্বংস সকলকে গ্রাস করিতে ছুটিয়াছে? এই ধ্বংসের কারণ পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে প্রেমের পরিবর্ত্তে প্রতিযোগীতা, সত্যের পরিবর্ত্তে মিথ্যা আর আত্মশক্তি বিকাশের স্থানে পাশবশক্তির তাণ্ডব নৃত্য।

কারণ ইউরোপের সভ্যতা চাহিয়াছিল আত্মার অস্তিত্বকে উড়াইয়া দিতে; বিজ্ঞান চেষ্টা করিয়াছিল, বৈজ্ঞানিকের Loboratoryতে Electricity এবং Electronএর মধ্যে ঈশ্বরকে ধরিয়া রাখিতে, রাজনীতি চাহিয়াছিল Co-operationএর স্থানে Competitionএর বিজয় পতাকা তুলিয়া ধরিতে, সমাজনীতি অগ্রসর হইয়াছিল Aristocracy ও Democracy ইর বন্যায় জগৎ প্লাবিত করিতে। কিন্তু যাহা সত্য, যাহা শাশ্বত তাহার জয় হইবেই; তাই এই যুদ্ধের পর

একটা বিরাট সাড়া জগতবাসীকে এই দেখাইয়াছিল যে, যে জাতির সভ্যতার আদর্শ ধর্ম্ম বা অধ্যাত্মিকতা নয় যে জাতির শিক্ষার আদর্শ প্রেমের বিস্তার নয়, যে জাতির রাজনীতির মূলে ত্যাগ ও প্রেমের প্রেরণা নাই, সে জাতি একদিন নিশ্চয়ই ধ্বংসের মুখে পড়িবে, সে জাতি একদিন নিশ্চই অন্যায় ও অত্যাচারের প্রতিফল পাইবে। তাই এই যুদ্ধ পাশ্চাত্যের প্রায় সকল জাতির প্রাণ স্পন্দনের মধ্যে এমন একটা সাড়া দিয়া গিয়াছে যে তাহারা বুঝিয়াছে যে এখন একটা গভীর সমস্যার সমাধান করিবার সময় আসিয়াছে—সমস্যা এই যে, প্রত্যেক জাতির স্ব স্ব জাতীয় সভ্যতার পূর্ব্ব পথ ছাড়িয়া কোন্ পথ অবলম্বন করিলে তাহাদের সভ্যতার আদর্শকে আরও বড় করিতে পারা যায়—কোন্ শিক্ষা আরম্ভ করিলে তাহাদের জাতীয় জীবনকে সত্য ও শাশ্বতের দিকে আরও নিকটবর্ত্তী করা যায় ; সমস্যা এই যে এতদিন রাজনীতি, সমাজনীতি ও পদার্থ-বিজ্ঞানকে জাতীয় জীবনের আদর্শ করিয়া তাহারা প্রকৃত জ্ঞান পাইল না, প্রকৃত শান্তি পাইল না, বিশ্বের ইতিহাসে তাহাদের গৌরবের কোন দাবী রহিল না, বিশ্বের উপর তাহাদের সভ্যতার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইল না,—কিন্তু সুদূর প্রাচ্যের একটা হেয় নগণ্য নিভৃত রাজ্য, ভিতর ও বাহির হইতে শত শত আঘাত পাইয়াও জগতের সভ্যতা ভাণ্ডারে প্রকৃত সত্য ও শাশ্বতের আভাষ দিবার জন্য এখনও বাঁচিয়া আছে—জগতকে সত্যের পথ, জ্ঞানের পথ, আলোর পথ দেখাইবার জন্য দাঁড়াইয়া বিশ্বমানবকে এখনও আহ্বান করিতেছে। এই রাজ্যে যে জাতি বাস করে সে কখনও রাজনীতিকে সভ্যতার আদর্শ করে নাই, সমাজনীতিকে ধর্ম্মের উচ্চে স্থান দেয় নাই, জড়বিজ্ঞানকে চেতনাশক্তির কখনও আধার করে নাই—কল কব্জার মধ্যে সত্যের অনুভূতি লইতে প্রয়াস পায় নাই, জাতীয় জীবনকে Anarchism Aristocracy, Democracyর ছাঁচে ঢালিয়া দেশের গৌরব জগতের সমক্ষে প্রচার করে নাই, Struggle for exsistence এর ধূয়া শিক্ষার আদর্শকে সংহারের মূর্ত্তি মনে করিয়া দেশের পূজা করে নাই। আজিকারদিনে বর্ত্তমান ইউরোপ এই ভীষণ সমস্যার নিকট উপস্থিত। এই গভীর সমস্যার সমাধান হইতে পারে

একমাত্র ধর্ম্মের মধ্য দিয়া আধ্যাত্মিকতার মধ্য দিয়া। এধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্ম নয়, ইসলামধর্ম্ম নয়, ' Christian ধর্ম্ম নয়, বৌদ্ধধর্ম্ম নয় এ ধর্ম্ম "বেদান্ত ধর্ম্ম" এধর্ম্ম ত্যাগ, সেবা ও প্রেম—এধর্ম্ম প্রত্যেক ব্যক্তি এবং জাতির মধ্যে একটা একত্বের অনুভব। যতদিন পর্য্যন্ত না ইউরোপ ও আমেরিকা তাহাদের জাতীয় সভ্যতার মূলে এই বেদান্ত ধর্ম্ম স্থাপন করিবে, যতদিন পর্য্যন্ত না এই বেদান্ত ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইয়া পৃথিবীর ধ্বংসপ্রায় জাতি সকল আবার নূতন উৎসাহে নূতন উদ্যমে সকল সঙ্কীর্ণতা, সকল দুর্ব্বলতা দূরে রাখিয়া, ত্যাগ সম্মিলিত হয়, ততদিন সভ্যতার বিস্তার দ্বারা প্রকৃত শান্তির অনুসন্ধান করা বিশ্বের মধ্যে কল্যাণের বাণী প্রচার বাতুলতা মাত্র।

যতদিন পর্য্যন্ত না বেদান্তের ভাব সমষ্টিকে কার্য্যে পরিণত করিতে পারা যায়, ততদিন দেশ শাসন, রাষ্ট্রীয় অধিকার, সমাজতন্ত্র বিশ্বের মঙ্গলের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছি বলিয়া দাবী করিতে পারে না।

তাই প্রথমে চাই বেদান্তের সেই ভাবসমূহকে এবং আত্মজ্ঞানকে শুধু মোক্ষ লাভের উপযোগী করতঃ গিরি গহ্বরে নিদিধ্যাসনের বস্তু করিয়া না রাখিয়া দৈনন্দিন ব্যক্তিগত ও জাতিগত জীবনের ভিতরে তাহাকে ছড়াইয়া দেওয়া; রাজনৈতিকের রাষ্ট্রসভায়, বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাগারে, শ্রমজীবীর কারখানায়, মুটে মজুরের কর্ম্মক্ষেত্রে, উচ্চ নীচ সকলের কুটির মধ্যে সর্ব্বত্র সমভাবে বেদান্তের এই মঙ্গলবর্ত্তিকা প্রজ্জ্বালিত করিতে হইবে। কেবল শিল্প, বাণিজ্য, যুদ্ধবিদ্যা, পদার্থবিজ্ঞান ও কল কব্জা সৃষ্টি করিয়া, রক্তস্রোতে জগৎ প্লাবিত করিলে সভ্য হওয়া যায় না—এইটী জগতকে প্রমাণ করিতে হইবে। সকলের মূলে সেই বেদান্তের ত্যাগ, সেবা ও প্রেম, সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার ভিত্তি দৃঢ়রূপে গঠন করা চাই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাবসমূহের আদান প্রদান চাই; কারণ ইহারই উপর প্রত্যেক জাতির আদর্শের বীজ রোপিত হয়।

যদিও এই কার্য্যের দায়িত্ব অনেক বেশী, তথাপি হে প্রাচ্য! হে পাশ্চাত্য! তোমরা, পশ্চাৎ পদ হইও না, সম্মুখে অসীম সমুদ্র দেখিয়া, নিরাশ বা বিচলিত হইও না। পথ অতি দুর্গম তথাপি মনে রাখিও যে

তোমরা যাহা কিছু মহান—যাহা কিছু সত্য শাশ্বত তাহারই জন্য অগ্রসর হইতেছ। তোমাদের এই কর্ত্তব্য যাহার মধ্যে বিশ্বের মঙ্গল লুক্কায়িত রহিয়াছে, যাহার মধ্যে সকল জাতির মুক্তি বিরাজ করিতেছে। মনে করিও না যে তোমাদের এই দায়িত্ব অতি সহজ এবং অতি শীঘ্র সাধিত হইবে। এই যে সুবিশাল মহীরুহ সুদূর গগনের ক্রোড়ে অসংখ্য শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া অগণিত বিহগকুলের আশ্রয় ও বহু শ্রান্ত পথিকের আরামের স্থল হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহাকেও একদিন ক্ষুদ্র বীজাকারে ধরণীর বক্ষে লুক্কায়িত থাকিতে হইয়াছিল, কত ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিয়া ধীরে ধীরে কতকাল ধরিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইতে হইয়াছে। সেইরূপ বেদান্তের সত্যসমূহ ধীরে ধীরে আপন প্রভাব বিস্তার করতঃ জগতের ভাব ও কার্য্যের শাসন ও নীতির একটা আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত করিয়া থাকে। প্রত্যেক জাতির প্রত্যেক ধর্ম্মের এবং প্রত্যেক সমাজের যথাযথ পূর্ণতা লাভ করিতে হইলে সকলকেই সেই বেদান্তের ত্যাগ, সেবা ও প্রেমের প্রেরণাদ্বারা সেই উদার অদ্বৈত তত্ত্ব অবশ্য গ্রহণ করিতে হইবে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। ব্যক্তিগত বা জাতিগত জীবনের প্রত্যেক কার্য্যটীকে বেদান্তের এই অপূর্ব্ব ভাবের আলোকে ধীরে ধীরে আলোকিত করিয়া তুলিতে হইবে। "নান্যঃপন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" ইহা ব্যতীত বিশ্বের কল্যাণের দ্বিতীয় পথ নাই।

আজিকার দিনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশের মধ্যে বর্ত্তমানে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর সমস্যা এখন ভারতের। গত ইউরোপীয় যুদ্ধ ভারতের অন্তরে এমন একটা আঘাত দিয়া গিয়াছে যে তাহার প্রাণবায়ু এখন কণ্ঠাগত প্রায়। তাই ভারত আজ অর্থসমস্যা, বস্ত্রসমস্যা খাদ্যসমস্যা এবং শিক্ষাসমস্যা আর সেই শাসন বা Home rule সমস্যার আবর্ত্তে পড়িয়া কেবল ঘুরপাক খাইতেছে। আজ ভারত এইরূপ হীনবীর্য্য হইয়া গভীর সমস্যার মধ্যে পড়িয়াছে, কারণ ভারত তাহার নিজ বিশেষত্বটুকু হারাইতে বসিয়াছে, কারণ ভারতের প্রাণ যে ধর্ম্ম বা আধ্যাত্মিকতা, সেইটাকে ছাড়িয়া রাজনীতি ও জড়বিজ্ঞানের আদর্শে জাতি গঠন করিতে প্রয়াস

পড়িয়াছে, কারণ ভারত দীন হীনভাব, অনুকরণ, বিলাস ও স্বার্থপরতাকে আপনার বলিয়া আলিঙ্গন করিতে শিখিয়াছে, কারণ দুঃখকে বরণ করিয়া তাহার মধ্য দিয়া পুরুষকার বলে অদৃষ্টকে গড়িয়া তোলা যেটা ভারতের চির অস্থিমজ্জাগতভাব সেইটাকে ভারত দূরে নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। কারণ ভারত সভ্যতার সিংহাসনে Co-operationএর স্থানে Competitionকে বসাইতে শিখিয়াছে। ইউরোপীয় সভ্যতার স্রোতে ভারত Struggle for existence এবং Survival of the fittest এর mottoকে জাতীয়তার আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে। কারণ, মানবের যে সবচেয়ে বড় অধিকার "মানুষ সৃষ্টি করা" এই আদর্শ ছাড়িয়া ভারত আজিকার দিনে কলকব্জা সৃষ্টি করিয়া জাতীয় গৌরব ও সফলতা আনিতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু হে ভারতের রাজনৈতিকগণ! হে সমাজের নেতৃগণ! হে দেশহিতকারিগণ! হে বক্তাগণ! তোমরা কি তোমাদের দায়িত্ব প্রকৃতরূপে বুঝিয়াছ? দেশের ও দশের মঙ্গলের জন্য আজিকার দিনে এই সমস্যা সমাধান করিতে তোমরা কি বদ্ধপরিকর হইয়াছ? যদি বুঝিয়া থাক, যদি হইয়া থাক, তবে তোমরা কি জান না যে এই ভারত চিরকাল ধর্ম্মপ্রাণ; যে ভারতের অস্থিমজ্জা তাহার সেই প্রাচীন গৌরব আধ্যাত্মিকতা, যাহা জগতের সভ্যতা ভাণ্ডারে দিবার জন্য ভারত আজিও দীনহীনভাবে বাঁচিয়া রহিয়াছে? তোমরা কি জাননা যে এই ভীষণ সমস্যার দিনে ভারত রাজনীতি ও সমাজনীতি বা জড়বিজ্ঞানের আদর্শে বড় হইতে পারিবে না। ভারতকে বর্ত্তমান সমস্যার সমাধান করিতে হইলে এখন তাহার সেই বিশেষত্বটুকু হারাইলে চলিবে না। ভারতকে যদি উঠিতে হয় তাহা কেবল ধর্ম্ম বা আধ্যাত্মিকতার মধ্য দিয়া, একমাত্র ধর্ম্মের মধ্য দিয়া রাজনীতি ও সমাজনীতির সামঞ্জস্য করিয়া, দেশকাল ও পাত্রোপযোগী করিয়া সকল কার্য্য সাধন করিতে হইবে, তাহা কি তোমরা ভুলিয়া গিয়াছ। এই ইউরোপীয় যুদ্ধ কি তোমাদের মুদ্রিত চক্ষু উন্মিলিত করিয়া দেয় নাই। মানুষের যেটা সবচেয়ে বড় শক্তি—শ্রেয়ঃকে গ্রহণ করিবার —তাহা ছাড়িয়া প্রেয়কে গ্রহন করিলে বিশ্বের বক্ষ যে সংহার ও

রক্তের বন্যায় ভাসিয়া যায় তাহা কি তোমরা আজিকার দিনে লক্ষ্য কর নাই? যদি করিয়া থাক তবে ভারতের পক্ষে যেটা সত্য, যেটা নিজস্ব তাহা ছাড়িয়া দিয়া, নিজেকে সামান্য গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া বড় হইবার দাবী করিতে যাইতেছ কোন সাহসে? তোমরা যে আজ ইউরোপের সভ্যতাকে অনুকরণ করিতে যাইতেছ নিজের বিশেষত্ব হারাইয়া সেটাকি বুঝিতে পারিতেছ না। মনে রাখিও যে এই ভারতবর্ষ—ভারতবর্ষ কেন, এই এশিয়া এক সময়ে বড় হইয়াছিল কলকজা সৃষ্টি করিয়া নয়—মানুষ সৃষ্টি করিয়া। মানুষের উপর সব চেয়ে বড় দায়িত্ব এই "মানুষ" সৃষ্টি করা আর এইটাই হইতেছে মানুষের সবচেয়ে বড় অধিকার; এই অধিকার এশিয়া চির দিন পাইয় আসিয়াছে এর যতটা দাবী এশিয়া তাহা করিয়াছে এবং এই বড় কর্ত্তব্য করিয়া পৃথিবীর সবচেয়ে সত্য যে আদর্শ সেইটাকে বরণ করিয়া আপনার করে লইয়াছে। রাজনীতি দিয়া একটা জাতি ধ্বংস করিতে পারা যায়, গঠন করিতে পারা যায় না; কল কজা করিয়া মানুষকে মারা যায় কিন্তু মানুষ সৃষ্টি করা যায় না। আজিকার দিনে "মানুষ সৃষ্টি করিতে হইবে" এই আদর্শ লইয়া ভারতের এই সুপ্তপ্রায় জাতীটাকে জাগাইয়া তুলা ভারতের পক্ষে সব চেয়ে বড় কাজ, ভারতকে এই আদর্শ লইয়া কাজ করিতে হইলে, ভিতরের সেই সত্যকে আরো ভাল করিয়া ধরিয়া রাখিতে হইবে, কারণ এই কাজে ভারতকে অন্তর ও বাহির হইতে অনেক বিপদ ও অত্যাচার, অনেক দুঃখ ও অপমান সহ্য করিতে হইবে; আর এই পদে পদে বাধা পাওয়াই সবচেয়ে বড় পাওয়া; কারণ বুঝিতে হইবে যে, যে যত বাধা পাইয়াছে সে সত্যটাকে ভাল করিয়া ধরিয়া রাখিতে পারিয়াছে—এই বাধাবিপত্তি ও ঘাতপ্রতিঘাতের সহিত যে যত যুদ্ধ করিয়াছে সে তত সত্যের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। বর্ত্তমানে এই ভীষণ সমস্যার দিনে ভারতকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে, এই দুঃখ ও বিপদকে বরণ করিয়া লইতে হইবে, তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইবে, ভিতরের সেই সত্যকে মস্তকের উপর রাখিয়া নিজের মনুষ্যত্বের বিকাশ করিতে হইবে, আর সঙ্গে সঙ্গে

হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহাকে বিস্তারিত করিয়া অপরকে "মানুষ" করিতে হইবে।

আজিকার দিনে একথা সত্য যে এখন ভারতের যেরূপ অর্থ ও খাদ্য সমস্যা, তাহাতে শিল্প বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্যের উন্নতির প্রয়োজন কিন্তু এই সকলের পশ্চাতে এই ভীষণ প্রতিযোগীতার দিনে co-opration বা সমবেত প্রযত্নের আরও বিশেষ প্রয়োজন। আমরা কলকব্জা করিব, নানাপ্রকার শিল্পি বস্তুর জন্য কারখানা খুলিব, Laboratory করিয়া বৈজ্ঞানিক সত্যের আবিষ্কার করিব, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ করিব সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পরস্পরের প্রতি ঘৃণিত ব্যবহার, দাসসুলভ ঈর্ষা দ্বেষ শঠতা তাহার পূর্ব্বে পরিত্যাগ করিব, সহানুভূতি সেবা ও ত্যাগের দ্বারা সকলকে আপন করিতে চেষ্টা করিব, আত্মশক্তির বিকাশ করিয়া সকলের মধ্যে একটা প্রবল বিশ্বাস ও ধর্ম্মপ্রেরণা জাগাইয়া তুলিব। তাহার পর উচ্চনীচ ভেদ ছাড়িয়া জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে একতা বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া, প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া যৌথ কারবার গঠন করিলে আমাদের বর্ত্তমান অর্থ ও খাদ্য সমস্যা অনেকটা সমাধান হইয়া যায়। তাই বলিতেছি আজিকার দিনে এই সমস্যার সমাধান করিতে হইলে, দেশের ও দশের উন্নতি করিতে হইলে ভারতের পক্ষে এখন বড় বড় স্বার্থ ত্যাগের প্রয়োজন। দুইটী বিরুদ্ধভাব একস্থানে থাকিতে পারে না,—"যাঁহা কাম তাঁহা নেহি রাম" স্বার্থত্যাগ ব্যতীত ত্যাগ প্রলাপোক্তিমাত্র।

আমরা মুখে সকলেই ধর্ম্ম ধর্ম্ম করি, কীর্ত্তনাদি শুনিলে ভাবে গদ্ গদ্ হইয়া যাই—মন্দিরে ঢুকিলে চণ্ডীপাঠ ও ঘণ্টানাড়ার মহাশব্দ পড়িয়া যায় কিন্তু জাতির বা দেশের সর্ব্বনাশ করিতে এতটুকু কুণ্ঠিত হই না। আজ যে ভাইএ ভাইএ মিল নাই, ব্রাহ্মণ শূদ্রে মিল নাই, জমিদারে প্রজায় মিল নাই—কেন? স্বার্থ; এত স্বার্থ যেখানে সেখানে দৈন্য কি করিয়া ঘুচিবে? শুধু গলাবাজী করিয়া রাষ্ট্রীয় অধিকার ভিক্ষা করিয়া কি ফল হইবে? শুধু বাহিরের Reformএ কি হইবে, ভিতরের Reformই আসল। ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থ মহান জাতীয় কল্যাণের

সম্মুখে বলি দিতে হইবে, নতুবা আভিজাত্যের বড়াই করিয়া শিক্ষার বড়াই করিয়া দেশের প্রাণতুল্য কোটী কোটী লোককে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া তাহাদিগকে শিক্ষাহীন, দীক্ষাহীন, অন্নহীন, বস্ত্রহীন দাসমাত্রে পরিণত করিয়া তাহাদের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের ফল, কয়েকটী তাম্র বা রজতখণ্ডের বিনিময়ে নিজেরাই ভোগ করিতে থাকিলে এবং স্বাধীনতা, স্বায়ত্বশাসন Home rule, Home rule বলিয়া আকাশ বিদীর্ণ করিলে স্বার্থপরেরণসে চীৎকারে কেহই কর্ণপাত করিবে না।

চাই প্রথমে কর্ম্মশীলতার জন্য উদ্যম, সাহস, অধ্যবসায়, অগাধ ধৈর্য্য আর চাই শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী সত্ত্ব ও রজোগুণ, চাই অকপট সহানুভূতি সম্পন্ন হৃদয়—চাই প্রাণপণ সমবেত চেষ্টা,—চাই বিমুখ ভাগ্যের অসীম ধিক্কার প্রবল অবহেলাভরে উপেক্ষা করিয়া পুরুষকার বলে আমাদের জাতীর আদর্শকে গড়িয়া লওয়া। ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা অনেকটা সমাধান হইবে যদি আমরা চেষ্টা করি—পুনঃ পুনঃ অন্তরে বাহিরে বাধা পাইয়াও বিফলতার মুখব্যাদন দেখিয়াও ভীত হইব না, উদ্যম প্রকাশে ক্ষুব্ধ বা লজ্জিত হইব না—যাহারা হেয় নগণ্য, যাহারা দরিদ্র প্রপীড়িত তাহাদিগকে মানুষের যাহা বড় অধিকার তাহা হইতে বঞ্চিত করিব না—আমাদের জীবনকে আমরা কেবল বক্তৃতা পুস্তক বা প্রবন্ধে আবদ্ধ রাখিব না, সত্যদ্বারা জীবনকে বিস্তার করিব; ত্যাগের দ্বারা জীবনকে ঠিকভাবে গ্রহণ করিব; কারণ এই গ্রহণ ও বিস্তারের উপরেই আমাদের জাতীয় জীবনের ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে—জাতীর কল্যাণের জন্য "আত্মবিসর্জ্জন" ইহাই যুগধর্ম্ম। তাই যুগধর্ম্মের বীণা ঝঙ্কৃত হইয়া আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে—

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্নিবোধত"

"জাগো বীর ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন ভয় কি তোমার সাজে
দুঃখভার এ ভব ঈশ্বর, মন্দির তাঁহার প্রেতভূমি চিতা মাঝে
পূজা তাঁর, সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয় তাহা না ডরাক্ তোমা
চূর্ণ হোক্ স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা"

কোন পথ ?

(শ্রীঅম্বিকাচরণ দত্ত)

কোন্ পথ ? এই প্রশ্ন উদয় হইলে স্বভাবতঃ মনে হয় প্রশ্নকর্ত্তা এমন একটা ভয়াবহ নির্জ্জন, অসহায় এবং বিপন্ন অবস্থায় পতিত হইয়াছেন যেস্থান সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। অকূল জলধি-বক্ষে দিঙ্‌নির্ণয়যন্ত্র-বিহীন তরণীর ন্যায় যেখানে পথপ্রদর্শক কেহ নাই, অথচ দিগন্তব্যাপী অনন্ত পথ চারিদিকে আপন মনে ছুটিয়া চলিয়াছে ; পথিক সেখানে আত্মহারা। কে তাহাকে পথ দেখাইবে ? যদি কেহ সহৃদয় মহাপুরুষ সেখানে হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হন, তিনি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিবেন "পথিক ? তুমি কি পথ হারাইয়াছ ? তোমার গন্তব্যস্থান কোথায় ?" যদি গন্তব্যস্থান জানা থাকে তাহা হইলে সেই মহাপুরুষ তাহাকে পথের অভ্রান্ত নিদর্শন দেখাইয়া দিবেন। কিন্তু যদি গন্তব্যস্থান সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে, তবে কে তাহাকে পথ দেখাইবে ? সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবানের করুণাকরসম্পাত ভিন্ন তাহার আর গত্যন্তর নাই।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের অবস্থা ঠিক এইরূপ। অনন্তবিস্তৃত এই সংসারভূমে আমরা মরুমরীচিকাভ্রান্ত অজ্ঞান মৃগযূথের ন্যায় ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছি। কিন্তু কোথায় যাইব তাহার স্থিরতা নাই। লক্ষ্যের অন্বেষণে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এবং ততোধিক নিশ্চেষ্ট। প্রবল বায়ুতাড়িত বৃক্ষপত্রের ন্যায় মানব অনন্ত কালস্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। কোথায় যাইতেছে তাহার ঠিকানা নাই। সুতরাং, প্রতি পদবিক্ষেপে পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

কোন্‌টী প্রকৃষ্ট পথ, এই প্রশ্ন জগতে অনেকবার উত্থিত হইয়াছে। ধর্ম্ম-বিপ্লব, রাজ্য-বিপ্লব, সমাজ-বিপ্লব, যখনই মানব মনকে একান্ত বিচলিত এবং পর্য্যুদস্ত করিয়াছে, অধর্ম্মের ভীষণ ঝঞ্ঝাবাতে যখনই

সংসারমহীরুহ ভূতলশায়ী হইয়া পড়িয়াছে, তখনই এই প্রশ্ন তদবস্থিত মানব সমাজকে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছে। আর্য্যঋষি অনেক লক্ষ্য-ভ্রষ্টকে লক্ষ্যের অনুসন্ধান বলিয়া দিয়াছেন, অনেক পথ-ভ্রান্তকে পথের পরিচয় করিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের শ্রীমুখ নিঃসৃত মধুর মন্ত্রধ্বনি এখনও মধ্যে মধ্যে আর্য্যহৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন—

"বেদাহমেকং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃপন্থা বিদ্যতে অয়নায়॥

অজ্ঞান অন্ধকারের পরপারে কোটিসূর্য্যসমুজ্জ্বল যে অদ্বিতীয় মহাপুরুষ সর্ব্বদা বিরাজমান রহিয়াছেন, তাঁহাকে উপলব্ধি করা ভিন্ন মানবের আর অন্য পথ নাই।

যতদিন আর্য্যসভ্যতার সৌভাগ্যসূর্য্য ভারতের মধ্যাহ্ন গগনে তাহার শ্বেতরশ্মি বিকীরণ করিতেছিলেন, তখন এই মহামন্ত্রই ভারতবাসীর একমাত্র পথপ্রদর্শক ছিল। দ্বাপর যুগের শেষভাগে যখন এই সৌভাগ্য-সূর্য্য ক্রমশঃ পশ্চিম গগনে বিলীন হইতেছিলেন তখন পুনরায় এই প্রশ্ন উত্থিত হয়। এবং মহারাজা যুধিষ্ঠির মহাভারতে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন, :—

"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ"

অর্থাৎ ধর্ম্মতত্ত্ব ক্রমশঃ মানব বুদ্ধির অগম্য হইয়া আসিতেছে। বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহ আর এক মতাবলম্বী বলিয়া বিবেচিত হইতেছেন। সুতরাং এ অবস্থায় মহাপুরুষগণ যে পথে গিয়াছেন সেই পথই প্রকৃষ্ট পথ।

এই কলিকালেও অনেক যুগ প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এবং তাঁহাদের বিশুদ্ধ চরিত্রের পূত মন্দাকিনী ধারায় লক্ষ লক্ষ নরনারীর শূন্য হৃদয়ে জীবনী শক্তির সঞ্চার করিয়াছে। রাজা, প্রজা, ধনী, নির্ধন, পাপী, তাপী সকলে সমস্বরে তাঁহাদের জয়গান ঘোষণা করিয়াছে এবং তাঁহাদের উপদেশাবলী যথাসাধ্য অনুবর্ত্তনের চেষ্টাও করিয়াছে।

তদানীন্তন মানবমন ধর্ম্মপথকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়াছে। সুখে, দুঃখে, সম্পদে বিপদে তাহারা মুহ্যমান হয় নাই। মানবতার পূর্ণ বিকাশই ভারতের চিরন্তনী সাধনা। জীবন যায় যাউক, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য ধূলায় বিলুণ্ঠিত হয় হউক, কিন্তু সত্য ও ন্যায়ের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে এই সাধনাই মানব জীবনের চরম লক্ষ্য।

ব্যষ্টি মানবের বিকাশ মুখ্য এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে সমাজ, জাতি এবং ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন তৎকালে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল। এই উদ্দেশ্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া, তদানীন্তন মানব জীবন গঠিত হইয়া উঠিতেছিল।

"ব্রহ্মনিষ্ঠোগৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ"

প্রত্যেক গৃহস্থকেই ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং তত্ত্বজ্ঞান পরায়ণ হইতে হইবে। এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ না হওয়া পর্য্যন্ত গৃহস্থ হওয়ার অধিকার ছিল না। যতদিন তত্ত্বজ্ঞান না হয় ততদিন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে, গুরুর উপদেশে চরিত্রগঠন শিক্ষালাভ ও শক্তি সঞ্চায় করিতে হইত। এই শিক্ষাই আর্য্যসভ্যতার প্রথম এবং শেষ সাধনা। এই সাধনার জ্যোতি এখন ম্লান হইয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবল বন্যায়, প্রাচ্য শিক্ষাদীক্ষা সমস্ত ভাসিয়া গিয়াছে। ইহার প্রবল তরঙ্গ ইয়ুরোপ প্রভৃতিদেশ প্লাবিত করিয়া ভারতাভিমুখে ছুটিয়াছে। এবং ভারত অসার জড়পিণ্ডের ন্যায় সেই সম্মোহিনী শক্তির অঙ্কলক্ষ্মী হইয়া পড়িয়াছে। দেশময় একটা নব্য জাতীয়তার ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে। জগৎ চায় এখন জাতিগঠন এবং জাতির কল্যাণ। তাহাতে ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিতে হয় হউক, শতবার জাল এবং প্রবঞ্চনা করিতে হয় হউক, সহস্র সহস্র নরনারীর হৃদয় শোণিতে হস্ত রঞ্জিত করিতে হয় হউক, লক্ষ লক্ষ নরনারী অনশনে, অর্দ্ধাশনে মৃতপ্রায় হয় হউক, মানবের কাতর কণ্ঠের করুণ প্রার্থনা যেন কোনও ক্রমে জাতির মঙ্গল হোমানল নির্ব্বাপিত করিতে সমর্থ না হয়।

এই নব্য জাতীয়তা! জাতির স্বার্থ, জাতির কল্যাণ এবং জাতির উন্নতি ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উন্নতির অর্থ কি এবং তাহার লক্ষ্য জানি না। আপাত দৃষ্টিতে অর্থ এবং অক্ষুণ্ণ ভোগ বিলাস, এই জাতীয়তার

চরম উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। মানবতার পূর্ণবিকাশ ইহার লক্ষ্য নহে। ন্যায় ও ধর্ম্ম এখানে স্থান পায় না। ধর্ম্মনীতির সূক্ষ্মতত্ব অনন্তকালের জন্য জলধিগর্ভে নিমজ্জিত। ইহ-সর্ব্বস্ববাদের গগনভেদী চীৎকারে দিঙ্মণ্ডল পরিব্যাপ্ত, নিজ নিজ ভোগ বিলাস বৃদ্ধির জন্য সমস্ত জাতির শক্তি নিয়োজিত। এই ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতাক্ষেত্রে জগতে যে মহাশ্মশান রচিত হইতেছে কবিবর মাইকেলের বর্ণনায় তাহার অতি সুন্দর এবং সুস্পষ্ট প্রতিকৃতি পরিলক্ষিত হয়—

"শিবাকুল, গৃধিনী, শকুনি
কুক্কুর পিশাচদল ফেরে কোলাহলে,
কেহ উড়ে, কেহ বসে, কেহ বা বিবাদে,
পাকশাট মারি কেহ খেদাইছে দূরে
সমলোভী জীবে; কেহ গরজি উল্লাসে
নাশে ক্ষুধা অগ্নি; কেহ শোষে রক্তস্রোত॥"

সমলোভী জীবের এই দারুণ হিংসানলে জগৎ ছারখার হইবার উপক্রম হইয়াছে। ইহার অতৃপ্ত বিলাস-লালসায় আহুতি দিবার জন্য কোটি কোটি নরনারী তাহাদের হৃদয়-শোণিত উপঢৌকন লইয়া দণ্ডায়মান। একজাতির রক্ত শোষণ ভিন্ন যখন অন্য জাতির এই পিপাসানল নির্ব্বাপিত হয় না, তখন জগৎ নিঃক্ষত্রিয় না হওয়া পর্য্যন্ত শান্তির আশা সুদূর-পরাহত।

বর্ত্তমান ভারত দুই সভ্যতার সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান। পূর্ব্বে প্রাচ্য সভ্যতার স্নিগ্ধ মধুর শিত রশ্মি—পশ্চিমে বিশ্ববিপ্লাবিনী পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রখর জ্বালাময়ী রৌদ্রপ্রভা। একদিকে সত্ব ও রজোগুণের মধুর সংমিশ্রণ—অন্যদিকে অসংযত রজঃশক্তির উদ্দাম তাণ্ডবনৃত্যে দিঙ্মণ্ডল উৎসাদিত। এদিকে ব্রহ্মনিষ্ঠা, কর্ম্মার্পণ, ত্যাগ ও ভোগের সুন্দর সমন্বয় —অন্যদিকে ইহসর্ব্বস্ব আত্ম-প্রতিষ্ঠা এবং কাম লালসার অনন্ত প্রজ্বলিত হুতাশন।

একদিকে "ক্ষতাৎ কিল ত্রায়ত ইত্যুদগ্রঃ
ক্ষত্রস্য শব্দো ভুবনেষু রূঢ়ঃ

"আর্ত্তত্রাণায় বঃ শস্ত্রং
মা প্রহর্ত্তুমনাগসি।"

আর্ত্তত্রাণই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, অন্যদিকে পরপীড়ণ, পরস্বলুণ্ঠন ক্ষত্র শক্তির প্রধান উপলক্ষ? একদিকে বিজ্ঞানের জয় জয় রবে শিবহীন দক্ষযজ্ঞের মুহুর্মুহুঃ মন্ত্রোচ্চারণ, অন্যদিকে—

"সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ," "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদি মহামন্ত্রের চির প্রবাহিতা মন্দাকিণীর শান্তি পীযুষ ধারা। একদিকের সেবকগণ জগতের সমস্ত বস্তুকে তাহাদিগের স্ব স্ব ভোগের নিমিত্ত নিয়োজিত করিতে কৃতসঙ্কল্প, অন্যদিকের সাধক সম্প্রদায় এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে বিশ্বরাজরাজেশ্বরীর মন্দিররূপে গ্রহণ করিয়া এবং যাবতীয় ভোগ্য বস্তু তাঁহারই শ্রীপাদপদ্মে উপহার দিয়া আপনারা প্রসাদমাত্র উপভোগ করিয়াছিলেন।

পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন ভাবাবলম্বী পথদ্বয়ের মধ্যে, পথিক! এইবার তোমার গন্তব্য পথ নির্ণয় কর। কোন্‌টি তোমার লক্ষ্য? তুমি কি চাও? তুমি অথবা তোমার সমাজের বা তোমার জাতির ভোগবিলাসের জন্য জগতের অনন্ত কোটী নরনারী দারুণ মর্ম্মবেদনায় ছট্‌ফট্‌ করুক? আর তুমি তোমার স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত অনবহিত চিত্তে, নিস্পন্দ নয়নে, তাহাদের অবস্থার প্রতি ভ্রূক্ষেপ কর? তুমি কি মনে কর ইহকালের ভোগবাসনা চরিতার্থ করাই জীবনের চরম উদ্দেশ্য? কিন্তু এ বাসনার নিবৃত্তি কোথায়? কোথায় তোমার সুখ? কোথায় শান্তি? বাসনার দাবানল অনন্ত কাল জ্বলিবে ও তোমাকে ভস্মীভূত করিবে। প্রতিদিন নূতন নূতন অভাবের সৃষ্টি করিবে। যতদিন তোমার শক্তি আছে ততদিন অপরের হৃদয়-রক্তে তোমার পিপাসা নির্ব্বাপিত হইতে পারে। কিন্তু যখন অপরের নিদ্রিত শক্তি জাগরিত হইবে, যখন তাহার প্রভুত্বের নিকট তোমার মস্তক অবনত হইবে, তখন তোমার শুষ্ক কণ্ঠের অনন্ত পিপাসা কে নির্ব্বাপিত করিবে? তখন পটপরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। তুমি যে তোমার কল্পিত কল্যাণের জন্য অগ্রসর হইয়াছিলে তাহার সফলতা কোথায় থাকিল?

প্রবলের ভোগের জন্য দুর্ব্বলের হিংসা পশুজাতির ধর্ম্ম। তুমি কি ইচ্ছা কর মানবও চিরকাল এই পাশব ধর্ম্ম অবলম্বনে জীবন যাপন করুক অথবা মানব একটা বৃহত্তর 'পশু' বলিয়া পরিগণিত হউক? পশুর মধ্যে একজাতি চিরকালই অপরের খাদ্য। ছাগ, মেষ, মহিষ চিরকালই ব্যাঘ্রের খাদ্য। ক্ষুদ্র মৎস্য চিরকালই বৃহত্তর মৎস্যের খাদ্য। কিন্তু ব্যাঘ্র যতই হীনবল হউক না কেন সে কখনও ছাগের খাদ্য হয় না। ক্ষুদ্র মৎস্য জাতি যতই বলবান হউক, তাহারা বৃহৎ মৎস্যকে আক্রমণ করে না। পশুজগতে এই জাতীয় বিশেষত্ব অনাদিকাল পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে। কেহ তাহার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করে নাই। কিন্তু মনুষ্য সমাজে প্রতিনিয়ত এই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে। কাল যে জাতি অপরের রক্তে মানবতার তর্পণ করিয়াছিল, পরধন লুণ্ঠন করিয়া গগনস্পর্শী অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিল, আজ তাহার রক্তে অন্যের তৃপ্তি সাধিত হইতেছে। তাহার ভগ্ন অট্টালিকার উপর নূতন সৌধাবলী এবং বিজেতার বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীয়মান হইতেছে। তদানীন্তন পীড়িত ও মুমূর্ষু জাতি আজ সগর্ব্বে, উন্নতমস্তকে জগৎকে উপহাস করিতেছে। প্রবল শক্তির নিকট দুর্ব্বলের পরাজয় প্রাকৃতিক নিয়ম। কিন্তু প্রবল কি শুধু দুর্ব্বলের হিংসার জন্যই তাহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিবে? দুর্ব্বলের রক্ষা কি সে শক্তির ধর্ম্ম হইতে পারে না? যতদিন পরপীড়ন এবং তজ্জনিত ভোগ সম্পদ মানবের লক্ষ্য ততদিন তাহার কল্যাণ সুদূরপরাহত।

যেখানে ত্যাগ ও ভোগে সুন্দর সমন্বয়ে এক পরম রমণীয় শান্তিরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, যেখানে উচ্ছ্বসিত প্রেমের গঙ্গা অশান্ত কল্লোলে অন্তঃসলিলা সত্য সরস্বতীর বক্ষ প্লাবিত করিয়া স্বচ্ছতোয়া, মূর্ত্তিমতী, পবিত্রা যমুনার সহিত মিলিত হইয়াছে, যেখানে অনন্ত কোটী নরনারী যুক্তকরে মিলিত কণ্ঠে একই বিশ্বরাজরাজেশ্বরীর জয়গান ঘোষণা করিতেছে এবং পুলকিত চিত্তে তাঁহারই প্রসাদ উপভোগ করিতেছে, পথিক একবার সেইপথে চল। দেখিবে তোমার ঈপ্সিততম তোমাকে চিরবাঞ্ছিত কল্যাণের জয়মাল্য পরাইবার জন্য সাদরে তোমার আগমন

প্রতীক্ষা করিতেছেন। ইচ্ছা হয় নাকি, একবার রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি সকলের ভিতরে "নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি", এই পবিত্র বীজমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সেই বিশ্ব-বিপ্লাবিনী মহাশক্তির উদ্বোধন করি? ভারত! এই প্রশ্নের সমাধান তোমাকেই করিতে হইবে।

দুঃখের বিষয় নিয়তিচক্রের অমোঘ আবর্ত্তনে ভারত আজ কক্ষচ্যুত গ্রহনক্ষত্রের ন্যায় এক অনির্দ্দিষ্ট অপরিচিত পথে ছুটিয়া চলিয়াছে। ভারতবাসী লক্ষ্যহীন, দিশাহারা, মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সেই গতির অনুসরণ করিতেছে। ভারতের জীর্ণ কঙ্কাল এক কঠোর সংঘাতে নিষ্পেষিত হওয়ায় আর অধিক বিলম্ব নাই। কে তাহাকে রক্ষা করিবে? কে তাহাকে সেই মঙ্গলাস্পদের পথ দেখাইয়া দিবে? কে আছে সহৃদয় সাধক! একবার ভারতবাসীর কর্ণ কুহরে মেঘমন্দ্রে উপনিষদের সেই মহামন্ত্র উচ্চারণ কর—

"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত" উঠ, জাগ এবং চিরকল্যাণময় সেই পরম সত্যকে উপলব্ধি কর। ভারতের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিবে কি না জানি না। ইচ্ছাময়ীর কি ইচ্ছা তিনিই জানেন। কিন্তু একবার কাতরকণ্ঠে বলিতে ইচ্ছা হয় "এস মা বিশ্ব জননী! রাবণের শেষ রথযাত্রার ন্যায়, এ অন্তিম রথযাত্রায় ভারতবাসীর হৃদয়-রথে একবার উন্মাদিনী মা সাজিয়া মাভৈঃ মাভৈঃ রবে আমাদিগকে কোলে করিয়া দাঁড়াও। বরাভয়প্রদায়িণী! তোমার স্মিতশোভন বদন মণ্ডলের মধুর হাস্যে আমাদের হৃদয় মন আলোকিত কর। কোমল করপল্লব স্পর্শে শরীরে নূতন আশা এবং নূতন শক্তির সঞ্চার কর। তোমার সঞ্জীবনী সুধারসে ভারতের চিরসন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তির অমৃত নির্ঝর প্রবাহিত হউক।"

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

কবি, তাঁহার বিষয় ও ভাষা।

(আধুনিক মত)

(শ্রীদেবেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বি. এ)

আলোচ্য বিষয় বুঝাইতে যাইয়া অনেক মহারথী বিস্তর কাগজ ও কালি ব্যয় করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অল্পসংখ্যক লেখকই আধুনিক মতের পোষকতা করিয়াছেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যালোচনা-ক্ষেত্রে এই প্রকার সমলোচনা নূতন না হইলেও, বাংলা সাহিত্যিকগণ নিম্নলিখিত আলোচনার দিকটা সহানুভূতির সহিত দেখাইতে চেষ্টা করেন নাই। কবি রবীন্দ্রনাথ ও জনকয়েক নব্য লেখকের রচনা ব্যতীত অন্যকাহারও রচনা বিশেষ ভাবে এই মতের সহায়ক হইয়াছে কি না তাহাও সন্দেহ। বিশদভাবে এই বিষয়ে আলোচনা করা, বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, যদিও অল্পকথায় প্রধান বক্তব্য বিষয় গুছাইয়া বলা কষ্টসাধ্য। বাগাড়ম্বর না করিয়া একেবারে বক্তব্য বিষয় আরম্ভ করা যাউক।

কবি শব্দের অর্থ কি? কবি কে? তাঁহার শ্রোতা ও পাঠকই বা কে? তাঁহার বিষয় ও ভাষাই বা কি? উত্তর,—তিনি এক জন মানুষ ব্যতীত অন্য কিছুই নহেন;—রক্তমাংস-যুক্ত আমাদের মতই জীব—তাঁহার শ্রোতাও মানুষই বটে;—তাহা হইলেও একটু পার্থক্য রহিয়াছে, সাধারণ মনুষ অপেক্ষা তাঁহার অন্তরের প্রসারতা, আগ্রহ, কোমলতা ও ধারণাশক্তি বেশী, এবং মানবচরিত্র সম্বন্ধে জ্ঞানও তাঁহার কিছু অধিক;—তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল গ্রাহ্য বস্তুতে অধিক আনন্দানুভব করেন এবং যে শক্তির খেলা তাঁহার মনে চলিয়াছে তাহা সম্যকরূপে উপভোগ ও অনুভব করেন। কেবলমাত্র নিজের মনের ভাব লইয়াই তিনি ব্যস্ত নহেন,—এই জগতে তাঁহার নিজের ভাবের অনুকূলে যে ভাববন্যা প্রবাহিত হইতেছে তাহাও উপলব্ধি করেন

এবং তাহাতে আনন্দ অনুভব করেন। সকল সময় এইরূপ অনুকূল ভাবের বিষয় প্রত্যক্ষ না হইলেও নিজের মনে তাহা ফুটাইয়া তোলেন। তাঁহার মনের ও চিন্তাশক্তির আর একটা বিশেষত্ব এই চক্ষুরগোচরে যে সমস্ত ঘটনাবলী ঘটিতেছে সেই গুলির ধারণা করিতে তিনি সাধারণ লোক অপেক্ষা অধিক পটু। এমনকি, বাস্তব ঘটনাতে যে সমস্ত বিষয় সম্যক বর্ত্তমান থাকে না, তাঁহার চিন্তাশক্তি-দ্বারা তিনি তাহা প্রস্ফুটিত করিয়া তোলেন; কিন্তু এই কথাও ঠিক নয় যে এই সমস্ত বিষয় ও তাঁহার চিন্তার মধ্যে পার্থক্য খুব বেশী।

মন ও ধারণাশক্তি তাঁহার এরূপ সুগঠিত, যাহা তিনি ভাবেন, দর্শন ও অনুভব করেন, বিশেষ, যে সকল ভাব তাঁহার নিজের অন্তর হইতে স্বতঃই উৎপন্ন হয় তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে তাঁহার পক্ষে মোটেই কষ্টসাধ্য নয়;—বরং কাল মেঘের গায়ে বিজলী চম্‌কাইলে যেমন তাহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পায়, কবিও তেমন সাধারণ ভাব ও দৃশ্যাবলীর মধ্যে এমন দু চারিটা ভাবের ছটা বসাইয়া দেন, যাহা সাধারণ শক্তির অতীত;—এই স্থানেই কবির বিশেষত্ব। তথাপিও কবির ক্ষোভ থাকিয়া যায়, 'কই অন্তরে যে ভাবগুলি আসে, যে প্রেরণা মনকে উদ্বেলিত করিয়া তোলে, প্রকাশ করিতে যাইয়া তাহার শতাংশের একাংশও ত করা হয় না। যাহা প্রকাশ পায়, তাহাত ঐ সব ভাব ও প্রেরণার ছায়ামাত্র'।

* * *

এখন বিষয়ের কথা বলা যাউক,—

সাধারণ জীবনের ঘটনাবলীতেই একটা আনন্দ ও সৌন্দর্য্য বেশী থাকে না কি? এবং ঐ সাধারণ ঘটনা ও ভাব সাধারণ লোকের ভাষায় প্রকাশ করার মধ্যেই কৃতিত্ব অধিক নয় কি? অবশ্য স্থানে স্থানে এক আধটু রঙ্গের খেলা থাকিবে বই কি। আর ঐ সমস্ত ঘটনাও অবস্থার মধ্যেই ত আমাদের সাধারণ জীবনের তথ্য, ধর্ম্ম ও প্রকৃতিগত নিয়মগুলি সম্যক্ বিদ্যমান রহিয়াছে। সাধারণ গ্রাম্য জীবন ও দৃশ্যে কবিতার সামগ্রী এবং বাহারও বেশী। গ্রাম্য লোকের মনের ভাবগুলি অবাধে

গড়িয়া উঠিবার সুযোগ পায়—তাহাদের মনোভাব ও চিন্তাশক্তি সহরের তথাকথিত সভ্যতার নিগড়ে বদ্ধ ও সঙ্কুচিত হয় না। নানাপ্রকার সভ্যতার সাপেক্ষে তাহাদের আড়ষ্ট হইবার প্রয়োজন নাই—তাহাদের ভাবের ঘরে লুকোচুরি নাই। জোর করিয়া তাহাদের প্রকৃতিকে বাধা দিবার প্রয়োজন নাই।—বাধা প্রাপ্ত হইলেই পঙ্গুত্ব আসে; আর কাহার ক্ষমতা পুনরায় ঐ পঙ্গুত্ব সম্পূর্ণ দূর করে!

প্রকৃতিদত্ত অবস্থার মধ্যেই মানুষের মনের প্রসারতা প্রাপ্ত হয় এবং সঠিক ভাবে ভাবগুল গঠিত হয়; এমন কোনও বাধা নাই তাহার বিঘ্ন ঘটাইবে সহজ ও স্পষ্ট ভাষায় মানুষ ভাবরাশি প্রকাশ করিতে শিক্ষা করে এবং ঐরূপ সহজ ভাষায় ভাবের স্ফুরণও অধিক হয়। সাধারণ গ্রাম্য জীবনে ভাবের প্রসারতা বৃদ্ধি পাইবার কারণ এই, উক্ত অবস্থায় আমরা অধিক সরল জীবন যাপন করি; সুতরাং ঐরূপ জীবন সম্বন্ধে চিন্তা করাও সহজসাধ্য হয়। প্রাকৃতিক অবস্থা ও দৃশ্যের সংস্পর্শে জীবন গঠিত হওয়াতে সাধারণ মানুষ প্রকৃতিকে অধিক ভালবাসিতে শিক্ষা করে, অত্যন্ত সরল প্রাণ হয় এবং নিজেদের মনের ভাব প্রাকৃতিক দৃশ্যের সহিত তুলনা করিয়া দেখাইতে অভ্যস্ত হয়।

* * * *

কবির ভাষা, গ্রাম্যভাষার অনুরূপ হইলেই বা দোষ কোথায়?—অবশ্য ভাষাকে ব্যাকরণগত দোষ ও অন্যান্য শিথিলতা হইতে মুক্ত ও মার্জ্জিত করিতে হইবে। গ্রামের লোক যে ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করে তাহাই হইল আদিম ভাষা—ভাষার মূল উৎপত্তি গ্রামেই। সভ্যতার সাপেক্ষে তাহাদের ভাষাকে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন লোকের রুচিকর করিতে হয় না। তাহাদের ভাষার একটা আঁটবাঁধ আছে। সামাজিক অবস্থার দিক হইতে তাহাদের কথোপকথন কিয়ৎপরিমাণে সীমাবদ্ধ হওয়াতে এবং গর্ব্বের মাত্রা ও আড়ম্বর তাহাদের চরিত্রে কিছু কম থাকাতে, মনের ভাব তাহারা সহজে প্রকাশ করে—ভাবগুলিকে নানাপ্রকারে ফেণাইয়া তুলিতে চাহে না বা চেষ্টাও করে না। সুতরাং

দেখা যাইতেছে তাহাদের প্রকৃতিগত (নিজস্ব) ভাষার অস্তিত্ব দৃঢ়—সাময়িক আদপকায়দা অনুসারে তাহাদের ভাষা পরিবর্ত্তিত হইবার নহে। এই হিসাবে তাঁহারা ঐ কপট, অহঙ্কারী এবং স্বেচ্ছাচারী কবির দল হইতে অনেক বড়। ঐরূপ বিকারগ্রস্ত কবির দল মনে করেন, 'আমরা যতই সাধারণ মানুষ ও পদার্থের সহিত সম্পর্ক কমাইতে পারিব, এবং যথেচ্ছাচারীর মত চঞ্চল-প্রকৃতি-পাঠকের দায়িত্বহীন রুচির রসদ যোগাইতে পারিব, ততই আমাদের কৃতিত্ব অধিক পরিমাণে প্রকাশ পাইবে'। আজ আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি ঐ প্রকৃতির কবির স্থান কত নীচে।

কবির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্রম্।

(কাঙ্গাল)

দেবমুনি-মহেশাদি-সর্ব্বারাধ্যো জগৎপতিঃ।
নমস্তে রামকৃষ্ণায় পর-ব্রহ্ম-স্বরূপিণে॥ (১)
ভব-সিন্ধু ভয়-ত্রাতা ত্রিবর্গ-ফল-দায়কঃ।
নমঃ শ্রীরামকৃষ্ণায় দেহি মে পদ-পঙ্কজম্॥ (২)
ত্বং জলং ত্বং স্থলং বায়ুরিন্দুস্ত্বঞ্চ দিবাকরঃ।
নমস্তে রামকৃষ্ণায় পরব্রহ্ম-স্বরূপিণে॥ (৩)
ত্বমিয়ঞ্চ ধরা ধান্যম্ বৈশ্বানর স্তমেবহি।
নমঃ শ্রীরামকৃষ্ণায় দেহি মে পদ-পঙ্কজম্॥ (৪)
ত্বমেব হি ক্ষুধা তৃষ্ণা ত্বমেবান্নং জলং তয়োঃ।
নমস্তে রামকৃষ্ণায় পর-ব্রহ্ম-স্বরূপিণে॥ (৫)
তারকশ্চাধমানাংবৈ দুর্ব্বলানাঞ্চ পালকঃ।
নমঃ শ্রীরামকৃষ্ণায় দেহি মে পদ-পঙ্কজম্॥ (৬)
পতিতপাবনস্ত্বং হি সুদিন-ভক্ত-বৎসলঃ।
নমস্তে রামকৃষ্ণায় পর-ব্রহ্ম-স্বরূপিণে॥ (৭)
পূজিতেন ত্বয়া ভক্ত্যা মোক্ষশ্চ দীয়তে সদা।
নমঃ শ্রীরামকৃষ্ণায় দেহি মে পদ-পঙ্কজম্॥ (৮)
সুকৃতাং ফল-দাতা হি দুষ্কৃতাঞ্চ বিনাশনঃ।
নমস্তে রামকৃষ্ণায় পর-ব্রহ্ম-স্বরূপিণে॥ (৯)

অতীত ও বর্ত্তমান ভারত।

(শ্রীসুব্রহ্মণ্য।)

অতীতকে ভাবচক্ষে জাগ্রত দেখিয়া কবি প্রাণের আবেগভরে গাহিয়াছেন,—

"যাহাদের কথা ভুলেছে সবাই
তুমি তাহাদের কিছু ভোল নাই,
বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী
স্তম্ভিত হ'য়ে বও!
ভাষা দাও তা'রে, হে মুনি অতীত,
কথা কও, কথা কও!"

কবির সনির্বন্ধ প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছে। বাস্তবিক, ইতিহাস-রূপ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, অতীত আজ জগতের সকল নীরব-কাহিনীকে ভাষাদানে সমর্থ। ইতিবৃত্তের প্রতি পুরাতন পৃষ্ঠের ছত্রে ছত্রে ইতিহাস-ভক্ত অতীতের জ্বলন্ত মূর্ত্তি সন্দর্শনে আপনার হৃদয়মন সার্থকজ্ঞান করিতেছে। অতীতকে মুছিয়া ফেল, উহার সহিত আমাদের কোন কার্য্যকরী সম্বন্ধ নাই, মৃতজনের সকল চিহ্ন, সকল কাহিনী অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ কর, অতীতকে লইয়া আমাদের কোন প্রয়োজন নাই,—আজিকার দিনে এরূপ অবজ্ঞাসূচক বাক্য ইতিহাস-পাঠককে আর বলা চলে না, কারণ অতীতের সহিত আমাদের সম্বন্ধনির্ণয় ও উহার সঠিক মূল্যনির্দ্ধারণ বুধমণ্ডলী বহুদিন স্থির করিয়াছেন,—ঐরূপ উক্তি বক্তার অজ্ঞতার এবং দৃষ্টিহীনতার পরিচয়মাত্র হইয়া তাঁহাকেই হাস্যাস্পদ করিয়া তুলিবে।

অতীতের সহিত আমরা অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্বদ্ধ, অতীতকে ভুলিলে সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও চিহ্ন থাকিবে না,—অতীত যে আমাদের জনক, আমাদের পূর্ব্বপুরুষ, অতীত যে আমরাই! অতীত নিষ্কর্ম্মা নহে—উহা বর্ত্তমানের স্রষ্টা এবং ভবিষ্যৎ জাতীয়জীবনের নিয়ন্তা,

পথপ্রদর্শক, একহিসাবে আমাদের ভাগ্যবিধাতা। আবার, অতীত প্রবলরূপে কার্য্যকরী, সেইজন্যই বোধ হয় তাহার বাহ্যাড়ম্বর নাই, তাহার জাঁকজমক, বিজয়নিনাদ নাই,—সে যেন নীরব কর্ম্মী, তাই নিভৃতে, লোকচক্ষুর অন্তরালে অদৃশ্যেই তাহার সকল কর্ম্মপ্রচেষ্টা। সুতরাং অতীত আমাদিগের তাচ্ছিল্যের বস্তু নহে, উহা আমাদের সম্মানার্হ পরমারাধ্য দেবতা।

ভারতের অতীত-ইতিহাস আমাদিগের 'পিতামহদের' কাহিনী বক্ষে সঞ্চয় করিয়া জাতীয়জীবনের এই নবজাগরণের দিনে আমাদের দ্বারে উপস্থিত। বর্ত্তমানের কর্ম্মকোলাহলের মধ্যে তাহার বাণী কে শুনিবে? আমাদের বর্ত্তমানকে বুঝিতে হইলে অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টাইয়া দেখা ভারত-ভারতী প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্যকর্ম্ম। বর্ত্তমানের সহিত অতীতের তুলনামূলক সমালোচনা ও বিশ্লেষণ করিলেই আমরা ভবিষ্যত পথের ইঙ্গিত এবং ঐ সঙ্গে আমাদের বহু সমস্যার সমাধান পাইব।

ভারতবর্ষের সাধনা, সভ্যতা ও শিক্ষার ইতিহাসালোচনায় প্রবৃত্ত অধুনা অনেক ব্যক্তি পাশ্চাত্য দেশের ইতিহাসের মাপকাটীকে চরমজ্ঞান করিয়া কতকগুলি শোচনীয় প্রমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রত্যেক জাতির জীবনেতিহাস স্থিরচিত্তে আলোচনা করিলে একটী কথা বারম্বার আমাদিগের মনে উঠিবে। প্রতি জাতির জীবন-স্রোত একটী বিশেষ ধারা অবলম্বনে পরিস্ফুট ও স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। জাতীয় চরিত্র সঠিক অবগত হইতে হইলে ঐরূপ জীবন-নাড়ীর সন্ধান লওয়া একান্ত আবশ্যক। ইতিহাস তাই আজ প্রত্যেক জাতির জীবনের মূলধারার অন্বেষণে এত তৎপর হইয়াছে।

তাই সে বলিয়াছে গ্রীসের প্রকৃত জীবনেতিহাস জানিতে হইলে রাষ্ট্র ভুলিয়া তাহার কলা, তাহার শিল্প, তাহার ভাস্কর্য্য, তাহার সাহিত্য ও তাহার সঙ্গীতবিদ্যার আলোচনা আবশ্যক। আবার রোমকজাতির প্রাণস্পন্দন অনুভব করিতে হইলে তাহার সুশৃঙ্খল আইন কানুন, তাহার সুদৃঢ় রাজ্যস্থাপন ও তাহার সুচারু রাষ্ট্রজীবনের প্রতিই লক্ষ্য রাখ। কিন্তু তাই বলিয়া ব্যক্তির জীবনে যেমন একটি বিশেষ ভাব

প্রধানরূপে প্রকট হইলেও তাঁহার প্রকৃতির অন্যান্য দিক দেখা আবশ্যক সেইরূপ জাতীয়জীবনের মূলধারা অন্বেষণের সঙ্গে সঙ্গে যে উহার অন্যান্য আনুষঙ্গিক ভাবগুলি কেমন পরিস্ফুট হইয়াছিল, তাহা আলোচনা করাও সেইরূপ আবশ্যক—ইহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে যেন না হয়।

ভারতবর্ষের রাজন্যবর্গের যুদ্ধবিগ্রহের বিবরণ-সম্বলিত পুঁথি ও লেখমালা পর্য্যাপ্ত পরিমাণ না পাইয়া, ভারতবর্ষের ইতিহাস বলিয়া কিছু নাই, সহসা এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত নহে। ঐ সকলের উদ্ধারকল্পে সকল প্রচেষ্টাই বিশেষভাবে প্রশংসনীয় এবং অত্যন্ত উৎসাহদানযোগ্য। কিন্তু ভারতীয় জীবনেতিহাসের প্রকৃত মর্ম্ম কি? রাষ্ট্র চিরকালই সকল জাতীয়জীবনের একটী দিকমাত্র। ভারতের রাষ্ট্রীয়জীবনের পর্য্যাপ্ত ইতিবৃত্ত ও বিবরণমালার একান্ত অভাব, একথা ধ্রুবসত্য। কিন্তু ধর্ম্মজীবনের খাতবাহিয়াই যে ভারতীয়দের মূল জীবন-ধারা প্রবাহিত হইয়াছিল, একথা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই। কাজেই ভারতের প্রাচীন ও বর্ত্তমান বিভিন্ন ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মানুষ্ঠানগুলির আলোচনা করিলেই আমরা ভারতীয়জীবনের একবিশেষ প্রয়োজনীয় অংশের জ্ঞানলাভে সমর্থ হইব; আর সঙ্গে সঙ্গে চপলতার প্রেরণায় 'ভারতের কোনরূপ ইতিহাস নাই' এরূপ হটকারী উক্তি আর উচ্চারণ করিব না। তবে, আবার বলিয়া রাখি, কেহ যেন না মনে করেন যে ভারতের ভাষা, ভারতের শিল্প, ভারতের ভাস্কর্য্য, ভারতের সঙ্গীতাদি ললিতকলা এবং ঐ সঙ্গে ভারতের প্রাপ্ত রাষ্ট্রীয় তথ্য,—এ সকলের সমভাবে আলোচনা না করিয়া আমরা সমগ্র ভারতেতিহাসের পূর্ণজ্ঞান লাভে সমর্থ হইতে পারি।

তবে, আধ্যাত্মিক ধর্ম্মজীবনই ভারত-ভারতীর পরমপদ বলিয়া গণ্য হইত। তাই দেখিতে পাই, যুগে যুগে রাষ্ট্রীয়পরাধীনতার লৌহনিগড়ে আবদ্ধ হইয়াও ভারতের এই চিরন্তন প্রাণের ধারা চিরপ্রবাহিত। ভারতের শুভ্রশির যোগীঋষিবৃন্দ একদিন বিশ্বকে যে বাণী শুনাইয়াছিলেন তাহাই মনে পড়ে—'নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং।'

মধ্যযুগে যখন ঘোর দুর্দ্দিনে ভারতলক্ষ্মী পাঠানের করতলগতা হইলেন,

রাষ্ট্রহিসাবে ভারতের সেইদিন মৃত্যু ঘটিল বটে, কিন্তু ধর্ম্মের স্বরাজ্যে ভারতবাসীর তখনও পূর্ণ অধিকার, কারণ মানুষের অন্তর-মনের উন্নতি ও বিকাশের পথ রুদ্ধকরা সে প্রবলশক্রুরও চির-অসাধ্য। তাই রাজনৈতিক সকল লাঞ্ছনা, অপমান ও নৈরাশ্যের ভিতরও ধর্ম্মরাজ্যে নূতন বাণী, নূতন প্রেরণা আনয়ন করিয়া ভারতবর্ষ আপনার মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিল। ভারতের সেই রাষ্ট্রীয় মরাগাঙেও আবার ধর্ম্মের নূতন-বাণ ডাকিল—মানবের মুক্তি ও ত্রাণের বাণী লইয়া অবতীর্ণ হইলেন—গুরু নানক, কবীর, রামানন্দ ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। "জগত্তারিণী, জগদ্ধাত্রী, জননী"ভারতবর্ষ আজিও উঁহাদিগের বিমলস্মৃতি আপন বক্ষভূষণ করিয়া রাখিয়াছেন—মাতা তাঁহার স্নেহের সন্তানদিগের কাহাকেও ভুলেন নাই।

ভারতের পরবর্ত্তী যুগের ইতিহাস আলোচনা করিয়া আমরা বারবার ইহারই পুনরাভিনয় দেখিয়া মুগ্ধ হই। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ও মধ্য-ভাগে ভারতভূমে প্রাচ্য-প্রতীচীর পরস্পর সংঘর্ষ ও সংঘাতে রুদ্র আবার একবার, তাঁহার ভীষণ তাণ্ডবলীলা দেখাইলেন। পাশ্চত্য সভ্যতার বাহ্যাড়ম্বর ও আপাতচাকচিক্যে বিহ্বল হইয়া ভারতবাসী মোহের তাড়নে আপনার পূর্ব্বপুরুষদিগের সরল সৌন্দর্য্যময় জীবনের সকলস্মৃতি ভুলিয়া পাশ্চাত্যের হাবভাব, তাহার বেশভূষা, তাহার পানভোজন সকল জিনিষেরই অন্ধ অনুকরণ করিয়া বড়গলায় আপনাদিগকে নূতন সভ্যতালোকে আলোকিত বলিয়া গর্ব্ব করিল, আর বলিল, প্রাচীনেরা বড় কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল। "আমরা সাহেবী ধরণে হাসি,

আমরা ফরাসী ধরণে কাসি
পা ফাঁক করিয়া চুরুট টানিতে
বড়ই ভালবাসি।"

ব্যঙ্গচ্ছলে কবি যেন সেকালের ভারতবাসীর জীবনযাপনপ্রণালীর সুন্দর আলেখ্য ধরিয়াছেন মনে হয়।

কিন্তু আমাদের বলিতে ইচ্ছা হয়—

"দাও ফিরে সে অরণ্য, লহ এ নগর,
লহ তব লৌহ, লোষ্ট্র, কাষ্ঠ ও প্রস্তর।

—দাও সেই সন্ধ্যাস্নান,
সেই গোচারণ, সেই শান্ত-সাম-গান,
নীবার ধান্যের মুষ্টি, বল্কল বসন,
মগ্ন হয়ে আত্মমাঝে নিত্য আলোচন মহাতত্ত্বগুলি।"

দেশকে আত্মস্থ করিবার জন্য শ্রীরামমোহনপ্রমুখ মনীষিবর্গের সকল প্রয়াস বিশেষ শ্লাঘনীয় কিন্তু ইঁহাদেরও প্রচেষ্টা পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকূল বলিয়া তাহাতেও চমক ভাঙ্গিল না।

নানাভাবে বৈশিষ্ঠ্য হারাইয়া "কোথা পথ—কোথা পথ!" বলিয়া সে যুগের দেশবাসী ব্যাকুল হইয়াছিল। তাই দেখিতে পাই, নৈরাশ্যের সেই ঘোর অমানিশায় ভারতের ভাগ্যনিয়ন্তা শ্রীভগবান আবার মুখ তুলিয়া চাহিলেন। স্তিমিত নেত্রে ভারত-ভারতী দেখিল প্রভাতী বালার্কের কিরণরেখা পূর্ব্বগগন আশীর্ব্বাদের সিন্দুররাগে রঞ্জিত করিয়া আবির্ভূত হইতেছে—তাহাদের চোখ যেন ঝলসিয়া গেল! ভারতের নিরাশ প্রাণ ধ্বনিয়া তুলিতে আশার 'অভৈঃ'বাণী কণ্ঠে বহিয়া, ভগবানের দূত, দক্ষিণেশ্বরের দীন-নিরক্ষর-পূজারী-ব্রাহ্মণের বেশে আসিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ভারতবর্ষের সেই পূর্ব্বতন প্রাণের ধারা অক্ষুণ্ণ রহিল। নবযুগে তাঁহার সেই মুক্তিবাণী শ্রীবিবেকানন্দের জলন্ত ভাষায় বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে নগরে নগরে অনুক্ষণ ধ্বনিত হউক। বঙ্গজননীর প্রাণস্বরূপ বাঙ্গলার যুবকমণ্ডলীর মধ্যে সেই অপূর্ব্ব মন্ত্রের বীরসাধক মিলিবে, ইহাই আমাদিগের ধ্রুব বিশ্বাস। "ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায়" পুনরায় নরনারায়ণরূপে এই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আগমন। ভারতবর্ষের অতীত ও বর্ত্তমানের কি অদ্ভুত সামঞ্জস্য ও একীকরণ!

বিবেকানন্দের বীরবাণী আমাদের জীবনে উপলব্ধি করিবার বস্তু—

"হে ভারত, ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; * ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী।* আর দিনরাত বল—"হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে আমায়

মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্ব্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

* * * * *

মহাজনের ভবিষ্যদ্‌বাণী আজ অক্ষরে অক্ষরে সত্য-প্রতীয়মান হইতেছে। বর্ত্তমানের এই ঘোর দুর্দ্দিনেও পদানত ভারতবাসী, ঘৃণিত ভারতবাসী অন্নবস্ত্র-বিহীন কাঙ্গাল ভারতবাসী, সংহতিশক্তিশূন্য মোহগ্রস্ত অভাগা ভারতবাসী ধর্ম্মপথের সন্ধান পাইয়া আপনার পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়াছে। মহামায়া আজ মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। অধঃপতিত আমরা, অকর্ম্মণ্য আমরা, পরশ্রীকাতর আমরা, আমাদের ভিতরও নারায়ণের আবির্ভাব!

ভারত আবার জাগিয়াছে—বর্ম্মাবৃত—অসিহস্ত—নির্ম্মম—পাষণ্ড সৈনিকের বেশে নয়, জিঘাংসার রোষকষায়িত মূর্ত্তিতে নয়—উন্মুক্ত আকাশ-চন্দ্রাতপতলে কটিবস্ত্র মাত্রাবৃত শান্ত-সৌম্যাকৃতি বৈরাগীর গৈরিক পতাকা উড়াইয়া, অহিংসা-শান্তি ও মৈত্রীর সত্যবাণীতে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়া। আত্মার অন্তর্নিহিত আত্মশক্তি আজ তাহার একমাত্র সম্বল, জীবনের শ্রেষ্ঠসম্পত্তি তাহার হস্তস্থিত—ঐ অমূল্য কাষ্ঠকমণ্ডলু—উহার শীতলবারি দিগদিগন্তে বিচ্ছুরিত হইয়া ধরার পাপদগ্ধমক শীতল করুক!

অগ্নি মীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং।
হোতারং রত্ন ধাতমং॥ ঋকবেদ, ১ম, ১সূ, ১ঋ।

"অগ্নি যজ্ঞের পুরোহিত এবং দীপ্তিমান; অগ্নি দেবগণের আহ্বানকারী ঋত্বিক্ এবং প্রভূত রত্নধারী; আমি অগ্নির স্তুতি করি।"

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যংতি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততং॥ ঋকবেদ, ১ম, ২২সূ, ২০ঋ।

"আকাশে সর্ব্বতো বিচারী চক্ষু যেরূপ দৃষ্টি করে, বিদ্বানেরা বিষ্ণুর পরমপদ সেইরূপ সর্ব্বদা দৃষ্টি করেন।"

শ্রীশ্রীভগবান রামকৃষ্ণদেব।

(শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার)

ফাল্গুনের শুক্লা দ্বিতীয়া—শ্রীশ্রীভগবান রামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি। আজ তাঁহার সপ্তাশীতিতম জন্মতিথির আনন্দোৎসব। এই সুপবিত্র দিনটী, আজ আমরা ভক্তিবিনম্র চিত্তে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিব। শান্ত সংযত হইয়া ভাবিয়া দেখিব, এই মহাপ্রাণ মহাপুরুষের পুণ্য জীবনের মহিমাসমুজ্জ্বল দিব্য বিভা, যাহা উনবিংশ শতাব্দীর অন্ধকারময় বাঙ্গালার ভাগ্যাকাশে অকস্মাৎ শুভ্রজ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া, ছত্রভঙ্গ বিপথগামী জাতিকে পথের সন্ধান দিয়াছিল।

বেদ অস্বীকার করিয়া, শ্রীবিগ্রহের অঙ্গে অগ্নিসংযোগ করিয়া, সমাজ-সংহতি ছিন্ন করিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতা-সম্মোহিত বাঙ্গালী আমরা যখন অন্ধ উন্মত্ততায় এক অনিবার্য্য ধ্বংসের মুখে ছুটিয়া চলিতেছিলাম, তখন বাঙ্গালার স্বভাবধর্ম্ম মূর্ত্তিগ্রহণ করিয়া দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটী মূলে এক মহামৌনী তপস্যায় আত্মমগ্ন ছিলেন। সেদিন কে ভাবিতে পারিয়াছিল যে এই দীন দরিদ্র, মূর্খ, পাগল পূজারী পৃথিবীর ধর্ম্মচিন্তায় এক অপূর্ব্ব ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিবে? সাধনা সিদ্ধ হইতে চলিল,—মৃণ্ময়ী, চিন্ময়ী হইয়া সন্তানের হাত ধরিলেন। বিশ্বজননীর অভয়-অঞ্চলের স্নেহস্নিগ্ধ ছায়ায় বসিয়া নির্ভীক সাধক গভীর তন্ময়-ধ্যানে এক সার্ব্বজনীন আদর্শের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। বর্ষের পর বর্ষ চলিয়া যাইতে লাগিল, ভ্রুক্ষেপহীন পরমহংস পরম আদর্শের সন্ধানে ইন্দ্রিয়াতীত ভাব-ভূমিতে বিহার করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ একদিন ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তের স্তব্ধতা কম্পিত করিয়া এক উদাত্ত গম্ভীর ধ্বনি বিহ্বল ভাবানন্দে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল—বেদাহমেতম্। 'ব্রহ্ম-তোয়া' ভাগীরথীবক্ষ পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল; প্রপীড়িতা ধরিত্রীর উল্লাস লক্ষ বিহগের মুখরিত কণ্ঠ আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হইল, ভুবনপাবন দিনদেব দিঙ্মণ্ডল

উদ্ভাসিত করিয়া উদিত হইলেন। দিন গেল—সূর্য্য অস্ত যায়—গ তীরে বসিয়া স্খলিতবসন উদাসীন পাগল করুণকণ্ঠে ডাকিতে লাগিলেন —ওরে তোরা আয় রে, কে কোথায় আছিস্।" এমনি ভাবে দিন যাইতে লাগিল।

যে মহানহৃদয়ের বৈদ্যুতিক আকর্ষণে দক্ষিণেশ্বর তীর্থে পরিণত হইল। দীপশিখাভিমুখে পতঙ্গদলের মত দলে দলে ধর্ম্মপিপাসু নরনারী ছুটিয়া আসিতে লাগিল,—পরমহংস বলিলেন, "যত মত তত পথ"। সকল ধর্ম্মই সত্য, একই গন্তব্যস্থানে পৌঁছিবার ভিন্ন ভিন্ন পন্থা মাত্র। কেহ বিশ্বাস করিল, কেহ করিল না। কেহ ভাবিল মহাজ্ঞানী কেহ ভাবিল বিকৃত মস্তিষ্ক উন্মাদ। কেহ অবজ্ঞাহাস্য ধিক্কার দিল, কেহ চরণতলে মাথা লুটাইয়া ধন্য হইল।

মহাপুরুষ লীলাসাঙ্গ করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার উদার ভাবরাশি গত চল্লিশ বৎসরাধিককাল ধরিয়া বন্যার মত সুবিপুল উচ্ছ্বাসে জগত প্লাবিত করিয়া ছুটিয়াছে—ইহার গতি ও প্রকৃতি বিচার করিবার দিন এখনো আসে নাই। প্রতিক্রিয়ামূলক সমন্বয় যুগের কার্য্য মাত্র আরম্ভ হইয়াছে—পরিসমাপ্তি এখনো বহুদূরে।

এই সমন্বয় যুগ—দরিদ্র-নারায়ণেরযুগ;—শ্রমিকেরযুগ, কৃষিজীবীরযুগ, বৃত্তিজীবীর যুগ, পতিত, উৎপীড়িত উপেক্ষিতের যুগ—এ যুগ, শূদ্রশক্তির উত্থানের যুগ। এ যুগের যুগধর্ম্ম—সেবা। এ যুগের দায়ীত্ব ও কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিবার জন্য যিনি ভারতবর্ষের বিক্ষোভিত জঠর হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের 'চিরপদাশ্রিত, চিরদাস'—স্বামী বিবেকানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ, অঙ্গাঙ্গিভাব সম্বন্ধে একই মহাশক্তির দ্যোতনা মাত্র। এককে বাদ দিয়া আরকে ভাবা যায় না, যিনি সে চেষ্টা করিবেন, তাঁহার ধারণা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। একই মহাদর্শ এই দুইটি আপাতঃ পৃথক জীবনের মধ্য দিয়া দেশ কাল ও পাত্রের ব্যবধানে এক বিচিত্র বৈশিষ্ট্য লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল! যে আদর্শ ভারতের চিরদিন জীবনাদর্শ, যে আদর্শ ভোগলোলুপ স্বার্থান্ধ জড়বাদের মোহ হইতে বিশ্বমানবকে মুক্ত করিবার আদর্শ—যে আদর্শ—ত্যাগ ও সেবা।

এই ত্যাগ ও সেবার ভিত্তির উপর সমন্বয় যুগের সমাজ ও রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিবে। 'ত্যাগ ও সেবার' ভুবন-পাবন মঙ্গলশক্তির মহিমা সমাজের সর্ব্বস্তরে জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলকে উপলব্ধি করিতে হইবে, স্বীকার করিতে, গ্রহণ করিতে হইবে। ব্যক্তির জীবনে এই মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া সমষ্টি শক্তি সহায়ে ইহা রাষ্ট্রে ও সমাজে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। এ কার্য্য এক দিনের নয়, এক জনের নয়। ইহা যে সকলের দায়, ইহা যে চিরদিনের চিরজীবনের কাজ, তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে। এই মহাসত্যটীকে শিক্ষা দিবার জন্য, যুগাদর্শকে স্বীয়জীবনে প্রকটিত করিয়া রামকৃষ্ণ আসিয়াছিলেন। আজ যেন আমরা বুদ্ধির মূঢ়তায় তাঁহাকে কোন বিশেষ জাতির বা বিশেষ সম্প্রদায়ের বা কোন বিশেষ দেশের বলিয়া না বুঝি বা বুঝাইতে চেষ্টা না করি। কোন বিশেষ সাধনা, বিশেষ মত বা বিশেষ তত্ত্বের গণ্ডির মধ্যে তাঁহার জীবন আবদ্ধ ছিল না। তিনি আসিয়াছিলেন স্বীয় বাক্য কর্ম্ম ও জীবন দিয়া এই কথাটুকু বুঝাইতে যে—পৃথিবীতে যাহা কিছু উচ্চ আদর্শ, মহান ভাব, যাহা কিছু কল্যাণপ্রদ, বলপ্রদ, বীর্য্যপ্রদ, যাহা মনুষ্যত্বের উদ্বোধক—তাহা জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলের। পতিত বলিয়া, অধম বলিয়া, অনধিকারী বলিয়া—গায়ের জোরে বা অর্থের জোরে অথবা বংশ-গরিমার দাবীতে, কাহাকেও কেহ সরাইয়া রাখিতে পারিবে না।

সর্ব্বদেশেই মানব সাধারণ ভেদ ও দুর্নীতিমূলক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে; বর্ত্তমানের এই ভয়াবহ স্বার্থদ্বন্দ্বে পৃথিবীর মনুষ্যজাতির অন্তরাত্মা ক্লিষ্ট ও পীড়িত হইয়া উঠিয়াছে। এই শোচনীয় অবস্থার মধ্যে দাঁড়াইয়া, ভীত উৎকণ্ঠিত, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় আমরা, শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের বাণী কেবল ভক্তির সহিত স্মরণ না করিয়া, যদি শক্তির সহিত কর্ম্মজীবনে পরিণত করিবার ব্রত গ্রহণ করিতে পারি, তাহা হইলেই আত্মস্থ হইতে পারিব।

বাঙ্গালী যুবক,—দুঃসাহসে দুঃখ হউক, সেই দুঃখকে বরণ করিয়াও তোমরা এই দুর্য্যোগের নিশিথে, এই ভাববিপ্লবসমূহ ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যে একবার মানবকল্যাণব্রতে গণ্ডির শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া বাহির হইতে পারিবে

কি? যদি না পার, যদি আধুনিকসভ্যতাপ্রপীড়িত মানবের কাতর ক্রন্দনে তোমাদের চিত্ত বিচলিত না হয়, যদি অপমানিত মনুষ্যত্বের মর্ম্ম-যাতনা উপলব্ধি করিবার মত হৃদয় ও মস্তিষ্ক এ দুইএরই তোমাদের অভাব থাকে; তবে বৃথা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের বাণী লইয়া শূণ্যগর্ভ আস্ফালনে অন্তরের নির্লজ্জ দৈন্যের পরিচয় দিও না। উৎসবক্ষেত্রের জনতা বৃদ্ধি করিয়া, কোলাহলকে অধিক মুখর করিয়া—শূন্য মনে, অবসন্ন দেহে ফিরিয়া আসার নাম—শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা নহে। স্মৃতিপূজার এমন হৃদয়হীন অভিনয় আর বাঙ্গালী কতদিন করিবে, কতদিন দেখিবে?

হে পরমগুরু পরমহংস! হে মহাশক্তির অনির্ব্বচনীয় বিকাশ! তুমি একদিন ব্যাষ্টি-মুক্তি কামনায় কাতর শিষ্যকে ধিক্কার দিয়া তাঁহার মুক্তি-পথ রুদ্ধ করিয়াছিলে, সমষ্টি-মুক্তির এক উদ্দাম কল্পনায় তাঁহাকে মাতাইয়া তুলিয়া সংসারের কঠিন কঠোর কর্ম্মক্ষেত্রে পাঠাইয়াছিলে, সেই মহাভৈরবের কণ্ঠ-নিঃসৃত আরাব—'যত্র জীব তত্র শিব', 'কি অস্পৃশ্য? ইহারা নারায়ণ'—এখনো আমাদের উৎসুক কর্ণপটাহে আসিয়া আঘাত করিতেছে। ভরসা ত তাহাই—ক্ষুদ্র হই, দীন হই, দুর্ব্বল হই, দরিদ্র হই—তবুও তুচ্ছ নহি, অনধিকারী নহি। মনুষ্যকে ভালবাসিবার অধিকার হইতে এ যুগে আর কেহ আমাদের বঞ্চিত করিতে পারিবে না। আমরা সে অভয় পাইয়াছি, সে আশ্বাস শুনিয়াছি। তাই জন্মোৎসবের পুণ্যলগ্নে, তোমার অত্যাশ্চর্য্য আবির্ভাবের সম্মুখে অপ্রমত্ত হইয়া গললগ্নী-কৃতবাসে দণ্ডায়মান হইয়াছি—তুমি আমাদের হৃদয়ের জড়ত্ব, বুদ্ধির বিদ্রোহ, চিন্তার দৈন্য দূর করিয়া দাও, এই অন্নহীন, বস্ত্রহীন জাতির অস্তিত্ব ও লজ্জারক্ষা ও নিবারণ কর। তোমার আরব্ধ মহামানবসেবা ব্রতে যদি ব্রতী হইতে না পারি, তবুও যেন তাহার বিঘ্নস্বরূপ না হই, এই আশীর্ব্বাদ কর।

"বন্দে জগদ্বীজমখণ্ডমেকং
বন্দে সুরসেবিত পাদপীঠং
বন্দে ভবেশং ভবরোগবৈদ্যং
তমেব বন্দে ভুবি রামকৃষ্ণ॥"

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

ব্রুকলিন, নিউইয়র্ক ষ্টেশন

২৮শে ডিসেম্বর, ১৮৯৪।

প্রিয় মিসেস বুল,

আমি নিরাপদে নিউইয়র্কে পৌছেছি—তথায় ল্যাণ্ডসবার্গ ডিপোয় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌লে—আমি তখনই ব্রুকলিনের দিকে রওনা হলাম ও সময়ে তথায় পৌছিলাম।

সন্ধ্যাকালটা পরমানন্দে কেটে গেল—নীতিসাধনসমিতির কতকগুলি ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।

আসছে রবিবার একটা বক্তৃতা হবে। ডাঃ জেন্‌স তাঁর স্বভাবসিদ্ধ খুব সহৃদয় ও অমায়িক ব্যবহার কর্‌লেন—আর মিঃ হিলিন্‌সকে পূর্ব্বেরই মত দেখ্‌লাম—খুব কাজের লোক। বল্‌তে পারি না কেন, অন্যান্য সহরের চেয়ে এই নিউইয়র্ক সহরই দেখ্‌ছি, স্ত্রীলোকের চেয়ে পুরুষেরাই বেশী ধর্ম্মালোচনায় আগ্রহবান্‌।

আমার ক্ষুরখানা ১৬১ নং বাড়ীতে ফেলে এসেছি, অনুগ্রহপূর্ব্বক সেটা ল্যাণ্ডস্‌বার্গের নামে পাঠিয়ে দেবেন।

এই সঙ্গে মিঃ হিলিন্‌স আমার সম্বন্ধে যে ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি ছাপিয়েছেন, তার এক কপি পাঠালাম—আশা করি, ভবিষ্যতে আরও পার্‌বো।

মিস্‌ ফার্ম্মারকে এবং তাঁদের পবিত্র পরিবারের সকলকে আমার ভালবাসা জানাবেন।

সদাবশম্বদ

বিবেকানন্দ।

C-o. জর্জ ডব্‌লিউ হেল,
৫৪১ নং ডিয়ারবর্ণ এভিনিউ, চিকাগো।
১৮৯৪।

প্রিয় আলাসিঙ্গা!

এইমাত্র তোমার পত্র পেলাম। ভট্টাচার্য্যের মাতার দেহত্যাগ সংবাদে বিশেষ দুঃখিত হলাম। তিনি একজন অসাধারণ মহিলা ছিলেন। প্রভু তাঁর কল্যাণ করুন।

আমি যে খবরের কাগজের অংশগুলি তোমায় পাঠিয়ে ছিলাম, সেগুলি প্রকাশ করতে বলে আমি ভুল করেছি। এ আমার একটা ভয়ানক অন্যায় হয়ে গেছে। মুহূর্ত্তের জন্য দুর্ব্বলতা আমার হৃদয়কে অধিকার করেছিল, এতে তাই প্রকাশ হচ্ছে।

এ'দেশে দু তিন বছর ধরে বক্তৃতা দিলে টাকা তোলা যেতে পারে। আমি কতকটা চেষ্টা করেছি আর যদিও সাধারণে খুব আদরের সহিত আমার কথা নিচ্ছে, কিন্তু আমার প্রকৃতিতে এটা একেবারে খাপ খাচ্ছে না—বরং ওতে আমার মনটাকে বেজায় নামিয়ে দিচ্ছে। সুতরাং হে ভ্রাতঃ, আমি এই গ্রীষ্মকালেই ইউরোপ হয়ে ভারতে ফিরে যাব স্থির করেছি—এতে যা খরচ হবে তার জন্য যথেষ্ট টাকা আছে—"তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হোক্।"

ভারতের খবরের কাগজ ও তাদের সমালোচনা সম্বন্ধে যা লিখেছ, তা পড়্‌লাম। তারা যে এরকম লিখ্‌বে এ তাদের পক্ষে খুব স্বাভাবিক। প্রত্যেক দাস জাতির মূল পাপ হচ্ছে ঈর্ষ্যা। আবার এই ঈর্ষ্যাদ্বেষ ও সহযোগিতার অভাবই এই দাসত্বকে চিরস্থায়ী করে রাখে। ভারতের বাইরে না এলে আমার এ মন্তব্যের মর্ম্ম বুঝ্‌বে না। পাশ্চাত্য জাতির কার্য্যসিদ্ধির রহস্য হচ্ছে এই সহযোগিতা। শক্তি আর এর ভিত্তি হচ্ছে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের বিশ্বাস আর আদরপূর্ব্বক পরস্পরের কার্য্যে অনুমোদন। আর জাতটা যত দুর্ব্বল ও কাপুরুষ হবে, ততই তার ভিতর এই পাপটা স্পষ্ট দেখা যাবে। যতই কষ্টকল্পিত হোক, মূলে কতকটা সত্য না থাকলে কোন অপবাদই উঠ্‌তে পারেনা, আর এখানে আসবার

পর বেকলে ও আর আর অনেকে বাঙ্গালী জাতকে যে ভয়ানক গালাগাল দিয়েছেন, তার কারণ কিছু কিছু বুঝ্তে পারছি। এরা সর্ব্বাপেক্ষা কাপুরুষ আর সেই কারণেই এতদূর ঈর্ষ্যাপরায়ণ ও পরনিন্দা-প্রবণ। কিন্তু হে ভ্রাতঃ, এই দাসভাবাপন্ন জাতের নিকট কিছু আশা করা উচিত নয়। ব্যাপারটা স্পষ্টভাবে দেখ্লে কোন আশার কারণ থাকেনা বটে, তথাপি তোমাদের সকলের সামনে খুলেই বল্‌ছি—তোমরা কি এই মৃত জড়পিণ্ডটার ভিতর—যাদের ভিতর ভাল হবার আকাঙ্ক্ষাটা পর্য্যন্ত নষ্ট হয়ে গেছে, যাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য একদম চেষ্টা নাই, যারা তাদের হিতৈষীদের উপরই আক্রমণ কর্‌তে সদা প্রস্তুত—এরূপ মড়ার ভিতর প্রাণসঞ্চার কর্‌তে পার? তোমরা কি এমন চিকিৎসকের আসন গ্রহণ কর্‌তে পার, যিনি একটা ছেলের গলায় ঔষধ ঢেলে দেবার চেষ্টা কচ্ছেন, এদিকে ছেলেটা ক্রমাগত পা ছুঁড়ে লাথি মাচ্ছে এবং ঔষধ খাবনা বলে চেঁচিয়ে অস্থির করে তুলেছে?'

—সম্পাদক সম্বন্ধে বক্তব্য এই, আমার স্বর্গীয় গুরুদেবের কাছে উত্তম মধ্যম তাড়া খেয়েছিল, সেই অবধি সে আমাদের ছায়া পর্য্যন্ত মাড়ায় না। একজন মার্কিন বা ইউরোপীয়ান তার বিদেশস্থ স্বদেশ-বাসীর পক্ষ সর্ব্বদাই নিয়ে থাকে. কিন্তু হিন্দু, বিশেষ বাঙ্গালী তাকে অপমানিত দেখ্‌লে খুসী হয়। যাইহক, ওসব নিন্দা কুৎসার দিকে একদম খেয়াল করোনা। ফের তোমার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি,—

'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।'—

কর্ম্মেই তোমার অধিকার, ফলে তোমার অধিকার নেই। পাহাড়ের মত অটল হয়ে থাকো। সত্যের জয় চিরকালই হয়ে থাকে। রাম-কৃষ্ণের সন্তানগণের যেন ভাবের ঘরে চুরি না থাকে, তাহলে ঠিক হয়ে যাবে। আমরা বেঁচে থাক্‌তে থাক্‌তে এর কোন ফল দেখে না যেতে পারি, কিন্তু আমরা বেঁচে রয়েছি, এ বিষয়ে যেমন কোন সন্দেহ নাই, সেইরূপ নিঃসন্দেহ শীঘ্র বা বিলম্বে এর ফল হবেই হবে। ভারতের পক্ষে প্রয়োজন—উহার জাতীয় ধমনীর ভিতর নব বিদ্যুদগ্নি সঞ্চার। এরূপ কাজ চিরকালই ধীরে ধীরে হয়ে এসেছে, চিরকালই ধীরে হবে

এখন ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে শুধু কাজ করেই খুসি থাক, সর্ব্বোপরি, পবিত্র ও দৃঢ়চিত্ত হও এবং মনে প্রাণে অকপট হও—এতটুকু ভাবের ঘরে চুরি যেন না থাকে, তা হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। যদি তোমরা রামকৃষ্ণের শিষ্যদের কারও ভিতর কোন জিনিষ লক্ষ্য করে থাক, সেটী এই:—তারা একেবারে সম্পূর্ণ অকপট। আমি যদি ভারতে এই রকম একজন লোক রেখে যেতে পারি, তা হলে আমি আনন্দিতচিত্তে মরতে পারব—আমি বুঝব আমার কর্ত্তব্য করা হয়ে গেছে। অজ্ঞ লোকে যা তা বকুক না কেন, তিনিই জানেন—সেই প্রভুই জানেন কি হবে। আমরা লোকের সাহায্য খুঁজেও বেড়াই না, অথবা সাহায্য এসে পড়লে ছেড়েও দিই না—আমরা সেই পরমপুরুষের দাস। এই সব ক্ষুদ্র লোকের ক্ষুদ্র চেষ্টা আমরা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনি না। এগিয়ে যাও—শত শত যুগের কঠোর চেষ্টার ফলে একটা চরিত্র গঠিত হয়। দুঃখিত হয়ো না; সত্যে প্রতিষ্ঠিত একটা কথা পর্য্যন্ত নষ্ট হবে না—হয়ত শত শত যুগ ধরে আবর্জ্জনাস্তূপে চাপা পড়ে লোকলোচনের অগোচরে থাকতে পারে—কিন্তু শীঘ্র হোক বিলম্বে হোক, উহা প্রকাশ হবেই হবে। সত্য অবিনশ্বর—ধর্ম্ম অবিনশ্বর—পবিত্রতা অবিনশ্বর। আমাকে একটা খাঁটি লোক দাও দেখি, আমি রাশি রাশি বাজে চেলা চাই না। বৎস, বৎস, দৃঢ়ভাবে ধরে থাক—কোন লোক তোমাকে এসে সাহায্য করবে, তার ভরসা রেখ না—সকল মানুষের সাহায্যের চেয়ে প্রভু কি অনন্তগুণে শক্তিমান্ নন? পবিত্র হও—প্রভুর উপর বিশ্বাস রাখ, সর্ব্বদাই তাঁর উপর নির্ভর কর—তা হলেই তোমার সব ঠিক হয়ে যাবে—কেহ তোমার বিরুদ্ধে লেগে কিছু করতে পারবে না। আগামী পত্রে আরও বিস্তারিত খবর দেবো।

আমি মনে কচ্ছি, এই গ্রীষ্মকালটাতে ইউরোপে যাব, আর শীতের প্রারম্ভে আবার ভারতে ফিরবো। বোম্বাই নেমে প্রথমেই বোধ হয় রাজপুতনায় যাব, সেখান থেকে কলকাতা। কলকাতা থেকে জাহাজে করে আবার মান্দ্রাজ যাব। এস আমরা প্রার্থনা করি, "হে জ্যোতির্ম্ময়, সদা আমাদের সত্যপথে পরিচালিত কর"—তা হলে নিশ্চিত আঁধারের

মধ্যে আলোকরাশি ফুটে উঠ্‌বে—আমাদিগকে পরিচালিত কর্‌বার জন্য তাঁর মঙ্গলহস্ত প্রসারিত হবে। আমি সর্ব্বদা তোমাদের জন্য প্রার্থনা কর্‌ছি, তোমরাও আমার জন্য প্রার্থনা কর। এস, আমাদের মধ্যে—প্রত্যেকে দিবারাত্র দারিদ্র্য, পৌরহিত্য শক্তি এবং প্রবলের অত্যাচার-নিষ্পিষ্ট ভারতের লক্ষ লক্ষ পদদলিতদের জন্য প্রার্থনা করি। দিবারাত্র তাদের জন্য প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর। বড় লোক ও ধনীদের কাছে আমি ধর্ম্মপ্রচার কর্‌তে চাই না। আমি তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু নই, দার্শনিকও নই, না, না—আমি সাধুও নই। আমি গরিব—গরিবদের আমি ভালবাসি। আমি এদেশে যাদের গরিব বলা হয় তাদের দেখ্‌ছি—আমাদের দেশের গরিবদের তুলনায় এদের অবস্থা অনেক ভাল হলেও কত লোকদের হৃদয় এদের জন্য কাঁদ্‌ছে। কিন্তু ভারতের চিরপতিত বিশ কোটী নরনারীর জন্য কার হৃদয় কাঁদ্‌ছে? তাদের উদ্ধারের উপায় কি? তাদের জন্য কার হৃদয় কাঁদে বল? তারা অন্ধকার থেকে আলোয় আস্‌তে পাচ্ছে না—তারা শিক্ষা পাচ্ছে না—কে তাদের কাছে আলো নিয়ে যাবে বল? কে দ্বারে দ্বারে ঘুরে তাদের কাছে আলো নিয়ে যাবে? এরাই তোমাদের ঈশ্বর—এরাই তোমাদের দেবতা হোক—এরাই তোমাদের ইষ্ট হোক্‌। তাদের জন্য ভাব, তাদের জন্য কাজ কর, তাদের জন্য সদাসর্ব্বদা প্রার্থনা কর—প্রভুই তোমাদের পথ দেখিয়ে দেবেন। তাঁদেরই আমি মহাত্মা বলি, যাঁরা হৃদয় থেকে গরিবদের জন্য রক্তমোক্ষন হয়? তা না হলে সে দুরাত্মা। তাদের কল্যাণের জন্য, আমাদের সমবেত ইচ্ছাশক্তি, সমবেত প্রার্থনা প্রযুক্ত হোক—আমরা কাজে কিছু করে উঠ্‌তে না পেরে লোকের অজ্ঞাতভাবে দেহত্যাগ কর্‌তে পারি—কেউ হয়ত আমাদের প্রতি এতটুকু সহানুভূতি দেখালে না, কেউ হয়ত আমাদের জন্য এক ফোঁটা চোক্ষের জল পর্য্যন্ত ফেল্‌লে না—কিন্তু আমাদের একটা চিন্তাও কখনও নষ্ট হবে না। এর ফল শীঘ্র বা বিলম্বে ফল্‌বেই ফল্‌বে। আমার প্রাণের ভিতর এত ভাব আস্‌ছে—আমি ভাষায় প্রকাশ কর্‌তে পার্‌ছি না—তোমরা আমার হৃদয়ের ভাব মনে মনে কল্পনা করে বুঝে নাও।

যতদিন ভারতের কোটী কোটী লোক দারিদ্র্য ও অজ্ঞানান্ধকারে ডুবে রয়েছে, ততদিন তাদের পয়সায় শিক্ষিত অথচ যারা তাদের দিকে চেয়েও দেখ্‌ছেনা, এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমি দেশদ্রোহী বলে মনে করি। যতদিন ভারতের বিশকোটী লোক ক্ষুধার্ত্ত পশুর তুল্য থাক্‌বে, ততদিন যে সব বড়লোক তাদের পিশে টাকা রোজগার করে জাঁকজমক করে বেড়াচ্ছে অথচ তাদের জন্য কিছু কর্‌ছে না—আমি তাদের হতভাগা বলি। হে ভ্রাতৃগণ! আমরা গরিব, আমরা নগণ্য, কিন্তু আমাদের মত গরিবরাই চিরকাল সেই পরমপুরুষের যন্ত্রস্বরূপ হয়ে কাজ করেছে। প্রভু তোমাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন—আশীর্ব্বাদ করুন। সকলে আমার বিশেষ ভালবাসা জান্‌বে।

ইতি
বিবেকানন্দ।

পুঃ—যদি তোমরা কিছু ছাপিয়ে না থাক ত ছাপা বন্ধ কর—নাম-হজুকের আর দরকার নাই।

ইতি
বি।

বুদ্ধ।

(শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ)

পুণ্য সেই পৌর্ণমাসী, বিশাখা নক্ষত্র,
বৈশাখ ঐ মাস, পুণ্য বাস্তু কপিলের,
জনমিয়া কৈলে পুণ্য ভারত ভূমিরে,
রাজপুত্র হয়ে, ওহে, সখা ভিক্ষুদের!
তুমিই সম্বুদ্ধ সত্য মানব-মণ্ডলে,
তোমার প্রভাব লুপ্ত হবেনা ভূতলে।
অসার সংসার মাত্র খেলা ঐ মায়ার
অনেকেই ভাবে, তবু মত্ত সে খেলাতে;

তুমি কিন্তু সে খেলাতে বিরত যৌবনে,
রিপুগণে সংযমিয়া প্রদর্শিলে সত্যে ;
যৌবনেতে, যুবরাজ, নিলে যে সন্ন্যাস,
ত্যাগের মাহাত্ম্য তায় হইল প্রকাশ।
"আত্মার ভিষক্!" ওহে! জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ লোকে!"
মহাঘোর পরীক্ষাতে, পাপ প্রলোভনে,
জিতেন্দ্রিয়, সংযতাত্মা, পবিত্র ঐ প্রাণ,
প্রশান্ত প্রসন্নচিত্ত সারা ঐ জীবনে,
কঠোর আচার নিজে নিয়মে রীতিতে,
কোমল সকলে তবু সমবেদনাতে!
তোমার অমৃতবাণী অশ্রুত অপূর্ব্ব!—
দয়া যে ঐ নির্ব্বিশেষে সর্ব্বজীবোপরে
শিখাইলে আচরিতে মানব সকলে,
তাহাতে সদয় হয় পাষণ্ড পামরে:—
অহিংসা পালিয়া ধর্ম্মে জীবমাত্রে ওই
"আমার ভায়েরা পশু সিদ্ধিতে সবাই।"
সর্ব্বজগতের প্রেমে উৎপ্লাবী হৃদয়।
পবিত্র জীবন মাত্র তব প্রাণে জাগে—
ইতরপ্রাণী ঐ কিম্বা অসাধু পামর
একসূত্রে গেঁথেছ যে সম অনুরাগে ;
কেহ যদি হাত তুলে ক্ষুদ্রেরও প্রতি
কাঁপ ঐ ন্যায়ের খড়্গ কোষ মধ্যে অতি।
হিংসায় হিংসার কভু হয় না দমন,
প্রেমেই হিংসার ক্রমে হয় অবসান,
প্রেমেই বিরোধে করে শান্তিতে গণন,
এই সত্য উপদেশ, এই সত্য জ্ঞান,
তুমি যে জগতে কৈলে জীবনে প্রচার,
তাহাতেই জগতের হবে সমুদ্ধার।

দরিদ্রবান্ধব, ওহে, সুজনের প্রিয়!
সত্য আর ন্যায্য চিন্তা প্রচারিলে যাহা,
সত্য আর ন্যায্য কার্য্য আর ঐ সংকল্প,
তব কাছে শুনি হয় শীলাচর আহা,
সহস্র সহস্র লোক অযুত অযুত;—
পিতাও শুনিয়া হ'ল ভিক্ষু ও ভকত।
দস্যু আর শ্রেষ্ঠী তব হেরিয়া মাহাত্ম্য
সাধুসঙ্গে পরিণত হ'ল তব কালে;
তোমার আত্মার ওই অদ্ভুত প্রভাবে
স্বৈরিণীও সাধ্বী হয়ে মুক্তি, আহা, পেলে;—
আনিয়া সর্ব্বস্ব তার সঁপিল চরণে,
অম্বপালী স্মরণীয়া হ'ল জেতবনে।
মানুষে করম করে; জন্ম জন্মান্তরে
করমে আশক্তি নাহি মিটে তার প্রাণে;
করমের আশে তার জন্ম তায় হয়—
কার্য্যেতে কারণ জন্মে, কার্য্য ঐ কারণে;
চক্রাকারে যাতায়াতে জন্মে আর মরে,—
ধ্যানেতে মগন হেরি, যুবক, তোমারে।
অবশেষে সমাধান সমস্যা জন্মের
অদ্ভুত-রূপেতে তব সংজ্ঞাতে উদয়—
নির্ব্বাণের মহালোকে দীপ্ত হ'ল প্রাণ;
চিত্তের সঞ্চিত যত অন্ধকারচয়
লুপ্ত হল, ভূমানন্দে পূর্ণ হ'ল প্রাণ,—
মানুষের জন্মমুক্তি জ্ঞাপিলে তখন।
জনম বন্ধন মুক্ত নির্ব্বাণ প্রাপ্তিতে।
বাহিরিলে বিজ্ঞাপিতে জগতের হিত,—
নিষ্কাম করম আর নিষ্কাম সাধন,
কর্ম্মবন্ধনের মুক্তি যাহাতে নিহিত:

ফল বিনা আবশ্যক ক্ষেত্রে নাহি হয়,
জন্মরূপ কর্ম্মক্ষেত্রে লুপ্ত তায় হয়।
তা'বলে করম নাহি করিলে বারণ;
বরং সৎকার্য্যের তার হ'য়ে অভ্যুদয়
মানব হইতে নিম্নজীবেতে নামিল;—
তোমার ঐ কৃতিনীতি শিক্ষা সমুদয়
জগতের জাতিদের পুণ্যশ্লোক হ'য়ে
সমদম দয়া লয়ে রহেছে দাঁড়ায়ে।
কর্ম্মে নাহি নাশিলে হে, বরং নব ধর্ম্মে
প্রস্থাপিলে দেখি এক দয়াবান্ হ'তে,—
যাগ যজ্ঞ জপতপে জানু পেতে থেকে
নাহি ফল, বরং উঠে কার্য্য লয়ে হাতে
পীড়িতে দরিদ্রে আর তৃষিতে তাপিতে
সেবা করে দেহ তব প্রাণেরে নিদিতে।
সব ত্যাগ হ'তে শ্রেষ্ঠ তব আত্মত্যাগ,
সব দান হ'তে উচ্চ তোমার ঐ প্রাণ;
সে ত্যাগে সে দানে লুপ্ত ভোগের আধার
এইরূপে হবে ব্রহ্ম নির্ব্বাণে সংস্থান;—
তা হতে উচ্ছিন্ন অবতরণ জন্মেতে,
থাকিবে ঐ বারিবিন্দু সম বারিধিতে!
"সদয় প্রকৃতি যারা নম্রান্তঃকরণ
জগতের জয়ী হ'তে; দয়া পাবে কালে,"
তোমার জীবন ইহা করে সপ্রমাণ;
তব নামধারী, হেরি, যদি না সকলে,
তবুও তোমার শিক্ষা রীতি চরিত্রের
নিয়ামক হ'তে কর ওহে সাধুদের!

সময়ে স্বামীজির বাণী।

(স্বামী ভূমানন্দ)

মহাত্মা গান্ধীর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আগমনের সময় হইতে—এদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রাণ আসিয়াছে। সে প্রাণের স্পন্দন কাহাকেও হত্যা করিতে বলে না—পরস্ব অপহরণ বা লুণ্ঠন করিতে 'সায়' দেয় না—গোপনে লুকোচুরী দ্বারা অভিষ্ট সিদ্ধ করিতে ইঙ্গিত করে না। যাহা সত্য—তাহা সোজা ভাষায় বলিবে, যাহা কর্ত্তব্য তাহা হাজার উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও করিতে বলিতেছে। সুতরাং এ আন্দোলনেই সহানুভূতি থাকা প্রত্যেক ধর্ম্ম প্রাণ ভারতবাসীরই কর্ত্তব্য।

সেজন্য অনেকেই এ আন্দোলনের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেছেন। আমাদের কিন্তু মনে হয় সুধু লক্ষ্য রাখিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না—যার যেমন ক্ষমতা তাই দিয়া "Be and make let this be our motto" করিয়া কাজে লাগা প্রয়োজন।

দেখা যায় 'উদ্দেশ্য' এক হইলেও উপায় লইয়া সর্ব্বদাই মনান্তর কত কি ঘটিয়া আসিতেছে। অসহযোগ আন্দোলন যে বহুদিন অহিংস থাকিতে পারে না—সে কথাও বহু মতে ব্যক্ত হইয়াছে।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী—প্রকৃত মহাত্মা। তিনি মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি না হইতে পারেন, তিনি অবতার পুরুষও না হইতে পারেন কিন্তু কৃতকর্ম্মে দোষ দেখিয়া স্বীকার করিতে এবং সময়োপযোগী কর্ম্মের মোড় ফিরাইয়া সৎপথে চালিত করিবার মত সাহস তাঁহার আছে। এ সাহস এ ভারতে আর কাহারও আছে কিনা আমরা জানি না।

মহাত্মার কত গুণ। তাহাছাড় আমরা যাহাকে অতি সামান্য, নগণ্য মনে করি—তিনি তাহাদের কথা ধৈর্য্যসহকারে শোনেন—যাহাতে সে কথার মধ্যে তিনি কিছু সত্য আবিষ্কার করিতে পারেন। তাহারপর শ্রদ্ধার সহিত সে কথার উত্তর প্রদান করেন। এহেন অভিমানশূন্য

সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া নেতৃত্বে যদি ভারত জগতের মধ্যে আপন স্থান নির্দ্দেশ করিয়া লইতে না পারে—সে তাহার দুর্ভাগ্য।

মহাত্মা যে তেজে সরকারের 'Challenge'কে accept করিয়া স্বেচ্ছাসেবকগণকে পিকেট করিতে এবং সভা সমিতি করিতে বলিয়াছিলেন সেই তেজেই তিনি আপন দলের সংস্কার সাধনে তৎপর হইয়াছেন। এসময় স্বামী বিবেকানন্দের দু একটি কথা উদ্ধৃত করিয়া বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে কর্ম্মের পন্থা নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া যে নিয়মগুলি বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহারই কয়েকটি নিয়ম আমরা এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি। ভারতের কল্যাণের জন্য একদিন স্বামীজি যাহা মুষ্টিমেয় সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীর উপর অর্পণ করিয়াছিলেন—মহাত্মা সে পথ একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন কি?

স্বামীজির মতে প্রীতি, অধ্যক্ষদিগের আজ্ঞাবহতা, সহিষ্ণুতা ও একান্ত পবিত্রতাই ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে একতা রক্ষার একমাত্র কারণ।—ভারতবর্ষে প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য—নীচ শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে বিদ্যা ও ধর্ম্মের বিতরণ। অন্নের সংস্থান না করিতে পারিলে ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির ধর্ম্ম হওয়া অসম্ভব। অতএব তাহাদের নিমিত্ত অন্নাগমের নূতন উপায় প্রদর্শন করা সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য।

"সমাজ সংস্কারের উপর মঠের অধিক দৃষ্টি থাকিবে না। কারণ সামাজিক দোষ বা কুরীতি সমাজরূপ শরীরের ব্যাধি বিশেষ। ঐ শরীর বিদ্যা ও অন্নের দ্বারা পুষ্ট হইলে ঐ সকল কুরীতি আপনা আপনি সরিয়া যাইবে। অতএব সামাজিক কুরীতির উদ্ঘাটনে বৃথা শক্তিক্ষয় না করিয়া সজাগ শরীর পুষ্ট করাই এই মঠের উদ্দেশ্য।

"চরিত্রবল না হইলে মনুষ্য কোন কার্য্যেই সক্ষম হয় না। এই চরিত্র-বলবিহীনতাই আমাদের কার্য্যপরিণত বুদ্ধির অভাবের একমাত্র কারণ।

"এই প্রকার মঠ সমস্ত পৃথিবীতে স্থাপন করিতে হইবে। কোন দেশে আধ্যাত্মিক ভাবমাত্রেরই প্রয়োজন। কোন দেশে ইহজীবনের কিঞ্চিৎ সুখ স্বচ্ছন্দতার অতীব প্রয়োজন। এই প্রকারে যে জাতিতে বা

যে ব্যক্তিতে যে অভাব অত্যন্ত প্রবল তাহা পূর্ণ করিয়া সেই পথ দিয়া তাহাকে ধর্ম্মরাজ্যে লইয়া যাইতে হইবে।

"বিদ্যার অভাবে ধর্ম্মসম্প্রদায় নীচ দশা প্রাপ্ত হয়। অতএব সর্ব্বদা বিদ্যার চর্চ্চা করিবে।

"প্রচারের দ্বারায় সম্প্রদায়ের জীবনীশক্তি বলবতী থাকে, অতএব প্রচারকার্য্য হইতে কখন বিরত থাকিবে না।

"যে ভাবে পুরুষদিগের মঠ পরিচালিত হইবে, স্ত্রীলোকদিগের মঠও ঠিক সেই ভাবে পরিচালিত হইবে। বিশেষ এই, স্ত্রীলোকদিগের মঠে—পুরুষের কোন সংশ্রব থাকিবে না এবং পুরুষদিগের মঠে স্ত্রীলোকের কোন প্রকার সংশ্রব থাকিবে না।

"স্ত্রীমঠ যতদিন পর্য্যন্ত কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ স্ত্রী না পাওয়া যায় ততদিন দূর হইতে পুরুষদের দ্বারা চালিত হইবে। তাহার পরে উঁহারা আপনাদের সকল কার্য্য আপনারাই করিয়া লইবে।

আজ এই পর্য্যন্ত; আমাদের প্রত্যেকেরই কার্য্যের দ্বারা প্রমাণ করা উচিৎ—One ounce of practice is worth a hundred tons of big talks.

ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃনুয়ামদেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ॥

"হে দেবগণ! আমরা যেন কর্ণে কল্যাণকর বাক্য শ্রবণ করিতে সমর্থ হই, হে যজনীয় দেবগণ! আমরা চক্ষে যেন কল্যাণকর বস্তু দেখিতে সমর্থ হই; আমরা যেন দৃঢ়াঙ্গ শরীরযুক্ত হইয়া তোমাদের স্তুতি করতঃ দেবগণ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট আয়ু প্রাপ্ত হই।"

ঋক্‌বেদ, ১ম, ৮৯ সূ, ৮ঋ।

পুরাণমাতা ঋক্‌শ্রুতি।

(স্বামী বাসুদেবানন্দ)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(২) ঋগ্বেদের আর একটি দেবতার নাম 'বায়ু'। প্রাচীন পারসীকদের 'অবস্থা' ধর্ম্মগ্রন্থেও ইঁহার নামোল্লেখ আছে।

"এই বায়ুকে আমরা যজ্ঞ প্রদান করি, এই বায়ুকে আমরা আহ্বান করি।"

"তিনি তাঁহার নিকট একটি বর প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, হে উর্দ্ধ-বিচারী বায়ু! আমাকে এই বর দাও যে, আমি তিন মুখ তিন মস্তকযুক্ত অজিদহককে (সংস্কৃত "অহি" "দহক") পরাস্ত করিতে পারি।

"উর্দ্ধ বিচারী বায়ু তাহাকে সৃষ্টিকর্ত্তা অহুরোমজ্‌দের প্রার্থনা অনুসারে সেই বর দিলেন।"

(৩) ঋগ্বেদে সোমরসের কথা আছে। আর্য্যেরা ইহার ব্যবহার করিতেন ইরাণীরা ভারতীয় আর্য্যগণের সহিত বিচ্ছেদের পর যখন পারস্যে উপনিবেশ স্থাপন করেন সেই হেতু এই সোমরসের ব্যবহারও তাঁহাদের অবস্থায় দেখা যায়। তাঁহারা সোমকে "হওমা" বলিতেন এবং যজ্ঞেতেও ব্যবহার করিতেন। "আমরা কাঞ্চনবর্ণ ও সুদীর্ঘ, হাওমাকে যজ্ঞদান করি; আমরা হর্ষদাতা হাওমাকে যজ্ঞদান করি, তিনি জগৎকে বৃদ্ধি করিতেছেন; আমরা হাওমাকে যজ্ঞদান করি, তিনি মৃত্যু দূরে রাখিয়াছেন।" —জেন্দ অবস্থা দ্বিতীয় সিরোজা।

"অহুর দ্বারা সৃষ্ট বেরেথ্রঘ্নকে (হিন্দুদিগের বৃত্রঘ্ন) আমরা যজ্ঞদান করি, হাওমা মস্তক রক্ষা করেন; আমি তাহা অর্পণ করি; হাওমা জয়শীল, আমি তাহা অর্পণ করি; আমি সুরক্ষককে অর্পণ করি; হাওমা আমার শরীর রক্ষা করেন, আমি তাহা অর্পণ করি; যে মনুষ্য হাওমা পান করিবে সে যুদ্ধে শত্রুদিগকে জয় করিবে।"

—জেন্দ অবস্থা বহরাম যাস্ত।

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলেন "বোধ হয় ইরাণীয় আর্য্যগণ সোমরস স্বাভাবিক অবস্থায় (Unfermented) ব্যবহার করিতেন, এবং হিন্দু আর্য্যগণ 'সোমরস মাদক অবস্থায় (Fermented) পান করিতে ভাল বাসিতেন, এবং ঐ দুই আর্য্য জাতির মধ্যে বিবাদের এই একটী কারণ।"

ঋগ্বেদের পরবর্ত্তী অথর্ব্ববেদ ও শতপথ ব্রাহ্মণে 'চন্দ্রকে' নানাস্থানে 'সোম' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। আর পুরাণে 'সোম' শব্দের অর্থ 'চন্দ্র' ইহা আমরা সকলেই জানি।

(৪) ঋগ্বেদের আর এক দেবতার নাম 'ইন্দ্র'। 'ইন্দ' ধাতু বর্ষণে 'ইন্দ্র' অর্থে বৃষ্টিদাতা আকাশ (রমেশ দত্ত)। প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যেরা আকাশকে 'দ্যু' ও 'বরুণ' বলিয়াও উপাসনা করিতেন দেখা যায়। ক্রমে ইন্দ্র'দেবতার জাগরণে 'দ্যু' ও 'বরুণ' দেবতা ক্ষীণ হইয়া পড়িলেন। এই 'দ্যু' শব্দই রূপান্তরিত হইয়া গ্রীকদের Zeus, লাটিনদিগের Jovis বা Ju (-piter পিতা) এংগ্লো সাক্সনদের Tiu, জার্ম্মানদের Zio দেবতার নাম সৃষ্টি হইয়াছে। ঋগ্বেদে যে 'দ্যু' বা আকাশ দেবতার উপাসনা আছে তিনি ইন্দ্রাদি সকল দেবতার জনক কিন্তু 'ইন্দ্র' দেবতা কেবল আকাশ রূপেই উপাসিত। এবং অপরাপর দেশের আর্য্যেরা এই 'দ্যু' দেবতাকে সকল দেবতার পিতৃরূপে উপাসনা করিতেন কাজে কাজেই বলিতে হয় এই ইন্দ্র দেবতা কেবলমাত্র ভারতীয় আর্য্যগণ কর্ত্তৃক উপাসিত হইতেন।*

ঋগ্বেদের একস্থলে ইন্দ্র ত্বষ্টা পুত্রের তিনটী মস্তক ছেদন করেন এইরূপ বৃত্তান্ত আছে। ইহা হইতেই ভাগবতাদি পুরাণে

* "হিন্দুগণ যখন আকাশকে 'ইন্দ্র' বলিয়া নূতন নাম দিলেন, সেই অবধি 'ইন্দ্রের' উপাসনা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, আকাশের পুরাতন দেব 'দ্যু'র তত গৌরব রহিল না। * * * ভারতবর্ষে নদীর জল, ভূমির উর্ব্বরতা, ধান্য ও খাদ্য দ্রব্য, মনুষ্যের, সুখ ও জীবন, সমস্তই বৃষ্টির উপর নির্ভর করে, অতএব বৃষ্টিদাতা আকাশের গৌরব অধিক 'দ্যু' আর্য্যদিগের পুরাতন আকাশ দেব, 'ইন্দ্র' হিন্দুদিগের নূতন বৃষ্টিদাতা আকাশ দেব. সুতরাং বৃষ্টি দাতার উপাসনা ক্রমে বৃদ্ধি পাইল।"—শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত)।

১ম, ৩২ সূ, ৫ঋকে আছে,—

অহন্ বৃত্রং বৃত্রতরং ব্যংসমিংদ্রো বজ্রেন মহতা বধেন।

স্কংধাংসীব কুলিশেনা বিবৃক্নাহিঃ শয়ত উপপৃক্ পৃথিব্যাঃ॥

—"জগতের আবরণকারী বৃত্রকে ইন্দ্র মহাধ্বংসকারী বজ্র দ্বারা ছিন্নবাহু করিয়া বিনাশ করিলেন, কুঠার-ছিন্ন-বৃক্ষ-স্কন্ধের ন্যায় অহি পৃথিবী স্পর্শ করিয়া পড়িয়া আছে।" এই ঋক্ হইতেই পৌরাণিক বৃত্রাসুর বধোপাখ্যান গঠিত হইয়াছে। ইরাণীরাও এই গল্প তাহাদের সহিত লইয়া যায়। অবস্থায় আছে,—

"অহুরের সৃষ্ট বেরেথ্রঘ্নকে (সংস্কৃত বৃত্রঘ্ন) আমরা যজ্ঞ প্রদান করি। জারথস্ত্র অহুরোমজ্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সদয়চিত্ত আহুরোমজ্দ! হে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা পবিত্রাত্মা! স্বর্গীয় উপাস্য-দিগের মধ্যে কে সর্ব্বোৎকৃষ্ট অস্ত্রধারী! অহুরোমজ্দ উত্তর করিলেন, হে স্পিতিমা জারাথস্ত্র! অহুরের সৃষ্ট বেরেথ্রঘ্ন।" (সর্ব্বোৎকৃষ্ট অস্ত্রধারী) —বহরাম যাস্ত।

১ম, ১০৬ সূ, ৬ঋকে আছে—ইং দ্রং কুৎসো বৃত্রহণং শচীপতিং কাটে নিবাড়্হঋষিরহ্ব দূতয়ে—"কূপে নিপতিত কুৎসঋষি রক্ষণের জন্য বৃত্রহন্তা ও যজ্ঞ প্রতিপালক ইন্দ্রকে আহ্বান করিয়াছে।" এখানে 'বৃত্রহন্' শব্দ আছে। শচীপতিং শব্দের অর্থ—শচীতি কর্ম্মনাম। সর্ব্বেষাং কর্ম্মনাং পালয়িতারং যদ্বা শচ্যা দেব্যা ভর্ত্তারং।—(সায়ণ)। ইন্দ্র যজ্ঞের পতি তাই শচীপতি। এই ঋকই পৌরাণিক শচী, ইন্দ্র-স্ত্রীর উৎপত্তি স্থান।

আর পাশ্চাত্য পণ্ডিত Coxএর মতে বৈদিক 'অহিঃ' গ্রীক Echis বা Echidna * কিন্তু সায়ণ যে ভাবে ১ম, ৩২ সূ ৪ এবং ৫ ঋকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে বৃত্রাসুরবধ বৃত্তান্তটী রূপক বলিয়া বোধ হয়।

* "Ahi reappears in the Greek Echis, Echidna, the dragon which crushes its victim with its coil"—Cox's Introduction to Mythology and Folklore. P. 34, note.

"But besides Kerberos (ঋগ্বেদে যমের কুকুর সর্বরা বা সারমেয়) there is another dog conquered by Hercules, and he (like Kerberos) is born of Typhasu and Echidna (ঋগ্বেদে অহি)…

—যদিংদ্রাহন্ প্রথমজামহীনামান্মায়িনামমিনাঃ প্রোত মায়াঃ।
আত্ সূর্য্যং জনয়ন্দ্যামুষানং তাদিত্না শত্রুং ন কিলা বিবিত্সে॥ ৪॥

—"যখন তুমি অহিদিগের মধ্যে প্রথম জাতকে হনন করিলে, তখন তুমি মায়াবীদিগের মায়া বিনাশ করিলে পর সূর্য্য ও ঊষাকাল ও আকাশকে প্রকাশ করিয়া আর শত্রু রাখিলে না।" জনয়ন্—আচরক মেঘ নিবারণেন প্রকাশয়ন্—(সায়ণ)। এবং ৫ শ্লোকের বৃত্রং বৃত্রতরং—অতিশয়েন লোকানাং আবরকং অন্ধকার রূপং—সায়ণ)। ৫শ্লোকের মূল বঙ্গানুবাদ পূর্ব্বে দেখ।

পুনশ্চ ৬ শ্লোকে,—

অযোদ্ধেব দুর্মদ আহি জুহ্বে মহাবীরং তুবিবাধমৃজীষং
নাতারীদস্য সমৃতিং বধানাং সং রুজানাঃ পিপিষ ইংদ্র শত্রুঃ।

—"দর্পযুক্ত বৃত্র (আপনার সমতুল) যোদ্ধা নাই (মনে করিয়া) মহাবীর ও বহু বিনাশী ও শত্রুবিজয়ী ইন্দ্রকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিল। ইন্দ্রের বিনাশকার্য্য হইতে রক্ষা পাইল না, ইন্দ্রশত্রু বৃত্র (নদীতে পতিত হইয়া) নদী সমুদয় পিষিয়া ফেলিল।"

পাশ্চাত্য পণ্ডিত Wilson ইহার রূপক ভাঙ্গিয়া অর্থ করিয়াছেন—মেঘ বর্ষিত হইয়া নদীর উভয় কূল প্লাবিত করিল।*

এই ইন্দ্রকে লইয়া ভারতীয় আর্য্যদের সহিত ইরাণীদের বোধ হয় বিরোধের সূত্রপাত। ইরাণীরা যে ইন্দ্রকে অত্যন্ত ঘৃণা করিত তাহার প্রমাণ—"আমি ইন্দ্রকে সৌরুকে ও দেব নজ্যত্যকে এই গৃহ হইতে, এই পল্লী হইতে, এই নগর হইতে, এই দেশ হইতে * *, এই পবিত্র অখণ্ড জগৎ হইতে দূর করিয়া দিই।"—জেন্দ অবস্থা—দশম ফার্গার্দ। কিন্তু পূর্ব্বে আমরা জেন্দ্ অবস্থা হইতে দেখাইয়াছি

The second dog is known by the name of Orthros, the exact copy, I believe, of the Vedic Vritra. That the Vedic Vritra should reappear in Greece in the shape of a dog need not surprise us....Thus we discover in Hercules, the victor of Orthros, a real Vitrahan."—Max Muller. Chips from a German Workshop, Vol. II (1867) PP. 154, 185.

* The banks "were broken down by the fall of Vritra, *i.e.*; by inundation occasioned by the descent of the rain."—Wilson.

তাঁহারা ইন্দ্রকে যজ্ঞ প্রদান করিতেন। অতএব অনুমিত হয় যে এক সময়ে ইঁহারা উভয় পক্ষই ইন্দ্রের উপাসনা করিতেন। পরে বরুণ ও ইন্দ্র দেবতার শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া বিবাদ উপস্থিত এবং ভারতীয় আর্য্যেরা ইন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করায় এবং অন্যান্য নানা কারণে সপ্তনদীর দেশ ত্যাগ করিয়া পারস্যে উপনিবেশ স্থাপন করিলেন এবং ইন্দ্রিকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতে লাগিলেন। [জেন্দ অবস্থার 'সৌরু', বৈদিক 'সর্ব্ব' বা 'সরু' যিনি মৃত্যুর বাণ বা নিদর্শন, "নঙ্ঘত্য' বেদের 'নাসত্য' দ্বয় অর্থাৎ অশ্বিদ্বয়।]

(৫) ঋগ্বেদের আর দুই দেবতার নাম "মিত্র ও বরুণ"। মিত্রং হুবে পূতদক্ষং বরুণং চ রিশাদসং (১ম, ২সূ, ৭ঋ) "পবিত্র বল মিত্র ও হিংসকশত্রুনাশক বরুণকে" ইত্যাদি উল্লেখ আছে। প্রাচীন হিন্দু ও পারসীকদের মধ্যে এই দেবতাদ্বয়ের উপাসনা প্রচলিত ছিল। ইরাণীরা মিত্রকে আলোক বা সূর্য্য বলিয়া পূজা করিতেন আর হিন্দুরা তাঁহাকে আলোক বা দিবা বলিয়া পূজা করিতেন। মৈত্রং বৈ অহরিতি শ্রুতেঃ —(সায়ণ)। বরুণকে হিন্দুর নৈশাকাশ বলিয়া প্রথমে পরে সমুদ্রের অধিপতি দেবতা বলিয়া জানিতেন। শ্রূয়তে চ বারুণী রাত্রি (সায়ণ) ইরাণীরা ইঁহাকে 'বরণ' এবং গ্রীকেরা Uranos শব্দে রূপান্তরিত করিয়াছেন। এই দুই দেবতা সম্বন্ধে জেন্দ অবস্থা হইতে উদ্ধৃত করা যাইতেছে,—

"আমরা মিত্রকে যজ্ঞ প্রদান করি, তিনি বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের অধিপতি, তিনি সত্যবাদী, সভায় সভাপতি; তাঁহার সহস্র সুন্দর কর্ণ আছে, দশ সহস্র চক্ষু আছে, তাঁহার পূর্ণ জ্ঞান আছে; তিনি বলবান্, অনিদ্র, চির জাগরুক।"—জেন্দ অবস্থা মিহির যাস্ত।

"আমি অহুরো মজ্দ যে উৎকৃষ্ট দেশ ও প্রদেশ সৃষ্টি করিয়াছিলাম, চতুষ্কোণ বরণ তাহার মধ্যে চতুর্দ্দশ সংখ্যক। সে দেশের জন্য থ্রেতন (সংস্কৃত ত্রৈতন বা ত্রিত, ৫২ সূক্তের ৫ঋকের টীকা দেখ) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি অজীদহককে (সংস্কৃত অহি, ১ম, ৩২ সূ, ১ঋ) হত করিয়াছিলেন। প্রথম ফার্গার্দ। (ক্রমশঃ)

মহাসমাধি।*

পরমহংসাচার্য্য—ব্রহ্মানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র—রাখাল, স্বামী বিবেকানন্দের আদরের ভাই—রাজা, শিষ্যের প্রিয়তম—মহারাজ, বিপুল শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের অধ্যক্ষ ইহধামে আর নাই। শ্রীভগবানের নবযুগলীলার পুষ্টির নিমিত্ত জগদ্ধিতায় যে চিণ্ময়ধাম হইতে এই ত্রিতাপ-তাপিত ধরায় তাঁর আগমন হয়, গত [illegible]শে চৈত্র, সোমবার মদন ত্রয়োদশীর দিন এবং চতুর্দ্দশীর প্রারম্ভে রাত্রি ৮টা ৪৫ মিনিটের সময়, তিনি সেই নিত্যধামে পুনরায় প্রভুর পার্ষদত্বই প্রাপ্ত হইয়াছেন। বিগত ১০ই চৈত্র শুক্রবার একাদশীর দিন, বাগবাজার পল্লীস্থ, বলরাম বসু মহাশয়ের বাটীতে হঠাৎ তিনি বিসূচিকা রোগগ্রস্ত হন। ঐ রোগ উপশমিত হইতে না হইতেই গত রামনবমীর দিন আবার তাঁহার জ্বর ও পূর্ব্বের বহুমূত্র রোগ অত্যাধিক বৃদ্ধি পায়। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র, শ্যামাদাস, চন্দ্রকালী, নীলরতন, কাঞ্জিলাল, দুর্গাপদ প্রভৃতি সুবিজ্ঞ চিকিৎসকেরাই ঐ দিন হইতে তাঁহার জীবন সম্বন্ধে সন্দীহান হন। শনিবার মধ্যরাত্রে হঠাৎ তিনি তাঁহার সকল সন্ন্যাসী শিষ্যবর্গকে নিকট বসিতে বলেন এবং কি এক অদ্ভুত প্রেমাবশে মাতোয়ারা হইয়া জড়িতকণ্ঠে সকলকে অভয় ও ভরসার বাণী শুনাইতে থাকেন। তাহার পর স্বামী সারদানন্দজীকে ডাকিয়া পাঠান। ইতিমধ্যে বলিয়াছিলেন, "আমার বিবেক, বিবেক, বিবেকানন্দ দাদা!" "বাবুরামকে চিনি, শ্রীরামকৃষ্ণচরণ জানি।" অতঃপর সারদানন্দ স্বামী উপস্থিত হইলে বলিলেন, "ভাই শরৎ, এসেছিস—আমার যে ব্রহ্ম-বেদান্ত গোল হয়ে গেল। তুই ত ব্রহ্মবিদ্যা জানিস্, কি বল দিকি।" শরৎ মহারাজ, "তোমার আবার গোল কি? ঠাকুর তোমার সব করে দিয়েছেন।" তখন বলিয়া উঠিলেন, "আমি প্রায় গিইছি, কেবল একটু পাচ্ছিনি। ব্রহ্ম-তিমির!" পরে বিদ্রূপের সহিত, "আচ্ছা, ব্রহ্ম, ব্রহ্ম করচি, আবার লেমনেড লেমনেড করচিস্ কেন?" কথা শুনিয়া সকলেই মৃদু হাস্য

---

* এই মহাসমাধি উপলক্ষে আগামী ৯ই বৈশাখ শনিবার বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ ভোগরাগাদি হইবে। সকল ভক্তজনের উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়।

করিতে লাগিলেন। 'Father in Heaven', দেখ, দেখ, এও খুব সুন্দর, এও ভগবানের এক ভাব। চল্, চল্।" শরৎ মহারাজ ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন "তুমি লেমনেড খেয়ে ঘুমও।" তখন বলিলেন "মন যে ঐ ব্রহ্মলোকে—নামতে চায় না—দে ব্রহ্মে ঢেলে।" কিছুক্ষণ পরে বলিয়া উঠিলেন "আহাহা! ব্রহ্ম-সমুদ্র! ওঁ পরব্রহ্মণে নমঃ! ওঁ পরমাত্মনে নমঃ! একটী বিশ্বাসের পত্রে ভেসে চলছি। আহাহা!" যখন এই কথাগুলি বলিতেছিলেন, তখন যেন সেই সচ্চিদানন্দ সাগরের শান্ত শীতল স্পর্শ, সমবেত সন্ন্যাসী-মণ্ডলীর হৃদয়কেও স্পর্শ করিয়া যাইতেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার সম্বন্ধে আরও যে সকল গুহ্য কথা অপরের নিকট বলিয়াছিলেন, যাহা তিনি জানিতেন না, তাহাও তিনি তখন প্রকাশ করেন। "দেখ্ দেখ্ কৃষ্ণ এসেছে। আমায় মল পরিয়ে দে, আমি তার হাত ধরে নাচব—ঝুম্ ঝুম্ ক'রে। আমি যে ব্রজের রাখাল। * * * একটী ছোট ছেলে তার কচি হাত আমার পিঠে বুলুচ্চে, আর বলচে চলে আয়, চলে আয়। তোরা সর, আমি যাই। ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ" মহাপুরুষজীকে দেখিয়া বলেন "শিবানন্দ দাদা এসেছ।" মহাপুরুষজী, "মহারাজ, তুমি চলে গেলে আমরা কি ক'রে থাকব। তুমি ইচ্ছে করলেই সেরে যাবে।" অভেদানন্দ স্বামীকে দেখিয়া বলিলেন "কালী ভাই এসেছিস্, আমি যাচ্চি।" তিনি বলিলেন "ভাই, তুমি থাক। তুমি ইচ্ছা কর, তা হলেই সেরে যাবে।" প্রভাতে শ্রীযুক্ত বিপিন ডাক্তার দেখিতে আসিলে বলিলেন "বিপিন দাদা, ব্রহ্ম সত্যং, জগন্মিথ্যা।" শ্যামাদাস কবিরাজ মহাশয় দেখিতে আসিলে বলিলেন "শিবই সত্য—ঔষধ মিথ্যা।" তাহার পর সকলকে বলিতে লাগিলেন "রামকৃষ্ণঃ! রামকৃষ্ণঃ! রামকৃষ্ণঃ! ভয় কি তোদের, তোরা ভগবানের নাম কর। তোরা সব তাঁর।" তিনি চলিয়া গিয়াছেন, আমাদের নিকট রাখিয়া গিয়াছেন, কেবল তাঁহার তপোপূত পবিত্র, মধুর, প্রেমময় জীবন। আকাশের চাঁদ জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া ঝিকমিক করে। মাছেরা তাহার সহিত খেলা করে, ভাবে এ বুঝি আমাদেরই একজন। তারা কি তখন বুঝিতে পারে এ চাঁদ চলিয়া যাইবে! এ চাঁদ আকাশের! জলের নয়!

সমালোচনা ও পুস্তক পরিচয়।

রোবাইয়াৎ-ওমার খৈয়াম রচিত—ইউরোপীয় ভাষায় এই পার্সি কবিতা রূপান্তরিত হওয়ার পর বর্ত্তমান যুগ ওমারকেই পারস্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। সেই রোবাইয়াৎ আজ শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক অনূদিত হইয়া বাঙ্গালীর মাতৃ-ভাষাকে অমূল্যধনে ধনী করিয়াছে। দার্শনিক-কবিতা সত্ত্বেও এরূপ সুকুমার ও সুললিত ভাষায় ইহার পদবিন্যাস হইয়াছে যে অনুবাদ না বলিয়া ইহাকে মৌলিকই বলিতে ইচ্ছা করে।

শব্দ বিশ্লেষণের দ্বারা কবির মন-বিজ্ঞান যাহা আমরা জ্ঞাত হই তাহা চারিটী ভাগে আমরা বিভক্ত করিতে পারি—(১) জগত ক্ষণিক (২) নিয়তির নির্ম্মম প্রবাহ রুদ্ধ করিবার সাধ্য কাহারও নাই (৩) যত পার আনন্দ সঞ্চয় করিয়া নিয়তির কঠোরতাকে সিক্ত কর এবং (৪) জন্মান্তরে সন্দেহ।

> "কুহক-রাণী আশার পিছে দিলটা ফিরে সর্ব্বদাই,
> স্বপ্ন কারো সত্য বা হয়, কার ভাগে বা উঠছে ছাই;
> সব ক্ষণিকের-আসল ফাঁকি—সত্য মিথ্যা কিছুই নয়—
> মরু 'পরে তুষার মত চিকমিকিয়ে পায় সে লয়।

জগতের এই ক্ষণিকত্ব উপলব্ধি করিয়া কবি আক্ষেপ করিয়াছেন,—

> কতক্ষণ বা রইব হেথা, ছুটছে আয়ু বায়ুর প্রায়
> বিদায় নিলে ফিরব না আর—অন্তহীন যে সেই বিদায়।

ভবিষ্যৎ জীবন 'আছে কি নাই' বলিয়াই এই আক্ষেপ। যা কিছু সব এই সুখ-দুঃখ বিজড়িত বর্ত্তমান জীবনে। তারপর কার কি তা কে জানে,—

> খতম যে সব এই খানেতেই বীজ না জন্মে পুনর্ব্বার,
> গোরের ভিতর যে জন সে কি, জীবন নিয়ে ফিরবে আর!

ওমর খৈয়ামের জগৎ আর বৌদ্ধদের ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদ একই। তবে শেষোক্তরা নির্ব্বাণসাগর আবিষ্কার করিয়া দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশ দেখাইয়াছেন, কিন্তু কবি নিয়তির নির্ম্মম প্রবাহ স্বীকার করিয়া,—

তিমির পথের যাত্রী মোরা দীপ্ত আশার রশ্মি কই ?
মর্ত্ত্যে হ'য়ে লক্ষ্যহারা—স্বর্গ পানে তাকিয়ে রই।
কর্ণে পশে দৈববাণী—কোথাও যে নেই আলোক্-পথ,
অন্ধ নিয়ত্ চালিয়ে বেড়ায় ভাগ্যদেবীর বিশ্বরথ !

এই জগতের দুঃখটাকে সুখের আরোকে দ্রব করিয়া লইতে বলিতেছেন,—

সেই পুরাতন দ্রাক্ষা বঁধু—মামুদশাহের মতন যেই,
দুঃখ কাফের মূর্ত্তিগুলোয় বীরের দাপে তাড়ায় সেই।
ঐন্দ্রজালিক অস্ত্রটি যার দীর্ণ করে সকল ভাণ,
আত্মারে যে করায় পুনঃ স্ব-স্বরূপে অধিষ্ঠান !
বিজ্ঞ যিনি বিজ্ঞ আছেন— তর্ক নিয়ে থাকুন ঘোর,
সৃষ্টি বিচার, তত্ত্ব কথা—ঘুচিয়ে এস সঙ্গে মোর।
একটি কোণে ব'সব দোঁহে, হট্টগোলের ঢের তফাৎ,
ভাগ্য যাহার খেলনা মোরা—কর্‌ব তারেই পাত্রসাৎ !

অতি রমণীয় উপমায় নিয়তী দেবীর নৃত্য গতির ছন্দ কবি দেখাইয়াছেন,—

ছক্‌টি আঁকা সৃজন্ ঘরের রাত্রি দিবা দুই রঙের,
নিয়ত্ দেবী খেলছে পাশা, মানুষ ঘুঁটি সব ঢঙের।
প'ড়ছে পাশা, ধর্‌ছে পুনঃ কাট্‌ছে ঘুঁটি উঠ্‌ছে ফের—
বাক্সবন্দী সব পুনরায়, সাঙ্গ হ'লে খেলার জের।

এ কথা গুলি আমাদের শাস্ত্রে যা "যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ" বলা হইয়াছে তাহারই চমৎকার উপমা। ওমর খৈয়াম বেদান্তের কেবল "সর্পত্ব" অনুভব করিয়াছেন, কিন্তু অপরোক্ষানুভূতি হীন বলিয়া "রজ্জুত্বের" নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই।

কৃষ্ণকথা।—প্রথম ভাগ—শ্রীবিশ্বেশ্বর দাস, বি-এ বিরচিত—আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। কৃষ্ণ-লীলা কবিতায় লেখা। মূল্য তিন আনা।

ব্রহ্মচর্য্য-শিক্ষা—শ্রীকালীপদ রায় প্রণীত—সমাজের বিশেষ উপকারী। মূল্য দশ আনা।

সংবাদ ও মন্তব্য

১। মাণিকগঞ্জ মহকুমার অন্তঃপাতী বেতিলা গ্রামে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। দাতব্য চিকিৎসালয় ইহার সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ হইবে। একটী অবৈতনিক কৃষক পাঠশালা স্থাপিত হইবে। তাহাতে নিকটবর্ত্তী ও দূরবর্ত্তী গ্রামের কৃষক ভাইদের ছেলেরা বিনা বেতনে শিক্ষালাভ করিতে পারিবে। বর্ত্তমানে বেতিলা উত্তর বাড়ীতে একটী বালিকা-বিদ্যালয় উপযুক্ত শিক্ষকের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। উদ্দোগের সফলতার জন্য সকলেরই সাহায্য একান্ত কর্ত্তব্য।

২। আমেরিকার বোষ্টন নগরে, বেদান্ত কেন্দ্রে স্বামী পরমানন্দ ১লা জানুয়ারী হইতে ২৬শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত কয়েকটী বক্তৃতা দিয়াছেন,—(১) আত্মার গুপ্ত শক্তি, (২) ধ্যান এবং অপরোক্ষানুভূতি, (৩) কর্ম্ম ও অদৃষ্ট, (৪) দেহ ও মনের স্বাস্থ্য সম্পাদন, (৫) আধ্যাত্মিক বিকাশে আহারের প্রয়োজনীয়তা, (৬) শান্তি বিজয়, (৭) প্রেম ও অপ্রতীকারিতার শক্তি, (৮) যোগের বাস্তব জীবনে সহায়তা এবং (৯) পর-জীবন ; এবং মার্চ্চ মাসের ২৬শে পর্য্যন্ত (১) মৌনের জনন্ শক্তি, (২) আধ্যাত্মিক হুপাশাবাদ, (৩) সৎ-চিন্তা এবং একাগ্রতা এবং ঈশ্বরীয় অনুভব—এই কয়েকটী বক্তৃতা দিবেন।

সর্ব্ব-সাধারণের জন্য প্রতি সপ্তাহে মঙ্গলবার প্রাচ্যশাস্ত্র আলোচিত হয় এবং বৃহস্পতিবার বেদান্ত কেন্দ্রের সভ্যগণকে ধর্ম্মোপদেশ করা হয়। রবিবারে সাধারণের জন্য ধ্যান, গান ও কিছু ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া হয়। স্বামীজির অনুপস্থিতিতে ভগ্নী দেবমাতা এই সকল কার্য্য পরিচালন করেন।

৩। বিবেকানন্দ-আশ্রম, কুয়ালা লুমপুর, মালয় উপদ্বীপ। শ্রীশ্রীঠাকুরের সপ্ত-অশিতীতম জন্মোৎসব হইয়া গিয়াছে। পূজা, পাঠ, দরিদ্র-নারায়ণ সেবা, কীর্ত্তন, হরিকথা প্রভৃতি কর্ম্ম যথোপযুক্ত ভাবে

হইয়াছিল। যথাবিহিত ভক্তি শ্রদ্ধার সহিত অভিনন্দন দিবার পর স্বামী অভেদানন্দ তাঁহার পাশ্চাত্য দেশের কার্য্য ও ধর্ম্মপ্রচার সম্বন্ধে এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা সুবিশাল জনসমুদ্রকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, স্বামীজি তাঁহার বক্তৃতায় অনেক শিক্ষাপ্রদ কথা বলিয়াছিলেন। সকলের মধ্যে আমাদের প্রাণে তাঁহার একটী কথা অকাট্য সত্য বলিয়া বোধ হইল। তিনি বলিয়াছেন যে, সকল দেশে, সকল প্রাচীন জাতির মধ্যেই শিক্ষিত ও উচ্চ স্তরের লোকেরা যাহাদিগকে দেশের অবনত জাতি বলিয়া মনে করে তাহাদের ভিতর বাস্তবিক সকল সময়ে, সকল দেশে, জাতির বাস্তব প্রাণ লুক্কায়িত থাকে। কোনও জাতির মূল শক্তি সেই জাতির মধ্যে যাহাদিগকে ছোট লোক, সাধারণ লোক মনে করা হয়, তাহাদের ভিতর থাকে। ভারতবর্ষ যে, আজ সকল দেশের, পৃথিবীর সকল জাতির এত পশ্চাতে, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, তাহারা সমাজের নিম্ন শ্রেণী পারিয়া, পঞ্চম, নমঃশূদ্র, রাজবংশি, কৈবর্ত্ত প্রভৃতি জাতি যাহারা দেশের জাতির মেরুদণ্ড স্বরূপ তাহাদিগকে পশু অপেক্ষা অধম বলিয়া দেখিয়া থাকে। মুষ্টিমেয় উচ্চ স্তরের লোকের দ্বারা দেশের কোনও মঙ্গল সাধন হইতে পারে না। প্রায় ৪ ভাগের তিন ভাগ লোক অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন,—মনুষ্যত্বে বঞ্চিত। স্বামী অভেদানন্দ পাশ্চাত্য দেশে ভ্রমণ ও অবস্থান করিয়া পাশ্চাত্য দেশের সামাজিক, শিক্ষা বিষয়ক ও রাজনীতি সম্বন্ধে যে সমস্ত সারগর্ভ কথা আমাদের নিকট বলিয়াছেন তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য। * * —নমঃশূদ্র-হিতৈষী

১৬। বৈদান্তিক সেবাসঙ্ঘ—জনাই—হুগলী—গত ১৮ই পৌষ সাধারণের উদ্যোগে উক্ত গ্রামে একটী অবৈতনিক নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। আপাততঃ উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে শিক্ষার মান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বিদ্যালয়টী সম্পূর্ণাঙ্গ করিতে হইলে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। ম্যাজিক লণ্ঠন চরকা, মানচিত্র, গ্লোব প্রভৃতি আসবাবের বিশেষ অভাব আছে। "সঙ্ঘ" সহৃদয় দেশবাসী ভ্রাতৃভগিনীগণের নিকট হইতে আশা করেন যে, তাঁহারা এই সদনুষ্ঠানে সাহায্য ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে বিমুখ হইবেন না।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণং

জগৎ-পাবন শ্রীশ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণদেবের পরমপ্রিয় মানসপুত্র

শ্রীব্রহ্মানন্দ স্বামিজী মহারাজের স্মরণার্থ

(১)

গান।

ইমন কল্যাণ—চৌতাল।

নমো নমো নমো শ্রীরামকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম সর্ব্ব পাতক নাশন।
সারদেশ্বরী পরমেশ্বরী ব্রহ্মশক্তি তুমি চরণে প্রণাম।
নমো ব্রহ্মশক্তি-মানস-পুত্র লোকোত্তর উদার চরিত্র
নমো ব্রহ্মানন্দ অতি পবিত্র শ্রীরামকৃষ্ণ মানস-রঞ্জন।
বিষয়ানন্দ জানি অসার "ব্রহ্মবেদান্ত" করিলে সার।
ব্রহ্মানন্দ করিতে প্রচার ব্রহ্মানন্দময় দেহধারণ।
লহ প্রণাম লহ প্রণাম ভক্তবৎসল করুণাধাম
রামকৃষ্ণপদে রহে যেন মন এই আশীর্ব্বাদ কর প্রদান।

কেদারা—চৌতাল।

ভজ রে মন ব্রহ্মানন্দ রামকৃষ্ণ-মানস-রঞ্জন।
ব্রহ্মবিৎ-অগ্রগণ্য ব্রহ্মানন্দে সদা মগন॥
ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ-দীপ্ত নয়ন ঝরিছে ব্রহ্মজ্যোতির কিরণ
আলোকরাশি আঁধারনাশি করিছ হৃদয়ে পুলক প্রদান।

ব্রহ্মানন্দ শ্রীবিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ ভুজদ্বন্দ্ব
বরাভয়ময় ভুজদ্বন্দ্ব করে বরাভয় বিশ্বে প্রদান।
অদ্ভুতানন্দ রামকৃষ্ণানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ পদদ্বন্দ্ব
ভক্ত যোগানন্দ প্রেমানন্দ ত্রিগুণাতীতাদি নিরঞ্জন।
সনাতনধর্ম্ম-রক্ষাকারণ রামকৃষ্ণসনে ধরাবতীর্ণ
স্বগণ-সহিত-পরব্রহ্ম করিলেন শরীর ধারণ।
ব্রহ্মানন্দ গণাধিপতি রামকৃষ্ণ-ভক্তগণ-ভূপতি
পরম দয়ালু ভকত প্রতি কর তাঁর গুণাসুকীর্ত্তন॥

পাশিবাগান রামকৃষ্ণ সমিতি।

(২)

আসিছে প্রভাত ; উষার কনকরেখা, যায়নি মিলায়ে,
তখনো গগন বুকে ; লাজরক্ত মুখে, পড়িছে ঢলিয়ে
শাখিগুলি পরস্পর গায় ; মৃদুমন্দ শান্ত সমীরণ
পুষ্প গুচ্ছ হতে কাড়ি গন্ধ, দূরান্তরে করে বিতরণ॥
গায় পাখী বসিয়ে কুলায় নিভৃত-আলাপ ; সব তাপ-
মুক্ত ধরা আজি, হইয়াছে নিরমল উজল নিষ্পাপ॥
বয়ে যায় পূত গঙ্গা, ব্রহ্মবারিধারা, ত্রিপথগামিনী।
অগতির একমাত্র গতি, সর্ব্বংসহা, ত্রিতাপনাশিনী॥
ফেনপুঞ্জ মাথে লয়ে, ঢেউগুলি উঠে নাচে ভেঙ্গে পড়ে।
চলেছে অভয়প্রদা, গাহিয়া সঙ্গীত হর হর স্বরে॥
একটী গম্ভীরভাব, নিখিল ব্যাপিয়া, রহে স্থির হয়ে।
যেন কার প্রতীক্ষায়, ধেয়ানে মগন—আছে পথ চেয়ে।
সহসা গঙ্গার বুকে, উঠিল ফুটিয়া একটী কমল,
সুবৃহৎ চারুতনু মন্দ সমীরণে করে ঢল ঢল॥
দুইটী কিশোর মরি, অরবিন্দ 'পরে, নৃত্যপরায়ণ।
রূপ শোভা অতীব মধুর, কেড়ে লয় সব প্রাণ মন।

শ্রীচরণ বেষ্টিত নূপুরে, নাচিতেছে ঝুম্ ঝুম্ ঝুমি ।
নাচিতেছে পদ্ম গঙ্গা'পরে, গঙ্গানীর বারে বারে চুমি ।
পীত ধড়া কটি পরে' বেড়া, চারুকরে সুচারু বাঁশরী ।
গলে দোলে গুঞ্জাফুলমালা, সারা অঙ্গে খেলিছে মাধুরী ॥
শিখি পাখা শিরে সুশোভন, কেরে তোরা চিত্তবিনোদন ।
এল কি "কমলকৃষ্ণ" সাথে' প্রিয় সখা, তারিতে ভুবন ?
সমস্ত প্রকৃতি হেরি, উঠিল শিহরি, হাসিল মধুরে
হৃদয়ের সার ধনে, গোপন-হৃদয়ে রাখিল আদরে ।
কাঁপাইয়া চরাচর, সুগম্ভীর স্বর, ডাকে, "আয় আয়—
আয়রে হৃদয় সখা, কতকাল আছি. তব প্রতীক্ষায়
যুগ যুগান্তর ধ'রে, জীবের ব্যথায়, কাঁদিতেছে মন
এস সহকারী মম, করমের ভার, করিতে গ্রহণ ।
এস শুদ্ধ-সত্ত্ব এস, আদরে আমার "ব্রজের রাখাল"
দাও ছাড়ি সখারে বারেক, দাও ছাড়ি. কমল- গোপাল'
সহসা লুকাল পদ্ম, কোথা গেল মিশে—সুগোল কিশোর ।
প্রভাতী সানাই বাজে, মন্দির ভবনে—হ'লো নিশা ভোর

তরুণ রাখাল: রামকৃষ্ণদেবচক্ষে বাল নারায়ণ
মানসনন্দনরূপে, দিয়েছে পাঠায়ে, অমূল্যর ধন-
মহামায়া দয়াময়ী ; তাই প্রিয়তম মানস তনয়ে.
ক্ষীর সর নবনী খাওয়ায়ে, তৃপ্তি নাহি আসিছে হৃদয়ে ।
মুখ-শশী বারে বারে করি নিরীক্ষণ, পিয়াসা না যায় ।
কতবার শোণা কথা, তবুও শ্রবণ শুনিতে যে চায়
কভু কাঁধে, কখন বুকেতে, ধরি তারে আদরের খেলা ।
ক্ষুদ্র জীব বুঝিতে কি পারে, এই ভাব. এই মহালীলা ?
অসম বয়স, তবু তারা দু'টি শিশু. তবু তারা এক ।
ভূমণ্ডলে এ খেলা নবীন, অপূর্ব্ব এ, দেখ সবে দেখ ।

আবার নিশীথ কালে, সমাধি মন্দিরে, স্থির দুই জন।
নাহি আর ছেলে-খেলা, নাহি অন্য ভাব, অনন্তে মগন॥
দেবতার পরশনে, জাগিছে চেতনা—কুলকুণ্ডলিনী।
ধায় ষড়্চক্রভেদি, বিচিত্র-গমনা, ব্রহ্মস্বরূপিণী॥
কত রূপ, কত লোক—তৃতীয় নয়ন, করে দরশন।
কভু ব্রহ্ম জলধিতে, মীনরূপী মন, হয় নিমগন॥
আবার পরশ মাত্র, ফিরে আসে ত্বরা, শ্রীগুরু-চরণে।
বেদবেদান্তের কথা, হয় অনুভব, আচার্য্য-বচনে॥
মরতের, অতিক্ষুদ্র তুচ্ছ জীব মোরা বুঝিতে কি পারি!
কর আশীর্ব্বাদ, যেন বিশ্বাস-নয়নে সতত নেহারি—
এই কম ছবিখানি; গোপনে গোপনে মরমের কোণে—
আঁকি যেন, হেরি যেন প্রভু, নিশিদিন শয়নে স্বপনে॥

রামকৃষ্ণ, হৃদয়ের ধন, চ'লে গেলে দিঠির বাহিরে
আত্মহারা ভক্তগণ, ভাসিল সহসা শোকের সাগরে।
মাতা, পিতা, ভ্রাতা, সখা, গুরু, এক সঙ্গে হারায়ে রাখাল।
শূন্যময় হেরিল ভুবন, হয়ে গেল, পথের কাঙাল॥
গেল সুখ শান্তি, দারুণ বৈরাগ্যানল উঠিল জ্বলিয়া।
মুছে দিল সর্ব্বভোগ আশা, বাসনারি বিবেকে রঙিয়া॥
পড়ে র'ল প্রাসাদ ভবন, পিতার অনন্ত স্নেহরাশি।
প্রিয়ার হৃদয়ভরা প্রেম, সন্তানের মৃদুমন্দ হাসি॥
ছিন্নবাসে কটিতট ঘেরি, চলিয়াছে কঠোর সন্ন্যাসী।
চলিয়াছে আত্ম অন্বেষণে নির্ব্বাসনা ব্রহ্ম অভিলাষী॥
পবিত্র এ ছবিখানি, ভারত জননী, যুগ যুগান্তরে—
আদর্শ দেখাতে ভবে মাঝে মাঝে তাই লোক চক্ষে ধরে।
একবার এঁকেছিল চারুশিল্পকরা শুদ্ধোধন গেহে—
এখনও অদ্ধপৃথ্বী অশ্রুপূর্ণনয়নে তার পানে চেয়ে,

কাটাইয়া দেয় দিন। রাজার তনয়, মনোরমা রাণী,
সুকুমার শিশু, চলে গেল ত্যাগীশ্বর সব তুচ্ছ মানি।
আবার গঙ্গার কূলে, শচীমার নয়ন অঞ্জন
বিষ্ণুপ্রিয়া কণ্ঠহার, নদীয়ার হৃদয় রতন
করিবারে ভূমণ্ডলে, অপরূপ আদর্শ স্থাপন
নিঠুর নির্ম্মম সম, ছেড়ে গেল সাধের ভবন।

কভু গঙ্গাতটবাসী, কভু ধায় তীর্থ হতে তীর্থান্তরে
হারায়ে হৃদয় মণি, পাগল বিরহী, খুঁজে খুঁজে ফেরে।
কভু বৃন্দাবনে, বৃন্দাবনচন্দ্রপাশে, কুসুম সায়রে—
তপোমগ্ন মহাযোগী, নিমীলিত আঁখি—উচ্চ ধ্যানঘোরে
দিন চলে যায়, রাতি আসে, বাহ্য শূন্য—জানেনা সন্ন্যাসী।
জ্যোতির্ম্ময় সমাধি সাগরে, ডুবে যায়, কভু ওঠে ভাসি॥
মাস যায়, বর্ষ যায়, আশা নাহি মিটে, পায় তত চায়।
কে জানে পাবার কোথা শেষ, কোন্ দেশে কোন্ সীমানায়!

প্রাণের নরেন ভাই, পাশ্চাত্য বিজয়ী ফিরিল স্বদেশে।
ভারতে পড়িল সাড়া, বরেণ্য মহানে, পূজিল হরষে॥
ভারতের দুঃখ হেরি, উদার সন্ন্যাসী, বিগলিত প্রাণ।
সিক্ত চোখে, তার হিত তরে, কায়মনবাক্য দিল দান॥
ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হোতা, ব্রহ্মানন্দস্বামী, সমাধি সাগরে।
সাধিতে জীবন-ব্রত, প্রাণের দোসরে, ডাকিল সাদরে॥
"রামকৃষ্ণ আসে নাই, আত্ম সুখস্রোতে, ডুবাতে আপনে।
আপনায় তুচ্ছকরি, বিলাইয়া দিতে, বিশ্ব-নারায়ণে
তার বড় সাধ; তাতে যদি যেতে হয় নরক দুয়ারে,
ব্রহ্মানন্দ তুচ্ছ করি, যাব কোটীবার, সানন্দ অন্তরে॥"
সে মহা আহ্বান কে পারে হেলিতে বল, ব্রহ্মানন্দ ছাড়ি,
ছুটে এল ব্রহ্মানন্দ স্বামী, পার্শ্বদেশে দাঁড়াইল তারি॥

ত্রিংশ বর্ষকাল, সঁপি দিয়ে, আপনারে নর-নারায়ণে,
মহাপূজা সাঙ্গ করি, চলেছে পূজারী, প্রভু সম্মিলনে।
চারিদিকে বসি শিষ্যগণ, নয়নেতে ঝরিতেছে নীর।
হৃদয়ের মহারাজে ছাড়িবে কেমনে, হৃদয় অধীর॥
একটী গম্ভীর ভাব, রয়েছে ব্যাপিয়া, সুপ্রশস্ত গেহে—
একটী কম্পন যেন, সঞ্চারি চলেছে, প্রতি দেহে দেহে॥
মধ্য রাত্রি কাল, আকাশে উদিত চাঁদ, পরিপূর্ণ কায়ে।
কুসুম সুবাস, বহিয়া বহিয়া যায়, মৃদুমন্দ বায়ে॥
সহসা আচার্য্যবর, মধুকণ্ঠস্বরে, ডাকি ভক্তগণে,
অভিষিক্ত করিলেন সবে, আশীর্ব্বাদ সুধার সিঞ্চনে,
"ভয় নাই, ভয় নাই, তোরা আপনার, হৃদয়ের তোরা,
রামকৃষ্ণ সুধানীরে, হৃদিকুম্ভগুলি, পূর্ণ করি পোরা
যে তোদের। ফকিরের চিরসাথী তোরা, আশীর্ব্বাদে মোর,
দেখিবি আলোক লোক, কেটে যাবে ভয়, অন্ধকার ঘোর॥"
সহসা শ্রীমুখকান্তি, হইল উজ্জল, অতি নিরমল,
ঘুচে গেছে রোগ চিহ্ন, পদ্ম আঁখি দুটী, প্রেমে ঢল ঢল॥
"ওই কৃষ্ণ! ওই কৃষ্ণ! জীবন আমার, আহা মরি মরি!
নবদুর্ব্বাদলশ্যাম, পীতবাস পরা, অপূর্ব্ব মাধুরী।
কমল উপরে আহা, কমল-কিশোর, এস সখা মোর,
তোমা অন্বেষণ করি, খুঁজেছি সদাই, এ জীবন ভোর।
দেখ্ দেখ্ ওরে অন্ধ, দেখ্ রে আমার, হৃদয় রতন॥
যাই যাই, যাই তব পাশে, এস কাছে, চিত-বিনোদন।
এ নহে 'কষ্টের কৃষ্ণ' এ যে গোপীকার, এ যেরে আমার
যাই যাই, আরো কাছে এস, প্রাণসখা জীবনের সার॥
নূপুর পরায়ে দেরে, ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্, নেচে চলে যাই,
অপেক্ষিছে প্রিয়তম মম, অপেক্ষিছে প্রাণের কানাই॥
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! রামকৃষ্ণ! রামকৃষ্ণ মম, হৃদয়ের ধন,
রামকৃষ্ণ বিনা কিছু নাই, রামকৃষ্ণ দেহ বুদ্ধি মন॥

ওই যেরে বাবুরাম, ঐ যে যোগীন, বিবেক কোথায় ?
ওই যে বিবেকানন্দ, বিবেক' আমার, আয় কাছে আয়॥
ব্রহ্মসত্য, এ জগৎ মিছে, দুদিনের যেন ছায়াবাজী,
এই ছিল, এই কোথা গেল—অভিনয় করে যেন সাজি॥
সহ্য কর, যত দুঃখ আসে প্রতিকার চেষ্টা নাহি করি।
চিন্তা নাহি করিও বারেক, দাও সব দূরে পরিহরি
'ব্রহ্ম সত্য' 'ব্রহ্ম সত্য' সার, এ জগৎ তুচ্ছ কিছু নয়
মন প্রাণ সব সঁপ তাঁহে, ঘুচে যাবে সকল সংশয়
বিশ্বাসের বটপত্রে বাহি ভেসে যাই ব্রহ্মসুধাম্বুধে
কি উজল ! কিবা মধুময় ! মহাভাব জাগিতেছে হৃদে"

শ্রী—

(৩)

মহারাজ ইহধাম ছাড়িয়া গিয়াছেন, কিন্তু মনেত হয় না তিনি আর আমাদের সহিত নাই—মনে হয় বুঝি তিনি পূর্ব্ববৎই তাঁহার এই পার্থিব লীলারঙ্গমঞ্চের কোন এক দেশে অবস্থান করিতেছেন। কিন্তু চক্ষু যে বলে, কই' সে দেবতনু ত দেখিতেছি না ! কর্ণ বলে, কই সে করুণাময়ী বাণী ত আর শুনিতেছি না ! আবার মন বলে, আছে। আমারই গভীরতম প্রদেশে অতীতের পুণ্য স্মৃতির মন্দিরে, সে গোপন দেবতা সকলের আড়ালে হাস্যকৌতুক রসের মধ্য দিয়া এক মধুর ধর্ম্মরাজ্য বিস্তার করিয়া স্বীয় দেবতার সহিত প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছেন। তাই আমাদের বিচ্ছেদের দীর্ঘ নিশ্বাস সেই মানস মন্দির দ্বারে আঘাত দিয়া অহরহঃ তাঁহার করুণার সাড়াই আনিয়া দিতেছে। তাঁহার সেই তপোপূতঃ করুণাঘন মূর্ত্তি আজ আমাদের ইন্দ্রিয়ের বাহ্য গতি রুদ্ধ করিয়া অন্তর রাজ্যেই টানিয়া আনিতেছে।
শ্রীকৃষ্ণবিরহে শুক বলিয়াছিলেন,—

স্বমূর্ত্ত্যা লোক লাবণ্য নিম্মুক্ত্যা লোচনং নৃণাম।
গীর্ভিস্তাঃ স্মরতাং চিত্তং পদৈস্তানীক্ষতাং ক্রিয়াঃ

আচ্ছিন্ন কীর্ত্তিং সুশ্লোকাং বিতত্য হ্যঙ্গসানুকৈ ।
তমোঽনয়া তরিষ্যন্তীত্যগাৎ স্বং পদমীশ্বরঃ

আমরা বলি, মহারাজ নিজ করুণাঘন মূর্ত্তির দ্বারা সকল লোক-লাবণ্য হরণ করিয়া গিয়াছেন, ভয়সামগ্রী বাণীর দ্বারা অতিবড় দুর্ব্বলকেও আশান্বিত করিয়া গিয়াছেন, পবিত্র কীর্ত্তির দ্বারা মুক্তির পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

গুরুশিষ্যের মধ্যে যে একটা গম্ভীর সম্বন্ধ থাকে—যাহা ভীতি মিশ্রিত—সে সম্বন্ধ তাঁহার শিষ্য-সন্তানের মধ্যে ছিল না। তাঁহার ও আমাদের মধ্যে ছিল প্রেমের সম্বন্ধ—যাহা সকল ব্যবধান দূর করিয়া তাঁহাকে আমাদের অতি নিকটতম প্রিয়তম হিতকারী বন্ধুরূপে প্রতীয়মান করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু যখন তাঁহার অন্তিমের মহাসমাধি দর্শন করিলাম—তাঁহার অজ্ঞাত, শ্রীশ্রীঠাকুরের তাঁহার সম্বন্ধে অনুভূতি সকল যখন তিনি স্বীয় মুখে প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখন অর্জ্জুনের ভগবৎ সম্বন্ধীয় উক্তি মনে পড়িতে লাগিল,—

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি ।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি

আমরা বলি হে "কমল-কৃষ্ণ-সখা"! অনুভূতি হীন আমরা, তোমার মহত্ব কি করিয়া বুঝিব। তুমি যে নানা হাস্য-রস-কৌতুকের মধ্যদিয়া আমাদের হৃদয় শ্রীরামকৃষ্ণ রাজ্যে পরিণত করিতে চাহিয়াছ, তাহা বুঝিতে না পারিয়া কেবল হাস্যরসেই আমরা মগ্ন হইয়াছি—নানা আধ্যাত্মিকতার ভাবে আমাদের হৃদয় পূর্ণ করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও তাহা আমরা উপেক্ষা করিয়াছি ;

ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্ ।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা ॥

প্রভৃতি শাস্ত্রবাক্য জানা সত্ত্বেও—তুমি যে হীন, দীন, নীচ দুর্ব্বলের প্রতি প্রেমসম্পন্ন হইয়া বিধিনিষেধ ভঙ্গ করিয়াছ—তোমার

এই দুর্নির্ণেয় গতি বুঝিতে অসমর্থ আমরা যে সাধারণ সিদ্ধ পুরুষের মাপ কাটিতে তোমাকে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি তজ্জন্য, হে শ্রীরামকৃষ্ণ মানস-পুত্র, আমাদিগকে ক্ষমা কর। কেন যে শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা দেবী তোমাকে অতি শুদ্ধসত্ত্ব প্রিয়তম পুত্র বলিতেন, কেন স্বামীজি বলিতেন 'আধ্যাত্মিকতা হিসাবে রাখাল আমাদের চাইতে ঢের বড়' কেন শিবানন্দ, সারদানন্দ প্রভৃতি সিদ্ধ মহাপুরুষেরা তদ্গত চিত্তে তোমার নিকট উপস্থিত হইতেন, কেন আজ তোমার বিরহে এই বিরাট-জন-সমুদ্র উদ্বেলিত—তাহা আমরা কি করিয়া বুঝিব? মহৎরাই মহৎকে বুঝেন—আমরা যে হীন, প্রেমিকেরাই প্রেমময়কে বুঝেন—আমরা যে পাষণ্ড, ক্ষমাশীলেরাই তোমার করুণা উপলব্ধি করিয়াছেন—আমাদের যে তিতিক্ষা নাই, বিতরাগেরাই তোমার ত্যাগ বুঝিয়াছেন—স্বার্থপর আমরা কি করিয়া তোমাকে বুঝিব, জানিব। তাই আজ শ্রীকৃষ্ণ-বিরহী উদ্ধবের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া বলিতে ইচ্ছা করিতেছে—

দুর্ভগো বত লোকঽয়ং যদবো নিতরামপি।
যে সংবসন্তো ন বিদুর্হরিং মীনা ইবোড়ুপং

দুর্ভাগা আমরা ঈশ্বর পার্ষদের পার্শ্বচর হইয়াও তাঁহাকে বুঝিতে পারি নাই, নিজেদের সর্ব্বস্ব তাঁহার চরণে বিকাইতে পারি নাই। আকাশের চাঁদ জলে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল, মৎস্যকুল তাহার সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে ভাবিয়াছিল এ বুঝি আমাদেরই মতন একজন, তাহারা ভাবে নাই, বুঝে নাই যে, এ চাঁদ তাহাদের সলিল-ভবন অন্ধকার করিয়া চলিয়া যাইবে, এ চাঁদ আকাশের—জলের নয়।

* * * * *

রুদ্রানুচর বিবেকানন্দ আসিলেন ত্যাগের ভৈরববিষাণ নিনাদে নিদ্রিত জগৎবাসীকে উঠাইতে, জাগ্রত করিতে; ত্রয়ীর ত্রিশূলে জগতের সকল পাষণ্ড, নাস্তিক, জড়বাদীর দুর্গ ধ্বংস করিয়া ব্যবধানহীন সমন্বয় রাজ্য প্রতিষ্ঠানের আয়োজন করিতে। পাপপ্রাসাদের ভিত্তি ধ্বংস হইল, ধীরে ধীরে সে প্রাসাদও জীর্ণ হইয়া খসিয়া পড়িতে লাগিল, কিন্তু গঠন করিবে কে? তাই শ্রীভগবান তাঁহার নবযুগধর্ম্ম প্রতিষ্ঠানের জন্য আনিয়া-

ছিলেন বিষ্ণু-সখা রাখালকে। রুদ্রতেজে বিশ্বের সকল পাপতাপ জ্বলিয়া পুড়িয়া ভস্ম হয়—কিন্তু ধর্ম্ম রাজ্য প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি গঠনের জন্য প্রয়োজন—শান্ত-মধুর শুদ্ধ-সত্ব শক্তি—যে শক্তি নিজকে বিকাশ দিয়াছিল শ্রীশ্রীমহারাজের মধ্য দিয়া। এই জীবন্ত শক্তিকে কেন্দ্র করিয়া যে ক্ষুদ্র-চক্র বরাহনগরে ক্রীড়া আরম্ভ করিয়াছিল—ধীরে সেই লীলায়িত শক্তি কেন্দ্র হইতে ঘন ঘন ভাবোচ্ছ্বাস বিপুল বেগে বৃহৎ হইতে বৃহত্তর পরিধির সৃষ্টি করিয়া আজ জগৎকে ব্যাপ্ত করিতে চাহিতেছে। মনে হয়, সেই শান্ত মধুর সত্ত্বঘন স্থূলমূর্ত্তি লোক চক্ষু হইতে নিজেকে তিরোধান করিয়াছে বলিয়া যে বোধ হইতেছে সে কেবল সঞ্জাত সম্মুখস্থ বিরাট তরঙ্গের ব্যবধান হেতু। কিন্তু এখনও সেই গঠন-শক্তি 'আত্মনঃ মোক্ষায় জগদ্ধিতায় চ' সাঙ্ঘাঙ্গ মধ্যে সূক্ষ্মাকারে ব্যাপ্ত থাকিয়া আরও অধিক নিজেকে প্রকট করিবে। কি করিয়া তিনি এই রামকৃষ্ণসঙ্ঘকে ধীরে ধীরে এত বড় বিরাট আকার ধারণ করাইলেন এবং কি করিয়াই বা সকল মঠ, সেবাশ্রম, বিদ্যালয়গুলিকে বেলুড় মঠে কেন্দ্রীভূত করিয়া রাখিয়াছিলেন—ভাবিতে গেলে হৃদয়ে যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দ উপস্থিত হয়। স্বামীজি অতি দুঃখে বলিয়াছিলেন, 'এই যে কয়েকটী বাঙ্গালী আমরা একত্রে বসবাস করিতেছি, আর কিছু না হউক, ইহাই একটী জগতের অদ্ভুত ঘটনা'। এত বড় পরশ্রীকাতর দাসবৃত্তি জাতির সন্তানেরা, এই বৃহৎ সঙ্ঘের মধ্যে একতাসূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে—ইহা কি বাস্তবিকই বিস্ময়ের বিষয় নয়? পরন্তু এই একতা জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কি ভরসা ও আনন্দ আনিয়া দেয় না? কিন্তু কোন্ চরিত্রবলে তিনি এই একতার কেন্দ্রস্বরূপ হইয়াছিলেন তাহা এই দাস জাতির যথেষ্ট ভাবিবার বিষয়। তিনি কখনও কোন সঙ্ঘ-সভ্যের ব্যক্তিগত ছোটখাট ব্যাপারে মন্তব্য প্রকাশ করিতেন না পরন্তু কেহ দোষ করিয়া থাকিলে তাহা বন্ধুর ন্যায় অতি গোপনে সংশোধন করিয়া দিতেন। তিনি কর্ম্মীর কর্ম্মে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দান করিতেন, নিজের মত তাহার ঘাড়ে বলপূর্ব্বক চাপাইয়া, তাহার উপায় ও উদ্দেশ্যে গোল বাধাইয়া দিতেন না, পরন্তু প্রয়োজন হইলে কেবল সাহায্যই করিতেন।

তমোগুণ মানুষকে জড় করিয়া দেয়। রজোগুণের দাপটে বিশ্ব কম্পিত হয়, সে বলপূর্ব্বক অপরকে নিজের মতে আনে, পৈশাশক্তির দ্বারা নিজ কার্য্য সিদ্ধ করিয়া লয়। সত্ত্বগুণ পবিত্র ও মধুর। করুণা ও প্রীতি তাহার সিদ্ধির উপায়। তাহার গতি নীরব, ধীর ও অপ্রতিহত। শিশিরবিন্দু যেমন ধীরে গোলাপ কোরকের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সকলের অজ্ঞাতসারে তাহাকে প্রস্ফুটিত করে—সলিল যেমন সকল বাধাবিপত্তিকে তুচ্ছ করিয়া ধীর অথচ অপ্রতিহত গতিতে তাহার গন্তব্য স্থানে পৌছে—সত্ত্বগুণের গতি ঠিক সেইরূপ। সত্ত্বগুণ যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে না কিন্তু যুদ্ধের পরিচালনকারী ধর্ম্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, বিচারে পরাস্ত করে না, কিন্তু হৃদয়কে অধিকার করে, দুরন্তকে নাশ করে না শান্ত করিয়া লয়, গড়াই তাহার কার্য্য—ভাঙ্গা নয়। যেখানে এই শক্তির বিকাশ—তাঁহারই দ্বারা পুরাতনের জীর্ণ অপসারণ করিয়া নূতনের গঠন সম্ভব। মহারাজ ছিলেন এই শক্তির আধার। তিনি সত্ত্বগুণাবলম্বীকে ধ্যানের দ্বারা, রজোগুণাবলম্বীকে কর্ম্মের দ্বারা, তমোগুণাবলম্বীকে ভোগের দ্বারা উত্তরোত্তর প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন। কাহাকেও কদাপি প্রত্যাখ্যান করেন নাই। বদ্ধের নিকট তিনি অতি বড় বদ্ধের ন্যায় মুক্ত হইবার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেন—মুমুক্ষুর সহিত নির্ম্মম ভাবে "নেতি" মার্গ অবলম্বন করিতেন—বিলাসীর নিকট তিনি ছিলেন মহা হাস্যামোদী।

> ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
> জোষয়েৎ সর্ব্ব কর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥

তিনি দৃষ্টিমাত্রেই অধিকারী বুঝিতে পারিতেন—তাই কখনও তিনি বড় বড় কথার দ্বারা কাহারও বুদ্ধির ভেদ উপস্থিত করিতেন না। তিনি আত্মযুক্ত হইয়া সাধারণের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। শাস্ত্রেও জ্ঞানীর এরূপ ব্যবহার প্রদর্শিত হইয়াছে,—

> বুধো বালকবৎ ক্রীড়েৎ কুশলো জড়বচ্চরেৎ।
> বদেদুন্মত্তবদ্বিদ্বান্ গোচর্য্যাং নৈগমশ্চরেৎ॥

ব্রহ্মজ্ঞেরা লোক সংগ্রহের জন্য প্রাজ্ঞ হইয়াও বালকবৎ ক্রীড়া করেন।

কর্ম্মকুশল হইয়াও জড়বৎ বিচরণ করেন, বিদ্বান হইয়াও উন্মত্তবৎ প্রলাপ বকেন, বেদবিৎ হইয়াও গোচর্য্যা করিয়া থাকেন।

মৃত্যু কিন্তু মানুষের যথার্থ স্বরূপ প্রকট করিয়া দেয়। জুয়াচোরের জুয়াচুরি ধরা পড়ে এই সন্ধিক্ষণে। টিয়াপাখী সারাজীবন রাধাকৃষ্ণ বলিয়া আসে কিন্তু যখন বিড়ালে ধরে, তখন টাঁ, টাঁ করে। তাই মহারাজের আজীবন ভাগবতানুধ্যানের পরিচয় পাই ইহ-লীলা অবসানের অন্তিম সময়ে। যখন ডাক্তার শ্রীযুক্ত দুর্গাপদ ঘোষ মহাসমাধির কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করেন "মহারাজ, আপনার কি কষ্ট হচ্চে"? তিনি উত্তরে বলেন,

"সহনং সর্ব্বদুঃখানাম প্রতীকারপূর্ব্বকম্।
চিন্তাবিলাপরহিতং সা তিতিক্ষা নিগদ্যতে॥

আমার অবস্থা এখন এইরূপ, তোমরা এইটীর ধারণা কর।" তিন দিন ধরিয়া তিনি অলৌকিক ভাগবতী মূর্ত্তি উপলব্ধি সম্বন্ধীয় বাক্য ছাড়া অপর কিছুই বলেন নাই। এবং সেই সকল প্রসঙ্গে সকলকে আশা ও ভরসার বাণী তথা—

যং ব্রহ্ম বেদান্তবিদো বদন্তি, পরং প্রধানং পুরুষং তথান্যে।
বিশ্বোদ্‌গতেঃ কারণমীশ্বরং বা তস্মৈ নমঃ বিঘ্নবিনাশনায়॥

ওঁ পরব্রহ্মণে নমঃ! ওঁ পরমাত্মনে নমঃ! রামকৃষ্ণঃ, রামকৃষ্ণঃ রামকৃষ্ণঃ প্রভৃতি ভগবন্নামানুকীর্ত্তন ছাড়া অপর শব্দের ব্যবহার মাত্র করেন নাই।

• অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রযাতি সমদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥
যং যং বাপি স্মরণ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥
প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্।

এই ভগবতাঙ্গীকার আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রবুদ্ধ করুক।

শ্রীধ্রুব।

(৪)

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো নচান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥

*   *   *

মনোজ্ঞং সুজ্ঞানং মুনিজন-নিধানং ধ্রুবপদং
সদা তং গোবিন্দং পরমসুখকন্দং ভজত রে॥
ধিয়া ধীরৈর্ধ্যেয়ং শ্রবণপুটপেয়ং যতিবরৈ-
র্মহাবাক্যৈর্জ্ঞেয়ং ত্রিভুবন-বিধেয়ং বিধিপরম্।
মনোমানামেয়ং সপদি হৃদি নেয়ং নবতনুং
সদা তং গোবিন্দং পরমসুখকন্দং ভজত রে॥

*   *   *

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব, ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব॥

চৈত্রপূর্ণিমার উদ্দীপ্ত মধ্যাহ্নে পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর পশ্চিমকূলে নবযুগের ভাবশ্রীক্ষেত্র বেলুড়মঠের পুণ্যাঙ্গনে সজলনেত্রে, দগ্ধহৃদয়ে গুরুভ্রাতৃবৃন্দ ও ভক্তশিষ্যমণ্ডলী তাঁহাদের বড় আদরের হৃদয়ের রাজা, জীবনের জীবন, অমূল্য রতন, পরমারাধ্য শ্রীমন্মহারাজের শিব-শরীর স্রক্-চন্দন-চর্চ্চিত, ক্ষৌমবস্ত্র-বিভূষিত করিয়া পবিত্র চিতাগ্নিতে আহুতি দিয়াছেন। তটিনীতটে পার্শ্বস্থ একপার্শে নির্ব্বাক-নিস্পন্দভাবে ভাঙ্গাবুক লইয়া দাঁড়াইয়াছিলাম, আর নির্নিমেষনয়নে দেখিতেছিলাম—আমাদের সবাকার রুদ্ধক্রন্দন ও বদ্ধব্যথা স্বয়ং প্রকৃতি আপনার সর্ব্ব-অঙ্গে প্রকট করিয়া রহিয়াছেন! সে শোকদৃশ্য দেখিয়া তপন তাঁহার প্রখররশ্মি হারাইয়া ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিলেন, পবন তাঁহার অবিরাম ক্রন্দনরোলে আমাদের সকলের অন্তরের শূন্যতা ক্রমশঃ বাড়াইয়া তুলিলেন, জননী-জাহ্নবী অশ্রুজলকল্লোলে উচ্চগ্রামে মাতৃ-হৃদয়ের অসহ্য জ্বালা জানাইয়া উথলিয়া উঠিলেন—আর দূরবনাগত ঘুঘুর করুণ ক্রন্দন-রব মূকপ্রাণীকুলের গভীর বেদনা ও সস্নেহ সহানুভূতি সূচিত

করিল। বোধ হইল—যেন সকলই নিরর্থক, নিরানন্দ ও নৈরাশ্যময়! আচার্য্য ধরাধাম ত্যাগ করিয়া চলিলেন—আর কে অমিয়মাখা সান্ত্বনা বাক্যে, প্রেমের অভয়বাণী শুনাইয়া বিপদে প্রফুল্লতা, কর্ত্তব্যে একাগ্রতা, দৈন্যে আত্মবিশ্বাস, স্খলনে ক্ষমা, চাঞ্চল্যে শান্তি দিবেন?

দ্বিপ্রহরের নিস্তব্ধগগনবক্ষ চিরিয়া মাঝে মাঝে 'রামকৃষ্ণায় স্বাহা! রামকৃষ্ণায় স্বাহা! রামকৃষ্ণায় স্বাহা!' রব ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। আর কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়, হতভাগ্য আমরা—চোখের সম্মুখে পলকে পলকে আচার্য্যের স্থূলদেহের ভস্ম-পরিণতি দেখিতে লাগিলাম!

শ্রীগুরুসকাশে নিত্যধামে প্রয়াণের দুই দিবস পূর্ব্বে কি এক অভূতপূর্ব্ব-অপরূপ ভাবমূহূর্ত্তে স্বামী ব্রহ্মানন্দ বিদায়-বেলায় নিজ জীবনের—গুহ্য মর্ম্মকথা জ্ঞাপন করিয়া গেলেন—"রামকৃষ্ণের 'কৃষ্ণ'টি চাই! ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ * * কৃষ্ণ এসেছ? আমাদের এ কৃষ্ণ আলাদা—এ গোপের কৃষ্ণ, কমলে-কৃষ্ণ, এ কষ্টের কৃষ্ণ নয়।"

কুরুক্ষেত্রের পার্থসারথিই যে নববেশে নবযুগে দক্ষিণেশ্বরের প্রেমিক-পূজারী ব্রাহ্মণেরবেশে যুগাবতাররূপে মানবমণ্ডলীকে মুক্তি ও ত্রাণের পথ দেখাইতে নূতন লীলার জন্য আবির্ভূত! সর্ব্বজ্ঞ, ত্রিকালদর্শী, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের এক-দিবসের ভাবাবেশে এক দিব্যদর্শনের অপ্রকাশিত কথা আজ প্রকাশ করিবার সময় আসিয়াছে। শ্রীশ্রীরাখালের প্রথম মিলনের অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি গঙ্গাবক্ষে একটী প্রস্ফুটিত পদ্মের ভিতর বালগোপাল শ্রীকৃষ্ণের সহিত নৃত্যরত সখা রাখালকে দেখিয়াছিলেন। ইহাই 'আমার কমলেকৃষ্ণ' উক্তির ভাষ্য!

অবতারের লীলার পুষ্টি ও সহায়তা ভিন্ন তাঁহার ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞ, ঈশ্বরকোটী, নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষের মানবদেহ ধারণ করিয়া অম্লানবদনে দেহীর সকল জ্বালাযন্ত্রণা বরণ করিয়া লইবার অন্য আর কি কারণ হইতে পারে? পরমহংসদেবই প্রাণের টানে তাঁহার পরমস্নেহের মানসপুত্রকে টানিয়া আনিয়াছিলেন!

আচার্য্যের জীবন-লীলার সকল ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিবার সামর্থ্য-আয়োজন এখানে নাই। কিন্তু আজিকার এই আকস্মিক

বজ্রপাতের সন্ধিক্ষণে তদীয় জীবনের প্রকৃত দ্যোতনা, মূল মর্ম্মকথা সর্ব্বজনসকাশে জানাইয়া আশ্বস্ত হইতে চাই।

দক্ষিণেশ্বরের, মুক্তিদাতা পরমহংসের পূতসংস্পর্শে আসিবার পূর্ব্বেই সাধারণ মানবের পথাবলম্বন করিয়া শ্রীরাখাল বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। তাহার পর ক্রমে ক্রমে 'কামিনীকাঞ্চন ত্যাগের' নূতন বাণীর নবীন আলোকে সঞ্জীবিত হইয়া তাঁহার বৈরাগ্যোদয় হইল—সে তীব্র তরঙ্গের আবর্ত্তে পৌঁছিয়া তিনি প্রেমাস্পদ প্রেয়সীর যৌবন-জীবন নৈরাশ্যসাগরে ভাসাইয়া, শিশু সন্তানের পিছনের অস্ফুট ডাক ও তাহার মায়াস্পর্শ নির্ম্মমভাবে অগ্রাহ্য করিয়া, এক অপূর্ব্ব প্রেরণার প্রভাবে সংসারের সকল বন্ধন, সর্ব্বপ্রলোভন চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া, অর্থ-ঐশ্বর্য্য পায়ে ঠেলিয়া শ্রীগুরুর ত্যাগ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ফকিরের মহানন্দ অনুভব করিলেন। তৎপরে তাঁহার দীর্ঘকাল তপস্যা ও কৃচ্ছ্র সাধন, সমাধি-অনুভূতি-দর্শন সকলই অদ্ভুত—লোকোত্তর। উচ্চদরের সাধক ভিন্ন সে কথা কহিবার আর কাহার অধিকার?

পরমহংসদেব তাঁহার বড় আদরের এই মানসপুত্রের ভিতর ইদানীং আপনাকে মূর্ত্ত ও প্রকট করিয়া রাখিয়াছিলেন; সাক্ষাৎ ঠাকুরই নরদেহে বিরাজিত ছিলেন। তাই সত্যসত্যই একদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের সমসাময়িক জনৈকা স্ত্রীভক্ত শ্রীমহারাজের নিকট কিয়ৎকাল স্থিরচিত্তে বসিয়া ভাবাবেশে আত্মহারা হইয়া তৎপরিবর্ত্তে স্বয়ং শ্রীশ্রীঠাকুরকে সশরীরে আবির্ভূত দেখিয়া নয়নমন সার্থক করিয়াছিলেন! উহা শুনিয়া শ্রীঈশার বাণী মনে পড়িল—'I and my Father are One.'

এই দুর্ল্লভ-দেবশিশুর সদাহাস্যময় নির্ম্মল মুখ জ্যোতি দেখিয়া পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হইত। তাঁহার কথা বলিতে গিয়া প্রথমে ইহাই মনে পড়ে—তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হইত—জগতের সকল শিশুর সরলতা একত্র সঞ্চিত ও আহৃত দেখিয়া তুষ্টিলাভের জন্যই বুঝি, ভগবান এই বাল রাখালকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন! 'Except ye become as little children, ye shall not enter into the Kingdom of Heaven.'

সংসারের ত্রিতাপতাপিত জীব, দুঃখদারিদ্র্যের গুরুভারাবনত মানব, পথভ্রষ্ট-কলুষ-পাপপঙ্কিল হতাশ-নরনারী কিয়ৎকাল তাঁহার শান্ত-স্নিগ্ধ চরণতলে বসিয়া সেই পূত-সংস্পর্শে আসিলে লুপ্ত উদ্যম, হারাণ জীবন, বিগত বিশ্বাস, নষ্ট চেতনা ফিরিয়া পাইয়া পরমা শান্তির স্বর্গসুখ অনুভব করিয়া ধন্য হইত—সে সুশীতল কল্পতরুর ছায়া,—সবাকার জুড়াইবার স্থান, চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত।

মহানন্দময়—সেই মহাপুরুষের প্রতি পদবিক্ষেপে আনন্দের শুভ্র-সমুজ্জ্বল কোটী শতদল পদ্ম বিকশিত হইয়া উঠিত! বেলুড় মঠে যখন তিনি থাকিতেন তখন মনে হইত, বিশাল মঠভূমির প্রত্যেক ধূলিকণা, তৃণশষ্প, বৃক্ষলতাগুল্ম, পশু-পক্ষী-মানব,—সর্ব্বোপরি ত্রাণতরঙ্গিনী ভাগীরথী—সকলই ব্রহ্মানন্দের এক অফুরন্ত ফোয়ারার সুখ-হিল্লোলে ভাসমান—মনে হইত, চির-আনন্দের লীলানিকেতন অমরায় বিরাজ করিতেছি। শিবক্ষেত্র বারাণসীখণ্ডে গুরুভ্রাতা, ভক্তশিষ্য পরিবেষ্টিত হইয়া আনন্দরাজ, মধুরমূরতি শ্রীমহারাজকে তাঁহার পরমপ্রিয় রামনাম-সঙ্কীর্ত্তন বা কালভয়বারিনী কালীকীর্ত্তনের আসর জমাইয়া বিরাজ করিতে যাহাদের দেখিবার ভাগ্য হইয়াছিল তাঁহারা চিরজীবনের তরে সে সুখস্মৃতি হৃদয়ের গোপন মণিকোঠায় সঞ্চিত রাখিয়াছেন—সে চিত্তবিমোহনকারী হ্লাদময়ী দৃশ্য-নিচয় নয়নমন ভরিয়া উপভোগ করিয়াও তাঁহাদের আশা মিটে নাই—মনে হইয়াছিল,—স্বয়ং শিব নরদেহ ধরিয়া ভাব-ভক্তি-প্রীতির ত্রিধারা ধরায় বহিয়া আনিয়াছেন! কিন্তু তখন কে জানিত কাশীতে এই তাঁহার শেষ আগমন? আবার এত শীঘ্র চলিয়া যাইবেন বলিয়াই বোধ হয়, সর্ব্বশেষে দক্ষিণদেশে মান্দ্রাজ অঞ্চলে সর্ব্বপ্রথম মহাসমারোহে বিপুল আয়োজনে দেবী দশভুজার পূজা, বিরাট অনুষ্ঠান; বিদ্যাপীঠের উদ্বোধন প্রভৃতি করিয়া সেবার ভক্তবৃন্দকে এক অপূর্ব্ব আনন্দস্রোতে ভাসাইয়া প্রাণমন মাতাইয়া ছিলেন। সর্ব্বোপরি—তাঁহার বড়সাধের আদরের অনুষ্ঠান—ভুবনেশ্বরের নবনির্ম্মিত বিরাটমঠে শিষ্যসমাবৃত হইয়া এক বিরাম-বিহীন ভাবস্রোতে সকলের মনোরঞ্জন করিলেন।

অনন্ত শক্তির আধার হইয়াও তিনি সর্ব্বক্ষণ এক অদ্ভুত উপায়ে

আত্মগোপন করিয়া আপনার প্রকৃতস্বরূপ লোক-লোচন হইতে ঢাকিয়া রাখিতেন। 'অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বাঁধিয়া' তিনি জগতের অনেক তুচ্ছ খুঁটিনাটিতে সাধারণ মানবের ন্যায় মনঃসংযোগ করিতেন,—সামান্য দ্রব্য লইয়া তাঁহাকে ছেলেখেলা করিতে দেখা যাইত। সর্ব্বসময়েই তাঁহাতে একটা সহজ, সরলভাব বিদ্যমান ছিল—কৃত্রিমতা ও আড়ষ্টভাবের তিলমাত্র সেখানে স্থান পাইত না। সহাস্যবদনে কত সময় বন্ধুর ন্যায় তাঁহাকে হাসি-ঠাট্টা-তামাসা করিতে দেখিয়া মূঢ় আমরা, পরস্পরের বিরাট ব্যবধান ভুলিয়া তাঁহাকে আমাদেরই মত একজন ভাবিতাম! কিন্তু উহারই ভিতর মাঝে মাঝে দুই একটী কথার ভাবে ইহাও বেশ বুঝা যাইত—যে আমরা যাঁহার সহিত কথা বলিতেছি, তিনি এ পৃথিবীর নহেন—তিনি স্বর্গলোকের এক দেবতা। "I am from above, I am not of this world."

নিপুণ মাঝির ন্যায় সুবিশাল সঙ্ঘতরণীর হাল ধরিয়া শত ঘূর্ণী, অসংখ্য ঝঞ্ঝা হইতে তিনি উহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন—তাই আজ পথহারা হইয়া হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে মরমের রব উঠিয়াছে—'কাণ্ডারী কোথা?'

সাধারণ নেতার বাহ্যাড়ম্বর, আত্মাভিমান, আত্মম্ভরিতা তাঁহাতে কোন দিন স্পর্শ করে নাই। সে ঐশী শক্তির সম্মুখে সকলকেই মস্তক অবনত করিতে হইত। সেই অসীম নিস্তব্ধ নীরবতার মধ্য হইতে কর্ম্মীর দল অনন্ত বীর্য্য, অদ্ভুত প্রেরণা পাইত এবং আপনাদিকে তাঁহারই যন্ত্রস্বরূপ বিবেচনা করিয়া প্রবল উৎসাহে কর্ম্মরত হইত।

দুরন্ত-চঞ্চল শিশু মনের টানে বিনাবিলম্বে কাহারও অপেক্ষা না রাখিয়া অকস্মাৎ প্রেমাস্পদের সহিত মিলিবার জন্য ছুটিয়া থাকে। আমাদের এই বাল-ব্রহ্মানন্দও তেমনি আজ আচম্বিতে শিশুসুলভ ক্ষিপ্রতার সহিত ভক্তজনহৃদয়ে শেল হানিয়া বিদ্যুদ্বেগে, ইচ্ছামাত্র শ্রীগুরুর পুণ্যলোকে, চকিতে চলিয়া গেলেন!

হে গুরো! তুমি নিত্য—তুমি শাশ্বত—তুমি অবিনাশী—তোমার মৃত্যু নাই—পরমগুরুর সহিত তোমার এই দিব্যমিলনে শোক-ক্রন্দন

অশাস্ত্রীয়—এ সকল জ্ঞানবাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য—কিন্তু "মন বুঝেছে, প্রাণ বুঝে না।" ক্ষুদ্র আমরা—মূঢ়-অজ্ঞান, অবুঝ আমরা—আমরা স্থূল চাই," নামরূপের কাঙ্গাল আমরা! তোমার শেষ-আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছাই আমাদের এই শঙ্কটময় দুর্গম জীবন-গহনপথের একমাত্র দীপবর্ত্তিকা, শোকে একমাত্র সান্ত্বনা। হে আচার্য্য! তুমি আজ অশরীরী হইয়া ভারতের গগন-পবন-প্রান্তরে—সর্ব্বত্র, পরিব্যাপ্ত থাক। আমাদের ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত জীবনসমস্যার সমাধান তোমাকেই করিতে হইবে। জাতির আজ বড় দুর্দ্দিন—তোমাকে ত আমরা ছাড়িতে পারি নাই—পারিবও না। আমাদের নেতা, আমাদের বন্ধু, আমাদের চালক হইয়া হে শিব! কল্যাণের পথে তুমি আমাদিগকে চালিত করিয়া মুক্তি দাও! তোমার 'অভীঃ'মন্ত্র সর্ব্বদা আমাদিগের অন্তরে জাগরূক রহিবে। জগতের তুচ্ছ প্রলোভন আসিয়া আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর,—কিন্তু হে করুণাময়! কৃপাসিন্ধো! আত্মবিস্মৃতি হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর—তুমি বারবার বলিয়াছ—'ব্রহ্মবিদ্যা—ব্রহ্মজ্ঞান—ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যা।' "Ye shall know the truth and the truth shall make you free"—এই সত্যবাণী উপলব্ধি করিলেই মুক্তি মিলিবে।

তোমার সাধনার তপোপূত জীবন, লোককল্যাণের জন্য তোমার আত্মবিসর্জ্জন,—পথের ইঙ্গিত দিয়াছে—আজ তুমি যেন ভৈরবকণ্ঠে ইহাই ঘোষিত করিলে—"I am the light of the world: he that followeth me, shall not walk in darkness, but shall have the Light of Life."

হে প্রভো! কোটীকণ্ঠে গললগ্নীকৃতবাসে আজ আমরা তোমার নিকট কাতর প্রার্থনা করিতেছি—তোমার শ্রীপাদপদ্মে আমাদের অচলা ভক্তি দাও। আমাদের শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা আর কিছুই নহে, কেবল—

"হৃদয়ে তোমারে বুঝিতে,
জীবনে তোমারে পূজিতে,
তোমার মাঝারে খুঁজিতে
চিত্তের চিরবসতি ॥

* * *

বচন মনের অতীতে
ডুবিতে তোমার জ্যোতিতে
সুখ দুখে লাভে ক্ষতিতে
শুনিতে তোমার ভারতী॥

শ্রীকণ্ঠ।

---

(৫)

জয় জয় জয়, "ব্রজের রাখাল"
(আজি) শায়িত কুসুম শয়নে,
জয় জয় জয়, জয় স্নেহময়,
করি প্রণতি যুগল চরণে॥
জয় জয় মহাভাব-মগন
পরিপূর্ণ মহাজ্ঞানে
(কিবা) অহেতুক স্নেহ, করুণা মরি রে
(চাহি) আকুল সন্তান পানে॥
("নব) জলধর-শ্যাম" "কমলে কৃষ্ণ"
(আহা) অপরূপ রূপ দরশনে।
লীলা অবসানে, আপনা স্মরণে,
শ্রীগুরু-চরণে মিলনে,
(হ'লে) "যোগনিদ্রা-গত," জয় "নারায়ণ",
রাজিত অনন্ত শয়নে।
(থাক) নিত্য বিরাজিত, হৃদি মাঝে মম,
সতত জীবনে মরণে॥
(আমি) জয় জয় গানে, উরধ নয়নে,
করপুটি হৃদি-গগনে ;—
দূর পরবাসে, কে রহিবে আর,
(এবার) চলেছি তোমার চরণে॥ শ্রীসন্তান।

(৬)

যার কিছু দিন পূর্ব্বে কল্পনা করিতে পারি নাই আজ, রঙ্গভূমে সহসা প্রেতের বীভৎস আবির্ভাবের মত অদৃষ্ট চক্রের উপর কঠোর বিধাতার দারুণ নির্ম্মম-হস্তের রেখাপাতের পরিচয় দিয়া, ভক্তদের সেই দুর্দিন সমাগত। যবনিকা পতনের গতি ও কাল নির্দ্দিষ্ট আছে—কিন্তু যে মহাজীবনের লীলাভিনয় প্রেমসমুদ্রতরঙ্গের উদ্দাম গতিতে কত জলহীনা শুষ্ক হৃদয়-নটিনীকে জলপূর্ণা করিয়া বন্যা ডাকাইয়াছিল তাহা যে এত শীঘ্র সমাপ্ত হইবে ইহা সেই আদি কবি বিশ্বনাট্যকারের রচনাতেই সম্ভব, ক্ষুদ্র মানব-সমাজে শ্রেষ্ঠতম নাট্যরথীরও দৃষ্টির বহুদূরে। বিধাতার কলমের উপর কে হস্তক্ষেপ করিবে? তাহাকে মানিয়া লওয়া ছাড়া আর উপায় কি? সে সনাতন প্রথানুযায়ী তস্করের মত চুপে চুপে আসিয়া ভক্তদের আরাধ্য দেবতা, জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি এবং হৃদয়-রাজ্যের মহামহিম মহারাজাধিরাজকে অপহৃত করিয়াছে। তাহার দ্বারে আজ নিঃসম্বল হইয়া হতভাগা আমরা, হাহাকার না করিয়া আর করিব কি? অকূল সংসার সমুদ্রের ঘাতপ্রতিঘাতে প্রহত হইয়া ক্ষুদ্র জীবন-তরী যে বিশাল আলোক-স্তম্ভের কিরণ ধারায় নিরাপদে বাহিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, আজ তাহা কালের কঠোর করস্পর্শে আমাদের নয়নপথ হইতে চিরতরে অন্তর্হিত হইয়া সেই জীবন-তরীকে অভাবনীয়রূপে বিপন্ন করিয়াছে।

এই বিপদের দিনে, এই আকুল ক্রন্দনের ব্যর্থতার মাঝখানে, বিধাতার কঠিন নির্য্যাতনে আমাদের মরুভূমিতে কিঞ্চিৎ বারি পতনের মত একটু আশ্বাসের উপায় আছে, তাহা সেই মহাকারুণিক ভগবান শ্রীমন্মহারাজের অপার করুণার কিঞ্চিৎ স্মরণমনন ও ধ্যানধারণা করিয়া। আমরা সেই প্রেম সমুদ্রের কতটুকুই বা আয়ত্ত করিয়াছি বা পারিয়াছি! কিন্তু 'পিপীলিকার একটী দানাতেই তৃপ্ত' হইবার মত আমাদের সেই সামান্যটুকুই যোগ্যলাভ জ্ঞান করিয়া তাহাই জীবনে কার্য্যে পরিণত করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিতে হইবে, কেন না আর পাইবার আশা নাই। এবং ইহার ফলে বাকি জীবনে কথঞ্চিৎ আশ্বাস

ও শান্তিলাভ করিয়া অন্তে যে পিতার পবিত্র আবাসে তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে মহাসিংহাসনোপরি আমাদের হৃদয়রাজ্যের মহারাজ উপবিষ্ট তাঁহারি অপার করুণায় তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করিয়া ধন্য হইব, ইহা নিশ্চয় মনে হয়।

এক একবার ভাবি, মহারাজ তাঁহার আনন্দের নিত্যধামে চলিয়া গিয়াছেন, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? বরঞ্চ সেই আনন্দের মূর্ত্তি এবং করুণার নির্ঝর এতদিন কি করিয়া এই শঠতা-প্রবঞ্চনাপূর্ণ শয়তানী সংসারে আমাদের মত ব্যক্তির উপর করুণায় ছিলেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। বরফের কণা গ্রীষ্মকালে কতক্ষণ সাকার থাকে?

ইদানীং মহারাজকে দেখিয়া মনে হইত তিনি সর্ব্বদাই ভাবরাজ্যে বিচরণ করিতেছেন, তাঁহার পাঞ্চভৌতিক দেহটী পর্য্যন্ত ভাবময় হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার আহার বিহার সেই ভাবানুযায়ী হইলেই তাঁহার দেহ ভাল থাকিত এবং একটু ব্যতিক্রম হইলেই তিনি অসুখে পড়িতেন। তাঁহার ভাবের কিঞ্চিৎমাত্র বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হইলে দেখিতাম, তাঁহার দৈহিক ক্লান্তি আনয়ন করিয়া উহা তাঁহার যন্ত্রণার কারণ হইয়াছে। অবশ্য তিনি তাহা, তাঁহার চিরহাস্যরঞ্জিত অধরে বেশ সংবরণ করিয়া থাকিতেন, তবে আমরা উহা কল্পনা করিয়া লইতাম মাত্র। এই জন্য বোধ হয় তিনি পরিচিত ও তাঁহার ভাব-রাজ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত সমাধিক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিতে পারিতেন এবং বিরুদ্ধভাবাপন্ন লোকদের মধ্যে কোনমতে শতচেষ্টাতেও থাকিতে পারিতেন না। কিন্তু তাঁহার দেহাবসানের কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে যখন দেখিলাম তাঁহার আর নিজস্ব-ভাব সংরক্ষণ করিবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নাই, বিরুদ্ধ অবিরুদ্ধ ভাবাপন্ন সকল রকম ব্যক্তিদের সহিতই অবাধে মেলামেশা করিতেছেন—তখনই আমাদের যুগপৎ আনন্দ ও ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল। তাঁহার ক্ষুদ্র দেহপিঞ্জর রক্ষা করিবার বহুপূর্ব্ব হইতেই তাঁহার দেহগত ব্যষ্টিকৃত অমৃতোপম ভাব-রাশিকে ক্ষিপ্রগতিতে ছড়াইয়া বিরাট সত্ত্বায় লীন করিতেছিলেন। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল তাঁহার দেহের তিরোধান।

মহারাজ, আজ তোমাকে হারাইয়া দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া আমরা বেড়াইতেছি, ইচ্ছা হয় চীৎকার করিয়া কাঁদি, কিন্তু বোধ হয় তোমার নিবিড় স্নেহজাল—সেই অপার ভালবাসার স্পর্শ এখনও আমাদের ঘিরিয়া রহিয়াছে, তাই পারিতেছি না। স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন আমরা, তোমায় দেখিতে পাইব না, সাধনভজনহীন হতভাগাদের সে জ্ঞানদৃষ্টি নাই যাহাতে তোমার নিত্যলীলাবিগ্রহ মানসচক্ষে দেখিয়া কৃতার্থ হয়। এখন আছে খালি, ভাবিবার—যাহা স্থূলভাবে তুমি তাহাদের জন্য করিয়াছ। তাহাও অপার অগম্য সমুদ্রবৎ—কতটুকুই বা ভাবিয়া ইয়ত্তা করিবে? আর সূক্ষ্মভাবে তাহাদের আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য যাহা সাধন করিয়াছ, যাহার জন্য তোমার মধুময় দেহপদ্ম মহাকালীর চরণতলে অর্ঘ্য প্রদান করিলে তাহা তাহাদের নয়নের চির অন্তরালে রহিয়া গেল।

মহারাজের চরিত্রের পরিচয় দিতে যাওয়া ধৃষ্টতামাত্র। হিমাদ্রির অনন্ত অম্বরস্পর্শী শিখরের ন্যায় সে চির-জ্যোতিষ্মান, চির-অভেদ্য থাকিবেই।

ব্রহ্মানন্দ যেমন মুখে ব্যক্ত করা যায় না, বলিলেই তাহার হীন অবস্থা ঘটে, তেমনি স্বামী ব্রহ্মানন্দের বিষয় কিছু বলিতে যাইলেই তাঁহাকে অতিশয় নিম্ন করিতে হয়। তিনি কি, বা কেমন ছিলেন, কি করিয়া বলিব? ব্রহ্মানন্দের উপমা ব্রহ্মানন্দ। তবে আমাদের নিকট যে যে ভাবে তিনি পরিদৃষ্ট হইতেন তাহাই কিছুমাত্র দেখাইতে চেষ্টা করিব, যদিও সে চেষ্টা সফল হইবার কোনরূপ আশা নাই।

গীতায় শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে বলিলেন:—

"পিতামহস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কারঃ ঋক্ সাম যজুরেব চ॥
গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ॥
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ং॥"

মহারাজকে না দেখিলে এক আধারে এই বিভিন্ন ভাবগুলির সমাবেশ হওয়া কিরূপে সম্ভবপর, তাহা বুঝিতে পারিতাম না।

যিনি প্রভুর ন্যায় কর্ত্তব্যপালনে শিষ্যকে কঠোর আজ্ঞা দিতেছেন, তিনি আবার কেমন করিয়া তাহারি সহিত বালকের মত সামান্য কারণে ফষ্টি নষ্টি করিয়া আনন্দ করিতেছেন, তাহা বুঝা সুকঠিন। যিনি গম্ভীর ভাবে 'ব্রহ্মসত্য জগন্মিথ্যা' উপলব্ধি করিয়া পৃথিবীর সমস্ত বস্তুর উপর বীতরাগ হইয়াছেন তিনি কেমন করিয়া শাক, কচু, মুলা বেগুন প্রভৃতি তরকারীর কথা কহিয়া তাহাদের উপকারিতা বুঝাইতেছেন তাহা ধারণা করা বড় সহজ নহে যিনি অর্থং অনর্থং জানিয়া কাম-কাঞ্চন ত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়াছেন তিনি কেমন করিয়া অর্থের সদব্যবহার হইতে পারে বুঝাইয়া তাহার ধর্ম্মতঃ সংগ্রহের পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন—ইহা বাহির হইতে অসামঞ্জস্যকর বলিয়াই ত মনে হয়। এই মাত্র যাঁহাকে অতি ধীর গম্ভীর ভাবে জ্ঞানতত্ত্ব উপদেশ করিতে দেখিলাম, পরমুহূর্ত্তে তাঁহাকেই 'প্রগল্‌ভ বালকের মত ক্রীড়া করিতে দেখিয়া বিস্ময় মানিতে হয়। তাহাদের কষ্টে দুঃখে ভক্তদের জন্য জননীর মত তাঁহার প্রাণ কাঁদিত, তাই তখন সহানুভূতি ও সান্ত্বনা দিয়া তিনি সেই দুঃখ নিবৃত্তির উপায় জ্ঞানদৃষ্টি সহায়ে বলিয়া দিতেন। স্বাস্থ্যভঙ্গে বা রোগে তিনি সুবিজ্ঞ বহুদর্শী চিকিৎসককেও পরাজিত করিয়া ভক্তদের আহার বিহারের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। তাঁহাদের নিজ নিজ বাড়ীতে কোন কার্য্যাদি হইলে তিনি আপনাকেই যেন তাহার তত্ত্বাবধায়ক জ্ঞান করিয়া সে কার্য্যে যাহাতে বিন্দুমাত্র অনুষ্ঠানেরও ব্যতিক্রম না হয় তাহার জন্য যত্নবান থাকিতেন। আবার নিয়মিত কর্ত্তব্যের অবহেলায় বা কোন কারণে মনের হীনতা দেখিলে তাহা সংশোধনার্থ তাঁহার মত তীব্রতিরস্কার কাহারও নিকট পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি বেশী বলিতেন না—অল্প দু একটী কথা যাহা বলিতেন, তাহা ব্যক্তিগত ভাবেই বলিতেন এবং উদ্দিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে তাহা যথেষ্ট হইত। আমরাও তাঁহার শ্রীমুখ হইতে ধর্ম্ম বা ঈশ্বর সম্বন্ধীয় বেশী কথা বলাইবার চেষ্টা করিতাম না, কারণ দেখা যাইত ঈশ্বরীয় কথা কহিবার পরই তিনি কেমন গম্ভীর হইয়া এক কালে উপস্থিত জনমণ্ডলীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া আপন মনে থাকিতেন। আমরা

তখনকার মত তাঁহার অপূর্ব্ব প্রাণমনমত্তকারী সাহচর্য্য হারাইতাম। 'জীবের কর্ত্তব্য কি' প্রসঙ্গে বহু পূর্ব্বে তিনি আমায় বলিয়াছিলেন 'সাধন ভজন মন কর তাঁর নিরন্তর'। সেইরূপ মিষ্টস্বরে, বালকের ব্যাকুলতায় ভগবানের স্তব আমি আর কোথাও শুনি নাই। উহা শ্রবণমাত্রে অতি অভক্তেরও প্রাণমন আকৃষ্ট হইয়া ক্ষণেকের জন্যও বোধ হয় শ্রীভগবানের চরণে ন্যস্ত হইত। নাটক রচনার নিগূঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার দুই একটী সারগর্ভ উপদেশ লাভ করিয়া আমি ভাবিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম মহারাজ এ বিষয়ও কেমন করিয়া আয়ত্ত করিলেন! বড় বড় নাট্যরথীর নিকট বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি, কিন্তু এত অল্প কথায় উহার সুগভীর তত্ত্ব কেহ আমায় কখন বলেন নাই—আমার বিশ্বাস সে তত্ত্ব তাঁহারাও জানেন না। কোন সময়ে বিবাহের ঘটককে তাহার নিজ কর্ম্মের অনুকূলজনক কথাবার্ত্তা মহারাজকে শিখাইয়া দিতে শুনিয়া আমি হাস্য সংবরণ করিতে পারি নাই। হাস্য রসের সৃজন করিতে তাঁহার মত আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তিনি আনন্দময় জগতের রাজরাজেশ্বর ছিলেন সুতরাং মর্ত্ত্যবাসীর নিকট সেই মহামূল্য স্থানের কিঞ্চিৎ কণা ছড়াইয়া দেওয়া আর তাঁহার পক্ষে বিচিত্র কি! অতি বিচক্ষণ দক্ষ মালীর মত বৃক্ষাদির রোপন ও তত্ত্বাবধান সম্বন্ধে মহারাজের কি অদ্ভুত দৃষ্টিশক্তিরই পরিচয় পাইয়াছি! শুধু বৃক্ষাদির তত্ত্বাবধান সম্বন্ধে কেন, জীবজন্তু প্রভৃতিরও বিষয়ে ঐরূপ। পশু-পক্ষী লইয়া তাঁহার খেলা যিনি চক্ষে দেখিয়াছেন তিনিই প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছেন তাহাদের উপরও সেই রাখালরাজের কি গভীর সহানুভূতি ও স্নেহ ছিল। বুঝি ইহাদেরও আহার বিহারের জন্য তিনি সচেষ্ট ও চিন্তিত থাকিতেন!

গৃহাদি নির্ম্মাণ সম্বন্ধেও মহারাজের জ্ঞান বড় অল্প ছিল না, তাহার ন্যায় সুদর্শন মনোহর, বাটীর নক্সা প্রস্তুত করাইতে আর দ্বিতীয় কাহাকেও দেখিব না, বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যিনি অদ্বিতীয় সত্য, নিত্যবিরাজিত শিবসুন্দরকে বক্ষে ধারণ করিয়া আছেন, তাঁহার প্রত্যেক কর্ম্মেই যে চরম দক্ষতা ও সৌন্দর্য্যের পরিচয় পাওয়া যাইবে—ইহাতে আর সন্দেহ কি? আমরা তাঁহার কটা দিক্‌ই বা দেখিয়াছি

যা দেখিয়াও তাহা যথাযথ বলিতে পারি!—এইরূপ সংসারিক এবং পারমার্থিক প্রত্যেক ব্যাপারে মহারাজের বিরাট শক্তি লোকহিতৈষণায় শতধা বিভক্ত হইয়া প্রতিদিনই অবিরাম ধারে ছুটিত—সে ধারা নির্ম্মল, মধুময়, ছন্দের গতিতে নৃত্য করিয়া চলিত; তাহাতে ছিল, কেবল ঝঙ্কার ভগবদ্ভক্তি, ভালবাসা এবং অহেতুকী কৃপা।

তাঁহার শ্রীমুখে বার বার শুনিয়াছি "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" যাহা কিছু সমুদয়ই সেই ব্রহ্ম, তাহা ছাড়া আর কিছুই নাই। তিনি স্বয়ং সেই ব্রহ্মানন্দের ঘনীভূত মূর্ত্তি ছিলেন, সেই জন্যই বোধ হয় জগতের সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বকথা তাঁহার অগোচর ছিল না, তিনিও তাহা আকাতরে অপামর সাধারণকে বিলাইয়াছেন।

তাঁহার শ্রীমুখে আমি শেষবাণী শুনিয়াছি "তোরা ভগবানকে ভুলিস না।" আর কেহ কি ভাবে ইহা লইবেন জানি না, তবে আমার মনে হয় তিনি যেন এই বাক্যে ভগবান যে আত্মীয় হইতেও পরমাত্মীয় এই অর্থটিই পরিব্যক্ত করিয়াছেন। যেমন পরমাত্মীয় তাঁহার আত্মীয়ের উপাসনা বা আরাধনা ব্যতীতও কল্যাণ কামনায় সচেষ্ট থাকেন এবং প্রার্থনা করেন—মাত্র তাহার স্মরণ-মননটুকু—সেইরূপ, ভগবান বুঝি আমাদের তৎসম্বন্ধে বিস্মৃতি না ঘটিলেই পরম সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হন। ঈশ্বরকথা প্রসঙ্গে তাঁহার বহুদিন পূর্ব্বের প্রথম বাণী "সর্ব্বদাই সাধন ভজন করিবে" এবং শেষ বাণী "ভগবানকে ভুলিস্ না।" (অবশ্য যাহা আমি শুনিয়াছি)। শেষ কথাটী বলিবার সময় তাঁহার কথা কহিবার শক্তি লোপ হইয়া আসিতেছিল এবং অতি কষ্টে তিনি উহা বলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আমরা কদাচ যেন সেই চিরকিশোর রাজা মহারাজের এই বহু কষ্টে উচ্চারিত শেষ কথাটী না উপেক্ষা করি। ইহা দুর্দ্দান্ত ও ভ্রান্ত জীবের প্রতি তাঁহার চরম ও পরম ছাড়পত্র। তাঁহার অপার ক্ষমাগুণ ও ভালবাসার পরিচয় দিতে যাইলে, চক্ষু আপনি অশ্রুপূর্ণ হয় এবং বাক্য রোধ হইয়া আসে।

যিনি মহারাজকে দেখিয়াছেন তাঁহারই ধারণা হইয়াছে যে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ সর্ব্বজ্ঞ। তিনি দেশ কাল পাত্রের অতীত অবস্থায় থাকায় ত্রিগুণ-

রহিত হয়েন এবং তাঁহার স্বভাব পঞ্চবর্ষীয় বালকের মত হয়। হে পরম পুরুষ, যতদিন এই পাপপূর্ণা মেদিনী পবিত্র করিয়াছিলে, ততদিন তোমার কোন সেবা করিতে পারি নাই, তোমাকে হারাইয়া তোমার পাদপদ্মে আজ অশ্রুসিক্ত ভক্তির কুসুমাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি ঃ—

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যং।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষীভূতং,
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং তং নমামি।

শ্রীগোকুল।

(৭)

ছেলেবেলা থেকেই থিয়েটার করি। নটগুরু মহাকবি স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্রের অধীনে অধিকাংশ সময়েই কাজ করিয়াছি। ছেলেবেলা থেকেই গিরিশ বাবুর মুখে শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের কথা শুনিতাম। গিরিশবাবুর সংস্পর্শে যে থিয়েটারই আসিয়াছে, সেই থিয়েটারেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানি করিয়া ছবি থাকিত। আমরা অভিনেতা অভিনেত্রীগণ সকলেই রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইবার পূর্ব্বে ঠাকুরের ছবিকে প্রণাম করিতাম এবং এখনও বোধ হয় বাঙ্গালীর সকল থিয়েটারে এই নিয়ম প্রচলিত আছে।

এইরূপে বাল্যকাল হইতেই আমরা ঠাকুরের প্রসঙ্গ শুনিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম এবং বেলুড় মঠে উৎসবাদি দর্শনে সময় সময় বড়ই ইচ্ছা হইত। একবার গিরিশবাবুকে বলিয়াছিলাম, তিনি যদি অনুমতি করেন—উৎসব দেখিয়া আসি। বেশ মনে আছে, সে সময় গিরিশ বাবু বলিয়াছিলেন "এখন নয়—ঠাকুরের যদি ইচ্ছা হয়, পরে যেও"। এই জন্য ইচ্ছা সত্ত্বেও কখন মঠে যাই নাই।

তারপর প্রথম মঠে গেলাম—সে বোধ হয় আজ ছয় বৎসর পূর্ব্বে। মন বড় খারাপ, অশান্তি—অশান্তি, কিছু ভাল লাগে না, এক স্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারি না। নানা তীর্থে দেবালয়ে যাই—সংসার ক্রমশঃ বিষবৎ হইয়া উঠিয়াছে। এম্‌নি যখন মনের অবস্থা—একদিন ঘুরিতে ঘুরিতে বেলুড়মঠে গেলাম। সঙ্গে ছিলেন, শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী—বাঙ্গ্‌লা নাট্যশালার শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী। অতি শৈশবে, যখন সাত বৎসর বয়সে রঙ্গালয়ে প্রথম প্রবেশ করি, তখন ইনিই আমায় নাট্যশালায় লইয়া যান—মঠেও ইনি আমার প্রথম সঙ্গিনী।

যখন মঠে গেলাম, তখন প্রায় দুপুর উত্তীর্ণ হইয়াছে—মহারাজ সেবা-অন্তে বিশ্রাম করিতে যাইবেন—আমরা উভয়ে প্রণাম করিলাম। মহারাজ দেখিয়াই বলিলেন "এই যে বিনোদ, এই যে তারা,—এসো এসো, এত বেলা ক'রে এলে—মঠের খাওয়া দাওয়া যে হয়ে গেছে—আগে একটু খবর দিতে হয়, তাইতো—বস বস।" দেখ্‌লেম আমাদের জন্য বড় ব্যস্ত। তাঁহার আদেশে তখনই প্রসাদ আসিল। লুচি ভাজাইবার ব্যবস্থা হইল। আমরা ঠাকুর প্রণাম করিয়া মঠে প্রসাদ পাইলাম। মহারাজের আর তখন বিশ্রাম গ্রহণ করা হইল না, একটী সাধুকে ডাকাইয়া বলিলেন "এদের সব মঠের কোথায় কি আছে দেখিয়ে দাও।" পরে পরিচয় হইলে জানিলাম যে সাধু আমাদের মঠ পরিদর্শন করাইলেন, তাঁহার নাম স্বামী অমৃতানন্দ।

সাধু সন্ন্যাসীকে ছেলেবেলা থেকেই ভক্তি শ্রদ্ধা করিতাম, কিন্তু ভক্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে ভয়টাও ছিল খুব বেশী। অপবিত্রা, পতিতা—, কি জানি যদি কোন অপরাধ হয়, তাই প্রথমে আমি সঙ্কোচ, ভয়ে ভয়ে মহারাজের চরণ ধূলি লইয়াছিলাম। কিন্তু মহারাজের কথায়, তাঁহার ব্যবহারে, আমাদের জন্য তাঁহার ব্যস্ততায়, তাঁহার যত্নে সে ভয়-সঙ্কোচ কোথায় উড়িয়া গেল! মহারাজ বলিলেন "এসো না কেন?" আমি বলিলাম "ভয়ে মঠে আস্‌তে পারি না"। অতি আগ্রহের সহিত মহারাজ বলিলেন "ভয়,—ঠাকুরের কাছে আস্‌বে, তার আর ভয় কি? আমরা সকলেই ত ঠাকুরের ছেলে-মেয়ে,—ভয় কি! যখন ইচ্ছা হবে

এসো। মা, তিনি ত খোলটা দেখেন না—ভেতরটা দেখেন। তাঁর কাছে ত কোন সঙ্কোচ নাই।" স্বামী প্রেমানন্দ তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনিও আশ্বাস্ দিয়া বলিলেন 'ঠাকুরের কাছে আস্‌তে কারু বাধা নাই'।

বৈকালে চা খাইয়া মঠ হইতে ফিরিলাম। আসিবার সময় মহারাজ বলিলেন "মাঝে মাঝে এসো, আজ বড় কষ্ট হ'ল, এক দিন ভাল করে প্রসাদ পেও।" এই আমার প্রথম দর্শন—এই আমার প্রথম বন্ধন।

ইহার কিছু দিন পরে মহারাজ একদিন 'রামানুজ' দেখিতে যান। অভিনয় শেষ হইলে আমি মহারাজের পায়ের ধূলি লইলাম—মহারাজ আশীর্ব্বাদ করিলেন; বলিলেন 'বেশ বেশ, খুব ভক্তি বৃদ্ধি হ'ক!' কৃতার্থ হইলাম।

দিন যায়—আমিও কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াই—কিছুতে শান্তি পাই না। কি যে জ্বালা—আশ্রয় নাই, জুড়াইবার স্থান নাই—সব শূন্য—সব শূন্য! জগন্নাথের দর্শন লালসায় পুরী যাত্রা করিলাম। পথে ভুবনেশ্বর-ধর্ম্মশালায় আছি, শুনিলাম মহারাজ ভুবনেশ্বরের মঠে আছেন—দেখিতে গেলাম। মহারাজের সেই আদর, সেই যত্ন, সেই আগ্রহ,—কোথায় বসাইবেন, কি খাওয়াইবেন! বলিলেন—"একি রোদ্দুরে যে তোমার মুখ শুকিয়ে গেছে—এসেছো শরীর সারতে, রোদ্দুরে বেরুলে কেন? * * কোথায় খাও? কাল থেকে মঠ হ'তেই প্রসাদ যাবে। কি খেতে ভালবাস! আর মা, আমরা সাধু সন্ন্যাসী ফকীর—কি বা এখানে পাওয়া যায়!" এমনি আরও কত কথা! আমিত একেবারে অবাক—একি সাধু! পরম-গৃহী, পরম মায়াজীবীও যে তাঁর ছেলেমেয়ের জন্য এমন উতলা হন না! কে আমি?—সমাজের কোন্ স্তরে আমার স্থান—কত—কত নিম্নে—ঘৃণা ও অবজ্ঞা ছাড়া জগতের কাছে যার প্রাপ্য আর কিছুই নেই—না বন্ধু, না পিতা, না আত্মীয়,—এত বড় সংসারটা—এ যেন একটা পরের বাড়ী। স্বার্থ ভিন্ন কেউ কথা কয় না, ফিরেও চায় না—জগতে আপনার বল্‌তে কেউ নাই। আজ স্বামী ব্রহ্মানন্দ—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মানস-

পুত্র, সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী, সর্ব্বপূজ্য, সর্ব্বমান্য মহারাজ কি আকুল আগ্রহে, কি অকৃত্রিম স্নেহে, কি অপ্রত্যাশিত যত্নে আমাকে আপনার করিয়া লইলেন! বাপকে কখনও দেখি নাই—শুনিয়াছি যখন আমি মাতৃগর্ভে তখন বাবা মারা যান। মনে হইল—এই কি বাপের স্নেহ, না এ তার চেয়েও বেশী আর কিছু? চোখের জল রাখিতে পারিলাম না—সারা জীবনের আক্ষেপ যেন অশ্রুধারার সঙ্গে সঙ্গে গলিয়া মাটিতে পড়িতে লাগিল! মনে হইল, এইত জুড়াবার স্থান, এইত এমন এক জন দরদী আছেন—যাঁর কাছে আমি পতিতা নই, অস্পৃশ্যা নই, ঘৃণিতা নই। মহারাজের মেয়ে আমি—যার কেউ নাই তার আপনার জন—ঐ আমার মহারাজ, ঐ আমার পিতা, আমার স্বর্গ, আমার শান্তি, আমার ভগবান। জ্বালা জুড়াইল, মহারাজ কত কথা বলিলেন—কত—সব মনে নাই। কিন্তু যা মনে আছে তাই এখন আমার জীবনের সম্বল। বলিলেন "মা বুঝ্‌তেইত পার্‌ছ, দেখছ ত সংসারে কত জ্বালা! আমাদেরও যে ও রকম হয়নি, তা মনে কোরো না। যখন প্রথম ঠাকুরের কাছে যাই, বয়স অল্প—জপতপ করি, কিন্তু সব সময় শান্তি পাই না—মনে কত কথা উঠে বুঝ্‌তেইত পার্‌ছ—চারি দিকের আকর্ষণ—জ্বালা। সময় সময় ভাবি, কই আনন্দ ত কিছু পেলাম না! একদিন এই রকম বসে ভাবছি, মনে করছি, এখান থেকে পালাব আর ঠাকুরের সঙ্গে দেখাও করব না। দেখ্‌লেম সম্মুখে ঠাকুর বল্‌লেন,—কি ভাব্‌ছিস্‌—বড় জ্বালা—নয়? আমি নিরুত্তর। ঠাকুর মাথায় হাত বুলাইয়া দিলেন। জ্বালা কোথায় গেল! কি আনন্দ! কি আনন্দ!"—আমারও মুখ দিয়া হঠাৎ বাহির হইল, "বাবা, আমার ত বড় জ্বালা—বড় তাপ—সহ্য করতে পারছি না, ছুটে ছুটে বেড়াই, ঠাকুরের মত আমারও জ্বালা জুড়িয়ে দিন।" স্নেহপূর্ণ করুণস্বরে মহারাজ বলিলেন, "ঠাকুরকে ডাক মা, কোন ভয় নেই—তিনি ত এই জন্যই এসেছিলেন—নাম কর—প্রথমটা দু'দিন, একটু কষ্ট হবে, তারপর ঠাকুরই সব ঠিক ক'রে দেবেন—কোন ভয় নেই মা, কোন ভয় নেই। দেখবে—বড় আনন্দ হবে, বড় মজা হবে।

শুনিয়াছি শ্রীশ্রীমহাপ্রভু নিত্যানন্দ ঠাকুর আমাদেরই মত পতিতকে

উদ্ধারের জন্য আসিয়াছিলেন—আজ প্রত্যক্ষ করিলাম—মহারাজের অহেতুকী কৃপা—ঘৃণা বিদ্বেষ-শূন্য কৃপা। আমার মত পতিতার জন্যই যেন আসিয়াছিলেন—'কোন ভয় নেই মা, ঠাকুরের ছেলে-মেয়ে ভয় কি!' কি আশ্বাস বাণী, কি সান্ত্বনা,—যেন পা বাড়াইয়া বলিতেছেন "ওরে কে কোথায় পতিত আছিস, কে তাপিত আছিস আয়, আশ্রয় নে, ভয় কি—ঠাকুর আছেন।"

ঠাকুর করুণ, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এ মহাবাক্য যেন না ভুলি!

শ্রীতারাসুন্দরী দাসী।

(৮)

২৭শে চৈত্র—সোমবার, শুক্লাত্রয়োদশী। ত্রয়োদশী শুভযাত্রায় সর্ব্ব সিদ্ধি যোগ, এই শুভযোগে শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ নিত্যধামে যাত্রা করিয়াছেন। প্রিয়জনের অশ্রুজলে শীতল, চন্দনগন্ধে সুবাসিত, পুষ্পদলে আবৃত পথে রাখাল মহারাজ তাঁহার নিত্যলীলার সখাগণের প্রেমের আহ্বানে ও তাঁহার প্রাণ-প্রিয় শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত একান্ত মিলনের আগ্রহে ত্বরিত-গমনে চলিয়া গিয়াছেন—ব্রজের রাখালের সেই নিত্যছন্দে গতিলীলার নূপুরধ্বনি এখনও আমাদের হৃদয়ে বাজিতেছে। এখনও সে মধুরধ্বনি যেন আমাদের শুনাইতেছে "ফুরায় নাই, ফুরায় না, ফুরাইবার নয়।"

ঠাকুরের তিনি আদরের দুলাল। তাঁহার কিশোর জীবনের প্রারম্ভ হইতে নিত্যধামে প্রয়াণের দিন পর্য্যন্ত সমগ্র জীবনটী নব বিকশিত পুষ্পের ন্যায় সমভাবেই নবীন ছিল। বর্ষচক্রের বহু আবর্ত্তনে সে অম্লান-তারুণ্যে একটীও রেখাপাত করিতে পারে নাই। যেমন শিশুসুলভ সরল নিঃসঙ্কোচে তিনি তাঁহার গুরুদেবকে বলিয়াছিলেন "তামাক সাজ্‌তে আমি পারব না, মশাই", যেমন শিশুর মত নিঃসঙ্কোচে তাঁহার কোলে উঠিয়া স্তন পান করিতেন—সেই সরলতা

ও সরসতায় তাঁহার জীবন চিরদিন মধুর রসে ভরপুর ছিল। সন্ন্যাস জীবনের কঠোর সাধনা, পাণ্ডিত্য, কর্ম্মপথের বাধায় আঘাত ও লোক-প্রতিষ্ঠা—কোন কিছুই তাঁহার চিরসরস চিত্তে নিমেষের জন্য নীরসতা আনিতে পারে নাই,—আদরের দুলাল হইয়া তিনি জগতে আসিয়াছিলেন, এবং আদরের দুলাল হইয়াই তিনি চোখের আড়ালে চলিয়া গিয়াছেন। এ আগমন ও গমন জন্মমৃত্যু নয়, এ কেবল নৃত্যকারী ব্রজবালকের প্রেমের খেলায় লুকাচুরী মাত্র।

ত্যাগের পথ কঠিন, এ কথা চিরদিন সকলে জানিয়া ও মানিয়া আসিতেছে। কিন্তু আগে কি কেহ জানিত ত্যাগের পথে এত সরসতা, এত মধুরতা আছে? ভোগ লালসায় লোকে চিরদিন লুব্ধ হইয়াছে, কিন্তু ত্যাগের অতি মনোহর লোভনীয় আদর্শ এমন ভাবে আগে কি জগতের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে? সন্ন্যাস মায়াবাদের কঠোরতায় নীরস—ইহাই সকলে জানিত। কে জানিত যে সন্ন্যাসই সেই পরম প্রেমের নির্ম্মল উৎস, যে উৎস স্বার্থের, ব্যক্তিত্বের, অথবা পারিবারিক কোন বন্ধনেই রুদ্ধ সলিলের মত কলুষিত হয় না। দীনে দয়া, দরিদ্রে ভিক্ষাদান এই কথাই লোক এতদিন জানিয়া আসিয়াছে, কিন্তু দীনের সেবা ইষ্টপূজা, একথা কে জানিত? কে জানিত যে ভিক্ষাদান বলিয়া কোন কথা নাই, আছে কেবল ভাইয়ের ভাইকে হৃদয়ে ধারণ? এবম্বিধ মহাপ্রেমের অভিযানের যিনি অগ্রগামী সেনাপতি হইবেন তাঁহার হৃদয় যে উপাদানে সৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন ঠাকুরের কি তাহা অজ্ঞাত ছিল? তাই তিনি ব্রজের রাখালকে জগতে আনিয়াছিলেন।

এই মহাপ্রয়াণ স্মরণে মন, যে ভাবে অভিভূত হয় ভাষা কি তাহা ব্যক্ত করিতে পারে? মানবচিত্ত সতত্ই দুঃখ-শোকে জর্জ্জরিত, দুঃখ-শোকের পরপার আনন্দের রাজ্য সে কেবল ক্ষণিকের স্বপ্ন।

যদি আজ আমাদের ন্যায় দীন চিত্তের এই মহাপ্রয়াণে জগত অন্ধকার মনে হয়, তাহা মানব হৃদয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। "একে একে নিবিছে দেউটি" ঠাকুর রামকৃষ্ণের সেই আনন্দের লীলা নিকেতন—সে যে নিত্য-

লীলার কেন্দ্র, শোকের আঘাতে এ কথা আমরা যতই ভুলিয়া যাই। 'বজ্রাদপি কঠোরানি মৃদূনি কুসুমাদপি' স্বামী বিবেকানন্দের অপূর্ব্ব প্রেমময় জীবন,—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, স্বামী ত্রিগুণাতীত, স্বামী প্রেমানন্দ কাহার কথাই বা না আজ মনে জাগিতেছে!

এক আঘাত সকল আঘাতের বেদনা নূতন করিয়া জাগাইয়া তুলে। তথাপি বার বার মনে হইতেছে আমরা ধন্য, আমরা কৃতার্থ, কাম-কাঞ্চনের ক্লেদমুক্ত এই অপূর্ব্ব পবিত্র প্রেম সাধনা, সজীব বিগ্রহরূপে—ইহজীবনে প্রত্যক্ষ করিবার ভাগ্যলাভ করিয়াছি।

শ্রীসরলাবালা দাসী।

(৯)

"শান্তো মহান্তঃ নিবসন্তি সন্তঃ
বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ।
তীর্ণাঃ স্বয়ং ভীমভবার্ণবং
জনানন্যান্ অহেতুমপি তারয়ন্তঃ॥"

বিবেকচূড়ামণি।

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রিয়তম মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বীয় অলৌকিক সাধনা ও পবিত্রতা সহায়ে তমোহীন আদিত্যবর্ণ মহান পুরুষকে স্বয়ং অবগত হইয়া, অহেতুক কৃপা প্রদর্শনে মানবকে তাহার সন্ধানদানকরতঃ অধুনা স্বস্বরূপে মিলিত হইয়াছেন। কিন্তু এরূপ ধর্ম্মবীর মহাপুরুষের স্থূল রূপ বিনষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সকল শক্তি অন্তর্হিত হয় না—সূক্ষ্মরূপে উহা মানব হৃদয়াকাশে ধ্রুবতারার ন্যায় চিরদিন উজ্জ্বল থাকিয়া তাহাকে সংসার-সমুদ্রের পরপারে উত্তীর্ণ করিতে সাহায্য করে। এই জড়বাদসর্ব্বস্ব বর্ত্তমান যুগে যখন মানব পার্থিব সুখকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া তল্লাভের চেষ্টাতেই [illegible] শক্তি নিয়োগ করিতেছে, তৎকালে শ্রীশ্রীমহারাজের

অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিকজীবন সেই পথহারা মানবগণের নিকট উজ্জ্বল আলোক-স্তম্ভ স্বরূপ। তিনি একাধারে যেরূপ মহাকর্ম্মী, সেইরূপ মহাভক্ত ও জ্ঞানী ছিলেন। এই তিনটী ভাব যে পরস্পর অবিরোধী এবং এই ত্রয়ী যে একই ক্ষেত্রে অবিরুদ্ধভাবে অবস্থান-পূর্ব্বক মানবজীবনকে পরিপূর্ণতর করিতে সক্ষম—ইহা আমরা স্বামী ব্রহ্মানন্দজীবনে দেখিয়াছি। আর দেখিয়াছি, কিরূপে মানব ভগবানের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারে, ভগবদারাধনায় নিমগ্ন হইয়া কিরূপে সাধক জগৎ ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়বস্তু দেহজ্ঞান পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া যায়, মোহিনী মায়া ও অনিমা-লঘিমাদি ঐশী সম্পদও কিরূপে সিদ্ধজীবনকে বিমুগ্ধ করিতে পারে না, এবং কিরূপে সার্ব্বজনীন প্রেম মানব-হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া, অসংখ্য বিরুদ্ধভাবাপন্ন ব্যক্তির হৃদয়কে অত্যদ্ভুত ভালবাসায় আকর্ষণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে একই লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর করাইতে সক্ষম। তদীয় গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে "ব্রজের রাখাল" বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন, তাই তাঁহার কৌমার বয়সে অত্যদ্ভুত বালক ভাবের, যৌবনে সাধক ভাবের, এবং উত্তর জীবনে গুরুভাবের অপূর্ব্ব বিকাশ দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও এই বালকের মধ্যে যে অদ্ভুত প্রেমসম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল অন্য কোন শিষ্যের সহিত শ্রীগুরুর ঐরূপ গভীর প্রেমসম্বন্ধ ছিল বলিয়া, আমাদের মনে হয় না। শ্রীগুরুর দেহান্তে এই বালক স্থির, ধীর ও সংসার-বিরক্ত হইয়া সমস্ত পার্থিব সুখকে তুচ্ছজ্ঞান পূর্ব্বক কোন অপার্থিব সুখের সন্ধানে গভীর সাধনায় নিমগ্ন হইয়াছিলেন। কখনও দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া উদর পূরণ, কখনও বা আকাশবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক ভগবানে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া অবস্থান কিছু জুটিলে আহার—নচেৎ উপবাস। বৃন্দাবনধামে তপস্যাকালীন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে কুটীর হইতে বহু দূরে কোন নির্জ্জন স্থানে গমন করিয়া তথায় সমস্তদিন গভীর ধ্যানান্তে যৎকিঞ্চিৎ ভিক্ষান্নে উদর পূরণ—অথবা তদভাবে আকণ্ঠ যমুনাবারি পান করিয়া তিনি ক্ষুন্নিবারণ করিতেন।

শুনিয়াছি—সাধক জীবনে স্বামী ব্রহ্মানন্দের দিবা রজনীর অধিকাংশ সময় শুদ্ধ ধ্যানজপে অতিবাহিত হইত। বহুবর্ষব্যাপী এইরূপ কঠোর ও গভীর সাধনাদ্বারা তিনি অনুভূতির কোন উচ্চচূড়ায় আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহা লিপি বদ্ধ করা আমাদের সাধ্যাতীত। কারণ জহুরিই একমাত্র জহর চিনিতে সক্ষম। শ্রীশ্রীমহারাজের তুল্য আর একজন মহাপুরুষ বর্ত্তমান থাকিলে তিনি বলিতে পারিতেন, আধ্যাত্মিক রাজ্যে তাঁহার স্থান কত উচ্চে। স্বামী বিবেকানন্দ তৎসম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—

"রাখাল spiritualityতে আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" তাঁহার উক্তির যাথার্থ্য স্বামী ব্রহ্মনন্দের প্রতি তাঁহার আচরণে সম্যক প্রকাশ পাইত। তিনি অন্যান্য গুরুভ্রাতা অপেক্ষা তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দর্শন করিতেন। বেলুড়মঠ পরিচালনার নিমিত্ত তৎকর্ত্তৃক যে নিয়মাবলী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, একমাত্র শ্রীশ্রীমহারাজ ব্যতীত অন্যান্য গুরুভ্রাতাগণকে তাহার অতি সামান্য নিয়মটিও মান্য করিয়া চলিতে হইত। অতি লঘু কর্ম্মও স্বামী ব্রহ্মনন্দের পরামর্শ ও অনুমোদন ব্যতীত তিনি কখন অনুষ্ঠান করিতেন না। মঠের নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইবার পর, উহার সমস্ত কর্ত্তৃত্ব তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন—"রাজা, আজ হ'তে এ সমস্ত তোর। আমি কেউ নই।". শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হইবার পর স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাকেই উহার সভাপতি নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং তিনিও আজীবন ঐ পদে নিযুক্ত থাকিয়া অশেষ লোককল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীশ্রীমহারাজের উপর স্বামী বিবেকানন্দের যে কতদূর বিশ্বাস ছিল তাহা আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের প্রাচীন সন্ন্যাসিগণের নিকট শুনিয়াছি। স্বামীজী বলিতেন—"সকলে আমাকে পরিত্যাগ করিলে, রাখাল ও হরি ভাই আমাকে কখন পরিত্যাগ করিবে না।" অন্যান্য গুরুভ্রাতাগণও তাঁহাকে যে কি শ্রদ্ধা ও ভক্তির চক্ষে দেখিতেন তাহা যাঁহারা সচক্ষে দর্শন করিয়াছেন তাঁহারা যৎকিঞ্চিৎ বলিতে পারেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দের আদেশ তাঁহারা শ্রীগুরুর আদেশ তুল্য জ্ঞান করিতেন।

তাঁহারা বলেন—মহারাজের ভিতর আমরা যেন ঠাকুরকে দেখিতে পাইতাম—অনেক সময় তাঁহাকে ঠাকুর বলিয়াই ভ্রম হইত। ঐরূপ ভাবই যে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে তাঁহাদের এতদূর শ্রদ্ধা ভক্তি করিবার একমাত্র কারণ, তাহা আর বলিতে হইবে না।

গুরুভ্রাতাগণের ন্যায় শিষ্যবর্গের হৃদয়ও তিনি এক অত্যদ্ভুত ভালবাসায় জয় করিয়াছিলেন। সে ভালবাসা কত গভীর, উহার বেগ কত প্রখর, তাহার আকর্ষণী শক্তি কত তীব্র তাহা যাঁহারা অনুভব করিয়াছেন তাঁহারাই বলিতে পারেন। পাঠকবর্গ ক্ষমা করিবেন, জনক-জননীর স্নেহও সে ভালবাসার নিকট তুচ্ছ বোধ হইত। সে ভালবাসায় কত তৃপ্তি, কত শান্তি, কত আনন্দ তাহা অনুভবযোগ্য, ভাষায় বর্ণনা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাঁহার চক্ষের একটী চাহনি হৃদয়ে পুলক সঞ্চার, মুখের একটী বাণী কর্ণকুহরে অমৃত বর্ষণ এবং অঙ্গের একটী স্পর্শ হৃদয়ে আনন্দের তুফান তুলিত। উত্তর কালে স্বামী ব্রহ্মানন্দজীবনে গুরুভাবের বিকসিত শতদলপদ্মের পুণ্য সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া—কতমধুপ যে তাহার চতুর্দ্দিকে আসিয়া জুটিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। তিনি যখন যে স্থানে অবস্থান করিতেন তখন সেই স্থানে নর নারী এবং বালক বৃদ্ধ ও যুবক ভক্তে সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকিত।

তত্ত্বান্বেষিগণকে একই শিক্ষা-যন্ত্রে ফেলিয়া সমভাবে তিনি সকলকে গঠন করিতেন না; তাহাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ ভাবানুযায়ী বিভিন্নমার্গে একই লক্ষ্যাভিমুখে চালিত করিতেন, বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ধর্ম্মজগতে এরূপ শিক্ষা পদ্ধতি একমাত্র ভারতেরই নিজস্ব। সাধারণতঃ আমরা দেখিতে পাই—প্রত্যেকের মনোগত ভাব, চিত্তের ঐকান্তিকতা, বিষয়ভেদে মনের দক্ষতা অন্য হইতে বিভিন্ন। কাহারও সাহিত্যে বা ইতিহাসে, কাহারও গণিত শাস্ত্রে বা বাণিজ্যে এবং কাহারও হয়ত ব্যবহার শাস্ত্রে বা সমর নীতিতে অনুরাগ প্রবল। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ মনোগত ভাবানুযায়ী শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ পাইলে সে অচিরেই তত্তৎ বিষয় সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ব করিয়া সংসার ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হয়, কিন্তু যদি সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিকে গণিত শাস্ত্র বা বাণিজ্যানুরাগীকে

সময় নীতি শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে বিষয়ভেদে তাহার মনের স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি লাভের পথ ত চিরতরে রুদ্ধ হইয়া যাইবেই, অধিকন্তু শিক্ষিতব্য বিষয়ে বিরাগজন্য সে তাহাতেও উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না। আধ্যাত্মিক রাজ্যেও তদ্রূপ। গুরু শিষ্যের মনোগত ভাব না বুঝিয়া তাহাকে তাহার অভীষ্ট পথে পরিচালিত করিতে না পারিলে শিষ্যের উন্নতি লাভের পথও চিরকালের জন্য নষ্ট হইয়া যায়। সেই জন্য গুরু, যিনি শিষ্যের সমস্ত পরিচালন ভার গ্রহণ করিবেন তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন হওয়া, বিশেষ প্রয়োজন। ভারতে এইরূপ তত্ত্বজ্ঞের সংখ্যা ভারতেতর দেশ হইতে চিরকালই অধিক বলিয়া উহার আধ্যাত্মিক জীবন সমধিক সতেজ ও সরস। শ্রীশ্রীমহারাজ ভারতীয় ঋষিগণের চিরানুচারিত শিক্ষা-পদ্ধতি অনুসারে শিষ্যবর্গকে তাহাদের নিজ নিজ ভাবানুযায়ী—যাহার প্রবলকর্ম্মানুরাগ তাহাকে লোকহিতকর নিষ্কাম কর্ম্মে, যাহার শাস্ত্রানুরাগ তাহাকে শাস্ত্র পাঠে, যাহার ধ্যান জপ বা পূজার্চ্চনায় তাহাকে তাহাতেই উৎসাহ দান করিতেন। কিন্তু যাহাতে তাঁহার শিষ্যবর্গ সকলেই সাধনার গভীর সলিলে নিমজ্জিত হইয়া অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক জীবন লাভে সক্ষম হয় ইহাই তাঁহার প্রাণের ইচ্ছা ছিল। আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া তিনি একদিন বলিয়াছিলেন—"কিছু কর্, কিছু কর্, না খাটলে কি কিছু হয়? তোরা ভাবছিস্, যে আগে অনুরাগ ভক্তি হো'ক তারপর ডাক্‌বো, তা'কি কখনও হয়? অরুণোদয় না হলে কি আলো আসে? তিনি এলেই প্রেম ভক্তি বিশ্বাস সঙ্গে সঙ্গে আস্‌বে। তাঁকে আনবার জন্যই তপস্যা; তপস্যা ছাড়া কি কিছু হয়? ব্রহ্মা প্রথমে শুনেছিলেন, তপঃ তপঃ তপঃ। দেখছিস্ নি, অবতার পুরুষদের পর্য্যন্ত কত খাটতে হয়েছে। কেউ কি না খেটে কিছু পেয়েছে? বুদ্ধ শঙ্কর চৈতন্য এদের কত তপস্যা করতে হয়েছিল। কি ত্যাগ, কি তপস্যা! এই ত বয়স, বুড়ো মেরে গেলে আর হবে না! লাগ্ দেখি, একবার জোর করে। দেখ্‌বি মনের সব শক্তি এক কর্ত্তে পারলে আগুন ছুটে যাবে। লাগ্, লাগ্, জপ ক'রে হয়, ধ্যান ক'রে হয়, বিচার ক'রে হয়,—সবই সমান, একটা ধ'রে ডুবে যা।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি স্বামী ব্রহ্মানন্দ আধ্যাত্মিক রাজ্যের কোন্ উচ্চ মণিকোঠায় সর্ব্বদা অবস্থান করিতেন তাহা আমরা বলিতে অক্ষম। স্তিমিত পদ্মার প্রশান্ত বক্ষ দেখিয়া কেহ যেরূপ কল্পনা করিতে পারে না উহা কত ভীষণ, উহার বেগ কত তীব্র, শ্রীশ্রীমহারাজের জীবনের বাহ্যিক প্রকাশ দর্শনে তাঁহার অপরোক্ষানুভূতির গভীরতা নির্ণয় করিতেও আমরা তদ্রূপ সম্পূর্ণ অপারগ। তাঁহার বালসুলভ ব্যঙ্গ কৌতুক, অদৃষ্টপূর্ব্ব সরলতা, চপল হাস্য, অপূর্ব্ব দীনতা দর্শনে কেহ ধারণাও করিতে পারিত না—ইনিই ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয়তম মানসপুত্র শ্রীযুক্ত রাখাল—স্বামী বিবেকানন্দের আদরের ধন—'রাজা' এবং শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একমাত্র কর্ণধার 'স্বামী ব্রহ্মানন্দ'।

শ্রীশ্রীমহারাজ দয়া, করুণা ও ক্ষমার মূর্ত্ত বিগ্রহ ছিলেন। যে কোন পাপী তাপী একান্ত সরল মনে তাঁহার আশ্রয় ভিক্ষা করিলে তিনি কাহাকেও প্রত্যাখ্যান করিতেন না। এমনকি সেই মহাপুরুষ বারবণিতাগণকেও শ্রীচরণে স্থান দিয়া তাহাদিগকে ভবভয় হইতে রক্ষা করিয়াছেন। এইরূপ বিচারশূন্য দয়া তাঁহার মহত্ত্বকে ক্ষুন্ন না করিয়া বরং সমধিক উজ্জ্বল করিয়াছে। জগতের অন্যান্য মহাপুরুষগণের জীবনেও এইরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। ভগবান বুদ্ধের বারবিলাসিনী অম্বাপালীকে কৃপা প্রদর্শন, যিশুখৃষ্টের পতিত চরিত্রদিগকে পদাশ্রয় দান এবং শ্রীচৈতন্যের জগাই মাধাইকে উদ্ধার করণ ইহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

শুদ্ধ আধ্যাত্মিক জগতেই যে স্বামী ব্রহ্মানন্দ শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাহা নহে। পার্থিব জগতেও তাঁহার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী ছিল। কেহ মামলা সংক্রান্ত কোন বিষয়ে তাঁহার উপদেশ লইতে আসিয়াছে, তিনি তাহাকে একজন বিজ্ঞ আইনজ্ঞের ন্যায় পরামর্শ দান করিতেছেন, কাহাকেও বা গৃহনির্ম্মাণ কার্য্যে সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ারের মত সকল বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া বলিতেছেন, আবার কাহারও পীড়া হইয়াছে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের ন্যায় তাহার ঔষধের ব্যবস্থা করিতেছেন। আধ্যাত্মিক ও পার্থিব জগতের এরূপ সর্ব্বজ্ঞান সম্পন্ন গুরুভাব তদীয় আচার্য্য

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং গুরুভ্রাতা স্বামী বিবেকানন্দ ব্যতীত অন্য কোন মানবে আমরা দেখিতে পাই না। একদিনের নিমিত্তও যে, তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছে, বারেকের জন্যও যে তাঁহার সদানন্দময় রূপ দর্শন করিয়াছে সে কখনও তাঁহাকে বিস্মৃত হইতে পারিবে না। তাঁহার অপার স্নেহে জননীর স্নেহ ভুলিয়াছিলাম, তাঁহার আশ্রয়ে জগতের ভীষণতা অন্তরে স্থান পাইত না। রাজাধিরাজ পিতার ক্ষমতা সন্তান যেরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, তদ্রূপ শ্রীশ্রীমহারাজের নিবিড় ভালবাসা আমাদিগকে তাঁহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে দেয় নাই। আমরা জানিতাম না তিনি আধ্যাত্মিক রাজ্যের কত বড় রাজা, ভাবিতাম না শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের তিনি সর্ব্বময় কর্ত্তা, শুধু জানিতাম তিনি আমাদের জনক জননী, ইহ-জগতের একমাত্র আশ্রয় স্থল।

হে পরমাশ্রয়, তোমাকে আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন্ত বিগ্রহ মনে করিয়া তোমার অপার স্নেহে মুগ্ধ থাকিতাম—"ত্বং হি নঃ পিতা যোঽস্মাকং বিদ্যায়াঃ পরং পারং তারয়সি।" তুমিই আমাদের পিতা, তুমি আমাদিগকে অবিদ্যার পরপারে উত্তীর্ণ করিতেছ।

শ্রীঅনন্ত।

---

(১০)

সবে মন্ত্র করেছি গ্রহণ।
সংসারের অন্তরালে
লজ্জামাখা কুণ্ঠা-জালে
গুরুপদ করেছি দর্শন,
আপনারে ঢেলে দিয়ে
পাপ পুণ্য প্রকাশিয়ে।
এ জীবনে কি চাহেন নাথ!

—সে বারতা জেনে লই
আজ কই—কাল কই
মিথ্যা করিয়াছি দিন পাত!
কে জানিত অকস্মাৎ
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত
ফুরাইবে আশার স্বপন!
সুদূর প্রবাসে ব'সে
বারতা কাণেতে পশে
স্পন্দে বুকে দরুণ কম্পন॥

'না বোঝ—কি এলো গেল
যা হল তা বল ভাল
কালচক্র সুদর্শন নাম।
চরাচর পালিবারে
ঘোরে নারায়ণ করে
অস্ত্ররূপে মন অভিরাম'
—থাকরে জ্ঞানের বাণী
গুমরি দহিছে প্রাণী
আজি তার কোনও মূল্য নাই।

কাঁদ—পার যদি—তবে—
হৃদি সুশীতল হবে
বিমুগ্ধতা! তাই আজি চাই
উথলিয়া শিহরিয়া
পরিপূর্ণ হোক হিয়া
চক্ষে হোক শ্রাবণ বর্ষণ।
স্মরি সেই মধুবাণী
জ্যোতির্ম্ময় ছবিখানি
দেবকীর্ত্তি করিয়া স্মরণ

সব স্তব্ধ হয়ে যাক্
ধরা মিলাইয়া থাক্
মিশে গিয়ে কর বিলোকন
—লুপ্ত হৌক সকল চেতন
মায়াবদ্ধ পিতৃগণ
মৃত্যু অন্তে বেঁচে রন
স্নেহ শ্রদ্ধা অনন্ত বাঁধনে।
—তিনি ঐশী আশীর্ব্বাদ
তাপতপ্ত মনোসাধ
মিলাইয়া জীবন জীবনে।
'কিসে বা অপূর্ণ রাখে
কেন বা ভাবিব তাঁকে
যাত্রী শুধু অনন্ত পথের।'
—তিনিও অমর হয়ে
দেখিব নিকটে রয়ে
থাকে যদি বাঁধনের ফের॥
যারা ভাই ভালবেসে
জুটেছিলে কাছে এসে
মিশেছিলে প্রেমের পাথারে।
সেই মূর্ত্তি মনে আঁক
রাখ বুকে হাত রাখ
বিন্দু তরে যেয়োনা সংসারে।
সেই প্রেম সেই প্রাণ
হবে নাক কভু ম্লান
চক্ররচি প্রবর্ত্তিবে তাঁরে।
তিনি যোগী সর্ব্বত্যাগী
জানি তোমাদেরি'লাগি
আছে জাগি,—মুক্তি পরপারে।

বিরলে একাকী স্থান
উদার সে মহাপ্রাণ
সে নির্ব্বাণ লবে না নিশ্চয়।
ব্যাপ্তি লাগি বহু ঘরে
লীলারি প্রকারান্তরে
করেছেন অনন্ত আশ্রয়।
এ দেহ যে ঘুচে গেছে
প্রাণ তাঁর যাচে—যাচে
বহু দেহে হ'তে প্রাণময়।
তোমাদেরি মাঝে এবে বয়
ওরাতো আসেনা ভবে
'দাও মোরে, মোর' রবে
ওরা সব শ্যাম মুরলীর।
সারাটি জীবন জিয়ে
যায় জীবে ডাক দিয়ে
মহাসিন্ধু ওই নীল নীর
ক্ষুদ্র হয়ে ভুলে আছি
ত্রাসে আসি মরি বাঁচি
তাই রূপ—তাই নরদেহ।
দীনতার ভাণ করি
সাজে তাই আমাদেরি
খেলাচ্ছলে ধরে মায়াস্নেহ।
গুরু পদে পুষ্পাঞ্জলি
দাও কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লি
কর আজ আত্মসমর্পণ।
ভাব নিজে ভাগ্যবান
ধন্যতব নর প্রাণ
মিলেছিল মূর্ত্ত নারায়ণ॥ শ্রীসত্যবালা দেবী।

(১১)

প্রায় আটাশ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা, মঠের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। কেন জানি না, কি কারণে মনে নাই, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রিয়ভক্ত শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তের সহিত মঠে যাই। তখন এই মঠ বরাহ নগরের আলম বাজারে। যৌবনের প্রথম উন্মেষ। সবল সুস্থদেহ, ততোধিক সুস্থ ও সবল মন। সংসারের কোনো চিন্তা নাই, বিশেষ বন্ধন নাই। শতমুখ-প্রসারি কল্পনা, রঙীণ ডানা মেলিয়া মুক্ত আকাশের দিকে ছুটিয়াছে। কত আশা, কত সুখস্বপ্ন। মঠে গেলাম ভাগ্যবশে মহারাজেরা চরণ ধূলিও দিলেন। তাঁহাদের মধ্যে স্বামী যোগানন্দ, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ আজ কোথায়? উৎসবে, পার্ব্বণে মঠে যাই, মহারাজদের তামাক সাজি, কত গল্প করি, ফাই ফরমাস খাটি, আর কি জানি কেন একটা বিপুল আনন্দে প্রাণ মাতিয়া উঠে।—কখনো কখনো গিরীশ বাবুর নাটক হইতে কোনো কোনো অংশের আবৃত্তি করি, মহারাজেরা হাসিয়া আকুল, আমি আত্ম-প্রসাদে উৎফুল্ল! এমনি গতায়াত, এমনি মেলামেশা। কত রাত্রি দক্ষিণেশ্বরে কাটাইয়াছি, পঞ্চবটী তলায়, নহবৎ খানায়, গঙ্গার ধারে পোস্তার উপরে—ঠাকুরের কথা, স্বামী বিবেকানন্দের কথা—তখন বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে জগৎ তোলপাড়। মাথার উপর মুক্ত আকাশ, সম্মুখে কলনাদিনী পূত প্রবাহিনী জ্যোৎস্না স্নাতা ভাগীরথী, আর চারিদিকে ফোটা ফুলের আকুল করা গন্ধ। উচ্চে উচ্চে, কত উচ্চে মনকে ছাড়িয়া দিতাম, হায় সেদিন,—আর আজ?

একটা কথা আছে, কল্পতরু মূলে যে যা' চায়, সে তাই পায়। —কি চাহিয়াছিলাম? মনের অগোচর তো পাপ নাই। যাহা চাহিয়া ছিলাম, ঠাকুর অকৃপণ-করে তাহাই দিয়াছেন, যাহার কণ্টক বেষ্টনী আজ অসহ্য, যাহার দংশন জ্বালাময়, যাহার অস্তিত্ব সর্ব্বসুখ হর। থিয়েটারের দলে মিশিলাম। তাহার পর মঠ হইতে, দক্ষিণেশ্বর হইতে, মহারাজদের চরণ প্রান্ত হইতে ধাপে ধাপে অকুতো সাহসে, ধীর অবিচলিত পাদক্ষেপে,

অন্ধকার সংসার গহ্বরের ক্রমনিম্নস্তরে নামিতে লাগিলাম। বিষম রোগ—মঠ, ভাল হইল! আর সেদিক মাড়াই না। চোরের মত লুকাইয়া এক আধ বছর হয়তো বেলুড়ে ঠাকুরের উৎসব দেখিয়া আস্তানায় ফিরি। দিন কোথা দিয়া চলিয়া যায়, কে তাহার সন্ধান রাখে। অনুকূল বাতাসে ঘুড়ী তখন তর তর করিয়া আকাশে উঠিয়া বুঁদ হইয়া গিয়াছে। আমি তখন সর্ব্ব বিষয়ে পুরা থিয়েটার ওয়ালা।

বার চৌদ্দ বৎসর এইভাবে কাটিল। একদিন—সুহৃৎ কি দুষ্ম জানি না—মতিলাল (শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মতিলাল) বলিল "হাঁ হে, তুমি আর মঠে যাও না কেন?" নিজের কাছে নিজেই চোর, বলিলাম "এ প্রাণ নিয়ে মঠে যেতে আর ইচ্ছা হয় না।" মতিলাল হাসিয়া বলে, "প্রাণ কবেই বা কি ছিল, আর আজই বা কি হয়েছে" মতিলাল ছাড়েনা, এক রকম জোর করিয়াই আমাকে "উদ্বোধনে" লইয়া গেল। বহুকাল পরে স্বামী সারদানন্দের পদধূলি লইলাম। তখন "রামানুজ" লিখিতেছি মতিলালই শশিমহারাজের (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণানন্দ স্বামীর) রামানুজ চরিত আনিয়া দিয়াছে। আর তাহার নিত্য কাবুলাওয়ালার তাগাদা চলিতেছে "কি হইল, কতদূর লেখা হল"? অঙ্কের পর অঙ্ক লেখা হয় আর স্বামী সারদানন্দকে শুনাইয়া আসি, তিনি উৎসাহ দেন, আশীর্ব্বাদ করেন। আমার ভাগ্য ক্রমে এই সময় মহারাজ শুনিলেন, আমি "রামানুজ" লিখিতেছি। শুনিলাম রামানুজ লেখা হচ্ছে শুনে 'মহারাজ' খুব খুসী হয়েচেন, জিজ্ঞাসা করেছেন "কে লিখছে, আমাদের সেই অপরেশ"? বন্ধুর মুখে শোনা কথা, তবু এখনো কর্ণে ঝঙ্কার তুলিতেছে "আমাদের সেই অপরেশ"। এমন করিয়া পরকে, পতিতকে, পাপীকে কে আপনার করিয়া লইতে পারে? কুম্ভকর্ণের নিদ্রা যেন নিমিশে ভাঙ্গিয়া গেল, ভয়ে, ভয়ে সসঙ্কোচে রামানুজের পুঁথি বগলে করিয়া "বলরাম-মন্দিরে" গেলাম মহারাজকে শুনাইতে,—তাঁহার আশীর্ব্বাদ আনিতে। চাহিবার পূর্ব্বে যে আশীর্ব্বাদ অকৃপণ-করে ঢালিয়া ঢালিয়া দিয়াছেন—তখন তো জানিনা। স্থানে স্থানে শুনিলেন,—কি আনন্দ, কি উৎসাহ, নীরদ মহারাজকে টেলিগ্রাম করিলেন, তিনি

তখন মুর্শিদাবাদে, মহারাজের ইচ্ছা তিনি গানের সুর করেন। মহারাজেরই আদেশে—রামনামের গানটী ইহাতে সন্নিবিষ্ট করি।

তাহার পর এই কয় বৎসরের স্মৃতি—কি বলিব, কি যে ভালবাসা, কি-যে টান, কি-যে অযাচিত করুণা, আর সর্ব্বপরি কি-যে মোহকরী আকর্ষণ! আমার মত হীন, শত কলুষেভরা জীবন, ভদ্র সমাজ অনেক কিছু বলিয়া নাসিকা কুঞ্চন করেন, যাঁরা ধর্ম্ম করেন—ভ্রষ্ট বলিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়ান, কিন্তু আমার মহারাজের হৃদয়ে এ-কি সঞ্চিত স্নেহ ধারা। কি তাঁহার আশ্বাস বাণী, আমার মত হতভাগ্যের জন্য কি তাঁহার ব্যথা। মঠে আমি যাই আর নির্ব্বাক হইয়া ভাবি, কি-এ আকর্ষণ? হেলায় ত্রিতাপ ভুলাইয়া দেয়, সংসারবিষের জ্বালা—নিমেষে জুড়াইয়া দেয়, কামনা—স্খলিত চরণে যেখানে মাটীতে লুটাইয়া পড়ে, দেখি দলে দলে মহারাজের নিকট লোক যায়, আর পরিপূর্ণ আনন্দ লইয়া ফিরিয়া আসে। কি-এ আকর্ষণ, কি-এ মহাশক্তি! আড়ম্বর নাই, বাগ্মীতা নাই, বিদ্যার প্রচার নাই—এ সন্ন্যাসী তামা-কে সোণা করে না, খড়ম পায়ে-গঙ্গাপার হয় না, বিভূতির কলাই নাই, অষ্ট সিদ্ধির বালাই নাই, কিন্তু তবুও কি-এ আকর্ষণ! সংসার ত্যাগী যতি, মায়াবাদী সন্ন্যাসী, ব্রহ্মমাত্র উপজীবী আনন্দময় সত্তা স্বামী ব্রহ্মানন্দ। কিন্তু ব্যথিতের কাছে, তাপিতের কাছে—মমতার সাগর, মায়ার অবতার, মাতৃ হৃদয়ের মত কোমল হৃদয়, যেন জগতের জীবের পুঞ্জীকৃত ব্যথায় সদা কাতর!

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখিবার ভাগ্য আমাদের হয় নাই! কিন্তু শুনিয়াছি তিনি একবার করুণ নেত্রে যাহার প্রতি চাইতেন, সে ভাগ্যবান আর তাঁহাকে ভুলিতে পারিত না। কি-এ আকর্ষণ, ইহা আমরা জানিনা, বুঝিনা কিন্তু স্বামী ব্রহ্মানন্দের জীবনে নিত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছি, যে তাঁহার নিকট আসিয়াছে, যে তাঁহার নিকট বসিয়া দুদণ্ড কথা কহিয়াছে, সেই এক অজ্ঞাত আকর্ষণে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। রামকৃষ্ণদেবের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ—ঠাকুর বুঝি আপন আকর্ষণী শক্তি তাঁহার এই মানস পুত্রের নিকট সঞ্চিত রাখিয়া

গিয়াছিলেন। তাই ব্রহ্মানন্দ স্বামী প্রেমের অবতার। এ-প্রেমে ঘৃণা ছিল না, বিদ্বেষ ছিল না, বিভাগ ছিল না, যত বড় পাপী হউক যেমন তাপিত হউক, ধনী নির্ধন পণ্ডিত মূর্খ সাধু অসাধু তিনি সকলকে অকাতরে এই প্রেম বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। পুরাণে গুরুভক্তির কথা পড়িয়াছি, মনে হইয়াছে ইহা পৌরাণিক, ইহা অলৌকিক, জাগতিক নয়। কিন্তু স্বামী ব্রহ্মানন্দের-শিষ্যবর্গের মধ্যে ভাগ্যক্রমে যে গুরু ভক্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা বুঝি পুরাণকেও অতিক্রম করিয়াছে। এই বৈজ্ঞানিক যুগে বিদ্যা যখন অবিদ্যার নিশান উড়াইয়া, জগতকে চকিত ত্রাস্ত ব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে, যখন পায়ের নীচের মুষ্টি মাত্র মৃত্তিকাও লোকে পরীক্ষা না করিয়া লইতে চাহে না, একটা মাটীর হাঁড়ি তিন বার বাজাইয়া তবে কেনে—এই জড়বাদীর যুগে কি-এ গুরুভক্তি, কি-এ অনুরাগ? মহারাজ ইঙ্গিতে আদেশ করিতেছেন—হাসিমুখে, মিষ্ট-কথায়-আদর করিয়া;—আর সংসার ত্যাগী সাধু—তাঁহার শিষ্য, তাঁহার পুত্র—উচ্চ সংসারীর উটজ প্রাঙ্গণে সাগ্রহে ছুটিয়া গিয়া দীনের দীন হীনের হীন সঙ্গিহারা বন্ধুহারা, পীড়িতের মলমূত্র চন্দন জ্ঞানে ধৌত করিয়া দিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইতেছেন। অন্নপূর্ণার হৃদয় লইয়া নিরন্নের মুখে ভিক্ষার অন্ন তুলিয়া দিতেছেন, শোকার্ত্তের অশ্রুতে অশ্রু মিশাইয়া সমবেদনার অমৃতধারায় তাহার শোকবহ্নি নির্ব্বাপিত করিতেছেন। এই যে সেবা, এই যে পরার্থে আত্মদান যে মহাপুরুষের ইঙ্গিতে যন্ত্রচালিত কর্ম্মের ন্যায় অনাড়ম্বরে নিষ্পন্ন হয়, ভগবান যদি সত্য ব্যথাহারী হন তাহা হইলে এই ব্রজের রাখাল—রাখাল মহারাজ, যে তাঁহারই মানসপুত্র, তাহাতে সন্দেহ করিবার কি আছে?

ব্রহ্মানন্দ স্বামী নাই, চারিদিকেই এই রব! তাঁহার অনুরক্ত ভক্ত শিষ্য সন্ন্যাসী গৃহী সকলের হৃদয়েই সমান হাহাকার! কিন্তু সত্যই কি তিনি নাই? তাঁহার ভৌতিক দেহ লোক-লোচন হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তবু কি তিনি নাই? তিনি আছেন, তিনি ছিলেন, তিনি থাকিবেন। তাইতো মা আনন্দময়ী ব্রজের শ্যামো-

ন্মাদিনী কালিন্দীকূল হইতে কুড়াইয়া আনিয়া ব্রজের রাখালকে এই শ্যামাঙ্গিনী বঙ্গের কোমল অঙ্কে তুলিয়া দিয়াছিলেন। বাঙ্গালীকে টানিয়া তুলিবার জন্য—বাঙ্গালাকে ধন্য করিবার জন্য—সেই বাঙ্গলায়, যেখানে বুদ্ধ নির্ব্বাণ মন্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন, যেখানে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু আচণ্ডালে নাম-সুধা বিতরণ করিয়াছিলেন, যেখানে আনন্দময় নিত্যানন্দ গললগ্নী কৃতবাসে দ্বারে দ্বারে বলিয়া বেড়াইয়াছিলেন—"আমায় কিনিয়া লহ বল গৌরহরি" সেই বাঙ্গালার নিজসম্পদ শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র, রাখাল মহারাজ—স্বামী ব্রহ্মানন্দ—তাঁহার ভাববিগ্রহ লইয়া ঐ যে আমাদের সম্মুখে ;—কে বলে তিনি নাই!

শ্রীঅপরেশচন্দ্র।

(১২)

আমার ভাবের ঠাকুর
ভাবতরঙ্গে, সদাই রঙ্গে
নেচে নেচে আসে যায়।
সে যে ভাবের চিন্তামণি
তারে ভাব বিনে কি
প্রাণের মাঝে ধরা যায়॥
ভাবের ঘোরে হাসে খেলে
ঘোরে ফেরে
ছায়াবাজীর প্রায়।
নমি সেই রসসিন্ধু
আর্ত্তবন্ধু প্রেমের ইন্দু
স্নেহ কোমল করুণ হৃদয়॥
পবিত্র নির্ম্মল শশী
অধরে অমিয়া হাসি

সে ধন হারায়ে প্রাণে
কি যাতনা পায়!
কাঁদে তব ভক্তবৃন্দ
কোথা হে সখা-গোবিন্দ
আকুল ব্যাকুল তব
বিরহ ব্যথায়॥
তুমি যে কি ধন
অমূল্য রতন
দিলে না চিনিতে
একি ছলনায়।
পাষাণে বাঁধিয়া প্রাণ
গাহি তব অন্তর্ধান
কোথা তুমি ভগবান
লুকালে কোথায়॥

বুড়ী।

(১৩)

যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের লীলা দর্শন আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। রামকৃষ্ণসঙ্ঘের অন্যতম নেতা স্বামী বিবেকানন্দ বা স্বামী যোগানন্দের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মিশিবার সৌভাগ্য আমার ছিল না। ঠাকুর সম্বন্ধে আমার যাহা কিছু জ্ঞান তাহা মহাকবি গিরিশচন্দ্রের মুখে শ্রুত তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনোপলব্ধি ও অনুভূতির আংশিক উন্মেষ মাত্র। বর্ত্তমান প্রবন্ধের সহিত সে সকলের কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও, যে মহাপুরুষের জীবনকথা আলোচনা করিতেছি তাহার সহিত আমার সে স্মৃতি পরোক্ষভাবে জড়িত। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয় গিরিশ-

চন্দ্রের গৃহে। মঠে, দক্ষিণেশ্বরে ও বলরাম মন্দিরে ইতিপূর্ব্বে তাঁহার দর্শন পাইলেও ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের তেমন সুবিধা হয় নাই। গিরিশচন্দ্রের মুখে ঠাকুরের অহেতুকী কৃপা ও ভালবাসার কথা শুনিয়া মনে হইত যে, দিন বৃথাই কাটিয়াছে, নররূপী নারায়ণের দর্শন এত সুলভ হইলেও হেলায় সে সুযোগ খোয়াইয়াছি। গিরিশ সে কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিতেন, দেখ, তোমরা আমাদের চেয়েও ভাগ্যবান, কেন জান, তোমরা ঠাকুরের নাম শুনিয়া এদ্বারে আসিয়াছে। ঈশা বলিয়াছেন "Blessed be he that cometh in the name of the Lord"

গিরিশের কথায় তখনকারমত শান্ত হইতাম সত্য, কিন্তু মনের ক্ষোভ মিটিত না।

যতদুর স্মরণ হয়, সে দিন বৈকালে মহারাজের সহিত গিরিশচন্দ্রের ঠাকুরের প্রসঙ্গ চলিতেছিল। আমি এক চ্যাংড়া সন্দেশ লইয়া উপস্থিত হইলাম। গিরিশ বলিলেন "দেখ ভাগ্যিবানের বোঝা ভগবানে বয়, বেশ করেছ, ওঁর কাছে দাও।" আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া উহা মহারাজের সম্মুখে রাখিলাম। মহারাজ আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। গিরিশ আমার পরিচয় দিয়া ভৃত্যকে জল অনিতে আদেশ করিলেন। জল আসিলে মহারাজ সন্দেশগুলি (চেঙ্গারী সমেত) ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া সানন্দে দুই একটী মাত্র গ্রহণ করিয়া বলিলেন "বাঃ। উত্তম সন্দেশ—সকলকে দাও।" সমবেত ভক্ত মণ্ডলীর মধ্যে উহা বিতরণ করিলাম। গিরিশ বলিলেন "তোমার খুব জোর বরাত"। তাহার পর আরও খানিকক্ষণ কথাবার্ত্তা চলিল, সন্ধ্যা হইয়া গেল, মহারাজ বলরাম মন্দিরে চলিয়া গেলেন। তাঁহার প্রস্থানের পর আমি গিরিশচন্দ্রকে এ অযাচিত করুণার হেতু জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন "দেখ, এর আর মানে নাই, যখন যার কাছে দরকার ঠাকুর ঠিক সেইখানে নিয়ে যাবেন।" গিরিশ সহোদর অতুলচন্দ্র সেখানে উপস্থিত ছিলেন বলিলেন "পরমহংসের কথা—রাখাল তাঁর ছেলে। ছেলে যত বড়ই মূর্খ ও আবদেরে হোক, বাপের কিছু কিছু গুণ তাতে বর্ত্তায়, রাখালে তাঁর অনেক গুণ বর্ত্তেছে। তোমরা পরমহংসের

দেখা পাওনি; তাঁর ছেলেদের দেখে কতকটা Idea পাবে।" গিরিশ বলিলেন "দেখ, ঠাকুর বলিতেন, এই খানকে এলে গেলেই হবে। 'এই খানকে' মানে কি জান—তাঁর চিহ্নিত ভক্তদের কাছে।" সকল কথা বোধগম্য হোক বা না হোক, অপূর্ব্ব শান্তি ও আনন্দ লইয়া সে রাত্রে গৃহে ফিরিয়াছিলাম।

ইহার কিছুদিন পরে বেলুড়মঠে মহারাজের সহিত আমার দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হয়। সেদিন রবিবার হইলেও, মঠে বেশী ভিড় ছিল না। মহারাজ ও তাঁহার দুই চারিটী অনুচর শিষ্য ভিন্ন, প্রায় সকলেই সে দিন সালিখার উৎসব দেখিতে গিয়াছিলেন। আমরাও সেখানে গিয়াছিলাম; প্রসাদ ধারণের পর সুবিধা হওয়ায় ডাক্তার কাঞ্জিলাল প্রভৃতি দুই চারিজন ভক্তের সহিত নৌকাযোগে মঠে চলিয়া আসি। বেলা অপরাহ্ন, মহারাজ চাএর টেবিলের পূর্ব্ব ধারের বেঞ্চিতে বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন। আমাদের দেখিবামাত্র বলিলেন "এইযে, এস, কেমন আছ?" আমরা সাষ্টাঙ্গ প্রণামের পর সামনের বেঞ্চি খানিতে বসিলাম। সালিখার উৎসবের কথা চলিতে লাগিল। মহারাজ বলিলেন "শরীরটে ভাল ছিল না ব'লে উৎসবে যেতে পারিনি।" তারপর পুলিন মিত্র, কাঞ্জিলাল প্রভৃতির সহিত হাস্যপরিহাস চলিতে লাগিল। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে দেখিলাম দুইজন মান্দ্রাজী ভক্ত কতকগুলা ফুল লইয়া ঠাকুর ঘরের সিঁড়ি বাহিয়া উপরে গেল এবং পরক্ষণেই ফুলগুলিসমেত নীচে নামিয়া আসিল। ফুল ঠাকুর ঘরে না রাখিয়া, ফিরাইয়া আনিতে দেখিয়া মনে কেমন খট্‌কা লাগিল; ভাবিলাম, কি আশ্চর্য্য! ঠাকুরের স্থান, এমন সুন্দর গোলাপ ঠাকুরকে না দিয়া অম্লানবদনে ফিরাইয়া লইয়া যাইবে। ভক্তদ্বয় কিন্তু কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ না করিয়া মহারাজের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। আঁখির পলকে মহারাজ একবার তাহাদের দিকে চাহিয়া ধ্যানস্থ হইবার উপক্রম করিলেন এবং পরক্ষণেই সমাধিস্থ হইয়া ঠাকুরের ছবির মূর্ত্তির মত, নিশ্চল নিস্পন্দে অবস্থান করিতে লাগিলেন। উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীর কেহই ইতিপূর্ব্বে মহারাজের এরূপ ভাবান্তর দেখে নাই। মহারাজ অসুস্থ হইয়াছেন মনে

করিয়া সকলেই চঞ্চল হইয়া উঠিল। ডাক্তার কাঞ্জিলাল নিকটেই বসিয়াছিল, তাড়াতাড়ি নাড়ী টিপিল। বলাবাহুল্য, কিছুই অনুভব করিতে পারিল না—একজন জল আনিতে ছুটিল। মান্দ্রাজী ভক্তদ্বয় কিন্তু কিছু-মাত্র বিচলিত হইল না, ধীরে ধীরে মহারাজের অভয় চরণ সমীপে উপস্থিত হইয়া পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া আপনাদিগকে ধন্যজ্ঞান করিল। প্রায় ৩।৪ মিনিট পরে মহারাজ প্রকৃতিস্থ হইলেন। অন্তরঙ্গ ভক্তেরা মহারাজকে এরূপ হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। "ঠাকুর জানেন" ছাড়া আর কোন বিশেষ উত্তর পাইয়াছিলেন বলিয়া আমার স্মরণ নাই। প্রসাদী ফুল লইয়া আমরা নৌকায় ফিরিয়া আসিলাম। সহযাত্রিগণের বিজ্ঞতা ও বক্তৃতার স্রোত ছুটিল, আমার কিন্তু সে সকল কিছুই ভাল লাগিল না, অন্তমন কেবলই বলিতে লাগিল নররূপী নারায়ণ—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ছবিতে ও তাঁহার মানসপুত্র সচল বিগ্রহ রাখালরাজে বিশেষ প্রভেদ নাই।

ভক্তজননী শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী,—গিরিশের সহিত কথা না কহায় গিরিশচন্দ্র দারুণ অভিমান ভরে মাকে বলিয়াছিলেন যে "তিনি হয়েছেন ছবি, আর তুমি হয়েছ বৌমা"। স্বামী ব্রহ্মানন্দকে না দেখিলে আমার মনে সে ভাব বদ্ধমূল হইয়া থাকিত। যে সকল মহামূল্য উপদেশ আমি তাঁহার কাছে পাইয়াছি তাহা সাধারণে প্রকাশ করিবার নয়—এবং তাঁহাকে বুঝিবার বা তাঁহার বিষয়ে লিখিবার শক্তি আমার নাই, কেবল একটীমাত্র কথা বলিতে পারি, তাঁহার কাছে যা কিছু পাইয়াছি তাহা তাঁহারই দয়ায়—আমার দাবী-দাওয়া তাহাতে কিছুই ছিল না।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মতিলাল।

---

(৪)

সম্মুখে মৃত্যুর ভৈরবা ছবি, পশ্চাতে স্মৃতির অস্পষ্ট ছায়া। একটী একটী করিয়া জীবনপথের আলোক নিবিতেছে, আর আমি স্থির শুষ্ক চক্ষে চাহিয়া আছি! এই চোখেই দেখিয়াছি, আকাশের ঊর্দ্ধতম বিন্দু হইতে মধ্যাহ্ন সূর্য্যের অন্তর্ধান—শ্রীরামকৃষ্ণের লোকলীলা অবসান। তারপর শ্রীযোগানন্দ, শ্রীবিবেকানন্দ, শ্রীনিরঞ্জনানন্দ, শ্রীঅদ্বৈতানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণানন্দ, শ্রীত্রিগুণাতীত, শ্রীপ্রেমানন্দ, শ্রীঅদ্ভুতানন্দ, পরমারাধ্যা শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত-জননী শ্রীশ্রীমা—একে একে সকলের জ্যোতি অন্তর্হিত হইয়াছে। অবশেষে শ্রীব্রহ্মানন্দে বিকশিত ব্রহ্মজ্যোতি পরব্রহ্মে বিলীন হইয়া গেল। মনে হইল যেন আপনার হইতে আপনার কাহাকে হারাইলাম, কিন্তু চক্ষু ভিজিল না; বুঝি, শোকের শেষ সম্বল অশ্রুজল নিঃশেষ হইয়া গেছে; আছে কেবল এই জীবন-সায়াহ্নে অর্দ্ধ জীবনব্যাপী স্মৃতির সুদীর্ঘ ছায়াপাত।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, 'রাখাল আমার ছেলে'—মানসপুত্র। ইহার অর্থ বুঝিবার সামর্থ্য আমার নাই। তবে শিখা হইতে অনুরূপ শিখার সঞ্চার, যদি একথার তাৎপর্য্য হয়, পিতা-পুত্র উভয়কে দেখিবার অপরিসীম সৌভাগ্য যাঁহার ঘটিয়াছে, তিনিই কতক উপলব্ধি করিতে পারিবেন, শ্রীরামকৃষ্ণ কেন বলিতেন—রাখাল আমার ছেলে।

যাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণের এই মানসপুত্রের সহিত ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা বলেন, মহারাজ (শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে 'স্বামিজী' বলিলে যেমন শ্রীবিবেকানন্দকে, 'মহারাজ' বলিলে তেমনি শ্রীব্রহ্মানন্দকে বুঝাইত) অমিত ব্রহ্মতেজসম্পন্ন ছিলেন; তাঁহার বহুমুখী শক্তি বর্ষার বারিধারার ন্যায় শতমুখে প্রবাহিত হইত। কিন্তু এত তেজ, এত শক্তি কিরূপে যে মৃণ্ময় আধারে এত শান্ত হইয়া থাকিত, তাহার সন্ধান কেহ জানিত না। বিদ্যুদ্বাহী তার দেখিতে নির্জীব, কিন্তু স্পর্শ করিলে জানা যায়, কি অমোঘ শক্তি তাহার অন্তর্নিহিত। শুনিতে পাই, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির শরীর মৃণ্ময় নয়—চিণ্ময়। কিন্তু এই

চিন্ময় পুরুষের সংস্পর্শে আসিয়া সে তথ্য সহজে বুঝা যাইত না। কি অলৌকিক ভালবাসায় তিনি সকলকে ভুলাইয়া রাখিতেন! সাধু, ভক্ত, ব্রহ্মচারী নির্ম্মল চিত্ত লইয়া, অথবা, বঞ্চিত, তাপিত, পতিত, কলঙ্কিত জীবনের বোঝা বহিয়া, যে কেহ এই পুরুষোত্তমের পদপ্রান্তে উপনীত হইয়াছেন, তিনিই অন্তরে অন্তরে এ সত্য অনুভব করিয়াছেন। তিনিই দেখিয়াছেন, যাহাকে সম্ভাষণ করিতে মন সঙ্কুচিত হয়, সেই অনাদৃত জনকে মহারাজ কি আদরে আপ্যায়িত করিতেছেন! আত্মীয় স্বজন যাহার নাম মুখে আনিতে কুণ্ঠা বোধ করে, কি স্নেহ-বিগলিত কণ্ঠে মহারাজ তার তত্ত্ব লইয়াছেন! যে অভাগা সর্ব্বজন-পরিত্যক্ত, কি মমতায় মহারাজ তাহাকে বাঁধিয়াছেন! যার কোথাও স্থান নাই, মহারাজের দ্বার তার জন্য চির-উন্মুক্ত! এই উদার বিশ্বপ্রেমের অমৃত আস্বাদ পাইয়া কেহ ধারণা করিতে পারিত না যে, এই নিশ্চিন্ত, শান্ত, শিবময় পুরুষের অন্তরে কি মহান্ ত্যাগ, কঠোর বৈরাগ্য, অপরিমেয় তিতিক্ষা, কি জ্ঞান, ভক্তি, নিষ্কাম কর্ম্মানুরক্তি, সংসার-মোহ-হারিণী কি মহাশক্তি উদ্বোধনের জন্য নিরুদ্বেগ প্রতীক্ষায় স্থির হইয়া থাকিত! ভিক্ষু তাঁহার অপ্রত্যাশিত করুণায় কৃতার্থ হইয়া ফিরিত; জ্ঞানী জ্ঞান-চর্চ্চায় তাঁহার ইতি করিতে পারিত না; ভক্ত সে ভক্তিসিন্ধু সন্তরণ করিয়া পার পাইত না; কর্ম্মী কর্ম্ম-কৌশলে তাঁহার কাছে হার মানিত; সংশয়ী বিশ্বাসের বল পাইত; সংসারী সংসার ধর্ম্মের নিগূঢ় মর্ম্ম বুঝিত; রসিক তাঁহার রস-স্ফুর্ত্তিতে মহাস্যধারায় হাবুডুবু খাইত; সাধক তাঁহার কাছে সাধনার উচ্চতত্ত্ব লাভ করিয়া চরিতার্থ হইত; তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া হতাশচিত্ত উৎসাহে, ভগ্নহৃদয় আশার উন্মাদনায় মাতিয়া উঠিত; অথচ এই মহারাজ বালকের সঙ্গে বালক হইয়া খেলা করিতেন!

মহারাজ যে মহারাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন, সেথায় দুঃখ দৈন্য শোকের প্রবেশাধিকার ছিল না; রিপুর দল বল প্রকাশ করিতে পারিত না; সে রাজ্যের যাঁহারা প্রজা—অমায়িক মহারাজের ব্যবহারে তাঁহারা ভাবিতেন, আমিই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়; অথচ আপন আপন

অধিকার-সীমা লঙ্ঘন করিয়া প্রশ্রয় লইতে কেহ কখন সাহসী হইতেন না। এ রাজ্যে প্রবেশ করিলে মনে হইত, সংসারের বহু উর্দ্ধে কোন্ এক অত্যাশ্চর্য্য আনন্দময় লোকে আসিয়াছি—যেখানে দ্বেষ দেশছাড়া, দ্বন্দ্ব স্পন্দহীন, আনন্দ অবাধ। শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামী তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, আধ্যাত্মিকতায় (Spirituality) রাখাল আমাদের সকলের চেয়ে বড়, তাঁহার মাহাত্ম্য যিনি বুঝিয়াছেন, তিনিই ধন্য! হায়, এই আধ্যাত্মিকতায় মানব দেবতা হয়, কিন্তু চিরজীবী হয় না! শরীর ধ্বংস হইলেও তাহার স্মৃতি অবিনাশী। দুর্লভ রত্ন যখন সুদুর্ল্লভ হয়, তখন নিভৃত পূজা লইবার জন্য তাহার স্মৃতি আমাদের বুক জুড়িয়া বসে।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

(১৫)

"নিত্য নব সত্য তব শুভ্র আলোকময়
পরিপূর্ণ জ্ঞানময়,

* * * *

সে আলোকে মহাসুখে আপন আলয়মুখে
চ'লে যাব গান গাহি
কে রহিবে আর দূর পরবাসে।"

অধ্যাত্ম রাজ্যের বিষয় শুনিতে প্রায় হেঁয়ালীর মতই শুনাইয়া থাকে। অনুভূতির কথা প্রজ্ঞাচক্ষুহীন মানব বুঝিতে পারে না। সুতরাং সে রকম কথার মূল্য উপলব্ধিহীন বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসীর নিকট প্রায় সমান। প্রভেদ—বিশ্বাসী মাথা নাড়িয়া "হাঁ" বলিয়া তাহার কর্ত্তব্য শেষ করে, অবিশ্বাসী ঘাড় বাঁকাইয়া সে কথা 'গাঁজা' বলিয়া উড়াইয়া দেয়।

তবুও শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার মানসপুত্র রাখালের সম্বন্ধে যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ পাঠক পাঠিকার অবগতির জন্য আমরা "লীলা প্রসঙ্গ" হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "রাখাল আসিবার কয়েকদিন পূর্ব্বে দেখিতেছি, মা (শ্রীশ্রীজগদম্বা) একটি বালককে আনিয়া সহসা আমার ক্রোড়ে বসাইয়া দিয়া বলিতেছেন 'এইটি তোমার পুত্র'!—শুনিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া বলিলাম,—'সেকি?—আমার আবার ছেলে কি?' তিনি তাহাতে হাসিয়া বুঝাইয়াছিলেন, 'সাধারণ সংসারীভাবে ছেলে নহে, ত্যাগী মানস-পুত্র' তখন আশ্বস্ত হই। ঐ দর্শনের পরেই রাখাল আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বুঝিলাম এই সেই বালক।

"তখন রাখালের এমন ভাব ছিল—ঠিক যেন তিন চার বৎসরের ছেলে! আমাকে ঠিক মাতার ন্যায় দেখিত। থাকিত থাকিত সহসা দৌড়াইয়া আসিয়া ক্রোড়ে বসিয়া পড়িত এবং মনের আনন্দে নিঃসঙ্কোচে স্তনপান করিত! বাড়ী ত দূরের কথা, এখান হইতে কোথাও এক পা নড়িতে চাহিত না!

* * * *

"বৃন্দাবনে থাকিবার কালে রাখালের অসুখ হইয়াছে শুনিয়া কত ভাবনা হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। কারণ, ইতিপূর্ব্বে মা দেখাইয়াছিলেন, রাখাল সত্য সত্যই ব্রজের রাখাল। যেখান হইতে সে আসিয়া শরীর ধারণ করিয়াছে, সেখানে যাইলে প্রায়ই তাহার পূর্ব্বকথা স্মরণ হইয়া সে শরীর ত্যাগ করে। সেই জন্য ভয় হইয়াছিল, পাছে শ্রীবৃন্দাবনে রাখালের শরীর যায়। তখন মার নিকট কাতর হইয়া প্রার্থনা করি এবং মা অভয়দানে আশ্বস্ত করেন। ঐরূপে রাখালের সম্বন্ধে মা কত কি দেখাইয়াছেন। তাহার অনেক কথা বলিতে নিষেধ আছে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবমুখে বহুবার বলিয়াছেন, "যে রাম যে কৃষ্ণ, সেই ইদানীং (নিজ শরীর দেখাইয়া) রামকৃষ্ণ।" বলিয়াছেন, রাখাল, ব্রজের রাখাল, কৃষ্ণের লীলা সহচর। আরও বলিয়াছেন, "যার, যার, তার তার, যুগে যুগে অবতার।"

উক্ত কথাগুলি ছাড়া গঙ্গাবক্ষে 'প্রস্ফুটিত কমলের উপর কৃষ্ণের হাত ধরিয়া রাখাল দাঁড়াইয়া আছে,' এই অনুভূতির কথা ঠাকুর তাঁহার শিষ্য-

গণকে বলিয়া, সে কথা রাখালকে জানাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় দীর্ঘকাল পরে গত ৮ই এপ্রিল, শনিবার রাত ১২টার পর হইতে সে কথার অনেক কথাই নিজেই বলিয়াছিলেন।

বিগত ২৬শে চৈত্র, ১৩২৮,—ইংরাজী ১০ই এপ্রিল, ১৯২২, সোমবার রাত ৮টা ৪৫ মিনিটের সময় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ দেহরক্ষা করিয়াছেন। গত ২২শে মার্চ্চ, বুধবার মহারাজ বেলুড়মঠ হইতে বাগবাজার ৫৭নং রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীটে বলরাম বসুর বাড়ীতে আসেন। সেখানে আসিয়া তিনি মাত্র দুইদিন সুস্থ ছিলেন। শুক্রবার দিন তাঁহার কলেরা হয়। আটদিন পর্য্যন্ত আক্রমণের জের ছিল। তারপর বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হয়েন। সকল রকম চিকিৎসাই করা হইয়াছিল, কিন্তু কোন ঔষধেই রোগের উপশম হইল না। রোগের তীব্র যন্ত্রণা স্থূল শরীরে তাঁহাকে ১৮ দিন ভোগ করিতে হইয়াছিল।

সন ১২৬৮ সালে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ধনীর গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্যে সুখের ক্রোড়ে লালিতপালিত, যৌবনে শ্রীরামকৃষ্ণের অহেতুকী ভালবাসার উত্তরাধিকারিত্ব, শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাবসানে সন্ন্যাস আশ্রয়ে সর্ব্ব প্রকার ভোগসুখ বিরত, ভারতের বিভিন্ন তীর্থাদিতে সাধনভজন রত, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, উত্তরকালে স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া সঙ্ঘের সকলের আন্তরিক শ্রদ্ধালাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহারই কর্ম্মকুশলতায় এই অত্যল্পকাল মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশন এত যশস্বী হইয়া উঠিয়াছে।

তাঁহার লোক চিনিবার এবং উপযুক্ত কাজে উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিবার এক অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল, প্রতীকারপরায়ণ হইয়া যখন তখন কাজ করা অপেক্ষা Wait and See এই নীতি অনুসরণ করিয়া দিন কতক চুপ করিয়া থাকাই তিনি সমধিক বাঞ্ছনীয় মনে করিতেন। তাঁহার আঁখিযুগলকে ফাঁকী দিয়া কাজ করিবার সাহস কাহারো ছিল না। আবার সে আঁখি যখন উজ্জ্বল হইয়া উঠিত, তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে কাহারও ভরসা হইত না। সঙ্ঘের প্রাণ প্রতিষ্ঠার সময় তাঁহার উন্নত পবিত্র জীবন কঠোরে কোমলে বাধাছিল। পরবর্ত্তী

কালে সঙ্ঘের প্রাণে জীবনীশক্তি প্রদান করিতে যাইয়া তাহা কোমলে ও সহানুভূতিতে মিলিয়া ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছিল।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ গুরুগম্ভীর প্রকৃতির হইয়াও নিরত 'ফষ্টিনষ্টি' করিয়াই আনন্দে সময় অতিবাহিত করিতেন—একথা যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন তাঁহারাই স্বীকার করিবেন।

"পুঁই চর্চড়িতে কুচো চিংড়ী কি চমৎকার জমে," "কচি আমে সরসে ফোঁড়ন দিয়ে ফটিকজল অম্বল কি মধুর," "গলদা চিংড়ী নারকেলের রসে কেমন সুসিদ্ধ হয়"—ইত্যাদি কথাগুলি তিনি বলিয়া যাইতেন। তা' ছাড়া যত রাজ্যের বাজে কথা, আগন্তুকদের সাংসারিক সকল সংবাদ নেওয়া—প্রত্যেকের সহিত সহানুভূতি সম্পন্ন হইয়া পরামর্শ দেওয়া—এগুলি ছিল তাঁর নিত্য কাজের মধ্যে। ভুলেও তিনি যার তার সম্মুখে ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিতেন না। ব্রহ্মানন্দ স্বামী যে একটা 'এত বড় ধর্ম্মসঙ্ঘের নেতা একথা তাঁহার কথাবার্ত্তা হইতে বোঝা বড়ই কঠিন ছিল।

এত বাজে কথা শুনিয়া শুনিয়াও লোকের অরুচি হইত না বরং তিনি যখন যেখানে থাকিতেন—দিনের পর দিন লোকের ভিড় লাগিয়া যাইত। একবার তাঁহার নিকট আসিয়া বসিলে কেহ বড় সহজে উঠিতে চাহিত না। সকলেই প্রাণে প্রাণে একটা বিপুল আনন্দধারা অনুভব করিত।

এই 'আনন্দধারা' আফিমের মৌতাতের ন্যায় ক্রিয়া করিত। যে একবার আসিত—সে আবার না আসিয়া পারিত না। যে বহুবার আসিয়াছে সে বহুবার আসিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিত না। সে যেন কি এক অদ্ভুত প্রহেলিকার রাজ্য—যাহা বাক্যে বলা যাইত না, অথচ তাহার প্রভাব ও আকর্ষণীশক্তি অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না। বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাসের একটী গানের শেষ কলিটি আপনা হইতেই যেন সেখানে মুখরিত হইয়া উঠিত—সকলকে বুঝাইয়া দিত,—

"ওসুখ সায়র লুবধ জগজন মুগধ ইহদিন রাতিয়া
দাস গোবিন্দ রোয়ত অনুখণ বিন্দুকণ আব লাগিয়া।"

সকলেই আসিত, সকলেই হাসিমুখে বাড়ী ফিরিত। "বিন্দুকণ আধ

লাগিয়া” আসিয়া তৃপ্ত হইয়া যাইত। কি শুনিয়া ? সেই পুঁই চচ্চড়ি ও কচি আমের অম্বলের কথা, আর বাজে দশ রকম অবান্তর আলোচনায় ? কি পাইয়া ? সে কথা আমরা জানিবার চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু দেখিয়াছি সেখানে সকলেরই অবস্থা এক—মূক আস্বাদনবৎ। শ্রদ্ধাবানের সহিত একান্তে ধর্ম্মালোচনা করিতে তিনি বড়ই উৎসাহী ছিলেন; কিন্তু প্রকাশ্যে ধর্ম্মপ্রসঙ্গে আলোচনা করিতে তিনি সর্ব্বদাই পশ্চাৎপদ ছিলেন—অথবা অত্যন্ত চাপা ছিলেন এমন কি, সে প্রসঙ্গ কেহ কখন উত্থাপন করে ইহা তিনি ‘যেন’ পছন্দ করিতেন না। তবুও যদি কেহ নিবেদন জানাইত—‘আমার একটা কথা আছে’—তখনই তাঁহার মুখখানা কেমন হইয়া যাইত—আর তার সঙ্গে বলিয়া উঠিতেন—“শরীরটা আজ ভাল নয় আর একদিন এসো, বাবা”। এমনই করিয়া জিজ্ঞাসু দিনের পর দিন আসিতে লাগিল—তিনিও আজ এটা, কাল ওটা করিয়া ঘুরাইতে লাগিলেন—শেষে একদিন হয় ত বলিয়াই বসিলেন—‘কি বলিস রে—আর ভাল দেখায় না ?’—

তারপর জিজ্ঞাসু নিভৃতে সাক্ষাৎ পাইল—এত দিনের শ্রম তাহার সার্থক হইল।

আগ্রহ না জন্মিলে অযাচিত ভাবে অমৃত দিতে গেলেও মানুষ তাহা বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া থাকে। কিন্তু আগ্রহ জাগিয়া উঠিলে —পাইবার ইচ্ছা প্রবল হইলে সামান্য কিছু পাইলেই মানুষ আশাতীত তৃপ্তি বোধ করিয়া থাকে।

স্বামী ব্রহ্মানন্দের জীবনব্যাপী লুকোচুরি খেলা ও আত্মগোপন করিবার একান্ত প্রচেষ্টা আমাদিগকে Lincolnএর কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়।

“You can fool some men for all time, all
men for some time, but not all men for all time.”

আমরা রোগ শয্যায় তাঁহাকে পনর দিন লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি —তিনি দেহ ছাড়িতে ইচ্ছুক ছিলেন না—অথবা দেহ ত্যাগ করিতে হইবে জানিয়া কাতরও হয়েন নাই। এবং রোগ-যন্ত্রণার মধ্যেও

তাঁহার চির অভ্যস্ত ফষ্টি নষ্টি গুলি তাঁহাকে ত্যাগ করিতে পারে নাই। ডাক্তারের সহিত কখন রহস্য করিতেছেন—কখন আপনি ঔষধ দিন, ভাল হব আমি, বলিয়া আপ্যায়িত করিতেছেন। আবার কবিরাজ যখন ঔষধ সেবন করিতে অনুরোধ করিতেছেন—তখন "শিবই সত্য ঔষধ মিথ্যা" বলিয়া তাঁহাকে প্রবোধ দিতেছেন। ডাক্তারী চিকিৎসার পর যখন কবিরাজী চিকিৎসা হইবে শুনিলেন তখন বলিয়াছিলেন—"হাকিমিটাই বা বাকি থাকে কেন?"

রোগের প্রথম দিন হইতে তিন শুক্রবার (১৫দিন) গত হইল। শনিবার পিপাসা ও গাত্রদাহ বাড়িয়া উঠিল। সমস্ত দিন ও রাত এগারটা পর্য্যন্ত—লেমনেড বরফ পান করিয়া ছট্‌ফট করিয়া কাটাইলেন।

রাত এগারটার পর তাঁহার মন উচ্চ হইতে উচ্চতম ভূমির দিকে ছুটিয়া চলিল—এ সময়ে তাঁহার যাহা উপলব্ধি হইয়াছিল তাহা আর চাপিয়া ঢাকিয়া রাখিতে পারেন নাই, প্রথমে শিষ্যগণকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তারপর ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথায় বলিতে লাগিলেন,—"ওরে আমায় নুপুর পরিয়ে দে, আমি কৃষ্ণের সঙ্গে নাচব—ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্—হুম্ করে নাচব।"

"আমার কেষ্ট কষ্টের কেষ্ট নয় রে গোপের কেষ্ট।" "তমসঃ পরস্তাৎ।"

"একি আমার কষ্টের কেষ্ট রে, এ রাম-কেষ্ট—পূর্ণচন্দ্র।" "নরেন—বিবেকানন্দ—বিবেকা—বিবেক ব্রহ্ম।" "বাবুরামকে দেখতে পাচ্ছি"। "কমলে-কৃষ্ণ।"

"জীবনের লেখা, এবারের লীলা শেষ হোল, কৃষ্ণ কৃষ্ণ। আহা, তোদের চোখ নেই দেখ্‌তে পাচ্ছিস নে, পীত বসনে কৃষ্ণ।"

"ব্রহ্ম-সমুদ্রে বিশ্বাসের পত্রে ভেসে যাচ্ছি।" "ঠাকুরের পা'দুখানি কি সুন্দর! দেখি, দেখি।" "একটি কচি ছেলে আমার গায়ে হাত বুলুচ্ছে, বল্‌চে, আয়।"

এমন মধুর স্বরে তিনি ঐ কথাগুলি বলিতেছিলেন যাহা শুনিয়া সত্যই মনে হইয়াছিল,—নামে কতই সুধা, কতই মধু, কতই আরাম!

সে রাত্রি গত হইল। রবিবার সমস্ত দিনরাত কাটিয়া গেল। সোমবার রাত্রি ৮টা ৪৫ মিনিটের সময় শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাবসানের ছত্রিশ বৎসর পরে দেবাদিদেবের আদেশে আজ রাখাল রাজ ঘরে ফিরিলেন।

স্বামী ভূমানন্দ।

"আজি সেই চিরদিবসের প্রেম
অবসান লভিয়াছে
রাশি রাশি হয়ে তোমার পায়ের কাছে।
নিখিলের সুখ নিখিলের দুখ
নিখিল প্রাণের প্রীতি
একটী প্রেমের মাঝারে মিশেছে
সকল প্রেমের স্মৃতি,
সকল কালের সকল কবির গীতি।"

অনেকেরই ধারণা, ত্যাগীপ্রবর সন্ন্যাসী ও সাধক স্বামী ব্রহ্মানন্দ নিশিদিন বুঝি ব্রহ্মানন্দেই লীন হইয়া থাকিতেন ত্রিতাপদগ্ধ জগতের দিকে তাঁর করুণাকটাক্ষ ছিল না তাঁহার ঐ গুরুগম্ভীর বাহ্যভাবের অন্তরালে যে কতখানি কোমল একটা হৃদয় বিরাজ করিত, তাহার খবর অনেকেই রাখেন না। যাহাদের ভাগ্যে তাঁহার সঙ্গলাভ ঘটিয়া উঠে নাই, তাহাদের পক্ষে উহা ধারণা করা তো একেবারেই অসম্ভব। কাল্পনিক ভালবাসার অহেতুকী কল্পনা যে খাঁটী সত্য হইতে কতটা দূরে পড়িয়া থাকে, তাহা কাহারও অজ্ঞাত নহে। কাজেই কল্পনার সাহায্য লইয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দের গভীর ভালবাসা ও অপার করুণার পরিমাপ করিতে গেলে মাপকাঠীর নিজের অস্তিত্বই সেখানে বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা।

আধ্যাত্মিক জগতের বাহিরের জীব আমরা, তাঁর সাধনার গভীরতা জানিতাম না। তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়াছিল কি না, সে প্রশ্নে

কোনদিনও মাথা ঘামাই নাই,—ঘামাইবার কোন প্রয়োজনও বোধ করি নাই! 'ব্রহ্ম সাকার কি নিরাকার' 'ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ কোথায়' ইত্যাদি গুরুগম্ভীর ও দুর্ব্বোধ্য প্রশ্নে কখনও আমাদের হৃদয়কে আলোড়িত হইতে দিই নাই। তবু কেন, আমরা তাঁহার পায়ে নিজেদের বিকাইয়া দিয়াছিলাম? ইহার উত্তরে আমাদের শুধু একটী কথা বলিবার আছে, যে, তাঁহাকে আমাদের ভাল লাগিত। তিনি তাঁহার ধর্ম্মজগতের উৎকর্ষতার ফলে আমাদের হৃদয় জয় করেন নাই—করিয়াছিলেন তাঁহার অপূর্ব্ব, আপন-ভোলা প্রেমের সহায়ে। তিনি তাঁহার অতুল প্রেমের বলেই আজ বিশ্ববিজয়ী।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ একজন আদর্শ প্রেমিক ছিলেন। প্রেমসাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া তিনি প্রেমের যে দৃষ্টান্ত জগৎ সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন তাহার আংশিক অনুসরণেও মানুষ নিজের জীবনকে সার্থক ও কৃতার্থ করিতে পারিবে। স্বামী বিবেকানন্দের কল্পনাপ্রসূত ছিন্নবিচ্ছিন্ন গ্রন্থিগুলিকে প্রেমের শৃঙ্খলে একত্রিত করিয়া, তিনি যে মহান্ এক সঙ্ঘের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, সমগ্র জগতে তাঁহার কীর্ত্তি যে কত যুগযুগান্তর ধরিয়া ধ্বনিত হইবে তাহা আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। বাহ্যিক কোন পূজার্চ্চনা বা মন্ত্রঃপূত হোমের সাহায্য না লইয়া হৃদয়ের তরঙ্গায়িত ভাবরাশির সহায়ে তাঁহার বিশ্ববিজয়ী প্রেমকে হোতার আসনে বসাইয়া তিনি এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি এই লোকহিতকর বিশাল সঙ্ঘের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। জননীর মত তাঁহার পরিপূর্ণ স্নেহসলিলে অবগাহন করিয়া এই বিরাট কল্যাণকর সঙ্ঘ পূত ও পবিত্র হইয়া দিন দিন শশিকলার ন্যায় বাড়িয়া উঠিয়াছে। এই সঙ্ঘের প্রাণ, সহায় ও সম্বল সবারই মূলে এই অপূর্ব্ব প্রেমবীজ প্রোথিত আছে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ এই প্রেমকেই তাঁহার হৃদয়ের রাজাসনে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। একসময় আমরা তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি—"মঠে আজকাল কত-রকমের লোক আস্‌ছে; সকলের মনোভাবের সঙ্গে খাপ খাইয়ে, একটা পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য করা একেবারে অসম্ভব; আমার মনে হয়, আমার

দিক থেকে একমাত্র কর্ত্তব্য হচ্ছে, এদের সকলকে শান্তি দেওয়া—সকলে যাতে সুখী হয়—সেই চেষ্টা করা।" তাহাই হইয়াছিল,—সকলের সুখের জন্যই তিনি আপনাকে প্রেমের অতলজলে ডুবাইয়া দিয়া—নিজের বিশেষত্বটাকে বাদ দিয়া—সকলকে সমানভাবে ভালবাসিয়াছিলেন। এই স্বেচ্ছাবিসর্জ্জন ছিল বলিয়াই আজ তাঁহার নামে চক্ষু ছলছল করিয়া উঠে।

বাহিরের জগতের যত পাপী তাপী, সকলেই তাঁহার কাছে সমান আদর পাইত। সমাজে যাহার এতটুকু স্থান নাই, তাহাকেও দেখিতাম তাঁহার হৃদয়ে এতখানি স্থান জুড়িয়া বসিয়া আছে। "নীচ জাতি, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত—তোমার ভাই" —এ বাণী আমরা তাঁহার মহিমায় জীবনে পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হইতে দেখিয়াছিলাম। একবার যে আসিত, সে পুনর্ব্বার তাঁহার কাছে না আসিয়া থাকিতে পারিত না, সকলেরই যে সেখানে সমান আদর—বড় ছোট ভেদাভেদ নাই। সে আনন্দময় রাজ্যে বাস করিবার সময় প্রায়ই কল্পনাকাশে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর শ্যামচ্ছায়ের পরিপূর্ণ ছবি ভাসিয়া উঠিত—যেখানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ অপার করুণা সহায়ে সকলকে সমভাবে প্রেম বিলাইয়াছিলেন। তাঁহারই তো মানসপুত্র ব্রহ্মানন্দ; আধ্যাত্মিক রাজ্যের নিয়ম ভিন্নরকম হইলেও, পুত্র যে অনেকাংশে পিতার গুণের অধিকারী হয়, এনিয়মের ব্যতিক্রম বোধ হয় সেখানেও হয় না। কাজেই শ্রীব্রহ্মানন্দের প্রেম যে অসীম ও অতলস্পর্শ হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি!

আর সেই প্রেম—তাপিত, পীড়িত ও ক্লিষ্টদের পানেই তীব্রবেগে প্রবাহিত হইয়াছিল। তাহার উল্লাসে গীতশূন্য অবসাদপুর ধ্বনিয়া উঠিয়া যেন মূর্ত্ত্য হইয়া প্রকাশ পাইত—সে মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সঙ্গীতে কর্ম্মহীন জীবনের সমস্ত প্রান্ত তরঙ্গিয়া উঠিত। তাঁহার সহানুভূতি-সূচক মৃদু মধুর কণ্ঠস্বরে দুঃখ তাহার ভাষা ও ভাব লাভ করিত—তাহার অন্তরের গভীর পিপাসা স্বর্গের অমৃতের জন্য লালায়িত হইয়া উধাও হইয়া ছুটিয়া চলিত; তাঁহার কোমলকরপরশনে কতশত অসন্তোষ মহানির্ব্বাণ

লাভ করিত—তাঁহার প্রেমের যন্ত্রের ফোঁটা ধারণ করিয়া পতিতা সিদ্ধিলাভ করিত। নীরবে করুণ নেত্রে অন্তরে নিরুপমা সৌন্দর্য্য-প্রতিমা বহন করিয়া তিনি তাহাদের শত অপরাধ ক্ষমা করিতেন। তিনি বলিতেন, "সমাজে কোথায়ও এদের স্থান নেই—অশান্তিময় জীবন নিয়ে এরা নিশিদিন কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে, আমরা যদি এদের স্থান না দিই, আমরা যদি এদের হাত বাড়িয়ে টেনে না তুলি, তবে আর এদের আশাভরসা কোথায় বল্।" তাহাই দেখিয়াছিলাম—কতশত পাপীর নিদারুণ পাপরাশি তিনি তাঁহার কোমল হস্তের অপূর্ব্ব পেলবে ঝাড়িয়া ফেলিয়াছিলেন, কতশত ঘৃণ্য নরনারী তাঁহার রক্তিম চরণতলে লুটাইয়া পড়িয়া তাহাদের আজন্মের রুদ্ধ অশ্রুজলে তাহা ধৌত করিয়া দিয়াছে। শুধু তাঁহারই পবিত্র "প্রেমে মিটিয়াছে সকলের সর্ব্বপ্রেম তৃষ্ণা।"

আমাদের এই তরঙ্গায়িত জীবনসমুদ্রের ভিতর আধ্যাত্মিকতা ও প্রেমের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য-ময় তাঁহার পরিপূর্ণ জীবন বিচিত্র মাধুরী-মণ্ডিত হইয়া এমন একটী দ্বীপের সৃষ্টি করিয়াছিল যেখানে বাত্যা-বিক্ষুব্ধ কতশত নরনারী আসিয়া একান্ত নির্ভরের সহিত আশ্রয় লইত। আমাদের এই সন্দেহাকুল জীবনে তাঁহার অপূর্ব্ব চরিত্র আমাদের জলন্ত অভিধানের কাজ করিত যেখানে,—

"নীরবে মিটিয়া যেত সকল সন্দেহ,
থেমে যেত সহস্র বচন!
তাঁহার চরণে-আসি মাগিত মরণ
লক্ষ্যহারা শতশত মত,
যেদিকে ফিরাত তারা দুখানি নয়ন
সেদিকে হেরিত সবে পথ!"

তাঁহার কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে; তাই তিনি আজ "শ্রান্তিহরা শান্তির উদ্দেশ্যে দুঃখহীন নিকেতনে" চলিয়া গিয়াছেন। শ্রীভগবানের মহিমালক্ষ্মী যখন তাঁহার কণ্ঠে সাফল্যের মালাটী পরাইয়া দিবেন, তখন আমরাও হয়ত তাহার আভাষ পাইব। স্মৃতি তো যাইবার নহে।

সুখে দুঃখে তাঁহার স্মৃতি যে আমাদের হৃদয়ে চিরকাল জাগরূক থাকিবে। কবির কথায় বলিতে ইচ্ছা হইতেছে,—

"তাই স্মৃতি ভারে মোরা পড়ে আছি,
ভারমুক্ত তিনি হেথা নাই।"

স্মৃতিকে বাদ দিলেও আমাদের চলিবে না। তাঁহার স্মৃতিই যে দিবানিশি আলোকে আঁধারে আমাদের পথ দেখাইয়া লইয়া চলিবে; সমুদ্রে, সমীরে তাঁহার মহান্ গম্ভীর মঙ্গলধ্বনি শুনিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া আমরা স্মৃতির পানে ফিরিয়া চাহিব—তাঁহার স্মৃতিকে অন্তরে রাখিয়াই সকলকে সুখী করিয়া আমাদিগকে নীরবে একাকী জীবনের কণ্টক পথে অগ্রসর হইতে হইবে। তাঁহার পুণ্যস্মৃতি আমাদিগকে যে ক্ষুদ্র দীপটীর ক্ষুদ্রতর আলোক রেখা প্রদর্শন করিবে তাহারি কিরণে উদ্ভাসিত অপূর্ব্ব প্রেম-রশ্মির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আমাদের সমস্ত ক্ষুদ্রতার ও সমস্ত অসম্মানের বলিদান কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে হইবে। তখনই আমরা উন্নতমস্তকে জগৎ সমক্ষে দাঁড়াইতে সক্ষম হইব। স্মৃতি চলিয়া যাইবার জিনিষ নয় বটে, কিন্তু তাহা বাহিরের নানাপ্রকার অসংবদ্ধ আস্তরণে চাপা পড়িয়া যায়; শুধু সেটাকে ফোটাইয়া তোলাই আমাদের কর্ত্তব্য। স্বামী ব্রহ্মানন্দের জননীর মত অপূর্ব্ব স্নেহ ও ভালবাসার কথা স্মরণ করিয়া যদি আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারি, তাহা হইলে একদিন হয়ত সমগ্র জগতকে আমরা প্রেমের চক্ষে দেখিতে পারিব ও সমুদয় মানবের সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া অক্ষয় ও সুন্দর হইতে পারিব আর তখনই আমরা বলিতে পারিব,—

"যাত্রা করি বৃথা যত অহঙ্কার হতে,
যাত্রা করি ছাড়ি হিংসা দ্বেষ,
যাত্রা করি স্বর্গময়ী করুণার পথে
শিরে ধরি সত্যের আদেশ!
যাত্রা করি মানবের হৃদয়ের মাঝে
প্রাণে লয়ে প্রেমের আলোক
এস সবে যাত্রা করি জগতের কাজে
তুচ্ছ করি নিজ দুঃখ শোক!"

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

(১৭)

কীর্ত্তন।

যদি এসেছিলে, না পোহাতে রাতি কেন চ'লে গেলে, কেন গো পালালে।

(আমার মনের কথা রইলো মনে—বলা তো হোল না

কেন চ'লে গেলে।)

যদি ভাল বেসেছিলে, না পূরিতে সাধ কেন গো কাঁদালে ॥

আমার ফুল তোলা সব রইল বাকী,

তোমার অভয় পদে দেওয়া তো হোল না,

কেন চ'লে গেলে কেন গো, কাঁদালে

জুড়াইতে জ্বালা যাব কার কাছে,

কে আর আমার আপনার আছে,

কি দোষ দেখিয়ে নিদয় হইয়ে—

তাপিতে চরণে ঠেলিলে অকালে ॥

(তুমি বিনা কেউ তো ছিল না, কে আর রইল বল)

হতাশে হুতাশে ঘুচাইতে ব্যথা

হেসে হেসে আর কে কহিবে কথা

যাচিয়ে সাধিয়ে কোলে তুলে নিয়ে

নিরাশ আঁধারে কেন গো ডুবালে।

(আর কেমন ক'রে যাব কূলে

কে আর কূল দেবে এ অকূলে)

দিয়ে অযাচিত প্রীতি ভাল বাসা,

শুধু বাড়াইলে আশাতীত আশা,

মিটিল না আশা, রহিল পিপাসা

ভাসায়ে অকূলে কেন গো লুকালে।

ব্রজের মাঝে রাখাল রাজা

হৃদয় মাঝে রাজার রাজা

যদি এই ছিল মনে, সাজা দিবে দীনে

তবে কেন গো মজালে ॥*

শ্রীঅপরেশ।

* ষ্টার রঙ্গমঞ্চে গীত।

শ্রীশ্রীব্রহ্মানন্দ স্বামিজী মহারাজের স্মরণার্থ

(১৮)

'রাজা নাই,' 'রাজা নাই,' চারিদিকে 'নাই' 'নাই,'
কোথাকার কে সে রাজা, মানুষ কেমন?
কেহ কহে মহারাজ, কেহ বা রাখালরাজ,
কত নামে ডাকে তাঁরে অপূর্ব্ব কথন।
কে এ রাজা-মহারাজ, কোথায় তাঁহার রাজ্য,
সে কথা বলে না কেহ, ফুকারিয়া কাঁদে!
হ'য়ে ধনরত্ন হারা ছোটে পাগলের পারা
হাতে পেয়ে হারায়েছে আকাশের চাঁদে!
বসন্তের চতুর্দ্দশী গগনে উদয় শশী,
হয় হয় পূর্ণ যেন ভাসায় ভুবন!
'রাম-কৃষ্ণ'-মহারবে ফুকারি উঠিল সবে,
শত-কণ্ঠে 'মহানাম' করে উচ্চারণ!
অকস্মাৎ একি হ'ল, আগুবাড়ি দেখি চল,
ফুল সাজে শোভে কা'র বর কলেবর?
—ব্রহ্মের আনন্দ-ঘন মূর্ত্তি ধরি' সুশোভন,
যোগ-নিদ্রা অধিভূত যেন মহেশ্বর!
উর্দ্ধ সম্প্রসারী দৃষ্টি ভেদিয়া অনন্ত সৃষ্টি,
—চিৎ-হংস ভাসে স্থির ব্রহ্মরস-সরে!
কে বুঝা'বে মহাতত্ত্ব, কে সে মহাপ্রেম মত্ত,
প্রকাশি' রহস্য-কথা দিবে প্রেমভরে!

'জগন্মিথ্যা 'ব্রহ্মসত্য'— লভি' সেই উচ্চ তত্ত্ব,
নির্লিপ্ত থাকিয়া জীবে কে শিখা'বে আর!
সমাহিত শান্ত মূর্ত্তি প্রশান্ত প্রেমের স্ফূর্ত্তি—
প্রেম-জ্ঞান-সমন্বয়—অমৃত-আধার
ভারতের পুণ্যক্ষেত্রে, গাঁথিবারে প্রেমসূত্রে,
মানব তেত্রিশ কোটী নব-অবতার.
—সাঙ্গোপাঙ্গ ল'য়ে সাথে, মহারথী মহারথে,
মহা সমন্বয়াচার্য্য আসিল আবার!
'বিবেক-আনন্দ' দানি' সঞ্জীবিয়া কোটী প্রাণী—
জগদিষ্ট 'রামকৃষ্ণ' জগতে প্রকাশ
বিচারিয়া সদসৎ মুগ্ধ নর পায় পথ,
নূতন সন্ন্যাসী-সঙ্ঘ হইল বিকাশ!
ক্রমে 'ব্রহ্মানন্দ' আসে ভূমানন্দ-মহোল্লাসে,
মাতে নরনারী-প্রাণ, হয় ধ্যানরত!
মহামৃত পেয়ে যেন, আস্ব'দিয়া মূকহেন
স্তম্ভিত নির্ব্বাকপ্রায়, প্রেম ভারে নত!
—হারায়েছি সেই ধন, কেবা আছ মহাজন,
এস, এস, জীবন্মুক্তি দাও মূঢ় জীবে!
ফুটাও সহস্র দলে অদ্বৈতের সে কমলে,
ভেদ যেন নাহি রয় জীব আর শিবে!
ব্রহ্মানন্দ মহারাজ, কোথায় চলিলে আজ?
এখন ত পূর্ণ নহে কীর্ত্তি অগণন,—
ব্রহ্মামৃত প্রস্রবণ ছুটাইতে অনুক্ষণ,
কার করে মধুচক্র ঘুরিবে এখন?
বেলুড়ের মহামঠে ভাগীরথী তীর পীঠে
এখন পূর্ণাঙ্গ নহে শ্রীগুরুর ধাম!
যার পূত স্পর্শে আসি জুড়া'বে ত্রিতাপরাশী,
শান্তি দিবে, নষ্ট করি জগতের কাম!

ভোলানাথ-'গুপ্তকাশী' প্রকাশ করিবে আসি,'
স্থাপিয়া আদর্শ মঠ 'ভুবন—ঈশ্বরে'।
কই কই কোথা গেলে, অকালে মোদের ফেলে,
বঞ্চিত করিলে কেন আনন্দ-নিকেতে ?
পুণ্য-ভূমি ভারতের, তীর্থ মহা-মানবের
আজীবন বর্ষে বর্ষে করি' পর্যটন,
স্থাপিয়াছ কীর্ত্তিচয়, উচ্চে জয় লোকময়,
সেবা-প্রতিষ্ঠান কত, সাধন-ভবন।
দেশ-দেশান্তরে ঘুরি,' নানা জনে প্রেম করি'
দিয়াছ মহান্ তত্ত্ব আনন্দ অপার।
নবীন জীবন পেয়ে, প্রেমানন্দে মত্ত হয়ে
জীবন্মুক্ত হ'য়ে করে প্রেমের সঞ্চার।
'রামকৃষ্ণ—উপদেশ' মানিয়া অসংখ্য দেশ,
ধ্যান ধরি' সাজিয়েছ চিদানন্দ ভাব
পেয়ে আস্বাদন তা'র ঘুচিল মন-বিকার,
আচণ্ডাল নরনারী স্বর্গ-অধিকারী।
বেদান্ত পরম সত্য জানাইলে মহাতত্ত্ব,
এ জগতে নাহি কিছু, ব্রহ্ম সার্বভৌম।
বার বার সেই কথা, দূরে ফেলি' কাতরতা,
বেদান্ত-কেশরী-নাদে করিলে প্রচার
ব্রজের রাখাল তুমি, মাতাইয়া বঙ্গ-ভূমি
গুরুর বাঁশীর রবে মাতালে ভুবন।
মোহন নূপুর পরি,' মহানন্দে লীলা করি'
ব্রজরাজ দেহে তনু করিলে গোপন।
যেই 'রাম' 'সেই কৃষ্ণ' সেই এবে 'রামকৃষ্ণ,'
বুঝেও বুঝে না জীব, একি মহাদায়।
দাও দেব জ্ঞান-ভক্তি, শিবে হো'ক অনুরক্তি,
কেটে যা'ক মোহ-মেঘ তব মহিমায়।

'ভয় কি,' 'ভয় কি'-রবে আশ্বাসিলা ভক্ত সবে,
অকস্মাৎ অন্তর্দ্ধান সন্ন্যাসী রাজন !
তব আশীর্ব্বাদ বলে ভ্রমি এই ভূমণ্ডলে,
লভুক শাশ্বতী-মুক্তি ওহে তপোধন
কত প্রেম কত দয়া, কত স্নেহ, কত মায়া
দিয়াছ অধমে তাহা জানাই কেমনে ?
তোমার প্রেমের ছাপে মুছিয়া সংসার তাপে,
মহানন্দে যাই যেন মরণ-বরণে।
গুরুর মানস পুত্র জগতের শ্রদ্ধাপাত্র
যাও রামকৃষ্ণ-লোকে বিরাজে যথায়
বিবেকানন্দ বীর প্রেমানন্দ সে সুধীর
আর আর ভাই সব অমৃত প্রভায়

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত।

(১৯)

আমাদের মহারাজ কি ছিলেন তা জানিনা। তিনি মহাপুরুষ ছিলেন কি সিদ্ধকোটি ছিলেন, কি শ্রীকৃষ্ণের সখা ছিলেন, না আর কিছু ছিলেন, এ আলোচনা আর যারাই করুন এ হতবুদ্ধি লেখকের, সে আলোচনা করবার মত শক্তি ও প্রবৃত্তি —মোটেই নাই। তবে এইটুকু শুনেছি মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণের বড় আদরের প্রিয়তম মানসপুত্র ছিলেন, আর বুঝেছি তিনি ছিলেন আমাদের পরম ও চরম আশ্রয় স্থল। এইটাই আমরা যতটা বড় করে, যতটা প্রাণের সঙ্গে অনুভব করেছি, এতটা আর কিছুই বুঝি নাই। এ ছাড়া তাঁর সম্বন্ধে আর কিছু জানবার বা ভাববার ইচ্ছা ও উৎসাহ তিনি থাকতে আমরা একটুও অনুভব করি নাই। কারণ স্নেহ

ভালবাসার স্নিগ্ধ স্পর্শে যে তিনি আমাদিগকে সদাই ভুলিয়ে রেখেছিলেন। দুঃখ কষ্ট অভাব অনুযোগের লেশমাত্রও ত তিনি আমাদের অনুভব করতে দেন নাই। আর তাইতে আমরা হৃষ্ট চিত্তে দুরন্ত বালকের মত তাঁকে ছেড়ে দুনিয়ার হাসিকান্নার ঘরে বিহ্বল হয়ে হেসেছি খেলেছি। আবার অবসন্ন দেহে ফিরে এসে নিদ্রা জড়িত চক্ষুতে তাঁর অমিয় বাণী শুনতে শুনতে অবাধে ঘুমিয়ে পড়েছি। এই ছিল মহারাজের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ। তাই বড় নিদারুণ ভাবেই আমরা আজ মহারাজের অভাব অনুভব করছি। আর ভাবছি কে আর আমাদের সদাই চোখে চোখে রাখবে, স্নেহ ভালবাসার অপূর্ব্ব প্রীতিতে কে আর আমাদিগকে অভিষিক্ত করবে। তাঁর ভালবাসা অশেষ—আমরা অবোধ তাই তাঁর সে অনুপম ভালবাসার ত্রিবেণী ধরায় নিজেদের ডুবিয়ে দিতে পারলাম না। কি দুরদৃষ্ট আমাদের! আমরা যদি তাঁর প্রীতি-প্রেমে হৃদয় পেয়ালা পূর্ণ করতে পারতাম তাহলে বোধ হয় দুনিয়ার আর সবাইকেও সে অপূর্ব্ব নিস্বার্থ ভালবাসায় বঞ্চিত হতে হত না। মহারাজ যে নর দেহে আমাদিগকেই সার্থক করবার জন্য, পূর্ণ করবার জন্য পরম প্রেমাস্পদ রূপে এসেছিলেন! হায় প্রেমাস্পদকে চিনলাম না, আমরা আমাদের ক্ষুদ্র অহমিকাকে তাঁর প্রেমে ডুবিয়ে দিতে পারলাম না। অসীম সসীম হয়ে—ভালবাসার প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি উজ্জ্বল দীপ্ত বিগ্রহ ধরে আমাদের সম্মুখে দাঁড়ালেন, কত ভালবাসলেন, ভালবাসার অমৃত রসে আমাদের সিক্ত করতে চাইলেন। অচেতন মূঢ় আমাদের প্রাণের সঙ্গে প্রাণ মিলিয়ে তিনি কতই না আবেগ জড়িত কণ্ঠে ডাকলেন অন্ধ আমরা—অজ্ঞ আমরা তাঁর সে সকরুণ আহ্বানে সাড়া দিলাম না, তাই আমাদের মহারাজ বড় অবেলায় বিমর্ষ বদনে যেন অভিমান ভরেই চলে গেলেন। বিদায় বেলায় সববাইয়ের জন্যই আশীর্ব্বাণী উচ্চারণ করে গেছেন, অভয় দিয়ে গেছেন। আমরা তাঁকে সত্যিকার হৃদয় দিয়ে চাই নাই তাই বোধ হয় তিনি ছোট্ট খোকাটীর মতই অভিমান ভরে চলে গেছেন, অভিমান মুখেই আশীর্ব্বাণী

উচ্চারণ করেছেন। অকথিত তাঁর ভালবাসা। পিতা মাতার ভালবাসা অতুলনীয় সত্য, কিন্তু আমাদের মহারাজের ভালবাসার তুলনা দেব এমন যে দুনিয়াতে আর কিছুই নাই, আর কিছুইত দেখতে পাচ্ছি না। এমন আপন ভোলা ভালবাসা দুনিয়ার নয়। দুনিয়ার বহু উচ্চে অনেক অনেক দূরের,—ঠিক কোথাকার যে সে ভালবাসা তা বলতে পারব না। তবে ইহকাল সর্ব্বস্ব স্বার্থপূর্ণ নশ্বর দুনিয়ার যে সে ভালবাসা নয় এটা অতি স্পষ্ট করেই বলছি। কারণ আজ যে আমরা বড় স্পষ্ট ভাবেই সেটা অনুভব করছি।

আমরা সাধন ভজন, ত্যাগ তপস্যা বা দেনা পাওনার ভেতর দিয়ে মহারাজের ভালবাসা লাভ করি নাই। আমরা হাসিখেলার ঘরে আমাদেরই একটীর মত তাঁকে পেয়েছিলাম। তাঁর অপার ভালবাসার কিছু কিছু উপলব্ধি করে ছিলাম। তাঁকে নিয়ে কত হেসেছি, খেলেছি কত আনন্দ করেছি আবার অভিমান আবদারই বা করেছি কত। তিনি হাসি খেলার ভেতর দিয়ে কত রকমেই না আমাদের বোঝাতে চেষ্টা করেছেন—এই সব ছোট বড় ব্যাপার গুলোই শেষ নয়। এর চাইতেও অনেক বড় আরও কত আনন্দের জিনিষ আছে। আমরা তাঁকে আশ্রয় করে খেলায় মত্ত—খেলার আনন্দেই মশগুল। তাঁর ওসব কথা শুনবার, তাঁর সে করুণ আবেগ ভরা দৃষ্টিতে মজবার অবসর তখন আমাদের কোথায়? বরং তাঁর ঐ রকম ভাবগুলোকে আমরা তখন আনন্দের অন্তরায় বলেই মনে করতাম। তখন আমরা মনে করতাম আমাদের এ আনন্দের হাট কখনও ভাঙ্গবে না। চিরদিন এমনি ধারা মিলনের নেশাতেই ভরপূর থাকব! বিচ্ছেদের দারুণ বেদনায় অস্থির হতে হবে, এটা যে স্বপ্নেও ভাবি নাই! তিনি খেলার ছলে আমাদিগকে একেবারে তাঁরই করে নিতে চেয়েছিলেন। আমরা খেলাতেই মত্ত রইলাম তাঁকে প্রাণভরে ভালবাসতে পারলাম না, জীবন-পথ ঠিক করে নিতে পারলাম না। তাই বিদায় বেলায় তাঁর অসীম ভালবাসার ডাক "আমার বাবারা তোরা কোথায়, আয় আয়" শুনে যখন তাঁর

কাছে দাঁড়ালাম, তখন অবসন্ন-ক্লান্ত-হৃদয় আমাদের—দুনিয়ার খেলার চিহ্নে তখন আমাদের সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছন্ন।

স্তম্ভীত হৃদয়ে তাঁর পাশে, তাঁর অতি কাছে গিয়ে বসলাম। তিনি অনেক কথা বল্লেন। আমরা অবাক হয়ে তাঁর সে 'অজানা দেশের অপূর্ব্ব বাণী শুনলাম। সাধনা বিহীন জীবন, কলুষিত প্রাণ মন, অচেতন হৃদয় দিয়ে, তাঁর সব কথা বুঝতে পারলাম না। তাঁর ভেতরের রূপটা—তাই যখন তিনি একটুখানি প্রকাশ করলেন তখন কিন্তু মনে হ'ল তিনি স্বধু ইহজীবনেরই নন, তিনি আমাদের চির জীবনের সঙ্গী, তিনিই আমাদের চির আপনার লোক। কোন্ অশুভক্ষণে পথ ভোলা পথিকের মত দুনিয়ার হাটে এসেছিলাম তা তিনিই জানেন। তাই বোধ হয় আমাদের বিহনে থাকতে না পেরে আমাদের তিনি নিতে এসেছিলেন।

কত মর্ম্মস্পর্শী, কত আদরের, কত মধুমাখা ডাকেই না তিনি আমাদের ডাকলেন। দুনিয়ার কোলাহলে সে ডাক শুনেও শুনলাম না। বহু দূরের দিগন্ত পারের স্নিগ্ধ মধুর সুর যেন কানের কাছ দিয়ে ভেসে চলে গেল। চমকিত হয়ে উঠলাম, আবার ভাল করে শুন্‌বার জন্য হৃদয়টাকে চেপে ধরলাম। কিন্তু আর না, বহুদূরের সে সুর, বহুদূর থেকে এসে কানের কাছ দিয়ে অনেক অনেক দূরে স্বপ্নলোকে মিলিয়ে গেল।

আমাদের শত দুর্ব্বলতা শত অক্ষমতা দেখে তিনি ব্যাকুল হৃদয়ে বার বার বলেছেন "ওরে আমাদের কেউ কেউ নয় রে, আমাদের কেউ আলাদা।" তিনি যে আমাদের বড় আপনার তাই শেষবার তিনি অতি আবেগভরে বলেছেন "আমাকে একটু ভালবাসিস।"

সব শুন্‌লাম, সন্ধ্যা-মলিন মুখখানার পানে চেয়ে চেয়ে, আশা নিরাশার দোলায় দুলতে দুলতে তাঁর সব কথাই শুনলাম, কিন্তু তিনি ত আর ফিরলেন না—তেমন করে ত আর তাঁকে পেলাম না। তাঁর ওসব কথা আমাদের সত্যই তখন ভাল লাগছিল না। আমাদের মহারাজ যাঁর একটুখানি অসুখ হ'লে আনন্দের ব্যাঘাত হচ্চে ভেবে ভয়ে তাঁরই জন্য

আকুল হয়ে তাঁর কাছে বসে থাকতাম। শীঘ্র ভাল হয়ে উঠুন, আবার আমরা তাঁকে নিয়ে আনন্দ করি—এই বলে কত বিনিদ্র রজনীই না তাঁর কাছে কাটিয়েছি সেই মহারাজ আমাদেরই সামনে দিন দিন তিল তিল করে শুকিয়ে যেতে লাগলেন। নন্দনকাননের একটী পারিজাত মর্ত্ত্যে এসেছিল—মর্ত্ত্যের মানুষ আমরা সে পারিজাতের মর্ম্ম কি বুঝব বুভুক্ষিত মন, তৃষিত প্রাণ নিয়ে তাঁর মর্য্যাদা না বুঝে অসংযত ভাবে ভোগ করতে চাইলাম তাই আমাদের উত্তপ্ত মলিন নিশ্বাসে সে দেবপুষ্প অতি শীঘ্র শুকিয়ে গেল, কত মঙ্গল কামনা নিয়ে ঝরে পড়ল—রেখে গেল নব প্রেরণা পূর্ণ বিমল স্মৃতি।

* * * *

বিরাট সুরম্য অট্টালিকা, অগণিত দাসদাসী, ফলপুষ্প শোভিত মনোরম উদ্যান, সুশীতল বারিপূর্ণ কুলু কুলু নাদিনী স্বচ্ছ স্রোতস্বিনী,—মালিক স্বয়ং একছত্র প্রবল প্রতাপান্বিত সৌম্যশান্ত হৃদিবান প্রেমিক "মহারাজ।" সন্তান তাঁর অগণিত, বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় কুটুম্বাদিতে প্রাসাদটী সদাই পরিপূর্ণ। প্রীতি প্রেম ভালবাসার বিমল স্পর্শে সে আনন্দ নিকেতনটীর সবাই নিশিদিন অভিষিক্ত।

ঘোরা রজনী—নিঝুম! মাঝে মাঝে প্রবল বারিপাত—ভয়ঙ্কর বজ্র দামিনীর অট্টহাস্য বিভীষিকার মতই সে শান্তি নিকেতনটীকে আজ ভীতিপ্রদ করে তুলেছে। ক্ষুদ্র বালক তাই বড় শঙ্কিতভাবে আজ তার স্নেহময়ী প্রেমময়ী জননীকে আঁকড়ে ধরেছে। ভাবটা শিশুর—একি হ'ল এমনটা ত কোন দিনই দেখি নাই। প্রকৃতি যেন রুদ্রমূর্ত্তি ধরে পৃথিবীকে গ্রাস করতে এসেছে। জননীর প্রেমপীযূষে সন্তান কিন্তু বড় শীঘ্রই ঘুমিয়ে পড়ল। বালক যখন জাগল তখন সব শূন্য—কেহ নাই—কিছু নাই, যতদূর দৃষ্টি যায় ধূ ধূ ধূ কিছু নাই—শূন্য মাঠ। কিছু নাই আছে শুধু বালক—আছে শুধু তার জ্বালাময়ী স্মৃতি, —আর কিছু নাই, কিছু নাই,—সব শূন্য—সব ফাঁকা, (মহারাজ—!) আছে শুধু উত্তপ্ত বালুকা পূর্ণ মরুভূমি। মহারাজ! মহারাজ!!

শ্রীঈশ্বর।

(২০)

গেছ চলি, গেছ দেব,—মরতের আবর্ত্ত ভীষণ
রাখি দূরে,—সংসারের বহু ঊর্দ্ধস্তরে ; জ্ঞানময়
প্রাণময় প্রেমময় হে বঙ্গের আনন্দ রঞ্জন !
মরণে অমর তুমি,—অমৃতে অমর

বিশ্বময়

বিস্ফূরিত আজি তব আনন্দের অমৃত কিরণ !
এ নহে মরণ তব ! জাগরণ মরণের মাঝে !
ধরিলা সমাধি তব পুণ্য ভূমি বেলুড় প্রাঙ্গন ;
ধন্য এ জননী-বঙ্গ, বক্ষে ধরি তোমা বহু রাজে !

ব্রহ্মাণ্ড আঁধার করি জ্ঞানময় ব্রহ্মানন্দ রবি
অস্তমিত যদি আজি, অনন্তের কোলে পাশে,—
তবু কি আঁধারে হায় ! মগ্ন হ'বে সারা বিশ্ব ছবি ?
বিম্বিত সে জ্ঞান-জ্যোতিঃ, আজি শান্ত অন্তর আকাশে।

অজ্ঞান তামসমগ্ন শত আঁখি নিমীলিত জনে,
দেখাইতে পুণ্যবর্ত্ম বিজলীর মত ঝলমল
ত্রিদিব সুষমা চুমি, এলে মর্ত্ত্যে ; আকাশ প্রাঙ্গনে
ওই, লুটে পড়ে ছায়াপথ তব, ঘুচাইতে তম।

নয়ন সম্মুখ হ'তে, আঁধারের কৃষ্ণ যবনিকা
নিলে টানি সযতনে, হে দেবতা, হেথা সবাকার।
ঘুচাইলে তুমি দেব ! অহংএর তুচ্ছ অহমিকা,
হে চিরভাস্বর-দীপ ঘুচাইলে মায়ার আঁধার !

সাশ্রুনেত্রে কেন আজি, হে জননি ! হে বঙ্গ দুঃখিনি !
উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক তব, কক্ষচ্যুত, তাই কি গো হায় ?
মাতৃ বুকে পুত্র কভু মরে কি মা, ত্রিদিব রূপিনি ?
মরে যদি পুত্র তব,—ভুলিতে কি পাব মা তাহায় ?

দেখ বঙ্গ! দেখ চেয়ে,—উন্মীলিয়া জ্ঞানোজ্জ্বল আঁখি,
হৃদয়ে, হৃদয়ে রাজে, অনাদির বুক ভরা ধন,
সহস্র সহস্র রূপে, ব্রহ্মানন্দ এক মূর্ত্তি রাখি।
হে বঙ্গ! তাহার তরে কেন আজি এ ব্যর্থ রোদন?

মুছে ফেল আঁখি জল, আজি শুভ বিদায় বাসরে
কেন ব্যর্থ হাহাকার? মিলনের এ মাহেন্দ্র ক্ষণে?
তাহার যা' কিছু ছিল রেখে গেছে জগতের তরে,—
ধন্য হও লভি তায়, অশরীরী শুভ আলিঙ্গনে!

মুক্ত কণ্ঠে,—যুক্ত কণ্ঠে,—গেয়ে উঠ আজি ভ্রাতৃগণ।
সেথা শান্ত সুশীতল সৎচিৎ আনন্দ ধারায়
র'ক মগ্ন হংসরূপী অনাদির আনন্দ রতন,
তুচ্ছ ক্ষুদ্র ব্যর্থ মোরা ঘুরে মরি প্রপঞ্চ মায়ায়!

শ্রীঅখিলকৃষ্ণ গাঙ্গোপাধ্যায়

(:)

বর্ত্তমান যুগে আসুরিক ভাব যুক্ত, ইহকাল সর্ব্বস্ব বুদ্ধি সম্পন্ন, আধিভৌতিক জ্ঞানানুশীলনে তৎপর পাশ্চাত্য জাতীর সহিত, দৈবী ভাবাপন্ন, পরকালে বিশ্বাসী, আধ্যাত্মিক সাধন তৎপর প্রাচ্য জাতীর ঘোর সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হওয়ায় জগতের মানবসমাজে এক মহা চাঞ্চল্যের ভাব দেখা দিল, পরা ও অপরা বিদ্যার মধ্যে পড়িয়া জীব কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। বৌদ্ধ, খৃষ্ট, মুসলমান ইত্যাদি নানা ধর্ম্ম মার্গে, শাক্ত শৈব, বৈষ্ণব ইত্যাদি বহু বিভিন্ন সাধন পন্থায়, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈত ইত্যাদি নানা বাদে মানব মন আলোড়িত হইতে থাকিল। কালের প্রভাবে মানুষ ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব ভুলিয়া কতকগুলি বাহ্যিক

আচার ব্যবহারকেই ধর্ম্ম বোধে উহাকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া পরস্পর বিবাদ ও কলহে মত্ত হইয়া উঠিল, নিজ নিজ ধর্ম্মমতই সত্য আর অন্য ধর্ম্মমত মিথ্যা এই বুদ্ধিতে পরস্পর পরস্পরের ধর্ম্মমত খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইল, ফলে ধর্ম্ম জিনিষটাই লোপ পাইবার উপক্রম হইল, ধর্ম্মের উপর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস লোকের দিন দিন হ্রাস পাইতে লাগিল। জগতের অবস্থা পুনরায় শোচনীয় ভাব ধারণ করিল।

অজ্ঞান-অন্ধ জীব অহং বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া মায়াচক্রের ঘোর আবর্ত্তনের মধ্যে পড়িয়া বাসনার পর বাসনার, কল্পনার পর কল্পনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া নৈরাশ্যের ঘাত প্রতিঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণীত হইতে লাগিল, আশার স্বপনে ভুলিয়া আবার উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, সুখ, দুঃখাদি দ্বন্দ্বের মধ্যে থাকিয়া অবিরাম যুদ্ধে নিযুক্ত হইল, সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখের তরঙ্গ তাহার হৃদয়কে উদ্বেলিত করিয়া তুলিল, জীব কখন আশা, কখন নিরাশা, কখন সুখ কখন দুঃখ, কখন শান্তি কখন অশান্তি এইরূপ এক অভিনব ভাব স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে চলিল। পরম করুণাময়, জগতের ঈশ্বর শ্রীভগবানের আসন জীবের দুঃখে টলিয়া উঠিল। কুরুক্ষেত্রে পার্থ সারথিরূপে তিনি যে সত্য করিয়া গিয়াছিলেন তাহা পালন করিবার সময় উপস্থিত হইল। মানব জগতে শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃ স্থাপনের জন্য, রজগুণের প্রবল প্রভাব সত্ত্বগুণের দ্বারা সংযত করিবার জন্য, দেহবুদ্ধি বিজড়িত অনিত্য সুখানুসন্ধানের প্রচেষ্টায় প্রমত্ত মানব মনকে নিত্য সুখের দিকে প্রধাবিত করিবার জন্য, ভিন্ন বিভিন্ন ধর্ম্মমত বিরোধ দূর করিবার জন্য, এ বিশ্ব-সংসারকে পরমানন্দ, পরম শান্তি প্রদান করিবার জন্য সেই ত্রিতাপ সংহর্ত্তা জগৎপিতা তাঁহার চির শান্তি নিকেতন বৈকুণ্ঠধাম ত্যাগ করিয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেব রূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া "যতমত, ততপথ" এই মহান্ সত্য প্রকাশ করিলেন এবং সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয় রূপ সাধনার দ্বারা এক নবযুগের সৃষ্টি করিলেন।

রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ, শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ শ্রীচৈতন্য এবং সেই দিন পর্য্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ রূপে শ্রীভগবান বার বার জগতে আসিয়া এক

একবারে এক-এক ভাবে তাঁহার অপূর্ব্বলীলা দেখাইয়া গিয়াছেন, কিন্তু শ্রীভগবানের সে লীলা দর্শন আমাদের ভাগ্যে ঘটে নাই। সেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের মানসপুত্র, তাঁহার বড় স্নেহের, বড় আদরের রাখাল-রাজ; যাঁহাকে ভক্তগণ মহারাজ বলিত, যিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দ নামে পরিচিত তাঁহার সেই শান্তিময় চরণপ্রান্তে আশ্রয়লাভের সৌভাগ্য তিনিই কৃপা করিয়া প্রদান করিয়াছিলেন।

সে আজ অনেক দিনের কথা যে দিন প্রথম এই মহাপুরুষকে দর্শন করি জানিনা কেন সেই একবার দর্শনমাত্রেই আপনা হইতেই হৃদয়ের মধ্যে তাঁহার প্রতি একটা অদ্ভুত ভালবাসার ভাব জাগিয়া উঠিল মনে হইল যেন তিনি আমার কত আপনার। তাহার পরই যখন তাঁহার শ্রীমুখের দুই একটী কথা শুনিলাম, সে কথাগুলি যদিও অতি সাধারণ কথা, সেরূপ কথা কত দিন কতবার কত লোকের মুখে শুনিয়াছি কিন্তু কোন দিন সে কথা মর্ম্মস্থানে যাইয়া এমন ভাবে আঘাত করিতে পারে নাই—আজ পর্য্যন্তও যেন সেই স্নেহমাখা, সেই ভালবাসাময়, সেই প্রেমপূর্ণ কথাগুলি কানে বাজিতেছে। ইহার পর হইতেই সে ভালবাসার আকর্ষণ যেন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তাঁহার সে ভালবাসার স্রোতের প্রবল বেগ পিতামাতা আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলের স্নেহ ভাসাইয়া দিল। সেদিন জানিতাম না ইনিই শ্রীভগবানের মানসপুত্র, সেদিন শুনি নাই যে ইঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিতেন "রাখাল নিত্য সিদ্ধ" "ঈশ্বর কোটির লোক" "শ্রীকৃষ্ণের অংশ" "ব্রজের রাখাল রাজ"। তাঁহার অপূর্ব্ব ভালবাসার কোনও হেতু ছিল না, সে ভালবাসার পশ্চাতে কোনও কামনা, কোনও বাসনা, কোনও মায়িক সম্বন্ধও ছিল না তথায় ছিল কেবলমাত্র করুণার একটী কটাক্ষ, অহেতুকী কৃপার একটি বারিবিন্দু, প্রেমময়ের প্রেমের একটু অভিব্যক্তি, শ্রীভগবানের দীনবন্ধু-দীনবৎসল নামের কথঞ্চিত সার্থকতা।

কত কথাই মনের মধ্যে উদয় হইতেছে শ্রীসম্পন্ন ধনীর ঘরে জন্ম লইয়া, সুখের, ভোগের ক্রোড়ে লালিতপালিত হইয়া, পিতা, মাতা,

স্ত্রী, পুত্র, বিষয় সম্পত্তি সমস্ত ত্যাগ করিয়া বহির্বাস কৌপীন মাত্র সম্বল করিয়া নগ্নদেহে ভিক্ষার ঝুলি হাতে লইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের রাখাল রাজা ব্রজধামের গ্রামে গ্রামে প্রিয় সখা শ্রীকৃষ্ণকে হারাইলে যেমন একদিন রাখালবালকগণ ব্যাকুল হইয়া উঠিত সেইরূপ ব্যাকুল হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ অন্বেষণেই যেন ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, মনে পড়িতেছে সেই আমাদের মহারাজ পরিব্রাজকরূপে সিংহ, ব্যাঘ্র ইত্যাদি হিংস্র জন্তুর ভয়কে তুচ্ছ করিয়া নিবিড় অরণ্যপথে পদব্রজে কত গিরি, কত উপত্যকা অতিক্রম করিয়া পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন, মনে পড়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বর কোটির লোক আমাদের ব্রহ্মানন্দ স্বামী নর্ম্মদা নদীর তীরে একাসনে, একাদিক্রমে ছয় দিন যাবৎ আহার বিহার সমস্ত ত্যাগ করিয়া গভীর ধ্যান নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন।

যেদিন দেখিলাম দোল পূর্ণিমার সুরধুনীতীরে বেলুড় মঠের আঙ্গিনায় ভক্তজন মাঝে প্রেমে ও ভাবে বিহ্বল হইয়া—"আজ হোলি খেলবো শ্যাম তোমার সনে" এই গীত গাহিতে গাহিতে বাহু তুলিয়া ভক্তগণের মন মাতাইয়া যেন সাক্ষাৎ নদীয়ার নিমাই আবার আসিয়া নৃত্য করিতেছেন, যেদিন দেখিলাম সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে দাঁড়াইয়া "আর কেন মন এ সংসারে, যাই চল সেই নগরে—"এই গীত গাহিতে গাহিতে কালী-কীর্ত্তনে ভক্তিগদগদ চিত্তে নৃত্য করিতেছেন এবং তাঁহার সেই অপূর্ব্ব ভাবে সহস্র সহস্র লোক মুগ্ধ হইয়া আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিতেছে, যে দিন দেখিলাম কাশীধামে সন্ন্যাসিগণের সম্মুখে রুদ্রাক্ষমালা হস্তে শিবের প্রেমে মত্ত হইয়া "বেলপাতা নেয় মাথা পেতে" গীত গাহিতে গাহিতে যেন সাক্ষাৎ শঙ্কর রূপ ধারণ করিয়া নৃত্য করিতেছেন, আবার যখন করাল বদনা, অসি মুণ্ডধরা, বরাভয়া মা জগদম্বার সম্মুখে যেন অষ্ট নায়িকার এক নায়িকা হইয়া চামর ঢুলাইতেছেন, আর পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলী দিয়া পূজা করিতেছেন, বিন্ধ্যাচলে বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দিরে গভীর রাত্রে যাইয়া ধ্যানস্থ হইয়া আছেন ও দুই চক্ষু দিয়া অবিরল ধারে ধারা বহিয়া যাইতেছে, বৃন্দাবন ধামে পদার্পণ মাত্র সমাধিস্থ হইয়া যাইতেছেন, যীশুখ্রীষ্টের জন্মদিন রাত্রে একাগ্র ভাবে Sermon on the

mount 'শ্রবণ' করিতেছেন ও যীশু খৃষ্টের উপাসনা করিয়া ভোগ দিতে-ছেন," এখন মনে হইল সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মানস পুত্র যেন সমন্বয়ের সাক্ষাৎ বিগ্রহ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ভূমণ্ডলে বিচরণ করিতেছেন। অদ্বৈতবাদীর ব্রহ্মজ্ঞান হইতে দ্বৈতবাদীর মূর্ত্তি পূজা পর্য্যন্ত সকল প্রকার সাধনার ভাব তাঁহার জীবনে যেন প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছিল "যত মত তত পথ" এই কথাটির সত্যতা যেন নিজ চরিত্রের দ্বারা তিনি দেখাইয়া দিয়া গেলেন।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব কর্তৃক প্রকাশিত মহা সমন্বয় ধর্ম্মের বার্ত্তা তাঁহার প্রিয় শিষ্য সাক্ষাৎ শঙ্করের অবতার স্বামী বিবেকানন্দ এক দিকে জগতের ঘরে ঘরে ঘোষণা করিয়া আসিলেন। বেদান্ত কেশরীর সে মহান্ গর্জ্জনে জগতের তম নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, সুপ্তোত্থিত জগৎ চক্ষু মেলিয়া সে বিরাট্ পুরুষকে দেখিয়া চমকিত হইল, তাঁহার মুখ নিঃসৃত সাম্য-বাণী শুনিয়া জগতের ভ্রম দূর হইল। সমস্ত জগৎ সমন্বয়ের ভাবে বিমুগ্ধ হইল। অপর দিকে ভগবন্নিষ্ঠ, সমন্বয় ভাবে ভাবাবিষ্ট ভক্তগণ স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখাৎ আশার বাণী পাইয়া আশ্রয়ের জন্য ছুটিয়া আসিতে লাগিল এবং স্বামী বিবেকানন্দের পশ্চাতে পশ্চাতে থাকিয়া করুণার অবতার, প্রেমের মূরতি, ভক্তবৎসল, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বড় আদরের মানসপুত্র, আমাদের ব্রজের রাখাল রাজা সেই সকল ভক্তগণকে লইয়া নীরবে শান্তভাবে শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘ গড়িয়া তুলিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দের অপরিসাম ভালবাসায় অপূর্ব্ব স্নেহে ও ঐশ্বরিক প্রেমের অঙ্ক মধ্যে থাকিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘরূপ শিশুটি শশিকলার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। "বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায় জীবন অর্পণ করা অপেক্ষা সাধন আর নাই" "sympathy sympathy সকলকে sympathy করিয়া যাও" "মনই মানুষের বন্ধন ও মোক্ষের কারণ" ইত্যাদি তাঁহার উপদেশ দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘটী সঞ্জীবিত হইতে থাকিল, সমাজের চক্ষে অতি নীচ শ্রেণীর লোক হইতে অতি উচ্চশ্রেণীর লোক পর্য্যন্ত তাঁহার প্রেমালিঙ্গন লাভে বঞ্চিত হইল না। জগতের যত লোক দুঃখের উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইয়া, অশান্তির

বহ্নিতে প্রদগ্ধ হইয়া, নৈরাশ্যের সাগরে ডুবিয়া বদ্ধ শ্বাস হইয়া, ষড়রিপুর প্রবল অত্যাচারে ক্ষত বিক্ষত হইয়া তাঁহার নিকট আসিল সকলেই আনন্দে মোহিত হইয়া, হৃদয়ে অপার শান্তি লইয়া, আশার তরীতে উঠিয়া, ষড়রিপুর উপর আধিপত্য লাভ করিয়া ফিরিয়া গেল, জগৎ যেন অভয় পাইল। কিন্তু আজ জগৎ সেই সাক্ষাৎ অভয়দাতা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ দেহত্যাগের পূর্ব্বে তাঁহার প্রিয়ভক্ত উদ্ধবকে পরম জ্ঞানের উপদেশ করিয়া, নর শরীর ত্যাগ করিয়া সমস্ত ভারতকে কাঁদাইয়া পাণ্ডবকুলকে নিরাশ্রয় করিয়া, ব্রজবালিকার হৃদয়তন্ত্রী ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, সেইরূপ আজ বহুশতাব্দী পরে আর একবার শ্রীকৃষ্ণ অংশসম্ভূত রাখালরাজ জগতে আসিয়া তাঁহার প্রেম ও ভক্তির লীলা খেলা সাঙ্গ করিয়া, শিষ্যগণকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ করিয়া জগৎকে কাঁদাইয়া, আশ্রিত জনকে নিরাশ্রয় করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। কেবলমাত্র তাঁহার সেই প্রেমের স্মৃতি, তাঁহার সেই "কোথায় আমার বাবারা কোথায়" এই স্নেহের আহ্বান, "ভয় কি, ভয় কি" বলিয়া তাঁহার সেই অমৃতময় অভয় বাণী রাখিয়া গিয়াছেন। আজ কে যেন প্রাণের ভিতর হইতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে এস এস, হে আমার হৃদয় দেবতা, হে আমার স্নেহের পুতুলি, হে আমার প্রেমের আস্পদ এস ফিরে এস, একবার এসে দেখে যাও, দেখে যাও আজ তোমার বিরহে কত শত নরনারী শোক সাগরে ভাসিতেছে, দেখে যাও আজ তোমার অভাব তাহারা হৃদয়ে হৃদয়ে কেমন অনুভব করিতেছে, বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত আজ তোমার জন্য অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে, আজ তাহারা তাহাদের একমাত্র অবলম্বন অগাধ সাগরে হারাইয়া সংসার তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে। আজ আর কোথায় যাইয়া তাহারা তাহাদের হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইবে? কোথায় যাইয়া তাহারা অপার শান্তি পাইবে? যাহাদের জন্য তুমি তোমার কৃষ্ণ-সখাকে ছাড়িয়া নর শরীর ধারণ করিয়া কত কষ্ট, কত যন্ত্রণা সহ্য করিতেছিলে, আজ তাহাদের ফেলিয়া চলিয়া যাইও না, হতভাগ্য জগৎকে দেবলীলা হইতে বঞ্চিত করিও না,

দুঃখিনী ভারত মাতা তোমার মুখপানে চাহিয়া কত আশা করিয়াছিল। আজ তাহার সে আশালতাকে ভগ্ন করিওনা। ঐ ঐ শোনো আজ ভারতের কঙ্কাল মাত্র সার, অনশনে মৃত প্রায়, সহস্র সহস্র সন্তান তোমার জন্য দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছে, ঐ ঐ শোনো আজ ভারতের সহস্র সহস্র নারী ছিন্ন বস্ত্রাবৃত হইয়া তোমার জন্য হা হুতাশ করিতেছে, ঐ ঐ শোনো আজ ভারতের সহস্র সহস্র নর নারী রোগ, মহামারীতে বিধ্বস্ত হইয়া শান্তির জন্য ব্যাকুল ভাবে তোমাকে আহ্বান করিতেছে, ঐ ঐ শোনো আজ কোটি কোটি ভারতবাসী শিক্ষার অভাবে তাহাদের জাতীয় জীবনকে রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া তোমার নিকট কাতর প্রার্থনা করিতেছে, ঐ ঐ শোনো আজ লক্ষ লক্ষ ভারতের অস্পৃশ্য জাতী সমাজের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া, তাহাদের হৃদয় ব্যাথা তোমাকে জ্ঞাপন করিতেছে—আর অপর দিকে ভক্তগণ আজ তোমার সেই সদা প্রফুল্ল বদন, তোমার সেই স্নেহ পরিপ্লুত অপূর্ব্ব দৃষ্টি, তোমার সেই হৃদয় বিগলিত কারী সুমধুর কথোপকথন তোমার সেই অপার করুণার কথা স্মরণ করিয়া দুঃখ সাগরে ভাসিতেছে। বার বার মনে হইতেছে যিনি আমাদের এত ভালবাসিতেন, যিনি আমাদের কল্যাণের জন্য এত চিন্তা করিতেন, যিনি শরীর ত্যাগের শেষ মুহূর্ত্তের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমাদের আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন সত্যই কি তিনি চির দিনের জন্য আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন, সত্যই কি আর আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইব না, সত্যই কি আমরা আর তাঁহার শ্রীমুখের বাণী শুনিতে পাইব না। যখনি যখনি এই চিন্তা মনে উদয় হয় তখনি তখনি যেন হৃদয়ের কোন এক নিভৃত স্থল হইতে কে যেন জলদ গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিতেছে "অজোনিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণঃ" ওরে আমি যে জন্মরহিত, আমি যে নিত্য, আমার যে শেষ নাই আমিই সে পুরাণ পুরুষ।

মুসাফির।

---

(২২)

(১)

যে দিন বঙ্গ-ধর্ম্ম-গগনে উঠিল জড় বিপ্লবঝঞ্ঝা
অধ্যাত্ম আলোক হইল মলিন লুপ্ত প্রায় ভক্তিমন্ত্র
এহেন সময় ধরায় উদিত শ্রীরামকৃষ্ণ পূর্ণচন্দ্র
কলুষ আঁধার পলায় সভয়ে বাজিল বিশ্বে প্রণবমন্ত্র ॥

(২)

প্রচার করিতে বেদের মর্ম্ম নাশিতে ধরার কলুষ পঙ্কে,
সহকারী রূপে যুগল তাপস উদিত তখন মেদিনী অঙ্কে
ব্রহ্মানন্দ বিবেকানন্দ বরাভয় দুই তারকা দীপ্ত
কর্ম্মক্ষেত্রে ভুজযুগ তাঁর মুক্তির বীজ করিলা উপ্ত ॥

(৩)

বিবেকবদ্ধ বিবেকানন্দ প্রচার করি সে বিবেক উক্তি
মুগ্ধ করিলা জগতবাসীরে বুঝায়ে জ্ঞান-কর্ম্ম ভক্তি
গুরুর আদেশ রাখিয়া মাথায় শিখায়ে মানবে সেবার ধর্ম্ম
সমাধিমগ্ন হইলা অকালে দেখায়ে জগতে বিশাল কর্ম্ম।

(৪)

বিবেকের সেই আদিষ্ট-কর্ম্ম সাধিয়া আজ নীরব কর্ম্মী
ব্রহ্মানন্দ সমাধিমগন ব্রহ্মে বিলীন ধ্যানের কর্ম্মী
শান্তির কোলে সুপ্ত তাপস শায়িত পূত গঙ্গাবক্ষে
অসীমেতে আজ হয়েছেন হারা মানবের চিরচরমলক্ষ্যে।

(৫)

রামকৃষ্ণ মন্দির চূড়া এতদিনে আজ হইল ভগ্ন
শত শত সঙ্ঘ চালক বিহীন বিশ্ব আজি বিপদ মগ্ন
জগত মাঝারে উঠে হাহাকার মর্ম্মভেদী কাতর কণ্ঠে
ধর্ম্মপ্রাণ ভক্তবৃন্দ তোমার বিরহে বিষাদে লুণ্ঠে

(৬)

বৃন্দাবনের রাখাল তুমি ঠাকুরের প্রিয় মানসপুত্র
প্রকৃতির চির সরল শিশুটী বসুধাময়ই তোমার-গোত্র
বিশ্বপ্রেমে সদা ভরপূর মুক্তির পথ দেখালে নিত্য
ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা বুঝালে সবারে সে সারতত্ত্ব।

(৭)

নিত্য-সিদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত 'ঈশ্বর কোটীতে' তোমার বাস
ব্রজের গোপাল ওহে মহারাজ, রচেছিলে মর্ত্ত্যে পূর্ণ-রাস
অতীত যুগের সিদ্ধ ঋষি (তুমি) দেহ ধরেছিলে লীলার তরে
প্রভুর ইঙ্গিতে ভেঙ্গে দিলে দেহ ছুটিয়া চলিতে মিলনের ঘরে॥

(৮)

অতীব সুগুপ্ত ছদ্মলীলা এই ঐশ্বর্য্যহীন প্রভু ভগবান্।
পঞ্চরস (তত্ত্ব) শিখাতে মানবে সাধনার তাই হল প্রয়োজন
বাৎসল্যভাব শিখাতে মানবে ঠাকুরের হলে সাধের তনয়
দয়াময়ী তাই দিলেন ঠাকুরে (যখন সমাধির ঘোরে
ছিলেন চিন্ময়।

(৯)

মুক্তিমন্ত্র দিয়াছ দীক্ষা নাশিতে মানব ত্রিতাপ আর্ত্তি
পর-উপকার সুমহান ব্রত সাধিয়া রেখেছ অতুল কীর্ত্তি
থাক মহাপ্রাণ স্বজনের সহ স্বপদ ভজিয়া নাশি গো শ্রান্তি
ব্রহ্মময়ীর মঙ্গল কোলে লভ হে মহান্ পরম শান্তি।

(১০)

বরিষ আশীষ মানবের শিরে বরিষ আশীষ ভকতবৃন্দে
বাজে যেন সেই নিগূঢ় মন্ত্র প্রাণের মাঝারে গভীর ছন্দে
তোমার প্রাণের ইচ্ছাশক্তি বাঁধে যেন সব পরম সখ্যে
নিয়ে চল নাথ মানব প্রবাহে অসীমের সেই চরম লক্ষ্যে।

—দীন প্রাণকৃষ্ণ।

কথাপ্রসঙ্গে।

(খ)

পরোপকার জিনিষটী জগতে অনেক দিন ধরিয়াই আছে। কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইহার উপরেও বড় আদর্শ দিয়াছেন, যে মানুষ পরের উপকার করিতে পারে না। যাঁহার জগৎ, তিনিই সকলকেই দেখিতেছেন। তবে পরের জন্য নিষ্কামভাবে কার্য্য করিলে নিজেরই উপকার হয়—চিত্ত শুদ্ধ হয়—শুদ্ধ চিত্ত জ্ঞানের দ্বার স্বরূপ। সে আদর্শ আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সেবা-ব্রতে। স্বামীজি বলিতেছেন, "তুমি কাহাকেও সাহায্য করিতে পার না, তুমি কেবল সেবা করিতে পার। প্রভুর সন্তানদিগকে, যদি সৌভাগ্য হয়, তবে স্বয়ং প্রভুকে সেবা কর। যদি প্রভুর অনুগ্রহে তাঁহার কোন সন্তানের সেবা করিতে পার, তবে তুমি ধন্য হইবে। নিজেকে একটা কেষ্ট বিষ্টু ভেব না। তুমি ধন্য যে, তুমি সেবা করিবার অধিকার পাইয়াছ, অপরে পায় নাই। অতএব জগৎ কেহই তোমার সাহায্য প্রার্থনা করে না। উহা তোমার পূজাস্বরূপ। আমি কতকগুলি দরিদ্র ব্যক্তিকে দেখিতেছি, আমার নিজ মুক্তির জন্য আমি তাহাদের নিকট যাইয়া তাহাদের পূজা করিব; ঈশ্বর সেখানে রহিয়াছেন। কতকগুলি ব্যক্তি যে দুঃখ ভুগিতেছে, সে তোমার আমার মুক্তির জন্য, যাহাতে আমরা রোগী, পাগল, কুষ্ঠী, পাপী প্রভৃতি রূপধারী প্রভুর পূজা করিতে পারি।"—এই সেবা-ব্রত জীবনে পরিণত করিবার জন্যই স্বামীজি শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন।

*　　　*　　　*　　　*

শুনিয়াছি যে কেহ ঠাকুরের কাছে উপদেশ লইতে আসিত, তাহাকেই তিনি অগ্রে জিজ্ঞাসা করিতেন, "[illegible] ভাতের যোগাড় আছে?" আরও বলিতেন, "ভুখে অন্ন, পিয়াসে পানি, ল্যাংটে বস্ত্র দিজিয়ে, অপরে হরিনাম লিজিয়ে।" স্বামীজিকেও এবিষয়ে ঠাকুর উপদেশ

করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার পত্রের মধ্যে দেখিতে পাই, তিনি বলিতেছেন "খালি পেটে ধর্ম্ম হয় না—গুরুদেব বলতেন না?" পেটে অন্ন না থাকিলে ধ্যান জপ মাথায় উঠে। তাই ঠাকুর বলিতেন, "অন্ন চিন্তা চমৎকারা, কবি কালিদাস হয় বুদ্ধি হারা।" গুরুবাক্যের অনুসরণ করিয়া দরিদ্রের অন্ন সংস্থানের দ্বারা ধর্ম্ম দান করিবার জন্যই শ্রীবিবেকানন্দের শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের স্থাপনা।

* * * *

আমরা ঠাকুরের কোন বিশিষ্ট ভক্তের নিকট শুনিয়াছি, তিনি একদিন স্বামীজিকে বলিলেন, "জীবে দয়া, সাধু সেবা, বৈষ্ণব সেবন" বলিয়াই আবার বলিলেন, "দূর শালা! স্বষ্টজীব হয়ে তুই কি দয়া করবি। তবে জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা করবি।" ঠাকুর এই ভাব আরও বিশদভাবে বুঝাইয়াছেন। তিনি বলিতেন, "অনুমানের পূজা ও বর্ত্তমানের পূজা।" শালগ্রামাদি শিলাতে চৈতন্য বুদ্ধি অরোপণ করিয়া উপাসনার নাম "অনুমান"। সম্মুখস্থ চেতন পদার্থের পূজার নাম "বর্ত্তমান", অর্থাৎ যাহাতে চৈতন্য বর্ত্তমান রহিয়াছে, দেখিতে পাইতেছি। স্বামীজির সঙ্ঘের মূল সূত্রে ঐ ভাবই বর্ত্তমান। তিনি গুরূপদেশানুযায়ীই বলিয়াছেন, "যিনি দরিদ্র, দুর্ব্বল, রোগী সকলেরই মধ্যে শিব দেখেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন। আর যে ব্যক্তি কেবল প্রতিমার মধ্যে শিব উপাসনা করে, সে প্রবর্ত্তক মাত্র।" যে ব্যক্তি জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে একটী দরিদ্র ব্যক্তিকেও শিব বোধে সেবা করে, তাহার প্রতি শিব, যে ব্যক্তি কেবল মন্দিরে শিব দর্শন করে, তাহার অপেক্ষা অধিক প্রসন্ন হন।" "তিনিই যথার্থ সাধু, তিনিই যথার্থ হরিভক্ত, যিনি সেই হরিকে সর্ব্বজীবে দেখিয়া থাকেন। যদি তুমি যথার্থ শিবের ভক্ত হও, তবে তুমি তাঁহাকে সর্ব্বজীবে ও সর্ব্বভূতে দেখিবে।"

* * * *

শাস্ত্রও বলিতেছেন,

"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥" (ভাগবত)

স্বামীজি, কখনও প্রতিমাদির উপাসনাকে উপহাস করেন নাই। তিনি চৈতন্যের প্রত্যক্ষ ক্রীড়াস্থল মনুষ্য প্রতীকের উপাসনা করিতে বলিয়াছেন—অন্নদানের দ্বারা, প্রাণদানের দ্বারা, বিদ্যাদানের দ্বারা ও ধর্ম্মদানের দ্বারা। তিনি জগতের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত করিয়া অনন্তভাবময়ী বিশ্বরূপাকে প্রত্যক্ষ করিতে বলিতেছেন,—"বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়," "আত্মানো মোক্ষায় জগদ্ধিতায়" এই মন্ত্র অবলম্বনে কর্ম্মকে পূজায় পরিসমাপ্ত করিয়া!

* * * *

শ্রীভগবান রামকৃষ্ণেও জীব-সেবার যথেষ্ট নিদর্শন আছে। কাশীপথে লোক-দারিদ্র্য তাঁহার বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণা দর্শনের সঙ্কল্প স্থগিত করে, হৃদয়ের বাক্যে নির্ব্বিকল্প সমাধিতে পঞ্চবটী তলে দেহ রক্ষা করিতে গিয়া, শ্রীশ্রীজগদম্বা কর্তৃক জীব-দুঃখ দর্শিত হইয়া, লোক কল্যাণের নিমিত্ত বহুজন্ম স্বীকারে প্রতিশ্রুতি, অপরের ব্যাধির যন্ত্রণা ও পাপ ফল নিজ শ্রীঅঙ্গে ভোগ প্রভৃতি নানা ঘটনার বিবৃতি করা যাইতে পারে। তিনি 'হীনের প্রতি দয়া' এই বুদ্ধিতে লোক-কল্যাণ করিতেন না। সর্ব্বভূতান্তর্যামিনী দেহাভিমানিনী শ্রীশ্রীজগন্মাতার সত্তা উপলব্ধি করিয়া তিনি সর্ব্বভূতে প্রীতিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি ঘাসের উপর পাদক্ষেপ করিতে পারিতেন না, পাতা ছিঁড়িতে পারিতেন না, অপরের অঙ্গের আঘাত নিজ অঙ্গে বোধ করিতেন—ইহার কারণ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই বেদবাক্য তিনি নিজ জীবনে অনুভব করিয়াছিলেন।

* * * *

'নেতি' বা 'ইতি' এই উভয় মার্গের যে কোনটী অবলম্বন করিয়া যথার্থ সত্তায় পৌছান যায়। একটী 'নেতি,' 'নেতি' বিচারের দ্বারা জগৎকে নিঃশেষে অস্বীকার করিয়া ব্রহ্ম বস্তুর উপলব্ধি এবং পরে যতদিন দেহ থাকে জীব-জগৎ প্রতীকাবলম্বনে তাঁহারই সেবা বা "সর্ব্বভূতোহিতে রতঃ।" অপরটী সর্ব্বভূতে ব্রহ্ম কল্পনার দ্বারা তাঁহার সেবা এবং পরে সেই বস্তুর উপলব্ধি—ইহাই 'ইতি' মার্গ। শাস্ত্রে মহাদেবের ক্ষিত্যাদি অষ্টমূর্ত্তি এই মার্গের প্রতীকরূপে গৃহীত হইয়াছে।

* * * *

স্বামীজির প্রচার বৃত্তিও শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট হইতেই আসিয়াছিল। তাঁহার নির্ব্বিকল্প সমাধির পর ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "এখন চাবিকাটি আমার কাছে তোলা রহিল, আমার কাজ করার পর আবার উহা লাভ হইবে।" এবং ঠাকুরের প্রচার বৃত্তিও শ্রীশ্রীজগদম্বার আদেশেই তাঁহার চিত্তে উদিত হয়। মা বলিয়াছিলেন "জীব-কল্যাণের জন্য, তুই ভাব মুখে থাক।"

* * * *

সঙ্ঘ জিনিষটীও ভারতবর্ষে নূতন নহে—বিশেষতঃ যাহারা বৌদ্ধযুগের ইতিহাস আলোচনা করেন তাঁহাদের নিকট ত একেবারেই নহে। সঙ্ঘের উৎপত্তি প্রথম ভারতবর্ষেই। এবং বর্ত্তমানেও দশ-নামী, বৈষ্ণব, শিখ প্রভৃতি বহু সন্ন্যাসী প্রচারশীল ধর্ম্ম সঙ্ঘ বর্ত্তমান। কিন্তু পাশ্চাত্য Organisation আরও উৎকৃষ্ট প্রণালীতে পরিচালিত বলিয়া স্বামীজি তাহা স্বদেশে প্রবর্ত্তন করিতে সচেষ্ট ছিলেন মাত্র।

যদি স্ত্রী যদ্যবরজঃ শ্রেয়ঃ কিঞ্চিৎ সমাচরেৎ।
তৎ সর্ব্বমাচরেদ্ যুক্তো যত্র বাস্যরমেন্মনঃ॥ মনু ॥২।২২৩॥

স্ত্রীলোক এবং শূদ্রও যদি শ্রেয়ঃ কর্ম্মের উপদেশ করে, (ব্রহ্মচারী) তাহাও উদ্যোগী হইয়া করিবেন এবং অন্য যে কোন সৎ কর্ম্মে তাহার রুচি হইবে তাহাও করিবেন॥

শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি।
অন্ত্যাদপি পরং ধর্ম্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি॥ মনু ॥ ২ । ২৩৮ ॥

মনুষ্য শ্রদ্ধাবান্ হইয়া শুভাবিদ্যা শূদ্রাদি হইতে গ্রহণ করিবে এবং পরধর্ম্ম চণ্ডালাদি অন্ত্যজ হইতেও গ্রহণ করিবে এবং নিকৃষ্ট কুল হইতেও স্ত্রীরত্ন গ্রহণ করিবে।

স্ত্রিয়ো রত্নান্যথো বিদ্যা ধর্ম্মঃ শৌচং সুভাষিতং।
বিবিধানি চ শিল্পানি সমাদেয়ানি সর্ব্বতঃ॥ মনু ॥২।২৪০॥

স্ত্রী, রত্ন, বিদ্যা ও ধর্ম্মশৌচ, যেমন হীনকুল হইতে গ্রহণ করিতে পারে, তেমন সর্ব্ব প্রকার শিল্প সকল হইতে গ্রহণ করিতে পারে।

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রা ফলাঃ ক্রিয়াঃ॥ মনু ॥৩।৫৬॥

যে কুলে স্ত্রীগণ বস্ত্রাদি দ্বারা পূজিত হয়, সেই কুলের প্রতি দেবগণ প্রসন্ন হয়েন, যে কুলে নারী পূজিতা না হয়, তাহাদের সমস্ত ক্রিয়া নিষ্ফল হয়।

মানব জীবনে সদালাপ।*

(শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন, বি, এ.)

এই সভা সদালাপ সভা; সম্মিলিত জনসঙ্ঘ সদ্বিষয়ে আলাপ বা আলোচনা করেন, ইহাই এই সদালাপ সভার উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, সৎ কাহাকে বলে. সৎ কি? তৎপরে আমরা দেখিব কি প্রকারে সেই সতের আলাপ বা সদালাপ আমাদের জীবনে কার্য্যকরী হয়; কি প্রকারে ইহা আমাদিগকে সংসারের ত্রিতাপ জ্বালা ভুলাইয়া দিয়া শান্তির উৎসঙ্গ কমলে বাসর শয্যায় শয়ন করায়।

সৎ কি? সৎ কাহাকে বলে? এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত অসংখ্য বৈচিত্র্যের মধ্যে কে সৎ, কে অসৎ, কেমন করিয়া চিনিব? সুতরাং প্রথমতঃ সতের লক্ষণ নির্ণয় করিতে হইবে। এখন দেখা যাউক সৎ শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ কি; তৎপরে দেখা যাইবে সৎ কি ও অসৎ কাহাকে বলে। অস্ ধাতু হইতে সৎ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অস্ ধাতুর অর্থ বর্ত্তমান থাকা; সুতরাং যাহা চির বর্ত্তমান, রূপান্তর-রহিত, তাহাই সৎ। এখন দেখা যাউক কি সে পদার্থ যাহা চির বর্ত্তমান, নিত্য, রূপান্তর রহিত।

আমরা দেখি—দিন যায়, রাত আসে; মাস বৎসরে লীন হয়; সন্ধ্যা অন্ধকারের কোলে ঢলিয়া পড়ে; আবার নিশ্‌খিনী উষার অস্ফুটালোকে হাসিয়া উঠে। গ্রীষ্মের প্রখর তাপ বর্ষার স্নিগ্ধ সলিল ধারায় আত্মহারা হয়; বর্ষার ঘনঘটা শরতের শুভ্র-জ্যোৎস্নালোকে, শেফালির কোমল গন্ধে, দুর্গা প্রতিমার মঙ্গল আবাহনে আপন অস্তিত্ব বিস্মৃত হয়; শরৎ আবার হেমন্তের পীত রৌদ্রতলে সুপক্ক শস্যের ক্ষেত্রে বসিয়া অনন্তের ধ্যান করে; শীতের তুষার শুভ্র পরিষদে হেমন্তের শ্রীহীনতা অপরূপ শোভায় ভরিয়া উঠে; শীত পুনরায় বসন্তের পুষ্পস্তবকে কোমল দেহ লতিকা সুসজ্জিত করে।

---

* পুঁড়া সদালাপ সভায় পঠিত।

মানব শিশু হইতে কুমার, কুমার হইতে যুবক, যুবক হইতে প্রৌঢ়, এবং ক্রমে প্রৌঢ় হইতে বৃদ্ধ হয়। বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ, বৃক্ষ হইতে ফল, ফল হইতে পুনরায় বীজ হয়।

এইরূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপীয়া একটা পরিবর্ত্তন, একটা রূপান্তর একটা সৃষ্টি, একটা ধ্বংস অবিচ্ছিন্ন চলিতেছে। মৃত্যু ও জন্ম, ধ্বংস ও সৃষ্টি যেন বিশ্বময় লুকোচুরী খেলা খেলিতেছে। তবে আমরা আপাত দৃষ্টিতে দেখিতেছি—বিশ্বে স্থির অপরিবর্ত্তনীয় চিরবর্ত্তমান কিছুই নাই—সবই পরিবর্ত্তনশীল, রূপান্তরে পরিণত, অস্থির।

কিন্তু সবই যে অস্থির, সবই যে পরিবর্ত্তনশীল, রূপান্তরে পরিণত, তাহাও ত নহে। যদিও মানব বিভিন্ন অবস্থার ভিতর দিয়া আত্ম-বিকাশ করে; বাল্য কৌমার যৌবন বার্দ্ধক্যের পরিবর্ত্তনে পরিবর্ত্তিত তথাপি তাহার মধ্যে এমন একটা কিছু আছে, যাহা এই নিত্য পরিবর্ত্তনেও অপরিবর্ত্তিত; যাহা মানব জীবনের বিভিন্ন অংশগুলিকে বিভিন্ন কুসুমের মত এক মালিকায় গাঁথিয়া রাখিয়াছে।

যথা— "নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
নচৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥
অচ্ছেদ্যোঽয়ম্ অদাহ্যোঽয়ম্ অক্লেদ্যোঽশোষ্যএবচ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥

এইরূপে দেখা যাইবে যদিও বিশ্ব আপাত পরিবর্ত্তনশীল তথাপি এই আসন্ন পরিবর্ত্তনের অন্তরালে, অসীম রূপান্তর যবনিকা তলে এমন একটা কিছু আছে যাহা অপরিবর্ত্তনীয়, স্থির, রূপান্তর রহিত, শুদ্ধ, নিত্য। যাহা খেলাঘরের বালকের মত বিশ্ব-সংসারকে পুতুল খেলায় সজ্জিত করে, সমস্ত রূপান্তরে অসীম কৌশল প্রদর্শন করে; কিন্তু নিজে রূপান্তরিত হয় না, নিজে ভেল্কীতে ভোলে না, নিজে স্থির থাকে। সেই নিত্য, শুদ্ধ অপরিবর্ত্তনীয়, রূপান্তর রহিত, অসীম আকাশ হইতেও বিশ্বব্যাপী, অগাধ সমুদ্র হইতেও গভীর, তুঙ্গ হিমালয় হইতেও মহান, চিরবর্ত্তমান পদার্থই সৎ।

আমরা দেখিলাম—বিশ্বের পরিবর্ত্তনের অন্তরালে এমন কোন

পদার্থ আছে, যাহা সৎ। এখন দেখা যাউক সে সৎ কি এবং কি প্রকারে সে সৎ আমাদের মানব জীবনকে আদর্শ আলোক চিত্রে বিভূষিত রূপের মত, নন্দনের রমণীয় উদ্যানের মত ফল, ফুল পল্লব-শোভিত জ্যোৎস্নালোকিত সুরভি সমাচ্ছন্ন করে।

কি সে পদার্থ ওই সৎ? কেমনতর রূপ, কেমন এর চেহারা? এসম্বন্ধে বিভিন্ন মতভেদ বর্ত্তমান; বেদান্ত বলেন—সেই সৎ ব্রহ্ম; বৈষ্ণব বলেন—সেই সৎ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ পরম দয়াল হরি; মুসলমান বলেন—এই সৎ আল্লা; খৃষ্টান বলেন—এই সৎ God। সুতরাং জন্মগত জাতিগত আচারগত পার্থক্যে এই সৎ বিভিন্ন লোকের নিকট বিভিন্ন ভাবে প্রতীয়মান হইবে; কিন্তু তাহা দিয়া আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। যেভাবে হউক, যে আকারে হউক, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, জগতের মানব মণ্ডলী এই সতের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। তটিনী যেমন বিভিন্ন দেশকে শস্য-সমৃদ্ধ করিয়া বিভিন্ন গতিতে বিভিন্ন ভঙ্গিমায়, বিভিন্ন পথে একই সাগরের দিকে প্রবাহিত, একই অনন্তের বিশালতায় ডুবিয়া যাইতে ব্যস্ত, মানবও তেমনি বিভিন্ন ধর্ম্মমতে, বিভিন্ন আচারে বিভিন্ন কর্ম্ম প্রবাহের মধ্যদিয়া সেই এক সতের দিকে ধাবমান; যিনি যেভাবে যেদিকে গমন করুন না কেন, সকলের লক্ষ্য এক—সেই চির বর্ত্তমান সৎ।

এখন দেখা যাউক,—কেন মানব এই সতের দিকে প্রধাবিত? সৎ ও মানবের মধ্যে এমন কি সম্বন্ধ বর্ত্তমানে, যাহাতে মানব অহরহ শয়নে স্বপনে, ভোজনে গমনে, জীবনে মরণে এই সতের জন্য ব্যাকুল।

যখন মানব তাহার ক্ষুদ্র দৃষ্টিশক্তিতে বিশ্বের আপাত প্রতীয়মান বিরুদ্ধশক্তি নিচয়ের বিরুদ্ধ কর্ম্মাবলীর সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে অসমর্থ হয়; যখন মানব দেখে তাহার ক্ষুদ্র শক্তি অসীমের সীমারেখায় প্রবেশ করিতে অসমর্থ; মাত্র সামান্য গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ, প্রতি পদে যখন মানবের গর্ব্ব চূর্ণ হয়, প্রতি কার্য্যে মানবের ইচ্ছা অন্য একটা মহতী ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তখনই মানব মন একটা এমন কিছু অদৃশ্য অচিন্ত্যনীয় মহাশক্তির আবিষ্কারে ব্যস্ত হয়, যাহার মধ্যে সমস্ত

বিরুদ্ধ কর্ম্ম ও মতবাদ সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে—যাহার মধ্যে কোন বিরুদ্ধ শক্তি কার্য্য করিতে পারে না—যাহা নিজেই নিজের বিশ্ব আত্ম-বিকাশের জন্য সৃজন করিয়াছে—আত্মপূর্ণতাই যাহার একমাত্র উদ্দেশ্য সেই অদৃশ্য মহাশক্তিই সৎ। (?) বিশ্ব-কারণ খুঁজিতে খুঁজিতে মানব দেখে সে নিজেও এই অদৃশ্য মহাশক্তির বা সতের অংশমাত্র—সেই মহাশক্তি আত্মপূর্ণতা লাভের জন্যই এই সংসারটাকে সৃষ্টি করিয়াছে; মানবও সেই মহাশক্তির অঙ্গীভূত উপাদানে গঠিত; সেই মহাশক্তি বিশ্বে ওতপ্রোত ভাবে মিশ্রিত—সতের অনন্ত শক্তি পরিচালনে বিশ্ব চলিতেছে; কিন্তু সৎ বিশ্বের মধ্যে নিঃশেষিত নহেন। কাজেই মানব ও তাহার উৎপাদক কারণ সতের মত আত্ম-পূর্ণতা লাভের জন্যই সচেষ্ট, সুতরাং সেই আত্মপূর্ণতা লাভের জন্যই সতের দিকে প্রধাবিত নদী যেমন সমুদ্রের সহিত না মিশিলে আত্মপূর্ণতা লাভ করিতে পারেন না, মানবও তেমনি যতদিন সতের সাক্ষাৎকার না লাভ করিতে পারে, ততদিন কোনরূপেই আত্মপূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। সেই হেতু মানবের সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত কার্য্য সেই সতের দিকে চলিয়াছে; বিভিন্ন অবস্থায়, বিভিন্ন পরিবর্ত্তনের মধ্যে মানব সেই চির বর্ত্তমান সতের চির অপরিবর্ত্তনীয়সত্তার উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে এই সৎ মানব জীবনের আদর্শ; ইহাই মানবের লক্ষ্যস্থল—সমস্ত কর্ম্মের পরিণতি। এই সতের মধ্য দিয়াই মানব আত্মপূর্ণতা লাভ করিবে। এই সৎই মানবকে স্বর্গরাজ্যের রুদ্ধ তোরণ উন্মুক্ত করিয়া দিবে। সৎকে ছাড়িয়া দিলে মানবের অস্তিত্বই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, আবার মানবকে ছাড়িয়া দিলে সৎ আত্মপূর্ণতা বিহীন হইয়া পড়ে; (?) তাই দার্শনিক প্রবর হেগেল বলিয়াছেন—Without world God is an abstract power and world without God can have no existence." তাহা হইলে আমরা দেখিতেছি—সৎ ও মানব পরস্পর পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ট ভাবে সংশ্লিষ্ট একক ছাড়িয়া দিলে অপর চলিতে পারে না। উভয়েই উভয়ের প্রয়োজনীয়। (?)

কাজেই দেখা যাইতেছে সদালাপ মানব জীবনের পূর্ণতার একটা

প্রধান অঙ্গ। সদালাপ বিহীন মানবজীবন বৃক্ষলতা পরিশূন্য ধূসর বালুকাময় মরুভূমি মাত্র। প্রতি পলে বিপলে, দিবসে মাসে বৎসরে, সকাল সন্ধ্যায়, বৃক্ষ পত্রের মর্ম্মর ধ্বনির মধ্যে, তটিনীর কুলুকুলু নিনাদে বিহগের অস্ফুটকলগানে, সমীরণের মৃদু হিল্লোলে, মহাসমুদ্রের, অগাধ জলোচ্ছ্বাসে, ঊর্ম্মিমালার চঞ্চল নর্ত্তনে, চন্দ্রের শুভ্রজ্যোৎস্নায়, তারকার ক্ষীণ হাসিরাশির মধ্যে, বিশ্বব্যাপ্ত গম্ভীর ওঁকার ধ্বনির মধ্যে সেই মহাবিশেষ্য সত্যের মহত্তীবাণী শ্রবণ করিতে হইবে, আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে—

"ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্র তারকং।
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়ম্ অগ্নিঃ॥
তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্ব্বং।
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি

Wordsworth এর মত বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুতে, প্রত্যেক পদার্থে সেই সত্যের বিকাশ দেখিতে হইবে। অনন্ত সৌরমণ্ডল পরিশোভিত বূর্ণমান জ্যোতিঃ পিণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদ্র সৈকতবাসী বালুকণা পর্য্যন্ত সেই সত্যেরেই বিভূতি বলিয়া আমাদিগকে প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতে হইবে। তবেই আমরা দিনদিন আমাদের আদর্শের সম্মুখীন হইতে পারিব; আমাদের জীবনকে আদর্শের অমৃত রসে অভিষিক্ত করিয়া অমরত্ব লাভ করিব।

জীবন্মুক্তি বিবেক।

শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অদ্যজাতাং যথা নারীং তথা ষোড়শ বর্ষিকীম্।
শতবর্ষাং চ যো দৃষ্ট্বা নির্ব্বিকারঃ স ষণ্ডকঃ।

যিনি সদ্যজাতা নারী ষোড়শবর্ষীয়া যুবতী এবং শতবর্ষ বয়স্কা বৃদ্ধাকে তুল্য-ভাবে দর্শন করিয়া নির্ব্বিকার থাকেন, তাঁহাকে ষণ্ডক বা পুরুষত্ববিহীন বলে।

ভিক্ষার্থমটনং যস্য বিণ্মূত্রকরণায় চ।
যোজনান্নপরং যাতি সর্ব্বথা পঙ্গুরেব সঃ॥

যিনি কেবল ভিক্ষা লাভের জন্য কিংবা মলমূত্র পরিত্যাগের জন্য ভ্রমণ করেন এবং চারিক্রোশের অধিক দূর গমন করেন না তিনিই সর্ব্বপ্রকারে পঙ্গু।

তিষ্ঠতো ব্রজতো বাপি যস্য চক্ষুর্ন দূরগম্।
চতুর্যুগাং ভুবং ত্যক্ত্বা পরিব্রাট্ সোঽন্ধ উচ্যতে॥

বসিয়া থাকিবার কালে অথবা (পথে) গমন করিবার কালে যে সন্ন্যাসীর দৃষ্টি ষোল হাত পরিমিত সম্মুখস্থ ভূমি ত্যাগ করিয়া দূরে গমন করে না, তাঁহাকে অন্ধ বলে।

হিতংমিতং মনোরামং বচঃ শোকাপহংচ যৎ।
শ্রুত্বা যো ন শৃণোতীব বধিরঃ স প্রকীর্ত্তিতঃ॥

যিনি হিতকর, পরিমিত, চিত্তের প্রীতিজনক এবং শোকবিনাশক বাক্য শুনিয়াও যেন শুনেন না তাহাকে বধির বলে।

সান্নিধ্যে বিষয়ানাং চ সমর্থোঽবিকলেন্দ্রিয়ঃ
সুপ্তবৎ বর্ত্ততে নিত্যং ভিক্ষুর্মুগ্ধঃ স উচ্যতে॥

যে ভিক্ষু অবিকলেন্দ্রিয় ও ভোগে সমর্থ হইয়া ভোগ্যবস্তুর সন্নিধানে সুপ্ত ব্যক্তির ন্যায় সর্ব্বদা অবস্থান করেন তাঁহাকে মুগ্ধ বা বুদ্ধিহীন বলে।*

---

* এই পর্য্যন্ত নারদ পরিব্রাজকোপনিষদে দৃষ্টিহয়।

ন নিন্দাং ন স্তুতিং কুর্য্যান্ন কঞ্চিন্মর্ম্মণি স্পৃশেৎ।
নাতিবাদী ভবেত্তদ্বৎ সর্ব্বত্রৈব সমো ভবেৎ॥

ভিক্ষু কাহারও নিন্দা করিবেন না, কাহারও স্তুতি করিবেন না, কাহারও মর্ম্মে আঘাত করিবেন না এবং কখনও কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিবেন না এবং সর্ব্বাবস্থায় সমভাবাপন্ন হইয়া থাকিবেন।

ন সম্ভাষেৎ স্ত্রিয়াং কাঞ্চিৎ পূর্ব্বদৃষ্টাং চ ন স্মরেৎ।
কথাং চ বর্জ্জয়েত্তাসাং ন পশ্যেল্লিখিতামপি॥

কোন স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভাষণ করিবেন না, পূর্ব্বে দেখিয়াছেন এরূপ কোন স্ত্রীলোককে স্মরণ করিবেন না, তাহাদিগের কথাও পরিত্যাগ করিবেন এবং চিত্রে লিখিত স্ত্রীলোককেও দেখিবেন না।

যেমন কোনও ব্রতধারী ব্যক্তি একবারমাত্র রাত্রিকালে ভোক্ষণ, অথবা উপবাস অথবা মৌন কিংবা অন্য কোনও ব্রতধারণের সঙ্কল্প করিয়া যাহাতে ব্রত হইতে স্খলন না ঘটে, এইরূপ সাবধান হইয়া সেইব্রত সম্যক-রূপে পালন করেন, সেইরূপ (মুমুক্ষু ব্যক্তি) অজিহ্বত্বাদি ব্রত ধারণ করিয়া বিবেক পালন করিবেন অর্থাৎ বিচার করিতে থাকিবেন। এইরূপে দীর্ঘকাল ধরিয়া নিরন্তর, আদর পূর্ব্বক বিবেক ও ইন্দ্রিয় নিরোধের অভ্যাস দ্বারা মৈত্রাদি ভাবনা প্রতিষ্ঠিত হইলে আসুর সম্পাদরূপ মলিন বাসনা সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। তাহারপর, নিশ্বাস প্রশ্বাস অথবা নিমেষ উন্মেষ যেরূপ লোকের প্রযত্নবিনাই আপনাআপনি চলিতে থাকে, সেইরূপ মৈত্র্যাদির সংস্কার আপনা আপনি চলিতে থাকিলে, তদ্দারা সংসারের ব্যবহার পালন করিয়াও এবং সেই ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে পালন করিতে পারিলাম কিনা অথবা অসম্পূর্ণ হইল এইরূপ চিন্তা মনোমধ্যে প্রবেশ করিতে না দিয়া, এবং নিদ্রা, তন্দ্রা অথবা বৃথা কল্পনা (মনোরাজ্য) রূপ সমস্তচেষ্টা হইতে যত্নপূর্ব্বক নিবৃত্ত হইয়া, কেবল চিন্মাত্রবাসনা অভ্যাস করিতে হইবে।

এই জগৎ স্বভাবতঃই চিৎ ও জড় এই উভয় স্বরূপেই প্রকাশিত হয় যদ্যপি শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি জড়বস্তু সমূহের প্রকাশের নিমিত্ত ইন্দ্রিয়সমূহ সৃষ্ট হইয়াছে, কেননা শ্রুতিতে আছে (কঠ-৪।১)

"পরাঞ্চিখানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ।"

[পরমেশ্বর শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সমূহকে বাহ্য শব্দাদিবিষয়প্রকাশন সমর্থকরিয়া তাহাদিগকে হিংসা বা হনন করিয়াছেন] তথাপি চৈতন্য জড়ের উপাদান বলিয়া এবং সেই হেতু চৈতন্যকে বর্জ্জন করা যায় না বলিয়া, চৈতন্যকে অগ্রবর্ত্তী করিয়াই জড় প্রকাশিত হয়। শ্রুতিতে আছে (কঠ ৫।১৬, মুণ্ডক ২।২।১০, শ্বেতা ৬।১৪

"তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" [সেই আনন্দস্বরূপ আত্মা দীপ্যমান থাকাতেই সূর্য্যাদি সকলেই তাঁহার প্রকাশের পর তাঁহার অনুগত ভাবে প্রকাশ পাইতেছে, এই সূর্য্যাদি পদার্থ সমূহ তাঁহার দীপ্তিতেই বিভাত হয়] তাহা হইলে প্রথম প্রকাশমান চৈতন্য পরবর্ত্তী প্রকাশমান জড়ের বাস্তবরূপ এইরূপ নিশ্চয় পূর্ব্বক জড়কে উপেক্ষা করিয়া কেবল চৈতন্যের সংস্কারই চিত্তে স্থাপন করিবেন।

এই কথা বলিয়া প্রশ্ন ও শুক্রের উত্তর দ্বারা স্পষ্টরূপেবুঝা যায়—

কিমিহাস্তীহ কিংমাত্রমিদং কিমময়মেব চ।
কস্তং কোঽহং কএতে বা লোকা ইতিবদাশুমে॥
(উপশম ২৬।৬)*

* মূলের পাঠ এইরূপ—কিয়ন্মাত্রমিদং ভোগ জালং কিংস্বয়মেব বা।
[illegible]হং কস্তং কিমেতে বা লোকা ইতি বদাশুমে॥ রামায়ণের টীকানু-
[illegible]য়ী অনুবাদ—এই ভোগজাল বা বিষয়সুখের মাত্রা বা উৎকর্ষের অবধি
[illegible] পর্য্যন্ত? ইহার স্বভাব কি প্রকার?—(এই দুইটি ভোগতত্ত্ববিষয়ক
[illegible]শ্ন) আমিই বা কে? আপনিই বা কে? (এই দুইটি ভোক্তৃতত্ত্ব বিষয়ক
[illegible]শ্ন)। এই সকল লোক বা ভোগ্যজাত কি? (এইটি ভোগ্যতত্ত্ব
[illegible]ষয়ক প্রশ্ন)। যাহা লোকিত—দৃষ্ট অর্থাৎ ভুক্ত হয় তাহাই লোক, এই
[illegible]প ব্যুৎপত্তি করিয়া লোক শব্দে ভোগ্যজাত অর্থ পাওয়া গেল। বলি
[illegible]কবল ভোগ সম্বন্ধেই এই প্রশ্নের উত্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু শুক্র ইহার
[illegible]ত্তর দিবার উপলক্ষে, সময়াভাববশতঃ লিখিত সার্ব্বভৌম উত্তর প্রদান
[illegible]রিলেন। মুনিবর বিদ্যারণ্য হয়ত তদনুসারেই প্রশ্নের আকার পরিবর্ত্তন
[illegible]রিয়াছিলেন।

এই সংসারে আছে কি ? এই সংসারে যাহা কিছু দেখিতেছি তাহা স্বরূপতঃ কি ? এবং ইহা কোন উপাদানে গঠিত ? আপনিই বা কে, আমিই বা কি ? এই লোক সকলই বা কি ? ইহা আমাকে শীঘ্র বলুন।

চিদিহাস্তীহ চিন্মাত্রমিদং চিন্ময়মেব চ।
চিত্ত্বং চিদহমেতে চ লোকাশ্চিদিতি সংগ্রহঃ।*

উপশমপ্র ২৬।১১)

এইজগতে যে একমাত্র চিৎই বিদ্যমান ইহা আর বলিতে হইবে না ; সেই চিৎই এই দৃশ্যমান প্রপঞ্চ সমূহের চরমোৎকর্ষের শেষ সীমা। সেই চিতেই তাহাদের ভেদ বৈচিত্র্য অধ্যস্ত হওয়াতে, তাহারা চিৎ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে—তুমিও চিৎ, আমিও চিৎ, এই লোক সকলও চিৎ, ইহাই সংক্ষেপে সকল তত্ত্ব।

যেমন কোন সুবর্ণকার সুবর্ণের বলয় ক্রয় করিবার কালে, সেই বলয়ের গঠনের গুণ দোষ না দেখিয়া কেবল তাহার ওজন ও বর্ণের প্রতি মনঃসংযোগ করে, সেইরূপ কেবল চিতেই মনঃসংযোগ করিতে হইবে। জড়কে

* মূলের পাঠ 'হ' স্থলে—'হি'। টীকাকারের ব্যাখ্যা—এই জগতে চিৎই আছেন। 'হি' শব্দের অর্থ এই যে—এই কথা এতই প্রসিদ্ধ যে ইহা সপ্রমান করিবার জন্য প্রমাণান্তরের অপেক্ষা নাই (ইহা স্বানুভব সিদ্ধ) এই হেতু ইহা চিৎ অর্থাৎ যাহা কিছু দৃশ্য তাহাতে চৈতন্য আছে বলিয়াই সিদ্ধ হয় অর্থাৎ ভোগ্যসমূহ চিন্মাত্র অর্থাৎ চৈতন্যই তাহাদের মাত্রা, উৎকর্ষের অবধি। কেননা তৈত্তিরীয় শ্রুতি (২।৪।১—"যাহা হইতে বাক্য সকল ফিরিয়া আইসে"—) হইতে জানা যায় যে পূর্ণ চিৎই সকল আনন্দের উৎকর্ষের অবধি। চৈতন্যেই ভেদ বৈচিত্র্য অধ্যস্ত হওয়াতে (এই দৃশ্যজাত) চিন্ময়। কেননা বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিতেছেন (৪।৩।৩২) অবিদ্যা বশতঃ পৃথগ্‌রূপে অবস্থিত এই প্রাণিগণ এই পরমানন্দেরই অংশমাত্র উপভোগ করিয়া থাকে"। তত্ত্বমসি * * * প্রভৃতি শত শত শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায় যে তুমি আমি ইত্যাদি ভোক্তৃগণের যাহা তত্ত্ব, তাহা চৈতন্য ভিন্ন অন্য কিছুই নহে—এই জন্যই বলিতেছেন তুমিও চিৎ ইত্যাদি। এবং যাহা কিছু ভোগ্য তাহা পরমার্থতঃ চৈতন্যই ; কেন না তাহাদের সত্তা ও স্ফূর্ত্তি, চৈতন্যেরই অধীন। আর শ্রুতি (মুণ্ডক ২।২।১২) বলিতেছেন "এই মহত্তর সমস্ত জগৎ ব্রহ্মস্বরূপই বটে ; এই হেতু বলিতেছেন "এই লোক সকল" ইত্যাদি।

একেবারে উপেক্ষা করিয়া, সে পর্য্যন্ত না কেবল চিত্তে মনঃসংযোগ নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় স্বাভাবিক হয় সেই পর্য্যন্ত কাল 'কেবল চিতের' সংস্কার রক্ষা করিতে, প্রযত্ন করিতে হইবে।

(শঙ্কা) আচ্ছা কেবল চিতের বাসনা বা সংস্কার দ্বারা যখন মলিন বাসনার নিবৃত্তি হয়, তখন প্রথম হইতেই কেন কেবল-চিতের বাসনা উৎপাদনের চেষ্টা হউক না? নিরর্থক মৈত্রাদির অভ্যাসের প্রয়োজন কি?

(সমাধান) এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না। কেন না তাহা হইলে সেই "কেবল-চিতের" বাসনা অতিপ্রতিষ্ঠিত বা ভিত্তিহীন হইবে। যেরূপ গৃহের ভিত্তিমূলকে দৃঢ়ভাবে নির্ম্মাণ না করিয়া স্তম্ভ দেয়াল দিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করিতে থাকিলে, সেই গৃহ টিকে না, অথবা যেরূপ বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা শরীর হইতে প্রবল দোষ না দূর করিয়া, রোগের ঔষধ প্রয়োগ করিলে তাহা আরোগ্য প্রদান করে না, সেইরূপ।

(শঙ্কা), আচ্ছা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, "তামপ্যথ পরিত্যজেৎ" (?) তামপ্যন্তঃ পরিত্যজ্য ইহাদ্বারা "কেবল-চিতের" বাসনাকেও পরিত্যাগ করিতে হইবে এইরূপ বুঝা যায়। তাহাও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না, কেননা কেবল-চিতের বাসনাকে পরিত্যাগ করিলে, ধরিয়া থাকিবার মত একটা কিছুত থাকে না।

(সমাধান) না, এইরূপ দোষ দেওয়া যাইতে পারে না। 'কেবল-চিতের' বাসনা দুই প্রকার—মনোবুদ্ধিসমন্বিত এবং মনোবুদ্ধি রহিত। মন হইল করণ, এবং আমিই কর্ত্তা এইরূপ উপাধি যাহার তাহাই বুদ্ধি, তাহা হইলে ("তামপ্যন্তঃ পরিত্যজ্য এই বাক্যাংশের এইরূপ অর্থ দাঁড়ায় যে—'আমি সাবধান হইয়া একাগ্রমনের সাহায্যে কেবল-চিতের ভাবনা করিব' এইরূপ কর্ত্তা ও করণ অনুসরণ পূর্ব্বক যে প্রাথমিক, 'কেবল-চিতের বাসনা, অর্থাৎ 'ধ্যান' করিলে যাহা বুঝা যায়, তাহাকেই পরিত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু অভ্যাসের দৃঢ়তাবশতঃ কর্ত্তা করণের অনুসরণ বর্জ্জিত, সাবধানতা শূন্য যে কেবল-চিতের বাসনা অর্থাৎ সমাধি বলিলে যাহা বুঝা যায় তাহাকে রাখিতে হইবে। ধ্যান ও সমাধির লক্ষণ পতঞ্জলি এইরূপে সূত্রে নিবদ্ধ করিয়াছেন—

"তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্" (বিভূতিপাদ—৩সূ)

(অর্থাৎ নাভিচক্র প্রভৃতি দেশে, বা কোন বাহ্য বিষয়ে যেস্থানে ধারণাভ্যাস করিতে হয়) ধ্যেয় বিষয়ক প্রত্যয়ের যে একতানতা বা প্রত্যয়ান্তর দ্বারা অবিচ্ছিন্নতা তাহাকেই ধ্যান বলে। ব্যাসভাষ্য।*

তদেবার্থমাত্র নির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ। (বিভূতিপাদ, ৪)

[তাহা (অতি স্বচ্ছ চিত্তবৃত্তি প্রবাহরূপ ধ্যান) যখন কেবলমাত্র ধ্যেয় বস্তু স্বরূপে প্রতিভাত হয়, তখন তাহাকে সমাধি বলে। সূত্রস্থ মাত্র চ প্রত্যয়ের অর্থই "স্বরূপশূন্য" এই শব্দের দ্বারা ব্যাখ্যাত হইতেছে অর্থাৎ ধ্যান যখন ধ্যানস্বরূপজ্ঞানশূন্য হয় অর্থাৎ যখন ধ্যান করিতে করিতে কেহ আত্মহারা হইয়া যায় তখন তাহাই সমাধি। 'ইব' অর্থে ন্যায়, 'ইব' শব্দের দ্বারা ধ্যান বিলুপ্ত হইবে না, অর্থাৎ থাকিবে ইহাই সূচিত হইতেছে। যেরূপ স্বচ্ছস্ফটিকমণি কুসুমরূপে প্রতিভাত হয় নিজের রূপে নহে, সেইরূপ। বিজাতীয় বৃত্তিরদ্বারা বিচ্ছিন্ন হইলেই তাহাকে ধারণা বলে, অবিচ্ছিন্ন হইলে, তাহাকে ধ্যান বলে, আর ধ্যেয়, ধ্যান, ধ্যাতা এই তিনটির স্ফূর্ত্তির মধ্যে যখন কেবল ধ্যেয় মাত্রের স্ফূর্ত্তি অবশিষ্ট থাকে তখনই তাহাকে সমাধি বলে। সেই সমাধিই যখন দীর্ঘকাল ব্যাপী হয় তখন তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত নামক যোগ বলে, আর ধ্যেয় বস্তুর স্ফূর্ত্তিশূন্য হইলে তাহাকে অসংপ্রজ্ঞাত বলে—এই মাত্র প্রভেদ। দীর্ঘকাল ধরিয়া নিরন্তর আদরের সহিত সেই (যোগ-মণিপ্রভা টীকা) সমাধির অনুষ্ঠিত হইলে তাহাতে স্থৈর্য্য লাভ হয়। সেই স্থৈর্য্যলাভ হইলে, তাহার পর কর্ত্তা ও করণের অনুসন্ধান পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত যে প্রযত্ন তাহাকেও পরিত্যাগ করিতে হইবে। ইহাই "তামপ্যন্তঃ পরিত্যজ্য" এই বাক্যাংশের অর্থ। শঙ্কা—আচ্ছা

* ধারণাভ্যাস করিতে করিতে ধ্যানাভ্যাস জন্মে। ধারণার প্রত্যয় বা জ্ঞানবৃত্তি অভীষ্টদেশে আবদ্ধ থাকে এবং সেই দেশ মধ্যেই খণ্ড খণ্ড রূপে ধারাবাহিক ক্রমে চলিতে থাকে। যখন তাহা অখণ্ডধারার মত হয় তখন তাহাকে ধ্যান বলে। ধারণার প্রত্যয় বিন্দু বিন্দু জলের ধারার ন্যায়; ধ্যানের প্রত্যয় তৈল বা মধুর ধারার ন্যায় একতান। একতান প্রত্যয়ে যেন একই বৃত্তি উদিত রহিয়াছে বোধ হয়।

তাহা হইলে "সেই ত্যাগের প্রযত্নকেও ত্যাগ করিতে হইবে (অর্থাৎ শেষোক্ত ত্যাগে আবার প্রযত্নের আবশ্যকতা আছে,) (এইরূপে পরপর প্রযত্ন চলিতে থাকিলে) তাহাতে ত অনবস্থা দোষ ঘটে (অর্থাৎ কোথাও প্রযত্নের বিরাম ঘটিবে না) ? সমাধান। না এরূপ হইতে পারে না। নির্ম্মলীবীজের রেণুর ন্যায় তাহা নিজের ও অপরের বিনাশ সাধক। যেরূপ ঘোলা জলে নির্ম্মলী বীজের রেণু প্রক্ষেপ করিলে সেই রেণু জলের মৃত্তিকাদি বিদূরিত করিয়া তৎসহ আপনিও বিনষ্ট হয়, সেইরূপ "প্রযত্ন" ত্যাগের জন্য প্রযত্ন, কর্ত্তা ও করণের অনুসন্ধানকে নিবৃত্ত করিয়া আপনাকেও নিবৃত্ত করিবে এবং তাহা নিবৃত্ত হইলে, মলিন বাসনার ন্যায় শুদ্ধ বাসনাও ক্ষীণ হওয়াতে, মন বাসনা শূন্য হইয়া অবস্থান করে। এই অভিপ্রায়েই বশিষ্ঠ বলিতেছেন।—

তস্মাদ্বাসনয়া বদ্ধং মুক্তং নির্ব্বাসনং মনঃ।
রাম নির্ব্বাসনীভাবমাহরাশু* বিবেকতঃ॥
(স্থিতি প্রকরণ) ৩৪।২৭

সেই হেতু† বাসনার দ্বারই মন বদ্ধ হয়, এবং বাসনাশূন্য মনই মুক্ত; হে রাম, তুমি বিচারদ্বারা মনের সেই বাসনাশূন্য ভাব, শীঘ্র আনয়ন কর।

সমালোচনাৎ§ সত্যাদ্বাসনা প্রবিলীয়তে,
বাসনা বিলয়ে চেতঃ শমমায়াতি দীপবৎ॥

যথাভূতার্থগোচর সম্যক্ বিচারের ফলে বাসনাসমূহ (ঐ ২৮) প্রবিলুপ্ত হইয়া যায়। বাসনাসমূহ অবিলুপ্ত হইলে, চিত্ত-দীপের ন্যায় নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়।

* মূলের পাঠ "আহরস্ব"।

† ভীমভাসদৃঢ়ের উপাখ্যান দ্বারা দেখাইলেন যে বাসনাই গতির কারণ, সেই হেতু।

§ মূলের পাঠ "আলোকনাৎ"।

টীকা—সেই বাসনাশূন্যভাব আনিবার উপায় কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—সত্য অর্থাৎ যাহা ভূতার্থগোচর সমালোচক দ্বারা অর্থাৎ (রত্নপ্রভাকে রত্ন বলিয়া গ্রহণ না করিয়া) রত্নের স্বরূপ সাক্ষাৎকারের ন্যায় অর্থাৎ দীর্ঘকালব্যাপী বিচার প্রণিধানজনিত সাক্ষাৎকার দ্বারা, বাসনাসমূহ বিলুপ্ত হয় ইত্যাদি।

যো জাগর্ত্তি সুষুপ্তিস্থো যস্য জাগ্রন্নবিদ্যতে ।
যস্য নির্ব্বাসনো বোধঃ সজীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ইতি চ ।

(উৎপত্তি প্রকরণ ৯।৭)*

যিনি সুষুপ্তাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও জাগত থাকেন অর্থাৎ যাঁহার মন বৃত্তিশূন্যাবস্থা প্রাপ্ত হইলেও তাঁহার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল নিজ নিজ গোলকে অবস্থান করিতে থাকে এবং যিনি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়োপলব্ধি করেন না বলিয়া যাঁহার জাগ্রৎ নাই এবং যাহার বুদ্ধি তত্ত্ব জ্ঞানের অভিমান শূন্য ও ভোগের সংস্কার বর্জ্জিত, তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত বলে।

সুষুপ্তিবৎ প্রশমিতভাববৃত্তিনা, স্থিতং সদা জাগ্রতি যেন চেতসা
কলান্বিতো বিধুরিব যঃ সদা বুধৈর্নিষেব্যতে মুক্ত ইতি হ স স্মৃতঃ ।

(উপশম প্র ১৬।২২ †

সুষুপ্তিকালে চিত্তে যেরূপ কোন প্রকার পদার্থ বিষয়িনীবৃত্তির উদয় হয় না, জাগ্রৎকালেও সেইরূপ চিত্ত লইয়া যিনি সর্ব্বদা অবস্থান করেন, এবং যিনি কলার আধার বা বিদ্যাবান বলিয়া যাঁহার সঙ্গে

* এই গ্রন্থের ৫১ পৃষ্ঠায় এই শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে তথায় ইহার গ্রন্থকার কৃত ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যাইবে। মূলের পাঠ "সুষুপ্তাহ" তদনুসারে টীকাকারের ব্যাখ্যা এইরূপ "তিনি নির্ব্বিকার স্বকীয় আত্মায় সুষুপ্তের ন্যায় অবস্থান করেন বলিয়া 'সুষুপ্তাহ' এবং সেইরূপ হইলেও তাঁহার অবিদ্যারূপ নিদ্রাক্ষয় হওয়াতে, তিনি স্বকীয় আত্মায় জাগ্রৎ থাকেন, এবং তাঁহার দেহেন্দ্রিয়াদির অভিমান পরিত্যক্ত হওয়াতে, তাঁহার ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় গ্রহণরূপ জাগ্রৎ নাই। তাঁহার বোধ নির্ব্বাসন অর্থাৎ জাগ্রদাবস্থার সংস্কার জনিত স্বপ্নও নাই—ইহাই ভাবার্থ।"

† মূলের পাঠ প্রথম চরণে সুষুপ্তবৎ, তৃতীয় চরণে 'সদামুদা' ও চতুর্থ চরণে "ইতি হ স স্মৃতঃ"। রামায়ণ টীকাকারের ব্যাখ্যা এইরূপ—সুষুপ্ত ব্যক্তির চিত্তে যেমন কোন পদার্থই স্থানলাভ করিতে পারে না, সেই রূপ চিত্ত লইয়া যিনি জাগ্রৎ কালেও অবস্থান করেন, এবং পূর্ণচন্দ্র যেমন প্রসন্নতার আশ্রয় হন, সেইরূপ যিনি সর্ব্বদাই চিত্ত প্রসাদের আশ্রয় হইয়াছেন, তাঁহাকেই মুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় ।

পূর্ণচন্দ্রের সঙ্গের ন্যায় বিচারশীল ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা সেবন করেন তাঁহাকে এই সংসারে লোকে মুক্ত বলিয়া থাকে।

হৃদয়াৎ সম্পরিত্যজ্য সর্ব্বমেব মহামতিঃ।
যস্তিষ্ঠতি গতব্যগ্রঃ স মুক্তঃ পরমেশ্বর॥ (স্থিতিপ্রকরণ ৫৭।২৫)

যে মহাবুদ্ধিমান্ ব্যক্তি হৃদয় হইতে সকল (বাসনাদি) বিদূরিত করিয়া ব্যগ্রতা পরিশূন্য চিত্তে অবস্থান করেন, তিনিই মুক্ত, তিনিই পরমেশ্বর।*

সমাধিমথ কর্ম্মানি মা করোতু করোতু বা
হৃদয়ে নাস্ত সর্ব্বাশো মুক্ত এবোত্তমাশয়ঃ॥ (ঐ ৫৭।২৬) †

যাঁহার হৃদয় হইতে সমস্ত আশা অস্তমিত হইয়াছে তিনি সমাধি ও কর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন বা নাই করুন সেই মহাশয় ব্যক্তি যে মুক্ত হইয়াছেন তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।

নৈষ্কর্ম্ম্যেণ ন তস্যার্থস্তস্যার্থোঽস্তি ন কর্ম্মভিঃ
ন সমাধান জপ্যাভ্যাং যস্য নির্ব্বাসনং মনঃ॥ (ঐ ৫৭।২৭)

যাঁহার মন বাসনা শূন্য হইয়াছে তাঁহার কর্ম্ম ত্যাগেরও প্রয়োজন নাই, কর্ম্মানুষ্ঠানেরও অপেক্ষা নাই। তাঁহার সমাধি এবং জপানুষ্ঠানেরও প্রয়োজন নাই।

বিচারিতমলং শাস্ত্রং চিরমুদ্‌গ্রাহিতং মিথঃ।
সংত্যক্ত বাসনান্মৌনাদৃতে নাস্ত্যত্তমং পদম্॥ (ঐ ৫৭।২৮) §

* রামায়ণ টীকাকারের ব্যাখ্যা—যিনি পূর্ণস্বরূপে স্থিতিলাভ করিয়াছেন তিনি জগতের পূজনীয় ইহাই বুঝাইবার জন্য তাঁহার প্রশংসা করিতেছেন, গতব্যগ্রঃ শব্দের অর্থ যিনি সর্ব্ব বিক্ষেপের নিদানভূত অভিমান পরিত্যাগ করিয়াছেন।

† মূলের পাঠ 'সর্ব্বাস্থো' টীকাকারের ব্যাখ্যা—এইরূপে অভ্যাসের পরিপাক দ্বারা যিনি সপ্তমী ভূমিকায় আরোহন করিয়া কৃতকৃত্য হইয়াছেন তাঁহার আর কোনও কর্ত্তব্য অবশিষ্ট নাই ইহাই শ্লোকের ভাবার্থ। "হৃদয়ে নাস্ত সর্ব্বাশেঃ" পাঠে হৃদয় হইতে অস্ত নিরস্ত সর্ব্ব আস্থো—পূর্ব্বোক্ত অভিমানাভ্যাস' যাঁহার দ্বারা—তিনি; এইরূপ অর্থ করিতে হইবে।

§ রামায়ণ টীকাকার বলেন—কিছুকাল ধরিয়া শ্রবণ মনন ও

আমি যথেষ্ট শাস্ত্র বিচার করিয়াছি, দীর্ঘকাল ধরিয়া সুধীগণের সহিত পরস্পর স্ব স্ব সিদ্ধান্তের মেলন করিয়াছি, (পরিশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি) যে, সকল বাসনার সম্যক্ প্রকারে ক্ষয় হইলে যে মুনি ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অবস্থা আর নাই, অর্থাৎ তাহাই পরমপদ।

এস্থলে, কেহ যেন এরূপ আশঙ্কা না করেন যে মন সম্পূর্ণরূপে বাসনাশূন্য হইলে, যে সকল ব্যবহার, জীবন ধারণের কারণ তাহা বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার বিলুপ্ত হইবে এইরূপ আশঙ্কা, অথবা মনের ব্যবহার বিলুপ্ত হইবে, এইরূপ আশঙ্কা—তন্মধ্যে প্রথমোক্ত আশাঙ্কা, উদ্দালক, এই বলিয়া পরিহার করিতেছেন যে—

> বাসনাহীনমপ্যেতচ্চক্ষুরাদীন্দ্রিয়ং * স্বতঃ
> প্রবর্ত্ততে বহিঃস্বার্থে বাসনা নাত্র কারণম্॥
> (উপশম প্রকরণ ৫২।৫৯)

বাসনহীন হইলেও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় শরীর রক্ষক বাহ্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, ইহাতে বাসনা কারণ নহে। দ্বিতীয় আশঙ্কার পরিহার বশিষ্ঠদেব এই প্রকারে করিতেছেন :—

নিদিধ্যাসনাভ্যাস দ্বারা বাসনা ক্ষয় হইবার পূর্ব্বেই আমি কৃতকৃত্য হইয়াছি, এইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়া কেহ পাছে পরমশ্রেয়ো লাভ হইতে নিবৃত্ত হয়, এই উদ্দেশ্যে ঋষি বলিতেছেন—"আমি ইত্যাদি"। আমি বহু পরিশ্রমে পণ্ডিতগণের সহিত কথোপকথন করিয়া সকলের সম্মতি ক্রমে ইহাই মোক্ষশাস্ত্র রহস্য বলিয়া নির্ণয় করিয়াছি ; যে শ্রবণ ও মননের পরিপাক জনিত নির্ব্বিকল্প অসম্প্রজ্ঞ সমাধির পরিপাক দ্বারা যে মুনিভাব লাভ করা যায় তদ্ব্যতীত পরমপদ অর্থাৎ "ব্রাহ্মণ" নামক পরিনিষ্ঠিত তত্ত্বজ্ঞান হইতে পারে না। টীকাকার বৃহদারণ্যক শ্রুতি ৩।৫।১ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

* মূলের পাঠ—"চক্ষুরাদীন্দ্রিয়ৈঃ" রামায়ণের টীকা—আচ্ছা বাসনা আদৌ না থাকিলে, বাহ্য প্রবৃত্তি একেবারেই বিলুপ্ত হইবে, তাহা হইলে সেই লোকের জীবন ধারণ করা ত হইবে না, এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন, এই শরীর বাসনাহীন হইলেও জীবনধারণের উপযোগী কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে। দেহাভিমান শূন্য দামব্যালকটের যুদ্ধে প্রবৃত্তি হইয়াছিল।

অযত্নোপনতেষক্ষিদিগ্দ্রব্যেষু যথা পুনঃ।
নীরাগমেব পততি তদ্বৎকার্য্যেষু ধীরধীঃ॥ * ইতি
(স্থিতি প্রকরণ ২৩।৪৪)

যদৃচ্ছাক্রমে সম্মিলিত দিক্ দ্রব্য প্রভৃতি পদার্থে চক্ষু যে রূপ অনাসক্ত ভাবে পতিত হয়, তত্ত্বজ্ঞানীর বুদ্ধিও সেইরূপে, ব্যবহারি কার্য্য সমূহে প্রবৃত্ত হয়। সেইরূপ বুদ্ধির দ্বারা যে প্রারব্ধ ভোগ করা চলে, তাহা বশিষ্ঠ দেবই এইরূপে বুঝাইতেছেন :—

পরিজ্ঞায়োপভুক্তো হি ভোগো ভবতি তুষ্টয়ে
বিজ্ঞায় সেবিতশ্চোরো মৈত্রীমেতি ন চৌরতাম্॥†
(স্থিতি প্রকরণ ২৩।৪১)

যেরূপ কাহাকেও চোর বলিয়া চিনিয়া তাহার সঙ্গ করিলে সে যেরূপ আশঙ্কার কারণ হয় না, বরং মিত্রতা করে, সেইরূপ ভোগকে (মোহোৎপাদক বলিয়া) চিনিয়া ভোগ করিলে (তাহা আশঙ্কার কারণ না হইয়া) বরং প্রীতিরই কারণ হয়।

* মূলের পাঠ :—"অযত্নোপনতেষ্বক্ষি পদার্থেষু" ইত্যাদি। টীকাকারের ব্যাখ্যা—কোনও পথিক পথে যাইতে যাইতে, পর্ব্বত বন পুষ্করিণী—প্রভৃতি পদার্থ যত্নপূর্ব্বক স্বকীয় চক্ষু সমক্ষে আনয়ন করেন না, এবং তাঁহাতে যে তরু গুল্ম পদ্ম প্রভৃতি পদার্থ দৃষ্ট হয় তাহাতে তাঁহার মমতাভিমান না থাকাতে, তাহাদিগকে কেহ ছিন্ন ভিন্ন ও অপহরণ করিলেও তাঁহার কোনও দুঃখ হয় না—তত্ত্বজ্ঞের বুদ্ধিও স্বকীয় স্ত্রী পুত্রাদিতে ও ব্যবহার কার্য্যে সেইরূপ অনাসক্ত ভাবে পতিত হয়।

† মূলের পাঠ—পরিজ্ঞাতোপভুক্তোহি, ভোগোভবতি তুষ্টয়ে। বিজ্ঞায় সেবিতামৈত্রীমেতি চৌরণ শক্রতাম্"॥ ৪১॥ টীকাকারের টিপ্পনি—বিষয়ের তত্ত্ব অবগত হইয়া তাহাদিগকে উপভোগ করিলে (তাহারা মোহাদির কারণ না লইয়া) প্রত্যুত সুখেরই কারণ হয়।

লীলান্তে।*

(২৩)

(১)

কার ওই চিতা জ্বলে পবিত্র জাহ্নবীকূলে

ভেদিয়া গগন উঠে হবি-তৃপ্ত হুতাশন,

চন্দনের সুরভিতে আমোদিত চারিভিতে

প্রক্ষিপ্ত-ধূপাদি বাসে যাগ প্রায় শবাসন ?

(২)

ওই কিরে "মহারাজ" "কাঙালের রাখাল রাজ"

ভারত বিশ্রুত যাঁর মহাপুণ্য নাম ?

ভাসায়ে অকূল জলে অনাথ ভকতদলে

চলিলা কি নররাজ ত্যজিয়ে মরত ধাম

(৩)

দিবা-অবসান কালে রাখাল বালক-দলে

যায় যথা নিজালয়ে ছাড়িয়ে গোঠের খেলা।

তেমতি কি খেলা শেষে চলিলা শ্রীগুরু-পাশে

ব্রজরাজ সম আজ ভাঙ্গিয়ে ব্রজের মেলা ?

(৪)

গোধূলির ধূলি সনে জননীর আবাহনে

গৃহেতে ফিরিত যথা যশোদার নীলমণি,

তেমতি কি চলিয়াছ ফেলিয়া মাটির ছাঁচ

পশিল কি কাণে আসি মায়ের—আদেশ ধ্বনি ?

---

* শ্রীশ্রীমহারাজের তিরোভাব উৎসব উপলক্ষে ৯ই বৈশাখ ঢাকা—র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণাশ্রমে পঠিত।

(৫)

পর পার হ'তে আজি   উঠিল কি বাঁশী বাজি
শুনিলা কি সেই তান মন প্রাণ মাতান ?
ছুটিয়া চলেছ এবে   স্মরি সে পূরব ভাবে
ছুটিতে যেমতি শুনি কালার বাঁশরী গান ॥

(৬)

বুঝেছি বুঝেছি হায়   পিতৃডাকে দিলে সায়,
(পিতা) সুরধামে স্মরিয়াছে মানস তনয়।
তাই হেন লয় মনে   লইয়া পার্শ্বদগণে
দেখা দিল শনি-রাতে * রামকৃষ্ণ লীলাময় ॥

(৭)

রাজরাজেশ্বর ছিলে   জগত-ঈশ্বর-ছেলে
সুন্দর-সরসকান্তি যোগী-মন-উচাটন্।
† নরেনের "ভাই রাজা"   আশ্রিতের "মহারাজা"
ছিলে তুমি যতিপতি চির-পতিত-পাবন্॥

(৮)

রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ যত   তোমারি ত পদানত,
ছিলে বাসুকির মত শিরে করিয়ে ধারন।
শিরোমণি সবাকার   এবে হেরি শবাকার
উঠে ধ্বনি হাহাকার বায়ু করি আলোড়ন ॥

(৯)

"ব্রহ্মানন্দ" নিলে নাম   ব্রহ্মেছিল স্বাধিষ্ঠান্,
"ব্রহ্মসত্য জগন্মিথ্যা" প্রচারিলে সারতথ্য।
ভারত-ভারতিগণে   প্রদানিলে ব্রহ্মধনে
আজীবন বুঝাইলে "জেনো মাত্র ব্রহ্ম সত্য॥"

* এই কবিতাটী বৈশাখের উদ্বোধনের "মহাসমাধি" নামক প্রবন্ধের ভাব লইয়া লিখিত। দেহত্যাগের পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিন রাত্রিতে যে অপরোক্ষ দর্শন হয় তাহাই এখানে উল্লেখ করা হইল।

† উদ্বোধনের "মহাসমাধি" দ্রষ্টব্য।

(১০)

কতশত পথভ্রান্ত　　　হ'য়ে ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত
জুড়ায়েছে তপ্তকায়ে রাজীব চরণ-ছায়ে।
নরনারী বালবৃদ্ধ　　　কিবা যোগী কিবা সিদ্ধ
লভিয়াছে অযাচিত—অপার করুণা-বায়ে॥

(১১)

ঝরিত নয়ন তব　　　নিরখি কলির জীব
বেদনায় গলিত হৃদয় বিরাটের তরে।
তাই বুঝি ভাগীরথী　　　হেরি সেই "দয়া মূর্ত্তি"
উথলিয়া আসিয়াছে লইতে শীতল ক্রোড়ে॥

(১২)

বেলুড়ের লীলা শেষ　　　পরিহরি রাজবেশ
চলিয়াছ ওহে প্রভো! চিদানন্দময় দেশে।
শোকেতে আকুল মোরা　　　অবোধ শিশুর পারা
বুঝিনা যে এসেছিলে দেবতা লুকানো বেশে॥

(১৩)

নীলাকাশে চাঁদ হাসে　　　জলে তার ছবি ভাসে
দীন যত খেলা করে বিস্মিত ছবির সাথে
ভাবেনাত একবার　　　চাঁদ নহে আপনার
নিমেষে আনিবে ডাকি গহন আঁধার রাতে॥ *

(১৪)

তেমতি ভকত যত　　　ভাবেনি সে কখনত
চকিতে চলিয়া যাবে ভাঙ্গিয়া চাঁদের হাট।
তাইত কাঁদিছে প্রাণ　　　সন্তশোকে ম্রিয়মান
বুঝেনা সে নিত্যলীলা বিপুল বিরাট॥

* উদ্বোধনের 'মহাসমাধির' শেষ কয়েক ছত্রের ভাবার্থ লইয়া লিখিত।

(১৫)

যাও দেব! যাও চলে রাখিয়া অবনী তলে
তপোপূত চিত্র মনো-মুকুরে সবার।
জীবনে মরণে সারা পূজিব স্মৃতিটী মোরা
গোপনে যতনে শুধু ঢালি ভক্তি-অশ্রু ধার॥

(১৬)

আশীর্ব্বাদ কর দাসে কাটিবারে অষ্টপাশে
লভিবারে পরাশান্তি চরণ পরশ ফলে।
কাণ্ডারী হইও প্রভু দিশেহারা হলে কভু
জীবনের তরীখানি সংসার-সাগর জলে॥

বর্ত্তমান যুগ ও যুগধর্ম্ম।

[শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার]

পশ্চাতে শ্মশান—সম্মুখে সুতিকাগার; পশ্চাতে কেন্দ্রভ্রষ্ট, ছত্রভঙ্গ, আত্মহারা অত্মঘাতী অভিসার, সম্মুখে আত্মপ্রতিষ্ঠ সমন্বয়। পশ্চাতে মরণাহত অতীতের বিলাপবহুল হাহাকার, সম্মুখে নবজাত শিশু-বর্ত্তমানের অস্ফুট ক্রন্দন!

জগতের ইতিহাসে—এমন কি ভারতের ইতিহাসেও এমন সঙ্কটাপন্ন সন্ধিক্ষণ নূতন নহে। সমাজের শ্রেণী বিন্যাস উচ্চনীচ ভেদ যখন প্রবল হইয়া উঠে, অর্থ ও দারিদ্র্যের আধিক্য যখন সমাজের দুই বিভিন্নস্তরে ঐকান্তিক হইয়া উঠে, রাজদণ্ড যেখানে অন্যায়রূপে দুর্ব্বলকে অযথা নিপীড়িত করে। মনুষ্য সমাজে যখন ধর্ম্মের গ্লানি প্রকট হয়, অত্যাচারের অধীনে সর্ব্বপ্রকার দুর্নীতি সহস্র শির লইয়া দেখা দেয়, ধ্বংস যখন অনিবার্য্য ও আসন্ন, তখন পুরাতনের জীর্ণ মৃতভার শ্মশান চুল্লীতে ভস্মীভূত করিয়া সেই ভস্মস্তূপের বেদীর উপর নূতন স্ফুলিঙ্গ লইয়া আবার নূতন সৃষ্টির সূত্রপাত দেখা দেয়—মনুষ্য সমাজ তখন ঢালিয়া সাজিবার

প্রয়োজন হয়। সেই পরম প্রয়োজনের মুহূর্ত্তে এক একজন মহাপুরুষ আসিয়া দেখা দেন।

একদিন ভারতবর্ষে স্ত্রী শূদ্র ও ব্রাহ্মণের ভেদ ঐকান্তিক হইয়া উঠিয়াছিল। অশ্বমেধ, গোমেধ, নরমেধ যজ্ঞাড়ম্বরে ভারতভূমি রুধিরাক্ত হইয়া উঠিতেছিল। রাজ-চক্রবর্ত্তী সম্রাট প্রজা-শক্তির কবন্ধের উপর তাঁহার বিজয়ী রথচক্র ঘর্ঘর শব্দে চালনা করিতেছিলেন, প্রজাশক্তি পর্য্যুদস্ত হইতেছিল, বেদ ও শাস্ত্রজ্ঞান কেবল ব্রাহ্মণের শ্রেণীতে আবদ্ধ ছিল, সভ্যতা কৃত্রিম হইয়া উঠিতেছিল, ইহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ভগবান বুদ্ধ দেব আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন। বেদ অস্বীকৃত হইল, ব্রাহ্মণ দূরে সরিয়া গেল, স্ত্রী শূদ্র ধর্ম্মের নামে সঙ্ঘবদ্ধ হইল। রাজ-চক্রবর্ত্তী সম্রাট সিংহাসন রাজদণ্ড ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া সামান্য ভিক্ষুকের বেশে ভারতবর্ষের পথে পথে ভগবান বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া জীবন-সন্ধ্যায় ভ্রমণ করিয়া গেলেন। সভ্যতার কৃত্রিম আবর্জ্জনা দূরে অপসারিত হইল, আপামর সাধারণের মধ্যে জ্ঞানরশ্মি ছড়াইয়া পড়িল, ভারতবর্ষের মনুষ্য এক অতুলনীয় সাম্যবাদের আদর্শে অনুপ্রাণীত হইয়া ধর্ম্ম ও সমাজকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিল। রাষ্ট্রক্ষেত্রে এই সাম্যবাদ তাহার প্রভাব বিস্তার-করিল।

ইয়োরোপের রঙ্গমঞ্চেও একদিন এইরূপ এক অভিনয় হইয়া গিয়াছে। রোমসাম্রাজ্যে যখন উচ্চনীচের ভেদ প্রবল হইল, বিলাস-ব্যভিচার স্রোতের মত প্রবাহিত হইল, রোমক সম্রাট যখন সাম্রাজ্যের মধ্যে শাসনের নামে পীড়ন আরম্ভ করিলেন, দুর্ব্বল যখন নিষ্পেষিত, আর্ত্ত, ভীত মুমূর্ষ, ধর্ম্মের যখন অত্যন্ত গ্লানি, রোমক-প্রধানেরা যখন ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র ও ভোগবাদী তখন সভ্যতার সেই কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে, সেই অধর্ম্মের বিরুদ্ধে দুর্ব্বলের রক্ষা-কল্পে প্রতিক্রিয়ার ফলে আর এক শক্তির স্ফুরণ হইল—এক দীন দরিদ্র মূর্খ সূত্রধরের পুত্র ইউরোপের ইতিহাস অঙ্গুলি হেলনে পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়া গেলেন। গ্রীস ও রোমের সভ্যতার পরে ইউরোপ যখন বর্ব্বরতার প্লাবনে ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইতেছিল, তখন সেই প্রলয় পয়োধি হইতে মহাত্মা যীশু ইয়োরোপকে তুলিয়া ধরিয়া রক্ষা করিয়া গেলেন।

আদর্শভ্রষ্ট বিপথগামী জাতির মধ্য হইতে সঙ্কটের দিনে এক একজন মহাপুরুষ উত্থিত হইয়া পুনরায় নূতন আদর্শে জাতি গড়িয়া তুলিয়াছেন,—পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার প্রমাণের অভাব নাই।

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপ জড়-বিজ্ঞানের উন্নতির মধ্য দিয়া এক অভিনব সভ্যতা গড়িয়া তুলিল। এই আধুনিক সভ্যতার মনোহর বাহ্যরূপে সমগ্র পৃথিবীর চক্ষু ঝলসিয়া গেল। যান, বাহন ও সংবাদাদি আদান প্রদানের আশ্চর্য্য কৌশলময়ী যন্ত্রশক্তির সাহায্য; নব্য ইউরোপের ভাবরাশি সমগ্র জগতে ছড়াইয়া পড়িল। কোন দেশের মানুষই ইহার গতিরোধ করিতে পারে নাই, করিবার প্রয়োজনও অনুভব করে নাই। আধুনিক সভ্যতা বাহ্যজগতে যে বিচিত্র পরিবর্ত্তন আনিয়াছে, মানুষের মনোরাজ্যেও সেইরূপ অথবা তদপেক্ষা অধিকতর পরিবর্ত্তন করিয়াছে। এ যুগের সভ্য মানুষ তাহাকেই বলে,—যে মানবের বর্ব্বরোচিত ও পাশবিক প্রবৃত্তির কদর্য্য সম্ভোগগুলিকে মনোহর ও কমনীয় ভাবে প্রকাশ করিতে পারে। এক ভয়াবহ জঘন্য বর্ব্বরতা ও স্বার্থপরতা সর্ব্বদেশের সমাজে শিক্ষা ও সভ্যতার আবরণে এমন এক চিত্তাকর্ষক ভঙ্গীতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—যাহা কোন দেশে কোন কালে সম্ভব হয় নাই। এযুগের সভ্য পাষণ্ডগণ তাহাদের ইন্দ্রিয়ললুপতা ও ভোগাকাঙ্ক্ষার এমন সমস্ত সূক্ষ্ম দার্শনিক ব্যাখ্যা দিতে পারে ও দিয়া থাকে যাহা অল্পবুদ্ধি মানুষের নিকট সহজেই হৃদয়গ্রাহী হয়। রাষ্ট্রে, সাহিত্য ও সমাজে এই যথেচ্ছাচারের লীলা যখন অপ্রতিহত গতিতে চলিতেছে, স্বাধিকার প্রমত্ত ইউরোপের বাণিজ্য ও লুণ্ঠন যখন পৃথিবীবক্ষ বিক্ষোভিত করিতেছিল,—মানুষ অ-সহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিল,—এই সভ্যতার ভোগাবর্ত্তে ডুবিয়া ভাসিয়া মানুষ যখন কূলে দাঁড়াইবার উপায় পাইতেছিল না,—তখন এক পরম প্রয়োজনে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে এক মহাদর্শ প্রকটিত হইয়াছিল।

আধুনিক সভ্যতার বিরুদ্ধে, ভোগবাদের বিরুদ্ধে, ইন্দ্রিয় পরতন্ত্রতার বিরুদ্ধে এই প্রতিক্রিয়ামূলক প্রচণ্ড-শক্তির খেলা বিংশ শতাব্দীতে কেবল আরম্ভ হইয়াছে মাত্র।

অনেকে ক্রমোন্নতির কথা তুলিয়া থাকেন, যুক্তি দ্বারা তর্ক করিয়া প্রমাণও করেন; কিন্তু জগতে অল্পসংখ্যক মনীষাই ধরিতে পারিয়াছেন এবং বুঝিয়াছেন যে এ যুগের মানুষ—মানুষ হিসাবে যতটা নামিয়া গিয়াছে, তাহা, 'অন্ধকারময় মধ্য-যুগেও' সম্ভব হয় নাই। উত্থান ও পতনের লীলাবর্ত্তে মানুষ ভাসিয়া চলিয়াছে সত্য; কিন্তু এত বড় অধঃ-পতন মানুষের অদৃষ্টে আর কখনও হয় নাই। স্বামী বিবেকানন্দ অন্যান্য পতনকে, বর্ত্তমান অধঃপতনের সহিত তুলনা করিতে গিয়া গোস্পদ ও সমুদ্রের উপমা দিয়াছেন। কিন্তু ইউরোপ তো দূরের কথা, এই পুণ্য-ভূমি ত্যাগ-বিবেক-বৈরাগ্যের দেশ ভারতবর্ষও আজ আধুনিক সভ্যতায় মোহাবিষ্ট। এমন অনেক বিজ্ঞ-ব্যক্তি আছেন, যাহাদের কথাটা মনঃপূত হইবে না। আধুনিক সভ্যতার আশীর্ব্বাদ বা অভিশাপ এই প্রচুর পর্য্যাপ্ত ভোগায়োজন উপেক্ষা করিয়া সহজ সরল আড়ম্বরহীন জীবন-যাপন করিতে আজ অনেকেই প্রস্তুত নহেন, প্রয়োজনও বোধ করেন না। দেহসর্ব্বস্ব এ যুগের স্বার্থপর মানুষ অন্ধ-উন্মত্ত-গতিতে এক শোচনীয় ধ্বংসের পথে ছুটিয়া চলিয়াছে—ইহাদিগকে ফিরাইয়া আনিবার গুরুদায়ীত্বভার এবার শ্রীভগবান ভারতবর্ষের স্কন্ধে নিক্ষেপ করিয়াছেন।

এই মহাদায়ীত্ব অঙ্গীকার করিয়া বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য দেশে, সভ্যতা ও ভোগের কেন্দ্রভূমিতে গিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এই নিঃসঙ্গ একক সন্ন্যাসী যেখানে গিয়াছেন সেইখানেই ত্যাগের রুদ্রদণ্ডে ভোগ-ললুপতাকে তাড়না করিয়াছেন। মানুষ যে দেহ নহে, যন্ত্র নহে, ধনী নহে, গরীব নহে, উচ্চ নহে—মানুষ আত্মা, মানুষ—নারায়ণ; এই তত্ত্ব তিনি প্রচার করিয়াছেন ও নিজ-জীবনে আচরণ করিয়া দেখাইয়াছেন। দুস্থ ইউরোপের বুকের উপর দাঁড়াইয়া তিনি অতীন্দ্রিয় ভাবভূমি হইতে জীবন ও জগত রহস্যের মীমাংসা সন্দেহবাদী ভোগৈকসর্ব্বস্ব মানুষকে শুনাইয়াছেন।

সভ্যতার নামে দুর্ব্বল ও অক্ষমের উপর প্রবলের যে ভয়াবহ অত্যা-চার আজ জগতে সহস্র শির তুলিয়া তাণ্ডবনৃত্য করিতেছে; বিবেকানন্দ তাহার বিরুদ্ধে এক প্রচণ্ড প্রতিবাদ উত্থাপন করিয়াছিলেন। আশার

কথা, ভরসার কথা; তাহা ব্যর্থ হয় নাই; সকল দেশেই এক শ্রেণীর লোক ব্যভিচার-মূলক রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। একের পর আর শক্তিশালী, ত্যাগী, তপস্বী মহাপুরুষগণ মানবের বন্ধন-জর্জ্জর সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমষ্টি-মুক্তির এক উদ্দাম কল্পনা লইয়া অবতীর্ণ হইতেছেন ইহাই—এই বিপুল ধর্ম্মযুদ্ধই বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস।

সমস্ত স্বার্থোদ্ধত বর্ব্বরতাকে ধ্বংস করিয়া মানব সমাজে এক মহা-মিলনের পথ প্রশস্থ করিতে হইবে, ইন্দ্রিয়-ভোগ-মূলক সভ্যতার মোহ হইতে জাতিকে রক্ষা করিতে হইবে—ইহাই যুগধর্ম্ম।

আমরা ভারতবাসী—আমরা বাঙ্গালী, গত পঁচিশ বৎসরের এই যুগ-ধর্ম্মকে কতটা জাতীয়-জীবনে ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছি—প্রশ্ন তাহাই।

বাঙ্গালী-সমাজের শ্রেণীবিন্যাসে যাহারা দুর্ভাগ্যক্রমে পতিতজাতি বলিয়া অভিহিত হয়, যাহারা জাতির অধিকাংশ; যাহাদিগকে বাদ দিয়া বা উপেক্ষা করিয়া কোন প্রকার উন্নতি অসম্ভব তাহাদিগের কল্যাণ-কল্পে আমরা—উচ্চবর্ণেরা আজ পর্য্যন্ত কি করিয়াছি? এই প্রশ্নের আজ উত্তর দিতে হইবে। প্রশ্নটা তুলিয়াছিলেন বিবেকানন্দ—বহুদিনের কথা—আজ তিনি একটা উত্তরের আশা নিশ্চয়ই করিতে পারেন।

ছুঁৎমার্গের ব্যাধি তিনি কেবল নির্দ্দেশ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; প্রতিষেধ ও প্রতিকারের ব্যবস্থাও তিনি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন। আমরা কি করিয়াছি?

—দু'একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি।

অল্প দিনের কথা যশোহর জেলার একটি মহকুমার একজন নমঃশূদ্র জাতীয় উকীল একজন চাপরাসী কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়াছিলেন, শিক্ষিত ও সভ্য তাঁহার সম-ব্যবসায়িগণ, যাঁহারা ছাত্র-জীবনে এই কলিকাতা সহরে—কি আর বলিব—তাঁহারাও চাপরাসীর আভিজাত্যের অহঙ্কারে ইন্ধন জোগাইতে লজ্জাবোধ করেন নাই। এমন কি একজন সহৃদয় উচ্চবর্ণের শিক্ষিত যুবক, ঐ নমঃশূদ্র ভদ্রলোকের সেবায় অগ্রসর

হইয়া চাপরাসীর কার্য্য অঙ্গীকার করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকেও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও নির্য্যাতন করিতে ছাড়েন নাই। এতো গেল মফঃস্বলের, পল্লীগ্রামের কথা—সংসারী, জাত্যাভিমানীদের কথা! এই কলিকাতা সহরে কিরূপ,?

যাহারা যুবক, যাহাদের দেহে নবজীবনের স্পন্দন, মনে অসীম উদার আকাঙ্ক্ষা, জাতির মেরুদণ্ড, দেশের ভরসা—সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা-লাভকামী ছাত্রগণ পরস্পরের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করেন? ইঁহাদের জাতিবিচারটা আরও কদর্য্য ও অর্থহীন। কলিকাতা সহরের ইংরেজি-কেতা-দুরস্ত ভোজনালয়গুলিতে সকলের এঁটোপাতে, বসিয়া খাইতে ইঁহারা পরমাগ্রহ প্রকাশ করেন, পার্শ্বে উপবিষ্ট ব্যক্তির বা পরিচারকের কুলশীল ভ্রমেও জিজ্ঞাসা করেন না, সাম্য ও মৈত্রীর মূর্ত্ত বিগ্রহের মত সারি সারি ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া বসিয়া যান। কিন্তু ছাত্রাবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেই জাত্যাভিমান এত প্রবল হইয়া উঠে যে ইঁহারা তথাকথিত কোন নিম্নবর্ণের সহপাঠির সান্নিধ্য কামনাকে ঔদ্ধত্য মনে করিয়া জাতিনাশের আশঙ্কায় বিব্রত হইয়া পড়েন। নিম্নবর্ণের ছাত্রগণ সংখ্যায় কম—কাজেই তাহারা তেমন দৃঢ়ভাবে কোন প্রতিবাদ করিতে পারে না, আর করিলেই বা শোনে কে? কিন্তু যে সব ছাত্রাবাসের অধ্যক্ষ বা কর্ত্তৃপক্ষ সকল জাতিকে সমানভাবে প্রবেশাধিকারের বন্দোবস্ত করিয়াছেন—সেখানে কোন কথা নাই; কোন উচ্চবাচ্য নাই। মস্তিষ্কহীনতা ও হৃদয়হীনতার এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কোন দেশের ছাত্র সমাজে আর খুঁজিয়া পাইব না। জাতিরক্ষার চেষ্টায় কলিকাতা সহরের দু'একটী প্রসিদ্ধ ছাত্রাবাসে এমন জঘন্য ব্যাপার ঘটিয়াছে যে তাহা উল্লেখ না করাই সঙ্গত।

যে সমস্ত মহাপ্রাণ মুষ্টিমেয় কর্ম্মী বিবেকানন্দের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সমাজ-শরীর হইতে এই রোগ দূর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন বা কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন—তাঁহারা জানেন ঝুটা অভিজাতের বর্ব্বর কাপট্যলীলা বাঙ্গালা-সমাজকে কত তিক্ত ও অসহিষ্ণু করিয়া তুলিয়াছে; সমাজের নিম্নস্তরে এক ক্ষুব্ধ বিদ্বেষ ক্রমেই ধূমায়িত

হইয়া উঠিতেছে; আজ যাহা প্রধূমিত, কাল তাহা প্রজ্জলিত হইয়া উঠিতে পারে। আমরা এক আসন্ন সমাজ-বিপ্লবের আশঙ্কায় সচকিত হইয়া উঠিয়াছি।

বর্ত্তমান ভারতের রাষ্ট্রগুরু মহাত্মা গান্ধিও 'ছুৎ-মার্গকে জাতীয় উন্নতির এক প্রধান বিঘ্ন বলিয়া ইহাকে পরিহার করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। তাঁহার আগ্রহ ও ইচ্ছায় এই প্রস্তাব নিখিল ভারত রাষ্ট্র মহাসভায় পরিগৃহীতও হইয়াছিল। রাষ্ট্র সভার প্রত্যেক সভ্যই এই ছুঁৎ-মার্গের কুসংস্কার হইতে বিমুক্ত হইবেন—কেবল কথায় নহে, কার্য্যে—ইহাই সিদ্ধান্ত। দেশের প্রতি নগরে গ্রামে গ্রামে রাষ্ট্র-সভার কার্য্য চলিতেছে; হিন্দু মুসলমান অনেকেই এই সমস্ত সভার সভ্য; কিন্তু বাঙ্গালাদেশের কোন মহকুমা বা কোন গ্রাম হইতে ছুঁৎমার্গের ব্যাধি বিদূরিত হইয়াছে বা দূর করিবার জন্য চেষ্টা হইতেছে, এমন সংবাদ আমরা এ পর্য্যন্ত পাই নাই। পক্ষান্তরে ইহাই দেখিয়া আসিতেছি যে এতৎ-সম্পর্কে বাঙ্গালাদেশ একেবারে নীরব। এখনো গ্রামে গ্রামে হিন্দুর জাতি হুকার জলের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া সশব্দে আস্ফালন করিয়া বলে—ছুঁয়োনা—আর অধিকে প্রয়োজন কি?

জল চল ও অচল লইয়া যে দাম্ভিক ভণ্ডামী বরাবর চলিয়া আসিতেছে,—আজও তাহা অব্যাহত আছে বেশীর ভাগ উদারতা ও সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাবের কতকগুলি মুখস্থ কথা ছোট বড় অনেকের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়। নিম্নজাতিগণের প্রতি ঘৃণা, অবজ্ঞা, অপমান, লাঞ্ছনা ঠিক সমানই আছে, বেশীর ভাগ পূর্ব্বে দায়ে পড়িয়া বা অজ্ঞতা বশতঃ নিম্নজাতিরা ইহার প্রতিবাদ করিত না, সহ্য করিত—আজকাল আর তাহারা সহ্য করিতে প্রস্তুত নহে। আজ বিবেকানন্দের অবিরাম আহ্বানে ও ত্যাগী কর্ম্মিগণের অক্লান্ত চেষ্টায় বাঙ্গালার গণ-বিগ্রহ জাগ্রত।

'যে শৃঙ্খল অপরের পদের জন্য পুরুষানুক্রমে অতি যত্নের সহিত বিনির্ম্মিত, তাহা নিজের গতিশক্তিকে শত বেষ্টনে প্রতিহত করিয়াছে; যে সকল পুঙ্খানুপুঙ্খ বহিঃশুদ্ধির আচার জাল সমাজকে বজ্রবন্ধনে রাখিবার জন্য চারিদিকে বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহারই তন্তুরাশি দ্বারা

আপাদমস্তক বিজড়িত পৌরহিত্যশক্তি' ব্রাহ্মণ-সভারূপ প্রহসনের অভিনয় করিয়া এই নবজাগরণকে বাধা দিতে চেষ্টা করিলে নিজেরাই হাস্যাস্পদ হইবেন, কেননা, 'শিখাহীন, টেড়িকাটা, অর্দ্ধ ইউরোপীয় বেশ-ভূষা ও আচারাদি সুমুণ্ডিত ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্বে সমাজ বিশ্বাসী নহেন। আভিজাত্য ও তাহার ফলরূপ দীন দরিদ্র নিম্নবর্ণের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা কেবল ব্রাহ্মণের শ্রেণীতে আবদ্ধ নহে, ব্রাহ্মণ যাহাদিগকে শূদ্র বলেন, সেই দুই একটী উচ্চ-শূদ্র (?) জাতির মধ্যেও ইহা প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। পৈত্রিক অধিকার, পৈত্রিক সম্মানের দোহাই দিয়া পৈত্রিক আধিপত্য বজায় রাখিবার কদর্য্য চেষ্টায় শক্তিক্ষয় না করিয়া, 'প্রত্যেক অভিজাত জাতির স্বহস্তে নিজের চিতা নির্ম্মাণ করাই প্রধান কর্ত্তব্য'—ইহাই কল্যাণপ্রদ।

বাঙ্গালার কবি যাহাদিগকে 'অসভ্য জাপান' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, সেই জাপানের অভিজাত ও সমস্ত সামুরাইগণ সম্মিলিত হইয়া একদিনে একরাজ্যে সমগ্রজাতির কল্যাণের জন্য সর্ব্বপ্রকার পৈত্রিক অধিকার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন—সেই আত্মোৎসর্গের মহিম্ন বেদীর উপর শক্তিশালী তরুণ জাপান গড়িয়া উঠিয়াছে। যাহা অসভ্য জাপান পারিয়াছে, তাহা সুসভ্য ও আর্য্যবংশধর ভারতবাসী পারিবে না কি? যদি না পারে তবে এক শোচনীয় অপমৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়াই একমাত্র পন্থা। কেননা যুগশক্তির জাগরণ এই কুলপ্লাবী প্রলয়বন্যার গতিরোধ করা, হে জাত্যাভিমানী কূপমণ্ডূক, তোমার সাধ্যাতীত। এখনো সময় থাকিতে যুগধর্ম্মের পতাকাতলে সমবেত হও। যুগপ্রবর্ত্তক আচার্য্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আত্মত্যাগ ও আত্মরক্ষা কর।

সৎকথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

(স্বামী অদ্ভুতানন্দ)

শ্রদ্ধা ও প্রীতি—সংসারীই বল আর ধর্ম্মই বল শ্রদ্ধা ও প্রীতি না হলে কিছুই হয় না, উপরোধে কি কোন কাজ হয়? প্রীতি থাকলে আর ছাড়তে ইচ্ছা হয় না ক্রমশঃ ভগবানে মন বসে যায়। প্রীতিই হলো প্রধান।

পরের দোষ দেখতে নেই। গুণই দেখতে হয়। সকলেরই কিছু কিছু দোষ আছে। কারও দোষ চাপা পড়ে থাকে।

আগে আপনাকে জেনে লও, তা হলে পরকে বুঝাতে পারবে।

কেউ এ জগতে কল্যাণ করতে আসে, আবার কেউ নাশ করতে আসে।

ভগবানের কৃপায় ভগবান পাওয়া যায়। সাধন-ভজনে কতটুক করবে—তাঁর দয়া চাই।

জীবের জন্য বাসনা তাতে বন্ধন হয় না, নিজের বাসনা বন্ধন।

তপস্যা না করিলে তাঁকে জানতে পারা যায় না, যত পবিত্র হবে—তত তাঁহাকে বুঝতে পারবে।

লোকে ধর্ম্ম করবে কি? গর্ভধারিণীকে টাকা দিতে কষ্ট হয়, যার দয়ায় জগৎ দেখছে, তা ঠাকুর-সাধু সেবার কথা ছেড়ে দাও। মা ছেলের জন্য কত কষ্ট করে তা সব ভুলে যায়।

সাধু, ভক্ত, ঠাকুর সেবা করলে ভগবান খুসী হন। তবে ত ভগবানের দয়া হয়।

সৎলোক সৎলোককে সাহায্য করে।

ভগবান যাকে আরাম দিয়ে থাকেন, তাকে দুঃখ দিবে এমন সাধ্য কার।

স্নেহ হওয়া বড় শক্ত ব্যাপার, ভগবানের দয়া না হইলে স্নেহ হয় না ; বিষয়ীদের স্নেহ লোক দেখান, সর্ব্বদাই স্বার্থে জড়িত তাদের কি কখন স্নেহ আসতে পারে ? যাহাদের স্নেহ আছে তাহারা ভাগ্যবান পুরুষ, কোন আশা না রেখে যে স্নেহ দেখাতে পারে তাহার উপর ভগবানের খুব দয়া বুঝতে হবে ।

কলিতে কঠোর করলে শরীর টিকবে না, তার চেয়ে খাওদাও, যতটুকু পার ভগবানের নাম কর ।

যার গুরু, ইষ্টের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস নেই তার আবার ধর্ম্ম হবে কি ?

সাধুর, গুরুর, ঠাকুরের কাছে যেন সরলভাব দেখাবে, কোন পেঁচালি বুদ্ধি দেখাবে না । তাহলে তাঁরা খুসি হয়ে আশীর্ব্বাদ দেন, তবে নিজের উন্নতি হয় ।

ভগবানকে কেউ ত দেখে নাই, তবে তার কর্ম্ম দেখে যে মানে সেই ভাগ্যবান ।

সৎলোক সৎলোকের জন্য দুঃখ করে । সে উপকার পেয়ে অপকার কখনও করবে না । আর অসৎলোক অপরের দুঃখ হলে হাসে এই তফাৎ ।

যে নিজের উপকার করতে পারে না, সে আবার পরের উপকার করবে কি ? আগে নিজের উপকার কর, তারপর পরের উপকার কর ।

যে নিজেকে দুঃখ দেয়, সেত পরকে দুঃখ দেবেই ।

পর সেবায় যিনি জীবন সমর্পণ কচ্ছেন, যার আপন পর বলে কিছুমাত্র দ্বিধা নাই, যিনি পরের দুঃখ প্রাণে প্রাণে বুঝতে পেরেছেন তাঁর চেয়ে আর ভাগ্যবান কে !

আমরা এমনই স্বার্থপর হয়ে পড়েছি যে বিপদে, আপদে কাউকেও দেখি না, পরের কুৎসা লয়েই ব্যস্ত এবং পরশ্রীতে কাতর হই, পরের জয় যেন চখে দেখতে পারি না সেইজন্য আমাদের এত দুর্দ্দশা ।

যদি ঠিক ঠিক নিঃস্বার্থভাবে পরসেবা ইত্যাদি করা যায় তাহলে ভগবান সন্তুষ্ট হন । ভগবান সন্তুষ্ট হলে বিবেক, বৈরাগ্য, শ্রদ্ধা, ভক্তি দেন ।

গেরুয়া কাপড়ের মূল্য কেউ দিতে পারে না ; ভগবানের বিশেষ শক্তি ও দয়া না থাকলে কেউ গেরুয়া পরতে পারে না ; তবে যার কাছে ভগবান মিথ্যা, তার কাছে ওর কোন দাম নেই। আধ পয়সা গেরুয়া রং কিনে গেরুয়া পরলেই হলো। হিংসে, মান, অপমান রাগ যাতে না হয় এই জন্য ত গেরুয়া পরা—সংসারীরা পারে না।

ভগবানের হুকুম শয়তানকে ঘৃণা করা।

ভগবান বলছেন হে জীব! ঠাকুর ও সাধুসেবা ছাড়া আর উৎকৃষ্ট কর্ম্ম জগতে কি আছে। তাঁর হুকুম যে প্রতিপালন করবে তার কল্যাণ হবেই।

চৈতন্য মহাপ্রভুর পুরীতে বাস করা, আর সংসারীর বাস করা বহু তফাৎ। উনি হলেন শ্রেষ্ঠ অবতার। উনি জ্ঞানভক্তি দিতে পারেন। এক সঙ্গে খেলেই যদি সকলে পরমহংস হইত তাহলে আর ভাবনা ছিল না, পুরীতে যতক্ষণ বাস ততক্ষণ ঐ সংস্কার থাকে। পুরীথেকে এলেই সেই জাতিভেদ, কুলমান লয়ে সংসারীরা ঝগড়া করে।

ভগবানের যেমন জাত নেই, সাধুরও জাত নেই। সাধুর দ্বারা ভগবান প্রকাশ হন। সাধুর দোষ ধরতে নেই। সাধুর ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি কেমন তাই দেখতে হয়। সাধু সব লোকলজ্জা, বিষয় ছেড়ে ভগবান পাবার জন্য সাধু হয়েছে। সংসারী আর সাধু বহু তফাৎ।

যে ভগবান লাভ করেছে সেই সরল হয়।

ভগবান ছেড়ে অহং বুদ্ধিতে মানুষ নষ্ট হয়।

২৪ ঘণ্টার মধ্যে মানুষের কত রকম মনবদলাচ্ছে তার ঠিক নেই।

যে গুরু ভবিষ্যৎ কল্যাণ করে সেই ত গুরু—পিতা।

সঙ্গগুণ আছে বৈ কি! সঙ্গগুণে অধোগতি হয়, উন্নতি হয়।

ভগবানকে যে ঠিক ঠিক ডাকবে সে নিশ্চয়ই সরল হয় ও সকলকে আত্মীয় বলে বোধ করে। ওর ভিতর যেন বজ্জাতিবুদ্ধি না হয়।

অবতারদের কৃপায় কত পরমহংস হয়। অবতারেরা শরীর ধারণ করে দেখিয়ে দেন আমরা জগতে এসে কি কচ্ছি। তোমরাও এ কর তাহলে তোমাদেরও উন্নতি হবে।

ভগবানের ঘরে মন থাকলে নিজের উন্নতি হয়।

জীবের নিস্তার নাই। যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই রক্ষা করলে হয়। সকাল হচ্ছে, সন্ধ্যা হচ্ছে, যার ভগবানের প্রতি শুদ্ধ প্রীতি, একটু হুঁস আছে, যাকে তিনি কৃপা করেন সেইবুঝতে পারে।

হিংসে যাবার জন্য সাধু হয়। হিংসে অনেক সময় বুঝা যায় না, কোথা হ'তে হিংসা আসে। হিংসেও যায় না, শান্তি ও হয় না।

জপে সিদ্ধি হবে এটা ঠিক কথা। যখন জপ ঠিক ঠিক পথে যাবে, তখন ধারণা ধ্যানাদি আপনা হতেই অবিশ্রান্ত তৈলধরাবৎ চলবে। তখন বাহ্যিক জপ ফুরাবে। এই জপ সহ সাময়িক ধারণাদি হয়। এই জপান্তে একটু বেশী সময় ধারণাদি অভ্যাস করিতে হয়। ক্রমে এতে ধ্যান স্থায়ী হয়।

ধ্যান-বিঘ্ন (লয় বিক্ষেপ রসাস্বাদন) দূর করতে হলে মনটাকে খুব দৃঢ় করে আসনে বসতে হয়। এ ভাবেও নিগ্রহ না হলে চোখে জল দিবে। অথবা অন্যত্র সামান্য একটু ঘুরে এসে পুনঃ আসনে বসবে। নিজ আসনে বসে তন্দ্রাদি বিঘ্ন দূর করাই ভাল---তাতে ভাব স্রোত নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা কম। জপান্তে নিদ্রাবেশ হয়, মেরুদণ্ড টনটন করে। শরীর বেশী গরম হলে ঘুমলেগে কাহারও কাহারও শারীরিক ক্ষতি হয়।

অন্তরে ত্যাগ খুব ভাল। লোকে জানতে পারে না যে ত্যাগী; তদ্রূপ অভিমানাদি বিঘ্নও থাকে না তবে এ বড় শক্ত। বাহিরের ভোগটা কখন যে চুপে চুপে অন্তরে ঢুকবে তা ধরা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই এ বিষয়ে সাবধান থাকতে হয়। প্রথমতঃ অন্তর্বহিঃত্যাগ অভ্যাস সহজ। প্রকৃত বৈরাগী উত্তমাধিকারী শেষে আর কিছু আটকাইতে পারে না তাঁরা বালকবাৎ ত্যাগ, ভোগ সকলই করেন।

এ জগতের জিনিষ ভোগ করা তপস্যা চাই বৈ কি! তপস্যা ভিন্ন হয় না এ ত প্রায় দেখা যায়।

যাবৎ ভেদবুদ্ধি তাবৎ সাম্প্রদায়িক দলাদলি। উপাধি নাশান্তে চৈতন্য হ'লে তখন জগত চৈতন্যময়ই বোধ হয়। সকল নাম, রূপ ও মত পথাদিই সত্য বলে বোধ হবে, এক পরম ব্রহ্মেরই সব-ভেদাভেদ।

দ্বেষাদ্বেষী চলে যায়। পূর্ণ জ্ঞান হ'লে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা বোধ আর থাকে না—সবই সত্য।

সাধু দর্শন, এতীর্থ-সেতীর্থ, কি বিগ্রহ দর্শন ইত্যাদি প্রথমতঃ কিছুদিন হবেই। তা বেশ। তবে আদর্শটী না হারায় এবং নিজের ভাব নষ্ট না হয়। সেটি লক্ষ্য রেখে সব করিতে হয়। নচেৎ সে স্থানে না যাওয়াই শ্রেয়ঃ। আপনা ভাবে আপনি থাক, যেও না মন কারুর ঘরে।

স্ত্রীলোকের-স্বামীকেই ইষ্টজ্ঞানে পূজা-সেবা করা উচিৎ। অন্যত্র গুরুকরণে কি সাধুসঙ্গাদিতে হানি হতে পারে। ঐ গুরু শিষ্য উভয়েরই বিপদাশঙ্কা। আপন স্বামীর কৃপায় স্ত্রী সময়ে সব বুঝতে পারে এবং ওতেই মুক্তি, ভগবান লাভ হবে। তবে ঠিক ঠিক স্বামীকে গুরু জ্ঞান করা চাই, ভোগ বুদ্ধি না থাকে। ভগবান ও স্বামী অভেদ এই জ্ঞান চাই।

ভগবান বলছেন, নির্ব্বোধেরা দোষকে গুণ দেখে, গুণকে দোষ দেখে —এই হল সংসারের খেলা এই জন্য সৎসঙ্গের দরকার। সৎসঙ্গ হলে জীব বুঝতে পারে।

সৎবুদ্ধি হলেই ভগবানে মানবে, গুরু জনের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তিহবে। অসৎবুদ্ধি হলে নিজের মেজাজ খারাপ হয় ও কষ্ট পায়।

ভগবান কি কারও শত্রু হন, তবে খুব অত্যাচার করলে শাসন করেন।

এ সংসারে ভাই, ভগ্নি, পিতা, পুত্র নেই। যার যার কর্ম্মনিয়ে জন্মায়।

সাধু না হলে সাধুর দুঃখ বুঝা যায় না, সাধুরা কত কষ্ট করে তবে ভগবানের দয়া পায়।

মাধুকরী।

স্বদেশী যুগে নিদ্রিত দেশবাসীকে জাগ্রত এবং প্রবুদ্ধ করিবার জন্য এক অভিনব ওজস্বী সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। এবং এই বর্ত্তমান আন্দোলনের প্রচারের জন্য এবং দেশবাসীকে যথার্থ কার্য্যকরী (Practical) করিবার জন্য যথেষ্ট সাহিত্যের প্রসার হইতেছে।—এক্ষণে "Be and make" সকলের মূলমন্ত্র হওয়া প্রয়োজন।

ঢাকপেটা সাহিত্যের মধ্যে আমরা যথার্থ জাতীয় চরিত্র খুব কমই খুঁজিয়া পাই। হয়ত সেটা আমাদের অভিজ্ঞতা এবং বিশ্লেষণের ভুল বশতঃই বুঝিতে পারি না। কিন্তু জাতীয় মত অনেকটা নির্ভুল ভাবে জানিবার উপায় স্বরূপ অন্তঃপুরের হস্তলিখিত কতকগুলি সাহিত্য যাহা নিরবে কার্য্য করিতেছে, আমরা গ্রহণ করিতে পারি। জাগরণের নিদর্শন আমরা তাহা হইতে ভিক্ষা করিয়া অদ্য উদ্বোধন পাঠকপাঠিকাকে উপহার দিব।

অপরিচিতা।—কণা।

"স্ত্রী শিক্ষার যে দরকার আছে—তা প্রমাণিত সত্য। * * তবে এটা ঠিক যে এখন যে ভাবে তারা শিক্ষা পাচ্চে, সেটা মোটেই প্রশংসনীয় নয়। একটু ইংরাজী বলতে শিখলেই ত শিক্ষা সম্পূর্ণ হল বলা চলে না। পড়াশুনো সত্যি করতে গেলে একেবারে ভিতরে ঢোকা দরকার।

"সকাল বেলা ৭টা থেকে ১০টা ও বিকালে ৩টা থেকে ৫টা পর্য্যন্ত স্কুল হওয়াই ঠিক; কারণ দুপুর বেলা আমাদের শক্তি ক্ষয়ের সময়—শক্তি বাড়ে সকালে এবং বিকালে।

"ভারতবর্ষের ইতিহাস, ভূগোল একটু অঙ্ক সবায়ের শেখা উচিৎ। ইতিহাস ভূগোল বই থেকে পড়া দেওয়া হবে না—মুখে মুখে শেখান হবে। ইতিহাসে কোন যুদ্ধ কোন তারিখে হল তা শেখান থেকে আসল যে ইতিহাস—নানা যুগের সাধারণ লোকের কথা—শিল্প-কলা, আদর্শ

ও ধর্ম্মের কথা বেশী ভাল করে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করা হবে। অঙ্ক একটু শেখা দরকার, শুধু বাজার খরচ রাখবার জন্য নয় (অনেকেই তাই ভাবেন অবশ্য)—আসলে মাথা পরিষ্কার হবার জন্যই।

"তারপর বিজ্ঞানের সবরকম শাখা—ফলিত রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা প্রভৃতি থাকবে—যার যেটা ইচ্ছা বেছে নিয়ে পড়বে—তাও মুখে মুখে শেখানই ব্যবস্থা থাকবে। ইংরাজী, বাংলা সংস্কৃত সাহিত্য নিশ্চয়ই থাকবে। * *

"মস্তবড় পুস্তকাগার—তাতে সবরকম বই থাকবে। মেয়েদের শেখাতে হবে যে সেখানে গিয়ে নিজের ইচ্ছা মত বই বেছে পড়ায় আনন্দ কতখানি। সেলাই, আঁকা, গান-বাজনা প্রভৃতি শিল্প কলাকে বিশেষ করে স্থান দিতে হবে।

"সাঁতার দেওয়া খেলা প্রভৃতি সম্বন্ধেও মেয়েদের যথা সম্ভব উৎসাহিত করা হবে। এই সমস্তর সঙ্গে সঙ্গে একটু সেবা করতেও শেখান উচিৎ। ছোট একটা হাঁসপাতাল থাকবে—মেয়েরা সেখানে সেবা করতে ও সামান্য-ডাক্তারীও শিখিবে।"

শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী।—সাজি।

"আলস্য ত্যাগ করিয়া মানসিক অনুশীলনে বোধ হয় আমাদের মধ্যে কেহই অযত্নপর হইবেন না। সংসারের কাজকর্ম্ম সারিয়া এমন যথেষ্ট সময় আমাদের থাকে যাহা সৎ-কর্ম্মে আমরা নিয়োগ করিতে পারি।

"আমরা চাই এমন সাহিত্য যাহাতে পৌরাণিক গল্পের মধ্য দিয়া আমাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে ধর্ম্মভাব জাগিয়া উঠে। এবং আমাদের শিক্ষিতেরা সরল ভাষায় প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য দর্শন-বিজ্ঞান, শিল্প কলার মহৎভাব-রাশি, যাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়, এরূপ ভাবে আমাদের নিকট উপস্থাপিত করিবেন।

"শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাবের সহিত নবযুগের ঊষা আরক্তিম রাগে ভারত-গগন উজ্জ্বল করিয়া সমুদিত। সেই মহাবতার-দ্বয়ের তপোলব্ধ আদর্শ আমরা জীবনে পরিণত করিয়া যদি আচার্য্যের মানসীনারী না হইতে পারিলাম তবে শ্রীভগবানের নর-লীলার সার্থকতা আমাদের নিকট কোথায়?

শ্রীমতী পদ্মরাণী দেবী।—ধূলা।

আমাদের দেশে স্ত্রীলোকদিগের মনে খুব অল্প বয়স থেকেই মাতৃভাব ফুটে উঠে। এটা অন্য কোন দেশে এত বেশী নেই। কিন্তু আমরা এই মাতৃ ভাবটাকে ঠিক মত চালাতে না দিয়ে নষ্ট করে ফেলি। ভগবান যে আমাদের চেয়ে জ্ঞানী, এটা আমরা কিছুতেই মনে রাখতে পারি না। এ দেশের স্ত্রীলোকেরা যেরূপ অল্পবয়সে সন্তানের জননী হন এরূপ আর কোন দেশে হয় না। কিন্তু বাড়িতে যে সব অন্য স্ত্রীলোক থাকেন তাঁরা ভাবেন কি প্রসূতী বালিকা— সে ছেলে মানুষ করিতে পারিবে না। জানি প্রসূতী বালিকা, কখনও ঠিক মত সন্তান লালনপান করিতে পারিবে না; কিন্তু তাই বলিয়া তাহার কর্ত্তব্য আমরা জোর করিয়া কাড়িয়া লই কেন। তাহাকে তাহার কর্ত্তব্য করিতে দেওয়া উচিৎ। সে জানুক যে সন্তান লালনপালন করিবার ভার তাহারই, অপরের ঘাড়ে ফেলে দিয়ে নভেল পড়া উচিৎ নয়। সন্তানের প্রতি জননীর এই কটী কর্ত্তব্য আছে এবং প্রত্যেক সন্তানের জননীর ইহা পালন করা উচিৎ। যথা :—

(১) শিশুর খাওয়ান—শিশুর জন্মের পর প্রথম তিন দিন কিছুই খাইতে দেওয়া উচিৎ নয়। যদি তাহাকে খাইতে দেওয়া বোধ হইত তাহা হইলে ভগবান্ প্রথম হইতেই স্তনে দুগ্ধ দিতেন। তিনি আমাদের চেয়ে বিবেচক এটা ঠিক। ওই তিন দিনের মধ্যে শিশু যদি খুব কাঁদে তবে তাহাকে অল্প মিশ্রি মিশ্রিত ঈষৎ উষ্ণজল খাইতে দেওয়া যাইতে পারে। ইহাতে তাহার উপকার ভিন্ন অপকার হয় না। শিশুর তিন মাস বয়স হইতে নয় মাস পর্য্যন্ত আধ পোয়া হইতে দেড়সের দুধ খাইতে দেওয়া যাইতে পারে। এবং সেটা নিয়ম করিয়া দিতে হইবে। শিশু কাঁদিলেই তাহার মুখে স্তন দেওয়া উচিৎ নয়। কারণ আমাদের যেমন যখন তখন খেলে অম্বল হয় শিশুদেরও ঠিক তাই। তাহাদেরও উপর্য্যুপরি ঘন ঘন স্তন দিলে অজীর্ণ প্রভৃতি রোগ হইতে পারে। তাহাদের পাকস্থলীকে একটু সুস্থির হইতে দেওয়া কর্ত্তব্য। এই জন্য আমার মতে শিশুকে

রাত্রি দশটার পর আর দুধ বা স্তন দেওয়া উচিৎ নয়। আবার ভোর পাঁচটা ছয়টার সময় খাইতে দেওয়া উচিৎ।

(২) অনেক মা আছেন, যাঁরা শিশুকে স্নান করাইতে চাহেন না। খুব গ্রীষ্মতেও সাত, আট দিন অন্তর স্নান করান। তাঁহারা বোঝেন না যে এতে শিশুর কত কষ্ট হয়। প্রত্যহ ঈষৎ উষ্ণজলে শিশুকে স্নান করাইয়া জামা পরাইলে শিশুর কোন ক্ষতি হয় না। ইহাতে তাহার লোমকূপ সকল পরিষ্কার থাকে ও সহজে রোগ জন্মিতে পারে না।

(৩) শিশুকে এক বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অন্ততঃ আঠার ঘণ্টা ঘুমাইতে দেওয়া উচিৎ। তাহাতে শিশুর ফুসফুস সবল হয়। বেশী নড়াচড়া করিলে ফুসফুসের আয়তন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না এবং সেই জন্য বয়ঃপ্রাপ্তে ব্রনকাইটিস বা সর্দ্দি ঘটিত রোগে সহজে আক্রান্ত হয় না। সেই হেতু শিশুর ঘুমের দিকে প্রত্যেক মায়ের লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। যাহাতে সে স্বচ্ছন্দে, নিরুপদ্রবে ঘুমাইতে পারে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা অত্যন্ত আবশ্যক।

(৪) শিশুকে কসাজামা পরান উচিৎ নহে। বেশ ঢিলেজামা পরান কর্ত্তব্য, যাহাতে তাহার সর্ব্বাঙ্গে রক্ত চলাচলের কোন ব্যাঘাত না ঘটে।

সিষ্টার নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়।

মনীষী সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ সম্যক্ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সমাজের বা শরীরের কোনও বিশেষ এক অংশকে শক্তিমান না করিয়া, সমগ্র সমাজকে সর্ব্বতঃ ও সুনিয়ন্ত্রীত ভাবে শক্তিশালী করিয়া তোলার মধ্যেই, উন্নতির বীজ নিহিত। এতদিন ধরিয়া আমরা স্ত্রী শিক্ষার দিকটা বাদ দিয়াই, ভারত সমাজের উন্নতি আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলাম। ঐ গোড়ায় গলদ আজ আমাদের লক্ষ্যে পতিত হইয়াছে। আজ এই নব জাগরণের দিনে ভারত স্বামী বিবেকানন্দের সহিত সম্যক্ বুঝিতে পারিয়াছেন, সুমাতার আবির্ভাব না হইলে ভবিষ্যৎ উন্নতি ও প্রতিষ্ঠার চেষ্টা বৃথা।

স্বামীজির ধর্ম্মে ও প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া ভগিনী নিবেদিতা, কলিকাতার বোসপাড়া লেনে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া, ঐ সমস্যা পূরণের চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিলেন। উক্ত সাধনায় জীবনপাত করিয়া ফলস্বরূপ তিনি বর্ত্তমানে সুপরিচিত "সিষ্টার নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় ও পুরস্ত্রীশিক্ষা বিভাগ" রাখিয়া গিয়াছেন।

রামকৃষ্ণ মিশনের কর্তৃপক্ষ, এতদিন ধরিয়া নিবেদিতার প্রবর্ত্তিত কার্য্য ব্রহ্মচারিণীগণের সাহায্যে চালনা করিয়া আসিতেছেন।

স্ত্রীশিক্ষার বিষয় এবং ঐ প্রসঙ্গে নিবেদিতা বিদ্যালয়ের কথা বহুদিন ধরিয়াই আমরা দেশবাসীর দৃষ্টির গোচরে আনিয়াছি; কিন্তু দুর্ভিক্ষ ও বন্যাদি কার্য্যে দেশবাসীর যেরূপ উৎসাহ ও সহানুভূতি দেখিতে পাই, এই ক্ষেত্রে তাহা লক্ষিত হইতেছে না। তাই সন্দেহ হয়, দেশবাসী এখনও স্ত্রীশিক্ষার কথা অন্তরে অন্তরে বুঝিতে পারিয়াছেন কি না।

যে ভাড়াটিয়া বাটীতে নিবেদিতা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, উহা আজ জীর্ণ ও ভগ্নস্তূপে পরিণত অথচ ছাত্রী সংখ্যা প্রায় ২৫০ শত। বিদ্যালয়ের কার্য্য পরিচালনা স্থানাভাবে বিশেষ অসুবিধাজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন নূতন বিদ্যামন্দির ও ছাত্রীবাস নির্ম্মাণ করা একান্ত প্রয়োজন। মিশন কর্তৃপক্ষ বাগবাজার, নিবেদিতা লেনে ঐ কার্য্যের জন্য যে জমী ক্রয় করিয়াছিলেন উহাতে শিক্ষামন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন।

কার্য্যের সূচনা মাত্র হইয়াছে,—সমাধা করিতে বহু অর্থের প্রয়োজন। এই জন্য আজ আবার দেশবাসীকে স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য ভিক্ষার ঝুলি লইয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইতেছি। আশা করি তাঁহাদের বদান্যতায় অর্থ সানুকূল্যে ঝুলি পূর্ণ হইবে—এবং যে শিক্ষানুষ্ঠান এত-দিন ধরিয়া বহুপ্রকারে সমাজের কল্যাণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছে, তাহা স্থায়ী ভাবে স্থাপিত হইবে। বহুশক্তির একত্র সমাবেশ হইলে এরূপ অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি।

বিদ্যামন্দির নির্ম্মাণকল্পে যিনি যাহা দান করিতে ইচ্ছুক, তাহা নিম্ন ঠিকানায় প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে।

প্রিয়জনের স্মৃতিরক্ষার্থ যদি কেহ দুই একখানি গৃহ নির্ম্মাণ ব্যয় বহন করিতে ইচ্ছুক থাকেন, তাহা হইলে সে সুযোগও যথেষ্ট আছে। ইতি—

শ্রীসারদানন্দ

সেক্রেটারী, রামকৃষ্ণ মিশন,

১নং মুখার্জ্জীলেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

সমালোচনা ও সাহিত্য পরিচয়।

ঋগ্বেদ—প্রথম ভাগ—শ্রীদ্বিজদাস দত্ত। মূল্য ২॥০ টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—কান্দির পাড় কুমিল্লা, গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য। দ্বিতীয় ভাগ যন্ত্রস্থ।

গ্রন্থ অসমাপ্ত বলিয়া যথাযথ মন্তব্য ইহার উপর দেওয়া চলে না। তবে আশা ও ভরসার কথা এই যে বাঙ্গালা ভাষায় বেদের আলোচনা হইতেছে। অস্মদেশীয় জন সমাজ হইতে গোড়ামী ও কুসংস্কার দূর এবং তাহাকে ঈশ্বর পরায়ণ ও স্বদেশ ভক্ত করিবার একমাত্র উপায় ঋগ্বেদ সংহিতার আলোচনা। বেদ যাহা বলিবেন, অপর শাস্ত্রকে উপেক্ষা করিয়া হিন্দু সমাজ তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য। কেন না "শ্রুতি স্মৃত্যোর্বিরোধে তু শ্রুতিরেব গরিয়সী" এই আদেশ মন্বাদি স্মৃতিকারেরা এবং শ্রীশঙ্করাদি

অষ্টাদশ আচার্য্যেরা সকলেই মানিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে যে প্রথম কুসংস্কার, "স্ত্রীশূদ্র দ্বিজবন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতি গোচরা" অর্থাৎ "স্ত্রীশূদ্রের বেদাধিকার নাই, আমাদের দেশের মজ্জায় মজ্জায় প্রবিষ্ট হইয়াছে, বেদাধ্যয়নের দ্বারা তাহা অপগত হইবে। কারণ ঋগ্বেদে বহু স্ত্রী মন্ত্র-দ্রষ্টা আছেন। যথা (১) লোপমুদ্রা (১ম-১৭৯সূ), (২) বিশ্ববারা (৫ম-২৮সূ), (৩) শাশ্বতী (৮ম-১সূ ও ৩৪ সূ), (৪) অপালা (৮ম-৯১সূ), (৫) ঘোষা (১০-ম ৪০ সূ), (৬) রাত্রি (১০ম-১২৭ সূ), (৭) জুহু (১০ম-১০৯ সূ), (৮) সূর্য্যা (১০ম-৮৫সূ), সর্মী (১০ম-১৫১সূ) এবং শচী (১০ম-১৫৯ সূ)। উর্ব্বশী (১০ম-৯৫ সূ) সরমা (১০ম-১০৮ সূ) এবং বাক্ (১০ম-১২৫ সূ) -ইঁহাদের নাম লেখক উল্লেক করেন নাই। দ্বিতীয়ত দেখা যায়, ঋষি কবষ ঋগ্বেদের ১০ম, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪ সূক্তের দ্রষ্টা। অথচ তিনি দাসীপুত্র, অব্রাহ্মণ, "কিতব" (জুয়ারি)। তিনি রাজা কুরু শ্রবণের যজ্ঞের ঋষি। লেখক মহাভারত হইতে আরও প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন —"ন বিশেষাস্তি বর্ণানং" "অসৃজৎ ব্রাহ্মণানেব পূর্ব্বং ব্রহ্মা প্রজাপতীন্" "হিংসানৃত প্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ। কৃষ্ণাঃ শৌচা পরিভ্রষ্টাস্তেদ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ"-(১৮৮-১০, ১, ৩)। "বৈশ্বামিত্রা দস্যূনাং ভূয়িষ্ঠাঃ" (৭-৩-১৮)। ইহা অপেক্ষা ও শ্রেষ্ঠ শ্রুতি-প্রমাণ আছে "যথেমাং বাচং কল্যানীমাবদানীজনেভ্যঃ। ব্রহ্ম রাজন্যভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায় চারণায়"। (শুক্ল যজুর্ব্বেদ, মাধ্যন্দিনীয়া শাখা ২৬ অধ্যায়, ২য় মন্ত্র)।

লেখকের কতকগুলি কথায় আমাদের সন্দেহ উপস্থিত হয়। যথা, "মৃতপ্রায় ভারতবাসীকে নবজীবন দিতে যাহা কিছু প্রয়োজন, অল্পাধিক পরিমাণে বিকাশোন্মুখ বীজরূপে (Heglian Thesis) ঋগ্বেদে প্রায় তাহার সমস্তই আছে"। কিন্তু আমরা বলি উহা ত আছেই, উপরন্তু বেদের অপ্রতিহত জ্ঞান হেগেলের বিরাট মনকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। "হায় আবাহমান কাল্ আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ অনিমাদি-সিদ্ধির আকাশ কুসুমের পশ্চাৎ ধাবিত হওয়ার ফলে, আজ তাহাদের সন্তানেরা সর্ব্বতোমুখী দাসত্বের শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত।"-ইহার হেতু কোথায়? বেদে

বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের সিদ্ধির কথা নাই অতএব পুরাণের কথা মিথ্যা তাহার হেতু কি? বেদে ত বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের জীবনেতিহাস লেখা নাই—তাঁহাদিগকর্ত্তৃক মন্ত্রাদির উল্লেখ আছে মাত্র। শ্রীশঙ্করের দ্বৈতমূলক স্তোত্র পাঠ করিয়া কি বলা যায় যে তিনি অদ্বৈতবাদ বুঝিতেন না! বালককে প্রথম ভাগ পড়িতে দেখিয়া সে কখনও কালিদাস পড়িবে না এরূপ হেত্বাভাসের প্রয়োজন কি? আর সিদ্ধাই (miracle) জিনিষটা অলীক নয়। আমরা কার্য্য কারণ সম্বন্ধ ঠিক করিতে পারিনা বলিয়া miracle বলিয়া থাকি। অন্য লোকের কাছে বিদ্যুতের আলো, উড়ো জাহাজ miracle কিন্তু বৈজ্ঞানিকের কাছে নয়। এই উদাহরণটী যেমন বাহ্য জগতের তেমনি অন্তর্জ্জগতের অনুশীলন দ্বারা ইন্দ্রিয় ও মনকে বহুশক্তি সম্পন্ন করা যায়, যাহার কার্য্য গুলিকে আমরা miracle বলিয়া থাকি। "শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি, অথবা বার্গসঁা (Bergson) প্রভৃতির পক্ষে যে জ্ঞান বহু গবেষণা এবং বহুবিচারের ফল, বৈদিক ঋষির তাহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ।" Bergsonর কিছু প্রত্যক্ষ হইয়াছিল কিনা আমরা জানি না, কিন্তু শ্রীশঙ্করের প্রত্যক্ষ হয় নাই তিনি কি করিয়া জানিলেন?

কতকগুলি কথা লেখকের ভদ্রোচিত হয় নাই। যথা "এ কালের ভিক্ষালোলুপ সন্ন্যাসীদিগের মত," "পরবর্ত্তী কালের মর্কট বৈরাগ্য 'যদহরের বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ'—বেদের সময় কোথায় ছিল?" আমরা বলি এই মহামত বেদের শীর্ষভাগেই অবস্থিত ছিল যাহা বেদান্ত বা উপনিষদ্ বলিয়া পরিচিত। বেদে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চারিবর্গের কথাই আছে। লেখকের মত যাঁহারা "আত্মীয় পরিজন লইয়া, গরু ঘোড়া লইয়া সুখে বাস করিতে আকাঙ্ক্ষা করেন সে পথও বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণ ভাগে নির্দ্দিষ্ট আছে। আবার যাঁহাদের সংসারের ক্ষণিকত্ব দেখিয়া বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছে তাঁহাদের জন্য ব্যবস্থা দিতেছেন "যদহরেব" "ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ" ইত্যাদি। যাহাদের ভোগবৃত্তির খর্ব্ব হয় নাই তাহাদের জন্য বলিতেছেন "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।

এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে।” বেদ একদেশদর্শী নহেন। তিনি একের পক্ষে যাহা খাটে তাহা অপরের পক্ষে জোর করিয়া চালান নাই। আর জিজ্ঞাসা করি “ভিক্ষা লোলুপ” “মর্কট বৈরাগী” বুদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি সন্ন্যাসীরা এই দেশকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে না ঋগ্বেদ সংহিতা ?

২। উপদেশামৃত—ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের। আহ্মামাদাবাদ হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি কর্ত্তৃক মারাটি ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে।

৩। বিবেকানন্দ বচনামৃত—লেখক ও প্রকাশক ডাহ্যা ভাই রামচন্দ্র মেহেতা। মারাটী ভাষায় বাহির হইয়াছে।

৪। দেশের ডাক—শ্রীহরেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্ত্তী—প্রণীত আমরা পাইয়াছি মূল্য দশ পয়সা। প্রাপ্তি স্থান সরস্বতী লাইব্রেরী ৯নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৫। মহাত্মা গান্ধী—শ্রীরমণী রঞ্জন গুহ রায় প্রণীত। ইহাতে মহাত্মার পূর্ব্ব এবং আধুনিক ইতিহাস সংক্ষেপে আছে। “গান্ধী, বিবেকানন্দের প্রারব্ধ কর্ম্মের পূর্ণ পরিণতি” এ কথা খুব সত্য বটে, কিন্তু “মহাত্মা গান্ধী স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া একথা স্বীকার করিয়াছেন—‘আমার অন্তরের প্রেরণানিচয় আমি লাভ করিয়াছি—বাঙ্গালার পূজারী ব্রাহ্মণ রামকৃষ্ণ দেব ও তদীয় শিষ্য, বিশ্ব-সমন্বয়-বাদ প্রচারক, হিন্দু-সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের পুণ্য প্রতিভা হইতে”—ইহার নজীর কোথায় ?

সংবাদ ও মন্তব্য

স্বামী বিবেকানন্দ—জন্ম-মহোৎসব

সোমবার, ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ‘ষ্টার-রঙ্গমঞ্চে’ রামকৃষ্ণ-মিশনের শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের সভাপতিত্বে কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটী কর্ত্তৃক, স্বদেশ-প্রেমিক, মহাত্মা, ভারতের বর্ত্তমান যুগের সন্ন্যাসী শ্রীশ্রীস্বামী বিবেকানন্দের ষষ্টিতম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই

উপলক্ষে এত লোকের সমাবেশ হইয়াছিল যে, থিয়েটারগৃহে আর তিল-মাত্রও স্থান ছিল না। কলিকাতাবাসী বহু গণ্যমান্য ও বিদ্বান ব্যক্তি এবং স্বামী বিবেকানন্দের বহু শিষ্য ও ভক্তবৃন্দ সভা বসিবার বহু পূর্ব্বেই তথায় উপস্থিত হন।

প্রথমে স্বামী বাসুদেবানন্দ একটী বৈদিক স্তোত্র পাঠ করিয়া সভার উদ্বোধন কার্য্য সমাধান করেন। তৎপরে সঙ্গীতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত চণ্ডী-চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একটী হৃদয়গ্রাহী ধর্ম্ম-সঙ্গীত করিলে সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বিবেকানন্দ সোসাইটীর ইং ১৯২১ সনের কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন। অতঃপর সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কাচার্য্য মহাশয় স্বামীজির মহত্ত্ব সম্বন্ধে সুললিত সংস্কৃত ভাষায় একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন ও স্বামীজির গুণাবলী বিবৃত করিয়া সংস্কৃত ভাষায় স্ব-রচিত একটী কবিতা পাঠ করেন। পরে বাঙ্গালোরের ডেপুটী কমিশনার শ্রীযুক্ত এম্, এ, নারায়ণ আয়াঙ্গার, বি-এ, বি-এল, ডাক্তার মরিনো ও নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়গণ সনাতন ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার উপযুক্ত শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ কর্ত্তৃক সনাতন-ধর্ম্মের বর্ত্তমান যুগোপযোগী ব্যাখ্যান বিষয়ে আলোচনা করেন। অতঃপর মনীষী স্বামী অভেদানন্দজী প্রায় একঘণ্টা কাল ব্যাপী একটী দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তাঁহার গুরুদেব শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের চিরনূতন অমূল্য উপদেশাবলী এবং তাঁহার প্রধান ও প্রিয়শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ কর্ত্তৃক উক্ত উপ-দেশাবলীর জগতে প্রচার সম্বন্ধে বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন। এমন আগাগোড়া ধর্ম্ম-ভাবোদ্দীপক সভা প্রায় দেখা যায় না। প্রত্যেক বক্তৃতাটী বেশ হৃদয়গ্রাহী ও মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল। সর্ব্ব-শেষে শ্রীমান নিত্যানন্দ সেনগুপ্ত কর্ত্তৃক "বিবেকানন্দ স্তোত্রম" গীত হইলে পর ৯-১৫ মিনিটের সময় সভা ভঙ্গ হয়। সমিতির সম্পাদক মহাশয়ের আহ্বানে অনেকে পার্শ্ববর্ত্তী সোসাইটী গৃহে সমাগত হইয়া প্রসাদাদি ধারণ করিয়া উৎসবের পরিসমাপ্তি করেন।

কথা প্রসঙ্গে।

মাতৃ-জাতিকে জাগাইবার জন্য আজকাল অনেক পুরুষ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। কিন্তু যাহাকে জাগাইবে সে যদি নিজে না জাগে ত তাহাকে জাগাইবার চেষ্টা বৃথা। অহমিকা বশতঃই আমরা অপরকে তুলিতে যাই, কেন না, ও ছোট হীন, আর আমি উচ্চ বলবান। কিন্তু শাস্ত্র বলিতেছেন—সকল স্ত্রী মহাশক্তির প্রকাশ। একবার ভাবিয়া দেখ দিকি যে মাতৃজাতি স্বীয় জঠরে সন্তানকে ধারণ করেন, বুকের রক্ত দিয়া যাহাকে পালন করেন, কত তপস্যা করিয়া যাহার স্বাস্থ্য বজায় রাখেন, সেই মাতৃজাতি দুর্ব্বল—আর পুরুষ বলবান! অপর দিকে বেদান্ত ত বলিতেছেন—আত্মায় লিঙ্গ ভেদ নাই। কার্য্যতঃও দেখিতে পাওয়া যায় ঋগ্বেদের যুগ হইতে রামকৃষ্ণযুগ পর্য্যন্ত ভারত ও ভারতেতর সকল দেশেই সাধু-পুরুষের সহিত সাধ্বী নারীরও অভাব হয় নাই। তবে নারীর প্রতি পুরুষের একটী কর্ত্তব্য আছে, সেটী নিজেদের স্বার্থ একটু কমাইয়া, তাহাদের যথার্থ স্বাধীনতার পথে অন্তরায় না হওয়া, ও সাহায্য করা। তাহার পর যাহা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য তাহা তাহারা নিজেরাই ঠিক করিয়া লইবে।

*　　*　　*

ভারতের মহারোগ—দারিদ্র্য।—কারণ অযথা বিলাসিতা। বাণিজ্য বলিয়া কোন জিনিষই ভারতের নাই—যেটুকু আছে সেটুকুকে দালালী বলিলেই চলে। ব্যবসাদার মানে বিদেশী দ্রব্য সস্তায় কিনিয়া স্বদেশীর নিকট বহুমূল্যে বিক্রয়, আর না হয় মূর্খ চাষার নিকট সস্তায় কাঁচা মাল কিনিয়া বিদেশীর নিকট কিঞ্চিদধিক মূল্যে বিক্রয় এবং সেই

মালের তৈয়ারী নানাবিধ বস্তু বিদেশীর নিকট কাঁচা মালের ডবল মূল্যে কিনিয়া স্বদেশীর নিকট বিক্রয়। ইহাতে দেশে অর্থ সঞ্চয় ত হয়ই না বরং ধুইয়া মুছিয়া যাহা আছে তাহাও বাহির হইয়া যায়। আর আছেন মসিজীবী কেরাণীকুল—যাঁহারা পরিবার প্রতিপালনেই অসমর্থ; এবং তৃতীয় শ্রেণী হইতেছে মূর্খ কৃষককুল যাহারা ইহজীবনে কখনও মহাজনের কবল হইতে মুক্ত হইতে পারে না। এমনি অবস্থায়ও কিন্তু আমাদের সাবান না মাখিলে স্নান হয় না, সিগারেট ছাড়া তামাকে সানায় না, এসেন্স ছাড়া ভদ্র সমাজে মেশা দায়, রং বেরঙের জামা ছাড়া মুখ দেখান ভার। অথচ এগুলি না হইলেও জীবনধারণ চলে। কিম্বা যদি এতই সৌখীন হও ত সেগুলি দেশী কিনিলেই ত চলে। একবার জার্ম্মাণী আর জাপানের মাল ঘরে আনিয়া স্বদেশী শিল্পীদের অনাহারে মারিয়াছ—আবার স্বদেশী শিল্প ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে, যেন শিশুর মত চটকে ভুলিয়া তাহার ধ্বংস করিও না এবং নিজেরাও বিলাসের আবর্ত্তে ডুবিয়া মরিও না।

* * *

ভারতের বস্ত্র-সমস্যা অনেকটা আশাপ্রদ। বিগত মহাযুদ্ধের সময় আমাদের দেশে প্রতি বৎসরে ১৭ কোটি টাকার বস্ত্র প্রস্তুত হইত। কিন্তু ১৯২১ সালে উহা বর্দ্ধিত হইয়া ৬৮ কোটি হয়।

করদ রাজ্যসহ ব্রিটিশ ভারতে

১৯১৯ সালে	৫০৮,৮৬০,৪২৭ পাউণ্ড
১৯২১ „	৫১৯,৭২৪,২২৭ „
বৃদ্ধি	১০,৮৬৩,৮০০ „

কেবল ব্রিটিশ-ভারতে

১৯১৯ সালে	৪৭৮,৯২০,৭১২ পাউণ্ড
১৯২১ „	৪৯০,১৮০,৮২৬ „
বৃদ্ধি	১১,২৫৯,৮০০ „

কিন্তু ইহার দ্বারা ভারতের বস্ত্র-সমস্যা পূরণ হয় না। কারণ আমাদিগকে সবস্ত্র থাকিতে হইলে ৫০০ কোটি গজ মোটা কাপড় এবং

২৫০ কোটি গজ সরু কাপড়ের জন্য এখনও বিদেশীর দ্বারস্থ হইতে হইতেছে। ভারতে মাত্র ১৫০ কোটি গজ কাপড় কলে তৈয়ারী হয় এবং ১০০ কোটি গজ কাপড় তাঁতী ও জোলায় প্রস্তুত করে। আমাদের নিজেদের বস্ত্রাভাব নিজেদেরই পূরণ করিতে হইলে কলে হউক বা চরকায় হউক ৭৫০ কোটি গজ কাপড় প্রস্তুত করিতে হইবে। কেবল "বিদেশী বর্জ্জন কর" বলিয়া চিৎকার করিলে চলিবে না। গরীব ও মধ্যবিত্ত লোকদের চরকায় মনযোগ দিতে হইবে এবং ধনীদের কল কারখানা খুলিতে হইবে।

* * *

আমরা ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যায় বলিয়া আসিয়াছি যে যদি আমাদের জাতিকে ম্যালেরিয়া, কলেরা, বিলাস এবং ব্যভিচার হইতে বাঁচাইতে হয় তবে তাহার একমাত্র প্রতিবেধ জমিদার ও ব্যবসায়ী কুলের সহর-মোহ ত্যাগ করিয়া পুনরায় স্ব স্ব গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন এবং সেখানেই জনসাধারণের হিতকর কার্য্য সকল সম্পাদন করা। বিশ্ব-বিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল, টোল, পাঠশালা, হাঁসপাতাল, দাতব্য-চিকিৎসালয়, বিজ্ঞানাগার, চিত্রশালা, পুস্তকাগার প্রভৃতি সকল সৎকর্ম্ম তাঁহারা গ্রামেই প্রতিষ্ঠিত করুন; মন্দির, উদ্যান, পথ, ঘাট, পুষ্করিণী, মহজ্জনের প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতির দ্বারা গ্রামের শোভা-সম্পদ বৃদ্ধি করুন।

১৯২১ সালে লোকসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি।

বর্দ্ধমান বিভাগ।

জেলা	মোট লোক সং	শতকরা বৃদ্ধি	শতকরা হ্রাস
বর্দ্ধমান	১৪৩৮৯২৬	০	৬·৫
বীরভূম	৮৪৭৫৭০	০	৯·৪
বাঁকুড়া	১০১৯৯৪১	০	১০·৪
মেদিনীপুর	২৬৬৬৬৬০	০	৫·৫
হুগলী	১০৮০১৪২		
হাওড়া	৯৯৭৪০৩	৫·	
মোট	৮০৫০৬৪২		

প্রেসিডেন্সী বিভাগ

২৪-পরগণা	২৬২৮২০৫	·৮	
কলিকাতা	৯০৭৮৫১	১·৩	
নদীয়া	১৪৮৭৫৭২		৮
মুর্শিদাবাদ	১২৬২৫১৪		৮
যশোহর	১৭২২২১৯		১·২
খুলনা	১৪৫৩০৩৪	৬·৭	
মোট	৯৪৬১৩৯৫		

রাজশাহী বিভাগ।

রাজশাহী	১৪৮৯৬৭৫	০·৬	
দিনাজপুর	১৭০৫৩৫৩	·১	
জলপাইগুড়ি	৯৩৬২৬৯	৩·৭	
দার্জ্জিলিং	২৮১৭৪৮	৬·৫	
রঙ্গপুর	২৫০৭৮৫৪	৫·১	
বগুড়া	১০৪৮৬০৬	৬·৬	•
পাবনা	১৩৮৯৪৯৪	০	২·৭
মালদহ	৯৮৫৬৬৫	০	১·৮
মোট	১০৩৪৫ ৬৪		

ঢাকা বিভাগ।

ঢাকা	৩১২৫৯৬৭	৮·৩
ময়মনসিংহ	৪৮৩৭৭৩০	৬·৯
ফরিদপুর	২২৪৯৮৫৮	৪·৮
বাখরগঞ্জ	২৬২৩৭৫৬	৮·২
মোট	১৩৮৩৭৩১১	

চট্টগ্রাম বিভাগ।

ত্রিপুরা	২৭৪৩০৭৩	৯.৭	
নোয়াখালি	১৪৭২৭৮৬	৯.০	
চট্টগ্রাম	১৬১১৪২২	৬.৮	
পার্ব্বত্যপ্রদেশ	১৭৩২৪৩	১২.৬	
মোট	৬০০০৫২৪		

মিত্ররাজ্য।

কুচবিহার	৫৯২৪৮৯		০.১
ত্রিপুরারাজ্য	৩০৪৪৩৭	৩২	
মোট	৮৯৬৯২৬		

দশ বৎসর পূর্ব্বে ৪৬, ৩০৫, ১৭০ ছিল। ১৯২১ সালে বর্দ্ধিত হইয়া ৪৭, ৫৯২, ৪৬২ হইয়াছে—শতকরা মাত্র ২৳ বৃদ্ধি। ইহার মধ্যে পুরুষ ২৪, ৬২৮, ৩৬৫ এবং স্ত্রীলোক ২২, ৯৬৪, ০৯৭।

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলী, ২৪ পরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, যশোহর, রাজশাহী, দিনাজপুর, পাবনা, মালদহ, নোয়াখালী এবং কুচবিহার এই কয়টী জেলার মৃত্যু আসন্ন।

দেশে ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, সাহিত্য, কৃষি, কলা ও শিল্পের বিস্তার এবং তাহা কর্ম্ম পরিণতির জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রামে গ্রামে, প্রবর্ত্তন করা বিশেষ প্রয়োজন।

(১) মন্দির প্রতিষ্ঠা; সেখানে গিয়া গ্রামবাসীরা পূজা-অর্চ্চা, ধ্যান জপ ও নানা ধর্ম্ম শাস্ত্রের আলোচনা করিবে।

(২) বালক ও বালিকা বিদ্যালয়; বালিকা বিদ্যালয় কেবল স্ত্রীলোকের দ্বারাই পরিচালিত হওয়া উচিৎ—উদ্দেশ্য অতি সরল ভাষায় সাহিত্য ও বিজ্ঞানের আলোচনা।

(৩) যাহাতে সকলেই নিজ জীবিকা উপার্জ্জনে সমর্থ হয়, তাঁহার জন্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিকার্য্য, কুটীর-শিল্প ও নানা কলাবিদ্যার শিক্ষা দেওয়া হইবে।

(৪) সেবাশ্রম ; দুস্থ লোকদের সাহায্য কল্পে।

(৫) স্বাস্থ্য রক্ষা ও বিবাদ বিসংবাদ মিটাইবার জন্য গ্রামের সকল উপযুক্ত ব্যক্তিকে একত্রিত করিয়া একটী সমিতি গঠিত হইবে। ইঁহারা সামাজিক সকল বিষয়েই ব্যবস্থা দিতে পারিবেন এবং সকল পল্লী সভ্যদের তাহা মানিয়া চলিতে হইবে।

(৬) এই কার্য্য প্রতিপাদনের জন্য গ্রামস্থ ধনীর নিকট অর্থ সাহায্য এবং মধ্যবিত্তের নিকট মুষ্টিভিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৭) গ্রামের শিক্ষিত সর্ব্বত্যাগী যুবকেরাই ইহার কর্ম্মিরূপে গৃহীত হইবেন।

"আয়, আয়"!

(শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ রায়)

সুপ্ত জগৎ সপ্ত নিনাদে গর্জ্জিল জাগো, জাগো ;
তপ্ত সূর্য্য ভ্রূকুটী ক্ষেপনে হুঙ্কারে 'ওঠ ওগো'!
দাউ দাউ জ্ব'লে উঠিছে বহ্নি জ্বালাময় কি ভীষণ,
রুদ্র-প্রতাপে প্রলয় আরাবে গর্জ্জে প্রভঞ্জন।
সুপ্ত মর্ত্ত্য জুড়িয়া কি যেন রুদ্র-মধুর সাড়া :
সারাটা জগৎ উদ্দীপনায় ভাঙ্গিছে জড়তা কারা।
"সুপ্তির কোলে কত কাল ধরে নিদ্রিত ছেলে হা রে,
আয়, আয় তোরা, কোলে উঠে আয় মা ডাকিছে সবাকারে"
মাতৃ আহ্বানে টুটিল তন্দ্রা মেলিল চক্ষু সব ;

কণ্ঠে আজিকে উত্থিত একি মহান গভীর রব !
"আয়, আয় উঠে, কতকাল আর ঘুমাবি চেতনাহারা ;
আয়, আয় তোরা শূন্য কোলেতে 'নদ্রিত তবু যারা।
মন্দির-দ্বারে কতকাল আমি ফিরে গেছি ডেকে ডেকে ;
বাছা তোরা সব নিদ্রার কোলে উঠিলি না ঘুম থেকে।
মন্দির-দ্বার ভেঙ্গে গেছে আজ গভীর শব্দময় !
মাতৃ-বক্ষে আয় ছুটে আয়, অতীত বেদনাময় !
রুদ্র-মধুর-সাড়া পড়ে গেছে আয় ছুটে কোলে আয় ;
শূন্য কোলেতে সন্তান-মাতা থাকিবে কেমনে হায় !"
মা ডাকিছে অই গভীর শব্দে 'ছুটে আয়, ছুটে আয়' ;
আহ্বান-ধ্বনি উত্থিত কা'রা ওই ছুটে যায় যায়।
চক্ষে ভীষণ হুতাশন জ্বলে অশ্রুর চিরাবাসে ;
বক্ষে জ্বলিছে কি ভীষণ তেজ—কোমলতা তারি পাশে !
কঠোর-কোমলে বেঁধেছে হৃদয় পলে পলে ছুটে যায় ;
"ওরে মোর চির-নিদ্রিত ছেলে আয় কোলে আয় আয়"
মাতৃ-আহ্বান বাজিছে কর্ণে উধাও ছুটেছে ছেলে ;
কণ্টকবন করি বিদারণ সাগর পিছনে ফেলে।
সম্মুখের বাধা ঠেলে ফেলে দূরে চূর্ণ করিছে সব,
পর্ব্বত ধূলি হয়ে পড়ে যায়,—ঐ না আহ্বান-রব ?
কতকাল পরে মা ডাকিছে তাই ছুটে যায় সুধু যায় :
পিছন হইতে কে ফিরায় ডেকে ?—শুনেও শুনে না তায়।
বাহির বিশ্ব হয়ে গেছে হারা, ধ্বনি সুধু বাজে কানে,
ধ্রুব তারা সম সেই ধ্বনি ধরে ছুটেছে মায়ের পানে।
হাজার পাহাড় পারিবে না তার গতি রোধ করিবারে ;
জলধি তাহার পারিবে না আর থামাতে পথের ধারে।
সন্তানহারা—মণিহীন ফণী—মাতা যে ডাকিছে তায় ;
হৃদয়ের সব সঞ্চিত বেগে তাই ছুটে যায়—যায় !!

স্মৃতি

(২৪)

(শ্রীঅজিত নাথ সরকার

দিন চলিয়া যায় থাকে না কিন্তু কালের বক্ষে পড়িয়া থাকে সেই দিনের স্মৃতি। মানুষের জীবনে সুখের পর দুঃখ—মিলনের পর বিচ্ছেদ ক্রমাগতঃই ঘটিতেছে; যেমন মহাসিন্ধুর এক একটী তরঙ্গ মাথা তুলিয়া উঠে আর হেলিতে দুলিতে যাইয়া কোথায় মিশিয়া যায়। লীলাময়ী প্রকৃতির কোলে জীব ও জড় জগতের এক একটী অভিনয় আপনার লীলাতরঙ্গে দিগন্ত প্লাবিত করিয়া কোন অনন্তে মিশিয়া যায় জানি না। তাই বলিতেছি যাহা যায় তাহা আসে না, কিন্তু তাহার অমলিন স্মৃতি-চিহ্ন লতিকার মত হৃদয়-কুঞ্জে পড়িয়া থাকে—আর তাই লইয়াই মানুষ আপনার মানসপটে কত বিচিত্র সুখ দুঃখের মূর্ত্তি আঁকিয়া হৃদয় ভরিয়া তুলে, তাহার একার্য্যে কেহ বাধা দিতে পারে না। কোন স্মরণাতীত যুগে পঞ্চবটীর অরণ্য ভবনে গোদাবরীর শ্যাম উপকূলে রঘুকুলমণি শ্রীরামচন্দ্র ও তাঁহার প্রেমময়ী প্রীতিময়ী জীবন সঙ্গিনী সীতাদেবী যে অপূর্ব্ব লীলাখেলা দেখাইয়া গিয়াছিলেন—যে মিলনের সুখে, যে বিয়োগের অশ্রুতে দিগ্বিদেশ ভরিয়া দিয়াছিলেন—তাহা কি কেহ ভুলিতে পারে! যে গোদাবরীর তীরে শ্রীরামচন্দ্র প্রাণাধিকার অদর্শনে ভূম্যবলুণ্ঠিত দেহে রোদন করিয়া বনের পশু পক্ষীকেও আকুল করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেখানে সেই করুণ ক্রন্দন ধ্বনি এখনও আকাশ বাতাস ভরিয়া দেয়—এখনও সেই কলনাদিনী গোদাবরী কলস্বরে তাঁহার বেদনা গীতি গাহিয়া চলিতেছে—ভুক্তভোগী বুঝিতে পারিবেন। যে নৈরঞ্জনাতীরে জীব দুঃখে কাতর যুগাবতার বুদ্ধ সোনার সংসার শোকের পাথারে ভাসাইয়া, শ্মশানের শবদেহ পরিত্যক্ত মলিন বস্ত্রে দেবকান্তি আচ্ছাদিত করিয়া—আকুল প্রাণে জগতের দুঃখে অভিভূত হইয়াছিলেন এবং কঠোর সাধনায় শরীরপাত করিতে বসিয়াছিলেন—সেই নৈরঞ্জনা এখনও আমাদের প্রাণে রাজপুত্র সন্ন্যাসীর ব্যথিত হৃদয়ের গভীর উচ্ছ্বাসে যেন বক্ষ আলোড়িত করিয়া দেয়।

যে যমুনা পুলিনে পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণ মধুর লীলাভিনয় দেখাইয়া গিয়াছিলেন তাঁহার স্মৃতি এখনও পড়িয়া রহিয়াছে। তাই বলিতেছি—সে রাম সীতা নাই, সে শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধ নাই তাঁহারা আপন আপন লীলাভিনয় শেষ করিয়া কোন অজানা রাজ্যে চলিয়া গিয়াছেন—কিন্তু সেই গোদাবরী, সেই নৈরঞ্জনা, সেই যমুনা এখনও পূর্ব্বকথিত মহাপুরুষদিগের উজ্জ্বল স্মৃতি আদরে বক্ষে ধরিয়া আছে। সে স্থানের ক্ষণিক দর্শনে এমন কি কল্পনাতেও যে বক্ষ আলোড়িত হইয়া উঠে—তাহা হৃদয়বান মাত্রেরই অনুভবের জিনিষ।

আমাদের দরিদ্রের বন্ধু—জগদ্‌গুরু বিবেকানন্দ যে মহা সাধনার উদ্বোধন করিয়া গিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ আজ প্রায় চতুর্ব্বিংশতি বৎসর তাহারই স্মৃতি বহন করিয়া আসিতেছে—তাঁহারই বাণী ঘোষণা করিয়া আসিতেছে তাই উহা আমাদের বড় আদরের সামগ্রী—সনাতন হিন্দু সমাজ? তোমার 'সনাতন' নাম আজ কোন সুদূর মরুপ্রান্তরে মিলাইয়া যাইত, কোন্ উন্মত্ত স্রোতবেগে ভাসিয়া যাইত—তাহা কি জান? কে তোমায় হৃৎপিণ্ডের রক্তদানে রক্ষা করিয়াছেন? সেই বিশ্ববিজয়ী বীরই আমাদের হৃদয়ারাধ্য বিবেকানন্দ। তাঁহার ঋণ কি স্বীকার করিবে? না কর ক্ষতি নাই কিন্তু প্রকৃতির লীলা নিকেতন হইতে সে স্মৃতি কেহ মুছিয়া ফেলিতে পারিবে না। রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ আজ এই দীর্ঘ দিন সেই মহাপুরুষের অমর বাণী আর তাঁহার অভিনব অমানুষী সাধনার কথা লোক সমাজে ঘোষণা করিয়া আসিতেছে—বিরাম নাই—শ্রান্তি ক্লান্তি নাই। কাল-রূপ মহাপারাবারের বক্ষে এই যে সুসজ্জিত তরণীখানি ভাসিয়া চলিয়াছে তাহার সুদক্ষ কর্ণধার ছিলেন—বিবেকানন্দের আদরের ভাই 'রাখাল-রাজা'। তাই আজ পর্য্যন্ত তরী উন্মত্ত স্রোতের তীব্র আলোড়নেও মগ্ন দিক্‌ভ্রান্ত হয় নাই, প্রশান্ত গতিতে চলিতেছিল।

কালের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গাঘাত অগ্রাহ্য করিয়া, যিনি প্রতিকূল স্রোতবেগ প্রতিহত করিয়া আপনার জীবনতরী এই বিচিত্রতাময় জগতের অসীম কর্ম্মসাগরে ভাসাইয়া দেন শুধু—"বহু জন সুখায় বহু জন হিতায়" জীবন ধন্য তাঁহারই, জন্ম সফল তাঁহারই; বিফলতায় ব্যর্থতায় হতাশভাব

নাই, আবার কৃতকার্য্যতায় আনন্দের চাঞ্চল্য নাই, তার পরিবর্ত্তে আছে একটা গভীর প্রশান্ত আনন্দের স্নিগ্ধতা। সে উদ্দাম গতির সম্মুখে দুর্ভেদ্য আবরণও হেলায় ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া সরিয়া যায়, জাগতিক মায়ার ক্ষীণ বন্ধনও শিথিল হইয়া খসিয়া পড়ে—অথবা সেই অশ্রান্ত গতির পিছনে পিছনে ছুটিতে থাকে—তাহাকে নূতনভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া নূতন শক্তিতে শক্তিমান করিয়া। জগতের প্রত্যেক জাতির জীবন ধারাই এক একটী লক্ষ্যের অভিমুখে ধাবিত কিন্তু আমাদের জীবন গতি যেন উদ্দেশ্যহীন লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার মুখ ফিরাইতে হইলে যে শক্তি সামর্থ্য, যে আয়োজনের দরকার তাহা যেন আমাদের ভাণ্ডারে নিতান্ত অভাব। যদিও কিছু আছে তাহা অনাদরের সহিত পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চেষ্ট বসিয়াছিলাম। সহসা ঘোর অমানিশার অন্ধকার ভেদ করিয়া একটী বিদ্যুতের রেখা চমকিয়া উঠিল. তাহারই উজ্জল আলোকে দেখিতে পাইলাম আমাদের গন্তব্য পথ কোন্‌দিকে ;—বুঝিতে পারিলাম জীবনের স্থির লক্ষ্য কি ? কিন্তু আমাদের অনিয়ন্ত্রিত ক্ষীণ জীবন-ধারা. লক্ষ্যের দিকে যাইবে কেমন করিয়া ? সে যে শক্তি হারা। আমাদের এই কর্ম্মভ্রষ্ট অবসন্ন প্রাণ—যাহা নিয়ত অলসতাপূর্ণ, তাহা কেমন করিয়া তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিবে ? শুধু কি আসুরিক শক্তির উপাসনায় মনপ্রাণ ভরিয়া তুলিতে হইবে—না প্রাণ মন্দির খুঁজিয়া দেবতার সন্ধান করিতে হইবে ? মূঢ় আমরা বুঝিতে পারি নাই যে আমাদের 'রাখালরাজা' প্রেমপারাবার হৃদয় লইয়া সেই মহা তপস্যার অনায়াস লভ্য সিদ্ধির পথ দেখাইয়া আসিতেছিলেন ;—আর আকুলকণ্ঠে ডাকিতেছিলেন—'আয় কে যাবিরে তোরা সেই আনন্দময় ধামে'! হতভাগ্য আমরা সে ডাক শুনিতে পাই নাই। তাই বুঝি আজ 'রাখালরাজার' বাঁশী নীরব হইল! হায়! কে আর বাঁশী বাজাইবে ? কে আর সেই রুদ্রাবতার বিবেকানন্দের ভৈরব বিষাণের পশ্চাতে যশোদা-দুলালের মোহন মুরলী রবে আমাদের অচেতন প্রাণ জাগাইয়া তুলিবে ? নির্ব্বোধ আমরা এতদিন মনে করিতাম বুঝি শুধু শাস্ত্রের গণ্ডগোল বাধাইলেই, আর ঐ নীচ কাঙ্গালদের অস্পৃশ্য ভাবিয়া দূরে থাকিলেই

প্রেমময় নারায়ণের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের এই গভীর সুপ্তির মাঝে যখন ভৈরবের বিষাণ বাজিয়া উঠিল—যখন 'রাখাল রাজার' মোহন বেণু সেই নিস্তব্ধ রজনীতে বেহাগের করুণ তান ধরিল—তখন সমস্ত জগৎ ব্যাকুল হৃদয়ে সাড়া দিয়া উঠিল। প্রাণের ভিতর কে যেন বলিয়া উঠিল:—"মন্দিরে মম কে আসিল হে!" দেখিতে দেখিতে ঃ—

—"সকল গগন অমৃতে মগন,
দিশি দিশি গেল মিশি অমানিশি দূরে দূরে।
সকল দুয়ার আপনি খুলিল, সকল প্রদীপ আপনি জ্বলিল,
সব বীণা বাজিল নব নব সুরে।"

শুনিলাম আকাশে বাতাসে ধ্বনিয়া উঠিল:—অন্তর দেবতার সন্ধান চাও? নিজের দিকে তাকাও—সেই বিশ্ব পিতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির দিকে তাকাও শূন্যের দিকে নয়। সেই সমস্ত দেবের সন্ধান পাইবে নররূপী নারায়ণের দিকে তাকাইলে। আর যদি তুমি উপাসনায় বসিয়া শূন্য মন্দিরের শূন্যের পানেই তাকাও তবে দেখিবে শুধু কূল কিনারাহীন শূন্য। ঐ দেখ! যশোদাদুলাল নারায়ণ সখা আজ দীন মূর্ত্তিতে নরের মাঝে আপন লীলা প্রকটিত করিয়াছেন। আর কোথায় খুঁজিবে ভাই? তোমার সকল সাধনার সিদ্ধি--পূর্ণতা পাইবে মানুষের মেলায়—দীনের মেলায়। এস সেইখানেই খুঁজিতে আরম্ভ করি।'

সিদ্ধি তখন ছিল শাস্ত্রের গণ্ডগোলে জয়লাভ; কাজেই দেবতার স্বরূপও আমাদের চক্ষের সম্মুখ হইতে সরিয়া গিয়াছিল। সেই সময়েই 'নরেন' আর তাঁহার আদরের ভাই 'রাখাল' প্রাণদেবতার সন্ধানের জন্য এই নূতন তপস্যার উদ্বোধন করিলেন। সে তপস্যা গহন কাননে নয়—দারুণ নিদাঘের অসহনীয় তাপে অথবা প্রজ্বলিত আগুণে দগ্ধ হইয়া নয়—তাহা মানুষের সেবায়, দীনের সেবায়, দরিদ্র নারায়ণের সেবায়। ভাগ্যবান তখন তাঁহার আলস্য জড়িত জীবন ধারা সেই তপস্যার দিকে তীব্র বেগে ছুটাইয়া দিলেন,—'আর' বুঝিলেন সত্যইত! কখনও কাহাকেও ভালবাসিয়াছি কি? কখনও আপনার সমস্ত শক্তিকে

নিঃশেষ করিয়া অন্তের সেবায় বিলাইয়া দিয়াছি কি ? যদি না দিয়া থাকি তবে উপাসনায় আমার কিসের অধিকার ? আমি যদি কখনও মানুষের জন্য না কাঁদিয়া থাকি তবে মানুষের দেবতার জন্য—ভগবানের জন্য কাঁদিবার শক্তি আমি লাভ করি নাই। আমি প্রত্যক্ষ লাভ ও আনন্দের বিনিময়ে যে প্রাণের টান মানুষকে বিলাইয়া দিতে পারিনা ; কল্পনায় ভগবানের মূর্ত্তি সৃষ্টি করিয়া কিরূপে তাঁহার চরণে আত্মোৎসর্গ করিব ! হে দয়াময় ! আজ হইতে তুমিই আমার সুখ, দুঃখ, মিলন, বিচ্ছেদ, আমার আকাঙ্ক্ষা সব ! আমি আর কিছুই চাইনা, চাই কেবল—ঐ চরণে আপন হারা হইয়া বিকাইতে ! হায় ! এ হৃদয় আমার কোথা হইতে আসিবে ? তবে কি শুধু চক্ষু মুদিয়া স্বার্থভরা প্রাণের তৃপ্তির জন্য লোক দেখান পূজার আয়োজন করিব ? না তা হবে না ! এত ভণ্ডামি বিশ্বতঃ চক্ষুর সম্মুখে অসম্ভব। তবে উপায় কি ? এই চিরপাপ কলুষিত হৃদয়ের শান্তি আমি কোথায় খুঁজিয়া পাইব ? বিশ্ববাসীর করুণ বিলাপ দয়াময়ের করুণ হৃদয়ে আঘাত করিল তাই 'রাখাল রাজার' বাঁশী বাজিয়াছিল :—'এস ভাই ! আজ তোমাদের নিদ্রালস আঁখির স্বপ্ন জড়িমা ঘুচাইয়া 'দরিদ্র নারায়ণের' সেবারূপ মহাতপস্যায় যোগ দাও' ! কিন্তু সে ডাক কানে গেল না—পাষাণ হৃদয় গলিল না—তাই বুঝি কমলে কৃষ্ণ সখার এই অভিমান ! এ অভিমান বুঝি আর ভাঙ্গিবে না ! সে বাঁশীর তান বুঝি আর বাজিবে না ! তাই স্বতঃই প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে—"ক মন্দ-মুরলীরবঃ ? ক্ব নু সুরেন্দ্র-নীলদ্যুতিঃ ?" হাঁগো রাখাল রাজা ! তুমি কি আমাদের সেই রাখাল রাজার সখা—যাঁহার মোহন বেণুর তানে আত্মহারা ব্রজগোপিনী সব হারাইয়া চরণ প্রান্তে লুটাইয়া পড়িত ?—যাঁহার ক্ষণিক অদর্শনে সমস্ত জগৎ আঁধার দেখিত ? কুরুক্ষেত্রের রণপ্রান্তরে অর্জ্জুন যাহার বিপুল শক্তি বলে বিজয়ী হইয়া ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন—তুমি কি আমাদের সেই রাখালরাজার সখা ? তোমায় আমরা কি দিয়া বাঁধিব দেব ? তুমি আজ তোমার খেলা শেষ করিয়া ঘরে ফিরিয়াছ ! আর কি তোমায় পাইব না ? তোমার শক্তি না পাইলে এ মহাযজ্ঞে পূর্ণাহুতি আমরা কেমন করিয়া দিব ? এ

তোমার—বিদায় নয়—ইহা সেই বাল-গোপালের সখের খেলা। তাই বড় আশা আবার তোমার এই হৃদয় প্রান্তে পাইব!

"কি করিলে বল পাইব তোমারে,
রাখিব আঁখিতে আঁখিতে;
এত প্রেম আমি কোথা পাব নাথ,
তোমারে হৃদয়ে রাখিতে।"

তুমি আমাদের জন্য কাঁদিয়াছ তবু তোমায় চাহি নাই। তুমি আমাদেরই জন্য আপনার ভক্তি মুক্তি সবই তুচ্ছ করিয়াছ তবুও তোমার কথা শুনি নাই, তাই বুঝি এত অভিমান! হতভাগ্য আমরা! কার মুখ চাহিয়াই আর সকল দুঃখ যন্ত্রনা ভুলিয়া যাইব? কার স্নেহ মাখা মধুর সম্ভাষণে ব্যথিত হৃদয় পূর্ণানন্দে ভরিয়া উঠিবে? আবার এসগো!

"আমি মর্ম্মের কথা অন্তর ব্যথা
কিছুই নাহি কব;
শুধু জীবন মন চরণে দিনু
বুঝিয়া লহ সব।
আমি কি আর কব!

হে দীননাথ! জীবনে বড় আশা থাকিল সেই প্রেমময় মূর্ত্তিতে আবার তোমার দেখা পাইব! হে অন্তর্যামিন্! তুমি সেই অজানা রাজ্য হইতে আমাদের অশীর্ব্বাদ কর, যেন সাধনায় সিদ্ধি লাভ হয়!

"এই চাহি নাথ যেন সর্ব্বক্ষণ
থাকে আমার মন তোমাতে মগন,
(আমার) ধন জন সুখে নাহি প্রয়োজন—
তোমাধনে লয়ে জুড়াব হৃদয়।"

(২৫)

(শ্রীঅখিলকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়)

আজি,—

লুকালে কোথায়? হে রাজা রাখাল! ধূসর সান্ধ্য ছায়;
আঁখির বাহিরে লুকোচুরি খেলা কোথায় খেলিছ হায়?

সুধু ছুটে মরি ধরিতে তোমারে বসনে আবৃত আঁখি?
একি খেলা তুমি জুড়ে দিলে রাজা আঁখির বাহিরে থাকি!
নিবিড় আঁধারে ঘুরে ঘুরে মরি আকুল দু'বাহু খুঁজে,
মানা করি তায়, তবু ছুটে যায়, বারণ মানেনা ভুজে।
আঁখি দুটি হায়! আঁধার সাগরে মজ্জিত জন প্রায়,
হেরি বিদ্যুদ্দাম ক্ষণ বিস্ফুরণ, পুলকে পাগল প্রায়,
ছুটে যায় তথা জানাতে তোমারে কতনা ব্যথার কথা
হে রাজা! তোমারে পায়না তথাপি যতনে খুঁজিয়া সেথা।
শ্রীরামকৃষ্ণ মানস নন্দন যশঃ মন্দার মরি,
গন্ধ বিলায়ে জগত ভুলায়ে আজিগে পড়িল ঝরি!
ধন্য গো সে ভূমি! হেন বন ফুল বক্ষে ফুটিল যা'র,
কক্ষে শোভিল যে, বন লতার ধন্য গো জনম তার।
মুক্ত বাতাসে গন্ধ যাহার ছুটিল বিশ্বময়,
অফুরন্ত তার সুরভি সম্ভার মন্দার সুরভিময়।
আজি তৃপ্তবিশ্ব দীপ্ত অবনী, তোমার সুষমা চুমি,
অতুলন তুমি জগত মাঝারে তোমারি তুলনা তুমি।
লভিলে সমাধি বেলুড় প্রাঙ্গনে জ্ঞানস্তিমিত আঁখি,
অবোধ আমরা পশ্চাতে পড়িয়া ডাকি গো তথাপি ডাকি
যদিও তোমার কর্ম্ম সরণী লম্বিত স্বরগ চুমি!
অবোধ পরাণ তবু কেঁদে ওঠে স্মরিয়া কোথা গো তুমি!
দীপ্তা ধরণী যদিও তোমার কীর্ত্তি জ্যোছনালোকে,
তৃপ্তা তবু নয় মানস বাহিনী আকুল তোমারি শোকে,
আজি, বিশ্বব্যোমে তুমি, চন্দ্র সূর্য্যে উজল তারকা পুঞ্জে,
বিশ্ব কোকিল গাহে তব গান ভকতি মালতি কুঞ্জে,
বিশ্ব বিভাসি সুরভি শোভায় কীর্ত্তি কলিকা মুঞ্জে,
জয় ব্রহ্মানন্দ অতুলানন্দ নিখিল অখিল ভুঞ্জে।

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

(কিয়দংশ)

আমেরিকা।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকাল।

প্রিয়—

আমাদের কোন সঙ্ঘ নাই—আমরা কোন সঙ্ঘ গড়তেও চাই না। আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি (সে পুরুষই হোক আর নারীই হোক) যা কিছু শিক্ষা দিতে, যা কিছু প্রচার করতে চায় তদ্বিষয়ে তার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে।

যদি তোমার ভিতরে ভাব থাকে, তবে অপর পাঁচজনকে তোমার দিকে আকৃষ্ট কর্‌বার কোন বাধাই হবে না। থিওসফিষ্টদের কার্য্য-প্রণালীর অনুসরণ আমরা কখনই করতে পারি না—তার সোজা কারণ এই যে, তারা একটী সঙ্ঘবদ্ধ সম্প্রদায়, আর আমরা তা নই।

আমার মূলমন্ত্র হচ্ছে—ব্যক্তিত্বের বিকাশ। এক একটী ব্যক্তিকে শিক্ষা দিয়ে গড়ে তোলা ছাড়া আমার অন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর নাই। আমি অতি অল্পই জানি—সেই অল্পস্বল্প যা জানি, তার কিছু চেপে না রেখেই আমি শিক্ষা দিয়ে যাই। যে বিষয়টা জানিনা, সেটা স্পষ্ট স্বীকারই করি যে উহা—আমার জানা নাই আর থিওসফিষ্ট, খ্রীষ্টিয়ান, মুসলমান বা জগতের অপর যার কাছ থেকেই হোক, লোক কিছুই সাহায্য পাচ্ছে জান্‌লে আমার এত আনন্দ হয় তা কি বোলবো। আমি ত একজন সন্ন্যাসী—সুতরাং এ জগতে আমি ত কারও গুরু বা প্রভু নই, আমি ত সকলেরই দাস। যদি লোকে আমায় ভালবাসে বাসুক তাদের খুসি, ঘৃণা করে করুক—তাদের খুসি।

প্রত্যেককেই নিজের উদ্ধারসাধন নিজেকেই করতে হবে—প্রত্যেককেই নিজের কায নিজে কর্‌তে হবে। আমি কারও সাহায্য খুঁজিনা, কেউ

সাহায্য কর্‌তে এলে ত্যাগও করিব না, আর জগতে কেউ আমার সাহায্য করুক, এ দাবি কর্‌বারও আমার অধিকার নাই। যে কেউ আমার সাহায্য করেছে বা কর্‌বে, সে আমার প্রতি তার দয়া, উহাতে আমার দাবিদাওয়া কিছু নাই, সুতরাং উহার জন্য তার কাছে আমি চিরকালের জন্য কৃতজ্ঞ।

যখন আমি সন্ন্যাসী হ'লাম, তখন আমি বুঝে সুঝেই ঐ পথ নিয়েছিলাম, বুঝেছিলাম, শরীরটা—অনাহারে মরবে—তার জন্য আমায় প্রস্তুত থাকতে হবে। তাতে কি হয়েছে? আমি ত ভিখারী। আমার বন্ধুরা সব গরিব। আমি গরিবদের ভালবাসি। আমি দারিদ্র্যকে সাদরে বরণ করে নিই। কখনও কখনও যে আমার উপবাস করে কাটাতে হয়, তাতে আমি খুসী। আমি কারও সাহায্য চাই না—তাতে ফল কি? সত্য নিজের প্রচার নিজেই কর্‌বে, আমার সাহায্যের অভাবে সত্য নষ্ট হয়ে যাবে না।

শ্রীভগবান্ গীতায় বলেছেন,

"সুখদুঃখ সমে কৃত্বালাভালাভৌ জয়াজয়ৌ—
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব.........

সুখদুঃখ, লাভ অলাভ, জয় অজয় সব সমান করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

এইরূপ অনন্ত ভালবাসা, সর্ব্বাবস্থায় এইরূপ অবিচলিত সাম্যভাব থাকলে এবং ঈর্ষ্যা দ্বেষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হলে তবে কায হয়। তাতেই কেবল কায হয়, আর কিছুতেই হয় না।

* * * *

অস্পৃশ্যতা।

(শ্রীসুব্রহ্মণ্য।)

মাতঙ্গ চণ্ডালের ঘরের ছেলে—ইহাই হইল তাহার গুরু-অপরাধ। বিধির বজ্রবিধান তাহার নগণ্য-ক্ষুদ্র-জীবনে বড় বিড়ম্বনা আনিয়াছে। সে ছিল মূঢ়—অজ্ঞান, আর সর্ব্বোপরি, একান্ত হতভাগ্য। জানে নাই, যে তাহার ন্যায় নীচ জাতিকে সমাজের শীর্ষস্থানীয় উচ্চবংশীয় ভাগ্য-বিধাতৃবৃন্দ পশু অপেক্ষাও হীন বলিয়া সর্ব্বসমক্ষে প্রচার করিয়াছেন। বলিয়াছেন—তাহারা, চিরদিনের মত ঘৃণ্য, অবজ্ঞাত, নিষ্পেষিত, অস্পৃশ্য দাসজীবনের উপযুক্ত। তাহারাও গললগ্নীকৃতবাসে কৃতাঞ্জলি হইয়া—"তথাস্তু, আমরা যথেষ্ট পেয়েছি! বিশেষ বাধিত হ'লাম"— বলিয়া উহা স্বীকার করিয়া লইয়াছে। কিন্তু অসহ্য জ্বালায় দহিতে দহিতে পরস্পরের ভিতর মর্ম্মবেদনায় গুমরিয়া বলিয়া উঠিয়াছে—"কি করিব, ক্ষমতা নাই,—এ যে ভগবানের মার!"

মাতঙ্গ আপনার কাজে পথে বাহির হইয়াছিল। এমন সময়, তাহার বড় দুর্ভাগ্য,—নগরের বিখ্যাত ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠিকন্যা দৃষ্টমঙ্গলিকা উদ্যানকেলির পথে রাস্তার উপর, সেই অস্পৃশ্য যুবাকে দেখিয়াই সচকিতা ও সন্ত্রস্তা হইলেন! এ যে দারুণ বিপদ! কোন্ বৈরী মাথার উপর বজ্রপাত করিল? চণ্ডালের মুখচ্ছায়া অপেক্ষা আর কলুষদৃশ্য কি হইতে পারে? শ্রেষ্ঠিনন্দিনী গন্ধোদক দিয়া চক্ষু ধুইয়া, মূর্চ্ছিতার কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন—'সত্বর ফিরাও রথ, যাব আমি পিতার সদন।' কেলি করা হইল না।

কথায় আছে, সূর্য্যের অপেক্ষা বালির তাপ বেশী। ঐশ্বর্য্যলোলুপ চাটুকার অনুচরবৃন্দ যুবাকে নির্ম্মম প্রহারের পর, পথের উপর নিঃসংজ্ঞ অবস্থায় ফেলিয়া গেল—অপরাধ তার অপরিমেয়, জন্মই যে একটা প্রকাণ্ড বিড়ম্বনা।

অনেকক্ষণ পর চেতনা আসিল, চকিত চক্ষে চণ্ডাল চারিদিকে

চাহিয়া দেখিল। রাজপথে অসাড়, অসহায় মৃতদেহের ন্যায় সে পড়িয়া আছে। মাথার চুল হইতে পায়ের নখাগ্র পর্য্যন্ত সর্ব্ব-অঙ্গ তাহার ব্যথায় ভরা। কোন্ দয়াল দেবতার মোহন করস্পর্শে আবার জীবন মিলিল?

* * *

উপরি-চিত্রিত আলেখ্য জাতকের কালে পূর্ব্বভারতের সামাজিক অবস্থার পরিচয় দিতেছে। ইহা খুব সম্ভব খৃষ্টপূর্ব্ব সপ্তমশতাব্দীর কথা।

সেই সুদূর প্রাচীন যুগ হইতে বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীর জ্ঞানবিজ্ঞানালোকিত কাল পর্য্যন্ত, হিমবন্ত হইতে কুমারিকা—ভারতের সর্ব্বত্র, অস্পৃশ্য-জাতিকুলের বুকভাঙ্গা বেদনায় মর্ম্মন্তুদ, বিরাম-বিহীন রোদন কখন উচ্চ কখন বা নিম্নগ্রামে শুনা যাইতেছে। ইহার সোম্ কোথায়? বারিধির ন্যায় বিশাল, বিস্তৃত, বিরাট বুদ্ধবক্ষে একদিন সমবেদনার অমৃতধারা উচ্ছ্বসিত হইয়া ভারতবাসীকে প্রেমপথের সন্ধান দিয়াছিল, কিন্তু তাহাও অধিককাল স্মরণে রহিল না।

তাহার পর যুগে যুগে অনেক প্রেমিক গোরার জাগরণের স্পন্দন ভারত-গগনে ধ্বনিত ও শ্রুত হইয়াছিল, কিন্তু মহামন্ত্র ত' কাণের ভিতর দিয়া মর্ম্ম স্পর্শ করে নাই—তাই প্রাণও আকুল হইল না। বারবার আঘাত ব্যর্থ হইয়াছে।

এ বিষয়ে উত্তর-দক্ষিণে বেশ পার্থক্য দেখিতেছি। উত্তর ভারত ঐতিহাসিকযুগে চিরদিনই বিভিন্ন জাতির মিলন ক্ষেত্র। পার্শি, যবন, চীনা, শক, হূণ, কুশান, আরব, পাঠানব, মুঘল ইত্যাদি সকল বাহিরের জাতিই, ভিন্ন ভিন্ন স্রোত-ধারার ন্যায় ভারতে আসিয়াছে—অনেকে বসবাস, আদান-প্রদান, বিবাহাদি পর্য্যন্ত করিয়াছে। ইহারই জন্য বোধ হয়, অস্পৃশ্যতার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ উত্তরে অনেকটা কম। তথায় স্থান না পাইয়া উগ্র অবশেষে দাক্ষিণাত্যের মুক্তহস্তে মৃত্যুপাশ পরাইয়া দিয়া তাহার অপূর্ব্ব মুখশ্রী কলঙ্ককালিমায় কলুষিত করিল। দানবের পৈশাচিক আনন্দের সীমা রহিল না! তাই সেখানে পারিয়ার স্পর্শে ভূমি পর্য্যন্ত অশুদ্ধ হয়, তাহাকে নগরে আসিতে হইলে দূর হইতে তারস্বরে চীৎকার করিয়া সকলকে সাবধান করিয়া দিতে হয়—ওগো!

তোমরা কে কোথায় আছ, সরিয়া দাঁড়াও—আমি প্যারিয়া, আমার স্পর্শ দূষিত, আমার শ্বাস বিষময়, আমার দর্শন—আরও ভয়ঙ্কর—তোমাদের সকল অশুভের উৎস।

ভারতের সামাজিক সমস্যাগুলি আজ বড় জটিল বলিতে হইবে। আলোচনা বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া শীঘ্র সমাধান না করিলেও নয়। অস্পৃশ্যতা ও বর্ণাশ্রমগত জাতিবিচার পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্বদ্ধ হইলেও দুইটী পৃথক্ পৃথক্ সমস্যার আকার লইয়াছে। প্রথমটী দ্বিতীয় হইতে উদ্ভূত হইয়াও স্বতন্ত্র আকার ধারণ করিয়া অসংখ্য অমঙ্গলের আকর হইয়াছে। ইহার আশু সমাধান একান্ত প্রয়োজন।

ভগবানের রাজ্যে অস্পৃশ্য ত' কেহই নহে। যাহাদিগকে আমরা ঐ আখ্যা দিয়া আসিতেছি তাঁহারা ত' সকলেই আমাদের ভ্রাতৃপদবাচ্য। সুতরাং পরস্পরের বিচ্ছেদ গৃহবিবাদ ছাড়া আর কিছুই নহে। প্রেমের সূত্রে সকলে একত্র গ্রথিত না হইলে সংহতিশক্তি কোথা হইতে আসিবে? জন্মগত জাতিবিচার ভাল কি মন্দ, উহা রাখিব কি বিনাশ করিব সে বিচার পরে আসিবে। প্রথম আবশ্যক—এই অস্পৃশ্যতারূপ দুষ্টব্রণ সমাজশরীর হইতে সম্পূর্ণভাবে বিতাড়িত করা। ঘৃণা অবলম্বন করিয়া প্রাচী-প্রতীচীর কোন জাতিই ত' বড় হয় নাই—বরং উহা সর্ব্বক্ষেত্রে পতনের সূচনা দিয়াছে।

গুণগত বৈষম্য ও বৃত্তির বিভিন্নতা চিরদিন থাকিবেই। শাস্ত্রের উপদেশ—মানুষকে নারায়ণ জ্ঞান করিয়া পূজা কর। তাহা যদি নাই পারিলাম, তবে তাঁহাকে নীচ পশু না ভাবিয়া, অন্ততঃ মানুষ বলিয়াও যেটুকু শ্রদ্ধাসমাদর করা দরকার—তাহারই জন্য আজ চণ্ডাল-পারিয়ার আহ্বান-বাণী,—না—বিনম্র-মিনতি। তাহা ছাড়া, জাতি-বিচার ত' অনেকদিনই রহিয়াছে; কিন্তু শুনা যায় পূর্ব্বে বর্ণাশ্রমীরাও সামাজিক বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে, বিভিন্ন স্থানে, শূদ্র-চণ্ডাল, জেলে-মালা, কুমোর-মেথর, মুচি-তাঁতিকে যোগদান করিতে দিতেন। গ্রামে যাত্রা-বারওয়ারীতলায় এক আসনে না হইলেও পৃথক্‌ভাবে, কিন্তু একই আসরের চন্দ্রাতপতলে তাহাদের স্থান দিতেন,—তাহাদের উপস্থিতিতে

বায়ু দূষিত-কলুষিত বিবেচিত হইত না। দেবমন্দির-দর্শনে সকলের সমান অধিকার দেখা যাইত। আর তাহা ছাড়া ধনী ব্রাহ্মণের গৃহেও পালপার্ব্বণপূজায় নীচজাতিদিগের ভূরিভোজন মিলিত, আদর আপ্যায়নও যথেষ্ট ছিল। তাহারাও বিনিময়ে কাজকর্ম্মে যথেষ্ট সহায়তা করিত—পরিশ্রমে কাতর তাহারা ত' কোনদিনই নহে। দাক্ষিণাত্যের অস্পৃশ্য পেষণকারী ব্রাহ্মণকুল বা হিন্দুস্থানের হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হটকারী উচ্চবর্ণের উদ্ধতব্যক্তিগণ ইহা হইতে শিখিবার কি কিছুই পাইবেন না? চেতনার চিহ্ন কোথা?

আজ কালবিপর্য্যয়ে আমরা ধাপে ধাপে অবনতির কত নিম্নস্তরে নামিয়া আসিয়াছি! ভাবিলে আত্মানুশোচনায় হৃদয় ভরিয়া উঠে,—জাতির ভাগ্যকে ধিক্কার দিতে হয়। মৈত্রী-মুদিতা মুখরিত ভারতের শান্তরসাস্পদ তপোবনে আজ ঘৃণা-অবজ্ঞার বীভৎস বিকটস্বরে দিঙ্মণ্ডল শিহরিয়া উঠিতেছে। হে, আভিজাত্যাভিমানি, বংশগৌরবদীপ্ত সর্ব্বগুণহীন বর্ণাশ্রমী, আজ তুমি আত্মসম্মানের জন্য লোলুপ হইয়া সকল সুনীতি পদদলিত করিতেছ, আর লজ্জাবতীলতার ন্যায় 'ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না মোরে' বলিয়া অস্পৃশ্যজাতিদিগের দৈন্যময় জীবন আরও শতগুণ ধিক্কৃত করিতেছ। ইহা ত' তোমার পূর্ব্বপুরুষের রীতি কোনদিন ছিল না। অস্পৃশ্যজাতির মানুষকে ত' আজ তোমা-অপেক্ষা বীর্য্যে বড়, কর্ম্মক্ষমতায় বড়, সাহসে বড়, সহ্যে বড়, সত্যে বড়, বিশ্বাসে বড় ও একতায় বড় দেখিতেছি; আর সুযোগ-সুবিধার ভাগ তাহাদিগকে দিলে তাহারা বিদ্যাবুদ্ধিতেও বড় হইতে পারে, এ আশা খুবই আছে। এখনি, মোড় না ফিরিলে ভবিষ্যত ভারত বুঝি বা একমাত্র তাহাদেরই হইবে, আর তোমরা অস্পৃশ্যদিগের প্রতাপেই হাওয়ায় অদৃশ্য হইয়া যাইবে।

দেবতার নিকট সকলে সমান। ব্রাহ্মণ-শূদ্র, উচ্চনীচ ভেদাভেদ সেথায় নাই। তাই ভারতের চারিধামের শ্রেষ্ঠতীর্থ জগন্নাথমন্দিরে ব্রাহ্মণ শূদ্রের ছোঁয়া খাইতে কোনরূপ কুণ্ঠাবোধ করেন না, সে যে মহা-প্রসাদ! জগন্নাথ সেই জন্যই বোধ হয়, শ্রীক্ষেত্র—সেখানে শান্তি,

সেখানে সুখ, সেখানে শ্রী, আর সেইখানেই মঙ্গল। একমাত্র ধনী ও উচ্চজাতির ত' তিনি নহেন—তিনি যে জগতের নাথ। আর আজ তিনি বিশেষ করিয়া পারিয়ার, চণ্ডালের, অনাথের, আর্ত্তের, তাপিতের, পতিতের ভগবান। বৌদ্ধপ্রভাবেই হউক, আর সনাতন হিন্দুধর্ম্মের অন্তরস্থ একতার শক্তিকেন্দ্রের মাহাত্ম্যেই হউক, ভবিষ্যত ভারতের আশার আলোক, পথের ইঙ্গিত, উন্নতির বাণী ঐস্থানেই মিলিবে। ভারতের জাগরিত গণ-চৈতন্তের ভাবশ্রীক্ষেত্র ঐ ছাঁচেই প্রস্তুত করিতে হইবে। শুধু দেবমন্দির হইতে নহে—বিদ্যাপীঠ, আমোদ-উৎসব-প্রাঙ্গণ, পঞ্চায়েত—সকল স্থান হইতেই অস্পৃশ্যতা দূর করিতে হইবে। অস্পৃশ্যজাতিদের অন্ন, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, স্বাচ্ছন্দ্য—এই সমস্তেরই সমান অধিকার।

আজ ভারতের অতি নগণ্য নগরী ও নিরালা পল্লী হইতে কাতারে কাতারে যাত্রীর দল দেবদর্শনলালসায় জগন্নাথের পাদপ্রান্তে উপস্থিত হইতেছেন। রথযাত্রার উৎসব-আনন্দ কি কেবল নিরর্থক জয়গান ও কোলাহলে পর্য্যবসিত হইবে? শূদ্র চণ্ডাল পারিয়াকে কয়েকদিন মাত্র সহানুভূতির সামান্য আস্বাদ দিয়াই কি ব্রাহ্মণ ক্ষান্ত হইবেন? চতুর্দ্দিক হইতে সকল সন্তানের একত্র-সমাবেশ হইয়াছে। হে সারথি! জাতির জীবন-রথ আজ তুমি মিলনের মঙ্গলমধ্যে লইয়া চল—আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের হিংসা-বিদ্বেষ, ঘৃণা-অবজ্ঞা নিশ্চিহ্ন করিয়া মুছিয়া ফেল। পারিয়া-চণ্ডালের ভিতর জগন্নাথেরে জীবন্ত মূর্ত্তি দেখাইয়া আমাদের নয়ন মন সার্থক কর! পাঁচ কোটীর উপর মাতৃসন্তান আর কতকাল অবজ্ঞাত রহিবেন?

দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, ব্রাহ্মণ-শূদ্রে একত্র আহার ঢের পরের কথা। কিন্তু চণ্ডাল দেখিলে অশুদ্ধ হইবেন—চণ্ডাল ঘৃণ্য, অস্পৃশ্য, এ বোধ বিদূরিত করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। একজন পরিচিত ব্যক্তির মানসিক বিকার দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। তদপেক্ষা শতগুণে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সুস্থ-সবল,—বোধ করি, আরও বেশী বুদ্ধিমান, পর পর তিনজন চণ্ডাল তাঁহাকে স্পর্শ করাতে তাঁহার ধর্ম্ম রসাতলে গেল। একদিনে তিনবার স্নান করিয়া শুদ্ধ হইলেন। মনে মনে বলিলাম,—ভায়া, গায়ের

চামড়া সাফ করিলে কি হইবে, তোমার মনের নিভৃতকোঠায় সঞ্চিত কতকালের ঘৃণা-অবজ্ঞার পুঞ্জীভূত পঙ্কিলরাজি ধুইয়া ফেলিয়া প্রেম-জাহ্নবীর জলে স্নান করিতে পারিলে তবেই শুদ্ধ হইবে—সেই তোমার শ্রেষ্ঠ শুচিস্নান, অন্য উপায় নাই।

বিগত ২৭শে পৌষ কামরূপ জেলার হাজো নামক স্থানের শিবমন্দিরে জনকয়েক নমঃশূদ্র দেবদর্শনের অনুমতি চায়। তাহারা জগমোহন হইতেই ঐ কার্য্য সম্পাদন করিবে বলিয়াছিল। সেবায়েতগণ বাধা দিলে তাহারা জোর করিয়াই জগমোহনের পৈঠায় প্রবেশ করে। মোহন্ত মহাশয় তাহার পর পঞ্চায়েতী বিচারে স্থির করেন যে, নমঃশূদ্রেরা অধুনা বীভৎস অসহযোগ নীতি প্রচারের ফলে নববলে বলীয়ান হইয়া ঐরূপ দুঃসাহসিক কার্য্য করিয়াছিল, বাস্তবিকই তাহাদের জগমোহন হইতেও দেবদর্শনের অধিকার নাই, থাকা উচিতও নহে। ইহার ফলে আবার ৩০শে তারিখে উহারা বিশেষ রুষ্ট ও উত্তেজিত হইয়া সদলবলে বলপ্রয়োগে আপনাদের অধিকার সপ্রমাণ করিতে ছুটিয়াছিল। ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া উহারা শেষে ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেবতারও অমর্য্যাদা করিতে কুণ্ঠাবোধ করে নাই,—নৈবেদ্য, ফলমূলাদি ধূলায় ছড়াইয়া দিয়াছিল। ইহা কোনমতেই সুষ্ঠু হয় নাই। তাহার পরও আবার লাঠি, বর্শা প্রভৃতি প্রহরণ লইয়া ২৬ জন নমঃশূদ্র মন্দির আক্রমণে যায়—পুলিশের বাধা পাইয়া শেষে ফিরিয়া আসে। দায়রার বিচারে তাহারা অভিযুক্ত হয়। অবশেষে সর্ব্বোচ্চ রাজদরবার হাইকোর্ট পর্য্যন্ত দুইদলের মামলা গড়াইয়াছে। অবশ্য, উত্তেজনা-জনিত বলপ্রয়োগ নমঃশূদ্রদিগের পক্ষে ভাল হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।

মামলাটী সমাজ-শরীরের ব্যাধি কোথায়, তাহা বেশ নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে। ভাবিবার কথা যথেষ্ট। এই বল প্রয়োগের পিছনে কতদিনের সঞ্চিত অনুতাপ, আত্মগ্লানি ও আত্মানুশোচনা লুকায়িত রহিয়াছে তাহা নির্দ্ধারিত করিয়া প্রকৃত দোষী কে, দেশ তাহা বিচার করুন। বিবেক-বিচারালয়ের আইন কি বলিবে? কামাখ্যার মন্দিরের জনৈক সেবায়েত

এখানে মুক্তকণ্ঠে কহিয়াছেন যে সেখানে এরূপ অস্পৃশ্যতার বিচার নাই—সকলেই মাতৃ-দর্শনের সম-অধিকারী।

উচ্চজাতির জোরজুলুমে নিষ্পেষিত হইয়া আজ স্থানে স্থানে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ অস্পৃশ্যদিগের এই প্রকার আচরণ অবশ্যম্ভাবী। সবই হইল—অস্পৃশ্য-লাঞ্ছনার আর বেশী বাকি নাই। ইহার পর যেদিন শুনিব, উচ্চবর্ণেরা তাঁহাদের অর্থেই নির্ম্মিত গঙ্গাস্নানের ঘাটগুলি একচেটিয়া করিয়া লইয়াছেন, আর অস্পৃশ্যজাতিদিগকে ব্যবহার করিতে দিবেন না বলায়, দুইদলে লাঠালাঠি এবং তাহার ফলে পুলিশকেস পর্য্যন্ত হইয়াছে—সেই দিনই জাতির দুর্দ্দশা ষোলকলার উপর সতের কলায় পূর্ণ হইবে।

অধোগতির আর বাকি কি? দেশীয় আভিজাত্যের অত্যাচার, যথেচ্ছাচারিতা ও চণ্ডনীতির ন্যায় মহাপাপ আর কি হইতে পারে? ইহার পরিণাম ভীষণ প্রায়শ্চিত্তে সমাপন।

আশা তথাপি ছাড়ি নাই। উচ্চজাতির হস্তে উদ্ধারের বীজমন্ত্র রহিয়াছে। তাঁহাদিগকে আজ কল্যাণের পথে মোড় ফিরিতে হইবে। অস্পৃশ্যতা সর্ব্ব-উন্নতির পরিপন্থী। এই মুহূর্ত্তেই উহা ত্যজ্য। আচণ্ডালে ভ্রাতৃবোধে প্রেমের—মিলনের আলিঙ্গন আমরা কবে দিব?

বিচ্ছেদেই উচ্ছেদ, মিলনে কল্যাণ।

ন কন্যায়াঃ পিতা বিদ্বান্ গৃহ্ণীয়াচ্ছুল্কমণ্বপি।

গৃহ্ণন্ শুল্কং হি লোভেন স্যান্নরোঽপত্যবিক্রয়ী॥ মনু ॥৩॥৫১॥

বিদ্বান্ পিতা কন্যার নিমিত্ত কোনরূপ শুল্ক গ্রহণ করিবে না, যেহেতু লোভবশতঃ কন্যা-পণ গ্রহণ করিলে অপত্য বিক্রয় পাপে লিপ্ত হইতে হয়।

স্ত্রী ধনানি তু যে মোহাদুপজীবন্তি বান্ধবাঃ।

নারীয়ানানি বস্ত্রং বা তে পাপা যান্ত্যধোগতিম্॥ মনু ॥৩॥৫২॥

কন্যা-পণ গ্রহণের ন্যায় পতি, পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতি বন্ধুগণ যদি মোহবশতঃ দাসী অশ্বাদি যান ও বস্ত্রাদি স্ত্রীধন ভোগ করেন, তবে তাহারা পাপে লিপ্ত হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হয়।

ডাক।

(শ্রীসরোজকুমার সেন)

আঁধার রাতে বেড়াই খুঁজে

কোথায় আলো রেখা—

কেউ ছিল না পথের সাথী

চলেছিলাম একা।

হঠাৎ শুনি নয়ন জলে,—

ডাক্‌লে মোরে "আয়গো" বলে;

ঝরা পাতার মর্ম্মরতায়

চরণ ধ্বনি বাজে—

দখিণ বায়ে পরশ লাগে,

শিউরে উঠি লাজে।

ডাকলে কেন অমন করে

নাই'ত আয়োজন,

ভাব্‌চি বসে তাই'ত আজি

কিসের প্রয়োজন?

আঘাত পেয়ে সবার দ্বারে,

ভেবেছিলাম প্রাণের তারে,

তোমার গাথা করুণ সুরে

বাজ্‌বে না'ত আর;—

অবহেলায় অপরাধের

বাড়্‌বে শুধু ভার।

মোহন্ত

(শ্রীসাহাজি)

সেদিন মোহন্ত ভগবান দাস আসিয়াছিলেন। তাঁহার (দেব-বিগ্রহ) মদনমোহনের সেবা চলে না তাই কিছু ভিক্ষা লইবার জন্য তাঁহার এই আগমন। খবরের কাগজে পড়িয়াছিলাম, এবারকার উত্তর অঞ্চলের ভীষণ বন্যায় তিনি অর্থ ও ধান্য দিয়া দরিদ্রের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার মদনমোহনের বিশ ত্রিশ বিঘা জমি। সেই জমির "উৎপত্তি"তেই ঠাকুরের পূজা-পার্ব্বণাদি সুসম্পন্ন হয়, বরং বৎসর বৎসর কিছু কিছু সঞ্চয়ও হয়। মদনমোহনের নগদ টাকা কড়িও কিছু আছে। মোহন্তজী গ্রামের দরিদ্রদের সময়াসময়ে তাহা কর্জ্জও দিয়া থাকেন। তিনি অবশ্য সুদের প্রার্থী নহেন, তবে দেবতার টাকা ফাঁকি দিয়া খাইতে নাই, তাই আসল টাকা ফেরৎ দিবার সময়ে সকলেই সুদ বাবদ কিছু না কিছু দিয়া থাকে। যে সুদের টাকা নগদ দিতে না পারে, সেও দুইটা লাউ কুমড়া, শশা, এমনই একটা কিছু দিয়া দেবতার ঋণ শুধিয়া যায়। তবে দুই একটা টাকা যে 'বসিয়া' না যায়, এমনও নহে। মোহন্তজীর নিকট হইতে যে টাকা লয়, তাহার অবস্থা যে শোচনীয় তাহা বলাই বাহুল্য। যাহার কোথাও ঋণ পাইবার আশা নাই, সেই আসে তাঁহার নিকটে টাকা লইতে। সুতরাং যে বাঁচিয়া থাকে, তাহার টাকা "উসুল" হয়। কিন্তু যে মরিয়া যায়, তাহার টাকা আর পাওয়া যায় না। এইরূপে মদনমোহনের অনেক টাকা নষ্টও হয়। কিন্তু তথাপি তাঁহার মদনমোহনের নাম লইয়া যেই আসুক, তিনি তাহাকে বিমুখ করিতে পারেন না। সুতরাং এ হেন মোহন্তজী যখন আমার নিকটে ভিক্ষার্থী হইয়া আসিলেন, তখন আর আমার বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

—"একি, মোহন্তজী? আপনার মদনমোহন মহাজন, তিনি আজ ভিক্ষুক, এ যে বড় আশ্চর্য্যের কথা!"—

মোহন্ত হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ বাবা, মহাজন আজ খাইয়া দাইয়া দেউলিয়া হইয়াছেন!" এবারকার বন্যায় তাঁহার যে কি বিষমক্ষুধা! এক মোর্‌কা ধান, টাকাকড়ি শ্রীঅঙ্গের আভরণগুলো পর্য্যন্ত খাইয়া নিঃশেষ করিয়া দিলেন। বিরাট পুরুষের এমন সেবা জীবনে কখনো দেখি নাই।"—বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু দুইটি জলে ভরিয়া উঠিল।

আমি বলিলাম, "সেকি, মদনমোহনের অমন সম্পত্তিটা তিনদিনে নষ্ট করিয়া ফেলিলেন?"

মোহন্তজী 'থতমত' হইয়া, যেন বড় অন্যায় করিয়াছেন, এমনভাবে সঙ্কুচিত হইয়া অত্যন্ত দীনতার সঙ্গে বলিলেন, "কি করিব, বাবু? মদন-মোহন যে বিশ্বময়। তাঁহার সম্পত্তি তিনি যদি খাইয়া ফুরাইয়া ফেলেন, আমি কি করিব?"

গর্ব্ব নাই, দর্প নাই! এত মহৎ অথচ এত বিনীত! এমন মহৎ কায করিয়াও এত সঙ্কুচিত! আমি মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেই নিরক্ষর বাবাজীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। মনে হইল, মদনমোহন, তুমি মাটির পুতুল কি সত্যিকারের ঠাকুর, তাহা জানি না। তবে এই মোহন্ত যদি সত্য হয়, তবে তুমিও সত্য, সত্য, ত্রিসত্য!

বাবাজীকে কিছুই দিতে পারিলাম না। দেওয়ার অভিমান আছে যাহার, তাহার দেওয়ার শক্তি কোথায়? আমার এই অযোগ্য দানের দ্বারায় তাঁহার সেই গ্রহণের পবিত্র যোগ্যতার অবমাননা করিতে পারিলাম না। একবার মনে হইল, তাহা হইলে মদনমোহনের সেবার কি হইবে? কিন্তু পরক্ষণেই অন্তর ভরিয়া উঠিল—যিনি বিশ্বের অন্ন জুটাইয়া থাকেন, তাঁহাকে অন্ন দিবার আমি কে?—মদনমোহন মাটির ঠাকুর, মুহূর্ত্তের জন্য এ স্মৃতি আমার মন হইতে মুছিয়া গিয়াছিল।

দেশের কথা।

(ডাঃ হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, এম্-বি)

পল্লীগ্রাম।

(১)

পল্লীগ্রাম মাত্রেই আমাদের জাতীয় জীবনের কেন্দ্রস্থল ও অবলম্বন স্বরূপ ছিল। কিন্তু দুঃভাগ্যবশতঃ পাশ্চাত্য-অন্ধ-অনুকরণ ফলে পল্লীগ্রামগুলি প্রায়ই ধ্বংসমুখে পতিত হইতেছে এবং সেই অনুপাতে জাতীয় শক্তিরও ক্রমাবনতি হইতেছে। "দরিদ্রের পর্ণকুটীরে জাতীয় বাসস্থান" এই কথাটি আমরা ক্রমশঃ ভুলিয়া যাইতেছি। এই বাঙ্গালা দেশে গ্রামের সংখ্যা বোধ হয় বিশ হাজার বা ততোধিক কিন্তু সহর সংখ্যা বোধ হয় দুই শতের অধিক নয়। কাজেই শতকরা নব্বই জন লোক এখনও পর্য্যন্ত পল্লীতে বাস করে। সুতরাং দেশকে বুঝিতে হইলে, দেশের প্রকৃত অবস্থা জানিতে হইলে, সহরের বড় বড় প্রাসাদ বা মটর গাড়ীর মধ্য দিয়া নয় পরন্ত পল্লীগ্রামের মধ্য দিয়া। আধুনিক পল্লীগ্রামের দুঃখ-দারিদ্র্য দর্শন করিলে চখে জল আসে। যে সব গ্রামে আগে "বারমাসে তের পার্ব্বণ" হইত, যে সব গ্রাম পূর্ব্বে বহু সুস্থ সবলকায় বালক বৃদ্ধ এবং যুবকের সরল অনাবিল হাসি এবং আমোদে পূর্ণ থাকিত, এখন সেই সমস্ত গ্রাম শ্মশানবৎ স্তব্ধ। ৺শারদীয়া পূজার সময় আমাদের নিজের গ্রামে পূর্ব্বে যে প্রকার উৎসাহ এবং স্ফূর্ত্তি দেখিয়াছি আজ দশ বৎসরের মধ্যেই তাহার একি পরিবর্ত্তন!! প্রত্যেক পল্লীগ্রামে ভীষণ জলকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, ম্যালেরিয়া ও কলেরা প্রভৃতি মহামারী প্রতি বৎসর কত শত লোককে যে অকালে কালগ্রাসে পাতিত করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। গ্রামের অধিকাংশ লোকই নিরক্ষর এবং অনশনক্লিষ্ট। বিনা বাক্য ব্যয়ে এই সব অভাব-অভিযোগ সহিয়া অর্দ্ধমৃত অবস্থায় বাঁচিয়া রহিয়াছে। পল্লী-

বাসীদের দুর্ভিক্ষপীড়িত বদন, প্লীহা-যকৃতপূর্ণ স্ফীতোদর, সদাই ম্রিয়মান মুখমণ্ডল দেখিলে হৃদয় হতাশে আচ্ছন্ন হয়। সমস্ত গ্রাম ভীষণ জঙ্গলে পরিপূর্ণ—শৃগাল ও ব্যাঘ্র প্রভৃতির আবাস ভূমি হইয়াছে।

কারণ এবং উপায়।

এতদিন আমরা সহরে সহরে সভাসমিতি করিয়া এবং সাবকাশ মত দুই একটী ওজস্বী বক্তৃতা দিয়া ভাবিতাম যে, দেশ উদ্ধারের পথ প্রশস্ত করিতেছি। কিন্তু "দেশ" অর্থে যে পল্লীগ্রাম তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। সুখের বিষয় আমরা এখন বুঝিতে পারিতেছি যে, কর্ম্মই প্রথম প্রয়োজক—বাক্য নয়—এবং এই কর্ম্মের প্রারম্ভস্থল পল্লীগ্রামই হওয়া উচিত। বৃক্ষকে বাঁচাইতে হইলে তাহার গোড়ায় জল দিতে হয়, আগায় নয়। নিজেদের জাতীয়ত্ব বজায় রাখিতে হইলে জাতিকে সবল এবং সুস্থ রাখিতে হইলে পল্লীগ্রামবাসীদের যাহাতে দৈহিক নৈতিক এবং আর্থিক উন্নতি হয় তাহা সর্ব্বাগ্রে করা উচিত। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে বেশ প্রতীয়মান হইবে যে, পল্লীগ্রামের এই ক্রমাবনতির প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ কারণ জমীদারবর্গ এবং অপরাপর ধনী এবং মধ্যবিত্তদের নিজ নিজ ভদ্রাসন ত্যাগ। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই সব ধনীলোকেরা সহরের শ্রীবৃদ্ধির জন্য অনেক সময় অনেক প্রকারে অর্থ ব্যয় করেন, কিন্তু নিজ নিজ পৈতৃক বাসস্থানের উন্নতির দিকে, নিজ নিজ প্রজাদের মঙ্গলামঙ্গলের জন্য মোটেই দৃষ্টিপাত করেন না; অথচ ভুলিয়া যান যে এই সব দরিদ্র প্রজাদের দত্ত অর্থেই তাঁহাদের সহরে বাস করা চলিতেছে। আরও দুঃখের বিষয়, তাঁহারা নানা-প্রকার ভোগ-বিলাসে ঐ সব অর্থ বৃথানষ্ট করিতেছেন, অথচ এই সব জমীদারবর্গের পূর্ব্ব পুরুষেরা প্রজাদের নিজ নিজ সন্তান সন্ততির ন্যায় দেখিতেন। জমীদার ও প্রজার মধ্যে সম্বন্ধ তখন কেবল মাত্র "অর্থ বা দেনা-পাওনা নীতি" সম্বন্ধ ছিল না।

ধনীরা পল্লীগ্রামে বাস করিলেই দেশের এবং জনসাধারণের উপকার হয়, কারণ—নিজেদের সুবিধার জন্য তাঁহাদের পুষ্করিণী খনন,

বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি সৎকর্ম্ম—অনিচ্ছাসত্ত্বেও করিতে হয়। তাই শিক্ষিত ধনী এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় গ্রাম পরিত্যাগ করায় পল্লীগ্রামবাসীরা আদর্শ হারাইতেছে। ফলে গ্রামে গ্রামে দলাদলি পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি ব্যাধি আরম্ভ হইয়াছে এবং তাহাদের নৈতিক অবনতিও সঙ্গে সঙ্গে হইতেছে। গ্রামে পূর্ব্বের ন্যায় পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি ও সমবেদনা আর নাই।

দারিদ্র্য ।

পল্লীগ্রামের দারিদ্র্য অবর্ণনীয়। কৃষককুল, শিল্পিসমাজ সমস্তই ঋণজালে আবদ্ধ হইয়া ক্রমেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে। কুটীর শিল্প যাহা এই ভারতের গৌরবস্থল ছিল তাহা একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যে ভারত এক সময় নিজ অভাব মোচন করিয়াও দূর দেশান্তরে নানা প্রকার পণ্য প্রেরণ করিয়া ভূরি ভূরি অর্থ সংগ্রহ করিত—সেই ভারত আজ কিনা তাহার লজ্জা নিবারণের জন্য পরমুখাপেক্ষী। গত যুদ্ধের সময় হইতে আমরা বিশেষ করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি যে ইচ্ছা করিলে পাশ্চাত্য জাতি সমূহ আমাদিগকে বিবস্ত্র করিয়াও রাখিতে পারে। কৃষি-কার্য্যের অবনতি, স্বাস্থ্যহীনতা প্রভৃতি সকলেরই মূল কারণ এই দারিদ্র্য।

এই ঘোর দারিদ্র্যের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে হইলে চাই একতা সমবেদনা এবং সহানুভূতি—ধনীর সহিত নির্ধনীর ও উচ্চের সহিত নীচের। কৃষক বা শিল্পিগণের অবস্থার অবনতি এত অধিক হইয়াছে যে তাহাদের দ্বারা একা কোন বৃহৎ কর্ম্ম হওয়া অসম্ভব—কাজেই সকলে মিলিয়া মিশিয়া পরস্পর পরস্পরের জন্য দায়ী হইয়া কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইলে, নিজেদের মধ্যে যৌথঋণ-দানমণ্ডলী অর্থাৎ ইংরাজীতে যাহাকে Co-operative Credit Society বলে তাহা গ্রামে গ্রামে স্থাপন করিতে হইবে। এই সব যৌথঋণদানমণ্ডলী স্থাপিত হইলে কৃষককুল এবং শিল্পিগণ মহাজনদের অন্যায় ও অপরিমিত সুদের

হাত হইতে অব্যাহতি পাইবে। এই সব যৌথমণ্ডলীর উপকারিতা এই যে, ইহাতে কৃষক এবং শিল্পিগণকে স্বাবলম্বন শিক্ষা দেয়। এই সব মহাজনেরা ইংরাজীতে যাহাকে বলে necessary evil। শুধু যৌথ-ঋণ-দানমণ্ডলী স্থাপন করিলে হইবে না, সঙ্গে সঙ্গে যৌথ-বিক্রয়-মণ্ডলীও স্থাপন করিতে হইবে। কারণ প্রায়ই দেখা যায় যে মহাজনেরা অতি যৎসামান্য মূল্যে কৃষক বা শিল্পিগণের নিকট হইতে দ্রব্য খরিদ করিয়া অনেক উচ্চতরহারে ঐ সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় করেন এবং তাহাতে বিশেষ লাভবান হন। ফলে ঐ সব কৃষক বা শিল্পিগণ চিরকালই দারিদ্র্যভার বহন করিয়া থাকে।

(ক) শিক্ষার অভাব বা অজ্ঞতাও এই দরিদ্রতার অন্যতম প্রধান কারণ। স্বাস্থ্য সম্বন্ধেই বল, কৃষি সম্বন্ধেই বল, আর শিল্প সম্বন্ধেই বল সব বিষয়ে এই অজ্ঞতা আমাদের পল্লীগ্রামের তথা বাঙ্গালাদেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা হেতু কতশত লোক যে প্রতিবৎসর অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখা যায়, জল ফুটাইয়া খাইলে (গরম করিয়া নহে) যে কলেরার হাত হইতে অনেক পরিমাণে রক্ষা পাওয়া যায়, এই সামান্য সাধারণ নিয়মও অনেক পল্লীগ্রামবাসীদিগের জানা নাই। প্রসূত ও প্রসূতিদিগকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিলে এবং গরম জলে ফুটান কাঁচি দিয়া নাড়ী কাটিলে যে "পেঁচোয়" পাওয়ার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায় ইহাও অনেক লোকের জানা নাই। বর্ষাকালে সপ্তাহে দুইবার করিয়া নিয়মিত ভাবে কুইনাইন খাইলে যে ম্যালেরিয়া জ্বর শীঘ্র আক্রমণ করিতে পারে না, ইহাও অনেকের নিকট আশ্চর্য্যের বিষয়। এ সম্বন্ধে "উদ্বোধন" পত্রিকায় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

(খ) কৃষিকার্য্য সম্বন্ধেও অজ্ঞতা ভীষণ। কৃষিকার্য্যে উন্নতি করিতে হইলে নূতন নূতন কৃষি যন্ত্রের ব্যবহার, এবং জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির জন্য বিজ্ঞান সম্মত সার সংগ্রহ প্রভৃতি জানা চাই। এই বাংলা দেশে এক সময় ১৲, ১৷৷৹ টাকা করিয়া চাউলের মণ ছিল আর আজ কিনা কত শত লোক অনশনে অনাহারে জীবন্মৃত প্রায় অবস্থান করিতেছে।

দুর্ভিক্ষের কারণ বিশেষভাবে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় এখানেও, অজ্ঞতা বিশেষভাবে দায়ী। আমরা আজ এত বড় মূর্খ যে, আমাদের অভাবের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া বহুল পরিমাণে খাদ্য শস্য বিদেশে রপ্তানি করিতেছি। আমাদের নিজেদের দোষে, আমাদের ভ্রাতা, ভগিনী সব "হা অন্ন," "হা অন্ন" করিয়া মরিতেছে আর সেই অন্ন আমরা পাঠাইতেছি বিদেশে তাহাদের ভোগ-বিলাস-লালসা চরিতার্থ করিবার জন্য। কারণ বিদেশে এই সব রপ্তানি চাউল কলার Stiff প্রভৃতি সখের জন্য ব্যবহৃত হয়। আরও বুঝি না যে খাদ্য শস্যের মূল্য বৃদ্ধির সহিত বস্ত্র প্রভৃতিরও মূল্য বৃদ্ধি হইবে। সুতরাং যে টাকা লাভ করিতেছি তাহা আবার কাপড় প্রভৃতি উচ্চ মূল্যে ক্রয়ের জন্য, ফলে লাভের ঘরে শূন্য পড়িল। আরও দেখা যাইতেছে, দেশে খাদ্য শস্যের উৎপত্তি ক্রমশঃই কমিয়া যাইতেছে।—পাটের চাষ অধিক হইতেছে। ইহাতেও নিজেদের সর্ব্বনাশ করিয়া পরের উপকার করা হইতেছে মাত্র।

এই অজ্ঞতা নিবারণের একমাত্র উপায় গ্রামে গ্রামে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন এবং দেশের জনসাধারণদের ক্রমশঃ শিক্ষা দান।

কলেরা বা ওলাউঠা

(৩)

এই ব্যাধির প্রাদুর্ভাব আমাদের দেশে বহুদিন হইতে দেখা যায় এবং প্রত্যেক বৎসর কত শত লোক যে ইহাতে অকালে কালগ্রাসে পতিত হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। এই বঙ্গদেশে এক ম্যালেরিয়া ছাড়া এতদিন ধরিয়া এত প্রাণনাশ অন্য কোন রোগ করে কিনা সন্দেহ। এক এক সময় দেখা যায় যে গ্রামের পর গ্রাম এই রোগ জনশূন্য করিয়া দিতেছে। অথচ চেষ্টা করিলে এবং কিকি কারণে এইরোগ সাধারণের মধ্যে এত শীঘ্র ছড়াইয়া পড়ে, জানা থাকিলে ইহা একেবারে দেশ হইতে বিদূরিত করা যাইতে পারে। ইউরোপই ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই রোগ সম্বন্ধে অজ্ঞতা এখনও বহুল পরিমাণে আমাদের

মধ্যে বর্ত্তমান আছে বিশেষতঃ পল্লীগ্রামে নিজ চক্ষে দেখিয়াছি, কলেরা-মলদুষিত বস্ত্রাদি পানীয় জল, যে পুষ্করিণী বা নদী হইতে লওয়া হয়; সেই ঘাটেই কাচা হইতেছে। প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে আমি কলেরা-ক্রান্ত প্রায় ২০।২৫ খানি গ্রামে তাহাদের উপদেশ ও চিকিৎসার জন্য ঘুরিয়াছিলাম। জল ফুটাইয়া খাইলেই যে এতবড় রোগের হাত হইতে অনেক পরিমাণে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় ইহাও ঐ গ্রামের লোকেরা জানিত না; কিন্তু প্রত্যেক গ্রামেই গ্রামবাসীরা প্রায় ৫০।৬০৲ টাকা করিয়া ভণ্ডসাধুদের জন্য খরচ করিতেছিল এবং উহারা গ্রামবাসীদের বুঝাইতেছিল যে গ্রাম "বাঁধিলেই" রোগ পলাইয়া যাইবে। পল্লীগ্রামে ভীষণ জল কষ্টও ইহার অন্যতম কারণ, এই গভীর অজ্ঞানতার জন্য দায়ী কে? দায়ী আমরা, যাঁহারা পল্লীগ্রাম হইতে ১০০ মাইল দূরে অবস্থিত থাকিয়া 'আমি তাহাদেরই নেতা' বলিয়া পরিচয় দিতে ব্যস্ত। দায়ী ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটী। তাঁহাদের দৃষ্টি আমি বিশেষ ভাবে এই বিষয়ে আকর্ষণ করিতে চাই। তাঁহারা যে Sanitary Inspector এবং Health officer রাখিয়াছেন তাঁহারা যদি শুধু পল্লী হইতে পল্লীতে গিয়া লোকজনদের স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ নিয়মগুলি শিক্ষা দেন, বিশেষতঃ ম্যজিকলণ্ঠন প্রভৃতির সাহায্যে, তাহা হইলে বোধ হয় গরীব পল্লীবাসীদের ট্যাক্সের কিছু প্রতিদান দেওয়া হয়। তবে এই Sanitary ও H. O. প্রভৃতিদের প্রতি সবিনয়ে নিবেদন, যেন তাঁহারা এই সব নিরক্ষর লোকদের আপনার মত ভাবিয়া তাহাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া শিক্ষা দেন। অর্থাৎ Official কায়দা তাঁহাদের ছাড়িতে হইবে—চাষীর সঙ্গে চাষী হইতে হইবে।

কারণ।

ইহাও এক প্রকার জীবাণু সমুদ্ভূত রোগ। "," কমার মত দেখিতে বলিয়া ইহাকে কমা ব্যাসিলাস বলে। অনুবীক্ষণ সাহায্যে ইহাদের বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। কলেরা রোগের মল ও বমন এই ব্যাসিলাসে পরিপূর্ণ। এইসব জীবাণু কলেরাবীজ দুষিত জলে (পল্লীগ্রামে ইহাই প্রধান কারণ) বা ঐ দূষিত জল ধৌতপাত্র প্রভৃতিতে রাখার দরুণ

দুগ্ধাদি খাদ্য প্রভৃতিতে বহুল পরিমাণে দেখা যায়। পুষ্করিণী, কূপ, নদী প্রভৃতিতে কলেরা মল নিক্ষেপ করিলে বা কলেরা দূষিত বস্ত্রাদি ধৌত করিলে জল দূষিত হয়।

যে মাছি কলেরার মল বা বমনে বসে তাহার ভিতরেও এই জীবাণু অনেক পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহারাই আবার খাদ্যদ্রব্যাদিতে বসিয়া উহাতে ঐ সব জীবাণু বমন করিয়া দেয়। ফলে ঐ সব খাদ্যদ্রব্যাদি কলেরা বীজে দূষিত হইয়া পড়ে।

উল্লিখিত যে কোন উপায়ে হউক এই সব জীবাণু আমাদের পাকাশয়ে প্রবেশ করে এবং সুবিধা হইলেই ইহাদের বংশ অন্ত্রের মধ্যে ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

নিবারণের উপায়।

যে কোন পল্লীগ্রাম (যেখানে কলেরা হইতেছে), গিয়া কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রথম একটী রোগী কোন মেলা বা অন্য দূরস্থান হইতে এই রোগ লইয়া সেই গ্রামে আসে; মূর্খতাবশতঃ সেই কলেরা মল-দূষিত বস্ত্রাদি পুষ্করিণী বা নদীতে কাচে; এদিকেএই পুষ্করিণী বা নদা হইতে গ্রামের প্রায় সমস্ত লোকই পানীয় জল লইয়া যায়; ফলে ঐ কলেরা বীজ-দূষিত জল সকলেই খাইতে আরম্ভ করায় ক্রমশঃ গ্রামময় প্রায় সকলেই এই রোগে আক্রান্ত হয়।

১। গ্রামে কলেরা আরম্ভ হইলেই জল কখনও না ফুটাইয়া (মাত্র গরম নয়) খাইবে না। দুইবার ফুটাইলেই ভাল হয়। একবার ফুটাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া আবার ফুটাইয়া লওয়া উচিত। তাহাতে এই জীবাণু-গুলির ডিম্বও নষ্ট হইয়া যায়।

২। কলেরাদূষিত জল বা বমন যাহাতে কোনও পুষ্করিণী বা নদীতে না পড়িতে পারে, তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রত্যেকেরই দেখা উচিত। মনে রাখা উচিত তুমি তোমার একার জন্য নয়, দশের সুবিধার এবং মঙ্গলের জন্য দায়ী। যেখানে দুই বা ততোধিক পুষ্করিণী থাকে সেখানে একটী শুধু পানীয় জলের জন্য আলাদা (Reserve) করিয়া রাখা উচিত

এবং এই পুষ্করিণীতে কাপড় কাচিতে বা পা ধুইতে দেওয়া উচিত নহে। এই সব বিষয়ে গ্রামের ধনিলোকদের উদাসীনতা খুবই বেশী। তাঁহাদের বুঝা উচিত, রোগ. গ্রামে প্রবেশ করিলে ধনী বা নির্ধন, বিদ্বান বা মূর্খ কাহাকেও বাদ দিবে না।

৩। কলেরা রোগীর মল-দূষিত বা বমন-দূষিত বস্ত্র-খণ্ডাদি তৎক্ষণাৎ পুড়াইয়া ফেলা উচিত। যদি মূল্যবান দ্রব্যাদি হয় তবে তাহা সাইলিন, কার্ব্বলিক বা অন্য কোন প্রকার 'কমা' বাজাণুনাশক লোশনে অন্ততঃ ৩ ঘণ্টা ডুবাইয়া রাখা উচিত এবং পরে কাচিয়া লইতে পারা যায়।

৪। যাঁহারা কলেরারোগীর শুশ্রূষা করেন তাঁহাদের খাইবার আগে হাত, পা বিশেষ ভাবে Pot. Permanganate লোশন দিয়া বার বার ধোওয়া উচিত। দুই একটী জীবাণুও হাতে লাগিয়া থাকিলে উহা পাকাশায়ে গিয়া অনর্থ বাধাইতে পারে। এমন কি কাপড় চোপড়ও কলেরা রোগীর ঘর হইতে বাহির হইয়া বদলান উচিত।

৫। কলেরা মলে বা বমনে মাছি কিছুতেই বসিতে দিবে না। সমস্ত খাবার দ্রব্যাদি ঢাকিয়া রাখিবে। এই সব ক্ষুদ্র প্রাণীরা জগতের যে কত অমঙ্গল করে তাহার ইয়ত্তা নাই, সাধারণতঃ দুর্গন্ধময়, যথা, পাইখানা, গোময় দুষিত প্রভৃতি স্থানেই ইহারা ডিম পাড়ে। ইহারা কলেরা মল ভক্ষণ করিয়া খাদ্য দ্রব্যাদিতে এই সব জীবাণু বমন করিয়া দেয়। কাজেই অন্যান্য লোক ঐ খাদ্য ভক্ষণ করিলে আক্রান্ত হয়।

৬। খালি পেটে কখনও জল খাইবে না এবং ভয় পাইবে না, কলেরার সময় বিশেষতঃ। পাকস্থলীর স্বাভাবিক রস অম্ল ও উহা কলেরার জীবাণু নাশক। খালি পেটে জল খাইলে বা অতিরিক্ত ভয় পাইলে পাকস্থলীর ঐ স্বাভাবিক রসের অম্লতা কমে। ফলে ঐ সময়ে যে সব জীবাণু পাকাশয়ে প্রবেশ করে উহা নষ্ট হয় না।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, জানি না কেন পল্লীগ্রামে ও পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি ক্রমশঃই কমিয়া যাইতেছে। এই সব Epedemicএর হাত হইতে বাঁচিতে হইলে পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি বিশেষ

প্রয়োজন। এবং সকলেরই মনে রাখা উচিত যে, সমাজের প্রত্যেকেই ধনী হউন বা নির্ধন হউন, উচ্চ হউন বা তথাকথিত নিম্নস্তরের লোক হউন —নিজের পরিবার ছাড়া, দশের ও দেশের লোকের শুভাশুভের জন্য দায়ী—এবং এইখানেই মানুষ ও পশুতে প্রভেদ। এই রোগ যে ইচ্ছা করিলেই প্রশমিত করা যায় তাহার প্রমাণ হাঁসপাতালের কলেরা রোগী হইতে ডাক্তারদের খুব কমই এই রোগ হইতে দেখা যায়।

মন্ত্র।

(শ্রীমধুসূদন মজুমদার)

ভারতকে লইয়া কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলে প্রথমেই আমাদের মনে হয়, কেন এমন-দেশ পদানত হইল? যাহার রামকৃষ্ণের মত পূজারী, বিবেকানন্দের মত জ্ঞানী কর্ম্মী, জগদীশের মত চিন্তাশীল, রবির মত কবি ও অরবিন্দ-চিত্তরঞ্জনের মত সন্তান, তার এত দুর্দ্দশা কেন? ইহার উত্তর কে দিবে? সাধারণ জনগণ বলিবে, তার সন্তানের বাহুতে বল নাই, তাই এত দুর্দ্দশা; হিংসাদ্বেষে হৃদয় পরিপূর্ণ, তাই এত দুর্দ্দশা; ঐক্য নাই, পরস্পরে মিল নাই, তাই এত দুর্দ্দশা; স্ত্রীজাতী অশিক্ষিত তাই এত দুর্দ্দশা! কেহ বলেন ঐ ত্যাগই ভারতের দুর্দ্দশার একমাত্র কারণ। কেহ বলেন বৈষ্ণব ধর্ম্মের চিক্কণ বাণী "সব ছেড়ে দিয়ে, হরি হরি বলে" বা "তৃণাদপি সুনীচেন" ইত্যাদি মন্ত্র গ্রহণ করিয়াই ভারত এত দুর্ব্বল হইয়াছে। কথাগুলি ব্যবহারিক জীবনে যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু আসল ঘর ঠিক করিতে বসিলে যে, কতদূর টিকিবে তাহা বলা যায় না।

এই ভ্রম প্রমাদ দূর করিবার জন্য বহুব্যক্তি কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছেন ও বহু গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধও প্রকাশিত হইয়াছে; কয়জন কৃতকার্য্য

হইয়াছেন বলা সঙ্কট। তাঁহারা ইহা দেখেন না যে, বাহুবলকে উপেক্ষা করিয়া, অন্য একটী শক্তি অন্তরালে ক্রীড়া করিতেছে, শত শত চেষ্টা করিলেও তাহার সাহায্য ব্যতীত ইহার প্রতীকার সম্ভবে না। যদি সম্ভব হইত তবে ভারত ইংরাজ-পদানত হইত না। ইংরাজ-শাসন পরোক্ষে আমাদের এই শিক্ষাই দিতেছে।

কিন্তু ঐ শক্তি সম্বন্ধী শিক্ষা আমাদের নূতন নহে—উহা সনাতন হিন্দুশিক্ষা। ভারত এই মন্ত্র হারাহইয়া এমন দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে. আর এই ইংরাজ এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া মুষ্টিমেয় শক্তির সাহায্যে এক বৃহৎ দেশকে পদানত করিয়াছে—তাহার এমনিই প্রভাব!

দেশ সেবক বিবেকানন্দ ইহার কি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, প্রথমতঃ আমাদের তাহাই দেখিতে হইবে। অনেকে বলিতে পারেন, শাস্ত্রাদি লইয়া আলোচনা না করিয়া, ইঁহাদের উপর নির্ভর কর কেন? ইহার উত্তরে আমাদের এক পূজারীর আশ্রয় লইতে হইবে—ইনি যেমন তেমন পূজারী নহেন—ঠিক ঠিক মায়ের মূর্ত্তিটী দেখিয়াছিলেন। তাই হে সেবকগণ! মাতৃ পূজার বাসনা থাকিলে, ঠিক তেমনি পূজারী সাজিতে হইবে।

তিনি বলিতেন, 'একালে আর নবাবি কালের টাকা চলে না'। আজ কোন্ ব্যক্তি ততদূর সক্ষম যে সেই বজ্রনিনাদ স্বরূপ গম্ভীর বাণী সমূহের পরিচালনা করিবে? মৃৎভাণ্ডে সিংহদুগ্ধ, ভাণ্ডের ভঙ্গুরতা জন্মায় মাত্র। স্থান পাইয়া অবস্থান করিতে পারে না। বিবেকানন্দ বলিতেছেন, ইহার কারণ দুটী। একটী আমাদের আত্মবিশ্বাসের অভাব অপরটী ত্যাগ মন্ত্রের অভাব। তিনি একটি উদাহরণ দিয়া ইহা সুন্দররূপে বিবৃত করিয়াছেন।

এক গর্ভিনী সিংহী একপাল মেষের উপর লম্ফপ্রদান করিল। তাহাতে একটা বাচ্ছা প্রসব হয়। সিংহী বাচ্ছাকে ঐ মেষপালে ফেলিয়া পলায়ন করে। বাচ্ছাটী মেষের সহিত পালিত হইয়া মেষ-স্বভাব জনিত গুণগরিমা লাভ করে। পরে ঐ সিংহ স্বভাবগত বলশালী হইলেও এরূপ হিংসাশূন্য হইয়াছিল যে, লোকে তাহাকে মেষ-সিংহ বলিত। একদিন

দৈবক্রমে ঐ মেষ-সিংহের সহিত এক বন্য সিংহের দর্শন হয়। তাহাতে বন্যসিংহ যারপর নাই আশ্চর্য্য হইয়া বলিল "রে মূর্খ, তুই তোর্ নিজের ক্ষমতা ও রূপ অবগত নহিস, আয়, তোকে তোর স্বরূপ দেখাইব।" এই বলিয়া বন্য সিংহ, মেষ-সিংহকে লইয়া এক কূপের নিকট উপস্থিত হইল। তাহাতে মেষ-সিংহ নিজের স্বরূপ দেখিয়া লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া হুহুঙ্কারে নিজমূর্ত্তি ধারণ করিল। তাই বলি আমরাও আজ বন্যসিংহের নিকট স্বরূপ দর্শন করিয়া নিজমূর্ত্তি ধারণ করিব।

বিবেকানন্দ পুরুষ সিংহ বলিতেছেন—"ভয়? কার ভয়? আমি প্রকৃতির নিয়ম পর্য্যন্ত গ্রাহ্য করি না। মৃত্যু আমার নিকট উপহাসের বস্তু। মানুষ যেন, নিজ আত্মার মহিমায় অবস্থিত হয়। যে আত্মা অনাদি, অনন্ত, অবিনাশী; যাঁহাকে কোন অস্ত্র ভেদ করিতে পারে না, অগ্নি দগ্ধ করিতে পারে না, জল গলাইতে পারে না, বায়ু শুষ্ক করিতে পারে না, যিনি অনন্ত, জন্ম রহিত, মৃত্যুশূন্য; যাঁহার মহিমার সম্মুখে দেশ কালের অস্তিত্ব বিলীন হইয়া যায়; আমাদিগকে এই মহিমাময় আত্মার প্রতি বিশ্বাসাপন্ন হইতে হইবে। তবেই বীর্য্য আসিবে। তুমি যাহা চিন্তা কর, তাহাই হইবে। যদি তুমি আপনাকে দুর্ব্বল ভাব, তবে তুমি দুর্ব্বল হইবে। তেজস্বী ভাবিলে তেজস্বী হইবে। যদি তুমি আপনাকে অপবিত্র ভাব, তবে তুমি অপবিত্র; আপনাকে বিশুদ্ধ ভাবিলে, বিশুদ্ধই হইবে।"

অপরটী ত্যাগ। এই ত্যাগ-মন্ত্র যে দিন ভারত হারাইয়াছেন, সেদিন হইতে ভারত প্রকৃত কাঙাল। ত্যাগ কি? যেদিন "তুঁহু তুঁহু" আসিবে, সেই দিন প্রকৃত ত্যাগ আসিবে। তাহাতে কি হইবে?—যথার্থ শিবের পূজা। শিব চিনিব। জানিব যত্র জীব, তত্র শিব। আজ মহাত্মা গান্ধি যে মন্ত্র লইয়া আন্দোলন করিতেছেন, ইহা নূতন নহে। ইহা শুনিয়া, হে ভারতবাসি, আশ্চর্য্য হইও না। ইহাই ভারতের নিজের জিনিষ, পরিচিত সুর। এই মন্ত্র গ্রহণ করিয়া প্রাচীন ঋষিগণ সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াও বিরাট রাজশক্তির উপর আধিপত্য করিয়াছেন। অমৃতের সন্তানগণ, তোমরা তাহা আলোচনা করিয়া বলবান হও। পাগ্লা

ভোলা হইয়া যাও—দেখিবে তোমার গৃহে ভগবতী, লক্ষ্মী, সরস্বতী কার্ত্তিক ও গনেশ—জগতের কাম্য—আপনা হইতেই বিরাজমান্। আর যত সুখ সুখ করিয়া অন্বেষণ করিবে, দুঃখ তত তোমাকে আক্রমণ করিবে। 'দেখে শুনে তবু কেন বোঝ না'। প্রকৃত সন্তান অরবিন্দ বলিতেছেন "যে দিন ভারত ত্যাগ মন্ত্র হারাইয়াছে, সেই দিন হইতে সে পাশে বদ্ধ। গুরুগোবিন্দ বা রণজিতের বিফল মনোরথ হইবার কারণ তাঁহারা ত্যাগ সাধারণে বিস্তার করিতে পারেন নাই,—শিবাজীরও তাই। হিন্দু রাজত্ব, এমন কি মুসলমান রাজত্ব সকলও এইরূপ ত্যাগ মন্ত্র হারাইয়া বার বার পদানত হইয়াছে। মহামতি আকবর ইহা লক্ষ্য করিয়াই এই মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। বঙ্গ-ভঙ্গের সময় বাঙ্গালীর বিফল মনোরথ হইবার ইহাই একমাত্র কারণ"। যতদিন ব্যক্তিগত সুখভোগ ত্যাগ করিয়া জাতিগত জীবশিব দেখিতে না পারিবে, ততদিন ভারতের মুক্তির আশা নাই। এই আন্দোলনের দিন যে ব্যক্তি নিজসুখ লইয়া বা উন্নতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করিবে, তাহাকে আমরা একনিষ্ঠ সেবক বলিতে পারিব না। ত্যাগ ভিন্ন কোন্ দিনে কোন্ জাতি উন্নতি লাভ করিয়াছে? গভর্ণর হেষ্টিংস্‌এর সহিত মেম্বরগণের অমিল স্বত্ত্বেও তাহাদের জাতিগত ভাবটী তাহারা হারায় নাই, তাই কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছিলেন। আজ আমরা যদি ত্যাগ মন্ত্র গ্রহণ করিয়া জাতিগত ভাবটী লইয়া বসি, তবে আমাদের কার্য্যের সফলতায় "নিশ্চয়" শব্দ ব্যবহার করিতে পারি। যেদিন জাপানের একদল তাহাদের সাম্প্রদায়িক ভাব ত্যাগ করিল, সেদিন জাপান অরুণ সূর্য্য দেখিল—জাগিল। হে মহান্! আজ সন্ধ্যার শঙ্খধ্বনি আমাদিগকে সেই কুরুক্ষেত্রের অর্জ্জুন উপদেশের কথা স্মরণ করাইতেছে "ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে। ক্ষুদ্রং হৃদয় দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥" হে জনবাসি ভাইগণ, কর্ম্ম কর, ফল চাহিও না। কারণ আসিবার সময় কেবল কর্ম্ম করিবার অধিকার লইয়াই আসিয়াছিলে—ফলে নয়। আজ যথার্থ শবপূজক হইয়া শিব পূজা কর। বিবেকানন্দ বলিতেছেন, "যিনি দরিদ্র, দুর্ব্বল, রোগী সকলের মধ্যে শিব দেখেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা

করেন ; আর যে ব্যক্তি কেবল প্রতিমার মধ্যে, শিব উপাসনা করেন তিনি প্রবর্ত্তক মাত্র। যিনি জাতি-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে একটী দরিদ্রকেও সেবা করেন তাঁর প্রতি শিব, যিনি কেবল মন্দিরেই শিব দেখেন, তাঁহা অপেক্ষা অধিক প্রসন্ন হন।”

শ্রীঠাকুর কেমন মিঠাভাবে বলিতেছেন “পাগল হয়ে যা ; লোকে সংসারের জন্য, মাগের জন্য, টাকার জন্য পাগল হয়, তুই ভগবানের জন্য পাগল হয়ে যা, লোকে বল্‌বে ধর্ম্মপাগ্‌লা।” কি সুন্দর কথা, আজ আমাদিগকে স্মরণ করিতে হইবে, “বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর॥” আজ আমাদিগকে মূলা প্রকৃতি-মাতার পূজা করিতে হইবে। তাহা হইলে আমরা আর বৃথা ঘোর পেঁচে না পড়িয়া পাশ ছিন্ন করিতে সমর্থ হইব। আমরা অরবিন্দের কথা স্মরণ করিব, “তন্মনা অর্থাৎ তাঁহাকে দর্শন করা, সর্ব্বকালে তাঁহাকে স্মরণ করা, সর্ব্বকার্য্যে ও সর্ব্বঘটনায় তাঁহার জ্ঞান ও প্রেমের খেলা বুঝিয়া পরমানন্দে থাকা। ইহাই তোমার আকাঙ্ক্ষা। তোমার ভয় নাই, অল্পমাত্র চেষ্টা করিলে স্বয়ং ভগবান অভয়দানে গুরু ও সুহৃৎরূপে কর্ম্মপথে অগ্রসর করিয়া দেন। ইহাতে, সর্ব্বজীবে তিনি, এই ভাব দৃঢ়রূপে থাকে ইন্দ্রিয় তাঁহাকেই দর্শন করে, আস্বাদন করে, আঘ্রাণ করে ও স্পর্শ করে।”

আমরা অন্যান্য সম্প্রদায়কে নিন্দা করিতে পারি না ; কারণ তাহারাও এই পাশ ছিন্ন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল এবং এই কার্য্যের বাধা বিপত্তি ও ভ্রম দর্শাইয়া দিয়াছে। প্রত্যেক সন্তান গৌরাঙ্গ হও। নিজ সংসার লইয়া থাকিও না। জগৎকে তোমার আপনার কার্য্যক্ষেত্র বলিয়া তাহার দায়িত্বটুকু মাথায় পাতিয়া লও। তাহা হইলে তোমার পিতামাতা ভাই বন্ধু কেহ বাদ পড়িবে না। কারণ তাহারাও জগতের। মাতাকে মা বলিয়া, পিতাকে বাপ বলিয়া, ভাইকে ভাই বলিয়া ভাবিও না ; জান স্বয়ং নারায়ণ—ঈশ্বর—আল্লা—God। ইঁহাদের সেবায় আমাদের আগমন। আজ সর্ব্বমোহ কাটিয়া এই নারায়ণ সেবা সুখ-সাগরে ঝম্প প্রদান করিয়া পড়। আজ গ্লানি উদ্ধারক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে।

তাঁহার আহ্বানে অগ্রসর হও। "সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"। তিনি সর্ব্বভূতে—তাঁর সেবায় ঢেলে দাও মন প্রাণ। তাই আজ নূতন যুগের নূতন আন্দোলনকে তোমরা হুজুক বলিও না—খেলা নয়, ইহা প্রাণের ডাক—পাঞ্চজন্যের ধ্বনি।

কানু বিরহে বৃন্দাবন।

(শ্রীফণীন্দ্র নাথ ঘোষ।)

(১)

শূন্য করি বৃন্দাবন—লুণ্ঠি মধু সকলি তার
ব্রজ কুমুদী ইন্দু গেছে করিয়া হৃদি অন্ধকার।
অতীব দীনা শাখীতে লীনা তুলিয়া কল কণ্ঠ তান
মুখরী শারী না গাহে আর প্রভাতী সুরে প্রণয় গান।
ধবলী আর ছুটেনা গোঠে ঊর্দ্ধমুখে কেবলি চায়
ঈশানে হেরি শাওন মেঘে বৎসগুলি ছুটিয়া যায়।
বিকাশি শত ইন্দ্রধনু দীঘল কাল হচ্ছে তার
পিয়াল শাখে মত্ত শিখী নাহিক নাচে হর্ষে আর।

(২)

ধরিয়া বুকে কান্ত ছবি যমুনা নীল লহর দল
উজানে বাহি ফিরেনা আর চুমিতে শ্যাম চরণ তল॥
মোদিত করি মদির বাসে হাসেনা নীপ কুন্দ চয়
তড়াগ নীরে ফুটেনা আর সরোজ রাজি সুরভিময়।
পরাগে মাখা পেলব পাখা করিয়া মৃদু গুঞ্জরণ
মধুপ আর শেফালী প'রে নাহিক করে সঞ্চরণ।
আহ্বানি মধু সখারে সুখে লতা বিতানে লুকায়ে কায়
সপ্তমেতে ডাকেনা পিক অলস মধু পূর্ণিমায়।

(৩)

ভ্রমেও আর আভিরি বধু যমুনা জলে করেনা স্নান,
হেরিয়া নীল জলদ দলে লোচনে ঝরে মুকুতা দান।
প্রলম্বিত নাগিনী বেণী পৃষ্ঠে তারা বাঁধেনা আর
মূরছি পড়ে শুনিয়া দূরে কীচক কল কাকলি ভার।
নীলাম্বরী নূপুর সাথে রুদ্ধ গৃহে রয়েছে লীন
খসিয়া পড়ে, বলয় দুটি ধরিতে নারে বাহুতে ক্ষীণ।
কোথা সে কাল বিশাল চোখে হাসির খর লহরী হায়
উন্মাদিনী বিধুরা গোপী মিশাতে চাহে মৃত্তিকায়।

(৪)

সন্ধ্যা-দীপ জ্বালিয়া-ঘরে তুলসী-মূলে শোয়ায়ে শির
যাচেনা কেহ রাধা রমণে করিতে চুরি নবনী ক্ষীর।
ভাদরে যবে পয়োদ দলে আবরি ফেলে গগনতল
শঙ্কাকুলা পন্থ চাহি ফেলেনা কেহ অশ্রুজল।
ভগ্ন-প্রাণ রাখাল যত ফেলিছে শুধু দীর্ঘ শ্বাস
নিবিড় হ'য়ে উঠিছে বুকে পুঞ্জিভূত বেদনা রাশ।
শুকায়ে গেছে ব্রততা বধু তরুতে আর ধরে না ফল
ঢালেনা আর সুরভি মৃদু কেতকী যুথী কুসুম দল।

(৫)

অগুরু বাস মোদিত গেহে রচিয়া শেজ কমল দলে
নিশীথে কেহ রহেনা জাগি বনবিহারী আসিবে ব'লে।
পসরা ল'য়ে তরুণী শত নাবিকে আর না দেয় দান
আঁখিতে আর করেনা কেহ কিশোর রাজ অমৃত পান
ফেলিয়া সুত, দয়িত ভুলি আধেক বাঁধা কবরী ধরি
বেণুর রব শুনিয়া কানে ছুটেনা পুর কামিনী মরি।
কলসী আর উঠে না কাঁখে গুল্মে ঢাকা সোপান তল
নাহি শিহরে নূপুর রবে শান্ত নীল লহর দল।

(৬)

বিরহ হের মূর্ত্তি ধরি বৃন্দাবনে এসেছে আজ
সকল শোভা করেছে চুরি নিঠুর সেই রাখাল রাজ।
শুষ্ক আঁখি উঠিছে ভরি ধরণী যেন শূন্যময়
বঁধুর মধু স্মৃতিটি শুধু সকল সাথে জড়ায়ে রয়।
আর কি ফিরি আসিয়া প্রিয় নাহি শুনাবে প্রেমের গান
দিবে না মৃতে জীবন পুনঃ শুনায়ে কানে তাঁহারি নাম।
সকলি আজি শ্রীহীন যেন মথিত হৃদি বিরহে তার
গিয়াছে হরি মথুরাপুরে—করিয়া ব্রজ অন্ধকার।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ।

বঙ্গের উদীয়মান কবি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, বিগত ১৬ই আষাঢ়, রাত্রকালে ইহধাম ত্যাগ করিয়া ভাব-রাজ্যে গমন করিয়াছেন। এই শব্দ-কৌশলী যে মাতৃ-ভাষায় এক নব প্রাণ-স্পন্দন সঞ্চার করিয়া যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন সে বিষয়ে আর কাহারও সন্দেহ নাই। যিনি তাঁহার 'গান্ধি' ও 'সুশ্বেতা'' পড়িয়াছেন, তিনি কবির স্মৃতি নিজ অন্তরে অমর করিয়া রাখিবেন, নিশ্চয়ই। নিয়তি কেন যে তাঁহার সৌন্দর্য্য সাধনার শেষ করিতে দিলেন না, তাহা আমাদের চির অজ্ঞাতই থাকিয়া যাইবে—জিজ্ঞাসা করিবার হুকুম আমাদের নাই সত্য, কিন্তু কি আশ্চর্য্য "গোলাপ যখন ফুটচে রাশি রাশি গোলাপ ফুলের ভক্ত গেল মরে!" তাঁহার অকাল মৃত্যুতে বঙ্গভারতীকে এক শ্রেষ্ঠ সম্পদ হারাইতে হইয়াছে—সে অভাবের পূরণ কি আর হইবে? হায়রে "একে একে বৈতরণীর তোয়ে ডুবছে মাণিক"—এ মাণিকের কি আর সন্ধান মিলিবে?

আদি নাথ।

(শ্রীলাবণ্যকুমার চক্রবর্ত্তী)

জলচর, শুশুক জলের নীচে বেশীক্ষণ থাকিতে পারে না, হাঁফাইয়া উঠে, উপরে আসিয়া আরামের নিশ্বাস ফেলে। প্রাণটা এমনি শুশুকের মত যখন আইঢাই করিয়া উঠিল—তখন চইটিবন্ধ বিষয় জলধির তলদেশ হইতে উঠিয়া পড়িয়া একবার ভৌগলিক সমুদ্র যাত্রা করিলাম। অবশ্য বিলাত নহে, আমাদের সেই চির পুরাতন (মেনকার অপত্য) মৈনাক পর্ব্বতে—আদিনাথে। একদিন সন্ধ্যাবেলা আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের লাকসাম ষ্টেশনে জীবন্ত মাল বোঝাই হইলাম। সে অগ্রহায়ণের প্রথম ভাগ। রেল শড়কের দুধারে হরিদ্বর্ণ পক্ক শস্য পরিপূর্ণ মাঠ, মাঠের পর মাঠ। শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, নোয়াখালী, চট্টগ্রামে কোলভরা ধান ছিল ও আছে, অথচ তখনও ও এখনও ঘরে ঘরে হাহাকার "অন্নচিন্তা চমৎকারা"। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরা অনেকটা কাছাকাছি বোধ হইল। কোথাও বিশাল মাঠ আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছে; কোথাও মাঠে মাঠে কোলাকুলি করিয়া প্রেমে বিভোর রহিয়াছে। বামধারে পাহাড়ের শ্রেণী, একটি পাহাড় আর একটিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া একেবারে সমুদ্র তীর পর্য্যন্ত কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কেহ উচু, কেহ নীচু বহুদূর পর্য্যন্ত অচ্ছেদ্য মিলনে আবদ্ধ। বিশৃঙ্খলার মধ্যেও কেমন একটা শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্য। প্রাণমন মুগ্ধ হয়! সমস্ত প্রাণটা ঢালিয়া দিয়া উপভোগ করিলে বলিতেই হয় "মরি কিবা প্রকৃতির বিশৃঙ্খল শোভা।" নোয়াখালিটা যেন কেমন একটু রুক্ষ্ম সুক্ষ্ম।

লাকসাম পৌছিলেই বুঝা যায় (অন্ততঃ আমরা বুঝিয়াছি), শ্রীহট্ট-ত্রিপুরা কিশোর-কিশোরীকে ছাড়িয়া হঠাৎ যেন সংসার তাপ ক্লিষ্ট একটি নব্য যুবকের সঙ্গে দেখা হইল। কিন্তু ফেণী নদী অতিক্রম করিলেই আবার হারা নিধিটী চোখের সামনে ভাসে। চট্টলা যেন শ্রীহট্ট ত্রিপুরার

কাছে দাঁড়াইয়া পড়ে। ঠিক মনে হয় যেন এক মা বাপের তিনটী ছেলে মেয়ে, কেবল নোয়াখালিটী যেন মিশিয়া মিশিয়া মিশিতে পারে না। ঠিক যেন একটি উদাসী যুবক উদাসনেত্রে তিনটী বেপোরয়া কিশোর কিশোরীর অবস্থা নিরীক্ষণ করিতেছে। রংবেরঙের লোক, অপূর্ব্ব-অচিন্ত্য আলাপআলোচনা দেখিয়া শুনিয়া যথা সময়ে সীতাকুণ্ডের সন্নিকটবর্ত্তী হইলাম; গাড়ী হইতেই ৺চন্দ্রনাথ দেবের মন্দির পাহাড়ের উচ্চশিখরে পরিদৃষ্ট হইল। পাহাড়গুলি অতীব মনোরম দেখাইতেছিল, কিন্তু তখন তেমন উচ্চ বলিয়া বোধ হইতেছিল না। সীতাকুণ্ড অতিক্রম করিয়া ক্রমে ভাটিয়ারী ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। গাছ গাছড়ার ফাঁক দিয়া মহাসমুদ্র পরিদৃষ্ট হইতেছিল।—দেখিলাম, একটি নীলবর্ণ বৃহৎ পাহাড়। মহাসমুদ্র দূর হইতে এমনি ভাবে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। সন্ধ্যার আঁধারে "পাহাড়তলী" ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া বন্ধুপ্রেরিত পথ প্রদর্শক ও মোট বাহক নিয়া অন্ধকারের সহিত একাঙ্গীভূত আমবাগানের ভিতর দিয়া পাহাড়তলীস্থ ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল সার্ভে ক্যাম্পে পৌঁছিলাম। ক্যাম্প ম্যানেজার দুজনই আপনার লোক। একজন লেখকের গুরুভাই, অপর জন আবাল্য বন্ধু। একজন তখন জ্বরের সহিত কুটুম্বিতা পাতাইয়া বিছানায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, অন্য বন্ধু তাঁহার তথাকার বন্ধু বান্ধবের সহিত গল্প গুজবে মজগুল ছিলেন। শিক্ষিত যুবকছাত্রগণ তাঁহাদের অধ্যাপকের বন্ধুদ্বয়কে অবিলম্বে 'টী-পার্টি' দ্বারা আপ্যায়িত করিলেন। স্বেচ্ছায় ও বাধ্যবাধকতায় দুইদিন বিশ্রাম ও বন্ধুদ্বয়ের প্রদত্ত চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় সদ্ব্যবহার করিয়া তৃতীয় দিনের ভোর বেলা আদিনাথ যাত্রা করিলাম।

চট্টগ্রাম সহরে কর্ণফুলি ঘাটে পূর্ব্বাহ্ণ সাড়ে সাত ঘটিকার সময় সমুদ্রগামী জাহাজের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। অচিরেই বাল্যের স্বপ্ন, যৌবনের কল্পনা মহাসমুদ্র শুধু যে দর্শন করিব তা নয়, উহার বিশাল বক্ষের উপর দিয়া দোল খাইতে খাইতে ভাসিয়া যাইব—একঘণ্টা, দুই ঘণ্টা নয়, আট ঘণ্টা! প্রাণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

পাহাড় সমুদ্র-নদনদী-বহুলা প্রকৃতির লীলা নিকেতন চট্টলা ক্রমশঃ

একখানি ছবির মত ভাসিতে লাগিল। ষ্টীমার ছুটিল। সম্মুখে দিগন্ত প্রসারিত মহাসমুদ্র মহাগাম্ভীর্য্য নিয়া যেন আহ্বান করিতেছিল। সম্মুখে পশ্চাতে রূপের হাট—কারে রাখি কারে দেখি।

ফিরিবার কালে চট্টলার রূপ দেখিয়া ফিরিব বলিয়া তার দিক হইতে বড় কষ্টে মুখ ফিরাইয়া লইলাম। মহাসমুদ্রের পানে ষোল আনা মন দিতে বসিলাম। দেখিলাম, কর্ণফুলী নদী ক্রমশঃ বড় হইয়া চলিয়াছে। বড় হইতে হইতে অবশেষে মহাসমুদ্রের মাঝে পৌঁছিয়া আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। শ্বেত নীলে মিশিতে মিশিতে অবশেষে একেবারে মিশিয়া গিয়াছে। এযেন রাধা-শ্যাম শ্যাম-রাধার অপূর্ব্ব মিলন॥

বুঝিলাম ছোট থাকিয়া বড় হইবার, অনন্তে মিশিবার সাধ বৃথা। বড় হইতে চাও, অনন্ত অপারে পড়িতে চাও ত এমনি করিয়া কর্ণফুলীর মত আপনাকে বড় করিতে থাক, চরমে মিলিয়া যাইবে, মিশিয়া যাইবে। ক্ষুদ্র স্রোত অসীম অনন্ত স্রোতে আপনাকে বিলাইয়া দিয়া সত্য সত্যই অসীম অনন্ত হইয়া পড়িবে। এইত সম্মুখে ঋষিসদৃশ স্থির, ধীর, প্রশান্ত, অতি প্রশান্ত লবণাম্বুরাশি, আজ পাহাড় প্রতিম জলরাশি তরঙ্গ ভঙ্গে ভীতি প্রদ নহে। প্রশান্ত মহাসাগর অপেক্ষাও যেন প্রশান্ত। চঞ্চল প্রাণটা এই অচঞ্চল মহা পুরুষের দর্শনে যেন স্থির হইয়া আসিল, দেখিতেছিলাম জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি আমাদেরই কালিদাসের—

"তমাল তালী বনরাজি নীলা
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে
ধারা নিবন্ধেব কলঙ্ক রেখা"

কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথের "নীল সিন্ধু জল ধৌতচরণতল, অনিল বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল" ভাবিতেছিলাম দেখিতেছিলাম, দেখিতেছিলাম ভাবিতেছিলাম—ভাবিতে ভাবিতে আনন্দে আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলাম। 'নুনের পুতুল আমার কল্পনা, সমুদ্রকে আর মাপিতে পারে নাই, গলিয়া গিয়াছিল।'

যতদূর দৃষ্টি চলে দেখিতেছিলাম দিক্ চক্রবালে আকাশের সহিত অনন্ত জলরাশি হরিহর অভেদাত্মা হইয়া গিয়াছে—আকাশ জল, জল আকাশ। অথবা কেবলই আকাশ, কেবলই জল! মুগ্ধনেত্রে ভাব বিভোর চিত্তে চাহিয়াই রহিলাম। (ক্রমশঃ)

"আমি"র সন্ধানে।

(শ্রীভৈরব চৈতন্য।)

(১)

নবজাত শিশুর কোনও নাম থাকে না। ক্রমে তাহার আত্মীয়গণের পছন্দমত একটী নাম রাখা হয়। পরে আরও বড় হইলে তাহার সে নামও বদলাইয়া যায় ও সে অন্য নামে অভিহিত হয়—সেই নাম তাহার মৃত্যু পর্য্যন্ত থাকিয়া যায়। এইরূপে একটী নামহীন প্রাণীর নাম হয়। ক্রমে সম্বন্ধ হয়। নাম ও সম্বন্ধ মনুষ্যকৃত। ঈশ্বর দত্ত নাম ও সম্বন্ধ লইয়া কেহ সংসারে আসে না। মনে কর যদি একটী শিশুর কোন নামই না দেওয়া হয় তবে কি সে তাহার অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলিবে? তুমি নাম দাও আর না দাও শিশু তাহার ব্যক্তিগত বিশেষত্বকে সমান ভাবেই প্রাণে প্রাণে অনুভব করিবে।

যাহা ব্যক্ত হইয়াছে তাহাকে "ব্যক্তি" কহে। কি ব্যক্ত হইয়া "ব্যক্তি" নাম ধারণ করে? শিশুর প্রথমে নাম ছিল না মধ্যে দিনকতক নাম ও সম্বন্ধ হইল ও মৃত্যুর পর নামরূপের জগতে নাম ও রূপ রাখিয়া দিয়া সে কোথায় চলিয়া গেল। প্রথমে অব্যক্ত। পরেও অব্যক্ত। মাঝে দু দিন "ব্যক্ত"। ইহারই বা বাস্তবতা কোথায়? শিশু যুবকে পরিণত হইল—কেহ ডাকিল পুত্র, কেহ ডাকিল পিতা, কেহ বন্ধু, কেহ শত্রু, এইরূপে একই বস্তুতে নানা নাম ও সম্বন্ধ কল্পিত হইয়া ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া চলিল।

পরিবারে আমরা যাঁহাদিগকে বাবা, মা, ভাই, বোন প্রভৃতি বলি তাঁহাদের সকলেরই সম্বন্ধে এই একই ভাব কল্পিত ও উহা বিভিন্ন জনের প্রতি বিভিন্ন প্রকার। সংসারে মানবের প্রকৃত পরিচয় তাহার এই পাতান নাম ও সম্বন্ধগুলিতে চাপা পড়িয়া যায়। এইরূপে আমরা প্রত্যেকে এক একটী ক্ষুদ্র পরিবার সৃষ্টি করিতেছি ও এই জগতটী এই প্রকার কতকগুলি ক্ষুদ্র পরিবারের সমষ্টি মাত্র। ব্যবহারিক ভাবে "জানি" বলিলেও আমরা পরস্পর পরস্পরের প্রকৃত আত্ম-পরিচয় জানি না। এইরূপে এই জগত চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু পশ্চাতে কোন সত্য বস্তু অবলম্বন না থাকিলে কখনও ভ্রমের কল্পনা সম্ভবে না। বাজারে একটী খোঁটা পোঁতা ছিল—অন্ধকারে তাহাকে কেহ বিদেশী, কেহ বৃক্ষ, কেহ চোর, কেহ পথিক, ইত্যাদি নানাজনে নানা কথা ভাবিয়াছিল। কিন্তু যদি খোঁটাটী পোঁতা না থাকিত কল্পনা অবলম্বন অভাবে সম্ভব হইত না। এবং নানা জনে নানারূপে ভাবিলেও খোঁটা বাস্তবিক খোঁটাই ছিল।

(২)

তোমায় যে শৈশবে দেখিয়াছে সে এখন বাৰ্দ্ধক্যে তোমায় দেখিলে আর চিনিতে পারিবে না। তোমার সে শরীর এখন আর নাই। সে বুদ্ধি সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে। মন বদলাইয়া গিয়াছে। শৈশবে যেসব বিষয়ে তোমার আনন্দ হইত, এখন আর তাহা হইতে আনন্দ পাওনা। আনন্দের ধারা বদলাইয়া গিয়াছে। শৈশবে এ জগতকে যে চক্ষে দেখিতে সে জগৎ এখন আর নাই। এই পরিবর্ত্তনের ভিতরও তোমার "আমি"ত্ব বোধ সমানই রহিয়াছে। শৈশবে যে তুমি "এটী আমার পিতা," "ইনি আমার শিক্ষক," এইরূপ মনে করিতে, বার্দ্ধক্যে সেই তুমি "এটী আমার নাতি," "আমি ইহার পিতামহ" এই প্রকার অনুভব করিতেছ। তোমার শৈশবের "আমি"ত্ব বোধ ও বার্দ্ধক্যের "আমি"ত্ব বোধ সমানই রহিয়াছে। শৈশবে, যৌবনে ও বার্দ্ধক্যে "আমি রহিয়াছি"—এই অনুভূতি তোমার ভিতরে বরাবর হইয়া আসিতেছে, উহা সমস্ত পারিপার্শ্বিক পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া তিন

কালে অপরিবর্ত্তনীয় ভাবে চলিয়া আসিতেছে। উহাই তোমার প্রকৃত "আমি"।

ফুটবল খেলিলে একটু আনন্দ পাও তাই তুমি উহা খেল! আনন্দ না হইলে খেলিতে কি? বল দেখি এই আনন্দ কে পায়? তুমি বলিবে, শরীর। তাহা হইতে পারে না। কারণ শরীর কতকগুলি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমষ্টি মাত্র। কোন্ অঙ্গ এই আনন্দ পায়? হস্ত, পদ, মস্তক না বক্ষ? তখন তুমি বলিবে মন এই আনন্দ পায়। তাহাও হইতে পারে না। কারণ মন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট একটী কিছু নাই। কাম, ক্রোধ, লোভ, দয়া, পরোপকার, সহানুভূতি, সঙ্কল্প প্রভৃতি কতকগুলি বৃত্তির সমষ্টির নাম মন। যদি বল বুদ্ধি এই আনন্দ ভোগ করে। তাহাও নহে। কারণ বুদ্ধিও একটী বৃত্তি মাত্র। ইহার দ্বারা কর্ম্মের কৌশল সকল অবগত হওয়া যায় মাত্র। ইহাকে পরিচালনা করে কে? যদি বল তোমার প্রাণ এই আনন্দ ভোক্তা। তাহাও হইতে পারে না। কারণ প্রাণ, শরীরকে জীবনী শক্তি দিয়া বাঁচাইয়া রাখে মাত্র। ইঁহার অন্য কোন প্রকার ক্রিয়া করে কে কোথায় দেখিয়াছে? অথচ তুমি জানিতেছ "আমি আনন্দ পাইতেছি" এই প্রকার ভাব তোমার ভিতরে রহিয়াছে। এবং উহা তোমার শরীরের ভিতরেই প্রাণ, মন, বুদ্ধি, আনন্দ হইতে স্বতন্ত্র ভাবে রহিয়াছে। ইহা বেশ পরিষ্কার ভাবে বুঝিতেছ এবং ইহাতে তোমার কোন সন্দেহই নাই। ইহাই তোমার "প্রকৃত আমি"। এই "প্রকৃত আমি"র কোন নাম নাই। নরেন্দ্র কাল, ফর্সা রোগা বা মোটা হইয়াছে বলিলে নরেন্দ্রের শরীরকে বুঝায়, তাহার "প্রকৃত আমি"কে বুঝায় না। তুমি ইচ্ছাপূর্ব্বক কখনও তোমার পিতার জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ পুত্র হইতে পার না, বা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ বা বৈদ্য হইতে পার না। জাতি বা সম্বন্ধ তোমার শরীরেরই হইয়া থাকে উহা তোমার "প্রকৃত আমি"র হইতে পারে না।

সাধারণতঃ তুমি যে "আমি," "আমি" বল, তাহার নির্দ্দিষ্ট একটী কোন অর্থ নাই। যখন বল "আমি ৺দয়ালচাঁদ রায়ের পুত্র" বা "আমি চলিতেছি" বা "আমি বসিয়া আছি," তখন "আমি" মানে

কর তোমার শরীর। যখন "আমি টেরা, কালা" বা "খোঁনা" বল। তখন "আমি" মানে কর তোমার ইন্দ্রিয়! ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন বস্তুকে "আমি" বলিতেছ। ইহাই তোমার "নশ্বর আমি।" "প্রকৃত আমি" একটি এবং "নশ্বর আমি" অনেকগুলি। যে সকল নশ্বর বিষয়কে "আমি" বল, সেগুলি কখনও সবল, দুর্ব্বল, সুস্থ বা অসুস্থ হইতেছে ও দেহের নাশের সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে।

(৩)

শাস্ত্রে "জাতিস্মর" বাক্যটী আমরা দেখিতে পাই। উহার অর্থ পূর্ব্ব জন্ম কথা স্মরণ হওয়া। ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের গয়াধামে পুষ্করিণী তীরে পূর্ব্ব জন্ম কথা স্মরণ হওয়া, তথা প্রাচীন কালে বুদ্ধদেব প্রভৃতি অনেকেরই আমরা দেখিতে পাই। আমরা আরও দেখিতে পাই, শিশু কাল হইতে কাহারও প্রবৃত্তি গীত বাদ্যের দিকে—কাহারও প্রবৃত্তি চিত্রাঙ্কনের দিকে; প্রথম হইতেই পাকা বিষয় বুদ্ধি লইয়া কেহ জন্মায়, কেহ অঙ্ক শাস্ত্রে বিশেষ ভাবে অনুরক্ত, কেহ বা বিষয়-বিরাগী সন্ন্যাসী প্রকৃতির।

খাদ্য হইতে রক্ত। রক্ত হইতে রেতঃ। রেতঃ হইতে মানবের জন্ম। তবে একই অন্ন ভোক্তা একই পিতার বিভিন্ন প্রবৃত্তির পুত্র জন্মায় কেন? যদি তুমি বল, একই মৃত্তিকায় ঝাল লঙ্কা, তেত নীম, মিষ্ট আক, টক তেঁতুল প্রভৃতি জন্মিতে দেখা যায় তবে আর একই পিতার বিভিন্ন প্রকৃতির পুত্র জন্মিবে না কেন? আমি বলিব, তাহা নহে। উহা সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতির কথা। বৃক্ষ, মানব, পক্ষী, মৎস, পশু, পতঙ্গ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির নিয়ম সম্পূর্ণ বিভিন্ন। একই লঙ্কা গাছে, একটি লঙ্কঝাল একটি মিষ্ট, একটি তিক্ত, একটী টক কবে কে কোথায় দেখিয়াছে। কিন্তু একই পিতারূপ বৃক্ষে বিভিন্ন প্রকৃতির পুত্ররূপ ফল ধরে কেন? (?)

সহরে কত শত ধনী রহিয়াছে তুমি গরিব কেন? কেহ পঙ্গু, কানা বা দুঃখী হয় কেন? সকলেই সুখ চায় তবে কেহ কেহ দুঃখ পায় কেন? ঈশ্বর কি এতই খেয়ালী যে তিনি কাহাকেও সুখী

কাহাকেও দুঃখী করিলেন। তুমি আজীবন প্রাণপণে লোকোপকার করিয়া মারা যাইলে; তোমার সে সব পুণ্য কার্য্য কি বিফলে যাইবে?

ঈশ্বরের রাজ্যে ন্যায়ের বিচার, পুণ্যের পুরস্কার, পাপের সাজা কি নাই? এই সকল রহস্য ভেদ করিতে গিয়া তত্ত্ববিদগণ জন্মান্তর বাদের অস্তিত্ব দেখিতে পাইয়াছেন। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইহার চরম মীমাংসা করিয়াছেন।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবনি গৃহ্ণাতি নরোপরাণি
তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণা
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ২।২২॥"

জীর্ণ বাস পরিত্যাগ করিয়া লোকে যেমন নব বাস পরিধান করে, আমি সেইরূপ আমার একটী পুরাতন ও জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন শরীর পরিগ্রহ করি।

কোন্ "আমি"? "প্রকৃত আমি" না "নশ্বর আমি"? "নশ্বর আমি" কখনই নহে,—কারণ "নশ্বর আমি" বলিলে যাহাদিগকে বুঝায়, যথা শরীর ইন্দ্রিয় প্রভৃতি,—সেগুলি মৃত্যুতে ধ্বংস হইয়া যায়। দ্বিতীয়বার জন্মগ্রহণের সময় সেগুলি কিছুই বর্ত্তমান থাকে না। অতএব উহা আমার "প্রকৃত আমি"। পূর্ব্ব জন্মের অভ্যাস বশতঃ "প্রকৃত আমি" গায়ক, লেখক, চিত্রকর, সন্ন্যাসী প্রভৃতি হইতে স্বতঃইপ্রবৃত্ত হয়। এই "প্রকৃত আমি"কে কেহ Soul, কেহ জীবাত্মা প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়াছেন। "নশ্বর আমি"র দিক দিয়া দেখিলে মানব মাত্রেই, নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হইলেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। আর "প্রকৃত আমি"র দিক দিয়া দেখিলে মানব মাত্রেই, জন্ম মৃত্যু রহিত নির্ব্বিকার পরমাত্মার অংশ, যাহা শঙ্করের "শিবোঽহং" বা ঈশার I and my Father are one ও মহম্মদের "রসুল উল্লাহ"।

পুরাণমাতা ঋক্‌শ্রুতি।

[স্বামী বাসুদেবানন্দ]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এক স্থল ব্যতীত বেদের সর্ব্বত্রই মিত্র-বরুণ এই যুগল দেবতার উপাসনা দৃষ্ট হয়। এবং অবস্থায় অসুরো-মজদের সহিত মিত্রের নাম সংজোজিত। ইহা হইতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অনুমান করেন অসুরো মজদ ও বরুণ একই দেবতা। বেদে বরুণ প্রথমে আবরণকারী আকাশ-দেব, পরে নৈশ আকাশ বা নিশাদেব, তাহার পর সমুদ্র বা জলদেবতা রূপে উপাসিত হইয়াছেন। এ পরিবর্ত্তনের কারণ, Alexander Von Humboldt বলেন "জল এবং আকাশে অনেক সাদৃশ্য আছে, উভয়ই পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আছে, অতএব আকাশের বরুণ জলের বরুণ হইলেন।" Roth বলেন "বেষ্টনকারী আকাশই বরুণ, নদী সকল পৃথিবীর প্রান্তে সমুদ্রে যাইতেছে সুতরা সমুদ্র পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এরূপ অনুমিত হইল, সুতরাং বরুণ সমুদ্রের দেব হইলেন। Westergaurd বলেন, আকাশের দূরপ্রান্তে স্থিত দেব বরুণ, তথায় বায়ু ও সমুদ্র যেন মিশ্রিত, সুতরাং বরুণ অবশেষে ভারতবর্ষে সমুদ্রের দেব হইলেন। হিন্দু পুরাণে বরুণ কেবল মাত্র জলদেবতা।

(৬) ১ম, ৩ সূক্তের দেবতা অশ্বিদ্বয়। যাস্ক নিরুক্তে লিখিতেছেন, তৎ কৌ অশ্বিনৌ। দ্যাবা পৃথিব্যৌ ইতি একে। অহো রাত্রৌ ইতি একে সূর্য্যচন্দ্রমসৌ ইতি একে। রাজানৌ পুণ্যকৃতৌ ইতি ঐতিহাসিকাঃ। তয়োঃকাল উর্দ্ধমর্দ্ধরাত্রাৎ প্রকাশিভবস্য অনুবিষ্টম্ভমনু। ইহাতে নানা মতের অবতারণা করিয়া যাস্ক অশ্বিদ্বয়ের কাল নির্ণয় সম্বন্ধে নিজ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে "অর্দ্ধরাত্রির পর এবং আলোক প্রকাশের পূর্ব্ব"। রশ্মিসমূহ বেদে অশ্বগতির সহিত তুলিত হইয়াছে সেই হেতু উষা ও সূর্য্যকে অশ্বযুক্ত বলা হইয়াছে। অশ্বিন্ শব্দও সেই অর্থে

প্রযুক্ত। ঋগ্বেদের ১০ম, ১৭ সূক্তে অশ্বিদ্বয়ের জন্ম লিখিত আছে—"ত্বষ্টা কন্যার বিবাহ দিতেছেন এই বলিয়া বিশ্বভুবন একত্র হইল। যমের মাতার বিবাহ হওয়ায় মহান্ বিবস্বানের স্ত্রীর মৃত্যু হইল। "মর্ত্যগণের নিকট হইতে অমরেরা দেবীকে লুকাইয়া রাখিলেন। তাঁহার ন্যায় একজনকে সৃষ্টি করিয়া বিবস্বান্‌কে দান করিল। এই ঘটনার সময় সরণ্যু যে অশ্বিদ্বয়কে জন্ম দিয়া, মিথুনদের ত্যাগ করিয়া যাইল।" পুরাণে যে দেখা যায় বিবস্বান্ বা সূর্য্য ও সরণ্যু বা উষা অশ্ব ও অশ্বিনীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন—তাহা বেদে দৃষ্ট হয় না। কিন্তু যাস্ক উক্ত ঋকের ব্যাখ্যায় বলিতেছেন "ত্বষ্টার কন্যা সরণ্যুর বিবস্বান্ বা সূর্য্যের দ্বারা যমক সন্তান হয়। সরণ্যু তাঁহার স্থানে তাঁহার ন্যায় আর একজন দেবীকে রাখিয়া অশ্বিনীরূপ ধরিয়া পলায়ন করেন। বিবস্বান্‌ও অশ্বরূপ ধরিয়া তাঁহার পশ্চাতে যান এবং তাঁহার সহিত সংসর্গ করেন। এইরূপে অশ্বিদ্বয়ের জন্ম হয়।"—বোধহয় এই ব্যাখ্যাই পৌরাণিক উপাখ্যানের ভিত্তি স্থল। গ্রীক দেবী Erinys—সরণ্যুর রূপান্তর। সরণ্যু যেরূপ অশ্বিনীরূপ ধরিয়া অশ্বিদ্বয় প্রসব করিয়াছিলেন Erinys Demeter সেইরূপ Arion এবং Despoina কে প্রসব করেন।

(৭) ১ম, ৬ সূক্তে মরুৎগণের কথা আছে। ঋগ্বেদের নানা স্থানে ইঁহারা রুদ্র ও পৃশ্নি পুত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। মৃ ধাতুর অর্থ আঘাত করা বা হনন করা; সেই হেতু ইঁহারা ধ্বংসকারী ঝড়। লাটিন যুদ্ধ দেবতা Mars এবং গ্রীক দেবতা Ares (মকার লোপ করিয়া) এই মরুৎ শব্দেরই রূপান্তর মাত্র।

(৮) ঐ সূক্তের ১ঋ—যুঞ্জন্তি ব্রধ্নমরুষং চরন্তং পরি তস্থুষঃ। রোচন্তে রোচনা দিবি।—"চতুর্দ্দিকস্থ লোকেরা (ইন্দ্রের সহিত) প্রভাপান্বিত (সূর্য্য) হিংসক রহিত (অগ্নি) ও বিচরণকারী (বায়ুর) সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে; নক্ষত্রগণ আকাশে দীপ্যমান রহিয়াছে।" এই ঋকের অর্থ সঠিক বুঝা যায় না। মূলে ইন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি বা বায়ুর নাম নাই, কেবল কতকগুলি বিশেষণ আছে, সায়ণ অনুমানের দ্বারা

দেবগণের নাম ভাষ্যে বসাইয়াছেন। কিন্তু "ব্রধ্ন" শব্দে যদি "প্রতাপান্বিত সূর্য্য" হয় তাহা হইলে Max Muller বলেন " 'অরুষের' আদি অর্থ লোহিত বর্ণ, এবং অরুষ বিশেষ্য হইয়া ব্যবহৃত হইলে সূর্য্যের একটী অশ্বের নাম। গ্রীক্ Eros এবং লাটিন Cupid (প্রেম দেবতা) এই সূর্য্যের লহিতাশ্ব অরুষের রূপান্তর।* তিনি আরও বলেন "সূর্য্যের অশ্বগণের সাধারণ নাম "হরিৎ," সেই জন্য সূর্য্যকে "হরিদশ্ব" কহে। ইহা গ্রীক্ দেশে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া Charites নাম ধারণ করিয়া (The Graces) পরম-রূপবতী ও কমনীয় দেবীরূপে পূজিত হইতেন।†

(৯) ১ম, ২০ সূক্তের দেবতা ঋভুগণ। সায়ণ ১ম, ১১০ সূক্তের ৬ ঋকের ব্যাখ্যায় একটী বচন উদ্ধৃত করিতেছেন—"আদিত্যরশ্ময়োঽপি ঋভবো উচ্যন্তে।" অর্থাৎ তাঁহারা সূর্য্যরশ্মি। গ্রীকদিকের মধ্যে প্রবাদ আছে, যে Orpheus, তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হইলে, গীতের দ্বারা মৃত্যুরাজ Pluto কে সন্তুষ্ট করিয়া স্ত্রীকে ফিরিয়া পান। কিন্তু পথে স্ত্রীর দিকে চাওয়াতে তাঁহার স্ত্রী পুনরায় অন্তর্ধান হন। Max Muller এর মতে "Orpheus, ঋভু বা অর্ব্বের রূপান্তর মাত্র এবং গল্পের মূল অর্থ এই যে সূর্য্য উষার দিকে চাহিলেই অর্থাৎ উদয় হইলেই উষা অদৃশ্য হইয়া যান।" তাহা ছাড়াও তিনি বলেন "উর্ব্বশী ও পুরূরবার যে গল্প বেদে ও হিন্দু সাহিত্যে পাওয়া যায় তাহারও এই মূল অর্থ; উর্ব্বশীর আদি অর্থ উষা।"

(১০) উষা হইতে গ্রীকদিকের Eos এবং লাটীনদিগের Aurora রূপান্তরিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া ঋগ্বেদের অর্জ্জুনী, বৃষয়, দহনা, উষস্, সরমা এবং সরণ্যু গ্রীকদিগের Argynories, Brisies, Daphne, Eos, Helen এবং Erinys শব্দে রূপান্তরিত হইয়াছে।‡

* Chips from a German Workshop Vol. II (1867) P.P. 128-14[illegible].

† Science of Language (1882). Vol. II P.P. 405 to 412.

‡ "The heroine of the stories mas[illegible] the Dawn, aptly represented as a charming maiden, and he[r] names in the Rig-Veda are Arjuni, Brisaya, Dahana, Ushas, Sarama and Saranya

ঋগ্বেদে আর একস্থলে উষাকে "অহনা" বলা হইয়াছে। উহা গ্রীকদিগের Athena (Lt. Minerva) Cox এর মতে Argos এবং Arcadia উষার অর্জ্জুনী নাম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। * তাহা ছাড়া সরণ্যু এবং Erinys + অথবা দহনা বা Daphne সম্বন্ধে আখ্যায়িকারও মিল আছে। গ্রীকদিগের পুরাণে আছে যে Appolo (সূর্য্য) Dhapne (দহনা) কে ধরিবার জন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছিলেন। তাঁহাকে ধরিবামাত্র Daphne বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ‡ অর্থাৎ সূর্য্যোদয় হইলেই উষা শেষ হয়।

(১১) ১ম, ৪১সূ, ১শ্লোকে অর্য্যমা দেবতার উল্লেখ আছে। ইনিই ইরাণীদের অর্য্যমণ্। হিন্দুদিগের ন্যায় ইনিও ইরাণীদের প্রথম সূর্য্য ছিলেন এবং অনেক রোগের ঔষধি জানিতেন। যখন অঙ্গ্ৰমৈন্যু ৯৯,৯৯৯ প্রকার রোগের সৃষ্টি করিল, তখন অহুর মজ্দ প্রতিকারের জন্য নৈরসংঘকে (বৈদিক নরাশংস বা অগ্নি) দূত করিয়া আর্য্যমণের নিকট পাঠাইলেন।

"পরম কমনীয় অর্য্যমণ্ সকল প্রকার রোগ ও মৃত্যু এবং যাতু ও পৈরিকা ও জৈনিদিগকে ধ্বংস করুন।" জেন্দ অবস্থা ২২ ফার্গাদ।

(১২) ১ম, ৩৫ সূ, ৬শ্লোকে—তিস্রো দ্যাবঃ সবিতুর্দ্বা উপস্থাঁ একা যমস্য ভুবনে বিরাষাট্—এই মন্ত্রে আছে। "দ্যুলোক প্রভৃতি তিনটী লোক আছে, দুইটী (দ্যুলোক ও ভূলোক) সূর্য্যের সমীপস্থ, একটী (অন্তরীক্ষ) যমের ভবনে গমনকারীদিগের পথ।" শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ইহার টীকায় লিখিতেছেন, যে বিবস্বানের দ্বারা সরণ্যুর গর্ভে

---

and all these names reappear among the Greeks as Argynoris, Briseis, Daphne, Eos, Helen and Erinys."

—Rajendra Lal Mitrie's Indo-Aryans, Vol. II, article "Primitive Aryans"

* Mythology of Aryan Nations, Vol I, bookI, chapter X.

+ এই প্রবন্ধের অগ্নি দেবতা সম্বন্ধীয় প্যারার (৬) শেষের কয়েক লাইন দেখ।

‡ এই প্রবন্ধের ঋভু দেবতা সম্বন্ধীয় প্যারার (৯) শেষ ভাগ দেখ।

যম ও তাঁহার ভগ্নী যমীর জন্ম হয়। বিবস্বান অর্থ আকাশ। Max Muller বলেন "দিবাই যম, এবং রাত্রীই যমী। সরণ্যুর বিবস্বানের সহিত বিবাহ হইয়াছে, অর্থাৎ উষা আকাশকে আলিঙ্গন করিয়াছেন; সরণ্যা যমজদিগকে রাখিয়া অন্তর্হিত হইলেন অর্থাৎ উষা অদৃশ্য হইল; দিবা হইয়াছে, বিবস্বান্ দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিলেন, অর্থাৎ স্বায়ংকাল আকাশকে আলিঙ্গন করিল"।*

Max Muller আরও বলেন, "প্রাচীন ঋষিগণ যেরূপ পূর্ব্বদিক্‌কে জীবনের উৎপত্তি স্থান মনে করিতেন, পশ্চিমদিক্‌কে সেইরূপ জীবনের অবসান মনে করিতেন। সূর্য্য সেই পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া পশ্চিম-দিকে অস্তহিত হইতেন, অর্থাৎ জীবনের পথ ভ্রমণ করিয়া পরলোকের পথ দেখাইতেন। এইরূপে যম পরলোকের রাজা এই অনুভব উদয় হইল।†

বৈদিক যম হইতে যেমন পৌরাণিক যম রূপান্তরিত হইয়াছে, তেমনি ইরাণী যমও রূপান্তরিত হইয়াছে। অবস্থায় যম 'যিম' বলিয়া পরিচিত। ইনি প্রথম রাজা এবং আদি সভ্যতার সৃষ্টিকর্তা। ইঁহার পিতার নাম বিবনুঘৎ, বৈদিক বিবস্বান। অবস্থায় এইরূপ আছে,—

"অহুর মজ্‌দ উত্তর দিলেন, হে জারাথস্ত্র! তোমার পূর্ব্বে শোভনীয় যিম নামক মর্ত্ত্যের সহিত আমি প্রথমে কথা কহিয়াছিলাম, তাহাকেই আমি অহুরের ধর্ম্ম, জারাথস্ত্রের ধর্ম্ম, শিক্ষা দিয়াছিলাম। হে জারা-থস্ত্রে! আমি অহুর মজ্‌দ তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে হে বিবনুঘতের পুত্র শোভনীয় যিম! তুমিই আমার ধর্ম্মের বাহক ও প্রচারক হও।"

—জেন্দ অবস্থা প্রথম ফার্গাদ।

সুবিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত Burnouf প্রথম আবিষ্কার করেন যে জেন্দ অবস্থার জিম, থ্রেতেয়ন এবং কেরেশাস্প ঋগ্বেদের যম, ত্রৈতন এবং কৃশাশ্ব।

* Science of Language (1882). Vol II. p. 556.
† Science of Language (1882). Vol II. P. 562.

সৎকথা।

(স্বামী অদ্ভুতানন্দ)

যে সৎকর্ম্ম করে সেই ভগবানের সন্তান।

যে ভগবানের বিরুদ্ধে চলে সেই কুসন্তান।

মতলব করে গেরুয়া পরা খারাপ! মতলব অর্থাৎ ভগবানে শ্রদ্ধা ভক্তি যদি হয় কোন দোষ নেই, তবে অন্য বদ মতলব হলে খারাপ এবং ভগবানের কাছে দোষী।

তাঁর ত হুকুম—সাধু ভক্ত যা অসৎ তা ফেলে দেয়, সৎগুলি লয়।

দশ অবতারে কর্ম্মের মিল নেই, তবে উদ্দেশ্য সকলেরই এক।

কর্ম্মফল ভোগ করিতেই হবে। সৎকর্ম্মই কর আর অসৎকর্ম্মই কর।

ভগবানকে না দেখে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা হওয়া কি কম ভাগ্যের কথা? যার এরূপ হয় সে কত ভাগ্যবান।

সাধুর শিষ্য হওয়া ভাগ্য বৈকি! সে তাঁর গুরুর কিছু কিছু গুণ অর্থাৎ দয়া-ধর্ম্ম পাবেই।

আমরা মায়াতে ভালবাসি। ভালবাসা কি সোজা জিনিস। অবতার-মহাপুরুষেরা ভালবাসা কাহাকে বলে জানেন।

এমন এক একটা মানুষ জন্মায় কত শক্তিমান, কত লোককে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়, আবার এমন মানুষ জন্মায় নিজেই চলিতে পারে না।

যার দ্বারা বহু লোকের কল্যাণ হয় সে কত বড় লোক সে আমার পূজনীয়। ওকে বলে ভগবৎশক্তি, জীবশক্তি নয়।

মানুষই মানুষকে ঠকাচ্ছে।

যে ভগবানকে না জানতে পারে তার সহিত পশুর কি তফাৎ, পশু খায় দায় ঘুমোয় তারপর মরে গেল, মানুষও তাই। কোন প্রভেদ নাই।

মায়াতেই ত কষ্ট দেয়। যে মায়া ছেড়ে ভগবানের শরণ লয়, সে ভাগ্যবান বৈকি?

সংযমই হলো প্রধান। সংযম করতে করতে ভগবানের মহিমা বুঝা যায়।

পণ্ডিত আর ত্যাগী বহু তফাৎ।

সৎসঙ্গে স্বর্গে যাওয়া যায়।

গুরু শাস্ত্র, পুরাণ, বেদান্ত বলছেন, যে ভগবানের পথে নিয়ে যায় সেই ত পিতা ভাই—বন্ধু।

ধ্যান জপ না করলে কি বাসনা যায়?

তাঁকে ডাকা বৃথা হয় না। তাঁকে ডাকিলে তিনি একটা সুবিধা করেই দিবেন।

ভগবান আর জীব বহু তফাৎ। ভগবানের কর্ম্ম আর জীবের কর্ম্ম বহু তফাৎ।

ভালবাসা কাহাকে বলে তা জীব জানে না, নিঃস্বার্থ ভালবাসা এক ভগবানই জানেন।

নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর দ্বারা চৈতন্য মহাপ্রভু প্রকাশ হলেন। নিত্যানন্দকে না মানলে চৈতন্য মহাপ্রভুকে মানা হবে না।

নিজে না বুঝলে কেউ বুঝাতে পারে না।

ত্যাগ-বৈরাগ্য-তিতিক্ষা-কঠোর ফেলে দিলে সে ধর্ম্ম করবে কি?

জীব অপরের নিন্দা করে সুখ পায় কেন? নিজেকে বড় করার জন্য।

ধর্ম্ম যত গোপন থাকে ততই ভাল।

ভোগ যতই বাড়াবে ততই বাড়বে। ভোগ যতই কমাবে ততই কমবে।

জ্ঞানীরা সমাধিকে মায়া বলে। উহাও মায়ার খেলা।

সত্যকে জানাই প্রধান।

যার কিছু নেই সে আবার ত্যাগ করবে কি। সব থাকতে থাকতে ত্যাগ—সেই ত্যাগ। যেমন চৈতন্য মহাপ্রভু, বুদ্ধদেব ইত্যাদি।

তিনি বলতেন যে, জগৎ দেখে ভুলিও না. জগৎ-কর্ত্তাকে জানবার চেষ্টা কর।

টাকা ও যৌবন এ দুটী কম নয়। যে এদের হাত থেকে পার হয় তার উপর ভগবানের খুব দয়া।

রোগ, শোক অশান্তি হলে সংসারীরা দমন করতে পারে না, হতাশ হয়ে পড়ে। সাধুরা দমন করতে পারে, জানে এ তাঁরই খেলা; সাধু ও গৃহস্থে এই তফাৎ।

যত দিন বাঁচ ততদিন সাধুসঙ্গ কর। সাধু সঙ্গে কি কেউ কষ্ট পায় ?

যে মেয়ে ধর্ম্ম করবে সে ত মেয়ে নয়, সে ত দেবী, সকলেই কি সীতা হয়। সীতার কৃপায় মেয়েরা দেবী হয়।

তিনি বলতেন যে, সাধুরা শেষকালে জীবে দয়া লয়ে থাকেন। যতটুকু জীবের কল্যাণ হয়।

(জগতের) সব ভুলা যায়, সংসার ভোলা সামান্য কথা, তাঁকে ভোলা যায় না।

তাঁহাতে মিশে গেলে সংশয় যায়।

কর্ম্মফল ভুগবেই ভুগবে জানুক আর নাই জানুক। যে জানতে পারে সে ভাগ্যবান।

মানুষ অহংকার, অভিমানে বলে,—কোথায় ভগবান ?

জীবের কোন ময়োদ নেই : কারও কাছে ভগবান প্রকাশ হচ্ছেন, কারও কাছে অপ্রকাশ গোপন—বেইমানি জোচ্চরি নেই।

জীব টাকা উপায় করে স্ফূর্ত্তি পায়। কেউ তাঁর দয়া বুঝতে পারে। এ সব মিথ্যা সৃষ্টিও কেহ নাশ করবে না, যার কাছে গোপন নেই, তার কাছেই যাওয়া উচিৎ।

মানুষের এমনি মায়া যে কর্ম্ম দেখতে পেয়েও বিশ্বাস হয় না।

যে ভগবান, ভগবান করে জীবন কাটাতে পারে সেই ভগবান। ভগবানের উপর বিশ্বাস হওয়া কঠিন। কত সংশয় এসে পড়ে। কত কষ্টে বিশ্বাস হল, আবার তার বিশ্বাস ধ্বংস করে দিল। অত দিনের

মেহনৎ বৃথা হয়ে গেল। তার যে কি গতি হবে? যাঁরা সাচ্চা তাঁরা বিশ্বাস বাড়িয়ে দেন, এঁরা বোঝাই করে দিতেন।

শরীর ছাড়তেই হবে তবে যার জগৎ তাঁকে জেনে শরীর ছাড়া ভাল।

এ দুনিয়ায় কেহ আত্মীয় নেই। টাকাই এক আত্মীয়।

আগে ধ্যান, জপ করে মন বসলে তারপর সন্ন্যাস। ধ্যান-জপ নেই খালি গেরুয়া পরলে কি হবে।

যার দ্বারা উপকার হয়, ধর্ম্ম হয়, সেই লক্ষ্মী।

যে ধর্ম্ম দেয়, সেই ত বন্ধু, ভাই—গুরু।

সাধুরা কত কষ্ট করে, কঠোর করে একটু তাঁর আনন্দ পায়, সেই আনন্দ কত যত্ন করে রাখে লোকের সঙ্গে মিশে না।

ঘৃণিত পাপী কেউ নেই। তবে কর্ম্মই ঘৃণিত, পাপী করে।

সকলেই তাঁর সন্তান তবে যে সন্তান তাঁর শরণ লবে, তার ত ধ্বংস নেই।

যত চিত্ত শুদ্ধ হবে, তিনি তত শক্তি দেন, জানিয়ে দেন।

তুলসীদাস ভগবান রামচন্দ্রকে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তাই তাঁর কথা এত জোর-পবিত্র।

সাধুর কৃপায়, গুরুর আশীর্ব্বাদে ভগবান লাভ হয়।

যুধিষ্ঠির মহারাজ, ভীষ্ম, বিদুর শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের উপর নিঃসংশয় ছিলেন। অর্জ্জুনের সংশয় ছিল, তাই তাঁর দ্বারা অত কর্ম্ম করিয়ে লইলেন।

ভগবান কি কোন কালে ছোট হয়? আমরা জীব কর্ম্ম নেই তাই বুঝতে পারি না।

সমালোচনা ও পুস্তক পরিচয়।

স্থপতি বিজ্ঞান—শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। বাঙ্গালা ভাষায় এইজাতীয় নির্ম্মাণোপকরণ গ্রন্থ অতি অল্প। ইংরাজী ভাষায় এ বিষয় বহুগ্রন্থ থাকিলেও এতদ্দেশীয় অল্প সংখ্যক লোকই উহাদ্বারা উপকৃত হইয়া থাকেন। দেশীয় সাধারণ কণ্ট্রাক্টর, রাজমিস্ত্রি সূতার প্রভৃতি যাঁহারা গৃহাদি নির্ম্মাণে নিযুক্ত হন, তাঁহাদের ব্যবহারিক জ্ঞানের দৃঢ়তা লাভ করার জন্য বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত এইরূপ একখানি গ্রন্থের নিতান্তই প্রয়োজন। আমাদের মনে হয় প্রফুল্ল বাবুর পুস্তকখানি দেশের সে অভাব দূর করিবে। নির্ম্মাণোপকরণগুলি শুষ্ক ও নীরস সত্য কিন্তু ভাষার পরিপাট্যে, যথোপযুক্ত শব্দের ব্যবহারে ও প্রণালী বদ্ধ রূপে লিখিত হওয়ায় বিষয়গুলি বেশ সরল ও সরস হইয়াছে। গৃহস্থ ব্যবসায়ী ছাত্র সকলেই পুস্তকখানি পাঠে লাভবান হইবেন সন্দেহ নাই।

আরোগ্য—দিগ্দর্শন—মহাত্মা গান্ধী প্রণীত—শ্রীকিরণ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় অনুদিত। ইহাতে স্বাস্থ্য ব্যতিরেকে নীতি ও ধর্ম্মের কথাও লিখিত আছে। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি ব্যাধি, জলে ডুবা প্রভৃতি আকস্মিক দুর্ঘটনার চিকিৎসাও অতি সরল ভাবে বিবৃত আছে। জল, বায়ু, পোষাক, ব্যায়াম ও খাদ্যাখাদ্যের বিচার সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা পাইবেন। ব্রহ্মচর্য্য, সন্তান পালন ও প্রসব সম্বন্ধে বহু নূতন তথ্য আছে। মহাত্মাজি লিখিয়াছেন, "ইহা বালক বালিকাদের শিক্ষায় অবশ্য শিক্ষণীয় (Compulsory) বিষয় হওয়া কর্ত্তব্য।" "আমি এই পুস্তকে এমন কথা কিছুই লিখি নাই যাহা আমার নিজের অথবা অপরের জীবনে পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই।"

সংবাদ ও মন্তব্য

১। ব্রহ্মানন্দ স্মৃতি-সভা—বসিরহাট।

ক। রামকৃষ্ণ মিশনের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজি মহারাজ বিগত ১৩ই মে ব্রহ্মানন্দ স্মৃতি-সভা উপলক্ষে বসিরহাট গমন করেন। সেখানে দ্বিতীয় মুনসেফ শ্রীযুক্ত পশুপতি মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। ১৪ই মে সুবিখ্যাত পণ্ডিত ৺কালীবর বেদান্তবাগীশের জন্মস্থান পুঁড়া গ্রামে সদালাপ সভার বাৎসরিক অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তথায় স্বামী শুদ্ধানন্দজি ও বাসুদেবানন্দ স্বামী "বেদান্ত ও সেবা সম্বন্ধে" বক্তৃতা করেন। পল্লীস্থ অপরাপর ভদ্রমণ্ডলীও নানাপ্রবন্ধপাঠ করেন। ১৫ই মে বসিরহাটের স্কুল হলে স্মৃতি সভার অধিবেশন হয়। সেখানে শিবানন্দজি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। স্বামী শুদ্ধানন্দজি ও স্বামী বাসুদেবানন্দ শ্রীশ্রীব্রহ্মানন্দজি সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। অপরাপর ভদ্র মণ্ডলীও তাঁহার সম্বন্ধে গান, ইংরাজী ও বাঙ্গালা প্রবন্ধ এবং কবিতা পাঠ করেন। শ্রীশ্রীমহারাজের স্মৃতি রক্ষা কল্পে একটী দাতব্য বা ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠান নির্ম্মাণের জন্যে একটী সমিতি গঠিত হয়। ১৬ই মে তিনি শ্রীশ্রীমহারাজের জন্মস্থান সিকরা-কুলীন গ্রাম দর্শনের জন্য গমন করেন এবং ১৭ই মে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

খ। পর সপ্তাহে রবিবার ২৮শে মে সিকরা গ্রামে শ্রীশ্রীমহারাজের স্মৃতি উৎসব হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা, রাম-নাম, কালীকীর্ত্তন ও হরিসংকীর্ত্তনের পর দরিদ্র ও ভদ্রনারায়ণ সেবা হয়। বেলুড় মঠ হইতে ১১জন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী গমন করেন। বৈকালে সভার অধিবেশন হয়। গ্রামস্থ জনৈক ভদ্রলোক তাঁহার বাল্য লীলা পাঠ করেন। পরে স্বামী বাসুদেবানন্দ, এবং সুবিখ্যাত বক্তা শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র ঘোষাল শ্রীশ্রীমহারাজের সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। এই উৎসব উপলক্ষে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজির আগমনের কথা ছিল কিন্তু অসুস্থতা নিবন্ধন আসিতে পারেন নাই।

গ। গত ৯ই বৈশাখ শনিবার শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দের দেহ রক্ষায় শোক প্রকাশনার্থ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতির (ডিব্রুগড়) ব্যবস্থায় এক

বিশেষ সাধারণ অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় স্বামীজির পুণ্যময় অলৌকিক জীবনের আলোচনা করিয়া প্রত্যেক বক্তাই তাঁহার বিরহ ব্যাথা প্রকাশ করেন। তৎপরে সর্ব্ব-সম্মতি ক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাব দুইটী গৃহীত হয়।

(১) শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দের দেহ রক্ষায় সমগ্র জাতির যে মহান্ ক্ষতি হইল তাহা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিয়া এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে।

(২) আগামী আশ্বিন মাসের মধ্যে যিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দের উৎকৃষ্ট জীবনী লিখিতে পারিবেন, সমিতি তাঁহাকে একটী রৌপ্য-পদক প্রদান করিয়া সম্মানিত করিবেন।

শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র সিংহ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

বাগদাদে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব।

(রামকৃষ্ণ মিশনের সেক্রেটারি শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ জিকে লিখিত জনৈক ভক্তের পত্র হইতে উদ্ধৃত।)

পরম ভক্তি ভাজনেষু—

এখন উৎসব সম্বন্ধে কিছু আপনাকে জানাইব। আপনি শ্রীশ্রী-ঠাকুরের ভক্তগণকে জানাইবেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসবের প্রায় এক সপ্তাহ পূর্ব্বে আমার একটী বন্ধুর সহিত একটী পত্রিকার পৃষ্ঠা উল্টাইতে উল্টাইতে মায়ের ইচ্ছায় ৺ঠাকুরের জন্মোৎসবের ছবিটী বাহির হইল। তখন আমার প্রাণে ৺ঠাকুরের জন্মোৎসব করিবার বাসনা জন্মিল। কয়েকটী অন্তরঙ্গ বন্ধুদের নিকট ঐ বিষয়ে কথা উত্থাপন করিলাম। মায়ের ইচ্ছায় তাঁহারা সাহস ও একান্ত উৎসাহ দেখাইলেন। তখনও ভাবি নাই যে কার্য্য এতদূর গড়াইবে। যাহা হউক তাঁহার নাম লইয়া আমাদিগের মধ্যে কয়েকটীতে মিলিয়া চাঁদার খাতায় নাম লিখিলাম। দেখিতে দেখিতে ১৪০৲ কি ১৫০৲ টাকা উঠিল। বন্ধুরা সকলেই উৎসাহী ও কর্ম্মঠ। মায়ের ইচ্ছাপূর্ণ হইল। কে কোন কার্য্যের ভার লইবে তাহা অবিলম্বে ঠিক হইয়া গেল। মায়ের ইচ্ছায় সমস্ত বোগদাদ সহরের ভারতবাসীকে জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে নিমন্ত্রণ

করা হইল। Bagdad Timesএ ছাপাইয়া দেওয়া হইল যে ঠাকুরের ভক্তগণ সমস্ত ভারতবাসীকে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসবে নিমন্ত্রণ করিতেছেন। ভোর ৫টা হইতে রাত্র ৮টা পর্য্যন্ত উৎসব স্থায়ী হইবে। প্রসাদ সর্ব্বদাই বিতরণ করা হইবে। এতদ্ব্যতীত যতদূর পারা গিয়াছে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠান হইয়াছে। এতবড় কার্য্যের ভার মাথায় লইয়া যে কতদূর চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলাম তাহা আর আপনাকে কি বলিব। আমাদের অধিকাংশ সময়ই অফিসের কার্য্যে ব্যয় হয়। বৈকালে যেটুকু সময় পাই তাহাই উক্ত কার্য্যে ব্যয় করি। যাহাহউক ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম যেন বৃষ্টি না হয়। কিন্তু কার্য্যের পূর্ব্বদিন ও তাহার আগের দিন রাত্রে মুসলধারে বৃষ্টি হইতে থাকিল। দ্বিপ্রহর রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিলে দেখি খুব বৃষ্টি হইতেছে। তখন বুকের মধ্যটা যেন ভয়ে ধুক্ ধুক্ করিতে লাগিল। তখন তাঁহার উপরেই পূর্ণ ভার দিলাম কিন্তু তথাপি থাকিয়া থাকিয়া মন হু হু করিতে থাকিল। ভগবানের ইচ্ছায় বেলা ১২॥ টায় বৃষ্টি থামিয়া রৌদ্র উঠিল। তখন মৃতপ্রাণে আশার সঞ্চার হইল। বন্ধুদের কৃপায় চাঁদা ৬০০ টাকা উঠিল। ঠাকুরের পূজার ভার আমার উপর পড়িল। যাহারা প্রসাদ রান্নার ভার লইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে যিনি দক্ষ তিনি অতিশয় রুগ্ন ব্যক্তি। তাঁহার চারিখানি হাত পা যেন চারিখানি হাড়। আমি তাঁহার উপর পূর্ণ আশা করিতে পারি নাই কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় উৎসবের পূর্ব্ব দিন বেলা ১।৩টা হইতে তিনি কার্য্য আরম্ভ করিলেন সমস্ত রাত্রি গেল, পরদিন সমস্ত দিন গেল। কিরূপে তিনি যে এত পরিশ্রম করিলেন আমি তাহা ভাবিতেই পারি না। আর প্রসাদ যে কি সুন্দর হইয়াছিল তাহা আজও নানাজাতীয় লোকের মুখে শুনিতে পাই। ভোর হইতেই লোক আসিতে থাকিল। বেলা দুইটার পর জনস্রোত যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল! হিমালয় হইতে কুমারিকা অন্তরীপ আর ওদিকে বেলুচিস্থান, প্রায় সকল স্থানের লোকই দয়া করিয়া আসিয়াছিলেন। সে যে কি আনন্দ হইয়াছিল তাহা যাহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা চিরকাল মনে

করিয়া রাখিবেন। মন্দিরটী অতি সুন্দর ভাবে সজ্জিত করা হয়। হিন্দু, মুসলমান, পার্শী খ্রীষ্টান সকল জাতীয় লোকই ছিলেন। ভোর-কীর্ত্তন, উদ্বোধন, বাল্যভোগ, পূজা, আরতি ভোগ, ঠাকুরের জীবন সম্বন্ধে আলোচনা, এতদ্ব্যতীত দুইটী খৃষ্টীয়ান ভদ্রলোক অতি সুন্দর বক্তৃতা করেন। এতদ্ভিন্ন আর একটী বাঙ্গালী ভদ্রলোক ও ঠাকুর সম্বন্ধে সুন্দর ভাবে বলেন। লোকের মন এতদূর তন্ময় হইয়াছিল যে মনে হইল যেন প্রত্যেকেই এরাজ্য ছাড়িয়া কোনও ভাব রাজ্যে চলিয়া গিয়াছেন। এই একদিনের জন্য সমস্ত ভারতবাসীর একত্র মিলনে আজ এখানে কি এক অভিনব ভাব আনিয়া দিয়াছে, যে তাহার পর হইতে আমাদের মধ্যে যেন প্রীতির বন্ধন আরও দৃঢ়তর হইয়াছে। কত এদেশীয় দরিদ্র-নারায়ণ আসিয়াছিলে, তাহারা কেমন আগ্রহের সহিত প্রসাদ খাইয়াছিল। সবল আরবী শিশুদিগের অবাধ নৃত্য যে দেখিয়াছে, সেই মুগ্ধ হইয়াছে। তাহারা হাতে তাই দিয়া ৬ঠাকুরের নাম গান করিয়াছিল। প্রসাদ এত অপর্য্যাপ্ত হইয়াছিল যে দুহাতে দিয়া কমে নাই। সুবিখ্যাত আব্দুল-কাদের-পিপানীর-মস্‌জিদ্ হইতে সুবৃহৎ ডেক্‌চি ও হাঁড়ি আনা হয়। যেরূপ সুন্দর ভাবে কার্য্য হইয়াছে তাহা লিখিয়া ব্যক্ত করিতে পারিব না। যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। তাঁহার ইচ্ছা। লোক সংখ্যা অনেকে অনুমান করেন প্রায় ৫ শত বা হাজার হইবে। এখন এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর কার্য্যে দিনগুলি যাইতেছে।

সেবক শ্রীজ্ঞানরঞ্জন ব্রহ্মচারী

৩। শিলংএ স্বামী অভেদানন্দ। রামকৃষ্ণ মিশনের বর্ত্তমান ভাইস-প্রেসিডেন্ট শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজি মহারাজের শিলংএ অবস্থান কালে তত্রস্থ নগরবাসীরা বিগত ৩০মে কুইন্‌টন মেমোরিয়াল হলে তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন। রায় উপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল বাহাদুর, রায় মহেন্দ্রকুমার গুপ্ত বাহাদুর, রায়সাহেব কমলাকান্ত বরুয়া, রায় অনুপম চাঁদ সাঙ্গানারিয়া বাহাদুর, মৌলবী বিলায়েত আলি, প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

তত্রস্থ ধর্ম্ম-সভাকর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া তিনি বিগত ৩রা জুন অপেরা হলে "উন্নতিশীল হিন্দুধর্ম্ম" সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। এবং ১৬ই জুন কুইনটন্ মেমোরিয়াল হলে "বেদান্তের বার্ত্তা" সম্বন্ধে আর একটী বক্তৃতা করিয়াছেন।

মহাসমাধি।

বিগত ৫ই শ্রাবণ, শুক্রবার অপরাহ্ণ ৬টা ৪৫ মিঃ সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তবৃন্দের অশেষ আশাভরসা ও জুড়াইবার স্থল, প্রাণস্পর্শী জীবন্ত বাণীর শক্তিকেন্দ্র, তপঃপরায়ণ, শাস্ত্রদর্শী পরম পূজ্যপাদ স্বামী তুরীয়ানন্দ (হরি মহারাজ) ৺কাশীধামে শ্রীগুরুর নিত্য জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপে সম্মিলিত হইয়া তুরীয়পদে চিরশান্তি লাভ করিয়াছেন। দীর্ঘ সাধনার তপোপূত, আকুমার অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্যের স্বর্গীয় জ্যোতিঃতে ভাস্বর—তাঁহার পুণ্যশরীর, বিগত দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া কঠিন বহুমূত্র রোগের সহিত সংগ্রাম করিতেছিল। ইহার ফলে সংখ্যাতীত দুষ্ট-ব্রণ ও স্ফোটকাদির তীব্র, মর্ম্মন্তুদ যাতনা তিনি নীরবে সহিয়া আসিতেছিলেন। এবার মাসাবধি পূর্ব্বে একটী সামান্য পৃষ্ঠ-ব্রণ দেখা দিল। কলিকাতার ও স্থানীয় সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণের পরামর্শে ও যত্নে তিনি উহা হইতে আবার সারিয়া উঠিবেন, ইহাই সকলের দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল। বিশেষতঃ ইতঃপূর্ব্বে ইহা অপেক্ষা দ্বিগুণ প্রাণসঙ্কট অবস্থা হইতেও তিনি আরোগ্য হন, ইহা সকলেরই স্মরণে ছিল। ক্রমে ঐ ক্ষুদ্র ব্রণ একটী বৃহৎ দুষ্টব্রণে পরিণত হইল।

বৃহস্পতিবারেও কেহ ভাবিতে পারেন নাই যে, তিনি কালই আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন। কারণ দুই চারি দিন পূর্ব্ব হইতে তাঁহার অবস্থা উহারই মধ্যে অপেক্ষাকৃত ভালই হইতেছিল। শরীর ত্যাগের দিন ও পূর্ব্বরাত্রে তিনি যে সমস্ত কথাবার্ত্তা বলিয়াছিলেন তাহার অর্থ তখন সম্যক্ বুঝা যায় নাই। কিন্তু এখন বেশ বোধ হইতেছে যে, তিনি তাঁহার আশু শরীর ত্যাগের বিষয় পূর্ব্ব হইতেই জানিয়া আমাদিগকে উহার আভাষ দিয়াছিলেন এবং নিজেও উহার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। তাঁহার অমানুষিক সহ্যগুণ দেখিয়া সকলেই

চমৎকৃত ও বিস্মিত হইয়াছিল। ইতঃপূর্ব্বে রোগ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে সহসা দীপ্ত কেশরীর গম্ভীর স্বরে তিনি বলিয়া উঠিলেন "আমি এ সব (যন্ত্রণা, ক্ষত ইত্যাদি) গায়েই করি না। "কি হয়েছে!—কার?" সেবক বলিলেন "না,—কিছুই হয় নাই—আপনার কি হবে?"

প্রায় পাঁচ-ছয় দিন পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন "আর পাঁচ-ছয় দিন খুব আনন্দ ক'রে নাও"। উঠিয়া বসিতে অনেক সময় তাঁহার ইচ্ছা হইত এবং নিকটে যাহাকে দেখিতেন তাহাকে সম্বোধন করিয়া উঠাইয়া বসাইয়া দিতে বলিতেন। আবার বসাইয়া দিবার পরে তাঁহার দুর্ব্বল অবস্থা দেখিয়া যদি কেহ তাঁহাকে ধরিয়া থাকিত তাহা হইলে বিরক্ত স্বরে বলিতেন "ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও, আমাকে ধ'রো না—আমি আপনি ব'স্‌ব—গায়ে হাত দিয়ো না, গায়ে হাত দিয়ো না।" বর্ত্তমান অসহযোগ-আন্দোলনের কথা প্রায়ই হইতে তিন আলোচনা করিয়া করিয়া উহার ফলাফল নির্দ্ধারণে চেষ্টা করিতেন। এই সময় কয়েকবার "C. R. Das, C. R. Das" নামটী উচ্চারণ করিতে শুনা গিয়াছিল—যেন ভ্রান্ত বা অভ্রান্ত যাহাই হউন তাঁহার নিঃস্বার্থতার জন্য আজ। আশীর্ব্বাণী দিয়া গেলেন।

শরীর ত্যাগের দুই এক দিন পূর্ব্ব হইতেই আহারে তিনি সম্পূর্ণ বীতরাগ হইয়াছিলেন। অসহ্য যন্ত্রণা সহিয়া তিনি মনের অলৌকিক সংযম ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছেন। Tocsin Poisoning সত্ত্বেও অনেক সময় সুস্থ মানুষের ন্যায় কথাবার্ত্তা কহিতেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তিনি যেরূপ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিলেন ও তাঁহার তন্দ্রার ভাব বৃদ্ধি পাইতেছিল তাহাতে আমাদের সকলের আশঙ্কা হইয়াছিল—বুঝি বা শেষে তাঁহার দেহ অজ্ঞানাবস্থায় চলিয়া যায়।

কিন্তু মহাপুরুষের মনের অবস্থা যে কিরূপ তাহা অশুদ্ধ অন্তর লইয়া আমরা কি করিয়া বুঝিব? শরীর ত্যাগের কয়েক মিনিট পূর্ব্বে তিনি সহসা যেন অন্য লোক হইয়া গেলেন এবং সমস্ত রোগ যন্ত্রণা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া সুস্থ মানুষের ন্যায় ভগবানের নাম করিতে করিতে মহাসমাধিতে মগ্ন হইলেন।

শরীর রক্ষার পূর্ব্বরাত্র-শেষে তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠেন "কাল শেষ দিন—কাল শেষ দিন"—আবার ইংরাজীতে—"Last Day"। তখন সে কথা কেহ সত্য বলিয়া ভাবিল না।

অদ্য প্রাতে তাঁহার গুরুভ্রাতা পূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজ (স্বামী অখণ্ডানন্দ) নিত্য প্রাতে তাঁহাকে দেখিতে আসিয়া "সুপ্রভাত" বলিতেন এবং তিনিও "এস দাদা, এস ভাই, সুপ্রভাত, সুপ্রভাত" এইরূপ উত্তর দিতেন। পরে "আমরা মায়ের—মা আমাদের" "মা আমাদের—আমরা মায়ের—বলো, বলো।" এইরূপ বারম্বার বলিতে লাগিলেন এবং "সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে" ইত্যাদি বলিয়া মহামায়ার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলেন। শুনা যায় দুপরে ও বিকালেও এইরূপে প্রণাম করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক কিছুক্ষণ পরে "বড় যন্ত্রণা হচ্ছে"—এই কথা প্রকাশ করিয়া,—"তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ক তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হচ্ছে, লোকে জানতে পাচ্ছে না।"

অদ্য শুক্রবার তিনি সেবকদের কাহারও কোন কথা শুনিতে চাহিতেছিলেন না এবং বিরক্তস্বরে সকলকে বাহির হইয়া যাইতে বলিতে লাগিলেন। আমাদের মনে হয় তাহাদিগের উপর তাঁহার যে বহুদিনের স্নেহ মমতার বন্ধন ছিল মহাপ্রস্থানের পূর্ব্বে তাহাই ছিন্ন করিবার জন্য তিনি ঐরূপ করিতেছিলেন। কারণ, ঐ দিন জনৈক মহারাজকে (স্বামী প্রবোধানন্দ) বলিয়াছিলেন—"তোমরা আমায় ছেড়ে দাও, তোমরা আমায় ছেড়ে দাও, তা' হ'লেই নিশ্চিন্ত হ'তে পারি।" উক্ত সেবক তদুত্তরে—"আমরা ছেড়ে দিয়েছি। আপনি নিশ্চিন্ত হ'ন।" উহার একটু পরেই বলিলেন—"সব হ'য়ে গেছে?" উত্তরে সেবক বলিলেন—"আজ্ঞে হাঁ।" তিনি বলিলেন—"তবে যাই, তবে যাই।" সেবক চুপ করিয়া রহিলেন।

ঐ দিন কোনরূপ খাদ্য মুখে দিলেই তিনি থু থু করিয়া ফেলিয়া দিতে থাকেন ও ঔষধ একেবারেই খাইতে চাহেন নাই। তাঁহার ঐরূপ আচরণে সেবকেরা গঙ্গাধর মহারাজকে ডাকাইলে তিনি তাঁহাকে বলেন—"আমার বন্ধন খুলে দাও,—বন্ধন খুলে দাও—কি এ সব?"

এবং তৎক্ষণাৎ ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া দেওয়া হইলে শান্ত ভাবে সেবককে বলেন —"খুলে দিয়েছ,—বেশ করেছ—একটু গায়ে হাত বুলিয়ে দাও।" গঙ্গাধর মহারাজের অনুরোধে এই সময় একবার ঔষধও খান।

বৈকালে Dressing হইবার পর তিনি আপন মনে মাঝে মাঝে ইংরাজীতে কথা বলিতে লাগিলেন। "গুরুদাস,—গুরুদাস" (জনৈক আমেরিকান ভক্ত)। গঙ্গাধর মহারাজের এবং আরও কাহার কাহার নাম করিতে শোনা গেল। এই দিন বৈকালে কয়েকবার "শরৎ, শরৎ" (স্বামী সারদানন্দ) বলিয়াছিলেন। তাঁহাকে এইরূপ কথা কহিতে দেখিয়া গঙ্গাধর মহারাজ বলিলেন "আপনি একটু ঘুমান।" উত্তরে বলিলেন—"Yes, I want that"। কিছুক্ষণ পরে পার্শ্বে উপবিষ্ট জনৈক সেবককে ডাকিয়া বলিলেন—"Can you make me get up?" তখন সেবক বলেন—"মহারাজ, আপনার কষ্ট হ'বে।" "That's a mistake on your part"—এই কথাটী বলেন"। আবার বলিলেন—"আর কে আছে?" তখন সনৎ মহারাজের নাম করায় তিনি অতি গম্ভীর স্বরে 'সনৎ' বলিয়া ডাকিয়া (সুস্থ অবস্থায় যেরূপ ভাবে ডাকিতেন) বলিলেন—"আমায় বসিয়ে দাও।" তাঁহাকে বসাইয়া দেওয়া হইল,—কিন্তু বসিতে পারিলেন না। মাথা ঝুঁকিয়া পড়িল। তখন বলিলেন—"Can't you give me *strength*, Can't you give me *strength*? আমায় তুলে ধ'র, তুলে ধ'র।" নিজে সোজা হ'য়ে বসিতে চেষ্টা করিলেন। এবং অসমর্থ হইয়া "মহামায়া" নামটী দুইবার উচ্চারণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার ঊর্দ্ধদৃষ্টি দীর্ঘশ্বাসের লক্ষণ দেখিয়া তাঁহার ঘোর অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে শোয়াইয়া দেওয়া হইল। অল্পক্ষণ স্থির হইয়া থাকিবার পর তিনি সুপ্তোত্থিতের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন—"প্রভু, প্রভু!" "তখন গঙ্গাধর মহারাজ তাঁহাকে— "দাদা, দাদা" বলিয়া সম্বোধন করায় বলিলেন—"ঠাওর ক'র্ত্তে পারছি না।" পরে বলিলেন—"হরে র্নামৈব, হরে র্নামৈব। ওঁ রামকৃষ্ণঃ, ওঁ রামকৃষ্ণঃ, —আমায় বসিয়ে দাও।" ইতিমধ্যে ডাক্তার বি, কে, বসু আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি উঠাইতে নিষেধ করিলেন এবং সেবককে একটু

ব্রাণ্ডি খাওয়াইতে বলিলেন। কিন্তু পূজনীয় হরিমহারাজ উহা খাইলেন না; ডাক্তার স্বয়ং খাওয়াইতে যাইলে বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিলেন। তাহার পর বলিলেন—"কৈ, বসিয়ে দাও, বসিয়ে দাও, বসিয়ে দাও।" বেশ বোধ হইল যেন আসনে বসিয়া শরীর ত্যাগ করিবার একান্ত ইচ্ছা। কিন্তু যখন দেখিলেন যে তাঁহাকে বসাইয়া দেওয়া হইল না, তখন বলিলেন—"সব বোকা—কেউ বুঝ্‌তে পাচ্ছে না। শরীর যাচ্ছে, প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে। পরে বলিলেন পা টেনে সোজা ক'রে দাও।" একটু টানিয়া দেওয়া হইলে বলিলেন—"টান টান, ভাল ক'রে টেনে সোজা ক'রে দাও ও হাত তুলে ধর, হাত তুলে ধর তোলো—তোলো তোলো—আরও তোলো।" ঐরূপ করা হইলে দুই হাত জোড় করিয়া "জয়গুরুদেব, জয় গুরুদেব, জয়রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ" বলিয়া প্রণাম করিলেন। আমরা অন্তিম অবস্থা বুঝিয়া এই সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণামৃত দিলে নিরাপত্তিতে দুইবার পান করিলেন। এবং বলিলেন—"সব সত্য—ব্রহ্ম সত্য, সংসার সত্য, জগৎ মিথ্যা নয়—সব সত্য, সত্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত, হাত তুলে ধ'র—জয় গুরুদেব, জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ—বলো, বলো, সত্য-স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ।" গঙ্গাধর মহারাজ বলিলেন—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"। ইহা শুনিয়া যেন খুব আনন্দের সহিত বলিলেন—"হুঁ; ঠিক,—বলো"। তখন পূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজ আবার "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" বলিলেন এবং তিনিও উহা উচ্চারণ করিলেন। তখন গঙ্গাধর মহারাজ আবার বলিলেন। তিনি কেন উহ উচ্চারণ না করিয়া বলিলেন "বস্"—এবং সঙ্গে সঙ্গে সমাধিমগ্ন হইলেন। মনে হইল যেন ঘুমাইয়া পড়িলেন। শরীরে বিকৃতি বা যন্ত্রণার চিহ্নমাত্র আর দেখা গেল না। এবং মুখমণ্ডল স্বর্গীয় প্রসন্নতায় ও মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সারারাত্র ভজনপাঠাদিতে কাটাইয়া শনিবার প্রাতে নয়টার সময় ভক্তমণ্ডলী তাঁহার পুণ্য শরীর আরত্রিকাদির পর মণিকর্ণিকায় জলসমাধি দিয়াছিলেন।

"সম্মার্জ্জনীর মর্ম্মকথা"

(শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়

হীন আমি অতি হীন

এ বিশ্ব মাঝারে।

হেয়জ্ঞানে রাখে দূরে

মানব আমারে।

নীচ নহে হে মানব ?

আমার অন্তর।

উচ্চভাব পুষিয়াছি

হিয়ার ভিতর।

দেখিতে যদিও হীন

উপর মলিন।

রহিয়াছি দাস সম

তোমার অধীন।

ঘৃণাভরে তুমি মোর

করে'ছ বেহাল।

আমি তব দূর করি

যতেক জঞ্জাল।

কথা প্রসঙ্গে।

হিন্দুধর্ম্মে যেরূপ খাদ্যাখাদ্য বিচার দৃষ্ট হয় এরূপ অপর ধর্ম্মে অতি বিরল। আর অধুনাতন ভারতবর্ষে যে স্পর্শদোষের কঠিন নিগড় আমাদের জাতীয় জীবন শিথিল করিয়া দিয়াছে, তাহার কারণ অশাস্ত্রীয় খাদ্যাখাদ্য বিচারের মধ্যেই নিহিত। হিন্দুজাতির সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ শ্রুতি। "আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ।" (ছান্দগ্য শ্রুতি, ৭ম প্রঃ, ২৬শ খণ্ড)। অর্থাৎ আহার শুদ্ধ হইলে চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং চিত্ত শুদ্ধ হইলে স্মৃতি শক্তি দৃঢ় হয়।" এক্ষণে চিত্ত শুদ্ধ নিশ্চয়ই করিতে হইবে নচেৎ ব্রহ্ম ধারণা অসম্ভব, কাজে কাজেই আহারের সদাসৎ বিচারও অবশ্যম্ভাবী।

* * * * *

শ্রীভগবান অর্জ্জুনোপদেশে 'আহার' তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন— সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস।

> আয়ুঃ সত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতি বিবর্দ্ধনাঃ।
> রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥
> কট্বম্ল লবণাত্যুষ্ণ তীক্ষ্ণরূক্ষবিদাহিনঃ।
> আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময় প্রদাঃ
> যাতযামং গতরসং পূতিপর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
> উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্

গীতা। ১৭অ। ৮। ৯। ১০।

"আয়ু বৃদ্ধি বল আরোগ্য সুখ ও প্রীতির বৃদ্ধি যাহার দ্বারা হয়, যাহা রসযুক্ত, স্নিগ্ধ, যাহার ফল বহুকাল থাকে, এবং যাহা হৃদয়ের তৃপ্তিকর, সেইরূপ আহারই সাত্ত্বিকগণের প্রিয়। অতি কটু, অতিশয় লবণযুক্ত, অত্যন্ত উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, দাহকর ও দুঃখশোকাময়প্রদ (দুঃখ শোক ও পীড়াদায়ক) আহার রাজস ব্যক্তির ইষ্ট হইয়া থাকে। যাহা মন্দপক্ক, নীরস, দুর্গন্ধযুক্ত, পর্য্যুষিত (গত রাত্রিতে পক্ক), উচ্ছিষ্ট এবং

অপবিত্র, সেই প্রকার ভোজনই, তামস প্রকৃতি জীবের প্রিয় হইয়া থাকে।" এখানে শ্রীভগবান আহার বিভাগে ছুঁতমার্গের পোষক কোনও শব্দই ব্যবহার করেন নাই।

* * * *

আচার্য্য শঙ্কর নিজে ছুঁতমার্গী ছিলেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নাই। তিনি শারীরক ভাষ্যে যদিও শ্রুতির অযথা ব্যাখ্যা (বেদান্ত সূত্র, ১অ, ৩পা, ৩৪ সূত্রের ভাষ্যে) করিয়া শূদ্রের বেদাধিকার নিরাশ করিয়াছেন—তথাপি পূর্ব্বপক্ষের যুক্তি সেখানে অটুট সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বর্ণাশ্রম "গুণকর্ম্ম বিভাগ" ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম॥

গীতা॥ ৪। ১৩॥

"মানবের গুণকর্ম্মানুযায়ী আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারিবর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি। আমাকে ইহার কর্ত্তা বলিয়া জানিবে, কিন্তু পরমার্থতঃ আমি কর্ত্তা নহি।" কিন্তু আচার্য্যের মত সাত্ত্বিকাদি "গুণ এবং কর্ম্ম" কুলগত; অর্থাৎ কাহারও ব্রাহ্মণকুলে জন্ম হইলেই বুঝিতে হইবে "শমোদমস্তপঃ" তাহাতে আছেই।—পরন্তু লোকে এরূপ দৃষ্ট হয় না।

কিন্তু তাঁহার "আহার" শব্দটীর ব্যাখ্যা অতি অপূর্ব্ব। ইহা সকলকেই মানিতে হইবে। তিনি ছান্দগ্য শ্রুতির ভাষ্যে লিখিতেছেন "আহ্রিয়ত ইত্যাহারঃ শব্দাদিবিষয়বিজ্ঞানম ভোক্তুর্ভোগায়াহ্রিয়তে। তস্য বিষয়োপলব্ধিলক্ষণস্য বিজ্ঞানস্য শুদ্ধিরাহারশুদ্ধিঃ। রাগদ্বেষ মোহদোষৈরসংসৃষ্টং বিষয়বিজ্ঞানমিত্যর্থঃ। তস্যামহারশুদ্ধৌ সত্যাং তদ্বতোঽন্তঃকরণস্য সত্ত্বস্য শুদ্ধির্নৈর্ম্মল্যং ভবতি। সত্ত্বশুদ্ধৌ চ সত্যাং যথাবগতে ভূমাত্মনি ধ্রুবা অবিচ্ছিন্না স্মৃতিরবিস্মরণং ভবতি। (ছান্দগ্য উঃ। ৭ প্রঃ। ২৬ খঃ ২য় মঃ ভাষ্য)। অর্থাৎ যাহা আহরণ করা যায় তাহাই আহার; যথা, রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ। ভোক্তা ভোগের নিমিত্ত আহরণ করেন।

এক্ষণে রূপ-রসাদি বিষয়-বিজ্ঞানের শুদ্ধি অর্থে আহার শুদ্ধি বুঝিতে হইবে। রাগদ্বেষাদির দ্বারা অসংস্পৃষ্ট বিষয় বিজ্ঞানই সদাহার। সেই আহার শুদ্ধি হইলে অন্তঃকরণের নৈর্ম্মল্যও হইয়া থাকে। আর চিত্ত শুদ্ধ হইলে ভূমা আত্মাতে ধ্রুবা—অবিচ্ছিন্ন স্মৃতিঃ—অবিস্মরণ হয়। বিষয়—আহার, ইন্দ্রিয়—মুখ, এবং চিত্ত—ভোক্তা এবং সদ্‌বিষয়—সদাহার।'

* * * *

আচার্য্য রামানুজ 'আহার' অর্থ সাধারণ ভাবেই ধরিয়াছেন। তিনি তাঁহার শ্রীভাষ্যে ঈশ্বর দর্শনের নানা উপায়ের মধ্যে একটী উপায় বিবেক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিবেক অর্থে নানা বিষয়ের সদাসদ বিচার এবং তাহার মধ্যে আহারের সদাসৎ বিচার একটী বিশেষ বিচার্য্য বিষয়। তিনটী দোষে আহার দুষ্ট হয়,—(১) নিমিত্ত দোষ অর্থাৎ বালি, ধূলা, কেশ প্রভৃতির দ্বারা যে আহার দুষ্ট হয়; এ বিষয়ে সকলেই নজর রাখিতে পারেন; খাদ্য সম্বন্ধে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সকলেরই রক্ষা করা উচিৎ। (২) জাতি-দোষ অর্থাৎ আহারের গুণগত দোষ, যাহা শ্রীভগবান গীতায় রাজস ও তামস বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। নিজ নিজ শারীরিক ও মানসিক অবস্থা ভেদে সকলেই বিচার করিয়া রাজস ও তামস জাতীয় আহার পরিত্যাগ করিতে পারেন। (৩) আশ্রয়দোষ—অসৎ লোকের খাদ্য আহার করিলে তাহার অসৎসত্তা ভোক্তাতে বর্ত্তায়। যাঁহারা যোগী তাঁহারা দৃষ্টিমাত্র আহারের আশ্রয় দোষ বুঝিতে পারেন এবং এই আশ্রয় দোষকেই আহার সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট দোষ বলিয়া ধরিয়া থাকেন। শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ জীবনে এই দোষ পর্য্যবেক্ষণের বহু দৃষ্টান্ত আছে। এমন কি অসৎলোকের লোভদৃষ্টিতে দুষ্ট আহারও তিনি ধরিতে পারিতেন।

* * * *

আশ্রয় দোষকে অবলম্বন করিয়াই ছুঁৎমার্গের উৎপত্তি। যোগী ব্যতীত আশ্রয় দোষ ধরিবার ক্ষমতা কাহারও নাই, তথাপি আমরা আজ সকলেই যোগী সাজিয়া বসিয়াছি। আমরা ধরিয়া লইয়াছি যে নীচ

জাতিরা অসৎ, অতএব উচ্চবর্ণের নিকট তাহাদের জল অচল সেই হেতু তাহাদের স্পর্শ করা বা ঘরে প্রবেশ করিতে দেওয়া উচিত নয়! কিন্তু যদি কোনও ব্যক্তি অসং হইয়াও উচ্চবর্ণ হয়, তাহা হইলে তাহার সাতখুন মাপ—যেমন বেশ্যাসক্ত, মদ্যপায়ী ব্রাহ্মণ, পাচক বা পূজারী হইলেও ক্ষতি নাই।

* * * *

যাঁহাদের মধ্যদিয়া আমরা ভগবানকে বুঝি ও জানি, যাঁহাদিগকে আমরা অবতার বলি, তাঁহারা বলিতেছেন,—

চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ।

হরিভক্তি বিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥—শ্রীচৈতন্য।

"যে হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করে, কিন্তু ঈশ্বর লাভ করতে চায় না, তার হবিষ্যান্ন গোমাংস-তুল্য হয়। আর যে গোমাংস ভক্ষণ করে কিন্তু, ভগবানকে লাভ করবার চেষ্টা করে, তার পক্ষে গোমাংস হবিষ্যান্নের তুল্য হয়।"—শ্রীরামকৃষ্ণ। কিন্তু—.

স্বর্গীয় মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের শাশুড়ী একদিন পরমহংসদেবকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তোমরা বেশ আছ, সংসারে থেকে ভগবানেতে মন রেখেছ।" তিনি বল্লেন "কই, আমাদের আর কিছুই হল না; এখনও আমি যার তার এঁটো খেতে পারি না।" তখন ঠাকুর বল্লেন, "সে কি গো? যার তার এঁটো খেলেই কি সব হল? কুকুর শেয়াল সবারই এঁটো খায়, তা বলেই কি তাদের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়েছে?"—একক্ষণে পাঠকপাঠিকা নিজেরাই শাস্ত্রের খাদ্যাখাদ্য এবং স্পর্শ-দোষ সম্বন্ধে কি সিদ্ধান্ত নিজেরাই বিচার করিয়া দেখুন।

* * *

শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।

সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাৎ ত্রিভিগুর্ণৈঃ॥ গীতা ॥১৮।৪০॥

"পৃথিবীতে কিম্বা স্বর্গে দেবগণের মধ্যে এমন কোন প্রাণী নাই,

যাহারা এই প্রকৃতিজ তিনটি গুণ (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ) হইতে বিমুক্ত।" সেই হেতু,—

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।

কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ। গীতা ॥১৮।৪১॥

"হে পরন্তপ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রগণের কর্ম্মসমূহ স্বভাব-প্রভব-গুণ-নিবহের দ্বারা প্রবিভক্ত হইয়া থাকে।" স্বভাব জিনিষটী পূর্ব্ব জন্মকৃত সংস্কার। সেই হেতু দাসীর গর্ভে নারদ, উর্ব্বশীর গর্ভে বশিষ্ঠ, বেশ্যাগর্ভে সত্যকাম, ধীবরীর গর্ভে ব্যাস, শূদ্রার গর্ভে বিদুর জন্মগ্রহণ করিয়াও ব্রহ্মজ্ঞানী। পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিলেই,—

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।

জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্ গীতা ১৮।৪২

"শম, দম, তপঃ, শৌচ, ক্ষমা, সারল্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং আস্তিক্য, ব্রাহ্মণের এই স্বাভাবিক কর্ম্ম"—দৃষ্ট হয় না।

* * *

সত্ত্ব শক্তিকে কেহই কোন কালে বা দেশে বিধি নিষেধের দ্বারা ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই। "তস্মাচ্ছূদ্রো যজ্ঞেঽনবক্লৃপ্তঃ" (তৈঃ, সং, ৭, ১, ১, ৬) শূদ্রোবিদ্যায়ামনবক্লৃপ্তঃ," "স্ত্রী শূদ্র দ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতি গোচরা" প্রভৃতি বিধি-বন্ধনের পার্শ্বে উদার নীতি সকলও বর্ত্তমান আছে, যথা,—"ন বিশেষাস্তি বর্ণানাং," "অসৃজৎ ব্রাহ্মনানেব পূর্ব্বং ব্রহ্মা প্রজাপতীন্," "হিংসানৃত প্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ। কৃষ্ণাঃ শৌচা পরিভ্রষ্টা স্তেদ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ মহাভা. ১০, ১৮৮,—১০, ১, ৩), "বিশ্বামিত্রা দশানাং তুম্রপ্রাঃ (মহাভা, ১-১-১৮), "যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যঃ। ব্রহ্ম রাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায় চারণায় (শু, যজু, মাধ্যন্দিনীয়া শাখা ২৬ অ. ২য় ম)। স্ত্রী-মন্ত্র দ্রষ্টার উদাহরণও বেদে যথেষ্ট আছে যথা, লোপমুদ্রা, বিশ্ববারা, শাশ্বতী, অপালা, ঘোষা, রাত্রি, জুহূ, সূর্য্যা, যমী, শচী, উর্ব্বশী, সরমা এবং বাক্। আবার দাসীপুত্র, অব্রাহ্মণ, কিতব (জুয়ারি) ঋষি কবষ ঋগ্বেদের বহু মন্ত্রের দ্রষ্টা এবং রাজা কুরু শ্রবণের যজ্ঞের ঋষি।

আচার্য্যগণের ব্যবস্থা

(শ্রীবিহারী লাল সরকার, বি, এল।)

১। চারিটী আচার্য্য।

আচার্য্যগণ অতি করুণ। তাঁহারা জীবের মঙ্গলের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তুমি আমি কি বুঝি, কি জানি? নিজে একটা পন্থা গড়িতে পারিব না। আমাদের মাথা হইতে যাহা বাহির হইবে সেটা কিম্ভুত কিমাকার একটা উদ্ভট হইবেই। কারণ শক্তি কোথায়? মনে করিলেই তো শক্তি হয় না। আচার্য্যেরা মহাশক্তিশালী। তাঁহাদের শক্তির ইয়ত্তা করা যায় না। তাহার উপর তাঁহারা জীবন ব্যাপী সাধনা করিয়াছেন। সাধনা করিয়া দেখিয়া নিজে বুঝিয়া একটা সম্প্রদায় খাড়া করিয়া গিয়াছেন; লোকে মানুক গণুক ভারতীয় আচার্য্যগণের মনে কখনও এভাব উঠে নাই। তাঁহাদের সাধু উদ্দেশ্য। জীব তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত পথে গমন করিলে ইষ্টলাভ করিবে। এই ভারতবর্ষে প্রধানতঃ চারটী আচার্য্যের মত খুব চলিতেছে। ১। শঙ্করাচার্য্য, ২। রামানুজাচার্য্য, ৩। মধ্বাচার্য্য, ৪। বল্লভাচার্য্য।

২। রামানুজাচার্য্য।

পূজ্যপাদ রামানুজাচার্য্যের মতে তত্ত্ব ত্রিবিধ—চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর।

ঈশ্বর।

স্বভাবতঃ নিরস্ত-সমস্ত-দোষ, অনবধিক, অতিশয়, অসংখ্যেয় কল্যাণ-গুণ বিশিষ্ট, যাহা হইতে এই জগতের সৃষ্টি স্থিতিলয় রূপ লীলা হইতেছে, তিনিই ব্রহ্ম। তাঁহাকেই বাসুদেব বা পুরুষোত্তম বলা হয়। অতএব তিনি সগুণ অর্থাৎ কল্যাণ গুণাকর, ও নির্গুণ অর্থাৎ নিখিল হেয় প্রত্যনীক।

বাসুদেবঃ পরং ব্রহ্ম কল্যাণ গুণ সংযুতঃ।
ভুবনানামুপাদানং কর্ত্তা জীবনিয়ামক ইতি॥

কল্যাণ গুণ সংযুত পরব্রহ্মই বাসুদেব। তিনি জগতের উপাদান ও নিমিত্ত এবং জীবের নিয়ামক।

সেই ব্রহ্মই চিৎ অর্থাৎ পুরুষ, অচিৎ অর্থাৎ প্রকৃতি, উভয়ের আত্মা এবং অন্তর্যামী। পুরুষ ও প্রকৃতি তাঁহার শরীর। তিনি আত্মারূপে অবস্থিত, অতএব উভয়ই তাঁহার প্রকার বা বিধান। প্রলয়ে জগৎ অব্যাকৃত বা অব্যক্ত অবস্থায় ব্রহ্মে থাকে, সৃষ্টিকালে নাম রূপ দ্বারা ব্যাকৃত বা ব্যক্ত হয়। কার্য্যাবস্থাপন্ন প্রকৃতিপুরুষ ও কারণাবস্থাপন্ন প্রকৃতিপুরুষ উভয়ই তাঁহার শরীর। তিনি আত্মারূপে উভয়াবস্থায় অবস্থিত।

ভেদাভেদ বাদ।

প্রকৃতি তাঁহার শরীর, অতএব প্রকৃতি ও ব্রহ্ম অভিন্ন। জগৎ পরিণামী ও বিকারশীল, ব্রহ্ম অপরিণামী ও নির্ব্বিকার। অতএব ব্রহ্মের তুলনায় জগৎ অসৎ ও অবস্তু। জীব নিয়ম্য ও ব্রহ্ম নিয়ামক; জীব অল্পজ্ঞ ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ; অতএব জীব ও ব্রহ্ম স্বতন্ত্র বস্তু। ব্রহ্ম অখণ্ড অতএব জীব ব্রহ্ম খণ্ড হইতে পারে না। তবে জীব ব্রহ্মের বিভূতি এজন্য ব্রহ্মের অংশ বলা যায়, যেমন প্রভাকে অগ্নির অংশ বলা যায়। আবার জীব যখন ব্রহ্মের শরীর ব্রহ্মাত্মক তখন জীবব্রহ্মে ভেদও বটে অভেদও বটে, এজন্য এই মতের নাম ভেদাভেদ বাদ।

চিৎ ও অচিৎ।

জীব পরমাত্মা হইতে ভিন্ন, নিত্য ও অণু। অচিৎ ত্রিবিধ—ভোগ্য, ভোগোপকরণ-ইন্দ্রিয় ও শরীর।

মায়া।

রামানুজ মতে "মায়া" শব্দে অনির্ব্বচনীয়া অজ্ঞানরূপা বুঝায় না; কিন্তু বিচিত্রার্থ সৃষ্টিকর্ত্রী ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে বুঝায়।

তত্ত্বমসি।

'তত্ত্বমসি' বাক্যের অর্থ—'তৎ' শব্দে নিরস্ত সমস্ত দোষ, অনবধিক, অতিশয়, অসংখ্যেয় কল্যাণ গুণের আস্পদ, ব্রহ্ম বুঝায়। "তৎ" পদ দ্বারা যিনি চিদ্ বিশিষ্ট, জীব যাঁহার শরীর সেই ব্রহ্মকেই বুঝায়। অতএব সামানাধিকরণ দ্বারা একই বস্তুর প্রকার ভেদ বুঝাইতেছে।

বাসুদেবের পঞ্চবিধ মূর্ত্তি।

বাসুদেব পরম কারুণিক ও ভক্তবৎসল। ভক্তবাৎসল্য হেতু তিনি লীলা করেন। লীলা হেতু অর্চ্চা, বিভব, ব্যূহ, সূক্ষ্ম ও অন্তর্যামিরূপ পঞ্চবিধ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অবস্থান করিতেছেন।

(ক) অর্চ্চামূর্ত্তি অর্থাৎ প্রতিমা।

(খ) বিভব মূর্ত্তি অর্থাৎ রামাদি অবতার সমূহ।

(গ) ব্যূহ মূর্ত্তি অর্থাৎ বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্ন-অনিরুদ্ধ।

[বাসুদেব-পরমাত্মা। সঙ্কর্ষণ-জীব। প্রদ্যুম্ন-মন। অনিরুদ্ধ-অহঙ্কার।]

(ঘ) সূক্ষ্ম সম্পূর্ণ ষড়্গুণ। [অপহত পাপ্মা, বিরজ, বিমৃত্যু, বিশোক, বিজিঘৎস অর্থাৎ অক্ষর, সত্যকাম-সত্যসংকল্প।]

(ঙ) অন্তর্যামী মূর্ত্তি জীবের হৃদয়স্থ ও জীব প্রেরক।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব মূর্ত্তি উপাসনা দ্বারা দুরিত ক্ষয় হইলে, উত্তরোত্তর মূর্ত্তিতে উপাসনার অধিকার জন্মে। অর্থাৎ অর্চ্চা মূর্ত্তির উপাসনা করিলে বিভব মূর্ত্তির উপাসনার অধিকার হয়। এইরূপ সর্ব্বশেষ অন্তর্যামী মূর্ত্তিতে উপাসনার অধিকার হয়।

উপাসনা।

উপাসনা পাঁচ প্রকার।

(১) অভিগমন—ভগবৎস্থানের মার্জ্জন, লেপন ইত্যাদি।

(২) উপাদান—গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ দান।

(৩) ইজ্যা—পূজা।

(৪). স্বাধ্যায়—মন্ত্রজপ, নাম জপ, স্তোত্র পাঠ, নামসংকীর্ত্তনাদি, ভগবৎশাস্ত্র অভ্যাস।

(৫) যোগ—একাগ্রচিত্তে ভগবদনুসন্ধান বা ধ্যান।

কর্ম্মজ্ঞান সমুচ্চয় বাদ।

রামানুজ মতে জৈমিনীর পূর্ব্বমীমাংসা ও ব্যাসের উত্তর মীমাংসা একই শাস্ত্র। পূর্ব্বমীমাংসার কর্ম্ম উপদেশ। কর্ম্ম না করিলে জ্ঞান হয় না। সেই হিসাবে পূর্ব্বমীমাংসা কারণ উত্তরমীমাংসা কার্য্য। অতএব উভয় শাস্ত্রে কার্য্য কারণ সম্বন্ধ রহিয়াছে। কর্ম্মফল নশ্বর, জ্ঞান অবিনশ্বর

বুঝিলে কর্ম্মে বৈরাগ্য আসে। বৈরাগ্য হইলে, তবে মোক্ষে প্রবৃত্তি হয়। অতএব কর্ম্মবিশিষ্ট জ্ঞানই মোক্ষের সাধন।

অন্ধংতমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।
বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্‌বেদোভয়ং সহ
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।

যে শুধু অবিদ্যার উপাসনা করে সে অন্ধতমতে প্রবেশ করে। যে শুধু বিদ্যাতে রত সে অধিকতর তমতে প্রবেশ করে। যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়কে জানেন তিনি অবিদ্যার দ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যার দ্বারা অমরত্ব লাভ করেন।

অতএব অবিদ্যা অর্থাৎ কর্ম্ম, বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান, এই উভয়ের সমুচ্চয়ই মুক্তির সাধন। অবিদ্যা কর্ম্ম, বিদ্যা জ্ঞান।

জ্ঞানের অর্থ কি ?

রামানুজ মতে জ্ঞান শব্দের অর্থ ধ্যান-উপাসনা, বাক্য জন্য জ্ঞান নহে। ধ্যান কি ?—তৈল ধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন স্মৃতি। এই স্মৃতিই মোক্ষের উপায়। এই স্মৃতি দর্শনসমানাকারা। ভাবনার প্রকর্ষ হইতে স্মৃতি দর্শনেরমত হইয়া থাকে।

শ্রুতিতে আছে—

যমেবৈষঃ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।

হরি যাকে কৃপা করেন তিনিই তাঁকে লাভ করেন।

গীতাতে আছে—

তেষাং সতত যুক্তানাম্ ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধি যোগং॥

আমাতে আসক্ত চিত্ত প্রীতি পূর্ব্বক ভজনাকারীদের জ্ঞান দিই। ভগবানের ভক্ত এইরূপ ধ্যান দ্বারা তাঁহাকে লাভ করেন।

রামানুজ মতে নিরতিশয় আনন্দ, প্রিয়, অনন্য-প্রয়োজন সকল-ইতর-বৈতৃষ্ণ্য-রূপ যে জ্ঞানবিশেষ উহাকেই ভক্তি বলে। পঞ্চবিধ উপাসনায় অল্পে অল্পে ভক্তি নামক জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ধ্যানাদি সহ ভক্তি দ্বারাই

ভগবৎ সাক্ষাৎকার হয়। এমন কি একমাত্র ভক্তি দ্বারাই ভগবৎ প্রাপ্তি হইতে পারে। ভক্তি জ্ঞান বিশেষ,ইহা"ইতর-বৈতৃষ্ণ্য-রূপিণী।"ভগবান ব্যতীত অপর সর্ব্ববস্তুতে যখন বৈতৃষ্ণ্য জন্মে তখন যে ভক্তি হয়, সেই ভক্তিই প্রকৃত ভক্তি। অতএব বৈরাগ্য ব্যতীত ভক্তি হইতে পারে না। বৈরাগ্য সত্ত্বশুদ্ধি হইতে জন্মে। সত্ত্ব শুদ্ধি আহারাদির শুদ্ধি হইতে জন্মে। ত্রিবিধ আহার বর্জ্জনীয় জাতি-দুষ্ট, স্পর্শ-দুষ্ট ও আশ্রয় দুষ্ট। জাতি-দুষ্ট যেমন পেঁয়াজ লশুন ইত্যাদি। এই কয়টী সাধনা দ্বারা ভক্তি সিদ্ধ হয়।

(১) বিবেক অর্থাৎ সত্ত্ব শুদ্ধি। আহার শুদ্ধি হইতে সত্ত্ব শুদ্ধি হয়।

(২) বিমোক—কামানভিষঙ্গ।

(৩) অভ্যাস—পুনঃপুনঃ অনুশীলন।

(৪) ক্রিয়া—শ্রৌত স্মার্ত্ত কর্ম্মানুষ্ঠান।

(৫) কল্যাণ—সত্য, আর্জ্জব, দয়া, দান।

(৬) অনবসাদ—দৈন্যবিপর্য্যয়।

(৭) অনুদ্ধর্ষ—তুষ্টি।

সিদ্ধি।

এইরূপ ধ্যানরূপা ভক্তি দ্বারা পুরুষোত্তম পদ লাভ করা যায়। বাসুদেব এইরূপ সাধককে

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্

অনন্তকালস্থায়ী পুনরাবৃত্তি রহিত স্বপদ প্রদান করেন। মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মের ন্যায় সমান ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হন কিন্তু সারূপ্য প্রাপ্ত হন না।

৩। মধ্বাচার্য্য।

তত্ত্ব দ্বিবিধ।

মধ্বমুনিকে হনুমানের অবতার বলে। তাঁর মতে জীব অণু, ভগবানের দাস, বেদ নিত্য ও অপৌরুষেয়, পঞ্চরাত্র শাস্ত্রই জীবের আশ্রয়নীয়, জগৎ সত্য। তত্ত্ব দ্বিবিধ স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র। ভগবান বিষ্ণু স্বতন্ত্র,জীব ও জগৎ অস্বতন্ত্র।

হরি কে?

যাঁহা হইতে উৎপত্তি, স্থিতি, সংহার, নিয়তি, জ্ঞান, আবৃত্তি, বন্ধ, মোক্ষ হয় তিনিই হরি! তিনি সকলের প্রভু। হরি শাস্ত্র প্রমাপক।

শাস্ত্র কি?

ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব, ভারত, পঞ্চরাত্র মূল রামায়ণ এই কয়টী শাস্ত্র।

মায়া।

মায়া শব্দের অর্থ ভগবদিচ্ছা।

তত্ত্বমসি।

তত্ত্বমসি প্রশংসা বাক্য ছাড়া আর কিছু নহে যেমন "যূপ আদিত্য" অর্থাৎ যজ্ঞকাষ্ঠ সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল।

ভেদ বাদ।

জীব ও হরিতে সম্পূর্ণ ভেদ আছে। (১) জীব ও ঈশ্বরে ভেদ (২) জড় ও ঈশ্বরে ভেদ (৩) জীবের মধ্যে ভেদ (৪) জড় ও জীবে ভেদ (৫) জড়ের মধ্যে নানা ভেদ—এই পঞ্চবিধ ভেদ সত্য ও অনাদি।

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ।

ব্রহ্মা, শিব, সুরাদির শরীর ক্ষর হেতু—তাঁহারা ক্ষর, লক্ষ্মী অক্ষর। হরি লক্ষ্মী হইতেও শ্রেষ্ঠ।

ভগবানের দাস্য জীবের অবলম্বনীয়।

বিষ্ণুর প্রাসাদ ব্যতিরেকে মোক্ষলাভ হয় না। প্রাসাদ সংগ্রহ তাঁহার গুণোৎকর্ষ জ্ঞান হেতু হয়। নিজের হীনত্ব বিষ্ণুর গুণোৎকর্ষ যিনি কীর্ত্তন করেন তাঁহার উপর বিষ্ণু প্রসন্ন হন। জীবের ভগবানের দাস্যই অবলম্বনীয়। ভগবানের সেবা ব্যতীত জীবের অন্য কর্ত্তব্য নাই। সেবা তিন প্রকার।

(১) অঙ্কণ—ভগবানের স্মরণের জন্য সুদর্শন চক্রাদি নারায়ণ অস্ত্রের প্রতিকৃতি দেহে অঙ্কণ।

(২) নামকরণ—পুত্রাদির নাম কেশব, কৃষ্ণ প্রভৃতি রাখা।

(৩) ভজন (ক) বাচিক (১) সত্যবাক্য (২) হিতবাক্য (৩) প্রিয়বাক্য (৪) স্বাধ্যায়।

(খ) কায়িক (১) দান (২) লোক পরিত্রাণ (৩) পরিরক্ষণ

(গ) মানসিক (১) দয়া (২) ভগবৎ স্পৃহা (৩) শ্রদ্ধা।

এই এক একটী সম্পন্ন করিয়া শ্রীনারায়ণে সমর্পণ করার নাম ভজন। এইরূপ সেবার দ্বারা ভগবানের প্রসন্নতা লাভ করা যায়। ভগবানের প্রসন্নতা লাভই পরম পুরুষার্থ।

বিষ্ণুর সামীপ্যই মোক্ষ।

বিষ্ণু প্রসন্ন হইয়া তাঁহার দাসকে মোক্ষ দান করেন।

মধ্বমতে বিষ্ণুর সামীপ্যই মোক্ষ।

বিষ্ণুং সর্ব্বগুণৈঃ পূর্ণং জ্ঞাত্বা সংসারবর্জ্জিতঃ।

নির্দুঃখানন্দভূক্ নিত্যং তৎসমীপে স মোদতে॥

সর্ব্বগুণপূর্ণ বিষ্ণুকে জানিলে সংসার নিবৃত্ত হয়, দুঃখের অবসান হয় ও নিত্য আনন্দ ভোগ হয়। তিনি তাঁহার সমীপে রহেন।

৪॥ বল্লভাচার্য্য॥

সেবা দ্বিবিধ।

বল্লভাচার্য্য বলেন গোলকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণই জীবের সেব্য। সেবা দ্বিবিধ সাধনরূপা ও ফলরূপা।

দ্রব্যার্পণ নিষ্পাদ্য ও কায়ব্যাপার নিষ্পাদ্য সেবা সাধনরূপা। আর শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ-চিন্তারূপা মানসী সেবা ফলরূপা। গোলকে গোপীভাব প্রাপ্ত হইয়া অখণ্ড রাসরসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণ ভগবানকে সেবা করাই পুরুষার্থ। ইহাই বল্লভাচার্য্যের মত। ইহাকে পুষ্টিমার্গ বলে।

৫। শঙ্করাচার্য্য॥

রামানুজ মতে ভক্তবৎসল ভগবান জীবকে স্বীয় আনন্দ ধাম দান করেন—উহাই মোক্ষ। মধ্বমতে বৈকুণ্ঠলোকে বিষ্ণুর সামীপ্যই মোক্ষ। আর বল্লভমতে গোলকে শ্রীকৃষ্ণের সহবাসই মোক্ষ।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলেন ভগবানের সেবার দ্বারা ভগবৎ সামীপ্য ও ভগবৎ স্থান লাভ করাই মোক্ষ নহে। পদে পদে সেবাপরাধ হইতে পারে। সেই জন্য পুনরায় সংসারে আসিতে হইবে। ভগবানের পার্ষদ, জয় বিজয়ে ইহার দৃষ্টান্ত। সালোক্য সামীপ্য গৌণ মুক্তি। উহা স্বর্গ ছাড়া আর কিছুই নহে। প্রশংসার জন্য স্বর্গকে অমৃত বলা হয়। কিন্তু নির্ব্বাণ মোক্ষই প্রকৃত অমৃত।

৬। সাধনা।

উপরে যাহা দেখা গেল তাহাতে বুঝা যায় শ্রীশঙ্করাচার্য্য জ্ঞানের পক্ষপাতী শ্রীরামানুজ জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির পক্ষপাতী শ্রীমধ্বমুনি সেবাভক্তির পক্ষপাতী আর শ্রীবল্লভ প্রেমাভক্তি বা প্রীতির পক্ষপাতী। নির্গুণ ব্রহ্ম ও অজয় আনন্দ লাভ, সগুণ ব্রহ্ম ও ভগবৎ সালোক্য, বিষ্ণু ও তাঁহার সামীপ্য, শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার সহবাস, এই চারিটী লোকচক্ষের সমক্ষে ধরা হইয়াছে। যাহার যেটী ইষ্ট সে সেইটী লাভ করুক এবং লাভ করিবার চেষ্টা করুক। মিছে তর্ক করিয়া, অদ্বৈতবাদ বা দ্বৈতবাদ-খণ্ডন করিয়া লাভ কি? এরূপ খণ্ডন করিয়া তোমার আমার কোন উপকার নাই। আচার্য্যেরা সম্প্রদায় কর্ত্তা। তাঁহারা নিজ নিজ মত দার্ঢ্যের জন্য বিপক্ষ মত খণ্ডন করিয়াছেন। আমরা যাহার হউক একজনের সিদ্ধান্ত লইব তাহা হইলেই আমাদের কল্যাণ হইবে। শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার সহবাস, বিষ্ণু ও তাঁহার সামীপ্য, সগুণ ব্রহ্ম ও ভগবৎ সালোক্য ইহার কোনটাই কম জিনিষ নয়। কোন একটী মতে সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিবার চেষ্টা করাই উচিত। কোন একটী মতে সিদ্ধির জন্য কিছু কিছু সাধনা করিলেও কতকটা কল্যাণ হইবে। কেবল কথা-কাটাকাটি করিয়া কোন উপকার হইবে না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সাধনা বলে সাধ্য বস্তু লাভের জন্য আচার্য্যগণের প্রবর্ত্তিত মার্গ অনুবর্ত্তন করা। নিজ মতলব অনুযায়ী যা' তা' করিলে ঠিক সাধনা হইবে না। লৌকিক বস্তু লাভ করিতে হইলেও প্রচলিত নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয়। অগ্রগামীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে হয়।

তাহা না করিলে নিজে পথ আবিষ্কার করিয়া অগ্রসর হওয়া যায় না। সেইজন্য আচার্য্যগণের প্রবর্ত্তিত মার্গ অনুগমন করিলে তবে সিদ্ধিলাভ করা যাইতে পারে। এই সব মহাত্মারা ঈশ্বর লাভের ভিন্ন ভিন্ন মার্গ প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত মার্গে যাওয়া ছাড়া সিদ্ধিলাভ করিবার অপর উপায় নাই।

কৃষ্ণ।

(শ্রীসাহাজি)

মোরে চাও তপোধন? হোথা তবে কেন অন্বেষণ?
শাশ্বত স্বরূপ মোর, বুঝনি কি এখনো, ধীমন্?
মথুরার রাজা নহি, নহি কংসদর্প নিসূদন,
যদুকুল মণি আমি নহি বসুদেবের নন্দন।
দেবকীর পুত্র নহি, রুক্মিণীর হৃদয় বল্লভ,
পার্থের সারথি নহি পাণ্ডবের সখা ও বান্ধব।
কৌরবের শত্রু নহি, নহি কুরুক্ষেত্রের নায়ক,
ভারতের দীক্ষাগুরু নহি আমি গীতার শিক্ষক।
প্রকৃতির নগ্ন শিশু, আমি কৃষ্ণ সহজ মানুষ,
সদামুক্ত সর্ব্ব-বন্ধ অকৃত্রিম অনাদি পুরুষ,
সরল স্বচ্ছন্দ সবি, নাহি মোর বন্ধনের লেশ,
শুভ্র স্বচ্ছ অনাবিল সবি মোর—সূচনা ও শেষ।
কপটতা, কৃত্রিমতা, অন্তঃশূন্য বাহ্য আবরণ,
সমাজের বুকে, করে—নীতি নামে নিত্য আস্ফালন—
সমাজ বন্ধন সেথা, হৃদয়ের সহজ বন্ধন,
করে নিত্য অপমান,—সেথা মোরে বৃথা অন্বেষণ।

আমি নিত্য লোকাতীত, নহে মোর সম্বন্ধ লৌকিক,
পতি নহি, পুত্র নহি, আমি পতি পুত্রেরো অধিক।
বসুদেব, দেবকীতে, রুক্মিণীতে মোরে অন্বেষণ,
সত্য কহি তপোধন! তাই তব বৃথা আকিঞ্চন।
স্নেহ প্রীতি দয়া প্রেম যেথা শুধু সমাজ বন্ধন,
প্রথামাত্র পরিণয় শৃঙ্খলিত সমাজ নিয়ম—
রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি কর্ম্মনীতি সমাজ বিধান—
মানুষের যত কিছু ভণ্ডামীর প্রকৃষ্ট প্রমাণ!
পশুত্বের পদতলে নরত্বের নিত্য অপমান।
মুক্তি কোথা?　সবি সেথা বন্ধনের নিয়ম বিধান।
গীতা বটে তপোধন! যোগযুক্ত কৃষ্ণের বচন,
আমি কিন্তু যোগাতীত, বৃন্দাবনে চরাই গোধন—
সরল সহজ শুদ্ধ—আমি সেথা রাখাল বালক,
সেথা শুধু প্রকৃতির অকৃত্রিম সহজ পুলক!
মুক্তা সেথা প্রভাতের শিশিরের শুভ্র বিন্দুচয়,
বহুমূল্য অলঙ্কার সেফালিকা স্বচ্ছ শোভাময়।
বসুদেব পিতা মোর, নন্দ সেথা পিতারো অধিক,
অকারণ সে বন্ধন, মুক্তি তার তুলনায় ধিক!
যশোদা জননী বটে, দেবকীর অধিক সেজন
সমাজের বাঁধভাঙ্গা মাতৃত্ব—কি বিপুল প্লাবন!
রুক্মিণী সে পতিব্রতা, সে যে মোর সমাজের দান,
রাধা মোর অকারণে আপনারে আপনি-বিলান!
নাহি সাক্ষী বিধি বাধা মধ্যস্থ কি ব্যবস্থা বিচার,
ধর্ম্ম কর্ম্ম নীতিমর্ম্ম,—লুপ্ত সেথা সমাজ সংস্কার:
সে যে শুধু নিজে মরে বেঁচে থাকা অন্যের মাঝার,
পত্নীত্বের বহু উচ্চে সে আমার,—আমি যে তাহার।
তাই আমি কত সুখী, শিরেধরি রাধার চরণ,
রাধা বিনা রুক্মিণী কি দিতে পারে আনন্দ এমন?

হায় ! নারী, হায় ! প্রেম, সবি শুধু সমাজ বন্ধন।
শাস্ত্র শাস্ত্র কর মুনি, বুঝ নি কি শাস্ত্রের মরম ?
নীতিকীট ! জান না কি শাস্ত্র শস্ত্র হ'তেও ভীষণ ?
মানুষের সবিগড়া—শাস্ত্রপুঁথি সংহিতা পুরাণ,
প্রাণের সহজ ধর্ম্ম, সহে নিত্য এরি অপমান।
সর্ব্ববন্ধনের সেবা মুক্তিভাণে এযে কি বন্ধন,—
কি কঠিন ! কি ভীষণ ! সত্য তাই শাস্ত্রাতীত ধন।
কোথা খোঁজ, তপোধন ! আমি কৃষ্ণ সহজ মানুষ,
ফেলে দাও ধর্ম্মকর্ম্ম—সভ্যতার মিথ্যা ও ফানুষ।
ধর্ম্মাতীত কর্ম্মাতীত, সর্ব্বাতীত আমি সারাৎসার,
নিত্য শুদ্ধ ব্রহ্মশিশু আমি মুক্ত সর্ব্ব সংস্কার।
বিকর্ম্মও কর্ম্ম হয়, কর্ম্ম হয় বিকর্ম্ম আবার,
একি বস্তু বিষামৃত, বুঝে দেখ বিচিত্র ব্যাপার।
অভেদ নরক স্বর্গ, পাপ পুণ্য সবি একাকার,
নরকেও স্বর্গফুটে, স্বর্গেফুটে নরক (ও) আবার।
অমৃতও বিষ হয়, বিষ হয় অমৃত পাথার।
হও মুক্ত সংস্কার। আবরণ মিথ্যা সভ্যতার—
খুলে ফেল, তপোধন। স্ব স্বরূপে দেখ চমৎকার,
সবি মুনি, একাকার—তুমি, আমি, জগৎ-সংসার।

ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজু কুটিল নানাপথ জুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥ মহিম্ন স্তোত্র॥ ৭॥

"জলরাশির সমুদ্রে যেমন গতি, ঋজু-কুটিল নানা পথ অনুবর্ত্তিগণের তুমিই একমাত্র গম্য। বেদ, সাংখ্য, যোগ, শৈব, বৈষ্ণব এই সকল জীবের রুচির বিচিত্রতা নিবন্ধন শাস্ত্রপথ ভিন্ন ভিন্ন। তাই এই মত শ্রেষ্ঠ ইত্যাদিরূপ বুদ্ধি হয়।"

অন্ধ-বিশ্বাস।

(শ্রীযতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্য-সাংখ্যতীর্থ, বি-এ)

গুটিকতক বন্ধু ও গুটিকতক ছাত্রকে নিয়ে প্রায় দেড় বৎসর পূর্ব্বে "মাতৃজাতি সেবক সমিতির" প্রতিষ্ঠা হয়। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল খুবই মহান্—সারাভারতের নারীজাতিকে স্বাবলম্বন লাভে সাহায্য করা, তাদের ভিতর হতে অজ্ঞানান্ধকার ও কুসংস্কার দূর করে দেওয়া, আর সেবা ও সাধনায় নারীকে পুরুষের সমকক্ষ করে তোলা। এতবড় বুকের পাটা! কিন্তু প্রথম মাসে, আমাদের জনবল হল—এক ডজন সভ্য, আর ধনবল মাত্র তিন চারি টাকা!

বন্ধু ফণী বল্‌লে, "আমি 'মাঠাকরুণকে' একবার যেমন করে পারি সমিতি ঘরে এনে ফেল্‌বো "তাঁর পায়ের ধূলা নিয়ে কাজ আরম্ভ করা যাবে।" কথাটা বেশ মিষ্টি লাগ্‌ল। প্রথম যোগাড়ায় মাঠাকরুণের পায়ের ধুলা! এযে romantic idea!

পদধূলি গ্রহণোপযোগী ঘর খুঁজছি এমন সময় সংবাদ এলো 'মাঠাকরুণ' দেহত্যাগ করেছেন। হতাশায় বুকটা এতটুকু হয়ে গেল, বোধ করি সেদিন 'মায়ের' নিষ্ঠুরতা ও উপহাসে চোক্ ফেটে জল পড়েছিল!

ভাঙ্গাবুক্, অন্ধকার ভবিষ্যৎ, জমাট বাঁধা অভিমান, আর খানকতক hand bill নিয়ে যেদিন 'মাঠাকরুণের' উৎসব, সেদিন বেলুড় মঠে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সম্মুখের দালানের মধ্যস্থলে 'মায়ের' ফটো পত্রপুষ্পে সজ্জিত! শত শত ভক্ত আশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্চে, চতুর্দ্দিকে নীরব সজীবতা।

সেই চেহারা, সেই রূপ সেই ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোমের সমষ্টি! তবে ক্ষিতি ও অপের ভাগ খুব কমবটে। সেই মা! সেই এলো কেশ! সতীর বেশ! সেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভক্ত জননী 'মাঠাকরুণ! যার যা গরজ সে অবশ্য তাই নিয়ে মাথা ঘামায়। আমি মায়ের পদতলে বসে মনেমনে প্রার্থনা কর্‌লুম্, "মা তোমার পাঞ্চভৌতিক শরীরকে একবার

সমিতি ঘরে নিয়ে যাবো বড় আশা ছিল! কিন্তু কি কারণে তুমি তোমার পাঞ্চভৌতিক শরীর নষ্ট করিলে, তুমিই জান, কিন্তু তোমার লিঙ্গ শরীর যদি এখনো নষ্ট করে না থাক, তবে একবার আমাদের সমিতি ঘরে চল আমাদের কাজটা একবার চালিয়ে দাও, তার পর আমরা পিছনে রয়েছি। মা তোমায় যেতেই হবে, আমাদের একটা বন্দোবস্ত করে দিতেই হবে। নীরবে প্রার্থনা করে, নীরবে দেশে (জনাইএ) ফিরে গেলুম্। তবে মাঠাক্‌রুণকে পরীক্ষা করবার একটা চালও যে ছিলনা তানয়। যেমন স্বামিজী ঠাকুরঘর প্রতিষ্ঠা করে তাঁকে পরীক্ষা করবার জন্য একটা ফন্দীবার করেছিলেন।

পরদিন কল্‌কাতার স্কুলে এসে শুন্‌লুম্ তিলক মহারাজের দেহ ত্যাগ হয়েছে। তৎক্ষণাৎ স্কুলের ছুটী হয়ে গেল। আমি জনাই হতে রোজ আনাগোনা করি, এখন যাবার গাড়ী নেই স্কুলের একটা বেঞ্চিতে শুয়ে রইলুম্। শুয়ে শুয়ে আকাশ পাতাল ভাবচি। কি ভাবচি? সমিতি। ছেলেবেলা হতে আমার নিজের ঘরের মা-বোনের ভাবের দৈন্য দেখে কেবলই মনে হতো মেয়েরা না জাগলে কিছুতেই দেশের কল্যাণ নেই। মেয়েদের উন্নতির জন্য এই যে প্রবল ইচ্ছা এটা একটা লক্কায়িত প্রবৃত্তির তাড়ণা অথবা কল্যাণকরী যাহোক্ কিছু, এইটে ভেবে ঠিক করতে আমার অনেক বছর কেটে গেছে। নিজেকে বুঝে নিজের চরিত্রের উপর বিশ্বাসী হয়ে তবে এই মাতৃজাতি সেবক সমিতি গঠন করেচি। তবে পথও নেই পাথেয়ও নেই। কি করে কার্য্যারম্ভ করি? কার শরণাগত হই? কাকে মনের কথা খুলে বলি? কাহাকেও পাই না যে!

সাত পাঁচ ভাবচি এমন সময় পোস্তার রাজা বেড়াতে বেড়াতে এঘর ও ঘর করতে করতে আমার কাছে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁরই স্কুল এটী, তবে এবাটীতে তাঁকে কখনো দেখিনি, কিন্তু তিনি এলেন! এসে যেচে আমার সঙ্গে কথা জুড়ে দিলেন! আমি আমার সমস্ত মতলবটা তাঁকে জানালুম্। তিনি শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে আমাদের সভ্য হয়ে গেলেন। সাংসারিকতার দিক্‌দিয়ে দেখতে গেলে—একটা মস্ত অবলম্বন নয় কি?

বৈকালে বুক ভরা উৎসাহ নিয়ে দেশে ফিরে গেলুম্। যেতে যেতে অবশ্য একবার বেলুড়মঠের সেই প্রতিমার দিকে মাথা হেঁট করেছিলুম্। কাকে একথা জানাব?—না না চাপা থাক্! হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে এ বিশ্বাস চাপা থাক্—এসব জিনিষ কি যাকে তাকে জানাতে আছে।

সেই হতে পোস্তার রাজা অনেক করেছেন, এখনো করেন। সে আর হেথায় কি জানাব? তার পর দু একদিনের মধ্যে ইন্দুদিদি এসে জুটলেন তিনি ঘোর উৎসাহে কার্য্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। মানাপমান তুচ্ছকরে আমাদের ভাওতায় ভিড়ে দেশের কাজে জীবন সঁপে দিলেন। তার পরই বরীন্দ্রকুমার ঘোষ সমিতি ঘরে এসে পড়লেন—তিনি এসেই ছাঁচ বদলাইয়া দিলেন—সমিতি পরমার্থ ভিত্তির উপর স্থাপিত হলো। বারীনবাবু আসাতে আয়ের পন্থা খুলে গেল, তাঁর বিরাট্ আমিত্ব ঢুকে সমিতি বেশ জমকাল হয়ে উঠ্ল অনেক মেয়ে অনেক রকমে সাহায্য পেলে।

ছ'মাস বেশ লীলা খেলা চল্ল। তার পর বারীনদা ক্ষুব্ধ আত্মার পরিতৃপ্তির জন্য পণ্ডীচারীতে অরবিন্দের কাছে চলে গেলেন। আজ ফিরেন কাল ফিরেন করে মাসের পর মাস কেটে যেতে লাগ্ল। এদিকে দেখতে দেখতে আয়ও কমে যেতে লাগ্ল। বিরাট ব্যায়ভার কাঁদে নিয়েছি, কিন্তু আর তেমন আয় হয় না, তেমন চাঁদা আসেনা ছেলেদের, মধ্যে তেমন উৎসাহ নেই।

দোষটা ঘাড়ে পড়ল আমার আর ইন্দুদিদির। সাহায্য প্রার্থিনীর দল যেমন তেমনিই বজায় আছে অথচ আমরা আয় বাড়াতে পাচ্চি না।—ছেলেরা ছিঁড়ে খাবেনা? কিন্তু আমাদের দোষ তত নেই। বারীন দার নামে অনেক টাকা আস্‌ছিল। সেই বারীনদা পণ্ডীচারীতে সাধনা কর্‌তে চলে গেছেন, কাজেই আর তাঁর বন্ধুবর্গ সাহায্য করবে কেন? তার পর মাঝে পুলিশের পরীক্ষা, একটী কর্ম্মী বালককে ধরে নিয়ে যাওয়া, এই সব কারণে আর একটী পয়সাও বাহির হতে আসা বন্ধ হয়ে গেল।

সংসারের অবস্থা অসচ্ছল হলে যেমন প্রত্যেকে ঝগড়া করে মরে, আমাদের কর্ম্মীদের মধ্যেও তাই হতে লাগল। মাঝখান হতে আমার

আর ইন্দুদিদির প্রাণটা ওষ্ঠাগত হয়ে উঠলো। এই সময় আবার দিদির আত্মীয় স্বজন খড়্গ হস্ত হয়ে সাধারণের কাজ হতে দিদির হাত গুটিয়ে নেবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগ্‌ল। আর একটী অল্পবুদ্ধি, অপবিত্র হৃদয় ক্ষুদ্র দল এই সুযোগ পেয়ে দিদির যে কলঙ্কটা বাকী ছিল, (অর্থাৎ পুরুষের সঙ্গে এরূপ মেলামেশাঘোরা অন্যায়) সেটাও প্রচার করতে লাগ্‌ল। এই রকমই হয়! বেচারী তিনটানায় পড়ে জব্দ হতে লাগ্‌ল। এই রকমই হয়! এই জন্যই কোন মেয়ে সাহস করে সাধারণের কাজে নাম্‌তে পারে না। ইহাই নারী সমাজের উপর অভিশাপ, নারীর উন্নতির অন্তরায়, দেশের কলঙ্ক।

এতদিন মাঠাকুরুণকে ভুলেছিলুম। হৈচৈতে পড়ে মনে পড়ে নি, বা মনে পড়লেও মনের ওপরে ভাসেনি—সেই অদৃশ্য হাতে যার প্রথম অভিব্যক্তিতে আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় অধীর হয়ে উঠেছিলুম্।

একদিন দিদিকে সঙ্গে নিয়ে মাঠাকুরুণের মন্দির দেখতে উদ্বোধন আফিসে গেলুম। সেখানে সারদানন্দ স্বামী দিদিকে "সেবা ও সাধনা"র সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিলেন। তারপর মাঠাকুরুণের ঘরে বসে সেই পদে আবার সেই কাতর মিনতি জানালুম্। আমি বিবেকানন্দ নই যে বিবেক-বৈরাগ্য প্রার্থনা করবো। আমি করেছিলুম অতি সামান্য দুটী প্রার্থনা। মাকে বল্‌লুম্, "মা, আমাদের ভজন-পূজনে একজন ভদ্র-লোকের মেয়ে আজ নাকের জলে চোখের জলে হতে বসেছে। তাকে রক্ষা করবার সাধ্য ত আমাদের নেই। তুমি দেখ মা। আর দু একটী বড় বড় চাঁদা দেনেওয়ালাকে জুটিয়ে দাও। একদল অনাথাকে নিয়ে বড় ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছি।

তারপর উঠে এসে পথে আস্‌তে আস্‌তে ভাব্‌লুম্, দেখি এবারে মা আমার কথা শোনেন কি না। মায়ের অদৃশ্য হস্ত এখনো আমাদের সমিতির গঠনে নিযুক্ত আছে কি না? পরীক্ষা করা স্বভাব তো?

সমিতি ঘরে ঢুকে সবেমাত্র জামা খুলে বস্‌তে যাচ্চি এমন সময় দেখি একজন ইউরোপীয় বেশধারী বাঙালী ভদ্রলোক মোটরে করে এসে সমিতিতে ঢুক্‌লেন তাঁর সঙ্গে অনেক আলোচনা হলো। তিনি

একজন বিখ্যাত ডাক্তার। তার সঙ্গে অরবিন্দের ও বর্দ্ধমান ডিভিসানের কমিশনার জে, এন্, গুপ্তের সঙ্গে পরিচয় আছে। পরে জান্‌লাম তিনি একজন বাঙলার সুপরিচিত ব্যক্তি। তিনি সমিতির বিষয় সব জানিয়া ২০৲ টাকা দিয়া গেলেন এবং ভবিষ্যতে সাহায্য কর্‌বার প্রতিশ্রুতি দিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁর বন্ধুবর্গকেও এ বিষয়ে সহায়তা করিতে অনুরোধ করিবেন বলে গেলেন।

সেদিন সমস্তদিন আমার একটা নেশার মত অবস্থা হয়েছিল। কেবলই মনের মধ্যে হতে লাগ্‌ল—কি করে এমন হল। ওগো! এ সমিতির সত্য সত্যই কি তুমি অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তোমারই ইচ্ছার কণা কি এই অধম যুবকের মাথায় আজ দু বছর আগে ঢুকেছিল। জানি না, কি করে যে কি হয় কিছুই বুঝতে পার্‌লুম্ না। সেদিন হতে আমার এই শিক্ষা হল। যে, যেখানে Mathematical calculation বা Logical inferenceএ কোন কুলকিনারা দিতে পারে না সেখানে মনের সঙ্গে বোঝাপড়া হয়ে যায় একমাত্র অন্ধ বিশ্বাসে!

সার্থক ব্যর্থতা।

(শ্রীনরেশভূষণ দত্ত)

নাই বা বীণা বাজ্‌লো।
তোমার হাতে বাঁধা বীণা,
মূক হ'য়েই বা থাক্‌লো॥
তোমার পরশ তারে তারে,
আছে যে তার বক্ষ ঘিরে,
কাঁদন যে আজ বেদন ভারে
মৌন হ'য়েই রইলো—
তোমারি সুর একে সাধা
এ কথা কে জান্‌লো
ব্যাথার আঁখি ঝর্‌লো না তার
রইল শুধু চেয়ে,

জ্যোৎস্না তাহার রইল বাঁধা
ঘুমের আব্‌ছায়ে ॥
তুমি যে আজ আপন হাতে
সপ্ত সুরের আঙ্গিনাতে,
আসন তাহার বিছিয়ে দেছ
প্রাণে সে তা জান্‌লো—'
বাহুর ঘেরে তোমায় সে আজ
প্রাণের তারে বাঁধ্‌লো ॥
নাই বা বীণা বাজ্‌লো ॥
মৌন হ'য়ে আছেই বা সে
ব্যাথার ধূলায় লুট্‌লো,
সুর যে তাহার তারে তারে
উঠেছে সে আজ রক্তধারে
ফেনিল হ'য়ে কত মরণ .
জীবনে তার মাত্‌লো—
মরণ সাধা বাঁধা-বীণা
নীরবে তা জান্‌লো ॥
পিয়াসা তার জাগে হৃদে
অসীম অন্তহীন,
মরণ সেথা জীবনে মেশে
শব্দ বন্ধ হীন ॥
তুমি যে তার তারায় তারায়
লুটিয়ে আছ অগ্নি ধারায়
আঘাত পেলেই তোমার করে,
উঠ্‌বে বেজে বীণ
ব্যথিত বীণার ব্যথার বেদন
তোমায় হ'বে লীন ॥

আদিনাথ।

(শ্রীলাবণ্যকুমার চক্রবর্ত্তী)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দক্ষিণে সন্দ্বীপ, ভাসমান দামখণ্ডের মত প্রতীয়মান হইতেছিল। একখানি জাহাজ সন্দ্বীপ অভিমুখে ধোঁয়া উড়াইয়া মাঝে মাঝে বাঁশী বাজাইয়া অগ্রসর হইতেছিল, দেখা যাইতেছিল যেন দীপান্বিতা রাত্রে ভাসমান কলার খোলোর ক্ষুদ্র ডিঙ্গী, শুনা যাইতেছিল যেন বহুদূরাগত ক্ষীণ, অতি ক্ষীণ সুমধুর বংশীধ্বনি। তারপর আর কিছুই দেখা যাইতেছিল না, শুনা যাইতেছিল না।

একটি সামুদ্রিক পায়রা (Seagull) ষ্টেশন ঘাটের নিকট হইতে আমাদের বাহন জাহাজখানির সঙ্গে সঙ্গে উড়িয়া চলিয়াছিল। কখন বা আকাশের উপরের দিকে চলিয়া যায়, কখন বা ঘুরিয়া ঘুরিয়া জাহাজের গায়ে যেন বসিতে বসিতে উড়িয়া যায়। অতি সুন্দর পাখী, দুগ্ধফেননিভ শাদা ধব্‌ধবে, ছোট্ট ঠোঁট দুখানি টুকটুকে লাল, ডানা দুটির অগ্রভাগ গাঢ় কাল, শরীরখানি লেপা-পোছা, বেশ পালিশ। এই শাদা কাল ও লালের সংমিশ্রণ নিটোল দেহখানি অতীব মনোরম। জাহাজের সঙ্গে পাখীটার এমন তীব্র আকর্ষণের চিহ্নদর্শনে মনে হইতেছিল এই জাহাজখানি বা তদভ্যন্তরস্থ কোন কিছুর সহিত তাহার প্রাণটা যেন একসূত্রে গাথা। আমি পাখীটাকে কখনও 'প্রেমিক কখনও বা পূর্ব্বজন্ম-রহস্যবিৎ ইত্যাদি কত কিছু মনে করিতে করিতে সত্যিকার সাগরে পড়িয়াও ভাবসাগরে ডুবিয়া গিয়াছিলাম। তখন আমার বন্ধুটীর অকবিসুলভ ব্যবহার ও মীমাংসায় একটু ক্ষুণ্ন হইলাম। বন্ধু হাসিতে হাসিতে দেখাইয়া দিলেন "দেখ্‌ছ, তোমার পূর্ব্বজন্ম রহস্যবিৎ প্রেমিক পক্ষী মহাশয়' কেমন টপ্‌ টপ্‌ লুটে মাছ ধরিতেছেন।" দেখিতে দেখিতে আরও অসংখ্য "সীগালস্‌" জুটিয়া গেল। জাহাজের

চক্রাঘাত-সঞ্জাত ফেনোপুঞ্জোপরি স্তূপাকারে ফেনোপ্রতিম অল্পপ্রাণ লুটে মাছ চক্রাঘাতে মরিয়া ভাসিতে লাগিল আর “সীগালস”গুলি লুফালুফি মারামারি করিয়া স্ব স্ব উদর পূজায় তন্ময় হইয়া পড়িল। পাখীটা এমনইভাবে যখন আমার সব কবিত্ব ফাঁসাইয়া দিল, তখন আবার অনন্ত বারিধির প্রতি চাহিয়া রহিলাম। অকূলে ভাসিয়াও ঠিক অকূলের ধারণা হইতেছিল না, কারণ বামদিকে তৃণরেখার মত বেলা-ভূমি পরিদৃষ্ট হইতেছিল। সম্মুখে, দক্ষিণে এবং পশ্চাতে অনন্ত জলরাশি প্রতিভাত হইতে থাকিলেও অকূলে পড়ার অকূলে ভাসার স্বাদটা ঠিক ঠিক মিটিতে ছিল না। জাহাজের দক্ষিণদিকে চলিয়া গেলাম। বামদিক স্বয়ং জাহাজেই অবরোধ করিয়া রাখিল। সুতরাং যতদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে ততদূর পর্য্যন্ত দেখিতেছিলাম গগনস্পর্শী জলরাশি। সূর্য্যরশ্মি স্থানে স্থানে যেন রজতখণ্ডের মত গলিয়া পড়িয়া স্থির সমুদ্রের বক্ষোপরি বেশ একটু আরাম উপভোগ করিতেছে। অনন্ত! অনন্ত!! যেদিকে দৃষ্টি পড়ে সব দিকই অনন্ত!!! বটপত্রশায়ী ভগবানের কাল্পনিক কথা আজ যেন জীবন্ত বিগ্রহ পরিধারণ করিয়া চক্ষের সম্মুখে প্রতিভাত হইতেছিল। অকূল সমুদ্রের তুলনায় ছোট জাহাজ খানিকে বটপত্রের সঙ্গে তুলনা করিলেও বড় করা হয়। ষ্টীমার হুম্ হাম্, ঝুম্ ঝাম্ শব্দ করিয়া নক্ষত্রবেগে কেবলই সম্মুখে চলিয়াছে। স্থির সমুদ্রের বক্ষঃ হইতে কোথাও বা জলচর, খেচর, উভচর, ত্রিচর প্রাণীকুল নানাপ্রকার বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়া আপন আপন স্বরূপ প্রকাশ করিতেছিল। সম্মুখে দৃষ্টি যতদূর চলে ততদূর চালিত করিয়া অবাক স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিলাম। হঠাৎ সম্মুখে বহুদূরে সবুজবর্ণ একটী দ্বীপ নীলের মাঝে ফুটিয়া উঠিল, সহ-যাত্রীর একজন বলিলেন “কুতুবদিয়া”। আমরা ক্রমশঃ দ্বীপের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম। কুতুবদিয়ার “বাতীঘর” (Light-house) সবুজ ঘাসের উপর সরল বংশদণ্ডের মত পরিদৃষ্ট হইতেছিল। বাতীঘর অস্পষ্ট হইতে স্পষ্ট, স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতে লাগিল। কুতুবদিয়া পাঠকবর্গের নিকট অপরিচিত নহে। ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বের

একটা স্পষ্টচিত্র আমার বন্ধুবরের সৌজন্যে পাঠকগণের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতে সমর্থ হইলাম। ভ্রমণপ্রিয় সাহিত্যরসিক জমিদার বন্ধুটী "অমৃত বাজারে" একটি কলম কাটিয়া সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন, আজ প্রায় সতর বৎসরের পরে পাঠকগণকে তাহাই উপহার দিলাম।

'Kutubdia is a small island in the Bay of Bengal. The area of the island is 45 Sq. miles and the population is about 11,000.

It is a pretty island in the sea. The deep and the dark blue ocean rolls on the western side of the island at a distance of only 30 to 60 ft. from the offices, and the rolling noise of the mountain waves deafen the ear during high tide. On all sides except the east the beach is neat and clean as if washed and brushed off by the sweepers and it is so hard that one can walk, ride or drill as he pleases. At places it is little marble in appearence and hardness, soft and glossy like velvet. The moving red crabs, oysters and varites of shells add grandure to its beauty which can better be imagined than discribed.

Another grand thing of this island is the Govt. Light-house which is situated in the Northern extremity of the island and is under the charge of two Eurasian gentlemen. This was built in 1846. The Light-house has been put here with much skill and ingenuity. It exihibits a white light which is being constantly revolving and is visible in clear weather from a distance of about 20 miles. The machinary, the workmanship and the views from its top are all commendable. The living here is very cheap. One can comfortably live for Rs. 3. per month. A dozen of eggs can be had at one anna or six pies, a fowl at annas two, a duck at annas three, a pegeon at pies five or six and a goat at Rs. 1. Good rice sells here at 19 seers per rupee at present.......But, above all, this seems to be the best place in the whole of the Chittagong Division from the sanitary point of view, a fact of which no-body can entertain any doubt

if he once sees the ruddy cheeks, the robust constitution and the general health and the longivity of the people here and studies with care the absence of malarial fever—which cause so great a havoc else where. The other-day a man of this island died at an age of 119 years and there is one still living who has seen 120 winters.

I can safely recommand the people suffering from malarial and chronic fever, dyspepsia and other allied diseases which require change of climate and sound health at the same time.

One of the grandest and pleasing sight of nature is the majestic sea."

(Doctor. The Amritabazar Patrika, November 21, 1904.)

কুতুবদিয়া নামিয়া আজ সতর বৎসর পরের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের সুযোগ আমাদের ভাগ্যে ঘটে নাই। তবে বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি যে কুতুবদিয়া তাহার পূর্ব্ব গৌরব সময়ের তুলনায় এখনও যথেষ্ট পরিমাণ রক্ষা করিতেছে।

তারপর যখন ভাব তন্ময়চিত্তে সমুদ্র দর্শন করিতেছিলাম—তখন আমি কি ভাবিতেছি বন্ধুটী জানিতে চাহিলে—বলিলাম, "আমি ভাবিতেছি এই বিশ্বজোড়া নীল ও লোণাজল কোনও কার্য্যে লাগাইতে পারি কি না। অন্ততঃ নীল ও লবণের কাজত কিঞ্চিৎ গবেষণার ফলেই সংসিদ্ধ হইতে পারে। আবার একটু বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছি যে যদি ইহা এতই সহজ হইত তবে স্বদেশে সাগরভরা নীলজল ফেলিয়া রাখিয়া নীলকর সাহেবদের আমাদের দেশে আসিতে হইত না। দীনবন্ধুর "নীলদর্পণের" সৃষ্টিও হইত না। আর লোণাজলে লবণের কাজ চলিলে সাতসমুদ্র তেরনদীর পরপারস্থ লিভারপুলের বিশুদ্ধ লবণের জন্য আমাদিগকে হা করিয়া বসিয়া থাকিতে হইত না। ভারি সমস্যা! তুমি ইহার সমাধান করিতে পার কি?"

আমার অদ্ভুত চিন্তার কথা শুনিয়া বন্ধুও হাসিতে হাসিতে লুটাপুটি খাইতে লাগিলেন। আর হঠাৎ একটা চমৎকারকাণ্ডও ঘটিয়া বসিল। জাহাজশুদ্ধ প্রায় সকলেরই দৃষ্টি সেইদিকে আকৃষ্ট হইল।

একটা খালাসী যাকে সম্মুখে পাইতেছে তাহাকেই অপূর্ব্ব ভাষায় জিজ্ঞাসা করিতেছে—তার তরকারী খাইয়া পয়সা দিল না—কোন্ হিন্দুটী?

"এগুয়া হেঁদু আমার ঠাইনত ছালম কিন্না খাইছে—পয়সা ন দি" শব্দে জাহাজের লোক উৎকর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।

একটি রসিক সহযাত্রী ভদ্রলোক আর একটি বিশিষ্ট ভদ্রলোককে দেখাইয়াদিলেন। খালাসী চাহিয়া দশনপংক্তি বিস্তার করতঃ বলিল "ইণ্ডিয়ানা"। তখন হাসির ফোয়ারা উঠিল, খালাসী সাহেবের "ইণ্ডিয়ানা" "ইণ্ডিয়ানা" পুরাদমে চলিতে লাগিল। এ ওকে, সে তাহাকে দেখাইতে লাগিল, আর খালাসী সাহেব তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন কিন্তু নিরুপায় হইয়া এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতে করিতে অবশেষে একটি মাদ্রাজী কুলীকে পাকড়াও করিয়া ফেলিলেন. খাস স্বদেশী ভাষায় কুটুম্বিতা পাতাইতে পাতাইতে খালাসী সাহেব যৎকিঞ্চিৎ মুষ্টিযোগেরও ব্যবস্থা করিলেন। কুলীটীর অপরাধ চৌবাচ্চায় সংরক্ষিত অলবণ জলের অপব্যবহার, তৃষ্ণাতুর কুলীটীর উপর খালাসী সাহেবের অত্যাচার জাহাজ শুদ্ধ সকলে অবাক স্তব্ধ হইয়া দেখিলাম, কাহারও মুখ দিয়া 'টুঁ' শব্দটী বাহির হইল না। ইহাই আমাদের জাতীয় বিশেষত্ব। খালাসীটী যখন আপনা আপনিই নিরস্ত হইয়া পড়িল তখন আমরাও আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম।

দেখিতে দেখিতে কতুবদিয়া ছাড়িয়া চলিলাম। সম্মুখে কিন্তু বহুদূরে আদিনাথের উচ্চতর পাহাড় শৃঙ্গটী নয়নপথে সম্পাতীত হইল। অপরাহ্নে ৫টার সময়—আদিনাথ বাড়ীর পূর্ব্ব প্রস্থের তীর হইতে বহুদূরে বাঁশী বাজাইয়া জাহাজ থামিল। বৃক্ষকাণ্ড নির্ম্মিত অপূর্ব্ব একখানি খেয়ানৌকা জাহাজের গায়ে লাগিল। আমরা জাহাজরূপ পাহাড় হইতে নৌকা রূপ গহ্বরে অবতরণ করিলাম।

(ক্রমশঃ)

পূর্ব্বাভাষ।

(শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ রায়)

একি হ'ল! ওগো ত্রিকালের বাঁশীর রাজা! বাঁশির কোন্ রন্ধ্র আজ অবধি বায়ু-কম্পনে কাঁপিয়ে তুললে;—ভোরের মুক্ত বায়ুর প্রতি স্তরে স্তরে কোন্ সুরের ঢেউ খেলিয়ে দিলে? উষার রক্তিম হাস্য আকাশের পটে ফুটে উঠ্‌ছে, নিশার আঁধার আলো-ছায়ার কোলে মিশে যাচ্ছে, ম্লান হয়ে নিভে যাচ্ছে গগন-দেউলের রত্নপ্রদীপগুলো, স্তব্ধতার বুকের কাছে হানা দিয়ে যাচ্ছে বাতাসের এক একটা পাগল ঢেউ!

কে আস্‌বে? কার আগমনে প্রতীক্ষমানা প্রকৃতি আজ উষার স্তব্ধতার কোলে নুয়ে পড়েছে;—কার স্বাগত-সম্ভাষণের বরণডালা আজ শত কোলাহলের মাঝেও ফুলের সৌরভ সুষমায় হেসে উঠেছে, মালার বন্ধনে জেগে উঠেছে, দীপালির আলোয় স্নিগ্ধ হয়েছে, শঙ্খধ্বনির অন্তরালে সজীব হয়ে উঠেছে!

আস্‌বে, ওগো আস্‌বে! যুগে যুগে আকাঙ্ক্ষার ধন, যুগপ্রবাহের মাঝে দেবতার আশীর্ব্বাদরূপে ভেসে আসবে। ওগো বাঁশীর রাজা! এই উষার মাধুর্য্যের মাঝে, এই স্তব্ধতার নিবিড়তার মাঝে ভৈরবী কি ভুলে গেলে? এত ভৈরবী নয়! এ যে কোন্ বায়ুনর্ত্তিত নগ্ন সাগরের অবিরাম হু হু ধ্বনি,—এ যে কোন্ কালবৈশাখীর যুগসঞ্চিত ঝটিকার অবিরত শোঁ শোঁ শব্দ,—বড় তীব্র, বড় উদাস! এ বুঝি তারই আগমনী! বহু যুগের আকাঙ্ক্ষিত ধন, চিরন্তন সত্যরূপে যে ভেসে আসবে এ বুঝি তারই বরণ-সঙ্গীত!

তাই হোক্;—হে বংশীধারি! তাই হোক! আমি চাইনে ভৈরবী, চাইনে বিভাস; চাইনে পূরবী, চাইনে মল্লার। চাই, চাই সুধু সেই প্রাণের যুগ-যুগ-আকাঙ্ক্ষিত ধন, যার আগমনের পথ চেয়ে উন্মুখ আগ্রহে মানব কত বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছে, জীবনের বিচিত্র চঞ্চলতা

নিয়ে কত শত শত দিবস মানবের সম্মুখ দিয়ে গড়িয়ে গেছে—ফিরেও তাকায় নি। তাই বলি হে বাঁশীর রাজা! বাজাও তোমার তীব্র কঠোর রাগিনী, ধ্বনিয়ে তোল বজ্রের বিভীষিকাময় কর্ণভেদী আর্ত্তনাদ, কাঁপিয়ে তোল একবার শ্মশানের ভীতি সমাকুল অট্টহাস্য;—জাগিয়ে তোল একবার প্রলয়ের গভীর উচ্ছল জল কল্লোল! অফুরন্ত হাহাকার নিয়ে আজ বাঁশীর সুর সপ্ত সাগর মথিত করে কেঁদে বেড়াক, প্রলয়শঙ্খের ভৈরবনাদ আজ বাঁশীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে ফুটে বেরুক, বজ্রে বজ্রে বাঁশীর দুর্জ্জয় আহ্বানটুকু গর্জ্জে উঠুক; ওর সংঘর্ষের দোলায় চিত্ত শিহরিত হয়ে জেগে উঠুক। ওগো! বজ্রের অগ্নি-আহ্বানকে সাড়া দেবার সামর্থটুকু আমায় দাও।

"বজ্রে তোমার বাজে বাঁশী,
সে কি সহজ গান?
সেই সুরেতে জাগব আমি
দাও মোরে সেই কাণ।
ভুলব না আর সহজেতে,—
সেই প্রাণে মন উঠবে মেতে
মৃত্যু মাঝে ঢাকা আছে
যে অন্তহীন প্রাণ।"

সহজের ভিতর দিয়ে আমি চাইনে আমার আকাঙ্ক্ষার ধনকে। সে আসুক অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়ে শুভ্র সত্য হয়ে, আসুক আর্ত্তনাদের কর্ণে কর্ণে শান্তির অমিয়ধারা বর্ষণ করে, আসুক মরণ সমাধি পাশে জীবনমন্দির প্রতিষ্ঠা করে, আসুক মহাপ্রলয়ের মাঝে সৃষ্টির সৃজনানন্দ নিয়ে। * *

হে বাঁশীর রাজা! ঐ যে ঝড় উঠল! কাল বৈশাখীর অঞ্চল উড়িয়ে ঐযে তাণ্ডব নৃত্য সুরু হ'ল! হে রুদ্র! হে সুন্দর! প্রলয়ের ডঙ্কা কি বাজিয়ে দিলে? দিকে দিকে গর্জ্জে উঠল ঝড়ের ভয়াল গর্জ্জন! সারা বিশ্ব বিলোড়িত করে একি প্রচণ্ড হাহাকার আজ গগন বিদীর্ণ করছে, কি গোপন যন্ত্রণায় আজ সমস্ত বিশ্ব মাথা খুঁড়ে মরছে, আর

তার বুকের কাছে হানা দিয়ে যাচ্ছে ঝড়ের এক একটা আর্ত্তনাদী ঢেউ—ওগো ভয় পাব কেন? তোমার এ প্রলয় ঝড়ত বুকের ভিতর আলোড়ন তুলেছে—তাকে ঠেকিয়ে রাখব কেন?

——"সে ঝড় যেন সই আনন্দে
চিত্ত-বীণার তারে
সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্ত
নাচাও যে ঝঙ্কারে।"——

* * মন প্রস্তুত হও। সর্ব্বনাশা বাঁশীর ডাকে সাড়া দেবার ক্ষমতাটুকু তোমার আছে তো? এবাঁশী তোমার বৃন্দাবনের কুসুমকুঞ্জ হতে ডাকে নি, এ বাঁশী তোমার মথুরার মর্ম্মর প্রাসাদে সিংহাসন হতে ডাকে নি;—এ বাঁশীর ডাক এসে পৌঁছেছে কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গন হতে—একটা প্রলয়ঘন প্রচণ্ডতার মাঝখান হ'তে। পারবে তো অস্ত্রের বিদ্যুৎচমকের মাঝে বাঁশীর নির্দেশটুকু পালন করতে; পারবে তো অসির ঝঞ্ঝনার মাঝে বাঁশীর সুরটি হৃদিয়ে ধারণ করতে? ভয় কি! স্বয়ং বাঁশীর রাজা যে তোমার রথের সারথি! পারবে বাঁশীর সুরের ডাকে বেরিয়ে পড়তে—পারবে সাধনার দিকে এগিয়ে যেতে, পাহাড় পাথর চূর্ণ করে, অমাবস্যার প্রহেলিকাময় আঁধারের কোলে একাকা মিশে গিয়ে কণ্টকবনে সাধনার ধ্বনি তুলতে;—পারবে জলে, স্থলে, ভূধরে কাননে ছুটে যেতে, পাগল হয়ে ছুটে যেতে, শত শত বাধাকে বুকের বেগে ঠেলে দিয়ে। তাতে যদি বুকের পাঁজর ভেঙ্গে যায় যাক্ না। ভয় কি! বল মাভৈঃ! ওরে আমার পাগল মন! ঐ শোন্ বাঁশীর ডাক—

"ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।"

জাগরে মন তুই জাগ্। উষার রথে চড়ে তোর সাধনার ধন যে আসবে। বোধনের বেলা যে বয়ে যায়! তাকে বরণ করবি কখন? ওরে মূঢ়! দেখিস তোর অবহেলার পীড়নে বরণের মালা যে ম্লান হয়ে যাবে, অর্ঘ্য যে ধূলায় লুটিয়ে পড়বে! তখন কত বড় অভিশাপ হয়েতো তোর বুকে বাজবে একবার ভেবে দেখেছিস্? বরণের ম্লান মালা বুকে চেপে হতাশার বিষাদ সঙ্গীত গাবার সময় পাবি ত? ওরে বোকা!

সন্ধ্যার ম্লান ধূসরতায় খেয়া বন্ধ হয়ে গেলে নিশার স্তব্ধ আঁধারে যে তোর একাকী ফিরে আসতে হবে ; সাথী যে কেউ মিলবে না ! এই বেলা জাগরে মন এই বেলা জাগ্। সময় থাকতে তৈরি হয়ে নে ; তোর সাধনার ধন ঐ যে আসে। সময় যদি হারাস্ তোর রুদ্ধ দ্বারের কাছে হানা দিয়ে সে যে ফিরে যাবে জন্মের মত। কেঁদে ডাক্‌লেও ত আর আস্‌বে না ; কান্না সে যে বোঝে না।

তাই বলি মন,— "এই বেলা নে ঘর ছেয়ে।" পরে কি সময় পাবি ? সে যখন আস্‌বে, আস্‌বে উচ্ছল প্রলয় জল কলরোলে জগৎ কম্পিত করে, দুর্ব্বার বন্যায় পৃথিবী প্লাবিত করে. উদ্দাম ফেনিল তরঙ্গভঙ্গে তটভূমি প্লাবিত বিধৌত করে। তখন তুই যে কোথায় ভেসে যাবি তার ঠিকানা থাক্‌বে কি ? এই বেলা তৈরী হ রে, এই বেলা তৈরী হ !

হে বাঁশীর রাজা ! জাগাও তোমার বাঁশীতে ভৈরব সঙ্গীত। মুহ্যমান ম্রিয়মাণ যারা তারা জেগে উঠুক সত্যের সুপ্রতিষ্ঠ সিংহাসন ঘিরে। তোমার বাঁশী বজ্র-গম্ভীর নির্ঘোষে আত্ম-পরীক্ষার হোমাগ্নির মাঝে টেনে নেও সবে :—আত্মচেতনার লৌহবর্ম্মে সাজিয়ে দাও সবে। আত্ম-প্রতিষ্ঠার ঘূর্ণীপাকে বিঘূর্ণিত চূর্ণিত করে দাও ; এ যে সুখ-সাধনা নয়। এ যে ত্যাগের যজ্ঞাগ্নিতে মহাভৈরবের আহ্বান, এ যে শশ্মানের নগ্ন ভীষণতার মাঝে শান্তিময় শিবের আরাধনা। কর আঘাত। কঠোর আঘাতে বাইরের নীরস খোলসটাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দাও তবেই ভিতরের শান্ত সজীব মানুষটী বেরিয়ে আস্‌বে। হে বজ্র-বংশীধারি ! বজ্রের আগুণে সব পুড়িয়ে দাও, আমার দেহ, মন, অহমিকা। তবেই এই ভস্মশেষের শুভ্র সত্তাটির ভিতর তোমার আগমনীর রং ফলিয়ে উঠবে।—

* * *—"এমনি করে হৃদয়ে মোর
তীব্র দহন জ্বালো। * * *
* * *—"বজ্রে তোলা আগুণ করে'
আমার যত কালো।" * * *

হে বংশীধারি ! কুরুক্ষেত্রের রণ ঝঞ্ঝনার মাঝ থেকে যখন ডাক

দিয়েছ তখন তোমার তূণীরের শ্রেষ্ঠ শরগুলি দিয়ে আমায় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দাও;—আমি বুক পেতেছি। যদি তোমার কঠোর নিদেশ পালনের তীব্রতার আগুনটুকু আমার হৃদয়ে প্রদীপ্ত হয়ে না ওঠে তবে যেন সমরাঙ্গণই আমার শেষ শয্যা হয়; আর যদি পারি তোমার অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে তখন কি সাধনা ব্যর্থ হবে? * * *

সময় ত হয়ে এল। ওরে পাগল মন! মহা ভৈরবের বেশে ঐ যে তোর চিরজীবনের সাধনার ধন জীবনের প্রলয়োচ্ছল রাগিণীর তালে তালে তাণ্ডব নৃত্যে এগিয়ে আসছে। মহারুদ্রের শঙ্খ রবে সারা বিশ্ব মুহুর্মুহু কেঁপে উঠচে। আর সময় নেই। এই বেলা বেরিয়ে পড়। লুটিয়ে পড় প্রলয়-ত্রস্ত বিশ্বের কম্পিত অন্তর-কেতনে। খুলে দে আজ তোর ভগ্ন কুটীরের শীর্ণ দরজা জানালাগুলো। চিত্ত-বীণার তারে তারে ধ্বনিয়ে তোল মহাভৈরবের প্রলয়ঘন বোধন-সঙ্গীত। সময় হ'ল, সময় হ'ল, সারা বিশ্বে কাঁপন লেগেছে, চিত্ত-বীণার তারে তারে ঝঙ্কার উঠেচে; মহাভৈরবের রুদ্র মধুর তাণ্ডবের সাড়া পড়েছে, আজ বিশ্বের অন্তরের মণিকোঠায়।—

"বাজেরে বাজে ডমরু বাজে
হৃদয় মাঝে, হৃদয় মাঝে।
নাচেরে নাচে চরণ নাচে
প্রাণের কাছে, প্রাণের কাছে।"

প্রাচীন ও নবীন।

(শ্রীব্রজেন্দ্রলাল গোস্বামী)

বিংশ শতাব্দীর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের' পরস্পর সংঘর্ষে সভ্যতার যে নবোদ্ভাসিত আলোকরাশির সঞ্চার হইয়াছে তাহাতে কি দেশীয়, কি সামাজিক, কি আধ্যাত্মিক সর্ব্ব বিষয়ে জীবন-মরণের কঠিনতম প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে। এদিকে প্রাচীন সত্য, অন্ধকুসংস্কারে আচ্ছন্ন হইয়া আমাদিগকে অজ্ঞানান্ধকারের দিকে সংস্কারের বশে ধাবিত করিতেছে; তজ্জন্যই ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদিগের আকাশবাণী অন্ধ জীবগণকে তত্ত্বজিজ্ঞাসা দ্বারা সত্যের প্রত্যয় উৎপাদন করিতেছে যে, অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ; দন্দ্রম্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়াঃ অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥ মূঢ় অন্ধজন স্বরূপঅজ্ঞজন, অবিদ্যামোহিত হইয়াও নিজকে পণ্ডিত ও ধীর জ্ঞানে অপর অন্ধ জনকে যষ্টির সাহায্যে পথ দেখাইয়া উভয়েই বিশাল কূপগর্ত্তে পতিত হয়, ও উদ্দেশ্য বিহীন হইয়া জীবন হারায়।

অপরদিকে তরুণ অরুণালোকে নয়নোন্মীলন করিয়া জগৎ চাহিয়া দেখিতেছে সেই প্রাচীন সত্যের সৌম্য শান্ত মূর্ত্তি মাধুর্য্যপূর্ণ হইয়া স্নিগ্ধ নির্ঝরিণীর ন্যায় অমৃতবর্ষণ করিতেছে। সহজ, সরল পথের সুন্দর আদেশ বাণী যেন জগৎকে প্রবঞ্চনার ও ভীষণ তাড়নার পথ হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়া চরম উদ্দেশ্যের দিকে আহ্বান করিতেছে। একদল প্রাচীন নূতনের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে স্বার্থ সঙ্কীর্ণ চিত্তে প্রবল আক্রমণ করিতেছে—আবার নূতন আর একদল প্রাচীনের দুর্ব্বল পাপবলের বিনাশ করিয়া বিজয় পতাকা উড়াইতে যথেষ্ট প্রয়াস পাইতেছে, আজ জীবন-মরণ পথের পথিক এই ভীষণ সন্দিগ্ধ স্থলে কঠিন প্রশ্নের সুন্দর মীমাংসা কে করিবে? নতুবা সমাজের দেশের ও জাতীয় জীবনী শক্তির জাগরণের সম্ভাবনা নাই।

আমরা দেশ, কাল, পাত্র, বিবেচনা করিয়া দেখিতে পাই প্রাচীন ও

নবীনের সমতা ও মিলন ব্যতীত এই সমাজ-নীতির দুরূহ প্রশ্নের সহজ মীমাংসা হইতে পারে না। উভয়ের সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইলে সত্যপথের যাত্রী নবীন ভাবুক একজন মহান্ পুরুষের বিশ্ববিজয়িনী—শক্তিম একান্ত প্রয়োজন। গীতাশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের উদ্বোধিনী কথামৃত হইতে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, জগতের সকল মহাপুরুষ অনন্তশক্তি ভগবানের বিভূতি লইয়া অবতীর্ণ হ'ন ও পার্থিব কল্মশ বিধৌত করিয়া বসুন্ধরায় নূতন একটা অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটান। আজিও সত্যের সেই অলঙ্ঘনীয় নিয়মে কালক্রমে নূতন যুগের আবির্ভাব ও সমস্ত বিষয়ের সংস্কার আবশ্যক। আমাদের জাতীয় ইতিহাস পর্য্যালোচনা দ্বারা কত শত অবতাররূপ মহাপুরুষের জ্বলন্ত জীবনাদর্শ দেখিতে ও শুনিতে পাই এবং আজিও সেই ইতিহাসের একাংশ পূরণের নিমিত্ত জীবন্ত মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘোষণা হইতেছে। প্রাচীন ইতিহাস পরিত্যাগ করিয়াও নবীন যুগের ইতিহাস আলোচনায় জানিতে পারি, রাজা রামমোহন রায় যে যুগের ভার লইয়া আসিয়াছিলেন, তিনি তাহার জীবনের মহাব্রত সাধন করিয়া নূতন সত্যপথের আবিষ্কার করিয়াছেন। হিন্দুজাতি যখন তাহার প্রাচীন কুসংস্কারের অন্ধকার দেখিয়া পতঙ্গের ন্যায় প্রতীচ্যের নূতন আলোকমালা ধরিতে যায়, রামমোহন রায়ই একমাত্র তখন মহদুপায় উদ্ভাবন করিয়া হিন্দুজাতীর মহাসত্য ঘোষণাদ্বারা যুগসমাজের প্রবর্ত্তন করেন এবং ফলতঃ ধর্ম্মপ্রাণা ভারত মাতার সতীত্ব ও পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। কালের কুটিলা গতিতে ব্রাহ্মসমাজও যখন আবার সত্য পথ ছাড়িয়া পাশ্চাত্য বিলাস-ভোগের চরমাবস্থায় মোহপ্রাপ্ত হইয়া পড়িল, তখন হিন্দুধর্ম্মের সম্পূর্ণ-সত্য সাধনা দ্বারা জগন্মাতা-ভারতের মহাশক্তির উদ্বোধনের চেষ্টায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব ও স্বামী বিবেকানন্দের অবতরণ হইল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে স্তম্ভিত করিয়া সে দিন হিন্দুধর্ম্ম জগদ্বরেণ্য স্থান অধিকার করিল। হিন্দুর যে সনাতন সত্য—তাহা জগতের অমূল্য রত্ন—মহা আদরের জিনিষ। সে সত্যের মহিমায় জগৎ মুগ্ধ,—জগদ্ব্যাপিনী জড়শক্তি ভারতের পদানত। আধ্যাত্মিক রাজ্যে একচ্ছত্রা শক্তির অতুল প্রভাবে ভারত সর্ব্বাপেক্ষা

উচ্চ সিংহাসনে অধিষ্টিত। তাহার সেই অপার্থিব ক্ষমতার নিকট পশুশক্তি পরাভূত। ভারতের ধর্ম্মরূপ গুপ্তধন প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় সমস্ত জগৎ লুব্ধ। অনন্তকাল—চিরদিন ভারতের প্রতি সকলজাতি—সকল দেশ আধ্যাত্মিক জিনিষের জন্য লুব্ধচিত্তে লালায়িত থাকিবে। ভারতের এ মহাধনের বিনাশ নাই সুতরাং এই অমূল্য নিধির অস্তিত্বেই অনন্তকাল ভারতের আবহমান সত্তা বিদ্যমান থাকিবে। নবযুগে হিন্দুজাগরণের পূর্ণাদর্শ স্বামী বিবেকানন্দ, ঠাকুরের কৃপায় কি অসীম প্রভাবে বিস্তার করিলেন তাহা প্রাণের উপলব্ধির সহিত বুঝিয়া দেশ-হিতকর আত্মিককর্ম্মে নিরত হইতে হইবে। ভারতবাসীর আজ যে দুর্দ্দশা, সমাজের যে দুর্ব্বলতা, ধর্ম্মালোকের যে ক্ষীণতা তাহার সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণের দাবী না করিলে—মনেপ্রাণে শক্তি সঞ্জীবনীর চেষ্টায় সাধনা না করিলে আমাদের দুর্দ্দৈব অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে না। সত্য-পদার্থ খুঁজিয়া হৃদয়ে গাঁথিতে হইবে; কর্ম্মকে হস্তের অলঙ্কার করিয়া, জ্ঞান ভক্তি প্রেমদ্বারা জীবনকে ভগবদ্‌রসসাগরে অভিসিঞ্চিত করিতে হইবে। মানব জীবনের যে সার্থকতা;—জীবগণের প্রতি ভগবানের যে প্রীতিময় আদেশ, তাহার পূর্ণ সাধনার নিমিত্ত সত্যকে একমাত্র আশ্রয় করিতে হইবে। তন্নিমিত্তই শাস্ত্রের বিমল বাণী আমাদের কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইতেছে :—

সত্যরূপং পরং ব্রহ্ম সত্যং হি পরমং তপঃ।
সত্যমূলা ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ সত্যাৎ পরতরো নহি॥
নহি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মো ন পাপ সম তৎ পরম্।
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা মর্ত্ত্যঃ সত্যমেকং সমাশ্রয়েৎ॥
সত্যহীনা বৃথা পূজা সত্যহীনো বৃথা জপঃ।
সত্যহীনং তপো ব্যর্থং উষরে বপনং যথা॥

সত্যরূপই পরম ব্রহ্ম, সত্যই পরম তপস্যা, সকল ক্রিয়াই সত্যমূলা,—সত্য হইতে আর পরতত্ত্ব নাই, নাই। সত্যহীন পূজা বৃথা, সত্যহীন জপ বৃথা, সত্যহীন তপ বৃথা—সত্যহীন সমস্ত কর্ম্মই অনুর্ব্বর ক্ষেত্রে বীজ রোপনের তুল্য নিষ্ফল।

আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য নিজ নিজ ক্ষুদ্র জীবনকে আদর্শ চরিত্রের অনুকরণে গঠিত করিয়া সত্য মঙ্গলময় চিদানন্দ পুরুষের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। সাংসারিক ক্ষুদ্রতা, ঘৃণিত জীবনের নীচাশয়তা লইয়া সমস্ত জীবনের অমূল্য সময় অতিবাহিত করিলে কখনও কর্ত্তব্য সমাধান হইবে না। তাই সমাজকে দেশকে তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডির বিষয় সমূহকে পরিত্যাগ করিয়া আদর্শ চিন্তা, আদর্শ কর্ম্মের দিকে চলিতে হইবে। আমাদের প্রত্যেকের ভিতর যে অনন্ত লুপ্তা শক্তি বর্ত্তমান তাহার উদ্বোধনের চেষ্টাই জীবনের কর্ত্তব্য, ইহা মনে করিতে হইবে। তবেই সমাজের ও দেশের মঙ্গল এবং ভবিষ্যৎ উন্নতির একান্ত আশা। দেশের শিক্ষাকে প্রকৃত শিক্ষায় পরিণত করিতে হইবে। সে শিক্ষা দ্বারা যেন মনোবৃত্তির বিকাশ, আধ্যাত্মিক ক্ষমতার উন্মেষ ও জাগতিক কর্ম্ম-কৌশল জ্ঞান সুচারুরূপে সাধিত হইতে পারে। পৃথিবীতে যত বড় বড় জাতি ও দেশ সভ্য জগতে সমুন্নত হইয়াছে, তাহারা একমাত্র শিক্ষার উৎকর্ষেই তদ্রূপ হইয়াছে। শিক্ষার মূল নীতি যদি আমরা পালন করিতাম এবং আমাদের জীবন ও চরিত্র যদি সত্যের ছাঁচে গড়িতাম তবে আজ দুর্দ্দশাগ্রস্ত অধঃপতিত ছাত্রসমাজ বা গৃহস্থ সমাজের প্রতি অশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণে এত আত্মগ্লানির সহিত নিজ নিজ জীবনকে ধিক্কার প্রদান করিতাম না। ব্রাহ্মণ সমাজও আজ এই শুভ মুহূর্ত্তে দুঃখ সন্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিত না। বাস্তবিক দুঃখের বিষয় যে, সমাজ কর্ত্তারা তাহাদের নিজেদের কিছুমাত্র উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন না—স্বীয় গৌরবান্বিত বংশধরগণের চরিত্রমার্জ্জনের চেষ্টা করিতেছেন না, বা তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতির কল্পনাও করিতেছেন না। বরং সমাজস্থ স্বার্থগণ্ডিতে অবস্থান করিয়া শুষ্ক বিষয়ের আলোড়ন দ্বারা পরবর্ত্তী সন্তানগণের ভবিষ্যৎ জীবনাকাশ অন্ধকারময় করিতেছেন। যদি তাহারা প্রাচীন বিষয়ের খুটিনাটী পরিহার করিয়া সহজ সরলভাবে সত্যের আচরণ ও পালন করিয়া সন্তানদিগকে উচ্চ শিক্ষার দিকে টানিয়া আনেন তবেই দেশের আশাস্থল, উন্নতিকামী, নবোৎসাহী যুবকবৃন্দের কর্ম্মপথ কণ্টকশূন্য সুগম হইবে। প্রতি সমাজে, গ্রামে

গ্রামে, দেশের কেন্দ্রস্থানে তরুণ যুবক-সঙ্ঘ তৈয়ারী করিতে হইবে ও তাহাদের কর্ম্মক্ষেত্রের প্রসার করিয়া মনপ্রাণ খুলিয়া নবোদ্যমে, নবোৎসাহে কাজ করিবার জন্য তাহাদিগকে সর্ব্বদা সুযোগ ও সুবিধা প্রদান করা উচিত। তাহা' হইলে প্রকৃতির নির্ম্মল স্বভাব-শৃঙ্খলার শিক্ষায় তাহাদের নৈতিক চরিত্র ক্রমশঃ উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। এবং অনন্তবীর্য্যাশক্তির প্রভাবে তাহারা দেশের মধ্যে অত্যাশ্চর্য্যরূপে কর্ম্ম করিয়া মানব সমাজের শ্রীবৃদ্ধিসাধন ও অশেষ উপকার দ্বারা কীর্ত্তি-সংরক্ষণ করিয়া যাইবে। প্রত্যেক বালক চরিত্রই স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশ মত পৃথিবীতে আসিয়া একটা স্মরণীয় 'দাগ' রাখিয়া যাইবে।

উৎসাহ দাও, ক্ষেত্র দাও, অমিততেজের সহিত কাজ করিবার অবসর ও সুযোগ দাও, দেখিবে আজও এই শশ্মান মরুভূমে—ভারতের নিবীর্য্যক্ষেত্রে আবার সফলতা, সজীবতার চৈতন্যসত্ত্বা ও শক্তিধর যুবকদলের চরিত্রালোকে সমাজ ও দেশের চিত্রপটে সুন্দর নবীন দৃশ্য অঙ্কিত হইবে।—যাহা দেখিয়া নবীন প্রাণে নবীন ভাবের উদয় হইবে—হৃদয়গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হইয়া প্রাণের তন্ত্রী আপনি নাচিয়া উঠিবে।—তরুণ অরুণের নির্ম্মল কিরণ প্রতিভাত হইবে—মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের প্রখর তেজের ন্যায় উন্নত ললাট আর্য্যসুতগণের মহিমামণ্ডলে ভারতাকাশ দিগ্বিভাষিত হইবে।

অসিত গিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধু পাত্রং
সুরতরু বর শাখা লেখনী পত্রমুর্ব্বী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা শারদা সর্ব্বকালং
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি॥ মহিম্ন স্তোত্র॥ ৩২॥

"যদি হিমালয় কৃষ্ণ পর্ব্বত-পরিমিত মসী হয়, সমুদ্র যদি দোয়াত হয়, কল্পতরুর শাখা যদি লেখনি হয়, বসুন্ধরা যদি লিখিবার পত্র হয়, এই সমস্ত দ্রব্য গ্রহণ করিয়া যদি স্বয়ং বাগ্‌দেবী অনন্তকাল ধরিয়া লেখেন, তথাপি তোমার গুণের পরিসীমা অতিক্রম করিতে পারেন না।"

বিচিত্র লীলা।

(শ্রীরমেশচন্দ্র দাস।)

সুজলা, শ্যামলকায়া ধরা, ঊর্দ্ধে নভঃ দীপ্ত নীলিমায়,
শ্বেত, পীত, কৃষ্ণ মেঘগুলি ভেসে যায় আকাশের গায় ;
নিম্নে শোভে চির-অচঞ্চল অচলের দৃশ্য সুগম্ভীর,
তা'রি পাশে চির বীচিময় বারিধির সুবিশাল নীর ;
পরেতে মহাকাশ ব্যাপি' চির চঞ্চলতাময় খেলা,
কে বুঝিবে, হে শ্যামা ! তোমার এ বিশ্ব জুড়ি কি বিচিত্র লীলা !
ক্ষুদ্রকায়, নগণ্য, নশ্বর, রোগাশ্রয় মনুষ্য শরীর,
নিশ্চয় গ্রাসিবে মৃত্যু আসি, কখন সে নহে কিছু স্থির ;
ভিতরে ইন্দ্রিয়াতীত মন দেশ কাল চায় লঙ্ঘিবার,
শক্তিবলে উদ্ধারিতে চায় রহস্য এ জগৎ স্রষ্টার !
স্থির নহে, তুষ্ট নহে কভু :—চিরচঞ্চলতাময় খেলা,
কে বুঝিবে হে শ্যামা ! তোমার এ স্বল্প দেহে কি বিচিত্র লীলা !
সম্মুখেতে গন্ধরূপরস, অগণন কত শ্রী মোহন,
নানাকার্য্যচিন্তা-সমাকুল হিতাহিত দৃষ্টিহীন মন,
উন্মাদ আপনা ভুলি' সদা চাহে গন্ধরূপরস পানে,
কি ভীষণ চলিছে সংগ্রাম ইন্দ্রিয়ের সুখ আলিঙ্গনে !
পশ্চাতে অচলসম স্থির, সাক্ষিবৎ আত্মা সমাসীন,
কেন্দ্রীভূত সব শক্তি তাঁয়, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও স্বাধীন ;
হে মায়ে ! কারণরূপিণি ! মহান্ এ সুগভীর খেলা
কে বুঝে, কে বুঝিবে মাতঃ ! বৈচিত্র্য তোমার এই লীলা !

দেশীয় ধাত্রী।

(ডাঃ শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় এম্‌-বি)

আমাদের দেশে শিশুর অকাল মৃত্যুর প্রধান কারণ অশিক্ষিতা দেশীয় ধাত্রী। ইহাদের হাতে আমরা জাতির আশা ভরসাস্থল শিশুর জীবন সমর্পণ করিয়া থাকি। কিন্তু একবারও ভাবি না যে তাহারা এত গুরুভার বহন করিবার উপযুক্ত কি না? প্রায়ই দেখা যায় যে নীচ জাতীয়া স্ত্রীলোকেরাই—হাড়ী, মুচি, ডোম প্রভৃতি—এই কার্য্য করিয়া থাকে। ধাত্রীকার্য্য করিতে হইলে যে কোন শিক্ষার প্রয়োজন হয় তাহা আমরা বিবেচনা করি না। এই সব ধাত্রীদের ধাত্রীবিদ্যা যে কি, ধাত্রীর কি কি কর্ত্তব্য, এ বিষয়ে জ্ঞান একেবারেই নাই। অনেক সময় দেখা যায় যে উত্তরাধিকারিসূত্রে তাহারা এই বিদ্যা পাইয়া থাকে। হয়ত তাহার মাতা ধাত্রী ছিল, না হয় তাহার অপর কেহ। কি ধনী, কি নির্ধন, কি শিক্ষিত বা অশিক্ষিত সকল বাটীতেই এই প্রকার ধাত্রীর ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ বোধহয় অনেকেই এখনও সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

পূর্ব্বে বোধ হয় ধাত্রীকার্য্য আমরা এত নীচচক্ষে দেখিতাম না। কারণ দেখিতে পাই, আমাদের শাস্ত্রকারগণ এই ধাত্রীকুলকে সপ্ত-মাতার মধ্যে স্থান দিয়াছেন। এখনও বিবাহের সময় "ধাইমাকে" যৌতুক দেওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে। কেন এবং কবে এই ধাত্রীদের কাজ নীচজাতি মধ্যে আবদ্ধ হইল বলিতে পারি না। অথচ এমন গুরুদায়িত্বপূর্ণ এবং উদার ব্যবসা জগতে আর আছে কি না সন্দেহ। যাহাতে অপেক্ষাকৃত উচ্চতরজাতীয়া স্ত্রীলোকগণ এই কার্য্যে ব্রতী হন, যাহাতে সমাজ তাঁহাদের সম্মানের চক্ষে দেখেন তাহা প্রত্যেকেরই করা কর্ত্তব্য। সুখের বিষয় ছুঁৎমার্গীদের প্রভুত্ব দিন দিন কমিয়া

যাইতেছে। "নরই নারায়ণ" এই কথা শুধু মুখে বলিলে হইবে না কার্য্যতঃ দেখাইতে হইবে।

এই সুশিক্ষিত ধাত্রীর অভাবে কত শত প্রসূত ও প্রসূতি যে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। শিশুর অকালমৃত্যুর অন্যান্য অনেক কারণও আছে। তাহা পূর্ব্বে "উদ্বোধনে" কিছু কিছু আভাস দেওয়া হইয়াছে। তবে আমার মনে হয় অশিক্ষিত ধাত্রী ও অস্বাস্থ্যকর প্রসবগৃহ এই শিশুহত্যার প্রধান কারণ। পুরাকালে আমাদের রমণীদিগের স্বাস্থ্য এবং জীবনীশক্তি এখন অপেক্ষা অনেক ভাল ছিল। সন্তানও তখন সবল ও সুস্থ হইত। এখন ত আমার চক্ষে পূর্ণ সুস্থবতী যুবতী প্রায়ই পড়ে না। গ্রামে গ্রামে, সহরে সহরে ম্যালেরিয়া প্রপীড়িতা, অনশনশীর্ণা রমণীর সংখ্যাই ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। কাজেই সেকাল অপেক্ষা একালে শিক্ষিতা ধাত্রীর আবশ্যকতা আরও বেশী।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা—প্রত্যেক রোগেই বিশেষ প্রয়োজন বিশেষতঃ প্রসব সময়ে। ইংরাজীতে বলে "Cleanliness is next to godliness। কিন্তু দরিদ্রতাবশতঃ ও শিক্ষার অভাবে এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা শুদ্ধাচরণ জিনিষটা জানে না। তাহাদের পরিধেয় বসনাদিও পরিস্কৃত থাকে না। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে নখ না কাটিয়াই, কার্ব্বলিক সাবান ও গরম জল দিয়া হস্তাদি ধৌত না করিয়াই এই শ্রেণীর ধাত্রীরা জরায়ুর অভ্যন্তর পরীক্ষা করিয়া থাকে। ফলে কতশত প্রসূতি যে "আঁতুড় জ্বরে" আক্রান্ত হন, তাহার সীমা নাই। দেখিতে পাওয়া যায় যে, জ্বর হইলে বাটীর লোকেরা ডাক্তার ডাকিয়া বিস্তর অর্থ ব্যয় করেন কিন্তু যাহাতে সে জ্বর না হয় তাহা করিতে তাঁহারা আদৌ প্রস্তুত নন, অর্থাৎ প্রসবের প্রথমেই কোন শিক্ষিতা ধাত্রী ডাকেন না। এখানে একটী প্রসূতির জরায়ু মধ্যে একটী অশিক্ষিতা ধাত্রী হস্তাদি উত্তমরূপে ধৌত না করিয়া সেই হস্ত দ্বারা ফুল ছিঁড়িয়া বাহির করায় তাহার ধনুষ্টঙ্কার রোগে মৃত্যু হয়। কিছু টাকা বাঁচাইতে গিয়া অথবা অজ্ঞতাবশতঃ বহুমূল্য একটী জীবন অকালে নষ্ট হইয়া যায়।

কি করিয়া—নাড়ী কাটীতে হয় প্রসবের পর কতক্ষণ অপেক্ষা করিয়া—নাড়ী বাঁধিতে হয়। নাড়ী কাটিবার জন্য—ধারাল কাঁচিটী ও বাঁধিবার সূতাটী যে উত্তমরূপে গরমজলে ফুটাইতে হয় এই সব শিক্ষা অশিক্ষিতা ধাত্রীদের মোটেই নাই। ফলে কতশত শিশু যে অকারণে "ধনুষ্টঙ্কার" রোগে আক্রান্ত হয় তাহার সংখ্যা নাই। আমরাও এই সব রোগ ভূতের খেয়ালভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বাসয়া থাকি এবং জল-পড়া প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া আসি। আর যদি "পেঁচো পেঁচীর" কৃপায় মৃত শিশুরা পরপার হইতে ফিরিয়া আসিয়া সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারিত, তবে নিশ্চয়ই তাহারা, অশিক্ষিতা ধাত্রীদের তাহাদের হত্যার প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিত।

ভগবানের কৃপায় শতকরা ৯৫টী প্রসব স্বাভাবিক ভাবে হয়। একটু বিকৃতাবস্থা হইলেই এই সব ধাত্রীদের বিদ্যা জাহির হইয়া পড়ে। ইহাদের সাহস কিন্তু অসীম। অনেক সময় দেখিয়াছি উপযুক্ত সময় না বুঝিয়া উপযুক্ত অবস্থা না বুঝিয়া জোর করিয়া প্রসব করাইতে গিয়া শিশুকে বিকলাঙ্গ করিয়া ফেলিয়াছে। যদি বাটীর কর্ত্তা বা গৃহিণীকে সময় মত ডাক্তার ডাকিতে উপদেশ দেয় তাহা হইলে এই সব বিষয় না জানাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু মর্য্যাদা হানি ভয়ে অনেক সময় তাহাও তাহারা করে না। ফলে অনেক সময়ে বিলম্ব হেতু সন্তান ও গর্ভিণী মারা পড়ে।

আমাদের দেশে শিক্ষিতা ধাত্রীর সংখ্যা অতীব কম। অনেক সহরেই শিক্ষিতা ধাত্রী উপযুক্ত পরিমাণে পাওয়া যায় না, পল্লীগ্রামের কথাত দূরে। কিন্তু যাহাতে দেশীয় ধাত্রীদিগকে কিছু কিছু ধাত্রী বিদ্যা শিখান যায় এ বিষয়ে সকল ডাক্তারেরই বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। কথাচ্ছলে গল্পচ্ছলে অনেক বিষয় ইহাদের শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।

পল্লীগ্রামের ডাক্তারদের দৃষ্টি এ বিষয়ে আমি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিতে চাই। আমরা সমবেত ভাবে চেষ্টা করিলে এই জাতীয় অভাব অল্প দিনের মধ্যেই বিদূরিত হইতে পারে। জাতীয় ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া আশাকরি সকলেই এ বিষয়ে চেষ্টাবান হইবেন।

কেবল এই সব ধাত্রীদের দোষ দিলে চলে না। অনেক সময় দেখিতে পাই যে বাটীর কর্ত্তা বা গৃহিণী এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। ধাত্রীরা শত চেষ্টা করিয়াও অনেক সময় গৃহস্থ দিগের নিকট হইতে সাবান, কাঁচি প্রভৃতি পান না। আর এক কথা, আমরাও এই সব দেশীয় ধাত্রী দিগকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে কুণ্ঠিত হই। কাজেই কেবল ধাত্রী-গিরী করিয়া ইহাদের দিন চলে না। কাজেই কোন উচ্চতরজাতীয়া স্ত্রীলোকেরা এই কার্য্য করিতে চান না। সচ্ছলভাবে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে না পারিলে উপযুক্ত শিক্ষিত লোক কেন এ ব্যবসা করিতে আসিবে? এটাও ভাবিবার বিষয়। লাভের মধ্যে প্রায় সর্ব্বত্রই এই দেশীয় ধাত্রীদের সংখ্যা ক্রমে ক্রমে কমিয়া যাইতেছে। এমন পল্লীগ্রাম দেখিয়াছি যেখানে ২।৩ মাইল দূর হইতে ধাত্রী আনিতে হয়। ফলে অনেক সময় সন্তান প্রসবের পর ধাত্রী আসিয়া উপস্থিত হয়। আমার মতে অন্নপ্রাশন প্রভৃতিব্যয় সংক্ষেপ করিয়া দেশীয় ধাত্রীদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিলে—এই সমস্যার মীমাংসা হইতে পারে।

পরিশেষে বক্তব্য, এই যে আমাদের জাতি বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে, কারণ জন্ম হইতে মৃত্যু সংখ্যা অধিকতর। এখনও সময় আছে। এখনও যদি আমরা বহুদিনের উদাসীনতা ও জড়তা ত্যাগ করিয়া সমবেত ভাবে চেষ্টা করি তবে হয় ত জাতির বাঁচিবার আশা এখনও আছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, বাঙ্গালা দেশে প্রত্যেক দিন শিশু মারা যায় গড়ে প্রায় ১০০০। তাহার মধ্যে শিক্ষিতা ধাত্রী ও উপযুক্ত পরিচর্য্যার অভাবে মারা যায় ৭৫০ !!! একবার স্থির হইয়া চিন্তা করিয়া দেখুন দেখি। ইহা ছাড়া ম্যালেরিয়া কলেরা প্রভৃতি রোগে যে কত শিশু দুই এক বৎসর হইয়াই মারা যায় তাহার ইয়ত্তা নাই। যেমন করিয়াই হউক এই শিশু হত্যা যজ্ঞের অবসান করিতেই হইবে। নতুবা আমাদের নাম এই ধরা পৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যাইবে।

উৎসব।

(শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন, বি-এ)

যাহা উর্দ্ধমুখে প্রসব করে. তাহাই উৎসব। অর্থাৎ যাহাতে প্রাণকে সাধারণ-গণ্ডি-সীমার বাহিরে, উচ্চস্তরে স্বরগের মন্দাকিনী-তট-প্রান্তবর্ত্তী মন্দার ছায়ায় লইয়া যায়, তাহাই উৎসব, উহার অপর নাম আনন্দের বাহ্য বিকাশ।

বিশ্বসংসার অবিরত উন্নতির পথে চলিয়াছে। দার্শনিকপ্রবর হেগেল বলিয়াছেন "The world is not standing still but is becoming" অর্থাৎ বিশ্ব স্থির অচল নহে, উহা পূর্ণতার পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। উহার প্রধান রথ আনন্দ বা উৎসব। বিশ্ব অপূর্ণ (?) ঐশীশক্তির বিকাশে, পূর্ণতার জন্য আকুল ; ঐশী শক্তি তিন প্রকারে বিশ্বে কার্য্য করিতেছে ;—সৎ বা সত্ত্বা, চিৎ বা জ্ঞান এবং আনন্দ বা উৎসব। আমরা দেখিতে পাইব, সমুদ্র-সৈকতবাসী নগণ্য বালুকাকণা হইতে আরম্ভ করিয়া ভগবানের শ্রেষ্ঠ-সৃষ্টি মানব পর্য্যন্ত সকলের মধ্যেই ঈশ্বরের ঐ তিনটী শক্তি অল্পাধিক পরিমাণে বিদ্যমান, এমন পদার্থ নাই, যাহার সত্ত্বা বা প্রাণ নাই ; এবং যদি আমরা সূক্ষ্মদৃষ্টি সম্পন্ন হইতাম, তাহা হইলে দেখিতাম, সমস্ত বস্তুতেই সামান্য পরিমাণে হইলেও জ্ঞান এবং আনন্দ বিরাজিত। সুতরাং বিশ্ব এই তিন শক্তির লীলাক্ষেত্র ; জড় জগতে দেখিতে পাই জ্ঞান এবং আনন্দের বাহ্যবিকাশ খুব কম। কিন্তু যতই উচ্চ স্তরে উঠি ; ততই দার্জ্জিলিংএর রেলপথে হিমগিরির তুষার-বিমণ্ডিত অপূর্ব্ব শোভাময় শিরে মেঘমালার লীলা-বিলাসের মত জ্ঞান ও আনন্দের লহরী-লীলা মানস জগতে আত্মপ্রকাশ করে। আপাতঃ দৃষ্টিতে বিশ্বজগৎ অনন্ত বৈচিত্র্যময় হইলেও কেবলমাত্র আনন্দের সুবর্ণ-ডোরে একত্র সম্বদ্ধ—সম্বদ্ধ বিহীন বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও অন্তরে অন্তরে নিভৃত প্রদেশে এক জাতীয়। যতই উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে

উঠিয়া পর্য্যবেক্ষণ করি, ততই দেখি, ক্রমশঃ আনন্দের পরিমাণ বেশী হইয়া দাঁড়াইতেছে, ততই সৎ ও চিত্তের অপেক্ষা আনন্দ প্রাধান্য লাভ করিতেছে। ইহাতে বুঝা যায় বিশ্ব পূর্ণানন্দের দিকে প্রধাবিত; যদি পূর্ণতা লাভের বাসনা থাকে, তবে আনন্দের ভিতর দিয়াই তাহা লাভ করিতে হইবে—পূর্ণতা সৌধের সুবর্ণ চূড়ায় উঠিবার আর কোন পথ নাই।

কিন্তু আনন্দ হৃদয়ে উদিত হইলে উহাকে আগুনের মত ছাই চাপা দিয়া রাখা চলে না, গিরিদরি ভিন্ন করিয়া ঝরণা যেমন মহাবেগে পৃথিবীর সমতল ক্ষেত্রে লাফাইয়া পড়ে, উহা তেমনি ছুটীয়া বাহির হইতে চাহে,—জোর করিয়া উহাকে হৃদয় কন্দরে আবদ্ধ রাখা সম্ভবপর নহে; এই যে হৃদয়-কন্দর-নিহিত-আনন্দের বাহ্যস্ফূর্ত্তি, উহাই উৎসব।

তাই আমরা দেখি, বিশ্বপ্রকৃতি হৃদয়ের অন্তর্নিহিত আনন্দপ্রকাশের জন্য উৎসবের আয়োজন করিতেছে; বর্ষার আকাশে ঘন-কৃষ্ণ-মেঘমালার উদ্দাম-নৃত্য, জ্যোতির্ম্ময়ী চপলার চকিত স্ফুরণ, বিরামবিহীন জলধারার পতনধ্বনি, মুহুর্মুহুঃ বজ্র নির্ঘোষে প্রকৃতির বৈচিত্র্যময় হৃদয়ের গুপ্ত আনন্দের বিকাশ, শরতের মেঘবিরল জ্যোৎস্নার কম্পমান প্রকাশ, ভাদ্রের ভরানদীর দুকূলপ্লাবী জলতরঙ্গ, শ্যাম শৈবালনিচয়ের মধ্যে সদ্যঃ বিকশিতা কমলিনীর রূপোচ্ছ্বাস, শেফালীর কোমল গন্ধ বিশ্বে ঋতুরাণীর উৎসব ঘোষণা করিতেছে; তারপর হেমন্তের পীতরৌদ্রতলে স্বর্ণশস্যের চঞ্চল নৃত্য, প্রকৃতি দেবীর উৎসবের পট পরিবর্ত্তনের সূচনা করে। আবার বসন্তরাণীর পদার্পণে বৃক্ষে বৃক্ষে অসংখ্য কুসুম-স্তবক ফুটিয়া উঠে; কুঞ্জে কুঞ্জে কোকিল ডাকিয়া উঠে, পাপিয়ার 'চোখ গেল' ডাকে মানবের চিত্তবীণায় একটা করুণ রাগিণী ঝঙ্কার দিয়ে উঠে; আম্র মুকুলের অপূর্ব্ব সুরভি বায়ুস্তর আমোদিত করে;—তখন বিশ্বপ্রকৃতির আনন্দ ষোলকলায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে; সুতরাং উৎসবের ঘটাও তখন সব চেয়ে বেশী বলিয়া মনে হয়।

তারপর জীবজগতের পানে তাকাইলেও দেখি,—সব সময় কোকিল ডাকে না, 'বউ কথা-কও' রব সব সময় ত শুনিতে পাই না; ইহার

কারণ কি?—তাহাদেরও প্রাণে যখন আনন্দ-সমুদ্রের তরঙ্গ, আসিয়া লাগে, তখনই তাহারা ঐ ডাকের ভিতর দিয়া বিশ্বে তা ছড়াইয়া দেয়; তখনই তারা আনন্দে মত্ত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে যখনই আনন্দ সমুদিত হয়, তখনই বিশ্ব উৎসবে মত্ত হয়, নতুবা কল্পকল্পান্তর অতীত হইয়া গেলেও উৎসবের কোন চিহ্ন দেখা যাইত না। বর্ষার অবসানে আকাশে যখন নীলিমা হাস্য করে, তখনই শারদশশীর শোভা ফুটিয়া উঠে, শীতের তীব্রতা চলিয়া গেলেই মলয় পবনের আনন্দ-হিল্লোলে বিশ্ব স্নিগ্ধ হয়। এইরূপে দেখা যাইবে যে সুযোগ ও সুবিধা উপস্থিত হইলে সকলেই উৎসবে মত্ত হয়; আনন্দের অমৃত মদিরা পান করিয়া সকলেই অমর হইতে চায়; সকলেই পূর্ণতা-সিন্ধুর নীল-তরঙ্গে অবগাহন করিবার জন্য লালায়িত। সুতরাং, মানব—বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জীব, মর্ত্ত্যে ভগবানের অবতার, জ্ঞানের গুরু, ত্যাগের শিষ্য, সভ্যতার স্নেহ-লালিত সন্তান, মোক্ষের পথ প্রদর্শক মানব যে আনন্দ লাভ করিয়া পূর্ণতার পথে দ্রুত অগ্রসর হইবে—ভূমা-মহতের সঙ্গে মিশিয়া মহামহীয়ান হইবে, তাহার আর বৈচিত্র্য কি? তাই আমরা দেখি, মানব জীবনই একটা অফুরন্ত আনন্দধারা; যাহার জীবন যত আনন্দ বহুল, তিনি তত পূর্ণ;—সচ্চিদানন্দময় ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবানের তত নিকটবর্ত্তী।

আমরা দেখি, অসভ্য বন্য ভীল, কোল, সাঁওতাল, কুকী প্রভৃতি জাতিও যখন দিবাবসানে নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম শেষ করিয়া গৃহে ফিরে, তখন তাহাদের গৃহে গৃহে আনন্দের মাদল বাজিয়া উঠে। সকলে মিলিয়া আনন্দোৎসব করিতে করিতে সংসারের দুঃখ-দৈন্য-অভাব, আশা-নিরাশার জ্বালা ক্ষণকালের জন্য বিস্মৃতির অতলগর্ভে নিক্ষেপ করে। আর যাহারা সভ্যতা-সোপানে আরোহণ করিয়াছে, তাহারা আরও অধিকতর, উচ্চতর আনন্দলাভের চেষ্টায় আকুল। তাই আমরা দেখি, সমস্ত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়,—কি বৌদ্ধ, কি খৃষ্টান, কি পার্শী, কি জৈন, কি মুসলমান —সকলেরই উৎসবের চেষ্টা—সকলেই আনন্দ সিন্ধুর তরঙ্গ রঙ্গে উৎসব তরণী ভাসাইয়া পূর্ণতার স্বর্ণ সৈকতে উপনীত হইতে চায়।

আর হিন্দুর সমগ্র জীবনই যে উৎসবের একটা অফুরন্ত উৎস!

যেদিন প্রথম পৃথিবী তাহার শ্যামল শোভা লইয়া নয়নের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে, যেদিন প্রথমে দিনমণিকে হিরণ্কিরণে ধরাবক্ষ বিরঞ্জিত করিতে দেখি, যেদিন প্রথম অনন্ত গ্রহ নক্ষত্র বুকে লইয়া বিশাল আকাশ একটা অসীম শূন্য চন্দ্রাতপের মত অনুভূতির মধ্যে আত্ম-প্রকাশ করে, সেই প্রথম জন্মদিন হইতেই উৎসবের আরম্ভ। তার পরে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নামকরণ, কর্ণবেধ, চূড়াকরণ প্রভৃতি উৎসবের মধ্য দিয়া হিন্দুজীবন পরিণয়ে উৎসবের উচ্চ সামায় আরোহণ করে।(?) এবং পরিশেষে হিন্দুজীবনে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় উৎসবের পরি-সমাপ্তি ঘটে। এই যে একটা ধারাবাহিক উৎসবের আয়োজন, এই যে আনন্দের বাহ্য বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার স্ফূর্ত্তি, ইহাই আমাদিগকে মর-জগতে অমরত্বের আস্বাদ প্রদান করে;—এই উৎসবের মধ্য দিয়াই আমরা চিরানন্দময় মহানের উপাসনা করি—ইহাই আমাদের প্রধান সাধনা, মুক্তির প্রধান অবলম্বন।

আমরা আরো দেখি,—নববর্ষের প্রথম প্রভাতে, বৈশাখের পুণ্য মাসে, জলদান ব্রতরূপ মহোৎসব প্রত্যেক হিন্দুর কর্ত্তব্য। পরের সেবায়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জন্য আত্মবিসর্জ্জনে যে কি পুণ্য, কি আনন্দ, আর্য্যঋষিগণ তাহা ভালরূপেই বুঝিয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহারা কখনো আত্ম সুখের দিকে চাহেন নাই; সমস্ত প্রাণী-জগতের দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—তাহারই প্রথম আদেশ—জলদানব্রত।

জ্যৈষ্ঠ মাসে গঙ্গাপূজার ব্যবস্থা; জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রখর রৌদ্রে যখন বিশ্ব দগ্ধ প্রায়, তখন জলদেবীর পূজায় প্রাণ আনন্দ-অনুভব করে। তখন শীতল জল-ধারা মানবের অত্যন্ত প্রীতি আকর্ষণ করে, সেই জন্য এই সময়েই জগন্নাথ দেবের স্নান-যাত্রার ব্যবস্থা।

আষাঢ়ের নব মেঘমালার নবসৌন্দর্য্যের মধ্যে, চপলার চপল-দীপ্তির মধ্যে, স্নিগ্ধ বারিধারার সমভিব্যাহারে জগন্নাথের রথযাত্রা ভক্ত হিন্দুর হৃদয়ে ভক্তি ও আনন্দের উৎস উৎসারিত করিয়া দেয়।

শ্রাবণের অবিরল বারি সম্পাতে যখন বৃক্ষে বৃক্ষে নবকিশলয় সমুদ্ভূত হয়, যখন প্রকৃতি শ্যামলিমায় আপন দেহ সুসজ্জিত করে, তখন

নব-সৌন্দর্য্য বিভূষিত, নব বিহঙ্গ-কূজন-মুখরিত কুঞ্জ-কাননে ঝুলনোৎসব আমাদের জীবন নাটকে একটা নবদৃশ্যের অবতারণা করে।

ভাদ্রের ভরানদীর কুলুকুলুধ্বনির মধ্যে, জলহীন শুভ্র-অভ্র মেঘ-মালার নিষ্ফল গর্জ্জনের মধ্যে ধান্য ক্ষেত্রের তরঙ্গিত শ্যামনীলিমার মধ্যে জন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব প্রাণে আনন্দধারা ঢালিয়া দেয়।

যখন সেফালীর মধুরগন্ধ গায়ে মাখিয়া, আনন্দিত কুলকামিনীর হর্ষ কোলাহলের সমভিব্যাহারে, গৃহ-কামনাভিলাষী প্রবাসীর ঔৎসুক্য-বিজড়িত উদ্দাম প্রতীক্ষার সঙ্গে, আশ্বিন দুর্গাপ্রতিমার আবাহন করে, তখন বালক বৃদ্ধ যুবা, পুরুষ স্ত্রী, সকলেই আনন্দে আত্মহারা হইয়া যায়। দিক্‌চক্রবালে নবনীত-শুভ্র মেঘমালার সঙ্গে ঈষৎপক্ক সর্ব্বশস্যের অপূর্ব্ব মিলন দর্শকের প্রাণকে সুর মন্দাকিনীর স্বর্ণ সৈকতে লইয়া যায়। লক্ষ্মী-দেবীর আগমনে গৃহে গৃহে মঙ্গল-শঙ্খ বাজিয়া উঠে, শারদ পূর্ণিমার বিমল জ্যোৎস্নায় হিন্দু সারা নিশি জাগিয়া অক্ষ-ক্রীড়ায় ধনাধিষ্ঠাত্রী দেবীর অর্চ্চনা করতঃ পুণ্য লাভের প্রয়াস পায়।

কার্ত্তিকের হিমানি-বিজড়িত ব্যোমে যখন গ্রহ নক্ষত্র স্পষ্ট দেখা যায় না, ছায়া মাখা বলিয়া বোধ হয়, তখনই হিন্দুর আকাশ প্রদীপের ব্যবস্থা; তারপর গভীর তামসী রাত্রে সুপ্ত বিশ্ব যখন নীরবতার কোলে ঢলিয়া পড়ে, তখনই নৈশ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া অমা নিশীথিনীর গভীর সুপ্তি ভাঙ্গিয়া দিয়া শ্যামাপূজার বাদ্য বাজিয়া উঠে; সাধকের প্রাণকে একটা অপার্থিব শান্তরসে ডুবাইয়া দেয়। আবার পূর্ণিমার কৌমুদীধৌত রাত্রে কদম্বমূলে রাসবিহারীর বংশীস্বরে যমুনা উজান বহে, কুলনারী লজ্জাভয় বিসর্জ্জন দিয়া রাস-রসে মজিতে চায়। দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অর্চ্চনা ও মানবকে স্থির যৌবন-রূপ-লাবণ্য-বিভূষিত শৌর্য্য-বীর্য্যের আধার দেহলাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে উপদেশ দেয়।

মার্গশীর্ষের শৈত্য মৃদু বাতাসের মধ্যে নবীন ধান্যের হিন্দু নবান্নের উৎসব সম্পন্ন করে।

পৌষের তুষার ধবলিত শীতল দৃশ্যের মধ্যে পৌষপার্ব্বন বা উত্তরায়ন সংক্রান্তির উৎসব আমাদের প্রাণে নবীন আনন্দ দান করে।

মাঘের প্রথম প্রভাতে, নব বসন্তের উদ্বোধনে, আম্রমুকুলের অপূর্ব্ব সৌরভের মধ্যে আমরা "তরুণশকলমিন্দোর্বিভ্রতীশুভ্রকান্তিঃ" বীণাপাণি বাগ্দেবীর পূজা করিয়া থাকি।

ফাল্গুনের মলয় হিল্লোলবাহিত কুসুম-পুঞ্জের সম্মিলিত সৌরভ-ভারে, কোকিলের পঞ্চম তানে আমাদের আনন্দ-দোল-লীলায় উৎসবের উচ্চ-সোপানে আরোহন করে।

অবশেষে বর্ষশেষ চৈত্রে বাসন্তী পূজায় ও চড়কের ঢাকের বাদ্যে আমরা আমাদের পুরাতন বর্ষকে বিদায় দিয়া নববর্ষের উদ্বোধন করি।

এইরূপে দেখা যাইবে হিন্দুর যা কিছু পূজা-পার্ব্বণ, সমস্তই উৎসব—সমস্তই হৃদয়ের অন্তর্নিহিত আনন্দের বাহ্য বিকাশ।

আরো দেখি, যে প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া নিশীথে শয়নের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত হিন্দুর যে নিত্যকর্ম্মের বিধান, তাহা উৎসবের নামান্তর বা আনন্দের বাহ্যবিকাশ।

তারপর হিন্দুর উৎসব শুধু একার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; শুধু পরিবার পরিজন লইয়াই তাহার উৎসব সম্পন্ন হয় না, পাড়া-পড়সী হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র বিশ্বের প্রাণীমাত্রকেই সে এই উৎসবে টানিয়া আনিতে চায়। ক্ষুদ্রতার সসীম গণ্ডি পরিহার করিয়া অনন্তের বিশালতায় বিচরণ করিতে শিক্ষা দেওয়াই হিন্দুর উৎসবের প্রধান উদ্দেশ্য। তাহার প্রধান অঙ্গ পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ কথিত দরিদ্র-নারায়ণের সেবা। অনাহার ক্লিষ্ট ক্ষুৎ-পিপাসা-কাতর দীন হীন নারায়ণের ভোজনাবসানে প্রফুল্ল হাস্যময় মুখ দেখিলে প্রাণে যে বিমল আনন্দের উদয় হয়, শত শত বক্তৃতায় সেরূপ আনন্দের উদয় হওয়া সম্ভবপর নহে; খোল করতালের প্রাণোন্মাদকারী শব্দেও তদ্রূপ হওয়া দুঃসাধ্য। তারপর দীনহীন নগণ্য সমাজের পদদলিত, উপেক্ষিত, ঘৃণিত নর-নারীকেও "নারায়ণ" জ্ঞানে ভক্তিভরে আহার-দানে আমাদের হৃদয় হইতে অভিমানের বোঝা নামিয়া যায়, বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুতেই

যে ভগবানের সত্তা বিদ্যমান, তাহাই আমাদের উপলব্ধি হয়; এইরূপে আমরা সমস্ত মানবকে ধরিয়া অনন্ত ঈশ্বরকে লাভ করিবার সোপানে আরোহন করি।

সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে উৎসব আমাদের জীবনের উন্নতির একটা প্রধান উপায়; কাজেই উৎসবকে বাদ দিলে মানব জীবন অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে, ভূমা-মহত্তের চরণ-তলে পৌঁছিতে পারিবে না, মর্ত্ত্যে আসিয়া স্বর্গের মন্দাকিনী-তট-প্রবাহিত ধীর সমীরে ত্রিতাপজ্বালা জুড়ান অসম্ভব হইবে।

আজ এই উৎসবে যাঁহারা যোগদান করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মঙ্গলময় ভগবানের অপার করুণাবলে চিরকাল এইরূপ নিত্য উৎসবেই জীবন যাপন করুন; সংসারের দুঃখ দৈন্য অভাব-অভিযোগ ভুলিয়া গিয়া তৃপ্তির বিমল সলিলে মগ্ন থাকুন; সংসারের নিন্দা ঘৃণা-উপেক্ষার পর-পারে অবস্থিত শান্তির শুভ্র-বৈজয়ন্তী-তলে উপনীত হইয়া পূর্ণতা লাভ করুন।

চট্টলের উদীয়মান কবি, বাঙ্গলার ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, শশাঙ্ক মোহনের ভাষায় বলি—

আনন্দে ভবলোক প্লাবিত হোক!
ধরণী পরিহর দূর পূরে সব।
দারুণ বিষরিষ অঘ দুখ শোক!
শোভিত ফুলফলে, পল্লব শ্যামলে
হাসহ গতমল ভূতল লোক!
নিত্য যমুনাজলে, স্বর্গ বরাতলে
সুন্দরে সুন্দর সঙ্গত হোক!
ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!*

---

* পূঁড়া সদালাপ সভার নবম বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

মাধুকরী।

"শক্তিকে চিনি না বলে নারী তাই গুটিয়ে এসে ইন্দ্রিয়-সেবার পুতুল হয়ে গেছে, বাংলার নারী তাই এত শ' বছর ধরে না কামিনী আর না স্নেহকাতরা জননী। সে নব নব সৃষ্টির উৎস নয়, সে পুরুষকে দেবত্ব দেবার তপঃরূপিনী হোম শিখা নয়, সে মানবের সত্ত্বার বৈকুণ্ঠে ও মর্ত্ত্যে সোনার সেতু নয়,—সে যৌবনের রাঙা চেলিপরা কনে বৌ, প্রৌঢ়ের ঝগড়া করবার আর সন্তান প্রসবের গৃহিনী এবং বার্দ্ধক্যের কাশী ও মালা জপার সঙ্গী। এই নারী বেদ-রচয়িত্রী ঠিক কেমনটী হয়, এই অসি হাতে দেশরক্ষায় রণচণ্ডী সাজলে কেমন করে পায়ের তলার ধরিত্রী কাঁপে, এই নারী তপস্যার দেবাসুর যুদ্ধে সাধকের শক্তি হয়ে জীব ও ভগবানের মাঝে কি করে যোগ স্থাপন করে, তখন তার সে তপস্বিনী উমার শান্ত নিমগ্ন অকাম শুদ্ধ লাবণী কেমন দেখায়, তা' এই দেশের অমৃতের অধিকারী আর্য্য পুত্রেরা ভুলে আছে।" শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ।

—ভারতী

"কিন্তু ভারতবর্ষের ওরকম করে কোন পরিবর্ত্তন আসবে বলে মনে হয় না। যতদিন জাতির প্রাণশক্তি থাকে, সে নব নব পারিপার্শ্বিক অবস্থায় নিত্য আপনাকে নূতন করে গড়েই বেঁচে থাকে। কিন্তু অনেক দিন পূর্ব্ব থেকেই ভারতের প্রাণশক্তি উড়ে গেছে। এখন তাই কেবল দুই চার শত বৎসর পর পর একটা একটা ঝাকুনি (spasm) দিয়েই আমরা ক্ষান্ত হচ্ছি। এই ঝাকুনির সরল মানে হচ্ছে বিপ্লব। যে জাত বেঁচে থাকে তার পরিবর্ত্তনটা হয় আস্তে আস্তে রোজ রোজ—কিন্তু যার মরণাপন্ন অবস্থা তার পরিবর্ত্তন হয়, একশ' দিনের কারণ এক সঙ্গে জড় হয়ে, একদিন হঠাৎ যখন ফেটে বার হয়।"

—নবসঙ্ঘ।

"ভারতের এই যুগধর্ম্মেও সেই ক্ষীণ চেতনারই লক্ষণ দেখিতেছি, তাই আজ সেই ধর্ম্মে ধর্ম্মী হইতে সেই কর্ম্মে কর্ম্মী হইতে, সেই চেতনায় চৈতন্যকে লাভ করিতে ডাক দিতে চাই। ওগো এস, ভারতের কোটী কোটি নরনারী, আজ পূর্ণ মহিমাকে বরন করিয়া লও। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্মের মহামিলনে সত্যকে সুন্দর কর, পূর্ণ কর। আজ ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের সমন্বয়ে জাতির মেরুদণ্ডের ভিত গড়িয়া তোল। আজ এস 'সংগচ্ছধ্বং'—একত্র চলিয়া সেই পুণ্যতীর্থে যাত্রা করি, সেই ধর্ম্মে ধর্ম্মী হইয়া ভারতকে তথা জগৎকে সত্য করি।"

—শঙ্খ

"নীরবে, তিল তিল করিয়া আপনার সত্তা দেশের প্রাণে সঞ্চারিত করিয়া দেশকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারে উত্তেজনায় আত্মহারা না হইয়া, বিফলতায় অবসন্ন না হইয়া আপনার স্বাধীন জীবনের আনন্দ দেশের মধ্যে মূর্ত্ত করিয়া ধরিতে পারে—দেশমাতৃকার আজ সেইরূপ সন্তানের প্রয়োজন।"　　—আত্মশক্তি

*　　*　　*

"চিকাগো চিকিৎসা সমিতিতে একটী ১৭ বছরের জন্মান্ধ ও বধির মেয়ের অদ্ভুত ক্ষমতা পরীক্ষা করা হয়েছে। মেয়েটীর নাম উইলেটা হাগিন্স (Willetta Huggins)। উইলেটা নাক দিয়ে দেখে ও হাতের আঙ্গুল দিয়ে শোনে। আঘ্রাণ দিয়ে সে যে কোন জিনিষের রঙ বলে দিতে পারে।

"সমিতিতে সমবেত ডাক্তারদের উইলেটা বলেছে যে, লালের গন্ধ উলের গন্ধের মত, নীলের গন্ধ কালীর মত, সবুজের গন্ধ কাচের মত ও কালো রঙের গন্ধ খবরের কাগজের মত।

"এই ব্যাপার প্রমাণ করবার জন্যে সে একত্রে মেশানো নানা রঙ বেরঙের সুতো আঘ্রাণ নিয়ে আলাদা বেছে দিয়েছে। একটী টাই তাকে দেবামাত্র সে তা নাকের কাছে ধরে ঠিক বলে দিলে যে, এটী লাল, নীল ও গৈরিক—তিন রঙা।

"একটী ফটোগ্রাফের ওপর নাক ঘসে উইলেটা বলে দিল, সে ছবিখানি দুইজন পুরুষ ও একজন মেয়েমানুষের।

"উইলেটা টেলিফোনের receiverএর উপর আঙ্গুল রেখে শুধু কম্পন থেকে টেলিফোনের কথা ধরে। মানুষের সঙ্গে আলাপ সে বক্তার গালে আঙ্গুল রেখে সব কথা শুনতে পায় ও উত্তর দেয়। যখন বক্তৃতা হচ্ছে তখন সে বক্তার মুখের দিকে আড় ভাবে একটা তা' কাগজ ধরে সমস্ত বক্তৃতাটী পুনরাবৃত্তি করতে পারে। তার হাতের স্পর্শ এত লঘু ও চতুর যে বড় বড় অক্ষরে ছাপা হেডিং ছুঁয়ে অক্লেশে পড়ে, ছোট অক্ষরের ছাপা কিন্তু পড়তে পারে না। সেই উপায়েই সে ছুঁয়ে বল্‌তে পারে কোন্‌টা কত টাকার নোট।

"মানুষের আত্মা সব বাঁধনের অতীত সর্ব্বশক্তিমান বস্তু; চক্ষু দিয়ে সে দেখে কাণের মধ্য দিয়ে শোনে, ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়ে তার জ্ঞানের খেলা হয়, তার অসাধ্য কাজ নেই। সেই তত্ত্বই এই বধির অন্ধ আধারে নূতন ইন্দ্রিয় গড়ে নিয়ে এই মেয়েকে শ্রুতিমতী ও চক্ষুষ্মান করেছে।"

• • •

"নিউ ইয়র্কে কার্ণেগি হলে সার আর্থার কানান্‌ডয়েল স্পিরিচুয়ালিজম্‌ বা মৃত্যুর পরে সূক্ষ্ম দেহের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছেন। তিনি প্রথমে এ বিষয়ে নাস্তিক ছিলেন, তারপর অনেক প্রমাণ পেয়ে, নিজের মৃত সন্তান ও মায়ের দেখা পেয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলে তবে আস্তিক হয়েছেন।

"তিনি বলেন মৃত্যু ভয়াবহ কিছু নয়, খুব সুখকর ব্যাপার, ঘুমের মত আরামদায়া। ভয়টা মানুষের মনের। একটী সূক্ষ্মঃ তেজঃসম্পন্ন etheric শরীর আছে, সে শরীরও এই স্থূলদেহের হুবহু নকল—প্রতি রোমকূপটী তার এরই মত। সেই তৈজস দেহ কোন ব্যথা না দিয়ে ধীরে ধীরে স্থূল কোষ থেকে নিজেকে মুক্ত করে চলে যায়। কনান্‌ ডয়েল সাহেব সভায় এক্টোপ্ল্যাজম্‌ নামক সেই অদ্ভুত পদার্থের বর্ণনা করেন, যা মিডিয়ামের শরীর থেকে বেরিয়ে বিদেহ আত্মার মূর্ত্তি গ্রহণের উপাদান হয় (materialisation of spirit)। এই শুভ্র স্থিতি

স্থাপক পদার্থটী তাঁর বিশ্বাস জড় ও ইথারের মিশ্রণজাত কিছু। তিনি স্পর্শ করে দেখেছেন, মানুষের স্পর্শে তা পোকার মত নড়ে ও সঙ্কুচিত হয়। আলোয় এ পদার্থ গ'লে অদৃশ্য হয়ে যায়।"

—বিজলী।

"সিবিল সার্বিসের ছাত্র—এই প্রথম সিবিল সার্বিস পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা হইল ভারতে। বাঙ্গালীর সুখ্যাতি ছিল, এদেশের কেন, অন্য দেশের লোকেরাও তাহাদের সঙ্গে পরীক্ষাপাশে আঁটিয়া উঠিতে পারে না; এ পরীক্ষায় ত বাঙ্গালীর দর্প চূর্ণ হইয়াছে; নামগুলি দিতেছি, সকলেই দেখিবেন তিনজন বাঙ্গালী একেবারে তলায়, আর তাহাদের দুইজন মাত্র কেবল খাঁটি বাঙ্গালা দেশের; প্রথম ও দ্বিতীয় হইয়াছেন মান্দ্রাজী ব্রাহ্মণ আর চতুর্থও সেই মান্দ্রাজী ব্রাহ্মণ। মাদ্রাজের নায়ডু মুদেলিয়ার-নায়ার প্রভৃতিরা দল পাকাইয়া বলেন যে, ব্রাহ্মণেরা সুবিধা পাইয়া সরকারী কাজে তাহাদিগকে চাপিয়া রাখিয়াছেন; কিন্তু এ প্রতিযোগীতায় তাঁহারা কোথায়? নামগুলি এই:—(১) এম্, এস্, এ, বেঙ্কট সুব্রাহ্মণ্যম্ (২) আর, এ শিবরাম কৃষ্ণ আয়ার (৩) এ, এন্, সপ্রু (যুক্ত-প্র) (৪) পি. এন্ এ, রামস্বামী আয়ার (৫) এ, ডি গরোয়ালা (বোম্বাই) (৬) পরমানন্দ (মধ্য-প্র) (৭) বি, কে, গুহ (বঙ্গ) (৮) এ, মুখোপাধ্যায় (বেহার উড়িষ্যা) (৯) এস এন্ গুহ রায় (বঙ্গ)।"

* * *

"ভারতবাসীর প্রাণের পরিচয়: আমেরিকাবাসী মার্টিনেট নিছক পায়ে চলিয়া সারা পৃথিবী ঘুরিবেন বলিয়া বিনা সম্বলে ১৯২০ সনের ১৯শে এপ্রিল তারিখে দেশ হইতে বাহির হন, এবং গত ৫ই জুলাই তারিখে কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন। শুনিতেছি, ইনি প্রতিদিন ৪০ মাইল করিয়া পথ হাঁটিয়াছেন।

"মার্টিনেটকে—বিলাতের কোন দেশে তাহার ঘর, সে ঠিক কি খেয়ালে পায়ে চলিয়া সারা পৃথিবী ঘুরিতেছে, ভারতের জন সাধারণ এ কথা জিজ্ঞাসাই করিতেছে না; ভারতবাসীরা দেখিল, যে একজন খালিপায়ে, খালি মাথায়, ছেঁড়া কাপড়ে নিঃসম্বলে এই বিপুল পৃথিবী

ঘুরিতেছে: অমনি তাহারা তাহাকে সাধু বলিয়া পূজা করিয়াছে। ইউরোপীয়েরা বিস্মিত যে এ ব্যক্তি ব্রাহ্মণ বর্ণের কেহ নয়, বরং ম্লেচ্ছ যবন দলের একজন, তবুও কেবল ভগবৎ মাহাত্ম্যে ও বৈরাগ্যের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ভারতবাসীরা তাহাকে সাধু মহাত্মা বলিয়া পূজা করিতেছে, এবং জাতিভেদে কিছু বাধিতেছে না। এখনও ভারতের খাঁটি প্রাণ ত্যাগের দৃশ্যে সাধুতার নামে মুগ্ধ, ইহাতে আমরা বড়ই আনন্দিত। ভারতকে যে গৌরবের ঠাটে চমকাইতে পারা যায় না, ক্ষমতার দাপটে ভক্ত করা যায় না—ইউরোপীয়েরা ইহার প্রমাণ পাইয়াও কথাটা ভুলিবেন না কি? হাজার হাজার দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, শূদ্র এই নিঃসম্বল যবনের পাদস্পর্শ করিতেছে, আর যাহারা ক্ষমতায় দীপ্ত ও অনুগ্রহের আধার, তাঁহাদিগকে দূর হইতেও সেলাম করিয়া বিপদ ভঞ্জন করিতে চায় না, ইহা যেন কেহ বিস্মৃত না হয়েন।" —বঙ্গবাণী।

স্বামী তুরীয়ানন্দ।

(শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।)

বালব্রহ্মচারী, যতী, নিত্য সদাচারী,
ব্রহ্মতেজে উদ্‌ভাসিত বদন-মণ্ডল।
রামকৃষ্ণ সংঘমাঝে তারকা উজ্জ্বল
তুরীয় আনন্দরূপী —গীতা মূর্ত্তিমতী
—গঠিল শরীর দিয়ে—স্বামী উক্তি হেন।
সন্ন্যাসীর বেশে ভবে যাপিলে জীবন ;
শাস্ত্রজ্ঞ—ব্রহ্মজ্ঞ—ভক্ত, তিতিক্ষা অসীম
দেখাইলে খলরোগ ধরি দেহে ছলে॥
হে দেব! কতই কথা জাগিতেছে মনে
পবিত্র-চরিত্র তব করিয়ে স্মরণ।
কোটি কোটি প্রণতি মম তোমার চরণে।
সাশ্রু-অর্ঘ্য লহ এই ভুলিও না দীনে॥

সমালোচনা ও পুস্তক পরিচয়।

ক। ভারতের মুক্তি পন্থা।—শ্রীসরোজকুমার সেন। ভারত বন্ধু এণ্ড্রুজের বিগত ৪ঠা মার্চ্চ তারিখে ষ্টার থিয়েটারে প্রদত্ত ইংরাজী বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ। মূল্য চারি আনা মাত্র।

খ। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের নিম্নলিখিত অ-সহযোগ গ্রন্থাবলী আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি,—(১) রাষ্ট্রগুরু মহাত্মা গান্ধি, (২) গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ, (৩) গান্ধি ও বিপিনচন্দ্র এবং (৪) গান্ধি ও চিত্তরঞ্জন।

উপর্য্যুক্ত পুস্তকগুলি সরস্বতী লাইব্রেরী ৯নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট্, কলিকাতায় পাওয়া যায়।

বাঙ্গলার রূপ।—শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী প্রণীত। লেখক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যখন বাংলার সাম্রাজ্য, সাহিত্য ও স্বাধীনতা ছিল, যখন "তার না ছিল কি? তার শিল্প ছিল, কৃষি ছিল, বাণিজ্য ছিল, অর্ণবপোত ছিল। তার অস্ত্র ছিল—সৈন্য ছিল—যুদ্ধ ছিল, দিগ্বিজয় ছিল। তার সিংহাসন ছিল, তপোবন ছিল, মন্দির ছিল, মঠ ছিল, নগর ছিল, গ্রাম ছিল। তার জাতি ছিল—গণ ছিল, শ্রেণী ছিল, সঙ্ঘ ছিল। তার আচার ছিল—ব্যবহার ছিল—প্রায়শ্চিত্ত ছিল তার নিশান ছিল, ডঙ্কা ছিল, হুঙ্কার ছিল"—সেই অতীতের স্বপ্ন-কাহিনীর যুগ হইতে—যাহা জগৎ কখনও ভুলিতে বা মুছিতে পারিবে না,—বর্ত্তমান আত্মবিস্মৃত দেশের,—যাহার "ঘর দীপ-শিখা নগরে নগরে" যাহার নারী বিবস্ত্রা, সন্তান বুভুক্ষিত, যাহার দেবতা আজ "বিচিত্র বসনে দেবি অন্নদান রতেহনঘে" না হইয়া দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বিপদুৎপাতরূপ "জ্বলচিতা মধ্যগতাং ঘোর দংষ্ট্রাং করালিনীং"—এক অপূর্ব্ব চিত্রাঙ্কনে সচেষ্ট হইয়াছেন।

পুরাতন বাংলার একটা স্বতন্ত্র ধারা, রূপ ও সুর ছিল, যাহা ফুটিয়া উঠিয়াছিল ব্রাহ্মণে নয় তন্ত্রে, জৈমিনীতে নয় শ্রীবুদ্ধে, মনু-যাজ্ঞবল্কে নয় জীমূতবাহন-রঘুনন্দনে, অক্ষপাদে নয় নব্যন্যায়ে, শঙ্করে নয়

শ্রীচৈতন্যে—যে অপরূপ রূপ মুছিবার জন্য "দুই শত বৎসরের ফরাসী দর্শনের আসার তর্জ্জমারগায়ে শঙ্কর ভাষ্যের দু' একটা গিল্‌টী তক্‌মা পরাইয়া, বাঙ্গালী তাঁহাকেই 'বাঙ্গালীর দর্শন' বলিয়া চালাইতে চেষ্টা করিয়াছিল," যাহার যাদুতে ভুলিয়া কিরূপে সে তাহার "বিগ্রহের শ্রীঅঙ্গে অগ্নিসংযোগ করিয়াছে, অপৌরুষেয় বেদবাণী অগ্রাহ্য করিয়াছে —শ্রীমূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া, শাস্ত্র জ্বালাইয়া, বিধবার ব্রহ্মচর্য্য ক্রমে আস্থাহীন ও অক্ষম করিয়া দিয়াছে", তাহা লেখক স্পষ্টাক্ষরে বর্ণনা করিয়াছেন।

তবে লেখকের সিদ্ধান্তে আমাদের দুই একস্থলে জিজ্ঞাসা করিবার আছে।

"দক্ষিণেশ্বরে মাতৃভাবে কালী সাধনায় সিদ্ধ পরমহংস রামকৃষ্ণ" কেবল "শাক্ত" ছিলেন একথা কি করিয়া সঙ্গত বলিয়া মনে করি? শ্রীমতী রাধারাণী এবং শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যে যে অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার ও মহাভাবের বিকাশ হইয়াছিল বৈষ্ণব মহাত্মাগণ যাহাকে শান্তাদি পঞ্চ ভাবের চরমোৎকর্ষ এবং জীবে সম্ভবপর নহে বলিয়া বর্ণনা করেন, উহা গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণে প্রকাশ হইয়াছিল কিনা জানিনা, কিন্তু পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণে যখন উহা মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন তাঁহাকে কেবল "শাক্ত" কি করিয়া বলি? লেখক ত নিজেই বলিতেছেন "পরমহংস রামকৃষ্ণ ধর্ম্মের রাজসূয়যজ্ঞে ব্রতী হইয়াছিলেন। তাঁহার নামাঙ্কিত অশ্ব, নদী, পর্ব্বত, সমুদ্র অতিক্রম করিয়া ছুটিয়াছিল; আটলান্টিকের 'উভতীর' দিগ্বিজয়ের জয়নির্ঘোষে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল।" প্রতি ধর্ম্মমতের উপর আধিপত্য না থাকিলে ধর্ম্মের রাজসূয় যজ্ঞকারীর যজ্ঞ কি সুসম্পন্ন হইতে পারে?

সংবাদ ও মন্তব্য।

১। রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড়ের দাতব্য ঔষধালয়ের ১৯২১ সালের বিবরণ বাহির হইয়াছে। ১৯১৩ সালে এখানে প্রায় ১,০০০ রোগীর সেবা করা হয়, আর ১৯২১ সালে উহা বর্দ্ধিত হইয়া ১১,৯৪২ হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৪০১৪ জন রোগী নূতন। হাওড়া, ঘুস্থরী, বেলুড়, বারাকপুর, বালি, ও উত্তরপাড়া হইতে সকল বর্ণ ও ধর্ম্মের দুস্থ লোকেরা ঔষধ ও পথ্যের নিমিত্ত এখানে আসে। এই মহৎ কার্য্যে সকলের সাহায্য প্রার্থনীয়।

মিশনের কর্ত্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত বদান্য ভদ্র মহোদয়গণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন,—(১) বালি মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তৃপক্ষগণ; ইঁহারা বাৎসরিক ১২০ টাকা করিয়া দিয়া আসিতেছেন, (২) বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফারমাসিউটিকাল ওয়ার্কসের কর্ত্তৃপক্ষগণ; ইঁহারা বহু ঔষধের দ্বারা সাহায্য করিয়া থাকেন। মেসার্স বি, কে, পাল এণ্ড কোং; (দাতব্য) ঔষধলয়ের ¾ অংশ ঔষধ ও পথ্য ইঁহারাই যোগাইয়া থাকেন।

কোন রোগীর কঠিন পীড়ার সময় নিম্ন লিখিত কলিকাতার সদাশয় চিকিৎসকেরা সাহায্য করিয়াছেন,—(১) ডাঃ বিপিনবিহারী ঘোষ, এম-বি (২) ডাঃ জে, এন, কাঞ্জিলাল, এম-বি, ডাঃ দুর্গাপদ ঘোষ, এম্-বি, ডাঃ শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়, এম-বি, এবং বালি ও বেলুড় নিবাসী ডাঃ ক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-বি, এবং ডাঃ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়— ইঁহাদের নিকটও মিশন কর্ত্তৃপক্ষগণ বিশেষ ভাবে ঋণী।

২। বিগত ১৪ই এপ্রিল বালিগঞ্জ ইউনাইটেড ক্লাবে শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সভানেতৃত্বে, স্বামী বাসুদেবানন্দ "বেদান্তের সার্ব্বজনিনত্ব" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

৩। বিগত ৩০শে এপ্রিল, সাঁতরাগাছি গ্রামে, রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের

বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে শ্রীমৎ স্বামী শুদ্ধানন্দজির সভাপতিত্বে এক ধর্ম্মাধিবেশন হয়। কলিকাতাস্থ বহু গণ্যমান্য পণ্ডিতমণ্ডলীর শুভাগমন হয়। স্বামী বাসুদেবানন্দ "সেবা-ধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা করার পর অপরাপর বিদ্বজ্জনও ঐ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন।

৪। বিগত ২৮শে মে ঢাকা জেলার অন্তঃপাতী বেলিয়াটী গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব উপলক্ষে স্বামী নির্গুণানন্দ ও কমলেশ্বরানন্দ গমন করেন। দরিদ্র-নারায়ণ সেবা, সেবাশ্রমের সাম্বৎসরিক সভার অধিবেশন ও রামকৃষ্ণ শিক্ষা মন্দিরের ছাত্রগণকে পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য তাঁহাদিগকর্তৃক সম্পাদিত যয়।

৫। নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী, বন্দবিল দরিদ্র-নারায়ণ সেবা সমিতির প্রথম বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে ব্রহ্মচারী অভয় চৈতন্য সেখানে গিয়া সেবাধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ করেন।

৬। বিগত ১০ই জুন, শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজির সভানেতৃত্বে, বাটরা ধর্ম্মসভা কর্তৃক এক মেলনী আহুত হয়। স্বামী বাসুদেবানন্দ "ব্রহ্মচর্য্য" সম্বন্ধে আলোচনা করার পর, জনৈক ব্রাহ্ম ভক্ত ঐ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। পরে মহাবীরের পূজা, রামনাম ও কালীকীর্ত্তন হইয়া সভা ভঙ্গ হয়।

৭। হাওড়া জেলার অন্তঃপাতী আন্দুল-মৌরি গ্রামে অনাথ বান্ধব সমিতির ১৪শ বার্ষিক অধিবেশনে, অনারেব্‌ল মহারাজা স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, কে, সি, আই, ই, মহাশয়ের সভানেতৃত্বে, স্বামী বাসুদেবানন্দ "বেদান্তের সামাজিক ও নৈতিক ভিত্তি" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।
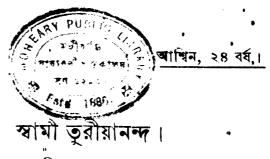
স্বামী তুরীয়ানন্দ।

(শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ।)

হে ঋত্বিক! হে মহান্! হে আচার্য্য গরীয়ান!

বেদান্তের অতুল সম্রাট!

তুলেছিলে নিতি নিতি, অনন্ত-প্রণব-গীতি,

হে জ্ঞানী! শাশ্বত! বিরাট!

মনে পড়ে সে মূরতি সৌম্য কম স্নিগ্ধ অতি,

মনে পড়ে সে চারু বয়ান;—

মর্ম্ম মাঝে উজ্জলিত,—প্রেম-দ্যুতি বিকসিত

সেই স্নিগ্ধ-বিজলী-নয়ান;

শ্রীরামকৃষ্ণের যুগে, বিশ্ব-জাগরণ-দিনে,

ভারতের উদ্বোধন-প্রাতে;

এসেছিলে সে সময়ে, সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয়ে

প্রেমের পশরা ল'য়ে হাতে।

ধর্ম্মে তুমি অনুপম, কর্ম্মে ঝঞ্ঝাবাত সম,

কর্ত্তব্যে ওহে বিন্ধ্যাচল

প্রেমধারা বরষিয়া, তৃষিত বিশ্বের হিয়া,

করে' গেলে তুষার শীতল;

সুদূর সাগর পারে, কালিফোর্ণিয়ার দ্বারে,

শান্তি বাণী করিলে প্রচার;

তৃষিত এমেরিকানে, বিলাইলে জনে জনে,

অমৃতের শুভ সমাচার।

কত বর্ষ বর্ষ ধরি, কঠোর তপস্যা করি,
হিমাদ্রির বিজন গুহায় ;
পলকে লভিলে তাঁরে, তুঙ্গ গিরি-শৃঙ্গ যাঁরে
ভক্তিভরে মস্তক নোয়ায়।
প্রত্যুষে, গঙ্গার বুকে, দাঁড়া'য়ে কুম্ভীর মুখে,
বেদান্তের করেছ বিচার
"ইন্দ্রিয় ত আমি নই, মন নই, দেহ নই,
কুম্ভীর কি করিবে আমার" !
হে কর্ম্ম কঠোর পন্থি ! শ্বেত-ধর্ম্ম-বৈজয়ন্তী
উড়াইলে ভারতের শিরে ;
গীতার গোপন বাণী শিষ্যের শ্রবণে দানি,
অনন্তেতে মিশে গেলে ধীরে।
তৃষ্ণার্ত্ত ভারত তরে, ধর্ম্ম-বীণা-তন্ত্রী-পরে
যে সঙ্গীত তুলে গেলে আজ ;
তাহার ঝঙ্কার-গীতি শত বর্ষ নিতি নিতি,
সমীরণে করিবে বিরাজ।
হে যোগী ! হে মহাঋষি ! হে তপস্বী ! হে সন্ন্যাসি !
হে ধ্যান-বিভোর নিরুপম !
সত্যের মোহন স্পর্শ, ত্যাগের মহানাদর্শ,
দেখাইলে ইন্দ্রজাল সম।
"কাম-কাঞ্চনের মায়া, কিছু নয় শুধু ছায়া"
জনে জনে প্রচারিলে তুমি
তোমায় চিনিল যারা, কৃতার্থ হইল তারা,
পবিত্র চরণ রেণু চুমি।
যে কর্ম্ম লইয়া করে, এসেছিলে ধরা'পরে
সে কর্ম্মের হোল আজি শেষ—
কর্ম্ম-জয়-টীকা ভালে, তাই আজি চলে গেলে,
শান্তিময় চিরানন্দ দেশ।

হে দেবতা মনে মনে, বসি' স্বর্গ-সিংহাসনে,

শক্তি ধারা কর গো প্রেরণ—

মোরা যেন অকাতরে, বিশ্ব-কল্যাণের তরে,

হেসে' বরি— অমর মরণ।

মোরা যেন জনে জনে, অভ্রান্ত নির্ভীক মনে,

করি বিশ্ব জগতের কাজ

কর আজি আশীর্ব্বাদ, টুটে যেন অবসাদ,

হে তুরীয়ানন্দ মহারাজ!

হে দেবতা! হে সন্ন্যাসি! জ্যোতির্ম্ময়-পুরবাসি!

আজি তোমা করি হে বন্দন

ত্রিদিব-আসনে বসি', ভক্তের হৃদয়ে পশি'

ভক্তি-অর্ঘ্য কর হে গ্রহণ।

যৌবন।

শ্রীনিরঞ্জন সেনগুপ্ত।

ঘুম-ঘোরে হেরিনু স্বপনে—

কুসুমিত উপবনে,

খেলিছে চাঁদের ছটা,

গায় পিক, বয়ে যায় মলয় পবন!

সহসা মেলিনু আঁখি

চেয়ে দেখি সব ফাঁকি

নিরাশ আঁধার মোরে করিছে পীড়ন

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র।

শ্রীহরি শরণম্।

৺কাশী

৫।৭।২০

শ্রীমান—,

গত কল্য তোমার ২রা জুলাইএর একখানি পত্র পাইয়াছি। তুমি......উত্তমরূপে পাশ করিয়া......পড়িবার চেষ্টা করিতেছ ও শারীরিক ভাল আছ জানিয়া প্রীত হইলাম। কলিকাতায় আসিয়াও শ্রীশ্রীমার দর্শন পাও নাই ইহা অতীব কষ্টের কথা সন্দেহ নাই কিন্তু উপায়ও ছিল না। শ্রীশ্রীমার শরীর এখনও স্বচ্ছন্দ হয় নাই বরং দিন দিন খারাপ হইয়াই পড়িতেছে। প্রভু যে কি করিবেন তিনিই জানেন। ভাবিতে আমাদের হৃদয় ব্যথিত ও শঙ্কিত হয়। যদি তাঁহার শরীর রক্ষা হয় আবার আসিয়া দর্শন করিতে পারিবে। মহারাজেরও দর্শন যখন ইচ্ছা হইতে পারিবে। * * *। * প্রভুর কৃপায় তাঁহার অনুগত থাকিয়া তাঁহাকেই আপনার করিতে চেষ্টা করিবে, অধিক আর কি বলিব। আমার শরীর বেশ ভাল নাই। বহুমূত্র ও তাহার আনুসঙ্গিক অনেক পীড়ায় বহুকাল ধরিয়া কষ্ট পাইতেছি। প্রভুর ইচ্ছা যেমত হয় তাহাই মঙ্গল জানিয়া সকল সহ্য করিতে পারিলে আপনাকে ধন্যজ্ঞান করিব। অন্যান্য সকলে এখানকার ভাল আছে। তুমি আমার শুভেচ্ছাদি জানিবে। ইতি

শুভানুধ্যায়ী

।

শ্রীশ্রীদুর্গাসহায়।

৺কাশীধাম
৯।৭।১৯১১

শ্রীমান্—,

তোমার ২৭শে আষাঢ়ের পত্র ২।৪ দিন পূর্ব্বে পাইয়াছি। বেলুড় মঠ হইতে এখানে পুনঃ প্রেরিত হইয়াছিল।

তোমার "মানুষ" হইবার ইচ্ছা আছে জানিয়া বড়ই সুখী হইলাম। সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি যেন মানুষ হইতে পার। তুমি কি মার নিকট দীক্ষা পাইয়াছ? * * *। ভিতরে আকাঙ্ক্ষা থাকিলে একদিন না একদিন তাহা পূর্ণ হইবেই। সৎকার্য্যে বিঘ্ন অনেক, কিন্তু তাই বলিয়া ছাড়িয়া দিবে না, যত বিঘ্ন যত্নও তত অধিক হওয়া উচিত। ব্যাকুলতা বাড়াই ত ভাল, কিন্তু সেটা আন্তরিক হওয়া আবশ্যক। পূজার সময় যদি মাকে দর্শন করিতে পার চেষ্টা করিবে। বাহিরের সঙ্গ না থাকিলে ভিতরের সঙ্গে মন বিশেষ করিয়া লাগাইবে। ভিতরের সঙ্গীকে আপনার করিতে পারিলে বাহিরের সঙ্গী তত প্রয়োজন হইবে না। ভিতরে যিনি আছেন তিনি সৎচিৎ আনন্দময়; তাঁহাকে চিন্তা করিলে জড় হইতে হইবে না। সর্ব্বতোভাবে সেই প্রেমময় ভগবানের শরণাগত হও, তিনিই সকল বুঝাইয়া দিবেন। তিনি অন্তর্য্যামী, অন্তরের ভাব বুঝিয়া সকল ব্যবস্থা করেন। আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবে। ইতি

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীতুরীয়ানন্দ।

পুনশ্চ

* * *

পিতা মাতাকে সুখী করা সন্তানের অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহাদের আজ্ঞা শিরোধার্য্য। ইতি

শ্রীতুরীয়ানন্দ।

শ্রীহরিঃ

শরণম্

৺কাশী

২৭।৭।২০

শ্রীমান্—,

তোমার বৃহস্পতিবারের পত্র পাইয়াছি। তুমি ভাল আছ জানিয়া সুখী হইলাম। শ্রীশ্রীমা আর ইহজগতে নাই। গত মঙ্গলবার রাত্রি ১॥০টার সময় তিনি মানবলীলা সম্বরণ করিয়া মহাসমাধি লাভ করিয়াছেন। যদিও তিনি ইহজগত হইতে অপসৃত হইয়াছেন তথাপি ভক্তহৃদয়ে তাঁহার চিরদিন আসন বিরাজমান থাকিবে। যে কথা বুঝিতে পার নাই লিখিয়াছ, তাহা কোথাকার কথা ? অর্থাৎ কোথা হইতে দেখিয়াছ অথবা শুনিয়াছ ? ইহারা দৃষ্টান্তস্বরূপ উক্ত হইয়াছে মাত্র। অবশ্য মন ও আত্মা এক জিনিষ নয়, ইহা সত্য কথা। কিন্তু মন শুদ্ধ হইলেই তাহাতে আত্মার বিকাশ হয় এবং তখনই মনের মনত্ব দূর হইয়া যায়। বিরাট মনUniversal mind যতক্ষণ Universe থাকে ততদিন পর্য্যন্ত উহার অস্তিত্ব। Universe অনন্ত নয় সুতরাং সেই হিসাবে Universal mind ও অনন্ত হইতে পারে না। এক পরমাত্মাই অনাদি অনন্ত। আর কিছুই অনন্ত নহে, বেশ চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে। আমার শরীর একরূপ চলিতেছে ; বেশ ভাল নয়। কৌপিন পরিতে আপত্তি কেন থাকিবে বুঝিতে পারি না। তবে সকল জিনিষের পবিত্রতা রক্ষা করা উচিত। কৌপিন পরার উদ্দেশ্য জিতেন্দ্রিয়ত্ব লাভ করিবার জন্য। কৌপিন পরার পর আর কাম সেবার নিমিত্ত তাহাকে খুলিতে নাই। খুলিলে উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যায়। আপনার মনে বেশ বিচার করিয়া এ সম্বন্ধে যেরূপ ভাল বুঝিবে করিতে পার। অধিক আর কি লিখিব। তুমি আমার শুভেচ্ছাদি জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীতুরীয়ানন্দ।

কথা প্রসঙ্গে।

ব্যক্তিতে যেমন সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদ দৃষ্ট হয়, সমষ্টিতেও সেইরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ-যুগ-পূর্ব্ব-কে এইরূপে আমরা মানব জাতির তামসিক যুগ বলিতে পারি। বর্ত্তমান তামসিক যুগে মানবের বুদ্ধিবৃত্তি যেমন কলুষিতা হইয়া জড়বাদ, দেহাত্মবাদ ও নিরীশ্বরবাদ অবলম্বনে অশেষ দুঃখের কারণীভূতা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ-পূর্ব্ব-যুগেও মানবজাতির সেই একই আপাত-মনোরমা প্রকৃতির উদ্ভব হইয়াছিল—ইহাই এ স্থলে আলোচ্য।

* * *

শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—

মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥ গীতা ॥৯।১২॥

"(যাহারা) মোহকারিণী রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃতিকেই আশ্রয় করে, তাহাদের আশা নিষ্ফল হয়, তাহাদের কার্য্য সফল হয় না, তাহাদের জ্ঞানও নিষ্প্রয়োজন হয় এবং তাহারা বিকৃতচিত্ত হইয়া থাকে।" তৎকালে নিশ্চয়ই এইরূপ একদল রাক্ষসী বা আসুরী প্রকৃতির লোক ছিল যাহাদের লক্ষ্য করিয়াই শ্রীভগবান এই কথা বলিতেছেন। এক্ষণে "রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃতি"র অর্থ কি? আচার্য্য শঙ্কর বলিতেছেন, "কিঞ্চ তে ভবন্তি রাক্ষসীং রাক্ষসামেব প্রকৃতিং স্বভাবম্ আসুরীম্ আসুরাণাঞ্চ প্রকৃতিং মোহিনীং মোহকরীং দেহাত্মবাদিনীং শ্রিতা আশ্রিতাশ্চিন্দি ভিন্ধি পিব খাদ পরস্বমপহর ইত্যেবং বদনশীলাঃ ক্রূরকর্ম্মাণো ভবন্তীত্যর্থঃ"। "এই রাক্ষস ও আসুর প্রকৃতি "মোহিনী" মোহকরী—অর্থাৎ ইহা দেহেতে আত্মবুদ্ধি করিয়া দেয়, এই প্রকার স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা "ছিন্ন কর, ভিন্ন কর, পান কর, ভোজন কর, পরের ধন অপহরণ কর, এই প্রকার বলিতে আরম্ভ করিয়া জগতে সকল প্রকার ক্রূর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে—ইহাই অর্থ।" পাঠক এই দীর্ঘ দ্বাদশ শত

বর্ষ পূর্ব্বের ব্যাখ্যাত মানব চরিত্রের সহিত বর্ত্তমান মানব চরিত্রের তুলনা করুন—ঠিক মিলিয়া যাইবে।

শ্রীভগবান্, "তাহাদের জ্ঞানও নিষ্প্রয়োজন হয়" এ কথা বলিলেন কেন? বাস্তবিকই, ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র, দেহাত্মবাদী, নাস্তিক যাহারা তাহাদের সকল কর্ম্মই বিফল তাহার উদাহরণ আমরা বর্ত্তমান তামসিক যুগ হইতেই প্রাপ্ত হইতেছি। "আধানিক" ভোগ ও নিরীশ্বরবাদের উপর যে সভ্যতার প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা আজ ভূমিস্যাৎ এবং জ্ঞান, বিজ্ঞান, কলা, কৌশল মনুষ্যজাতির কিঞ্চিৎ ভোগবিধান করিয়া অধিকাংশই ধ্বংসের নিমিত্ত প্রযুক্ত হইয়াছে।

ইহারা বলিয়া থাকে,—

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্॥ গীতা॥ ১৬।৮॥

"(আসুর প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ) বলিয়া থাকে যে, এই জগতে সকলই অসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত—ধর্ম্মাধর্ম্মকৃত কর্ম্মফল বলিয়া কিছুই নাই। জগতের বিধাতা কোন ঈশ্বরও নাই। স্ত্রী-পুরুষগণ পরস্পর কামবশে মিলিত হইয়াই এই জগৎকে উৎপাদিত করিয়াছে। কাম ছাড়া জগতের আর কি কারণ হইতে পারে? শ্রীভগবান্ আরও বলিতেছেন, "উগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায়"—"এই উগ্রকর্ম্মারা জগতের ক্ষয়ের নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করে। "কামোপভোগ পরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ"— "কামোপভোগই পরমপুরুষার্থ, ইহাই তাহারা নিশ্চয় করিয়াছে।"

* * *

*"ন চ ধর্ম্মাধর্ম্মসব্যপেক্ষকেঽস্য শাসিতা ঈশ্বরো বিদ্যতে ইত্যতোঽনীশ্বরং জগদাহুঃ। কিঞ্চ অপরস্পরসম্ভূতং কামপ্রযুক্তয়োঃ স্ত্রীপুরুষয়োরন্যোন্যসংযোগাৎ জগৎ সর্ব্বং সম্ভূতম্।... ... কাম এব প্রাণিনাং কারণম্ ইতি লোকায়তিকদৃষ্টিরিয়ম্," —আচার্য্য শঙ্কর ইঁহাদিগকে লোকায়তিক আখ্যা দিয়াছেন। বর্ত্তমান Lamark, Darwin Wallace প্রভৃতি দার্শনিকেরা এই প্রাচীন লোকায়তিকদের নবীন সংস্করণ। The Law of Natural Selection. Process of Artificial

Selection, Variation of Species; Struggle for existence, Survival of the fittest, The process of Sexual selection, or The struggle between the individuals of one sex, generally the males, for the possession of the other sex প্রভৃতি। মর্ত্তবাদ অলৌকিক শাস্ত্র দৃষ্টিকে অগ্রাহ্য করিয়া সাধারণ দৃষ্টির উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই হেতু অস্মদ্দেশীয় আস্তিক-দার্শনিকেরা ইঁহাদিগকে "লোকায়ত" আখ্যা দিয়াছেন। "লোকগাথামনুরুন্ধানা নীতি কামশাস্ত্রানুসারেণার্থকামাবেব পুরুষার্থৌ মন্যমানাঃ পারলৌকিকমর্থমপহ্নুবানাশ্চার্ব্বাকমতমনুবর্ত্তমানা এবানুভূয়ন্তে। অতএব তস্য চার্ব্বাকমতস্য লোকায়তমিত্যন্বর্থমপরং নামধেয়ম্"॥ যাঁহারা সাধারণ লোকের কথার বশবর্ত্তী হইয়া অর্থনীতি ও কামশাস্ত্রানুসারে কাম ও অর্থকেই পুরুষার্থ বলিয়া স্বীকার করেন, পারলৌকিক অর্থ স্বীকার করেন না। সেই সকল চার্ব্বাক মতানুবর্ত্তীরাই এইরূপ অনুভব করিয়া থাকেন। এই নিমিত্তই চার্ব্বাকমতের "লোকায়ত" এই অপর নামটী সার্থক হইতেছে।" এই মত "দুরুচ্ছেদং"।—কেন ? "প্রায়েণ সর্ব্বপ্রাণিনস্তাবৎ"। জগতে যিনি যতই জ্ঞানের গরীমা করুন কিন্তু কার্য্যতঃ অধিকাংশ জীবই ইহার অনুসরণ করেন। "দেহাতিরিক্ত আত্মনি প্রমাণাভাবাৎ। কিণ্বাদিভ্যো মদশক্তিবৎ চৈতন্যমুপজায়তে"। "দেহের অতিরিক্ত আত্মা নাই। তণ্ডুল কণা হইতে যেমন মদ-শক্তি জন্মে সেইরূপ ভূতচতুষ্টয় সম্ভূত দেহ হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি"। আকাশ ও দেহাতিরিক্ত আত্মা ইঁহারা মানেন না—"প্রত্যক্ষৈকপ্রমাণবাদিতয়া"। ইঁহাদের মতে পুরুষার্থ—অঙ্গনালিঙ্গনাদি জন্য সুখ, নরক—কণ্টকাদি জন্য দুঃখ, পরমেশ্বর—লোক সিদ্ধ রাজা, মোক্ষ—দেহনাশ। অতএব "যাবজ্জীবং সুখং জীবেৎ"—Eat, drink and be merry, স্বর্গ, অপবর্গো, আত্মা বা পরলোক বলিয়া কিছুই নাই। (সর্ব্বদর্শন সংগ্রহঃ)

* * *

আত্মা ও পুনর্জ্জন্ম অস্বীকার করিয়া কোম্‌তে (Comte) নীচে (Nietzsche) প্রমুখ প্রতীচ্য মনীষিমণ্ডলীরা জড় বিজ্ঞানের ভিত্তির

উপর সমাজ প্রতিষ্ঠা ও মনুষ্যত্ব-ধর্ম্ম (Religion of Humanity—Comte.) বা অতি-মানবের (Idea of Supper man—Nietzsche.) আদর্শ বিস্তারের প্রচেষ্টা তত্তৎ দেশে বৃথা হইয়াছে; কারণ পূর্ব্ব ও পর জন্ম, কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধযুক্ত জীবাত্মার অস্তিত্ব অগ্রাহ্য করিয়া সমাজে প্রীতি, শৃঙ্খলা ও উন্নতি অসম্ভব। 'আমার' 'আমিত্ব' ক্ষণিক বুদ্‌বুদের ন্যায় এই সংসার সমুদ্রে উত্থিত হইয়া লীন হইয়া যায়—এই ধারণা মানব চিন্তার ভিত্তি হইলে, সে কখনই আপাত মনোরম ভোগ ও স্বার্থ ত্যাগ করিয়া কোম্‌তের, "Our principle is love; our foundation, order; our aim, progress." এই বাণী, ব্যক্তিগত জীবনে স্বার্থক করিবার জন্য গ্রহণ করিবে না।

* * *

ডারউইনের Survival of the fittest বা 'জোর যার মুল্লুক তার' এই পশু-জনোচিত নীতির প্রতিধ্বনি করিয়া নীচে বলিতেছেন এই মানব সমাজ দুই ভাগে বিভক্ত—সবল ও দুর্ব্বল, প্রভু ও ভৃত্য, সাধারণ ও অভিজাত। এই দুই সম্প্রদায়ের নীতিও বিভিন্ন এবং প্রত্যেকেই নিজের নীতি অপরের ঘাড়ে চাপাইবার চেষ্টায়, প্রতিপক্ষের গুণ নিজেদের প্রতিকূল বলিয়া, দোষাবহ নির্ণয় করিতেছে। যাহারা দুর্ব্বল তাহারা শান্ত-শিষ্ট-স্বভাব, দয়া, দারিদ্র্য এবং ত্যাগানুশীলনের সমর্থক। খৃষ্ট-ধর্ম্মের অভ্যুত্থান দাস জাতির মধ্য হইতে; সেই হেতু ইহার নৈতিক ভিত্তিও দাসোচিত। প্রবল ইচ্ছা হইতে শক্তি এবং শক্তিমান পুরুষদেরনীতিই শ্রেষ্ঠ নীতি।—এক্ষণে যথার্থ শক্তির স্ফুরণ ত্যাগে, না পশুবলে?

* * *

পতঞ্জলি তাঁহার দর্শনে দুইটী সূত্রে জীবজগতের ক্রমোবিকাশ ও সঙ্কোচের কারণ নির্দ্দেশ করিতেছেন,—

জাত্যন্তর পরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ॥ ৪।২॥

নিমিত্তমপ্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ॥ ৪।৩॥

"প্রকৃতির আপূরণের দ্বারা একজাতি আর এক জাতিতে পরিণত হইয়া যায়। সৎকর্ম্মাদি নিমিত্ত প্রকৃতির পরিণামের কারণ নহে, কিন্তু উহারা প্রকৃতির পরিণামের বাধা-ভগ্ন-কারী-মাত্র, যেমন কৃষক জল আসিবার প্রতিবন্ধক-স্বরূপ আইল ভঙ্গ করিয়া দিলে জল আপনার স্বভাবেই চলিয়া যায়।" আচার্য্য বিবেকানন্দ ইহার ব্যাখ্যায় বলিতেছেন, "যখন কোন কৃষক ক্ষেত্রে জল-সিঞ্চন করিবার ইচ্ছা করে, তখন তাহার আর অন্য কোন স্থান হইতে জল আনিবার আবশ্যক হয় না, ক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী জলাশয়ে জল সঞ্চিত রহিয়াছে, কেবল মধ্যে কবাটের দ্বারা ঐ জল ক্ষেত্রে আসিতে দিতেছে না। কৃষক সেই কবাট খুলিয়া দেয় মাত্র, দিবামাত্রই জল আপনা আপনি মাধ্যাকর্ষণ নিয়মানুসারে তাহার ভিতর চলিয়া যায়। এইরূপ সকল ব্যক্তিতেই সর্ব্ব-প্রকার উন্নতি ও শক্তি রহিয়াছে। পূর্ণতা প্রত্যেক মনুষ্যের স্বভাব, কেবল উহার দ্বার রুদ্ধ আছে, উহা উহার প্রকৃত পথ পাইতেছে না। যদি কেহ ঐ প্রতিবন্ধক অপসারিত করিয়া দিতে পারে, তবে তাহার সেই স্বভাব-গত পূর্ণতা নিজ মহিমায় প্রকাশিত হইয়া পড়ে। মানুষ তাহার ভিতর পূর্ব্ব হইতে অবস্থিত যে শক্তি, তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই প্রতিবন্ধক অপসারিত হইলে ও প্রকৃতি আপনার অপ্রতিহত গতি পাইলে, আমরা যাহাদিগকে পাপী বলি, তাহারা সাধুরূপে পরিণত হয়। স্বভাবই আমাদিগকে পূর্ণতার দিকে লইয়া যাইতেছেন, কালে তিনি সকলকেই তথায় লইয়া যাইবেন। ধর্ম্মের জন্য যাহা কিছু সাধন ও চেষ্টা, তাহা কেবল নিষেধমুখ কার্য্যমাত্র; কেবল প্রতিবন্ধক অপসারিত করিয়া লওয়া, আমাদের স্বভাব সিদ্ধ জন্ম হইতে প্রাপ্ত অধিকার-স্বরূপ পূর্ণতার দ্বার খুলিয়া দেওয়া। আজকাল প্রাচীন যোগীদিগের পরিণাম-বাদ বর্ত্তমানকালের জ্ঞানের আলোকে অপেক্ষাকৃত উত্তমরূপে বুঝিতে পারা যাইবে। কিন্তু যোগীদিগের ব্যাখ্যা আধুনিক ব্যাখ্যা হইতে শ্রেষ্ঠতর। আধুনিকেরা বলেন, পরিণামের দুইটী কারণ, যৌন নির্ব্বাচন (Sexual Selection) ও যোগ্যতমের উজ্জীবন (Survival of the

fittest)। কিন্তু এই দুইটী কারণকে সম্পূর্ণ পর্য্যাপ্ত বলিয়া বোধ হয় না। মনে কর, মানবীয় জ্ঞান এতদূর উন্নত হইল যে শরীর ধারণ ও পতি বা পত্নী লাভ করিবার বিষয়ে প্রতিযোগীতা উঠিয়া গেল। তাহা হইলে অধুনিকদিগের মতে মানবীয় উন্নতি-প্রবাহ রুদ্ধ হইবে ও জাতির মৃত্যু হইবে। আর এই মতের এই ফল দাঁড়ায় যে, প্রত্যেক অত্যাচারী ব্যক্তি আপনার বিবেকের ভৎর্সনা হইতে অব্যাহতি পাইবার যুক্তি প্রাপ্ত হয়। আর এমন লোকেরও অভাব নাই, যাঁহারা দার্শনিক নাম ধারণ করিয়া, যত দুষ্ট ও অনুপযুক্ত লোকদিগকে মারিয়া ফেলিয়া (অবশ্য ইঁহারাই উপযুক্ত অনুপযুক্ত বিচার করিবার একমাত্র বিচারক) মনুষ্যজাতিকে রক্ষা করিতে চান। কিন্তু প্রাচীন পরিণামবাদী মহাপুরুষ পতঞ্জলি বলেন যে পরিণামের প্রকৃত রহস্য—প্রত্যেক ব্যক্তিতে পূর্ণতার যে প্রাগ্‌ভাব রহিয়াছে, তাহারই আবির্ভাব মাত্র। তিনি বলেন, এই পূর্ণতা নিজ প্রকাশের প্রতিবন্ধকতা প্রাপ্ত হইয়াছে। ঐ পূর্ণতারূপ আমাদের অন্তরালস্থ, অনন্ত তরঙ্গরাশি আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। আমরা এই যে নানা প্রকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রতিযোগিতা ইত্যাদি করিতেছি, উহা কেবল আমাদের অজ্ঞানের ফলমাত্র। আমরা এই দ্বার কি করিয়া খুলিয়া দিতে হয় ও জলকে কি করিয়া ভিতরে আনিতে হয়, তাহা জানি না বলিয়াই এইরূপ হইয়া থাকে। আমাদের পশ্চাতে যে অনন্ত তরঙ্গরাশি রহিয়াছে, তাহা আপনাকে প্রকাশ করিবেই করিবে; ইহাই সমুদয় অভিব্যক্তির কারণ, কেবল জীবন ধারণ অথবা ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার চেষ্টা এই অভিব্যক্তির কারণ নহে। উহারা বাস্তবিক ক্ষণিক অনাবশ্যক, বাহ্যব্যাপার মাত্র। উহারা অজ্ঞান-জাত। সমুদয় প্রতিযোগিতা বন্ধ হইয়া যাইলেও যতদিন পর্য্যন্ত না প্রত্যেক ব্যক্তি পূর্ণ হইতেছে, ততদিন আমাদের অন্তরালস্থ এই পূর্ণ স্বভাব আমাদিগকে ক্রমশঃ অগ্রসর করাইয়া উন্নতির দিকে লইয়া যাইবে। এই জন্যই প্রতিযোগিতা যে উন্নতির জন্য আবশ্যক, ইহা বিশ্বাস করিবার কোন যুক্তি নাই। পশুর ভিতর মানুষ গূঢ়ভাবে রহিয়াছে, যেমন দ্বার খোলা

হয়, অর্থাৎ প্রতিবন্ধক অপসারিত হয়, অমনি মানুষ প্রকাশ পাইল। এইরূপ মানুষের ভিতরও দেবতা গূঢ়-ভাবে রহিয়াছেন, কেবল অজ্ঞানের [illegible]কে প্রকাশ হইতে দিতেছে না। যখন জ্ঞান এই
লে, তখনই সেই দেবতা প্রকাশ পান।"

গুরু-শিষ্য।

(শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন, বি,-এ)

শিষ্যেরে লইয়া সঙ্গে রাজপুরে মনোরঙ্গে
গুরু মান-নাথ
উপনীত বেলাশেষে যবে রবি ভিন্ন দেশে,
প্রচারে প্রভাত।
দেখি' রাজা সাধুজন সভয়ে প্রণত হন,
করি সমাদর,
দিল দোঁহে বাসস্থান, ভোজন সামগ্রী দান
শয্যা শুভ্রতর।
প্রভাতে উঠিয়া যবে বলে গুরু, "যাই এবে"
জুড়ি' দুই কর,
বলে রাজা, "বহু আশ শুনিব তোমার পাশ,
ধর্ম্ম দুঃখ-হর।
কি করিলে যায় তাপ, শরীরে স্পর্শে না পাপ
কিসে দুঃখ নাশ,
কিসে ব্রহ্ম প্রাপ্তি ঘটে, শুনিব গো অকপটে
কিসে স্বর্গ বাস।
কৃপাকরি' দয়াময় বল কিসে মুক্তি হয়,
মায়ার বিনাশ;

এই পুরী হবে ধন্য ত্রিভুবনে অগ্রগণ্য
কর যদি বাস।"
শিষ্য শ্রীগোরথনাথ বলে, "প্রভু চলসাথ
করিও না বাস,
বিষয়ী-সংসর্গ হলে' ধর্ম্ম-পুণ্য যা'বে জ্বলে,'
হবে সর্ব্বনাশ।"
গুরু বলে, "কিবা ভয়? —বিষয়ীর বিষচয়
সাধু না পরশে;
ধর্ম্ম-কথা-রস-রঙ্গে যাপিব রাজার সঙ্গে
মনের হরষে।"
"তবে প্রভু" শিষ্য বলে, "আমি তীর্থে যাই চলে"
দাও অনুমতি;
অনন্ত অনন্ত কাল তবপদে সুধসাল
রহুক ভকতি।"
তীর্থে চলি' গেল শিষ্য কপর্দ্দকহীন নিঃস্ব
ভকত উদার।
হেথা বিষয়ীর সনে স্পর্শিল সাধুর মনে
বিষয়-বিকার!
অপূর্ব্ব মায়ার খেলা! —কে বুঝিবে ভব-মেলা?
—সাধু-বাঁধা পড়ে
মোহের কুহক ঘোরে যেমন রজনী-ভোরে
সিংহ ফাঁদে পড়ে!
উদিল সাধুর মনে ভোগ-লিপ্সা সঙ্গোপনে
ধীরে ধীরে বাড়ে;
হল ক্রমে পল্লবিত ফলেফুলে সুশোভিত
বৰ্দ্ধিত আকারে।
অপূর্ব্ব রূপের ফাঁদে উদাস সাধুরে বাঁধে!
—হেরি' রাজকন্যা,

যৌবনে উন্নত বক্ষ পরিপুষ্ট সর্ব্ব পক্ষ
রূপেগুণে ধন্যা ;
তাহারে বিবাহ করি' ধর্ম্ম কর্ম্ম পরিহরি'
বিষয়-ভজন
করে সাধু অবিরাম ; ধর্ম্ম শুধু অর্থকাম
চিন্তা অনুক্ষণ !
অপুত্রক রাজাতবে পরিহরি গেল ভবে
জামাতা রাজার,
সাধু মীন-নাথ পরে, বসে সিংহাসনোপরে
পালে চারি ধার !
অচিন্ত্য নিয়তি ফলে বিষয়ীর পথে চলে
ভুলি' ধর্ম্ম পথ ;
করে বিষয়ীর কর্ম্ম যজ্ঞ দান ক্রিয়াধর্ম্ম,
মাগি', স্বর্গ-রথ !
তীর্থ পর্য্যটন করি', পুনঃ শিষ্য আসে ফিরি' ;
শোনে গুরু তার
হইয়াছে মহারাজ পরেছে রাজার সাজ
পালে পরিবার।
গুরুরে ভেটিতে চায়, পথ কিন্তু নাহি পায়
গুরু অন্তঃপুরে !
ভগবানে একমনে ডাকে শিষ্য প্রাণপণে,
করুণে মধুরে।
অদূরে পশ্চিম ভাগে আলোকিয়া রক্তরাগে
সায়াহ্ন গগন
ঢলিয়া পড়িছে রবি সমুজ্জ্বল দীপ্তছবি
তন্দ্রায় মগন !
সহসা আসন ত্যজি' উঠে শিষ্য গুরু ভজি'
বলে, "ঠিক ঠিক ;

পেয়েছি উদ্ধার পথ, স্বরগের সুখপথ,
পেয়েছি মাণিক।"

পরদিন উষাভাগে শিষ্য প্রীতি-অনুরাগে
অন্তঃপুর-দ্বারে,
বাজায় মাদলরঙ্গে নৃত্য' করি' তা'র সঙ্গে
সঘন ফুকারে—
"এসেছে গোরখাফিরি' ভ্রমি' বন-মরু-গিরি
মাগিছে দর্শন।
এস গুরু দয়া করি' দাও হে চরণতরী
মাগে অভাজন।"

সহসা বিস্মৃতি টুটে, সাধুর মানসে ফুটে,
শুনি' কণ্ঠস্বর—
'এযে প্রিয়তমশিষ্য একনিষ্ঠভক্ত নিঃস্ব
চির অনুচর।'
জন্মান্তর স্মৃতি সম সব কথা অনুপম
জাগে হৃদিমাঝে;
নিজপানে সাধু চায়, অসীমে পরাণ ধায়
মরে পুনঃ লাজে!

অবশেষে শিষ্য ডাকি' কহিল, "আছে কি বাকী
তীর্থ পর্য্যটন?
সব যদি হয় শেষ বাস কর এই দেশ
নাহি অনটন।
সর্ব্বভোগ্যবস্তু পাবে উন্নতির পথে যা'বে
শীর্ণ দেহ তব—"
শিষ্য বলে, "নাহি চাই ভোগ্যবস্তু তব ঠাঁই
বিষয়-বিভব;
দয়া কর মোরে নাথ রহিব তোমার সাথ
দিবস রজনী;

করিব চরণ সেবা　　তবে মম সম কেবা
সৌভাগ্যের খনি ?"
রহিল গুরুর ঠাঁই ;　　মুখে অন্যবাক্য নাই
বিনা তত্ত্ব-কথা ;
শুনিতে শুনিতে ক্রমে　　ছাড়িল মায়ার ভ্রমে
অপূর্ব্ব বারতা !
ফুটিল বৈরাগ্যফুল,　　স্পর্শিল প্রাণের মূল
জাগিল ধিক্কার ;
বলে, "শিষ্য কর পার,　　পূর্ব্ব গুরুরে তোমার
হে গুরু আমার !
অধম বিষয় ভোগ　　পূর্ণ-জরা-শোক-রোগ
কর মম দূর ;
নিরমল কর চিত্ত,　　দূরে যা'ক তুচ্ছ বিত্ত
শুদ্ধ-হৃদি পুর।"
একদিন নিশাযোগে　　ত্যজিয়া বিষয় ভোগে
দুই-শিষ্যগুরু
রাজধানী পরিহরি'　　কাননের পথ ধরি'
করে চলা সুরু।
হায়রে কুহক-মায়া　　থাকে সঙ্গে তোর ছায়া ;
তুই কুহকিনি !
কিছুতে নহিস দূর　　আবরি' হৃদয় পুর
র'স একাকিনী !
তোমার কুহকে পড়ি'　　যবে রাজ্য পরিহরি'
যায় মীন-নাথ
সুবর্ণ মানিক্যরত্ন　　বাঁধিল করিয়া যত্ন,
নিল সাথে সাথ।
দেখিয়া হাসিল শিষ্য :—　　সন্ন্যাসী হইবে নিঃস্ব
সঞ্চয় না করে ;

ভিক্ষামাত্র বৃত্তি তার, হোক্ বা না হো'ক্ আহার
এ ভুবন পরে।
যাইতে যাইতে পথে হর্ষে মাতি' মনোরথে
মানিক রতন
ফেলিল গোরখনাথ নিয়েছে যা' মীননাথ
করিয়া যতন।
দেখি' গুরু ক্রোধ ভরে সুশিষ্যে ভৎর্সনা করে,
"কিবা বুদ্ধি তব,
ফেলিলে মাণিক্যমণি পেলে যাহা মহাধনী
অপূর্ব্ব বিভব।
এবে বল কোথা যা'ব, ক্ষুধা পে'লে কিবা খা'ব,
কে দিবে আহার?
তোমার বুদ্ধির দোষে, এবে মরি আপশোষে
পৃথিবী মাঝার।"
শুনি 'হাসি' শিষ্য বলে, "যাঁর দয়া ভবতলে
শিশুর আহার
সৃজে দুগ্ধ মাতৃ স্তনে জন্ম-পূর্ব্বে সঙ্গোপনে
করুণা-আধার।
সেই মহা শক্তিমান, রাখিবে মোদের প্রাণ
দিবে দয়া করি'
ক্ষুধায় সুমিষ্ট অন্ন, শয়নে শীতল পর্ণ
জলে' তৃষা হরি',
কি বল মণির কথা দেখ গুরু দেখ হোথা।
মম মূত্র সাথে
সহস্র মাণিক জ্বলে জ্বালা যা'র এ ভূতলে
দিবা করে রাতে।"
দেখিয়া গুরুর মন লভিয়া বিস্ময়, ক'ন
"একি চমৎকার"।

নিজের অদৃষ্ট ভাবি' কেঁদে মরে, "কোথা পাবি,
হেন রত্ন আর,"
বলে শিষ্যে, "ন'স শিষ্য, তুই গুরু, আমি নিঃস্ব
দেরে পদধূলি
ফুটুক অজ্ঞান আঁখি, তোর পদ-রজঃ মাখি'
হোক সত্য বুলি"
শিষ্য বলে, "তুমি গুরু সিদ্ধি দাতা কল্পতরু
নিত্য নিত্য কাল;
আর কি বা ভয় তব, দারিদ্র্য বিভব সব
হবে এক হাল।
তোমার চরণ ধরি' যাব ভব পরিহরি'
পা'ব মুক্তি আশ;
দেখ গুরু সত্য নিত্য ব্রহ্ম-ধ্যান রত-চিত্ত
বিশ্বে তব বাস।
জাগাও আপন শক্তি পদতলে রবে মুক্তি
জ্ঞান কর সার,
দেখিবে ব্রহ্মাণ্ড শত ঘুরিতেছে অবিরত
আজ্ঞায় তোমার।"
ধীরে ধীরে পূর্ব্বাকাশে বিমোহিনী উষা হাসে
রক্তিম আভায়,
সাগরে, সরিতে, হ্রদে গিরিদরী নদী নদে
লীলায় খেলায়
অন্ধকার দূরে যায়, আলোকে নিখিল ভায়;
অজ্ঞানতা শেষে
বৈরাগ্য তপন উঠে হৃদয় কুসুম ফুটে
অভিনব বেশে।

———

মাতৃশক্তির-উদ্বোধন।

(শ্রীঅজিতকুমার সরকার)

ওগো! তোমরা আজ অত ব্যস্ত কেন? চাঞ্চল্য-পূর্ণ আনন্দের মৃদুগুঞ্জনে মুখরিত বিশাল পুরীতে চঞ্চলগতি আজ কেন তোমাদের ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে? এসব কিসের আয়োজন? ঐ যে— মন্দিরে আজ সৌন্দর্য্যময়ী মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া নানা আভরণে সাজাইয়া রাখিয়াছ, ঐ যে পল্লবের মালায় মন্দির-তোরণ আচ্ছাদিত করিয়া বিচিত্র পুষ্পসম্ভারে দিগ্‌দেশ ভরিয়া দিয়াছ; ওসব কার জন্য? সেই সঙ্গে শারদীয়া প্রকৃতি বিচিত্র বেশে, বিচিত্র সৌন্দর্য্যের অঞ্জলি লইয়া বসিয়া রহিয়াছে, আজ কার প্রতিক্ষায়? শুনিলাম মা আসিতেছে! বহুদিন পরে কত হৃদয়ের আজ অন্তস্তলে কত চিন্তাতীত স্বপ্নের পারিজাত-ভরা স্বর্গীয়পুরীর রচনা করিয়া—কত মর্ম্মন্তুদ বেদনার উজ্জ্বল রাগে রঞ্জিত স্মৃতিকুঞ্জ গড়িয়া—কত দৈন্যে, কত হাহাকারে, কত শোকে, কত অশ্রু-নীরে পরিপূর্ণ সংখ্যাতীত মায়াপুরীর সৃষ্টি করিয়া মা আবার আশীর্ব্বাদের মালা হাতে লইয়া আসিতেছে। কেন, মা কি আমার ছিল না! আমি কি এতদিন তবে মাতৃহারা হইয়াছিলাম! হাঁ, তা ছিলাম বৈকি। মাতৃহারা সন্তানের আদর নাই, সোহাগ নাই, সন্ত্বনা নাই—আছে শুধু দারুণ অবহেলা এবং তাড়না, আর তারই সঙ্গে আছে—অগ্নিবাণ তার মর্ম্মগ্রন্থির প্রতি স্তরে স্তরে বিদ্ধ হইয়া। আমি যদি মাতৃহারাই না হইব তবে এ মলিন দশা কেন? নয়নে করুণকাঙ্ক্ষী সজল দৃষ্টি কেন? যাহারা আমার কেহ নয়, যাহারা আমার সুখে দুঃখে, শোকে দৈন্যে একটী সহানুভূতির কথাও বলে না,—যাহারা আমার জীবনের শেষ সম্বলটুকু কাড়িয়া লইতে চায়, যাহারা আমার হৃৎপিণ্ডের শেষ রক্তবিন্দুও শুষিয়া খাইতে চায়—আমি তাহাদেরই পদতলে দাঁড়াইয়া করুণার ভিখারী কেন? ওরে মুগ্ধ মন! কি আশায় আজ পলকহীন

দৃষ্টিতে চাহিয়া আছিস? কোন্ সুদুর অন্তরঙ্গের সোহাগস্পর্শী আলিঙ্গনের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছিস? কোন্ ঘন তমিস্রাবৃত বিজন-গুহার গোপনের ধন পাইবার আশায় তোর ছিন্নঝুলি পাতিয়া রাখিয়াছিস? ওরে ভিখারি! তোর ভিক্ষার সাধ কি কখনও মিটিবে না?—আমি ভিখারি! আহা সেত আমার চিরাকাঙ্ক্ষিত, সে সাধ আমার কবে পূর্ণ হইবে! কবে আমি পূর্ণ ভিখারী হইয়া আমার দেহের শক্তি, প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, মনের চিন্তা, হৃদয়ের আবেগ একসঙ্গে মিশাইয়া বিশ্বের দ্বারে উপস্থিত হইব! কবে আমি আমার ভিক্ষার ঝুলি সেই রাজরাজেশ্বরের অনন্ত ভাণ্ডারের সম্মুখে পাতিয়া দিব? তবে কি আমি ভিখারী নই! হাঁ ভিখারী বৈকি—কিন্তু এ ভিক্ষা আমার ভিখারীর নিকটেই যাওয়া—তাই ঝুলিও পূর্ণ হয় না, ক্ষুধারও নিবৃত্তি হয় না। 'দাও দাও আরও' দাও—বড় ক্ষুধা—বড় তৃষ্ণা! যেখানে যা কিছু আছে সব আমায় দাও। দেখিতে পাইতেছ না—করাল দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা কেমন করিয়া আমায় পাইয়া বসিয়াছে'? একি—ওকি আশ্চর্য্য! এই বিরাট বিশ্বের সবাই কি তবে আজ আমারই মত ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির! কেন—উহাদের ত কত সম্পত্তি, কত কান্তি, কত পুষ্টি,—কত বিলাস কত প্রয়াস—কত বল, কত কৌশল সবই ত রহিয়াছে! আমার যে কিছুই নাই, ওগো! আমার যে কিছুই নাই, আমার ঘর যে শূন্য, আমার দেহ যে উলঙ্গ, আমার শরীর যন্ত্র যে অন্নভাবে বিকল! তবে তোমরা আবার কেন চাও? আমার শুধু প্রয়োজন মত—শুধু জীবন ধারণের মত পাইতেও কি তোমরা দিবে না? 'কেন দিব? তোমার মুখের গ্রাস কেন আমি প্রস্তুত করিয়া দিব? তোমার ইচ্ছা থাকে, তোমার শক্তি থাকে, প্রস্তুত করিতে কতক্ষণ'—ন্যায্য উত্তর শুনিলাম। ওরে মূঢ় আর কেন! এখন আয় ঐ দেখ তোর মা আসিতেছে! ঐ দেখ তোর স্নেহময়ী জননী অশ্রুপ্লাবিত মলিন মুখের দুঃখ কালিমা মুছাইবার জন্য ছুটিয়া আসিয়াছে! আমি ভাবিলাম মাতৃহারার আবার মা কি! আমি নিজেই ত মাকে বিদায় দিয়াছি, তবে অভিমানিনী মা আবার কি আমার কাছে ছুটিয়া আসিয়াছে! চক্ষু ফিরাইয়া দেখিলাম

—ক্ষীণা, নিরাভরণা, অসহায়া, লাঞ্ছিতা নারীমূর্ত্তি! করুণারূপিণী আজ কার কাছে করুণাভিখারিণী! হায় এই কি আমার মা! আমার মা যে বরাভয়দায়িনী—বররূপিণী—করুণারূপিণী শান্তিবিধায়িনী! তবে এ দশা তার কে করিল? আমিই করিয়াছি! আমিই মাকে ভিখারিণী সাজাইয়া নিজেও ভিখারী সাজিয়াছি। হায় মা! আমারই জন্য আজ তোর এই দশা।

"স্ত্রিয়ঃ সমস্তা সকলা জগৎসু"—"হে দেবি, তুমিই যাবতীয় স্ত্রী মূর্ত্তিরূপে আপনি প্রকাশিতা হইয়া রহিয়াছ"—ইত্যাদি চণ্ডীতে লিপিবদ্ধ স্তবাদি পাঠ করিয়াই আবার পরক্ষণে মাতা, জায়া বা দুহিতার উপর নির্দ্দয় ব্যবহার করিলাম!" (ভারতে শক্তি-পূজা) শাস্ত্রকার বলিয়াছেন "যত্র নার্য্যাস্তু পূজ্যন্তে নন্দন্তে তত্র দেবতাঃ।

যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥"

"যে গৃহে নারীগণ পূজিতা হন, সেই গৃহে দেবতা সকলও সানন্দে আগমন করেন; আর যে গৃহে নারীগণ বহু মান লাভ না করেন, সে গৃহে দেবতাদিগের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত যাগযজ্ঞাদি কোন ক্রিয়াই সুফল প্রসব করে না।" ইত্যাদি—অনেক কথা আজ পর্য্যন্ত শুনিলাম—কিন্তু কার্য্যে করিলাম কি! আমাদের পূজনীয় মনীষিগণ যে মাতৃশক্তির আসন এত উচ্চে দিয়াছিলেন আমরা তাহাদের কি অবমাননাই না করিতেছি। যাঁহাদের কৃপায় আমরা সংসারে মানুষ হইবার আশা করি, তাঁহারা কেবল নিতান্ত হীনভাবে জীবনটুকু লইয়া সংসারে বাঁচিয়া থাকিবারই অধিকারই পাইতেছেন, তার বেশী প্রাপ্য কি আর নাই? আছে বৈকি! সত্যের কাছে, ন্যায়ের কাছে নিশ্চয়ই আছে; কিন্তু স্বার্থান্ধ আমরা তাঁহাদিগকে সে অধিকার হইতে এতদিন বঞ্চিত রাখিয়াছিলাম। সম্প্রতি সমাজের উচ্চ শিক্ষিত মনীষিগণ সেই মানব জীবনের সৃষ্টিকারিণী মহাশক্তিকে জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিতেছেন; বাস্তবিকই ইহা আনন্দের বিষয়। কিন্তু তাঁহারা যে আদর্শ-মূর্ত্তি আজ সমাজ-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন তাহা দেখিয়া আমরা বেশ তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছিনা, সে মূর্ত্তির কাছে সসম্ভ্রমে মাথা নত হইয়া যাইতেছে না।

তখন স্বতঃই মনে হইতেছে—আজ এই নব জাগরণের বিপুল উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সংস্কারের চঞ্চল-উদ্যম আমাদিগকে মানবের যে মহামেলার দিকে প্রেরণা দিতেছে তাহার মধ্যে আমার 'নিজস্ব' কতখানি? এর অধিকাংশই যে ধার করা! চক্ষের সম্মুখে যাহারা প্রবল তৃষ্ণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে তাহাদের সেই তৃষ্ণাকেই যে আমরা আঁকড়াইয়া ধরিতেছি! অথচ সে তৃষ্ণা নিবরেণের উপযোগী পানীয়ের বন্দোবস্ত আমার ঘরে আদৌ নাই। সুতরাং আমার পক্ষে এ তৃষ্ণা কেবল পতঙ্গের অগ্নিতে আত্মবলি দেওয়া ছাড়া আর কি হইতে পারে?

মানুষের মন যখন বিবিধ ভোগোপকরণের তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন তাহার ভালমন্দ বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ চিন্তার সময় বা শক্তি থাকে কিনা জানি না; কিন্তু সে যে তখন একটা উন্মত্ততার আবর্ত্তে পড়িয়া দিক্‌হারা হইয়া পড়ে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। মোহ আবরণ এরূপ জমাট বাঁধিয়া তখন চিন্তাশক্তি ও দূরদৃষ্টিকে ঢাকিয়া ফেলে যে, তাহার শক্তির নিকট, তাহার সূক্ষ্ম বিচার ও সুযুক্তির নিকট জগতের সবই হার মানিয়া যায়! শুধু তাই নয়, আদর্শ পুরুষও তখন এই চক্রে পড়িয়া কাপুরুষে পরিণত হয়। সকল জিনিষেরই সংস্কার একান্ত আবশ্যক; কিন্তু আমাদের এ সংস্কারকে কতকটা সংহার বলিলেও চলে। সংহার এই অর্থে যে, উন্নতি হউক বা না হউক সখ মিটাইবার জন্য যা আমার চিরন্তন নিজস্ব তাহাকে হৃদয় হইতে বিসর্জ্জন দিয়া ফেলি। 'চিরন্তন' কথায় যেন কেহ গোঁড়ামি মনে করিবেন না। গোঁড়ামী সকল স্থলেই শত্রুতা সাধন করে। প্রাচীনদের ভিতর জীর্ণ পুরাতনের পক্ষপাতিত্বে নূতনকে বিষদৃষ্টিতে দেখা যেমন গোঁড়ামী—আবার, নবীনদের ভিতর পুরাতনের সবই অগ্রাহ্য আর নূতন সবই আদর্শ' এই ভাবও এক প্রকার গোঁড়ামি। মোটের উপর গোঁড়ামির হাত আমরা কাটাইতে পারিতেছি না—তাই সংস্কারও ঠিক হইতেছে না। কোন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া এই সনাতন সমাজ যুগযুগান্তর ধরিয়া কত প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করিয়াও বাঁচিয়া আছে, আমরা তাহার খোঁজ করিয়াও করি না কিম্বা গ্রাহ্য

করি না"। চারিদিকে দেখি স্বেচ্ছাচারিতা। এই স্বেচ্ছাচারিতার যুগে কে কার কথা শুনে? এই সেদিন একজন বীর সন্ন্যাসী, সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার আলোকে জগৎকে দেখাইয়া গেলেন ভারতের আদর্শ কি? আধুনিক যুগের সেই অদ্বিতীয় সংস্কারকও বলিয়াছেন, "আমি চাই আমূল সংস্কার" কিন্তু তাঁহার আদর্শ কাহারও অনুকরণ নয়, কিম্বা তাঁহার নীতি ধ্বংস নয়, গঠন—সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর গঠন"—ভারতের আবহাওয়ায় যে অক্ষয় উপাদান, শুধু তাই দিয়া। তিনি অসাধারণ সাধনায় আপনার জিনিষ চিনিতে পারিয়াছিলেন তাই জগতের সমক্ষে মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন :—India cannot be killed. Deathless she stands and will stand, so long as her old spirit remains as the background, so long as her people do not give up the God of India, so long as they do not believe in materialism, so long as they do not abandon spirituality." অর্থাৎ "ভারতের মৃত্যু নাই। সে মৃত্যুকে জয় করিয়াছে, এবং যতদিন ধর্ম্ম বা আধ্যাত্মিক শক্তি তাহার মেরুদণ্ডস্বরূপ থাকিবে, যতদিন সে ঈশ্বরকে ত্যাগ না করিবে, যতদিন সে জড়বাদিতায় আত্মহারা না হইবে, যতদিন সে ধর্ম্মকে ত্যাগ না করিবে ততদিন বাঁচিয়াই থাকিবে" (My Master)। সুতরাং ধর্ম্মই যে আমাদের মেরুদণ্ড এবং সকল আদর্শ গঠিত করিতে হইবে সেই ধর্ম্মকেই আশ্রয় করিয়া, একথা যদি ভুলিয়া যাই তবে সুফলের আশা করিতে পারি কেমন করিয়া? এক্ষণে দেখা যাউক আমাদের সংস্কৃত আদর্শে কতখানি নিজস্ব বজায় থাকিতেছে বা থাকিবার আশা করা যায়।

আজকাল আমাদের মাতৃশক্তিকে জাগ্রত করিবার মূলমন্ত্র শুনিতে পাই,—উচ্চশিক্ষা দান, পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার প্রদান, এবং স্বেচ্ছায় গমনাগমন ইত্যাদি। অর্থাৎ সোজা কথায় পুরুষের মধ্যে যেরূপ শিক্ষক, অধ্যাপক, ব্যবহারাজীবি ও কেরাণীর দল সৃষ্টি হইয়াছে নারীদের মধ্যেও সেইরূপ সৃষ্টি করা, তাহা হইলেই নাকি চরম সিদ্ধি

পাওয়া যাইবে। এত ন্যায্য দাবী! পিতামাতা যদি বাস্তুভিটা বিক্রয় করিয়া, অনশনে দিন কাটাইয়া, পুত্রের শিক্ষা বিধান করিতে পারেন তখন কন্যারাই বা পারিবেন না কেন? যদি না পারেন তিনি কর্ত্তব্যে ক্রুটী করিলেন। শিক্ষাই মানুষকে 'মানুষ' করিয়া তুলে নতুবা সে মানুষের অবয়ব বিশিষ্ট একটা ইতরজীব হইয়াই সংসারে বাঁচিয়া থাকে; একথা সর্ব্ববাদী সম্মত। কিন্তু সে শিক্ষা কোথায়? সেরূপ প্রাণ-প্রতিষ্ঠাধারী শিক্ষা মানে কি পরীক্ষায় পাশ? সেরূপ শিক্ষিত যত বাড়িতেছে ততই যে আমরা দৈন্যের হাহাকারে ডুবিয়া যাইতেছি! সমস্যার মীমাংসা ত দেখিতে পাইতেছি না? তবে কেমন করিয়া ভরসা করি ঐটাই আমাদের অবলম্বনীয় পথ? আমাদের শিক্ষা অর্থে পাশ আর স্বাধীনতা অর্থে যথেচ্ছা গমনাগমন কিম্বা কাহারও শাসনের অধীন না হওয়া। এই প্রসঙ্গে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয়ের কয়েকটী কথা মনে পড়িল। তিনি বলিয়াছিলেন:—"ঈশ্বরের অধীন হওয়া—ধর্ম্মের অধীন হওয়াই প্রকৃত স্বাধীনতা। সমাজভয়ে সত্য প্রতি-পালনে বিরত থাকাই প্রকৃত অধীনতা। অন্তর রিপুদিগকে বশীভূত করিয়া পবিত্র থাকাই যথার্থ স্বাধীনতা। রিপুদিগের অধীন হইয়া পাপের দাস হওয়াই প্রকৃত পরাধীনতা। পুরুষের সহিত প্রকাশ্যরূপে আলাপ করা, প্রকাশ্যপথে পদব্রজে অথবা অনাবৃত যানে বিচরণ করা, পুরুষদের সভায় উপস্থিত হইয়া স্বাধীনতা প্রদর্শন করা, ইহার একটীকেও স্বাধীনতা বলিয়া বোধ হয় না। কারণ; আমাদের দেশের নীচশ্রেণীর স্ত্রীলোকগণ সর্ব্বত্র বিচরণ করে, সর্ব্বদা পুরুষমণ্ডলীতে অবস্থিতি করে, তজ্জন্য তাহাদিগকে স্বাধীন বলা যায় না।" (গোস্বামী প্রভুর জীবনী) অবশ্য একথা অনেকেই বৈরাগীর প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া দিবেন তাহা জানি। কারণ, আজকাল সংসারীর কাছে রিপুর দমন, সংযম, ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন, শাস্ত্রালোচন ইত্যাদি একটা হাস্যকৌতুকের বিষয় বলিয়া গণ্য। তাহা হইবারই কথা, যে হেতু আমাদের শিক্ষার সঙ্গে ওসকল আপদ বালাইএর কোন সম্পর্কই নাই। ছেলে বেলায় মুখস্থ করি,—"লেখা পড়া করে যে গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে।" অর্থাৎ গাড়ি ঘোড়া চড়াটাই

শিক্ষা এবং জীবনের পূর্ণ উচ্চাবস্থা কিম্বা চরম সফলতা। কাজেই বাল্যকাল হইতেই "শরীর পতন কিম্বা মন্ত্রের সাধন" এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা লইয়া গাড়ি-ঘোড়ার জন্য শিক্ষা মন্দির হইতে কর্ম্মক্ষেত্র পর্য্যন্ত ছুটিয়া বেড়াই। কিন্তু হায় লীলাময়ের কি বিচিত্র লীলা! সমস্ত জীবনটা প্রাণে দারুণ তৃষ্ণা লইয়া হৃদয়ে অসহ্য জ্বালা লইয়া কেবল ঘুরিয়া মরিয়া গাড়ি ঘোড়ার সাধ আর মিটে না। 'ত্যাগ' কথাটা আজ আর ভদ্র সমাজে তিষ্টিতে পারে না, তাহা কেবল ফকিরের সম্বল। জ্ঞান, ভক্তি এবং ঈশ্বর-প্রণিধান ও সব ফকিরের ধন; আজকালকার ভদ্র সমাজের কোন কার্য্যেই ওসকল অসার পদার্থের আবশ্যক হয় না। তাঁহাদের কেবল "ধনং দেহি" আর "যশো দেহি" মন্ত্রই ইহকাল পরকালের সার বস্তু। হায়! আজ আমরা বুঝিতে অক্ষম যে সন্ন্যাসী অপেক্ষা গৃহীর সমস্যাই অধিকতর সঙ্কটাপন্ন,—যদি প্রকৃত মনুষ্যত্বের, প্রকৃত গৃহস্থের অধিকার কেহ লাভ করিতে যান। আমরা জানি ভোগের শেষ না হইলে কেহ নিবৃত্তি মার্গে আসিতে পারে না; সুতরাং সংসারে যত রকমের ভোগ আছে সবই শেষ করিতে হইবে! কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, সেই সীমাহীন মরুর অনন্ত বক্ষ লঙ্ঘন করা আমাদের মত পিপাসাকুল হতচৈতন্য জীবের দ্বারা একরকম অসম্ভব। যদি না সহজ পথের সন্ধান কোনখানে করিতে পারি। আমরা যতই আত্ম গোপন করি, যতই বাহিরের আস্ফালন দেখাই ভিতরের দৈন্য আর গোপন রাখিতে পারিব না। কারণ যে পথিকের সঙ্গে এতদূর আসিয়াছি, যে আমাকে এই মরু অভিযানের সঙ্গী করিয়াছে, তাহার হাতেই এখন মান সম্মান, জীবন মরণ সবই নির্ভর করিতেছে। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় (Sir P. C. Ray) একদিন বলিয়াছিলেন বিবেকানন্দের চেলারা বলিলেন বেদান্ত প্রচার কর তবেই দেশ উন্নত হইবে'। বলা বাহুল্য অনেকটা ঠাট্টাছলে তিনি একথা বলিয়াছিলেন। আজ কিন্তু তাঁহার একটা কথায় বেশ বুঝিতেছি বিবেকানন্দই আমাদের খাঁটি এবং উপযুক্ত পূর্ণ সংস্কারক। গত আষাঢ় মাসের মাসিক বসুমতীতে 'সভ্যতার মাপকাঠি' শীর্ষক প্রবন্ধের একস্থানে তিনি বলিয়াছেন—"কলেজের ছাত্রেরা

প্রায়ই, চাল-চলনে উচ্চস্তরের সভ্যতার পরিচয় দিতে সচেষ্ট, আর তাহাদের নিত্য-নৈমিত্তিক আচার ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ করিলে সহজেই অনুভব হয় যে, বর্ত্তমান সভ্যতা (যাহা পাশ্চাত্য সভ্যতার অবিকল অনুকরণ) তাহাদিগের প্রায় অস্থিমজ্জাগত হইতে চলিল।.........যে দেশের চরম আদর্শ আত্মও তত্ত্বজ্ঞান লাভ, যে দেশের কর্ম্মীর আদর্শ গর্ডন, ক্লাইব নহে, কিন্তু কর্ম্মযোগী শ্রীকৃষ্ণ, সে দেশের কামনা ও সাধনা, সে দেশের ধর্ম্ম ও সভ্যতা যে য়ুরোপীয় জ্বালাময়ী সভ্যতার মাপকাঠিতে পরিমাপ হয় না, তাহাতে আর বিস্ময়ের কারণ কি ? এই পশ্চিমের স্রোতে অতর্কিত ভাবে গা ঢালিয়া, ভারত যুবক ! তোমরা নিজস্ব ভুলিও না।" শুধু যুবক নয় যুবতীরাও যে নিজস্ব ভুলিতে চলিল, আর আমাদের কে রক্ষা করিবে ? যে দেশের মহাপুরুষেরা নারীকে আদ্যা-শক্তির অংশ ভাবিয়া পূজনীয়া বলিয়া গিয়াছেন, আজ সকল অবস্থাতেই সর্ব্বান্তঃকরণে আমরা তাঁহাদিগকে বিলাসের সামগ্রী করিতে চাই। মরু অভিযানের যাত্রী আমরা, আজ প্রাণ-শক্তি-রূপিনীদের তদোপযুক্ত বেশ-ভূষায় সজ্জিত করিয়া সেইরূপ শিক্ষায় শিক্ষিতা করিয়া, বুকফাটা পিপাসানলের ইন্ধন যোগাইবার যোগাড় করিতেছি।

স্ত্রীশিক্ষার বহুল প্রচার একান্ত আবশ্যক, কিন্তু কেবল 'শিক্ষাই' আবশ্যক, 'কুশিক্ষা' নয়। সে শিক্ষা যেন তাহার নিজস্বকে ভাঙ্গিয়া চূরিয়া নষ্ট না করিয়া দেয়, সে শিক্ষা যেন নারীকে নারীত্বের গৌরবেই গৌরবিনী করে। যদি আমরা প্রকৃত শিক্ষা দিতে পারি তবেই তাঁহাদের অধিকার তাঁহারা নিজেরাই চিনিয়া লইতে পারিবেন। কিন্তু প্রথমে দেখা অবশ্য নিতান্ত প্রয়োজন যে নারীর 'নারীত্ব' কি ? কোন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলে সেই নারীত্ব পূর্ণ-বিকশিত হইবে ? রন্ধন শালার অধিশ্বরী হইলে, অথবা স্কুল, কলেজ, আদালত, সভাগৃহ মুখরিত করিলেই নারীর 'নারীত্ব' পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না—ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

সুতরাং আপন অধিকার বুঝিয়া লইতে হইলে যাঁহাদের অধিকার, তাঁহাদেরই অন্তর্দৃষ্টি থাকা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি জিনিবটা বড়ই ধাঁধার জিনিষ! কাহাকে অন্তর্দৃষ্টি বলিব ? বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়া-

ছিলেন, যাহা থাকিলে 'মানুষ' আর যাহা না থাকিলে মানুষ 'মানুষ' নয় তাহাই মনুষ্যত্ব। ইহার সম্বন্ধেও তার বেশী আর কিছু বলিতে পারিব না; অর্থাৎ যে দৃষ্টির সাহায্যে মানুষ আপনার চিরন্তন অধিকার বুঝিয়া লইতে পারে, যে দৃষ্টির সাহায্যে সে সংসাররূপ অতল জলধির মাঝে দিক্ হারা হয় না; এবং যে দৃষ্টি না থাকিলে সে বিপথে কুপথে যাইয়া পরিশেষে আপনাকে হত্যা করিয়া বসে তাহাই অন্তর্দৃষ্টি। কিন্তু এ দৃষ্টির বিষয় 'নুনের পুতুলের সমুদ্র মাপিতে' যাওয়ার মত অন্যকে বুঝান যায় না, যার এ দৃষ্টি আছে, যিনি ইহার সাহায্যে মানব জীবনের চিরাকাঙ্ক্ষিত দর্শনীয় দর্শন করিয়াছেন তিনিই বুঝিতে পারেন ইহার স্বরূপ কেমন? তবে কি উপায় অবলম্বন করিলে এ দৃষ্টি লাভ করা যায়, তাহা অভিজ্ঞ নিশ্চয়ই বলিতে পারেন! আর তাঁহাদের সাহায্যেই আমরাও অবশ্য মুখস্থ করি যে, বিদ্যাই সে বস্তু লাভের একমাত্র পন্থাঃ। বিদ্যাই সেই মোহ-অঞ্জন পরিষ্কাররূপে ধৌত করিয়া অন্তর্দৃষ্টি জাগ্রত করিয়া দেয়। কিন্তু আজকাল আমরা অন্তর্দৃষ্টি অর্থে বিলাস এবং জড় প্রকৃতির মোহময়ীরূপ চিনিবার শক্তিবিশেষ বুঝিয়াই বোধ হয় বেশ আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছি, নতুবা আর অগ্রসর হইনা কেন? আসল কথা বলিতে গেলে আধুনিক যুগের সভ্য এবং অসভ্য দলের অধিকাংশই "যে তিমির সেই তিমিরে"ই আচ্ছন্ন!

আধুনিক কালে স্ত্রীশিক্ষার যে বন্দোবস্ত হইয়াছে—তাহার ফল কিরূপ দূরদর্শী মনীষিগণ অবশ্যই তাহা জানেন। কিন্তু আমরা এখনও বুঝিতে অক্ষম যে, পুরুষোচিত শিক্ষাদীক্ষা ও অধিকার লাভে নারীজীবন কিরূপে পূর্ণতা লাভ করিবে! বিধাতা নারী ও পুরুষের সৃষ্টি বিষয়ে যে অলঙ্ঘনীয় বৈচিত্র্য প্রদর্শন করিয়াছেন—তাহাতে নারী, পুরুষ কিম্বা পুরুষ, নারী হইতে পারে না। তারপর সৃষ্টির মধ্যেই যেখানে এত বিভিন্ন বৈচিত্র্য বর্ত্তমান সেখানে সকলের জন্যই যদি একই কর্ম্মক্ষেত্রে একই কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হয়, তবে কিরূপে সুফলের আশা করা যায়? কুমারীত্ব, নারীত্ব এবং সর্ব্বশেষে মাতৃত্বেই নারীজীবনের পূর্ণ সফলতা একথা এখনও আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল রহিয়াছে। আমরা চাই সেই

নারী—যাঁহার দর্শনে হৃদয়ে অপঙ্কিল প্রেমপ্রবাহ ছুটিয়া যাইবে, যাঁহার তেজ ও রূপ মাধুর্য্যের নিকট ভক্তিপ্রণত শির অলক্ষিতে নুইয়া পড়িবে। আমরা চাই সেই মা, যাহার নির্ম্মল স্নেহ রসে প্লাবিত হইয়া মরনোন্মুখ জীবন সজীব হইয়া উঠিবে, আমরা চাই সেই মা—যাঁহার অব্যর্থ-শক্তি-নিহিত আশীর্ব্বচনে, যাঁহার ভীত্তি-বিনাশ কর মাভৈঃ মন্ত্রে অসীম তেজে সমর জয় করিয়া আসিব। হায়রে দুর্ভাগ্য! সীতা-সাবিত্রী, সুভদ্রা-দময়ন্তী ও পদ্মিনীর দেশে আমরা নারীত্বের আদর্শ খুঁজিয়া মরিতেছি! আজকাল আমাদের বিলাসিনী মায়েরা আর মাতৃত্বের দাবি রাখিতেই চান না—তৃষ্ণা মিটাইবার জন্য যতখানি দরকার সেইটুকু হইলেই যথেষ্ট। আমরা প্রাণ ভরিয়া চাহিতেছি সুখ; অথচ সুখের রাজ্য আজ কল্পনার বাহিরে অন্তর্হিত হইয়াছে। এমন সুখ কেবল স্বপ্ন—কেবল পিপাসার উন্মাদনা।

সেদিন এক বিদূষী জননী স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছেন:—"এই যে নূতন স্রোত দেশের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে এ স্রোত দেশের নদীর নিজের বক্ষ হইতে ক্রমশঃ উদ্ভূত হয় নাই। ইহা বৈদেশিক বন্যার অতর্কিত প্লাবন। এই নূতন স্রোতের বেগবতী ধারা আমাদের ঘর দ্বার ভাসাইয়া না দেয়, সেই দিকে আমাদের দৃষ্টি রাখাও অত্যাবশ্যক বলিয়া আমার মনে হয়। ... ...স্ত্রীশিক্ষা বলিতে আজকাল আমরা সাধারণতঃ মেয়েদের স্কুল কলেজে লেখা পড়া শেখানকেই বুঝি। আজকাল এই প্রকারের শিক্ষিতা মেয়েদের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে; এবং দিন দিন ইহাঁদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে ও পাইবে।......নব্যশিক্ষিতা মেয়েদের বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনাযায়, উহারা ঠিক পূর্ব্বের মত ধর্ম্মভীরু হয় না।......নব্য-শিক্ষিতাগণ পুরাতন দলের তুলনায় কিঞ্চিৎ অহঙ্কৃতা এবং অসরলা—এ নিন্দাটাও তাহাদের ঘটিতেছে। স্কুল কলেজে শিক্ষিতা হইলেই যে মেয়েরা কুটিলা হইবেন, এমন কথা বলিনা, তবে তুলনামূলক সমালোচনা করিতে গেলে, ইহা এতই সুস্পষ্ট রূপে চোখে পড়ে যে, এ সম্বন্ধে আর বেশী স্পষ্ট কোন কথা না বলিলেও চলে। প্রাচীনারা পরকে এক মুহূর্ত্তে

আপন করিতে পারিতেন, নবীনারা আপনাকেও বহুদিনে নিকটতম করিতে ত পারেনই না,—পরন্তু পর করেন। ইহা অকাট্য সত্য! ইহার একমাত্র কারণ তাঁহারা নিজের প্রকৃতিকে চাপিয়া রাখিয়া, ছাঁচে ঢালাই করা, নিক্তির তৌল বা কৃত্রিম শিষ্টাচারের আশ্রিতা হইতেছেন। পূর্ব্বের মেয়েরা অলঙ্কার প্রিয় ছিলনা, তাহা নারী মনস্তুষ্টি সম্পাদন পূর্ব্বক গৃহস্থের গৃহে অসময়ের জন্য একটা সঞ্চয় থাকিত। কিন্তু এযুগের নারীবিমোহন যাবতীয় বস্তুজাতই ভূয়া। অলঙ্কাররূপে ইহারা ক্রয়কালীন বহুমূল্য এবং বিক্রয়কালীন মূল্যহীন ;—মুক্তা, চুনী বা কাঁচ, পাথর এবং অধিকাংশই রেশম পশম ও লেশচিকনের গাদা। ....এই যে বিদেশী ঢঙ্গের পুরুষোচিত শিক্ষা মেয়েদের জন্য বিহিত হইয়াছে, ইহা সংশোধিত, পরিবর্ত্তিত না হইলে, আমাদের মেয়েদের গার্হস্থ্য জীবনের ভবিষ্যৎ খুবই সুখোজ্জ্বল বলিয়া আমার তো বিশ্বাস হয় না"।

(শ্রীঅনুরূপা দেবী—ভারতবর্ষ)

নজীর দেখাইয়া তর্কে প্রতিষ্ঠালাভ কাহারও উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে, কিন্তু তাহা হইলেও নজীরের আবশ্যকতা আছে—তাই আমার বিশ্বাসের অনুকূল দুই চারিটী নজীর দেখাইলাম। যদি বলা যায় কেন দেখাইলাম? ঐ নজীর যে মানিতে হইবে তাহারই বা কারণ কি? কারণ অন্য কিছু নাই ;—আমরা চাই সংস্কার, চাই উন্নতি, চাই মানুষ হইয়া সংসারে বাঁচিয়া থাকিতে। সুতরাং মানুষ হইতে হইলে যে পথে যাইতে হয় অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাই তাহা অবগত আছেন বলিয়া, তাঁহাদের উপদেশ আমাদের অবশ্যগ্রহণীয়। যদি বলি আমি কি মানুষ নই? আবার আমি যাহাকে ঘৃণা করি সেও কি মানুষ নয়? হাঁ সাধারণ দৃষ্টিতে এবং বাহ্যিক অবয়বে সকলেই মানুষ বলিয়াই পরিচিত হইলেও ত্রুটী রহিয়াছে আগাগোড়া সকল স্থানেই। আমাদের উদ্দেশ্য নাই অথচ কর্ম্ম বা বিকর্ম্ম আছে, তপস্যা নাই আবার সিদ্ধির আশাও আছে। অর্থাৎ সবই অনিয়ন্ত্রিত এবং লক্ষ্যভ্রষ্ট। তবে কি আধুনিক ভাবকে পরিত্যাগ করিয়া পুরাতনের জীর্ণ পঞ্জরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে? তাহা অসম্ভব। মানুষের জীবন সমস্যা তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে কেন্দ্র

করিয়া বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। সুতরাং তাহারই উপর নিজেকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সমস্যার মীমাংসা করিতে হইবে একথা সর্ব্বৈব সত্য। কিন্তু পুরাতনের স্মৃতিকে একেবারে ধুইয়া মুছিয়া ফেলিবারও ত কোন কারণ দেখা যায় না। যেখানে অগণিত সাফল্যের বিজয় নিশান উড্ডীয়মান তাহাতে আমার শিক্ষার কি কিছুই নাই? সে স্মৃতির গৌরব আমার কাছে এত বেশী যে, তাহা বিস্মৃতির অতল জলে ডুবাইতে চাহিলেও ডুবিয়া যায় না আপনি অলক্ষিতে ভাসিয়া উঠে। ওগো! তাহা যে আমি কিছুতেই ভুলিতে পারি না! তাহা যে সমস্ত হৃদয়কে করুণ করিয়া, এক অব্যক্ত উচ্ছ্বাসে নূতনকে রঞ্জিত করিয়া, অতি সুস্পষ্ট ভাবে ভাসিয়া উঠে! সে যে পুরাতন হইলেও নিত্য নূতন—বেদনাময় হইলেও অতি মধুর! সে যে আমার শিরায় শিরায় রক্তস্রোতের সঙ্গে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। সে যে আমার হৃদয় কন্দরের অতি নিভৃত প্রদেশে নিজেকে বিলীন করিয়া লুকাইয়া রহিয়াছে! তবে কি রাশি রাশি অনাবশ্যক বিকট কুসংস্কারের বোঝা ঘাড়ে চাপাইয়া জীবনটাকে দুঃসহ ভারাক্রান্ত করিতে হইবে? সেই ভারেই ত আজ আমরা এতনীচে পড়িয়া রহিয়াছি! সুতরাং বোঝার ভার কমাইতে হইবে। সমস্ত আগাছা উৎপাটন করিয়া চিরন্তন সত্যের পবিত্র মন্দির সুসংস্কৃত করিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া ভিত্তি খুঁড়িয়া নূতন ভাবে সেইরূপ মণিময় তুরঙ্গমন্দির গড়িবার রত্নসম্ভার দীন ভিক্ষুক আমরা কোথায় পাইব? তাহা ব্যতীত সেই চিরপবিত্র মন্দিরাভ্যন্তরে যে সকল দেবতার চরণচিহ্ন পড়িয়াছে, তাহার প্রতি অণু-পরমাণুর সঙ্গে যে পূর্ণ সফলতার চিরোজ্জ্বল স্মৃতি মিশাইয়া আছে—তাহা আমাদের পূজার যোগ্য।

এতক্ষণ কেবল একপক্ষের সমালোচনা হইল; শুধু সমালোচনাতেই কোন কার্য্য সুন্দর হইয়া উঠে না, চাই আদর্শ। বিভিন্ন প্রকৃতি মানুষের বিভিন্ন প্রকার আদর্শ আছে। তাহা ভাল হউক বা মন্দ হউক সেইটাই তাহার প্রিয়। আমাদেরও সেইরূপ আলোচ্য বিষয়ের একটা আদর্শ নিশ্চয়ই আছে। আমরা আধুনিক শিক্ষিতা নারীদের বিলাসিনী,

ইত্যাদি অনেক কথাই বলিয়াছি। তবে কি আমরা বিলাস চাইনা, না পারিপাট্য চাইনা, না রূপ চাইনা ? চাই সবই। সৌন্দর্য্য জগতে কেনা চায় ? সুন্দরকে ভাল কেনা বাসে ? সেখানে যে মঙ্গলময় বিধাতারই বিশেষ করুণা মিশ্রিত রহিয়াছে—তাই সুন্দর সকলের প্রিয়। আমরাও রূপ চাই, কিন্তু কেমন করিয়া সে রূপের স্বরূপ ভাষায় বুঝাইয়া দিব ? তাহা যে শুধু নয়ন আর হৃদয় দিয়াই অনুভব করা যায়! প্রকাশ করিবার রীতি কি আছে জানি না। এখানে সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্রের ভাষায় বলিব ;—"কখন কিশোর বয়সে কোন স্থিরা, ধীরা কোমল প্রকৃতি কিশোরীর নব সঞ্চারিত লাবণ্য প্রেম চক্ষে দেখিয়াছেন ? একবার মাত্র দেখিয়া চিরজীবন মধ্যে যাহার মাধুর্য্য বিস্মৃত হইতে পারেন নহে, কৈশোরে, যৌবনে, প্রগল্ভবয়সে, কার্য্যে, বিশ্রামে, জাগ্রতে, নিদ্রায় পুনঃ পুনঃ যে মনোমোহিনী মূর্ত্তি স্মরণ পথে স্বপ্নবৎ যাতায়াত করে অথচ তৎসম্বন্ধে কখন চিত্তমালিন্য জনক লালসা জন্মায় না, এমন তরুণী দেখিয়াছেন ?... ...যে মূর্ত্তির সৌন্দর্য্য-প্রভা প্রাচুর্য্যে মন প্রদীপ্ত করে, যে মূর্ত্তি লীলা-লাবণ্যাদির পারিপাট্যে হৃদয় মধ্যে বিষের দন্ত রোপিত করে এ সে মূর্ত্তি নহে, যে মূর্ত্তি কোমলতা মাধুর্য্যাদি গুণে চিত্তের সন্তুষ্টি জন্মায়, এ সেই মূর্ত্তি।" (দুর্গেশ নন্দিনী)। আর আমাদের আদর্শ রূপও সেইরূপ। রূপের প্রভায় হৃদয় আলোকিত না হইয়া যদি পুড়িয়া মরে তবে সে রূপ নয়—বিষ ; রূপের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যদি হৃদয় প্রেমভক্তিরসে আপ্লুত না হইয়া উঠে তবে তাহা কেবল ফাঁদ বই আর কিছু নয় ; আবার আমরা প্রেমচক্ষে দেখিতে জানিনা এটাও যেমন সত্য, তাঁহারা বাহ্যিক আড়ম্বরে রূপকে আগুনের ন্যায় তীব্রোজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছেন এবং তাহারই সঙ্গে অন্তরের সৌন্দর্য্য প্রভা নিবিয়া যাইতেছে—এটাও তেমনই সত্য। তাঁহারা সৃষ্টি কর্ত্তার উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া যাহা সৃষ্টি করিতেছেন তাহা দেখিলে চক্ষু ঝলসিয়া যায়। যাহাহউক যাঁহাদের সামর্থ্য আছে, বিলাস বাবুয়ানা, সাহেবীয়ানা লইয়া যাঁহাদের দিন বেশ কাটিয়া যাইবে, এ নূতন সৃষ্টি তাঁহাদের গৃহে আবদ্ধ থাকিলে বিশেষ ক্ষতি ছিল না (যদিও উহা

সমাজ এবং দেশের পক্ষে অহিতকর) কিন্তু তাহা যে নিজেদের গৃহেও অলক্ষ্যে উপস্থিত হইয়া আপন প্রভাব বিস্তার করিতেছে! সুতরাং এ ব্যাধি যদি ক্রমে ছোট বড় ; সহর-পল্লী সকল স্থানেই বিস্তৃত হয় তবে মৃত্যু আর কে নিবারণ করিতে পারে ?

সুদূর পল্লীবাসিনীরা আচারের বোঝা মাথায় লইয়া জড় পিণ্ডবৎ বিরাজমানা থাকিলেও সেখানে বিশ্বাস (অবশ্য অন্ধ-বিশ্বাসও হইতে পারে), এবং নারী-সুলভ-লজ্জা, দেবতার প্রতি অন্ততঃ প্রাণহীন ভাবে ভক্তিও অবশিষ্ট আছে। সেখানে যদি সহরের আবহাওয়া, সভ্যা জননীদের পাশ্চাত্য আদর্শ ভালরূপে ভাব বিস্তার করিতে পারে, তবে সকল দেবতা এবং ক্রমে ভগবানকেও এ রাজ্য ছাড়িয়া পলাইতে হইবে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। অতএব উহাদের হৃদয়ের সেই প্রকৃতিবদ্ধ ভাব বিনষ্ট না করিয়া (অবশ্য আচারের বোঝা বা কুসংস্কার বাদ দিয়াই বলিতেছি) যদি প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া যায় তবে বোধহয় আমাদের গার্হস্থ্য জীবন এত হীন হয় না। ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, গণিত, কাব্য, সবই তাঁহাদের শিক্ষনীয় অবশ্য হওয়া উচিত, কিন্তু সেই সঙ্গে গার্হস্থ্য বিদ্যা ও ধর্ম্মপ্রাণতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার। আসল কথা ধর্ম্মকে বাদ দিয়া, ভগবানকে বাদ দিয়া কখন সুশিক্ষা হইতে পারে না। আমরা ইচ্ছা করিলেই দেখিতে পারি—কুসুম-কোরকের ন্যায় সুকোমল কুমারী হৃদয়ে কত শীঘ্র ধর্ম্মভাব রোপিত করা যায়,—কত শীঘ্র তাহারা ভক্তিময়ী স্নেহময়ী হইয়া উঠিতে পারে! চাই সুশিক্ষা, চাই খাঁটি আদর্শ। এখনও পর্য্যন্ত পল্লীগ্রামে অনেক প্রকার কুমারী-ব্রত, পূজা, উপাসনা ইত্যাদির প্রচলন আছে। সে সব এখন প্রাণহীন ভাবে অনুষ্ঠিত হয় মাত্র ; কারণ প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবার লোক কোথায়? একদিকে ধর্ম্মত্যাগী স্বেচ্ছাচার—আর একদিকে অনাবশ্যক কুসংস্কার ও আচারের মৃত্তিকা-স্তূপ লইয়াই আমাদের আধুনিক সমাজ বর্ত্তমান।

স্বামিজী, এই সনাতন পন্থীদের দ্বারা স্ত্রীজাতির প্রতি অমানুষিক ব্যবহারে ব্যথিত হইয়া তাঁহার অন্তরঙ্গদিগকে কত কথাই না বলিয়া-

ছিলেন; কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও বলিতে ভুলেন নাই যে সীতা, সাবিত্রীই ভারত-নারীর একমাত্র আদর্শ। এ আদর্শ যদি কোনও সংস্কার বজায় রাখিতে না চান, তিনি বিফল প্রযত্ন হইবেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, আজকালকার, নব্যশিক্ষিতা মেয়েদের নিকট বিশেষ আমল পান বলিয়া ত মনে হয় না। আমরা শুনিতে পাই তাঁহারাও নাকি নিতান্ত অচেতন ভাবে দাসীত্ব করিয়া গিয়াছেন। বিশেষতঃ নারী পুরুষের নিকট দাসীত্ব স্বীকার করিবে কেন? এটাও আধুনিক কালের একটা প্রধান অভিযোগের বিষয়। এখান দেখা যাউক দাসত্ব বা দাসীত্ব করে, মানুষ কিরূপ অবস্থার অধীন হইয়া।—শুধু নারীই কি পুরুষের দাসীত্ব করে? পুরুষ কি নারীর নিকট দাসত্বে বাঁধা থাকে না? আমাদের মনে হয় এ ক্ষেত্রে উভয়েই পরস্পরকে জয় করিবার চেষ্টা বড় কম করেন না! প্রথমতঃ অবস্থার বিপর্য্যয়ে আপন প্রাণ বাঁচাইবার জন্য মানুষ দাসত্ব বা দাসীত্ব বরণ করিয়া লইতে বাধ্য হয়। দুর্ব্বলেরই এই দাসত্ব চির সঙ্গী এবং সেখানে তাহার শারীরিক মানসিক সকল স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তিই দৃঢ় ভাবে শৃঙ্খলিত থাকে। ইহা সে না চাহিলেও বক্ষে পাষাণ চাপিয়া তাহাকে তাহার ভার বহন করিতে হয়। এখানে দিবারাত্রি প্রবলের নিষ্ঠুর তাড়না দুর্ব্বলের ক্ষীণদেহ নিষ্পেষিত করিয়া তাহার রুদ্ধ যাতনার অস্ফুট করুণ আর্ত্তনাদে প্রকৃতির রাজ্য বিষময় করিয়া তুলে। এ দাসত্ব মানুষের প্রাণে অসহ্য হওয়া স্বাভাবিক; যদি কাহারও না হয় তবে তাহার মনুষ্যত্ব কতখানি বলা যায় না। অবশ্য একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, আমাদের সনাতন হিন্দু সমাজে মাতৃজাতির এরূপ দাসীত্বের দৃষ্টান্তও নিতান্ত বিরল নহে। আর সেই জন্যই আজ প্রথমে সহৃদয় পুরুষের প্রাণই সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠিয়াছে। তারপর আর এক প্রকার দাসীত্ব বা দাসত্ব দেখিতে পাওয়া যায়,—মলয় হিল্লোলের মৃদুস্পর্শে আন্দোলিত মধুভরা কুসুম-কুঞ্জে প্রমত্ত অলিকুলের ন্যায় প্রেমিক যখন প্রিয়তমের চরণে আবেগ ভরে আত্মবিক্রয় করিয়া বসে। এ দাসত্বে নারী-পুরুষ

ভেদাভেদ নাই, ছোট বড় ভেদাভেদ নাই; কখন নারী বড়, কখন পুরুষ বড়। 'সকলেই নিজেকে ছোট এবং প্রিয়তমকে অসীম পারাবারের ন্যায় পূর্ণ এবং' মহান ভাবিয়াই সুখ পায়। এ দাসত্বে—মুক্তিতে সুখ নাই—আছে নিবিড় বন্ধনে। এখানে দাসত্ব করিয়া, আত্মবিক্রয় করিয়া, আপনার হৃদয় মন যাহা কিছু অমূল্য-রত্ন প্রিয়তমের সেবার আয়োজনে বিলাইয়া দিয়া "তুঁহু মম হৃদয় কি রাজা" বলিয়া চরণ প্রান্তে আপনাকে হারাইয়া ফেলিলেই যেন বিশ্বের সিংহাসন লাভ করে। এ দাসত্বের শৃঙ্খল এত কোমল, এত স্নিগ্ধ যে, ইহার দৃঢ় বন্ধনে হৃদয়ের গভীর অন্তস্তলও পুলকে শিহরিয়া উঠে। তখন মনে হয়,—"এ কি বিচিত্র নিগূঢ় নিগড় মধুর প্রিয় বাঞ্ছিত কারা এ।" হায়! এ হৃদ্ কারাগারে বন্দী হইতে—অতি সাধারণ সংসারী মানবের কে না চায়? সুখ দুঃখের নানা বৈচিত্র্য-ময় মর জগতে যদি কোথাও প্রকৃত সুখের অনুভূতি থাকে,—তাহা ঐ "চিরবাঞ্ছিত কারা এ"। যদি কোথাও রত্ন বলিয়া কিছু থাকে,—যদি কোথাও স্বর্গীয় সম্পদ কিছু থাকে তাহা ঐ চির পবিত্র হৃদ্ কারাগারে প্রেমের নিগড়েই বিলীন আছে। দাস যখন একবার সেখানে বন্দী হয়, তখন সে মুক্তি চাহিবে কি—সকল স্বার্থ সকল আকাঙ্ক্ষা তাহার চক্ষুর অগোচরে আবেগের উন্মত্ত প্রবাহে ভাসিয়া যায়। সেখানে তখন সুরভি-কুসুম ফুটিয়া উঠে, মলয়-সমীরণ তাহার সেই সৌরভ হরণ করিয়া চতুর্দ্দিকস্থ আকাশ ভরিয়া দেয়। তখন কি আর আপনার বলিতে কিছু থাকে? ওগো! তখন যে অনন্তের-রত্ন ভাণ্ডার সব আমার হইয়া, আমার শূন্য-কুটীর পূর্ণ করিয়া দেয়! যে কুটীরে জগতের মধ্যে কেবল 'আমাকেই' দেখিতাম, তথায় দেখি এখন লীলা-লাবণ্যময়ী প্রকৃতির বিচিত্র খেলার বিপুল আয়োজন! এই আয়োজনের মধ্যে, এই মহামেলার মধ্যে আমি আপনাকে হারাইয়া ফেলি—শুধু তোমার সুখ, তোমার মঙ্গল, তোমার চিন্তাতেই হৃদয় ভরিয়া উঠে। তারপর যদি 'আমিই' হারাইয়া গেলাম তবে দাসত্ব বুঝিব কেমন করিয়া? এ দাসত্বকে তোমরা কি বলিবে জানিনা কিন্তু আমরা বলিব—এই

আকাঙ্ক্ষিত সুকৃতি-লব্ধ অবস্থার নামই প্রেম—ভক্তি বা স্নেহ! মানুষের সমাজে সংসারী মানুষের মত তপস্যা যদি কিছু থাকে তাহার প্রারম্ভ ক্ষেত্রই এই স্থানে। যাহার জন্য নিষাধরাজ নলের পায়ে আত্ম বিক্রয় করিয়া, দময়ন্তী স্বর্গ ভুলিয়াছিলেন, ইন্দ্রত্ব ভুলিয়াছিলেন; যাহার জন্য রামময়-জীবিতে বৈদেহী আমরণ. এমন কি জন্ম জন্মান্তরের জন্যও অশেষ দুঃখের কারণ শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায়, পতি কামনা করিয়াছিলেন। এ সুখ সংসারীর পক্ষে অমূল্য ধন। ইহার আর শেষ নাই। ইহার বিচ্ছেদেও সুখ, মিলনেও সুখ. জীবনেও সুখ,—মরণেও সুখ। এখানে পিপাসার তীব্র জ্বালা নাই, আবার ভোগেও তৃপ্তি নাই, কিম্বা তাহা কাম্য নয়;—তাই "জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু নয়ন না তিরপিত ভেল" বলিলেও হৃদয়ে তৃষ্ণার জ্বালা নাই! তাহা ভোগের অতৃপ্ত কামনা হইলেও স্বার্থ বিবর্জ্জিত।

দুইটী হৃদয় যখন পরস্পর প্রেমে আবদ্ধ হয় তখন তাহা 'কামনা-বিবর্জ্জিত থাকে না একথা' খুবই সত্য। প্রথম অবস্থার মিলনের আশা সুখ, প্রতিদানের ন্যায্য-দাবি নিরন্তর প্রাণে আকুলতার সঞ্চার করে। ইহা হইতেই মান অভিমান আরও কত কি আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু এই পরস্পর-সাপেক্ষ হৃদয়-বন্ধন ক্রমে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতে থাকে। এখানে স্বার্থ-সুখ যদি কেহ বিসর্জ্জন দিতে না পারেন তবে এই সুখের হাটও ভাঙ্গিয়া চুরিয়া হাহাকারে পূর্ণ হইয়া যায়। আর যেখানে প্রকৃত প্রীতি-বন্ধন দুইটী হৃদয়কে বাঁধিয়াছে, যেখানে স্বার্থ-সুখ বিসর্জ্জিত হইয়াছে, সেখানে বিচ্ছেদের বেদনা তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। যদিই বা সেই যবনিকা দুই হৃদয়কে আড়াল করিয়া দাঁড়ায়, যদিই বা নিরাশার গাঢ় তিমিরে মিলনের আশাকে ঢাকিয়া ফেলে, তথাপি সে প্রেমের বাতি নিবিয়া যায় না;—আরও উজ্জ্বল হইয়া,—আরও স্নিগ্ধ হইয়া—আরও করুণ হইয়া ভাতিয়া উঠে। —কেন এমন হয়? কে বলিবে, কেন এমন হয়! যাহা পাইবার নয় মানুষের মন তাহাই পাইবার জন্য আরও ব্যাকুল হইয়া উঠে, এটা তার স্বভাব। 'পাইব না' বলিয়া ব্যথিত হৃদয়ের শান্তির জন্য অসার বস্তুকে

আশ্রয় করা প্রেমের ধর্ম্ম নয়। প্রেম যখন বিরহানলে পুড়িতে থাকে তখন প্রিয়তমের স্মৃতিই সে আগুনে শীতল বারি সিঞ্চন করে, আবার —"কোথায় যায় মিলিয়া সে মিলনের হাসে চুম্বনের পাশে হারায়ে।" এক হৃদয় বিভিন্ন হইয়া যখন সরিৎ সাগরের ব্যবধান আনয়ন করে, তখন মানুষ হৃদয়ের টানে অসাধ্য সাধনে তৎপর হইয়া উঠে এবং অনেক স্থলে মিলন আশায় বঞ্চিত হইয়া বিচ্ছেদের মধ্যেই সুখের পূর্ণতা খুঁজিয়া বেড়ায়। যে নিজে পূর্ণ তাঁহার রাজ্যে অপূর্ণ কিছুই থাকে না সুতরাং এ ব্যাকুলতা ব্যর্থও হয় না। তখন প্রেমিক বা প্রেমিকা বঞ্চিত হৃদয়ের বেদনাময় অশ্রু দিয়া নিষ্কাম প্রেমের পূজা করিতে শিখে। তখন সে সকল শক্তি দিয়া প্রিয়তমের স্মৃতির পূজা করিয়া, তাহার মঙ্গলাচরণ করিয়াই পরম পরিতৃপ্তি পায়। এ রাজ্যে আসিলে আর পিপাসা নাই—কেবলই শান্তি, গরল নাই—কেবলই অমৃত। রূপের নয়নে তখন আর চপলার হাসি থাকে না, প্রভাত-শিশির-স্নাত রক্তোৎপলের ন্যায় মধুময় সৌরভ ছড়াইয়া অমৃত সরোবরে ভাসিতে থাকে। সেই উন্মত্ত আবেগ-চঞ্চল হৃদয় আজ প্রশান্ত ভাবে প্রীতি-কুসুমের অঞ্জলি লইয়া প্রিয়তমের নিষ্কাম পূজায় বসিয়া যায়! তখন প্রিয়তম আর দূরে নয় অতি নিকটে ঐ ব্যথিত হিয়ার শূন্য সিংহাসন অধিকার করিয়া বসে। এরূপ নিবিড় মিলনের পর, এরূপ পরিপূর্ণ পাওয়ার পর আর বিচ্ছেদের ভয় থাকে না; তখন কেবলই মিলন— অসীম অনন্ত মিলন এই ক্ষেত্রে, মিলিয়া, সেই চির অনন্তের সঙ্গে নিজেকে বিলীন করিয়া দেয়। এবং মানুষ-জন্মের তপস্যা, গৃহীর তপস্যা শেষ হয়। এই তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করিয়াই সীতা-সাবিত্রী, সুভদ্রা-দময়ন্তী, পদ্মিনী আমাদের পূজনীয়া। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি সে আদর্শ যদি কেহ হৃদয়ের আরাধ্য করিতে পারেন তিনি ভাগ্যবতী। শুধু তাই নয় তিনিই আমাদের পূজনীয়া ভারতনারী, তিনিই আমাদের বরাভয়দায়িনী স্নেহময়ী জননী। আমরা পূজা করিতে জানি, মাথা নীচু করিতে জানি; যাঁহারা এই মাতৃহারা সন্তানদের জননী হইতে পারিবেন, এস মা! আজ সসম্ভ্রমে মন্দির দ্বার

খুলিয়া দিতেছি! এসগো জননী! আজ শক্তিরূপিণীর পূজা করিয়া ধন্য হইব। আর একটী বীরবাণীর উল্লেখ করিয়া আজিকার মত বিদায় মাগিতেছি:—"India cannot be killed... ...so as her people do not give up the God of India."

মায়া।

(শ্রীনিরঞ্জন সেনগুপ্ত।)

আপনি রচিনু জাল খেলায় খেলায়,
শেষে হেরি উহা মোরে বাঁধে হাত পায়।
পালাইতে যত চাই চেপে ধরে তত,
সেই তত কড়া হয় কোমল যে যত।

"নাহি-অবসর।"

(শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়)

জীবন প্রভাতে করিয়াছ যাহা
জীবন সন্ধ্যায় কি ভাবিছ তাহা
এ'ত নয় হে মানব? চিন্তার সময়
তরী তব বাঁধা ঘাটে, বড় অসময়।
দীর্ঘদিন গেল চলি এক এক করি
বৃথা কাল কাটাইলে না ভজিলে "হরি"
অশ্রুজল বক্ষ ধৌত মিছা এবে কর
চিন্তা করিবার আর নাহি অবসর।

দেশের কাজ।*

(স্বামী প্রজ্ঞানন্দ—"ভারতের সাধনা"র লেখক)

আজকাল আমাদের দেশের যুবকগণ দেশের কাজ করিবার জন্য একটা প্রবল অকৃত্রিম উৎসাহ অনুভব করিয়াছে। এই উৎসাহ তরঙ্গে দেশের পুঞ্জীকৃত তমোভাব ক্রমশঃ কাটিয়া যাইবে বলিয়া আশা হয়। অতএব এই উৎসাহ যাহাতে ম্লান না হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়, সেরূপ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

---

* প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে, ১৩১৯ সালের শেষ ভাগে লেখক যখন "উদ্বোধন"-পত্রে "ভারতের সাধনা" শীর্ষক প্রবন্ধ পর্য্যায় লিখিতে আরম্ভ করেন, তখন কতিপয় বন্ধুর সহিত আলোচনা-প্রসঙ্গে সংক্ষেপে স্বীয় মত ব্যক্ত করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি প্রবন্ধাকারে ইহা লিপিবদ্ধ করেন। বলা বাহুল্য সাধারণে প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে ইহা লিখিত হয় নাই; বন্ধুবর্গের অনুরোধে "ভারতের সাধনা"য় আলোচিত মত-বিশেষের সংক্ষেপ পূর্ব্বাভাষ দেওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল- প্রবন্ধ শেষে লেখক নিজেই তাহা বলিয়াছেন। ঐরূপ করিতে যাইয়া প্রবন্ধারম্ভেই লেখক দেশের তদনীন্তন রাজনৈতিক অবস্থা ও রাজনৈতিকগণের যুক্তি ও মতবাদের সংক্ষেপ অবতারণা করিয়া উহাদের সমালোচনা ও দেশের প্রকৃত উন্নতি সাধন কল্পে উহাদের অকিঞ্চিৎকরত্ব প্রতিপাদন করিয়া স্বীয় মত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি যে সকল কথার আলোচনা করিয়াছেন, বহুধা পরিবর্ত্তিত দেশের বর্ত্তমান কালের অবস্থার সহিত অনেকাংশে তাহার গরমিল থাকিলেও, লেখকের এই দীর্ঘকাল পূর্ব্বে চিন্তা ধারায় মূলতঃ বর্ত্তমান অবস্থায়ও আমাদের যে অনেক ভাবিবার ও বুঝিবার বিষয় আছে, প্রবন্ধপাঠে পাঠক নিজেই তাহা নিঃসন্দেহে দেখিতে পাইবেন। আমরা দীর্ঘকাল পরে জনৈক বন্ধুর নিকট হইতে লেখকের স্বহস্ত লিখিত এই প্রবন্ধটী পাইয়া "উদ্বোধনে" প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি,—তাহার কারণ, ইহাতে লেখক-পোষিত মত-বাদের মূল ধারাটীর একটী সরল সুস্পষ্ট চিত্র অঙ্কিত আছে, এবং ইহা পাঠ করিয়া লইলে "ভারতের সাধনায়" বিবৃত বিষয় সকলের অনুধাবনও বোধ অনেকটা সুগম হইবে বলিয়া বোধ হয় ইতি। উঃ সঃ।

কিন্তু প্রশ্ন এই যে, দেশের কাজ কি তাহা সুনিশ্চিতরূপে স্থির করা হইয়াছে কি না? এই প্রশ্নের বিচারে প্রথমতঃ দেখা যাউক, যে সম্প্রতি দেশের কাজ বলিতে দেশের অধিকাংশ লোক কি বুঝিতেছেন।

দেশের কাজ বলিতে আজকাল অনেকে অনেক রকম বুঝেন। তবে মোটামুটি ইঁহাদিগকে তিনটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত করা যায়; যথা:—

(১) দেশের কাজ বলিতে এক সম্প্রদায় যাঁহারা কংগ্রেস করেন, তাঁহারা এই বুঝেন যে—ইংরাজ নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাজনীতিক সাধনায় দেশের লোককে একযোগ করা এবং সঙ্গে সঙ্গে শিল্প, সমাজ, শিক্ষা প্রভৃতির সংস্কারে সচেষ্ট থাকাই দেশের কাজ।

(২) দেশের কাজ বলিতে আর এক সম্প্রদায় এই বুঝেন যে, প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতাকে কালের উপযোগী করিয়া দেশে প্রতিষ্ঠিত করিবার সমবেত চেষ্টাই দেশের কাজ।

(৩) তৃতীয় সম্প্রদায় পাশ্চাত্য নেশনের ইতিহাস ও স্বরূপ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন যে, স্বাধীন রাজশক্তি বা ষ্টেটের অস্তিত্বই একটা দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির মূল উৎস, অতএব তাঁহারা দেশের কাজ বলিতে বুঝেন স্বাধীন শাসন-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হওয়া।

আমাদের দেশের যে সমস্ত যুবক অকৃত্রিম অনুরাগ ও পূর্ণ স্বার্থ-ত্যাগের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া দেশের কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহারা সম্প্রতি কংগ্রেসের কার্য্যপ্রণালীর উপর কোন আস্থাই রাখে না। অতএব, ১ম সম্প্রদায়ের কথা এখানে আলোচনা করার দরকার নাই।

২য় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিস্থানীয়া ছিলেন সিষ্টার নিবেদিতা। এ সম্প্রদায়ের অনেক ধীসম্পন্নলোক সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত রহিয়াছেন। ইঁহারা প্রাচীন শিল্পকলা, সাহিত্য, ইতিহাস, প্রভৃতির পুনরুদ্ধারে বিশেষ ভাবে যত্নবান। ইঁহারা বলেন যে আমাদের প্রাচীন সভ্যতার প্রত্যেক অঙ্গ যদি আমরা পুনরায় অনুশীলন করিয়া যাই, তবে ভারতে আবার নেশন গড়িয়া উঠিবে। প্রার্থিরূপেই হউক বা বিরোধিরূপেই

হউক, ইংরাজ রাজার সঙ্গে সংশ্রব রাখা ইঁহারা আবশ্যক মনে করেন না। ইঁহাদের অভিপ্রায় এই যে প্রাচীন সভ্যতার পুনরুদ্ধার কল্পে দেশশুদ্ধ লোক একযোগ হইয়া উঠুক, একটা নেশনের সূচনা হউক, তার পর রাজশক্তিরূপ নেশন-অঙ্গের প্রসঙ্গ উঠিবে।

এই দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের মতামত পরে বিচার করিব। অগ্রে তৃতীয় সম্প্রদায়ের কথা আলোচনা করা যাউক। তৃতীয় সম্প্রদায় বলেন যে, ইংরাজের দাসত্বমোচন করাই প্রকৃত দেশের কাজ। ইঁহাদের মতামত প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বিশদভাবে বুঝিয়া দেখা যাউক।

প্রঃ—ইংরাজের দাসত্বমোচন মানে কি?

উঃ—দেশের শাসনভার বিদেশীর হাত থেকে কাড়িয়া লইয়া স্বদেশীয়দের হস্তে অর্পণ করা।

প্রঃ—অর্থাৎ প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন, যেমন?

উঃ—হাঁ।

প্রঃ—স্বায়ত্ত-শাসন পাইলেই কি আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধিত হইল?

উঃ—না; কল্যাণ সাধনের পথ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হইল। কল্যাণের পথ উন্মুক্ত করিবার জন্যই দাসত্ব-মোচন করা আবশ্যক। রাজনৈতিক দাসত্ব থাকিতে স্থায়ী-কল্যাণের সম্ভাবনা নাই।

প্রঃ—কেন নাই।

উঃ—ইংরাজ ভারতে নিজের স্বার্থপোষণের জন্য রাজত্ব করে; সেই স্বার্থের অনুরোধে দেশে শান্তিরক্ষা করে। কিন্তু আমাদের ঐহিক উন্নতি, তাহার স্বার্থে আঘাত করিবেই, কারণ আমাদের ঐহিক কল্যাণ ও তাহাদের ঐহিক কল্যাণ পরস্পর বিরোধী। বৈদেশিক শাসন কর্ত্তৃত্ব আমাদের ঐহিক কল্যাণের পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এ অবস্থায় ঐ শাসন কর্ত্তৃত্বের উচ্ছেদ না করিলে আমরা প্রকৃত ভাবে অগ্রসর হইতে কোন মতেই সক্ষম হইব না।

প্রঃ—তাহা হইলে আপনার কথায় দাঁড়াইতেছে এই যে, ঐহিক

কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে গেলেই প্রথমতঃ স্বায়ত্ত-শাসন বা স্বাধীনতা লাভ করাই আবশ্যক হয়।

উঃ—হাঁ, তাহাই বটে; জগতে যেখানেই অধুনা কোনও নেশন গড়িয়া উঠিতেছে, সেখানেই দেখিতেছি তাহাদের ঐহিক কল্যাণের মূলে স্বাধীন রাজশক্তি বিদ্যমান। স্বাধীনতা না থাকিলে ঐহিক কল্যাণের পথে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব।

প্রঃ—যদি আমাদের দেশ, কেবল যতদূর পর্য্যন্ত যাইলে ইংরাজের সহিত বিরোধ না হয়, ততদূর পর্য্যন্তই ঐহিক কল্যাণের পথে অগ্রসর হয়?

উঃ—যদি তাই হয়, তবে অচিরে আমাদিগকে মরিতে হইবে, কারণ, ইংরাজের গোলাম থাকিয়াই যদি আমরা সন্তুষ্ট থাকি, তবে একটা প্রাচীন দেশ বলিয়া—আমাদের কোনও বিশেষত্ব থাকিবে না; উদরান্নের জন্য ক্রমশঃই একটা হীন দাসজাতিতে আমরা পরিণত হব। আধুনিক জগতে কেবলমাত্র ইংরাজের দাস বলিয়াই যদি আমাদের পরিচয় হয়, যদি আধুনিক জগতে আর কোনও কার্য্য আমাদের না থাকে, বলিতে হইবে আমরা মরিয়াছি, আমাদের স্বরূপ আর নাই।

প্রঃ—তাহা হইলেই দেখিতেছি মরণ-বাঁচনের কথা আসিয়া পড়িল। আপনার যুক্তি এই যে, বাঁচিতে হইলেই আমাদিকে ঐহিক কল্যাণের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে, এবং ঐ পথে অগ্রসর হইতে গেলেই পথরোধকারী ইংরাজ-শাসন বিনষ্ট করিতে হইবে। আচ্ছা তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে "আমরা বাঁচিব"—এই কথাটীর অর্থ কি?

উঃ—আর পাঁচটা নেশন জগতে যেমন বাঁচিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, আমরাও সেইরূপ দাঁড়াইব। অবশ্য "আমরা বাঁচিব" অর্থে আমাদের পূর্ব্ব-স্বরূপ বজায় রাখিয়া দাঁড়াইব ইহাই বুঝায়। নতুবা যে "আমরা" পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে ভালমন্দ নানা ভাবে ইতিহাসে আত্মপরিচয় দিয়াছি, সেই "আমরা" যদি সম্পূর্ণ বদ্‌লাইয়া যাইয়া একটা স্বাধীন নেশন গড়ি, তবে বলিতে হইবে যে একটা নূতন নেশন ভারতে গড়িয়া উঠিল।

প্রঃ—তাহা হইলে আপনার মতে দেখিতেছি তিন রকম পরিণতি ভারতবাসীদের ঘটিতে পারে :—

১ম, সম্পূর্ণ ইংরাজ-কৃপাজীবী দাসজাতিরূপ পরিণাম; ২য়, সম্পূর্ণ নূতন ভাবে গঠিত স্বাধীন জাতিরূপ পরিণাম ও ৩য়, আমাদের ঐতিহাসিক সনাতন স্বরূপ বজায় রাখিয়া জগতে স্বাধীন হইয়া বাঁচিয়া থাকা। এই তিনটি পরিণামের মধ্যে আপনার কিরূপ পরিণাম অভিপ্রেত?

উঃ—যে রূপেই হউক, আমি চাই ভারতবর্ষ বাঁচিয়া থাকে,—প্রথম পরিণামটিকেই আমি মৃত্যু বলিয়া গণ্য করি। যদি ঐরূপ ভাগ্যকে আমরা বরণ করিতে না চাই, তবে আমাদের সনাতন স্বরূপ বজায় রাখিয়া স্বাধীন হইতে গেলেও ইংরাজ শাসন ঘুচাইতে হইবে, এবং সেই স্বরূপ বদলাইয়া স্বাধীন হইতে গেলেও, ইংরাজ শাসন ঘুচাইতে হইবে।

প্রঃ—বেশ কথা। যদি ধরুন আপনি পূর্ব্ব-স্বরূপ বজায় না রাখাই শ্রেয়ঃ মনে করেন, তবে স্বাধীনতা লাভের চেষ্টায় "আমরা" শব্দটি কি অর্থে ব্যবহার করিবেন?

উঃ—তখন "আমরা" বলিতে বুঝিব, যাহারা স্বাধীনতার চেষ্টায় একযোগ হইতেছেন। তাহারাই শেষে নূতন জাতি বা নেশনের প্রতিষ্ঠা করিবেন।

প্রঃ—তাহা হইলে আপনার মতে আমাদের দেশের লোককে ঐহিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে ইংরাজ-শাসন ধ্বংস করিতে একযোগ করা সম্ভবপর এবং একযোগ করিবার সময় দেশের কর্ম্মীদের পূর্ব্ব-স্বরূপ আলোচনা করিবার কোনও প্রয়োজন নাই।

উঃ—পূর্ব্ব-স্বরূপ বিচার করিবার এইটুকু প্রয়োজন যে তাহাদের প্রকৃতিতে যুগযুগের সংস্কার বশতঃ এমন একটা নির্দ্দিষ্ট খাত গড়িয়া গিয়াছে যে, উৎসাহ বা উদ্দীপনাকে স্থায়ীভাবে সেই প্রকৃতিতে অনু-প্রবিষ্ট করিয়া দিতে হইলে, সেই নির্দ্দিষ্ট খাতটি অবলম্বন করিতে হইবে। তাহা না করিলে দেশের লোকের কাছে কাজ আদায় করা যাইবে না। সেইজন্য ইংরাজ-শাসন বিধ্বস্ত করিবার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গেই যথাসম্ভব পরমার্থ ভাব অনুস্যূত করিয়া দিতে হইবে।

প্রঃ—তাহা হইলে আপনি আমাদের পূর্ব্ব-স্বরূপের খেয়াল রাখা আবশ্যক মনে করেন ?

উঃ—হাঁ, মনে করি। কিন্তু যতটুকু উপস্থিত কার্য্যের জন্য দরকার, কেবল সেইটুকু খেয়াল রাখাই আমার অভিপ্রায়। স্বাধীনতার সেবকদের মধ্যে যে ক্ষেত্রে যেরূপ ভাবে, বা খাতের ভিতর দিয়া উদ্দীপনা জাগাইয়া রাখা সম্ভব, সেই ভাব বা খাত দিয়াই সেখানে শক্তি সঞ্চার করিতে হইবে।

প্রঃ—তাহা হইলে সংক্ষেপে আপনার মত এই যে, আমাদিগকে বাঁচিতেই হইবে,—বাঁচিতে হইলেই আমাদিগকে ঐহিক কল্যাণ খুঁজিতে হইবে,—ঐহিক কল্যাণ খুঁজিতে হইলেই উহার পথ উন্মুক্ত করিবার জন্য ইংরাজ শাসন ঘুচাইতে হইবে ; অতএব ইংরাজ শাসন ঘুচাইবার চেষ্টাই প্রকৃত দেশের কাজ। ঐ কাজের অনুরোধেই যেখানে যতটুকু পূর্ব্ব সংস্কারের সহায়তা লওয়া আবশ্যক, সেখানে ততটুকু লইলেই চলিবে।

দাসত্ব মোচনপ্রয়াসী প্রাগুক্ত তৃতীয় সম্প্রদায়ের মতামত প্রশ্নোত্তর-চ্ছলে বিশদভাবে প্রকাশ করা হইল। ইঁহাদের যুক্তির তিনটী সোপান রহিয়াছে, আমরা দেখিয়াছি,—প্রথম সোপান, আমাদিগকে বাঁচিতে হইবে।

যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে "আমরা বাঁচিব" বলিলেই ত চলিবে না, কেমন করিয়া বা কি হইয়া বাঁচিব তাহা বল। তখন উত্তর পাই, 'আর পাঁচটা নেশন যেমন করিয়া বাঁচিয়া জগতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।' এই উত্তরের মধ্যেই গোল রহিয়া গিয়াছে। আমগাছ বাঁচে, আমগাছ থাকিয়াই ; তালগাছ তালগাছ থাকিয়াই বাঁচে। জগতের আর পাঁচটা নেশন প্রত্যেকেই নিজের নিজের স্বরূপ লইয়া বাঁচে ; আমাদিগকে বাঁচিতে হইলে প্রথমেই দেখিতে হইবে—আমাদের স্বরূপটা কি, অর্থাৎ আমরা কি ছিলাম, কি আছি এবং কি হইব। জগতে প্রত্যেক নেশনই মানব সমষ্টির উপস্থিত বা স্থায়ী কল্যাণের জন্য কিছু-না-কিছু দিবার

জন্যই বাঁচে। জগতে কি দিবার উদ্দেশ্যে আমরা বাঁচিব, আমাদের বাঁচার লক্ষ্য কি—তাহা অগ্রেই স্থির করিয়া তবে বাঁচিবার চেষ্টা করিলে ঠিক্ ঠিক্ বাঁচা বা বাঁচিবার পথে যাওয়া সম্ভবপর। নচেৎ বাঁচিব বলিয়া সামনে দৌড় দিলেই বাঁচিবার পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। যেমন আম দিবার জন্য আমগাছ বাঁচে, আমগাছ হইয়া ; তাল দিবার জন্য তালগাছ বাঁচে তালগাছ হইয়া ; তেমনি যাহা দিবার জন্য আমরা বাঁচিব তাহাই নির্ণয় করিয়া দিবে—আমাদের বাঁচিবার রকম বা ধাঁজটী কি,—আমাদের নেশনরূপে একযোগ হওয়ার বিশেষত্ব কি।

আমরাও সহস্রবার স্বীকার করি যে আমাদিগকে বাঁচিতে হইবে ; কিন্তু আমরা বাঁচিব বলিতে কাহারা বাঁচিবে বুঝায়, তাহা সর্ব্বাগ্রে বুঝিয়া দেখা আবশ্যক মনে করি। প্রশ্ন এই যে আর পাঁচটা নেশন যেমন করিয়া বাঁচে, আমরাও কি তেমন করিয়া বাঁচিব? উত্তর এই যে, নেশনরূপে বাঁচার মধ্যে সকলেরই এক জায়গায় মিলও আছে, আবার এক জায়গায় গরমিলও আছে ; যেমন বৃক্ষজীবনে বৃক্ষত্ব হিসাবে সকলেরই মিল আছে, আবার—ফল-ধারণ হিসাবে—ফল প্রসবরূপ লক্ষ্য-সাধনে—সকলের মধ্যে গরমিলও আছে। নেশনের নেশনত্ব—নিজ শক্তিতে একযোগ হইয়া একলক্ষ্য সাধনে ; এই নেশনত্বের হিসাবে সব নেশনকেই একরূপ হইতে হইবে,—প্রত্যেকের বাঁচায় এই জায়গায় মিল ; কিন্তু গরমিল এইখানে যে, কে কিরূপ লক্ষ্যসাধন করে,—এই লক্ষ্যসাধনের হিসাবে বাঁচায় প্রভেদ রহিয়াছে। সেইজন্য "আর পাঁচটা নেশন যেমন বাঁচিয়া জগতে দাঁড়াইয়াছে, আমরাও সেইরূপ বাঁচিয়া জগতে দাঁড়াইব"—এই সংকল্প-বাক্যের প্রকৃত অর্থ এই যে—"আর পাঁচটা নেশন যেমন নিজ শক্তিতে একযোগ হইয়া একলক্ষ্য-সাধনে দণ্ডায়মান, আমরাও সেইরূপ নিজশক্তিতে একযোগ হইয়া একলক্ষ্য-সাধনে দণ্ডায়মান হইব।" রাজনৈতিক স্বায়ত্ত-শাসন-প্রয়াসীদের যুক্তির প্রথম সোপানটি আমরা এই ভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া বলিতে চাই।

উহাদের যুক্তির দ্বিতীয় সোপান কি? না, "বাঁচিতে গেলেই ঐহিক

কল্যাণ খুঁজিতে হইবে।" বেশ কথা। নেশনের পক্ষে বাঁচা কাহাকে বলে, তাহা আমরা দেখিয়াছি। এই দ্বিতীয় স্বরটীকে আমাদের পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট ছাঁচে ফেলিলে, কথাটা দাঁড়ায় এই,—"বাঁচিতে গেলেই, অর্থাৎ নেশনরূপে নিজশক্তিতে একযোগ হইয়া একলক্ষ্যসাধনে দাঁড়াইতে গেলেই, ঐহিক কল্যাণ খুঁজিতে হইবে।"

কথাটী কি ঠিক? উত্তর—না। কারণ, নেশন হইয়া বাঁচা মানেই দেখিতেছি দুইটী ব্যাপার,—প্রথমটী নিজশক্তিতে একযোগ হওয়া, দ্বিতীয়টী একলক্ষ্য স্থির থাকা। অতএব লক্ষ্য যতদিন না স্থির হয়, ততদিন অগ্রসর হওয়াই ভ্রান্তি। সর্ব্বাগ্রে লক্ষ্যটী স্থির করিতে হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে উহাকেই উদ্দেশ্য করিয়া আমাদিগকে নিজের চেষ্টায় একযোগ হইতে হইবে; তারপর একযোগে লক্ষ্যসাধন করিতে গেলেই কি কি বস্তুর প্রয়োজন, বা অভাব ঘটে—ঐহিক কল্যাণ, না আর কিছুর—তাহা বুঝিয়া দেখিতে হইবে। যে পর্য্যন্ত লক্ষ্যই স্থির নাই, এবং নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যকে ধরিয়া একযোগ হইবার চেষ্টাও আমাদের মধ্যে নাই, সে পর্য্যন্ত প্রকৃতপক্ষে বাঁচিবার উদ্যোগই আমাদের মধ্যে আসে নাই। বাঁচিবার উদ্যোগ আসিলে, তবে ত দেখিব বাঁচিবার জন্য ঐহিক কল্যাণ বা আর কিছু আমাদের দরকার কিনা।

নেশনরূপে বাঁচা মানেই একলক্ষ্যসাধনে নিজশক্তিতে একযোগ হইয়া থাকা। আমরা বাঁচিতেছি, কি না বাঁচিতেছি, কিম্বা আমরা কেমন করিয়া বাঁচিতেছি, ইহা সর্ব্বাগ্রে না বুঝিলে বাঁচিবার যথার্থ উদ্যোগই আসিতে পারে না। বাঁচিবার উদ্যোগ আসিলে তারপর দেখা, দরকার যে আমাদের বাঁচিতে গেলে প্রথমেই কি প্রয়োজন—ঐহিক কল্যাণ বা আর কিছু।

অতএব প্রথমেই জিজ্ঞাস্য যে, কি লক্ষ্যসাধনে আমরা নিজশক্তিতে একযোগ থাকি বা থাকিতে পারি। এই খানেই আমাদের সনাতন স্বরূপটীর কথা আসিয়া পড়ে। ইতিহাস প্রমাণ করে যে, পরমার্থরূপ লক্ষ্যের সাধনায় আমরা প্রাচীনতমযুগে নিজ শক্তিতে একযোগ

হইয়াছিলাম। তারপর কালের করাল প্রবাহে সেই পরমার্থ-লক্ষ্য আমরা বুকে আঁকড়াইয়া পড়িয়া আছি বটে, কিন্তু একযোগের ভাবটি বারম্বার ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছে এবং নিজশক্তিতে একযোগ হওয়াও আর ঘটিয়া উঠে নাই। আমাদের লক্ষ্যটীই ঠিক যাহাদের লক্ষ্য নহে, এরূপ অনেকেই—যথা বৌদ্ধ, মুসলমান বা ইংরাজ—আমাদিগকে একযোগ করিতে গিয়াছে বটে, কিন্তু সে আমাদের বিশেষ লক্ষ্যটীর সাধনায় নহে। আর যাহাদের লক্ষ্য, তাহাদেরই নিজশক্তিই একযোগ করিতে প্রযুক্ত হওয়া চাই। তাহাও প্রাচীন যুগের পর আর ঘটিয়া উঠে নাই।

তাহা হইলে পরিষ্কার বুঝা গেল যে পরমার্থরূপ লক্ষ্যের সাধনোদ্দেশ্যে আমাদিগকে নিজশক্তিতে একযোগ হইয়া সর্ব্বাগ্রে দাঁড়াইতে হইবে। একযোগ হইয়া দাঁড়াইবার পর, সেই লক্ষ্য সাধনায় যে বিঘ্ন আসে তাহা সরাইতে হইবে, যে অভাব ঘটে তাহা মোচন করিতে হইবে।

"পেটে খেতে না পেলে আমরা বাঁচিব কি করে"—এই কথাটীতে বেশ একটা চটক্ আছে; তাই রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রয়াসীদের মুখে কথাটী শুনিয়াই প্রথমে মনে হয়—ঠিকই ত বটে। কিন্তু বাপুহে 'পেটে খেতে পাওয়া' ও 'জীবন ধারণ করা' একার্থবাচক নহে; ব্যাধিতে প্রাণ লইয়া এমন টানাটনি পড়িতে পারে যে, তখন জল-সাগু ছাড়া খাদ্যই দেওয়া যায় না। যে সুস্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে সেই 'পেটে খাবার' অধিকারী। যে মৃত্যুশয্যা থেকে বেঁচে উঠিল, তার জন্যই অন্ন পথ্যের ব্যবস্থা করা যায়। তোমরা যে যুগ যুগ ধরিয়া মৃত্যুশয্যায় পচিতেছে, তাহা বিধাতা চোখে অঙ্গুলি দিয়া আর কত বুঝাইবেন? সেই জন্য আর বৃথা সময় নষ্ট করিও না, আগে নেশন-শরীরের শীর্ণতার দিকে না চাহিয়া, উহার প্রাণ রক্ষার ব্যবস্থা কর, আগে প্রকৃতপক্ষে বাঁচিয়া উঠ, আগে চিরন্তন লক্ষ্যটী গ্রহণ করিয়া নিজশক্তিতে একযোগ হও, তারপর বাঁচিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেই, 'পেটে খাবার' যথেষ্ট ব্যবস্থা করা হইবে। এখন শতকরা ২৫টা লোক অন্নকষ্টে মরিতেছে

বলিয়াই কি দিশাহারা হইয়া রুগ্ন নেশনটার পেটে অন্ন ঠাসিবার জন্যই কেবল ব্যস্ত হইবে? রোগটা যে প্রাণ লইয়া, পেট লইয়া ত নহে। নেশনের প্রাণ হইতেছে নিজলক্ষ্য সাধনায় নিজশক্তিতে একযোগ হওয়া; এই প্রাণটা পরিপুষ্ট কর, এই প্রাণটা রাখিবার ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে কর, তারপর স্বাভাবিক পথের ব্যবস্থা যথাসময়ে হইবে। যদি প্রাণটী বাঁচাইবার সন্ধান পাইয়া থাক, তবে এখন শতকরা দেশে ৪০টা মরিলেই বা ক্ষতি কি; আর যদি প্রাণটা বিদায় লইতে থাকে, তবে মুখে মুখে পায়সান্ন গুঁজিবার যোগাড় করিতে পারিলেও কোনও ফল নাই।

"আমরা বাঁচিব" অর্থে বুঝায় যে আমরা সুস্থ হইয়া, জগতে নেশনরূপে জীবন ধারণ করিব। সুস্থ বা স্বস্থ হইতে হইলে আগে স্বলক্ষ্য স্থির হওয়া চাই; অতীত বুঝিয়া স্বলক্ষ্য স্থির হইলে, সকলে নিজ চেষ্টায়, পরের অপেক্ষা না রাখিয়া, একযোগ হওয়া চাই। পরমার্থরূপ লক্ষ্যসাধনোদ্দেশ্যে একযোগ হইবার পর বিবেচ্য—আমাদের লক্ষ্য-সাধনার পথে বিঘ্ন কি। বিঘ্নের কথা তখন আসিবে।

যদি বল বিঘ্নের কথা ত আগেই আসিয়া পড়িতেছে; ইংরাজ আমাদিগকে একযোট হইতে দিবে কেন? উত্তরে আমরা বলি,—ইংরাজ নিজের বিরুদ্ধে একজোট হইতে দিবে কেন? ইংরাজ দেশের রাজনীতি ক্ষেত্রটী সর্ব্বপ্রকারে অধিকার করিয়া বসিয়া আছে এবং পাশ্চাত্য ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব ও অভিজ্ঞতার ফলে এই বুঝিয়া নিশ্চিন্ত আছে যে, রাজনীতিই সর্ব্বপ্রকার অভ্যুদয়ের মূল, অতএব রাজনীতি ক্ষেত্রে আপনি ছাড়া আর কোন সমকক্ষ শক্তির অভ্যুত্থান না হইলে, তাহাদের প্রভুত্ব নিষ্কণ্টক থাকিবে; সেইজন্য তাহারা আমাদের আধ্যাত্মিক বা সামাজিক সাধনা বা অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করে না,—তাহারা মনে করে যে ভারতবাসীরা ধর্ম্ম লইয়া যত ইচ্ছা নাড়াচাড়া করুক, রাজনীতি-রূপ পক্ক ফলটীর উপর লোলুপ দৃষ্টি না করিলেই হইল। আবার এই পর্য্যন্ত আমরা রাজনীতি-ক্ষেত্রে দাঁড়াইবার স্থান পাইতে যে আন্দোলন-অভিযোগাদি করিয়াছি, যদি সত্য সত্যই সে

সমস্ত একেবারে পরিহার করিয়া, ঘোষণা করি যে পাশ্চাত্য রাজনীতিক সাধনা আমাদের জাতীয়তার অঙ্গীভূত নহে, আমাদের জাতীয় সাধনা সম্পূর্ণ পরমার্থিক, তবে ঐরূপ মতামত লইয়া একজোট হইতে ইংরাজের বাধা দেওয়া দূরে থাক, আবশ্যক মত সাহায্য পর্য্যন্ত পাওয়া যাইতে পারে,—কারণ তাহারা এইরূপ সম্প্রদায়ের উদ্ভবে বুঝিবে যে, রাজনৈতিক বিরোধী সম্প্রদায়ের হাত হইতে উহাদের সাহায্যে তাহারা নিস্কৃতি পাইবে।

সম্প্রতি ইংরাজ সকল রকম সমবেত সাধনাকেই সন্দেহের চক্ষে দেখে,—নিজেদের প্রতি সকল রকম সভাসমিতির ব্যবহার লক্ষ্য করে। কিন্তু ইহাতেও আমাদের ক্ষতি নাই, কারণ—যতদিন কেবল ধর্ম্ম লইয়া একজোট হওয়াই আমাদের আসল কাজ ততদিন ইংরাজের, সহিত ব্যবহারে বিরুদ্ধভাব পোষণ বা প্রদর্শন করার ত কোনও আবশ্যকতা বা সাফল্য নাই। আমাদের একযোগ হইবার চেষ্টায় ত কোনও বিদ্বেষভাব নাই—শুধু ধর্ম্মভাব ও সনাতন ধর্ম্মের প্রতি প্রাণপণ অনুরাগই বিদ্যমান। বিদ্বেষ ভাবের খাত থাকিতে ভারতীয় নেশনের গড়ন সুসম্পন্ন হইবে না।

এইখানে এ কথাও বলিয়া রাখা ভাল যে. পরামার্থরূপ লক্ষ্য ধরিয়া একযোগ হইবার পথে ইংরাজ যদি সত্যই দুর্লঙ্ঘ্য বাধাস্বরূপ দণ্ডায়মান হয়, তবুও রাজনীতিরূপ পরের কোটে দাড়াইয়া ইংরাজের সহিত শেষ সংগ্রাম করা অপেক্ষা নিজের কোটে দাঁড়াইয়া যুঝিতে যুঝিতে মরা ভাল। নিষাদতাড়িত হরিণ যখন মনঃপূত কোণটী অধিকার করিয়া মরণযুদ্ধ যুঝিতে দাঁড়ায়, তখন তাহার শরীরে দশটা হরিণের শক্তি বিদ্যুৎবেগে খেলা করে; তেমনি হে ভারতের, সনাতন ধর্ম্মের, আশা-স্থল যুবকবৃন্দ, তোমরা নিশ্চয় জানিও হাজার হাজার বৎসরের প্রাচীন সনাতনধর্ম্মের আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া সনাতন ধর্ম্মের জন্য তোমরা যদি মরিতে প্রস্তুত হও, তবে তোমাদের বাহুতে অলৌকিকশক্তির আবেশ হইবে এবং আরও যাহা হইবার সম্ভাবনা তাহা এখন বলিলাম না,—কেবল এইটুকু স্মরণ রাখিও, যে যদি মরিতে হয়, তবে এমন মরণ

তোমার পক্ষে আর নাই, যদি মরিতে হয় তবে যাহার আশ্রয়ে, যে সনাতন ধর্মের কোলে আমরা একদিন জীবন লাভ করিয়াছি, যেন তাহারই কোলে মৃত্যুশয়নে শায়িত হই—যে সনাতন ধর্মের জন্য কৃষ্ণার্জ্জুন, রাঘব, পরশুরাম প্রভৃতি জীবনপাত করিয়াছেন, যেন তাহার জন্যই আমরা মরিতে পাই। সেজন্য বলি যে যদি মরিতে হয় তবে সনাতন ধর্ম্মের নিজের কোটে দাঁড়াইয়া মরিব, পাশ্চাত্য রাজনীতির কোটে মরিতে যাইব কেন?

অতএব ইংরাজ যদি ধর্ম্ম লইয়া আমাদিগকে একজোট না হইতে দেয় তবে তাহারও সদুপায় আছে। অন্য ভাবে একজোট হইতে যাওয়াও আমাদের পক্ষে বাঁচা নহে; পরমার্থ লইয়া একযোগ হওয়াই আমাদের স্বরূপ। যদি জীবনে আমরা ঐ স্বরূপ লাভ না করি, অন্ততঃ মরণে করিব—বাধার সহিত সংগ্রামে মরিতে মরিতেও করিব।

আর একটা আপত্তি উঠিতে পারে এই যে পরমার্থ লইয়া দেশ শুদ্ধ লোককে কিরূপে এক করা যায়, কারণ দেশে নানা ধর্ম্মাবলম্বী লোক রহিয়াছে।

বর্ত্তমান যুগে যিনি, প্রথম ভারতীয় নেশন-গঠনের উপায় দেখাইয়া দেন, যিনি পরমার্থ লইয়া একযোগ হইবার জন্য প্রথম স্বদেশবাসীদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন, তিনিই—স্বামী বিবেকানন্দই, এই সমস্ত আপত্তি খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। আমরা এখানে তাঁহার দ্বারা প্রযুক্ত যুক্তির উল্লেখ করিব না—লেখা বিষমরূপে বাড়িয়া যাইবে। স্বামীজির জীবনে দেখিতে পাই, তিনি জগতের জন্য ঘোষণা করিয়াছেন—এক ভারতীয় পরমার্থতত্ত্বে সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয়ের সমাচার, এবং ভারতের জন্য ঘোষণা করিয়াছেন—সেই পরমার্থরূপ লক্ষ্যসাধনায় নেশন-নির্ম্মাণ। তাঁহার জীবনের এই দুইটী সমাচার যিনি সম্যকরূপে বুঝিবেন, তাঁহার পক্ষে এ আশঙ্কা হওয়া সম্ভব নয় যে পরমার্থ-লক্ষ্য ধরিয়া একজোট হইতে গেলেই, মুসলমান প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইবে। বরঞ্চ পরমার্থ-তত্ত্বটী যতই আমরা দেশের সম্মুখে প্রকটিত করিতে থাকিব ততই দেশের ধর্ম্মকলহ উপশমিত হইতে থাকিবে

এবং যে ব্যক্তি সেই তত্ত্বটী স্বীকার করিবে তাহার সাধনপথ ইস্লাম নির্দ্দিষ্ট হউক বা চার্চ্চ নির্দ্দিষ্ট হউক,—সে ব্যক্তি—আমাদের নেশন-গঠন কাজে যোগদান করিতে সমর্থ হইবে।

এতদ্ব্যতীত আর একটী কথা এই যে ইতিহাসে দেখিতেছি—সনাতন ধর্ম্ম হইতেই ভারতে প্রাচীন কালে সমাজ বল, শিক্ষা বল, বাণিজ্য বল, শৌর্য্য-বীর্য্য বল, যাহা কিছু মনুষ্যোচিত তাহাই উদ্ভূত হইয়াছিল। সেই সনাতন ধর্ম্ম এখনও বাঁচিয়া রহিয়াছে, আর আমরাও বুঝিয়াছি যে পরমার্থ বা সেই সনাতন ধর্ম্মের সাধনা লইয়াই—আমাদিগের মধ্যে দৃঢ় সমবায় গড়িয়া উঠা সম্ভব। এ অবস্থায় আমাদের উচিত কি? আমরা কি একটা কল্পিত বা বৈদেশিক নেশন আদর্শের অনুকরণ করিতে যাইয়া আমাদের প্রাচীন ভিত্তি পরমার্থসাধনকে বর্জ্জন করিব? আমরা কি সংখ্যার আধিক্য বজায় করিতে গিয়া, উদ্দীপনার একমাত্র উৎস, সনাতন নেশন-ভিত্তি পরমার্থ-সাধনকে পরিহার করিব? কখনই না। আমাদের উচিৎ, যথাসম্ভব সংখ্যার হ্রাস লইয়াই একযোগ হইবার জন্য ভারতের পক্ষে নিত্যসত্য পরমার্থভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হওয়া। তারপর এই দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলার মধ্যে, যদি প্রকৃত ভাবে একটা দৃঢ়িষ্ট সমবায় গড়িয়া উঠে এবং স্বামী বিবেকানন্দের মত উদ্দীপনা ও জ্ঞান সম্পদ যদি থাকে, তবে সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য আশঙ্কা নাই। এমন সহর এবং বড়গ্রাম নাই, যেখানে ঐ সমবায়ের প্রভাব অল্প সময়ের মধ্যেই সঞ্চারিত না হইতে পারে। তখন মুসলমানকে উহার মধ্যে অঙ্গীভূত না করিতে পারিলেও ক্ষতি নাই। আমাদের দেশের প্রধান অভাব সমষ্টি-বদ্ধতার; যে সঙ্ঘ যথার্থ সমষ্টিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার জনসংখ্যা অল্প হইলেও, অপরাপর সংঘের তুলনায় তাহার প্রতিপত্তি অনেক বেশী। অতএব পরে মুসলমান জাতি আসিবে কি না আসিবে, তাহা এখন ভাবিবার দরকার নাই; যদি আসে তবে তাহাদের পক্ষেই ভাল, সর্ব্বপ্রকারেই ভাল, আর যদি না আসে তবে তাহাদের স্বভাব পরিবর্ত্তিত করিয়া সনাতন ধর্ম্মাশ্রিত ভারতবাসী নিশ্চয়ই তাহাদিগকে আত্মসাৎ (absorb) করিয়া লইবে।

সুতরাং বেশ বুঝা যাইতেছে যে আমাদের দেশে দেশের কাজ বলিতে রাজনীতি বুঝায় না,—দেশের কাজ বলিতে আপাততঃ বুঝায় দেশের সনাতন লক্ষ্য ধরিয়া—দেশটাকে একযোগা করা, অর্থাৎ প্রকৃত ভিত্তিতে দেশটাকে Organise করা। পরমার্থ সাধনরূপ লক্ষ্য ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াই রহিয়াছে; এই লক্ষ্যের প্রচার চাই। দেশের লোককে লক্ষ্য স্বীকার করানর সঙ্গে সঙ্গেই লক্ষ্য সাধনার জন্য তাহাদিগকে বদ্ধ পরিকর করিতে হইবে এবং ঐ সাধনাকে উপলক্ষ্য করিয়া তাহাদিগকে একজোট করিতে হইবে। অগ্রসর হইবার পথ এইরূপে নির্ণীত রহিয়াছে।

কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন এই যে পথ নির্ণয় হইলেও, উহা দেশের যুবকবৃন্দের পক্ষে রুচিকর হইবে কি না; কারণ, পাশ্চাত্য ভাবের দ্বারা চিত্ত অনেকস্থলেই বিকৃত হইয়া গিয়াছে, তাহারা অনেকেই ধর্ম্মের বড় একটা ধার ধারে না, অথচ দেশের কাজ করিবার জন্য তাহাদের উৎসাহ অকৃত্রিম। এই সকল উৎসাহী যুবকের জন্য উপায় কি? উপায়—যথাসম্ভব মনোমত কাজের মধ্য দিয়াই উঁহাদিগকে পরমার্থ সাধনে ব্রতী করা। প্রকৃত পরমার্থ সাধনে সঙ্কীর্ণ গণ্ডি নাই, যার যেমন প্রকৃতি, উহাতে তা'র জন্য সেইরূপ সাধনপথ নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। অতএব অনেকেরই এ সম্বন্ধে নিরাশ হইবার কোনও কারণ নাই। এখন যুবকদের মনের অবস্থা ভাবিয়া দেখা যাক্,—দেখা যাক্ আমাদের নেশন-লক্ষ্যের সাধনায় ব্রতী হইবার পক্ষে তাহাদের প্রকৃতিগত বিঘ্ন কি আছে।

দেশে যখন ইংরাজ শাসন আরম্ভ হয়, তখন দেশের লোক একটা তমোভাবের দ্বারা অভিভূত হইয়াছিল, অবশ্য বেশী ভাগ লোকের কথাই বলা হইতেছে। স্বামী বিবেকানন্দ এই প্রবল তমোভাব দেখিয়া রজোভাবের দ্বারা উহাকে দূরীভূত করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তারপর ইংরাজ ও পাশ্চাত্য জাতিদের সঙ্ঘবদ্ধতার ভাব দেখিয়া এবং ইংরাজের স্বার্থান্ধতার বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া ঐ তমোভাবকে দেশের যুবকবৃন্দ অনেকটা বিনাশ করিয়াছে। সেইজন্য

আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে যুবকদের উৎসাহ ও উদ্যম দেশের তমোভাবকে বিনষ্ট করিবে।

রজোভাব তমকে নাশ করে বটে, উদ্যমশীল করে বটে, কিন্তু উহার মাথা নাই, অর্থাৎ প্রবৃত্তি দ্বারাই উহা চালিত হয়। আমরাও দেখিতেছি যে বর্ত্তমান রজোভাবের অভ্যুদয়ের মূলে ইংরাজ বিদ্বেষ বিদ্যমান। অবশ্য অনেক যুবকের হৃদয়ে বিদ্বেষ অপেক্ষা দেশের কল্যাণ কামনাই প্রবল, কিন্তু ইংরাজ বিদ্বেষ প্রায় কম বেশী সকল জায়গায়ই ফুটিয়া উঠিয়াছে। একটা বিঘ্নের বিরুদ্ধে বিদ্বেষরূপ প্রবৃত্তিকে অবলম্বন করিয়াই আমাদের দেশে রজোভাব মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে।

এখন কথা হইতেছে এই যে, তম অপেক্ষা রজোভাব মানুষের পক্ষে প্রীতিকর। যে রজোগুণের আস্বাদ পাইয়াছে সে আর তমোগুণের কাছে ঘেঁসে না। এমন কি, তাহার মনে একটা আশঙ্কা থাকে যাহাতে সে তমোগুণের কুহকে আর না ডুবে। এইজন্য আমাদের দেশে বিঘ্নের প্রতি বিরোধ লইয়া রজোভাবের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে বলিয়াই, দেশের যুবকবৃন্দ ঐ ভাবটী কতকটা আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। এখন যদি তাহাদিগকে এমন একটি কর্ম্মক্ষেত্রে আহ্বান করা যায়, যেখানে বিঘ্নের প্রতি বিরোধ-ভাব লইয়া দাঁড়াইবার কথাটা চাপা পড়িয়া যাইতেছে, তাহা হইলে তাহাদের সেরূপ কাজে মন উঠে না। এমন কি তাহারা তর্ক করিবে যে, 'যে কাজে বিঘ্নবিরোধিত্বের ভাবটী নাই, সে কাজ করিতে যাইলে দেশ আবার তমোমোহে ঘুমাইয়া পড়িবে।

রজোভাবের মধ্যে যাহা উপাদেয় তাহার নাম উদ্যম আর যাহা হেয় তাহার নাম প্রবৃত্তি। দেশ যখন তমসাচ্ছন্ন ছিল, তখন প্রবৃত্তি বা বিঘ্নবিরোধিতার সাহায্যে উদ্যম আনিতে হইয়াছে; এখন সমস্যা এই যে উদ্যমকে বজায় রাখিতে হইলে আমাদের মধ্যে বিঘ্নবিরোধিতার ভাবটী অপরিহার্য্য কি না। বিঘ্নবিরোধিতার ভাব ভিন্ন উদ্যমকে বজায় রাখিবার কি অন্য উপায় নাই?

উত্তর—আছে। প্রমাণ স্বামীবিবেকানন্দের জীবন; তিনি উদ্যমের মূর্ত্তিমান্ অফুরন্ত উৎস ছিলেন, কিন্তু সে উদ্যম প্রবৃত্তি-প্রসূত নহে।

মহান আদর্শের মধ্যেও উদ্যমের বীজনিহিত থাকে। জগতের সমস্ত কর্ম্মবীরের জীবন আলোচনা কর, দেখিতে পাইবে তাঁহারা এক একটা মহদাদর্শ ধরিয়া আপনাদিগকে সেই আদর্শের সহিত একীভূত করিয়া দিয়াছেন, এবং সেই আদর্শ হইতে তাঁহাদের জীবনে উদ্যমের উৎস খুলিয়া গিয়াছে। অতএব একটী আদর্শ যদি কেহ হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া দিতে পারে তবে উদ্যমের জন্য সামান্য প্রবৃত্তির দাস হওয়ার কোন প্রয়োজন থাকিবে না।

আমাদের দেশের যুবকগণ যদিও বিঘ্নবিরোধিতা প্রভৃত প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া বহুকাল পোষিত তমোভাবকে বিনষ্ট করিতে পারিয়াছে প্রবৃত্তির বশ্যতা এখন আর তাহাদের পক্ষে অপরিহার্য্য নহে। তাহারা যে উদ্যমের আস্বাদ পাইয়াছে, যে রজোভাবের উত্তেজনা অনুভব করিতেছে, এখন সেই উদ্যম ও উত্তেজনাকে প্রবৃত্তির হাত হইতে রক্ষা করা নিতান্ত প্রয়োজন; কারণ তমোমূলক রজোভাব, প্রবৃত্তিমূলক উদ্যম লইয়া দেশে উপযুক্ত ক্ষত্রিয়শক্তির উদ্ভব হইবে না। আমাদের প্রাচীন ক্ষাত্রশক্তি সত্ত্বমূলক রজোভাবের বিকাশ। ঐ ক্ষাত্রশক্তিকে আবার আমাদের দেশে জাগাইয়া তুলিতে হইলে, উদ্যমের মূলে প্রবৃত্তিকে না জাগাইয়া, একটা মহান আদর্শকে ভিত্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। সনাতনধর্ম্মের সংরক্ষণ, সনাতনধর্ম্মের জন্য দেহমন প্রাণ উৎসর্গ করাই ঐ মহান্ আদর্শ।

অতএব দেখা গেল যে বিঘ্নবিরোধিতা ছাড়াও উদ্যমকে জাগাইয়া রাখিবার প্রকৃষ্টতর উপায় রহিয়াছে। এখন এই বিঘ্নবিরোধিতার ভাবটী আমাদের হৃদয় হইতে সরাইয়া দিতে হইবে, কারণ উহা একদিকে যেমন প্রকৃত ক্ষাত্রশক্তির উদ্ভবের বিরোধী, অপরদিকে তেমনই যে পরমার্থ সাধনার উপলক্ষ্যে সমস্ত দেশকে একযোগ করিতে হইবে, সেই পরমার্থ সাধনারও বিরোধী। আমাদের প্রথম কাজ, নেশন লক্ষ্য ধরিয়া অর্থাৎ পরমার্থ সাধনার জন্য একজোট হওয়া, ক্ষাত্রশক্তি প্রভৃতির বিকাশ তার পরের কাজ। অতএব দেখিতেছি গোড়াথেকেই বিঘ্ন-বিরোধীতার ভাবটী বর্জ্জন করিতে হইবে। যদি বিঘ্নঘটার মধ্যে কোনও

উপকারিতাই স্বীকার কর, তবে কোন ভাবনা নাই—পথে ভবিষ্যতে অনেক বিঘ্নই ঘটিবে; কিন্তু এখন থেকে বিঘ্নের ধ্যানে চিত্ত নিযুক্ত রাখিয়া গোড়ার কাজ কেন মাটি করিব, হীনভাবরূপ গলদ গোড়াতেই কেন প্রবিষ্ট করিব।

অতএব বিঘ্নের প্রতি বিরোধভাব যদি চিত্ত হইতে সরাইয়া ফেল, তবে হে যুবক, তোমার প্রকৃতি যেরূপই হউক পরমার্থসাধনে যদি তোমার আগ্রহ থাকে তবে ঐ সাধনায় তোমার স্থানও আছে। পরমার্থ সাধন বলিতে মোটামুটি কি বুঝায় জান? ত্যাগ ও সেবা; The ational ideals of India are renunciation and service স্বামীজি বুঝাইয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মসাধনার প্রণালী অনেক রকম আছে, —সনাতন ধর্ম্মের পরিচয় লাভ হইলে একথা বুঝিবে—কিন্তু সমস্ত রকম সাধন প্রণালীর মধ্যে গতি নির্ণয়, উন্নিতির হিসাব, কি উপায়ে হয়? উপায়—ত্যাগের প্রতি লক্ষ্য রাখা। যিনি যেমনই সাধনার সাধক হউন, যে পরিমাণে তাঁহার ত্যাগ বাড়িতেছে; অর্থাৎ আসক্তি কমিতেছে, তিনি সেই পরিমাণে উন্নত। সেই জন্য পরমার্থ সাধনার কম্পাস হইতেছে ত্যাগ বা অনাসক্তি। অতএব ধর্ম্ম বলিতে কিছু একটা কিম্ভতকিমাকার বুঝায় না,—বুঝায় অনাসক্তি। যিনি পরম অনাশক্তি লাভ করিয়াছেন, তিনি নির্ব্বাণ, ব্রহ্ম বা পরাভক্তি উপলব্ধি করিয়াছেন। পরম অনাশক্তির দিকে অগ্রসর হইবার জন্য যেমন জ্ঞানমূলক, ভক্তিমূলক সাধন-পথ আছে, তেমনই আবার কর্ম্মমূলক সাধন-পথ আছে। এই কর্ম্মমূলক সাধন-পথের নাম সেবা। কর্ম্মমূলক সেবা বা কর্ম্মযোগ অনেক রকমের আছে। কর্ম্মযোগ জ্ঞানসাপেক্ষ হইতে পারে, ভক্তিসাপেক্ষ হইতে পারে, আবার নিরপেক্ষ হইতেও পারে। জ্ঞানসাপেক্ষ সেবায় "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ" ইত্যাদির ভাবনা রক্ষা করিতে হয়,—সমস্তই ব্রহ্ম—অন্যভাবে যে দেখি সেটা অজ্ঞান, সেটাকে বর্জ্জন করিতে হইবে,—অজ্ঞানের মূল হ'ল অহংভাব—'আমি' বলিতে যা বুঝি বা 'আমার' বলিতে যা বুঝি, তাহাকে ব্রহ্মার্পণ করিতে হইবে, 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই জ্ঞানে বিসর্জ্জন দিতে হইবে। এই ভাবে আপনাকে দিয়ে দেওয়ার

নাম জ্ঞানসাপেক্ষ সেবা। ভক্তিসাপেক্ষ সেবায় জীব ও জগৎকে নিজ-ইষ্টেরই মায়ারূপ বলিয়া ধারণা করিতে হয়—অর্থাৎ নিজ ইষ্টদেবতাই বিচিত্রাবস্থাপন্ন জীবরূপে আমার সেবা গ্রহণ করিতে উপস্থিত রহিয়াছেন, তিনিই আমার পূজা লইতে কখনও দরিদ্র আতুর কখনও বিদ্যাবুদ্ধিহীন ইতরলোক, কখনও সংসারদগ্ধ সাধন ভজনহীন অজ্ঞানী সাজিয়া আমার কাছে আসিতেছেন; আমি উপযুক্ত উপকরণ দ্বারা তাহাদের অভাব মোচন করিলেই—তাঁহার সেবা করা হইল। এইরূপ স্থির-ভক্তির চক্ষে জীবজগৎকে দেখিয়া সেবা করার নামই ভক্তিসাপেক্ষ সেবা। নিরপেক্ষ সেবায় সেবক ভাবে যে সেবা করাই তাহার ধর্ম্ম; সে সেবায় নিজের বা অপরের কোন সুফল হউক বা না হউক সেবকের কিছু আসিয়া যায় না। জীবসেবাই তার স্বধর্ম্ম; জীবসেবার জন্য সে সবসময় যেন কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে, সুযোগ বা আহ্বান পাইলেই হইল। বিশ্বমৈত্রী, বিশ্বপ্রেম প্রভৃতি সাধন করিবার অপেক্ষায় বুদ্ধদেব একরকম কর্ম্মযোগ প্রচার করিয়াছিলেন; উহার মূলকথা বিশেষ ভাবসাধন উদ্দেশ্যে জীবসেবা। জৈনমতে অশুভ আশ্রবের নাশ, বা বৌদ্ধমতে বিশেষ পারমিতার প্রাপ্তির জন্য যে কর্ম্ম সাধককে করিতে হয়, তাহাকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ সেবা বলা যায় না। নিরপেক্ষ সেবাধর্ম্মে আশু অভাবমোচন ছাড়া, আর কোনরূপ গৌণ ফলপ্রত্যাশা নাই—মানযশ, প্রতিপত্তি, আত্মগৌরব ত দূরের কথা।

কিন্তু নিরপেক্ষ সেবাধর্ম্মে যে সেবকের কোন রকমের হুঁসিয়ারি নাই, তাহা নহে। জ্ঞানসাপেক্ষ সেবায় ব্রহ্মভাবের হুঁস থাকা চাই, ভক্তিসাপেক্ষ সেবায় ইষ্টের অধিষ্ঠানের প্রতি হৃদয়মনের হুঁস থাকা চাই; তেমনি নিরপেক্ষ সেবায় হুঁস থাকা চাই নিরপেক্ষতার উপর, অর্থাৎ সেবায় যাহাতে অভাব-মোচন ছাড়া আর কোনও রকম ফলপ্রত্যাশা না থাকে, সেদিকে তীব্র লক্ষ্য রাখা চাই। সেবায় কোন রকম 'পলিসি' ত থাকিবেই না, আবার নিজের কোন রকম লাভও থাকিবে না, আধ্যাত্মিক উন্নতি চেষ্টা পর্য্যন্ত নয়, অথবা নিজের দয়া প্রভৃতি কোন

র পরিতৃপ্তিও নয়। অথচ সেবাটী ঠিক ঠিক সেবা হওয়া চাই—যেমন বুদ্ধি সেবায় ঢালিয়া দিতে হইবে, দেহ আলস্য বা আরাম খুঁজিতেছে না, মন সেবা কাজ ছাড়া আর কিছুতে বিক্ষিপ্ত হয় না, বুদ্ধিতে আপনাকে দিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোন রকম হিসাব বা ধারণা নাই। এইরূপ নিরপেক্ষ সেবাধর্ম্মকেই প্রকৃত নিষ্কামকর্ম্ম বলে,—ইহার অধিকারী এ পর্য্যন্ত দুর্লভ ছিল। এই নিষ্কাম কর্ম্মও পরমার্থ সাধনা, কারণ ত্যাগেই ইহার গতি।

দেশের কাজ বলিতে আমরা বুঝিলাম কি? বুঝিলাম—

(১)

পরমার্থরূপ জাতীয় লক্ষ্য ধরিয়া দেশের সর্ব্বত্র একযোগ হওয়া।

(২)

লক্ষ্যধরার অর্থ লক্ষ্য-বুঝা, লক্ষ্য প্রচার করা, লক্ষ্য সাধন করা। সকলেই সবটা বুঝে না, বা প্রচার করিতে পারে না, কিন্তু সকলেই অল্পাধিক লক্ষ্যের সাধন করিতে পারে। সকলেই এক জোট হইতে পারে।

(৩)

লক্ষ্যসাধনের দুইটীর মধ্যে একটী প্রধান অঙ্গ সেবা। লোকসেবায় তিনটী বিভাগ—শারীরিক অভাব-মোচন, মানসিক অভাবমোচন বা শিক্ষাদান ও আধ্যাত্মিক অভাবমোচন বা ধর্ম্মদান। কিন্তু সেবাকার্য্য যেন জ্ঞানসাপেক্ষ বা ভক্তিসাপেক্ষ বা পূর্ণ নিরপেক্ষ হয়, তাহা না হইলে উহা দ্বারা পরমার্থের সাধনা হইবে না। জ্ঞান বা ভক্তির দ্বারা সেবার ভিত্তি গড়িয়া লওয়াই অধিকাংশস্থলে শ্রেয়স্কর।

(৪)

উদ্যমের মূলে যেন ইংরাজ-শাসনরূপ বিঘ্নের প্রতি বিরোধ ভাব না থাকে। আমাদিগকে বাঁচিবার জন্য দেশে নেশন খাড়া করিতে হইবে;

ক্ষত্রিয় বীর্য্যের প্রকৃত পত্তন হইবে।

(৫)

উৎসাহ পাইবার জন্য, ভাল বাসিবার জন্য হৃদয়ে যদি কিছু ধারণা করিতে চাও, তবে সনাতনধর্ম্মকে গ্রহণ কর; উহার প্রতি প্রাণপণ অনুরাগ, উহার জন্য দেহমন সমর্পণ, উহার জন্য বাঁচামরার ভাব পোষণ কর। সনাতনধর্ম্মই আমাদের দেশে নেশন গড়িতে সক্ষম—সনাতনধর্ম্মই ভারতবর্ষকে পুণ্যতীর্থে পরিণত করিয়াছে, নহিলে পাশ্চাত্য স্বদেশভাবের কোনও অর্থ আমাদের পক্ষে নাই। অতএব সনাতনধর্ম্মকেই ভালবাসিতে শিখ ও শিখাও।

(৬)

দেশকে নেশনরূপে organise করার কাজ স্বামীবিবেকানন্দ আরম্ভ করিয়াছেন; তৎপ্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণমিশন ঐ কার্য্যে ব্রতী। উদ্বোধনে "ভারতের সাধনা" নামক প্রবন্ধ পর্য্যায়ে ঐ ব্রত উদ্‌যাপনের কথা আলোচিত হইতেছে। অতএব স্বামীজির পাতাকার নিম্নে আসিয়া দেশকে একজোট হইতে হইবে।

দেশের যে যেখানে আছ প্রকৃত দেশের কাজ আরম্ভ করিয়া দাও, রামকৃষ্ণমিশন এক সময় সকলকেই একত্র সন্নিবিষ্ট করিবে।

(৭)

দেশের কাজ করিবার জন্য যাহারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছে, তাহাদের জন্যই এত কথা বলা হইল। যাহারা সে আসরে নামে নাই, তাহাদের জন্য বিশেষ ভাবে কিছু বলা হইল না। তাহাদিগকেও যথাসম্ভব আদর্শ দিতে হইবে।

সমালোচনা ও পুস্তকপরিচয়।

১। অখণ্ড আলোক—শ্রীসত্যাশ্রয়ী লিখিত। প্রকাশক—শ্রীসুশীলচন্দ্র বসু, বি, এ,। মূল্য ৵০ আনা।

২। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও হিন্দুয়ানী—শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর লিখিত "ত্রিশূল" হইতে উদ্ধৃত। শ্রীশ্রীশচন্দ্র শর্ম্মা দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য ।০ আনা মাত্র।

৩। **পুরাণ-তত্ত্ব** (প্রথম খণ্ড)—শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দ ভারতী কর্তৃক ব্যাখ্যাত (ত্রিশূল হইতে উদ্ধৃত)। মূল্য ।৵০ আনা। এই সুন্দর গবেষণাপূর্ণ পুস্তক হইতে কল্যব্দ ও পুরাণ সম্বন্ধে আমাদের পাঠক পাঠিকার নিকট কিঞ্চিৎ উপস্থিত করিতেছি।

"এখন যে ভাবে পুরাণ আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে হইলে কলিযুগের আরম্ভের কথা প্রথমে তুলিতে হইবে। আমাদের এই বর্ত্তমান কলিযুগ কতদিন হইতে আরম্ভ হইয়াছে? এক কথাতে ইহার উত্তর হইতে পারে, কিন্তু ইহার উত্তর দিবার পূর্ব্বে দুই চারিটা অবান্তর কথার অবতারণা এখানে আমাকে বাধ্য হইয়া করিতে হইতেছে।

"এখনকার মনুষ্যেরা প্রধানত ইতিহাসমূলক কেবল বিশেষ ঘটনা দ্বারা সময় নিরুপণ করে। আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীরা আকাশ-ঘড়ী দেখিয়া সময় নির্ণয় করিতেন। তাহার সহিত ইতিহাসের মিল ছিল। সেই আকাশ ঘড়ী কি? তাহার একটু পরিচয় সংক্ষেপে দিতেছি।

সপ্তর্ষীণাং চ যৌ পূর্ব্বৌ দৃশ্যতে উদিতৌ দিবি।
তয়োস্তু মধ্য নক্ষত্রং দৃশ্যতে সৎ সমং নিশি॥
তেন সপ্তর্ষয়ো যুক্তাস্তিষ্ঠন্ত্যব্দ শতং নৃণাম্।
তে তু পরীক্ষিতে কালে মঘাস্বাসন্ দ্বিজোত্তম॥

(বিষ্ণুপুরাণ ৪র্থ অংশ ২৪শ অধ্যায়।)

ভাবার্থ—উত্তর গগনে যে সপ্তর্ষী নামক সাতটী তারা দেখা যায়, তাহার মধ্যে যে দুইটী প্রথমে উদিত দৃষ্ট হয়, ঐ দুইয়ের মাঝামাঝি স্থান হইতে দক্ষিণ দিকে একটী রেখা কল্পনা কর। সেই রেখা যাইয়া রাশি-চক্রস্থিত কোন নক্ষত্রকে স্পর্শ করিবে। দেখা গিয়াছে রাশি চক্রাদির ঘূর্ণনদ্বারা ঐ রেখা একশত বৎসর করিয়া এক এক নক্ষত্রে অবস্থান করে। এবং ইহাও শুনা গিয়াছে, যুধিষ্ঠির যখন পরীক্ষিৎকে রাজ্য দিয়া যান, তখন ঐ রেখা মঘা নক্ষত্রে ছিল। পরবর্ত্তী শ্লোকে জানা যায়—নন্দ রাজার সময়ে যখন শূদ্র-রাজত্ব আরম্ভ হইবে, তখন ঐ রেখাটী পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্রে যাইবে। ১০নং নক্ষত্র মঘা; ২০নং নক্ষত্র পূর্ব্বাষাঢ়া। মধ্যের ব্যবধান ১১ নক্ষত্র হইতে কম। তবেই পরীক্ষিৎ

ও নন্দের রাজত্বের ব্যবধান এগার শত বৎসরের ন্যূন। পরীক্ষিৎ হইতে নন্দ পর্য্যন্ত রাজাদের কাল ইতিহাসের সাহায্যে গণনা করিলে ১০৫০ বৎসর পাওয়া যায়। বরাহমিহির কৃত বৃহৎ সংহিতা নামক জ্যোতিষ গ্রন্থে রহিয়াছে—"আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ। ষড়্‌দ্বিকপঞ্চ-দ্বিযুত (২৫২৬) শক কালস্তস্যরাজ্ঞশ্চ॥"

যখন যুধিষ্ঠির রাজা পৃথ্বী শাসন করিতেছিলেন তখন সপ্তর্ষিগণ মঘা নক্ষত্রে অবস্থান করিতেন, তাহার পরে শালিবাহনের রাজত্ব কালে যে নক্ষত্র আসেন, তাহার হিসাব করিয়া যুধিষ্ঠিরের ২৫২৬ বৎসর পরে শালিবাহনের শকাব্দ প্রচলন কাল জানা গিয়াছে। এই ভাবে আকাশ ঘড়িদ্বারা কাল নির্ণয় হইত এবং তাহা ইতিহাসের সহিত মিলিয়া যাইত।

এখন ১৮৪৩ শালিবাহন শক চলিতেছে এবং কল্যব্দ অর্থাৎ পঞ্জিকার লিখিত "কলের্গতাব্দাঃ" ৫০২২। এদিকে কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ ইতিহাস রাজতরঙ্গিনীর সহিত মহাভারত কথার ঐক্য করিলে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যত্যাগ, পরীক্ষিতের রাজ্যারম্ভ ও কাশ্মীরপতি গোনর্দ্দনের রাজ্যপ্রাপ্তি ৬৫৩ কল্যব্দ জানা যায়। এখন এই ৬৫৩ কল্যব্দ শালিবাহনের সময়ের ঐ ২৫২৬ কল্যব্দ + বর্ত্তমান শালিবাহন শকাব্দ ১৮৪৩ = ৫০২২ বর্ত্তমান কল্যব্দ হয়। * * *

মহাভারতে জানা যায়, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ৩৬ বৎসর পরে শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ হইয়াছিল এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান দেখিয়াই পঞ্চপাণ্ডব পরীক্ষিৎকে রাজত্ব দিয়া মহা-প্রস্থান করেন। তাহা ৬৫৩ কল্যব্দের কথা। ৬৫৩—৩৬ = ৬১৭ কল্যব্দে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। ইহাও প্রকাশ যে তাহার অল্প পূর্ব্বে (৬১৬ কল্যব্দে) ব্যাসশিষ্য রোমহর্ষণসূত নৈমিষারণ্যে ব্যাসাসনে বসিয়া পুরাণ বলিতেছিলেন, তখন বলরাম যাইয়া তাঁহাকে হত্যা করেন। তদুপলক্ষে বলরামকে কয়েক মাসের জন্য তীর্থভ্রমণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৬ষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।) সেজন্য তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অনুপস্থিত থাকিয়া গদাযুদ্ধ সময়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমরা নৈমিষারণ্যে গিয়া এখনও সেই

ব্যাসাসনের পূজা প্রচলিত থাকিতে দেখিয়াছি। পূর্ব্বাপর মিলাইলে বুঝা যায় উপরিচর বসুর (ব্যাস মুনির মাতামহের) রাজত্ব কালে ঐ কল্যব্দের গণনা আরম্ভ হইয়াছে।

কলির সন্ধ্যা সময়ে অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কিছু পূর্ব্বে ব্যাসদেব পুরাণ কথাগুলি সংগ্রহ করিয়া একখানি পুরাণ সংহিতা সকলন করেন এবং তাহা স্থতকে শিক্ষা দেন।

সাধারণের ধারণা যে ব্যাস মুনি, পুরাণ নামধেয় অষ্টাদশ খানা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। ব্যাস একখানি মাত্র পুরাণ সংহিতা প্রস্তুত করেন। তাহা হইতে শিষ্য রোমহর্ষণ স্থত একখানা এবং প্রশিষ্যেরা তিনখানা মোট চারিখানা পুরাণ সংহিতা রচনা করিয়াছিলেন। তৎকালীয় পুরাণবিদেরা এই পুরাণসংহিতা দ্বারা পুরাণ শিক্ষা করিতেন এবং নৈমিষাদি মুনি সমাজে কথকতা করার কালে ভিন্ন ভিন্ন পুরাণাকারে বুঝাইতেন! তাহাতেই ব্যাসের ঐ একমাত্র পুরাণসংহিতা কালক্রমে অষ্টাদশ পুরাণে পরিণত হইয়াছে! ইহা আমার মনগড়া কথা নয়, ব্যাসের পিতা পরাশর মুনি আমাদিগকে ইহা শিখাইয়াছেন। তোমরা পরাশর কৃত বিষ্ণু পুরাণের ৩য় অংশ ৬ষ্ঠ অধ্যায় খুলিয়া দেখিতে পার। উহাতে লিখা আছে—

"আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভিঃ কল্পসিদ্ধিভিঃ। পুরাণসংহিতাং চক্রে পুরানার্থ-বিশারদঃ। প্রখ্যাতো ব্যাসশিষ্যোঽভূৎ স্থত বৈ রোমহর্ষণঃ। পুরাণ-সংহিতাং তস্মৈ দদৌ ব্যাসো মহামুনিঃ সুমতিশ্চাগ্নিবর্চ্চাশ্চ মিত্রায়ুঃ শাংশপায়নঃ। অকৃতব্রণোঽথ সাবর্ণিঃ ষট্ শিষ্যাস্তস্য চাভবন্॥ কাশ্যপঃ (অকৃতব্রণঃ) সংহিতাকর্ত্তা সাবর্ণিঃ শাংশপায়নঃ। রোমহর্ষণিকা চান্যা তিসৃণাং মূল সংহিতা॥ চতুষ্টয়েনাপ্যেতেন সংহিতানামিদং মুনেঃ।" ইত্যাদি—(ইদমিতি অষ্টাদশ পুরাণম্)। (বিষ্ণুপুরাণ ৩ অংশ ৬ অধ্যায়।)

পুরানার্থ বিশারদ ব্যাস, আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা, কল্পসিদ্ধি প্রভৃতি হইতে পুরাণ-সংহিতা প্রণয়ন করেন। এইরূপ ব্যাসের শিষ্য প্রশিষ্য দ্বারা তাহা হইতে চারিখানা সংহিতা রচিত হওয়া এবং সেই চারি সংহিতা

হইতে ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, শিব, ভাগবত, নারদীয়, মার্কণ্ডেয়, অগ্নি, ভবিষ্য ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত, লিঙ্গ, বরাহ, স্কন্দ, বামন, কূর্ম্ম, মৎস্য, গরুড় ও ব্রহ্মাণ্ড এই অষ্টাদশ পুরাণের উদ্ভব, স্বয়ং পরাশর বলিয়াছেন।

পরাশর যখন এই বর্ণনা করেন তখন পরিক্ষিৎ রাজা রাজত্ব করিতেন। এতদ্বারা বুঝা গেল—ব্যাস কৃত পুরাণ সংহিতা প্রণয়নের পরবর্ত্তী শত বৎসর কালের মধ্যে ঐ সংহিতাটী অষ্টাদশ মহাপুরাণে পরিণত হইয়াছিল।

পুরাণ কথিত হওয়ার দ্বিতীয় পরিচয়, রাজা পরীক্ষিতের সময়ে পাওয়া যায়, যথা "পরীক্ষিৎ যজ্ঞে। যোঽয়ং সাম্প্রতমেতদ্ ভূমণ্ডলমখণ্ডিতায়তি ধর্ম্মেণ পালযতী"তি॥ বিষ্ণু পুরাণ ৪র্থ অংশ ২০শ অধ্যায়।

(ক্রমশঃ)

সংবাদ ও মন্তব্য।

১। আমাদের বন্ধুগণ ও পাঠকগণ শ্রবণ করিয়া সুখী হইবেন, নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটীর একটী স্থায়ী আবাস হইয়াছে। বেদান্ত সোসাইটীর অন্যতমা মেম্বার-ট্রষ্টী নিউইয়র্ক নিবাসিনী মিস্ মেরী মর্টন্ নাম্নী একজন মহিলা উক্ত আবাসটী দান করিয়াছেন। উহা ৩৪ নম্বর ওয়েষ্ট ৭১ ষ্ট্রিটে অবস্থিত। বিগত গ্রীষ্ম কালে মিস্ মর্টন্ স্বামী বোধানন্দের নিকট একটী বাটী দান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। উক্ত অভিপ্রায় স্বামী বেদান্ত সোসাইটীর ২।৪ জন মুখ্য মেম্বরকে বিদিত করায়, সকলেই উহাতে অভিমত দেন। বাটী নির্ব্বাচন করিবার জন্য একটী কমিটী স্থাপিত হয়। ঐ কমিটী এই বাটীটী নির্ব্বাচিত করিবার স্বল্প পরেই মিস্ মর্টন্ তাঁহার নিজের এটর্নীর দ্বারা তদন্ত করিয়া বাটী খরিদ করিবার আদেশ দেন। বাটীটীর মূল্য ৪০৫০০ ডলার। ইহা এটর্নীর ফিঃ ও একবৎসরের ট্যাক্স বাবদ প্রায় ২০০০ ডলার খরচ হয়। সমস্ত খরচ মিস মর্টন্ দিয়াছেন। গত অক্টোবর

মাসে ৫ই তারিখে বেদান্ত সোসাইটী এই বাটীর অধিকার পাইয়াছে। বাটীতে ৫টী তলা আছে। সর্ব্বনিম্ন তলে তত্ত্বাবধায়ক সস্ত্রীক থাকেন। ২য় তলে সোসাইটীর মিটিং হয়। ৩য় তলটির একটী ঘরে স্বামীর ষ্টাডি ও অপরটীতে শয়ন গৃহ। ৪র্থ ও ৫ম তল আবশ্যকীয় খরচ সরবরাহের জন্য ভাড়া দেওয়া হয়।

মিস্ মর্টন্ এই কার্য্যটী করিয়া বেদান্ত সোসাইটীর মেম্বরগণের এবং ভারতীয় বন্ধুগণের বিশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্রী হইয়াছেন। শ্রীশ্রীজগজ্জনীর কৃপায় তাঁহার ভক্তি ও জ্ঞান দিন দিন বৃদ্ধি হউক, এবং তিনি লোক হিতকার বহু সৎকার্য্য করিয়া কৃতার্থ হউন। ইহাই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা। মিস্ মর্টন্ একজন অতি সম্ভ্রান্ত বংশীয়া মহিলা। ইঁহার পিতা পরলোক গত অনারেব্‌ল্ লিভাই, পি, মর্টন্ আমেরিকার একজন প্রসিদ্ধ ধনী লোক ছিলেন। দেশ সেবার্থে রাজনৈতিক কার্য্যে অনুরক্ত হইয়া য়্যাম্বাসডার; সেনিটর, গভর্ণর এবং ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট হইয়াছিলেন। বার্দ্ধক্য বশতঃ কার্য্যে অসক্ত না হইলে প্রেসিডেণ্ট হইতে পারিতেন।

২। গৌহাটীতে স্বামী অভেদানন্দ—শিলং হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের বার্ত্তমান ভাইস প্রেসিডেণ্ট শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ গৌহাটীতে এক সপ্তাহ কাল অবস্থান করেন। গৌহাটীবাসী জনসাধারণ তাঁহাকে সাদরে অভ্যথনা করেন। ২রা জুলাই তারিখে তিনি স্থানীয় 'কামরূপ-নাট্য-সমাজ হলে' "সনাতন ধর্ম্ম ও বেদান্ত" সম্বন্ধে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল ধরিয়া ইংরাজীতে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাকালে স্বামিজীর কথন ভঙ্গী ও তাঁহার গৈরীক পাগ্‌ড়ী আলখেল্লা শোভিত দেহ কান্তি অতীব মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল। ৫ই তারিখে শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র বরদলৈ মহাশয়ের ভবনে একটী মহিলা সভায় তাঁহাকে অভ্যর্থনা করা হয় ও তিনি বঙ্গভাষায় একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। ৬ই তারিখ, অপরাহ্ণ ৺ঘটিকার সময় তিনি স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম গৃহে শুভ পদার্পণ করেন। সেবাশ্রমের সভ্যগণ তাঁহাকে পুষ্পমাল্য গন্ধাদিদ্বারা বিভূষিত করিয়া সুললিত পদ্যে একটী অভিনন্দন পাঠ করেন। তদুত্তরে

স্বামিজী "আমাদের উপস্থিত কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে উপদেশচ্ছলে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। ৺কামাখ্যা, বশিষ্ঠাশ্রম ও অশ্বক্রান্ত দর্শনান্তর তিনি গৌহাটী পরিত্যাগ করেন। গৌহাটীতে তাঁহার একখানি ফটো রাখা হয়।

৩। কামারপুকুর রামকৃষ্ণ ইনষ্টিটিউসন্—ঠাকুরের জন্মস্থান পুণ্যভূমি কামারপুকুর এবং তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের বালকগণের সৎশিক্ষাকল্পে ঠাকুরের জন্মস্থানের সন্নিকটে উচ্চইংরাজী বিদ্যালয়ের অনুকরণে একটী আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে। ঐ স্থানে এরূপ একটী বিদ্যালয়ের আবশ্যকতা খুবই বেশী, যেহেতু তাহাতে স্থানীয় লোকশিক্ষার বিশেষ সহায়তা করিবে। স্থানীয় লোকগণের চেষ্টা ও সাহায্য দ্বারা জায়গা সংগ্রহ এবং আবশ্যকীয় গৃহাদির কতকাংশ তৈয়ার হইয়াছে। ১৯২১ সালের জানুয়ারী মাস হইতে বিদ্যালয় আরম্ভ হইয়াছে এবং উপস্থিত নিম্নতম শ্রেণী হইতে তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ের কার্য্য চলিতেছে। বিদ্যালয়টীর আবশ্যকীয় বক্রী গৃহনির্ম্মাণাদির ব্যায় সঙ্কুলান জন্য এখনও অন্ততঃ তিনহাজার টাকার আবশ্যক। স্থানীয় লোকদের মধ্যে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রের সংখ্যাই বেশী, অবস্থাপন্ন নাই বলিলেই হয়। তাঁহারা যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্য হইতে ঐ বক্রী অর্থ সংগ্রহ হইবার কোন আশা নাই। উদ্যোগিগণ প্রথম হইতেই এ সম্ভাবনা জানিতেন এবং ভক্ত ও দানশীল ব্যক্তিগণের কৃপা দ্বারা তাঁহাদের কার্য্য উদ্ধার হইবে এইরূপই ভরসা করিয়া আসিয়াছেন। এক্ষণে ঐ সাহায্য প্রাপ্তি ভিন্ন গত্যন্তর নাই বলিয়াই তাঁহারা সহৃদয়গণের সাহায্য প্রার্থী হইয়াছেন এবং এই সদনুষ্ঠানে তাঁহাদের কৃপালাভে বঞ্চিত না হন এই প্রার্থনা। যিনি যাহা সাহায্য করিবেন নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীপ্রমথনাথ রায়, সহকারী সম্পাদক, কামারপুকুর রামকৃষ্ণ ইনষ্টিটিউসন্। পোঃ কামারপুকুর। জেলা হুগলী।

কথা প্রসঙ্গে।

ব্যাধিহেতু অনাহারে মুমূর্ষু ব্যক্তিও দুর্ব্বল আবার অনাহারে সুস্থ ব্যক্তিও দুর্ব্বল। এই দুইএর প্রাণ রক্ষা করিতে হইলে ব্যবস্থারও ভেদ আবশ্যক। অনাহারে সুস্থ ব্যক্তিকে পুষ্টিকর খাদ্য দিলেই সে পুনরায় সবল হইয়া কর্ম্মঠ হইবে। কিন্তু যে মুমূর্ষু তাহাকে সবল করিবার জন্য যদি পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে তাহার প্রাণের উৎক্রমণ অবশ্যম্ভাবী। পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন এস্থলে আদৌ নাই। এখানে প্রয়োজন ঔষধ পথ্যাদির প্রয়োগে তাহার প্রাণপক্ষীকে দেহপিঞ্জরে রক্ষা করা।

* * * * *

দুর্ব্বল ভারতবাসীকে অনেকেই কল-কারখানা ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা অন্ন-সংস্থান করিয়া সবল করিতে চান। কিন্তু তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি, মুমূর্ষু ভারতবাসীর মুখে এখন পায়সান্ন ঢালিয়া দিলেও সে তাহা বমন করিয়া ফেলিবে, কারণ তাহার জাতীয়তারূপ প্রাণপক্ষী যে প্রায় উড়িয়া যাইবার দাখিল? সর্ব্বাগ্রে তাহার জাতীয়তা রক্ষা করিতে হইবে, তাহার পর পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা। ব্যবসা-বাণিজ্য, কল-কারখানা দ্বারা অন্ন সংস্থানের চেষ্টা সে কি ইতিপূর্ব্বে করে নাই?— প্রাণহীন বলিয়া তাহার সকল প্রচেষ্টাই সে সম্বন্ধে বৃথা হইয়াছে। যে জাতির জাতীয়তা আছে তাহার একতা বন্ধন আছে। এই ঐক্যবন্ধন না থাকিলে ব্যবসা বল, বণিজ্য বল, কল বল, কারখানা বল, এই ভীষণ প্রতিযোগিতার দিনে কিছুই সম্ভব নয়। স্বদেশী বল, অসহযোগিতা বল— করিবে কে? প্রাণহীন, জাতীয়তা হীন, একতা হীন যাহারা তাহাদের দ্বারা কোন্ কার্য্য সম্ভব?

জাতির প্রাণ বা জাতীয়তা রক্ষা হয় কোনও না কোন নীতিকে ভিত্তি করিয়া। বিভিন্ন দেশে রাজনীতি, সমাজনীতি বা ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন নীতি অবলম্বন করিয়াই তাহাদের জাতীয়তা বা একতা বন্ধন প্রতিষ্ঠিত আছে। এই নীতি যখন প্রবল মাত্রায় তত্তৎ দেশে অনুষ্ঠিত হয় তখন সেই জাতি সর্ব্বংসহ, সর্ব্বকর্ম্মকুশলী এবং সর্ব্বজয়ী হইয়া উঠে। এই বিশেষ নীতির হানিতে সেই জাতির কর্ম্মকুশলতা ও গৌরবেরও হানি হয়। অর্থ-ঘটিত রাজনীতির উৎকর্ষতায় ইংরাজ সিদ্ধ। সে বহুকাল ধরিয়া ইহার অনুশীলন করিয়াছে, ইহার জন্য যুদ্ধ করিয়াছে—এমন কি তাহার রাজাকে পর্য্যন্ত বলি দিয়াছে। এই রাজনীতিই Catholic, Protestant নির্ব্বিশেষে তাহাদিগকে patriot করিয়াছে এবং একতা বন্ধনে দৃঢ় নিবদ্ধ রাখিয়া, তাহাদের প্রতাপ আজ সমগ্র পৃথিবীকে অনুভব করাইতেছে। এই রাজনীতির বিপর্য্যয়ে ইংরাজের বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় বিপর্য্যয় ঘটিবে। ইংরাজ যাহা চাও তাহাই দিতে প্রস্তুত—সকল স্বাধীনতাই দিতে প্রস্তুত, কেবল তাহার নিকট রাজনৈতিক কিছু চাহিও না।

তেমনি ফরাসীর জাতীয়তা সমাজনীতির উপর, জার্ম্মানির ক্ষাত্রনীতির উপর এবং আমেরিকার অর্থনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সকল বিভিন্ন নীতির বিপর্য্যয়ে তত্তৎ জাতির জাতীয়তারও বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে বা ঘটিবে।

* * *

প্রাচীন ভারতবর্ষ, গ্রীক ও রোম, পরপর ধর্ম্ম সমাজ এবং রাজনৈতিক প্রাণসম্পন্ন ছিল। তাহাদের জাতীয়তা উৎসন্ন গিয়াছে ঐ সকলের অপকর্ষে। ধর্ম্মহীন হইয়া ভারতবর্ষ মুসলমান কবলিত হইয়াছিল। কিন্তু তখনও ভারত-ভারতী ধর্ম্মানুশীলন ত্যাগ করিলেও ধর্ম্মাদর্শ ত্যাগ করে নাই বলিয়া কোরাণ-তরবারধারী মুসলমান শাসনও তাহার বড় একটা কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই বরং হিন্দু মুসলমানকে তাহার স্বদেশী করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু যবন, হুণ উপপ্লাবন বা ইস্‌লাম ধর্ম্মোন্মাদ যাহা করিতে পারে নাই, আধুনিক প্রতীচ্য তাহা সম্পাদিত করিয়াছে। আজ পশ্চিমে ঝড় আসিয়া হিন্দুস্থানের মঠ, মন্দির ভূমিসাৎ, বৈজ্ঞানিক কল-কারখানা ও সভ্য সহরের

আবর্জ্জনায় তাহার ভক্তি-গঙ্গার পূত-ধারা কলুষিত, অপরা-বিদ্যার কালো মেঘ পরাবিদ্যার নির্ম্মল আকাশের জ্ঞান সূর্য্য ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। হিন্দু আদর্শ ভুলিতে বসিয়াছে, তাই আজ তাহার প্রাণবায়ুও বহির্-গমনোন্মুখ।

* * *

কলকারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া প্রতিমুখে কালিয়া-পোলাও দিলেও এ জাতির মঙ্গল নাই। অনুকরণ প্রাণের চিহ্ন নয়—উহা অপমৃত্যু। যাহার নিজস্ব স্বাধীন বৃত্তি নাই তাহা ত প্রাণহীন যন্ত্র। যে জাতি বা ব্যক্তি নিজস্ব স্বাধীন চিন্তা-বৃত্তির অনুশীলন না করিয়া পরানুকরণপ্রিয় হয় সেই জাতি বা ব্যক্তি আত্মহত্যা করিতেছে বা অপর ব্যক্তি বা জাতি স্বীয় চিন্তার দ্বারা তাহার ব্যক্তিত্ব বা জাতীয়তাকে হজম করিয়া ফেলিতেছে বুঝিতে হইবে। ইহার ফল আত্যন্তিক ধ্বংস।

* * *

এ দেশের কৃষকাদি জন-সাধারণের উপর রামায়ণ মহাভারত যেরূপ শীঘ্র কার্য্যকরী হইবে—মিল, কোমতে, নীচের দর্শন সেরূপ কার্য্যকরী হইতে কতদিন লাগিবে বা রাম, ভীষ্ম, কৃষ্ণ, সীতা, সাবিত্রী, সুভদ্রার জ্বলন্ত চরিত্র যেরূপ তাঁহাদের পক্ষে ক্ষিপ্র বলপ্রদ হইবে—পাশ্চাত্য কোন্ আদর্শ চরিত্র তাহাদিগকে তত শীঘ্র অনুপ্রাণিত করিবে তাহা আমরা বলিতে পারি না? কিন্তু একবার ভারতের আবালবৃদ্ধ বনিতাকে বুঝাইয়া দাও দেখি তাহার বহু সহস্র বৎসরের ত্যাগ মহিমাসম্পন্ন ধর্ম্ম আজ বিপন্ন, যে ধর্ম্মের একটী ধারায় বিশাল বৌদ্ধ সমাজের সৃষ্টি, খৃষ্টধর্ম্ম যাহার ছায়ায় এত প্রতাপান্বিত, যে ধর্ম্মের অনুশীলন দ্বারা তাঁহাদের পিতৃ পিতামহগণ আবহমান কাল ধরিয়া জগদ্‌গুরুর আসন রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন—আজ তাহাদের সন্তান, তোমরা অজ্ঞানারণ্যে পশুর ন্যায় ভ্রমণ করিতেছ, পরানুকরণেই তোমাদের প্রীতি। তখন দেখিবে নীতি আসিবে, উৎসাহ আসিবে, বলবীর্য্য, একতা জাতীয়তা সবই আসিবে—আর তখনই শুনিবে লক্ষ্য কল-কারখানার ঘর ঘর শব্দে, নিজ বাণিজ্য পোতের বংশীর স্বরে কণ্ঠ মিলাইয়া অসংখ্য নরনারীর উচ্ছ্বসিত সমুদ্র জল-কল্লোল-তুচ্ছিকৃত কোটী-বজ্র-নির্ঘোষে —! জয় শ্রীগুরুমহারাজজীকি জয়!

পতিত ও পতিতা।

(শ্রী:—)

"The woman in the street or the thief in the jail is the Christ that is being sacrifised that you may be a good man. Such is the law of balance. All the thiefs, and the murderers, all the unjust, the weakest, the wickedest, the devils, they are all my Christs!... ...They are all my teachers, are all my spiritual fathers, all are my saviours.... ...I have to sneer at the woman walking the street, because soceity wants it! She my saviour, she, whose street-walking is the cause of the chastity of other women! Think of that! Think, men and women, of this question in your mind. It is a truth! —A bare bold truth!

Swami Vivekananda.

প্রত্যেক মানুষের জীবনই একটি জটিল সমস্যা। গুটিপোকা যেমন আপনাকে আপনার সূত্র বন্ধনে আপনাকে আবদ্ধ করে, তেমনি প্রত্যেকটী মানুষ আপন কর্ম্মবন্ধনের জটিলতায় আপনাকে আবদ্ধ করিয়া বাহির হইয়া আসিবার পথ খুঁজিয়া পায় না। সহানুভূতি ও সমবেদনাহীন সাধারণ মানুষ আপনার দিকে ফিরিয়া না চাহিয়া, আপনার জীবন-সমস্যা তাচ্ছিল্য করিয়া পথভ্রষ্ট মানুষকে তিরস্কার ও অবজ্ঞা করে। সাধারণ দৃষ্টিতে একটি জীবনের আদি অথবা অন্ত আমাদের গোচরীভূত হয় না,—মধ্যস্থলের অল্প কয়েকটি মাত্র ঘটনার উপর নির্ভর করিয়া আমরা সাধারণ-সিদ্ধান্তে উপনীত হই। কত কালের, কত জন্মের মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা সমূহ সংস্কাররূপে সঞ্চিত হইয়া একটি জীবনের চরিত্রে নিয়ন্তৃত্ব করে তাহা স্থূলদৃষ্টিতে আমাদের চক্ষে পড়ে না।

কিন্তু ভগবানের অবতার, মহাপুরুষ ও সমাজসংস্কারক

আসেন আপনাদের হৃদয়ভরা প্রেম ও করুণা লইয়া। তাঁহাদের প্রেম ও করুণার ক্ষমা-সুন্দর চক্ষে অবজ্ঞা, বিরক্তি বা তুচ্ছতাচ্ছিল্যতা স্থান পায় না। জগতে ত্রিতাপের জ্বালা কেন, কলুষতা কেন, অবিচার কেন, নির্দ্দয়তা কেন?—প্রভৃতি প্রশ্ন প্রতিক্ষণে তাঁহাদের কোমল পবিত্র হৃদয়কে ব্যথা দেয় ও কাঁদাইয়া তুলে। এমনি এক করুণার উচ্ছ্বাস ভগবান বুদ্ধদেবকে কাঁদাইয়া তুলিয়াছিল। তাই জগত পুড়িয়া ছাই হইতেছে দেখিয়া তিনি প্রতিকারের পথ উদ্ভাবন না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার জীবন-চরিতকার লিখিয়াছেন বুদ্ধ-জীবনের একটী কর্ম্মও নিজের স্বার্থের জন্য সম্পাদিত হয় নাই। তিনি যে রাজপুত্র হইয়া, অরণ্যবাসী হইয়াছিলেন—তাহা জগতের দুঃখ নিবারণের উপায় উদ্ভাবন করিবার জন্য—নিজের মুক্তির জন্য নহে। এই মহান প্রেম ও করুণার উচ্ছ্বাসে ভগবান যীশু সগ্যধৃতা কুলটাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন ও ভগবান বুদ্ধ নৃপতির নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া বারাঙ্গনা অম্বাপালীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াছিলেন।

চুরি, ডাকাতি, হত্যা, ব্যভিচার, অবিচার, অত্যাচার, প্রভৃতি সুদূর অতীত হইতে আজ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। মানুষ চুরি করে কেন?—ব্যভিচার করে কেন?—জগতে পাপ কেন? এ সকলের কি কোন উপযোগীতা আছে? এই সকল ঘটনা সমাজ রক্ষার পরিপন্থীর অথবা পুষ্টির জন্য আবশ্যক? ইত্যাদি প্রশ্ন অতিশয় জটিল। পাপ কেমন করিয়া জগতে প্রবেশ করিল তাহা শিশু মানবের ক্ষুদ্র বুদ্ধিকেও ব্যাকুল করিয়াছিল। এডাম ও ইভ্ আনন্দে স্বর্গসুখ ভোগ করিতেছিলেন—কিন্তু সয়তানের প্ররোচনায় তাঁহারা যখন বিষবৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিলেন—অমনি দ্বিধা, লজ্জা, পাপ প্রভৃতির উদ্ভব হইল। সম্ভবতঃ ইহুদি ও আরবগণ এই সয়তানের ভাব প্রাচীন পারসীকগণের নিকট পাইয়াছিলেন। জেন্দাবস্তায় পাপ-সমস্যা মীমাংসার জন্য দুইজন ঈশ্বরের কল্পনা করা হইয়াছে—যিনি সত্যের প্রবর্ত্তক তাহার নাম অহুর মজ্দ আর যিনি অসতের প্রবর্ত্তক তাহার নাম অহ্রিম্যান্। এই প্রকারের

পাপ-বাদ প্রাচীন ভারতেও প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু ভারতীয় প্রতিভা সত্বরই উহাকে বিতাড়িত করে। বর্ত্তমান যুগের দর্শন রাজ্যে প্রবেশ করিলেও দেখিতে পাওয়া যায়—নানা দার্শনিক নানাভাবে পাপ-বাদের ব্যাখ্যান দিয়াছেন। স্পিনোজার সর্ব্ব-ঈশ্বর-বাদ (Pantheism), জগতের সত্তা উড়াইয়া দিয়া পাপ-বাদকেও উড়াইয়া দেয়। auDlism বা দ্বৈত বাদ দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বী ঈশ্বরের কল্পনা করে—অথবা প্রতিকূল পূর্ব্বাবস্থিত কোন জড় পদার্থ হইতে ঈশ্বর জগত সৃষ্টি করিয়াছেন এই প্রকার মত প্রচার করে। Theism বলে জগত শান্ত, সীমাবদ্ধ ও অসম্পূর্ণ ; সুতরাং এখানে পাপ না থাকিয়াই পারে না ; তবে Leibnitz এর মতে —পাপের একটি ভাল উদ্দেশ্য আছে—ইহা মানবজাতির নৈতিক শিক্ষার জন্য দরকার। হিগেল বলেন—পূর্ণ মঙ্গলের বিকাশের জন্য পাপ নিতান্ত প্রয়োজন। Sub specie aeternitatis পাপ বলিয়া কিছুই নাই ; আমাদের সঙ্কীর্ণতার দোষেই আমরা পাপ দেখি।

এই সম্বন্ধে স্বামীজী আমাদের কি নূতন চিন্তা দিয়াছেন—তাহা আলোচনার চেষ্টা করিব। তিনি বেদান্তের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর Ethicsকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং তদনুসারে moralityর বিচার করিয়াছেন। পাপ কোথা হইতে আসিল ? কেন আসিল ? এই প্রকারের প্রশ্ন বর্ত্তমান দার্শনিক গঠনে নূতন আকার ধারণ করিয়াছে। তাহা এই—জগতে বৈষম্য কেন ? এবং উহার প্রারম্ভ কোন্ কাল হইতে ? বেদান্ত এক চরম সত্যের প্রচারক—তিনি দ্বৈতভাব অস্বীকার করেন। এই একই চরম সত্য বিভিন্ন দৃষ্টিতে বিভিন্ন প্রকারে প্রতিভাসিত হয়। এই একই সত্য পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভূত হইয়া বহির্জগত, বুদ্ধির দ্বারা অনুভূত হইয়া অন্তর্জগত ও আত্মদৃষ্টিতে অনুভূত হইয়া চরম সত্যরূপে গোচরীভূত হন। এখন প্রশ্ন এই—বৈষম্য দৃষ্টিরূপ এই Delusion, এই মায়া কেমন করিয়া আসিল ? মানুষ এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না—কারণ logically এই প্রশ্নটি আকার ধারণ করিতে পারে না। এই মায়ার জগত

দেশ, কাল ও, নিমিত্তকে লইয়া। এই দেশ, কাল ও নিমিত্ত কেমন করিয়া কোথা হইতে আসিল? এই প্রশ্ন করিতে গেলে সর্ব্বাগ্রে এই তিনটিই স্বীকার করিয়া লইতে হয়। তাই স্বামীজী বলিয়াছেন—

"Within time, space and causation, it can never be answered and what answer may lie beyond these limits can only be known when we have transcended them: therefore the wise will let the question rest!"

জগতের আদিকাল হইতে এই মায়া—এই বৈসাদৃশ্য চলিয়া আসিতেছে। বেদান্ত কোন বাদ বা Theory দ্বারা এই ব্যবহারিক বৈষম্যকে তাড়াইয়া দিতে চেষ্টা করেন নাই; পরন্তু বৈষম্যের ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করিয়া লইয়া—চরমসত্যের ভিত্তি হইতে উহার সত্য ব্যাখ্যান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বেদান্তের মায়া কোন বাদ বা theory নহে—"It is the simple statement of facts of this universe of, how it is going on" জগত ইতিহাস, কত অবতার, কত মহাপুরুষ, সমাজসংস্কারক প্রভৃতির দর্শন লাভ করিয়াছে—কিন্তু তাঁহারা কেহই স্থায়ীভাবে কিছুই সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই। জগতটি যেন কুকুরের লেজ, কিছুতেই সরল হইতে চায় না। 'এই সংসারই স্বর্গরাজ্যে পরিণত হউক' ও 'সমগ্র মানবজাতি সত্যলাভ করিয়া পূর্ণ আত্মপ্রসাদ লাভ করুক' প্রভৃতি মহান স্বপ্ন সমূহ, অনেক করুণা-উদ্বেলিত-হৃদয় মহাপুরুষকে ব্যাকুল করিয়া তুলিলেও,—ভাল কখনও মন্দকে পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে নাই;—পরন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় ভালর মধ্যেই যেন মন্দের বীজ উপ্ত ছিল—যাহা অল্প কিছুকাল পরেই মন্দ ও ব্যাভিচারে পরিণত হইল। মানব-চরিত্র ও মানব-প্রকৃতি ভাল ও মন্দের মিশ্রনে গঠিত তাই যখন মানুষ কোন উচ্চ আদর্শ গ্রহণ করিতে যায় তখন সেই আদর্শকে নিজের প্রকৃতির সঙ্গে খাপ না খাওয়াইয়া গ্রহণ করিতে পারে না এবং পারে না বলিয়াই মহান্ আদর্শ আপনার আদি মনোহারিত্ব হারাইয়া ফেলে। স্বামীজী বলিয়াছেন—

"Thus the Vedanta Philosophy is neither optimistic nor pessimistic. It voices both these views and takes things as they are; it admits that this world is a mixture of good and evil, happiness and misery; and that to increase the one, must of necessity increase the other. There will never be a perfectly good or bad world because the very idea is a contradiction in terms."

এই মায়ার রাজত্বে সম্পূর্ণ ভাল (Absolute good) বা সম্পূর্ণ মন্দ (Absolute bad) বলিয়া কিছুই নাই। প্রত্যেকটি মন্দের মধ্যেও খুঁজিয়া দেখিলে ভালর বীজ বাহির হইয়া পড়ে। absolute পাপ বা absolute পুণ্য বলিয়া কিছুই নাই! পাপকে ছাড়িয়া যেমন পুণ্যের অস্তিত্ব অসম্ভব, তেমনি পাপের ভিতরও অন্বেষণ করিলে পুণ্য বাহির হইয়া পড়ে। আমরা কোন মানুষকে তাহার নিজের দিক হইতে বিচার করিতে পারি না—আমাদের ভিতরের সংস্কারের উপর প্রতিবিম্বিত করিয়াই কোন ঘটনার ভাল মন্দ বিচার করি। তাই স্বামীজী বলিয়াছেন—"The most wicked person may have some good qualities that I entirely lack. I see that every day of my life." স্বামীজী অন্য এক স্থানে বলিয়াছেন "বুদ্ধ করলেন আমাদের সর্ব্বনাশ আর যীশু করলেন গ্রীস্ রোমের সর্ব্বনাশ।" আপাতঃ দৃষ্টিতে এই কথাগুলি আমাদের নিকট বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়। কারণ প্রেম ও করুণার ভাবে উদ্বেলিত হইয়া যে সকল কার্য্য জীব কল্যাণের জন্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহারা কি প্রকারে অমঙ্গল প্রসূ হইতে পারে? বৌদ্ধযুগে অধিকারী, অনধিকারী বিচার না করিয়া সন্ন্যাস ও উচ্চ আদর্শের প্রচারে ও সমাজে বৈদিকপ্রণালীর অবহেলা হওয়ায়, খাঁটি ধর্ম্মভাবের অবনতির সহিত সমাজ শরীরও অল্পকাল মধ্যেই দূষিত হইয়া পড়ে। বুদ্ধদেবের দেহরক্ষার অল্পকাল পরেই বৌদ্ধসঙ্ঘে নানা বিশৃঙ্খলতার সূত্রপাত হয় এবং অবনতির পূর্ণ পরিণতির যুগে ধর্ম্মের নামে নানা বীভৎস আচার

সমাজ শরীরকে কলুষিত করিয়া তুলে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়—ভারতীয় সাধনার একটী বিশিষ্ট সমস্যা মীমাংসা করিতেই, বৌদ্ধযুগ আগত হইয়াছিল। খ্রীষ্ট ধর্ম্মের উচ্চভাবরাশি স্বীয় জীবনে পরিণত করিয়া কত নরনারী আধ্যাত্মিক উচ্চ অনুভূতি লাভ করিয়াছিলেন—তাহা আমরা ফ্রান্সিস্ অব এসিসি ও মধ্যযুগের অন্যান্য সাধু ও সাধ্বী-গণের জীবনী হইতে জানিতে পারি। কিন্তু অপরদিকে এই ভাবরাশিই নানাভাবে ব্যাখ্যাত হইয়া ইউরোপের জনসাধারণকে কি প্রকারে দুর্দ্দশার চরম সীমায় লইয়া গিয়াছে তাহা না ভাবিয়া থাকা যায় না। "Blessed are they that mourn for they shall be comforted. Blessed are they that shall hungar...... for they shall be filled" এই উপদেশ সমূহ স্বার্থপর লোকের দ্বারা প্রচারিত হইয়া জন সাধারণের দুর্ব্বলতার উপর আরও দুর্ব্বলতা ঘনাইয়া তুলিতেছে এবং এই প্রকার মানসীক অবসাদের সুযোগ লইয়া State ও Church নিদ্রিত জনসাধারণের লুণ্ঠন ও শোষন করিয়াছে।

চুরি, ডাকাতী, ব্যাভিচার প্রভৃতিকে আমরা খুব ব্যাপক ভাবে দেখিবার চেষ্টা করিব। সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ বিভিন্ন দিক্ হইতে এই সমূহের আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজের পর্য্যালোচনা করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে শক্তিশালী অল্পসংখ্যক একদল লোক ছলে বলে, কৌশলে অধিকসংখ্যককে লুণ্ঠন ও শোষণ করিয়াছে। সমাজনৈতিক সিদ্ধান্তের একদিক্ হইতে এই শেষ কথা। একজন মানুষ যখন অপর কাহাকেও হত্যা করে তখন তাহার ফাঁসির বিধি আছে। কিন্তু যখন একটি জাতি স্বার্থপরতার লেলিহান্ জিহ্বা বিস্তার করিয়া অন্য একটি জাতিকে হত্যা করিতে যায় তখন তাহা হত্যা বলিয়া গণ্য হয় না। একজন অন্য কাহারও কিছু না বলিয়া লইয়া গেলে তাহাকে চুরি বলা হয় এবং ইহার সমুচিত প্রতিবিধানের জন্য সমাজের ঘৃণা, জেল, কয়েদখানা প্রভৃতি বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক সমাজে যে অল্পসংখ্যক একদল লোক সমস্ত সুখের অধিকার, সৎচিন্তার অধিকার, ধর্ম্মের অধিকার ছলে বলে

কৌশলে একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছে—ইহা কি বড় চুরি নহে? ইউরোপের এই সৌভাগ্যের দিনে তিনভাগের দুইভাগ লোক যে আধ-পেটা খইয়া দিন কাটাইতে বাধ্য হয়, এই যে সমগ্র জগতের জন-সাধারণ হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রমের উপর অতি বড় সভ্যতার রসদ্ যোগাইয়া, নিজের হাতে সমগ্র জিনিষ প্রস্তুত করিয়া অনাহারে ও শিক্ষার অভাবে দুর্দ্দশার একশেষ প্রাপ্ত হইতেছে—ইহা কি বড় বড় চাতুরি ও চুরি হইতে উদ্ভূত নয়? অনেক দেশের ইতিহাসই দেখাইয়া দেয় অভিজাত যেখানে, দয়াপরবশ হইয়া ধর্ম্মপ্রচার, বিদ্যাদান, সামাজিক বা রাজনৈতিক সংস্কার করিতে গিয়াছেন তাহাদের প্রত্যেকটি তাহারা জনসাধারণকে শোষণ করিবার, লুণ্ঠন করিবার কৌশল ও সন্ধান রূপেই সম্পন্ন করিয়াছে। সাধারণ চুরি, ডাকাতি, হত্যা প্রভৃতি আমাদের চক্ষে পড়ে কিন্তু যে সকল বড় বড় কৌশলময়ী চৌর্য্যবৃত্তি, ডাকাতি, ব্যভিচার সাজানো গুছানো ভাবে তথাকথিত সভ্যতার শুভ্র-আবরণে আবৃত হইয়া সমাজকে শোষণ করিতেছে—তাহার প্রতিকার কোথায়?

কাহাকেও অবজ্ঞা করিবার অধিকার আমাদের নাই। আমরা নিজ নিজ অজ্ঞতা ও গোঁড়ামির দ্বারা অন্যকে দেখিয়া থাকি। একদল আমেরিকাবাসীর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল নিগ্রোজাতিকে স্বাধীনতা দিলে আমেরিকা ধ্বংস হইয়া যাইবে। ফল কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত হইল। গোঁড়ামী প্রবুক্ত অহঙ্কার আপনার বিশেষ অধিকার ছাড়িতে চায় না—তাই একদল মনে করেন—যাহারা অজ্ঞ, পাপী তাহারা যদি উচ্চভাব প্রাপ্ত হন—তাহা হইলে জগত ধ্বংস হইয়া যাইবে। প্রকৃতির রাজ্যে Law of balance সর্ব্বদাই রহিয়াছে। মানুষ প্রকৃতির ভিতরে থাকিয়া কখনই ইহাকে অবহেলা করিতে পারে না। সমুদ্রের প্রত্যেকটি তরঙ্গের উন্নতি অন্য তরঙ্গের অধঃপতনের উপর নির্ভর করে ঠিক সেই প্রকার পাপকে ছাড়িয়া পুণ্য ও পুণ্য ছাড়িয়া পাপ নাই। স্বামিজী বৃদ্ধের Rheumatismএর উদাহরণ দিতেন। উহা মাথা হইতে পায়ে যায়—পা হইতে সরাইলে হাতে উঠে। সুতরাং মানুষের চরিত্র আলোচনা করিবার

সময় আমাদের অধিকতর সহানুভূতি পরায়ণ হইয়া বিচার করা উচিত। আমরা অনেক সময় আশ্চর্য্য হইব যে, কি প্রকারে অতি কদর্য্যতার পশ্চাতেও কত মহান্ ও উদারতা লুক্কায়িত থাকিতে পারে। স্বামিজী বলিয়াছেন—"The whole universe is one of perfect balance. I do not know but some day we may wake up and find that the mere worm has something which balances our manhood..... when you are judging man and woman, judge them by the standard of their respective greatness. One cannot be in other's shoes. The one is no right to say the other is wicked." সৎ হইতেছে বলিয়া কাহারও বাহাদুরি লইবার যেমন কিছুই নাই, তেমনি পাপ বা ব্যভিচার করিতেছে বলিয়াই একজন ঘৃণ্য বা নিষ্পেষিত থাকিবে এমন কথা নাই। এমন কতকগুলি Psychological problems অলক্ষ্যে থাকিয়া মানুষের জীবনকে পরিচালিত করিতেছে যে, যে পুণ্য করিতেছে সে পুণ্য না করিয়া থাকিতে পারিতেছে না, আর যে পাপ করিতেছে সে পাপ না করিয়া থাকিতে পারিতেছে না। খুব সহানুভূতি ও সমবেদনার ভিতর দিয়া যাহারা মানুষের জীবন আলোচনা করেন—তাঁহারা কাহাকেও অবজ্ঞা করিতে পারেন না। প্রকৃতির ভিতরে ইচ্ছার স্বাধীনতা বলিয়া কিছুই নাই ; ইচ্ছা করার অর্থই আপনার চিরন্তন স্বাধীনতাকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা। কোন এক অদৃশ্য শক্তি যেন মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিতেছে—প্রকৃতির ভিতরে মানুষের কোন শক্তি নাই। স্বাধীন-ইচ্ছা সম্বন্ধে স্বামিজী বলেন—

"It is when the infinite existence comes, as it were, into the net-work of Maya that it takes the form of will. Will is a portion of that being caught in the net-work of Maya and therefore "free will" is a misnomer. It means nothing—sheer nonsense."

সমাজের চাওয়ার উপরই অনেক কুপ্রথার প্রচলন নির্ভর করে। সমাজ নিজ প্রয়োজন বশতঃই অনেক কুপ্রথায় সায় দেয়—অথচ সেই

উপকারটুকুর জন্য কৃতজ্ঞ থাকিতে চায় না। মানব-সমাজের অধিকাংশ লোকই পশু-মাংস ভোজন করে। ইহাতে যে কেবল পশু-হত্যাজনিত দোষ হয়—তাহা নহে, এই পশুমাংস ভক্ষণের জন্যই সমাজ কসাই বলিয়া এক শ্রেণীকে পৃথক করে। সমাজ নিজ প্রয়োজন বশতঃই কসাইশ্রেণীকে একটি নৃশংস বৃত্তিতে প্রবৃত্ত করায় এবং কৃতজ্ঞতার প্রতিদান স্বরূপ তাহাদের অবজ্ঞা ও ঘৃণা করে। বারাঙ্গনা সমাজের কোন প্রয়োজন না থাকিলে টিকিয়া থাকিতে পারিত না। সমাজে সতীত্বের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত একদল নারীকে এই জঘন্য বৃত্তি গ্রহণ করিতে বাধ্য করে। সামাজিক নিপেষণ কঠোরতা এবং দেশের নিদারুণ দারিদ্র্যও অনেককে এই জঘন্য বৃত্তি গ্রহণ করিতে বাধ্য করে। রংপুর জেলায় মুসলমানগণ নমঃশূদ্রদের উপর বড় অত্যাচার করিত; তাহারা কোন নমঃশূদ্র কুলনারীকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতে পারিলে গৌরব অনুভব করিত। এই প্রকারের অত্যাচার প্রপীড়িতা নারীগণের সমাজের কোন স্তরে স্থান হইত না বলিয়া তাহাদিগকে কলুষিত উপায়ে জীবন যাপন করিতে হইত। কিছুকাল পরে নমঃশূদ্র-সমাজ যখন এই প্রপীড়িতা নারীদিগকে সমাজে গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন—তখন তাহারা এই প্রকারের অসদ্বৃত্তি পরিহার করিল। সমাজের একদল লোক মদ manufacture করিতেছেন,—তখন সমাজের কার্য্যাবলীর পশ্চাতে সুস্পষ্ট এই অর্থ লুক্কায়িত রহিয়াছে যে সমাজে এমন একদল লোক থাকা চাই—যাহারা মদ পান করিবেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় সমাজ তাহাদের ঘৃণা করে আর সরকারের আইনের বিধানেও তাহাদের শাস্তি হয়। যাহারা ভিক্টার হুগোর "লা মিজারেবল" পড়িয়াছেন তাহারা মনে রাখিবেন চোর জিন্‌ভালজিন্ প্রত্যেক সমাজেই আছে। বিশেষতঃ ভারতবর্ষের চুরি, ডাকাতী প্রভৃতির জন্য দেশের দরিদ্রতা কতদূর দায়ী তাহার স্পষ্ট উত্তর পাঠক তাহার নিজে মনকে জিজ্ঞাসা করুন। 'লা মিজারেবল'এর রুটি চুরিরই মত আমাদের দেশের ভাত চুরি, সামান্য আস্‌বাব পত্র চুরির কথা শুনা যায়। ছলে বলে কৌশলে পরের কর্ম্মের ফল নিজের অধিকারে

আনিয়া অভিশপ্ত জনসাধারণকে যে চুরি, ডাকাতী প্রভৃতিতে প্রবৃত্ত করে তাহার আশু প্রতিকার সমগ্র সমাজের আমূল পরিবর্ত্তন—"Radical reform" ভিন্ন সম্ভব কি? একচক্ষু হরিণের মত এই সব বিষয় যদি আমরা সঙ্কীর্ণভাবে বিচার করিতে যাই—তাহা হইলে আমাদের হৃদয়হীন অজ্ঞতাই প্রকাশ পাইবে।

"We may make the mistakes but they may be angels unawares." পাপ পুণ্য, ভাল মন্দ প্রভৃতি বস্তুতন্ত্রহীন। একটী বস্তুকেই আমরা Subjectively ভাল মন্দ পাপ পুণ্য বলিয়া দেখি। দুইটি ঐরূপ পৃথক বস্তু নাই; একটী পদার্থ আমাদের দৃষ্টির পার্থক্য অনুসারে ভাল, মন্দ ও পাপ, পুণ্য রূপে প্রতিফলিত হইতেছে। সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য, ভাল মন্দ মানুষের আদর্শ হইতে পারে না। এই সমূহ মাত্র আমাদের মনে কতকগুলি অভিজ্ঞতার দাগ অঙ্কিত করিয়া সরিয়া পড়ে। অনেক সময় পুণ্য অপেক্ষা পাপ, সুখ অপেক্ষা দুঃখই আমাদের অধিক পরিমাণে অভিজ্ঞতা প্রদান করে। এই সকল দ্বন্দ্বের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ও ঘাত প্রতিঘাতের পশ্চাতে যদি মানুষের কোন চিরন্তন আদর্শ না থাকে, তাহা হইলে সমগ্র মানব জীবনই ব্যর্থতায় পরিণত হয়। বস্তুতঃ একটী সনাতন আদর্শ জন্ম-সত্ব রূপে প্রত্যেক প্রাণীতে চিরবিদ্যমান রহিয়াছে এবং যাবতীয় ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ধীরে ধীরে আমাদের সেই মহান্ আদর্শকেই ব্যক্ত করিতে চলিয়াছে। উপনিষদে দুইটি পাখীর গল্প আছে। একটি পাখী নিশ্চল ভাবে আপনাতে আপনি বিভোর হইয়া বসিয়াছিল—অপরটি স্বাদু ও তীক্ত ফলের আস্বাদ করিতে করিতে উপরের পাখীটীর দিকে অগ্রসর হইতেছিল। তাহার অভিজ্ঞতা শেষ হইয়া গেলে দেখিতে পাইল যে সে কখনও স্বাদু বা তিক্ত ফল ভক্ষণ করে নাই—সে চিরকালই উপরের পাখীর সহিত অনন্ত স্বরূপে বর্ত্তমান ছিল। এই অনন্ত স্বরূপ হইতে পৃথক অবস্থিত তীক্ত বা স্বাদু অন্য কিছুই ছিল না। স্বামিজী "Angels unawares" নামক কবিতায় লিখিয়াছেন—

"Then looking back, on all that made him kin
To stock, and stones, and on to what the world

Had shunned him for, his fall, he blessed the fall.
And with a joyful heart declared it "Blessed Sin."

পাপ স্বীকার করিতেন না। তিনি বলিতেন—"It is a sin to call a man sinner." তিনি মন্দকে কমভাল ও পাপকে কমপুণ্য বলিতেন। স্বকীয় মহান্ আত্মশক্তির উপর অবিশ্বাস ও দুর্ব্বলতাই চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার প্রভৃতির কারণ; তিনি মানুষের অনন্ত জ্ঞান ও শক্তির মহান্ বাণীই সমগ্র জগতে ঘোষণা করিয়াছেন। এই বিংশ শতাব্দীর নব-যুগে সমগ্র পৃথিবীর উপর দিয়া যে চিন্তা-বিপ্লব চলিয়াছে তাহা শিক্ষা, বিজ্ঞান, সমাজ প্রভৃতিতে নূতন আলো প্রদান করিতেছে। শিক্ষা সম্বন্ধে পূর্ব্ব ধারণা ছিল মানুষ স্বভাবতঃ অজ্ঞ আর বর্ত্তমানের ধারণা হইতেছে যে অনন্ত জ্ঞান মানুষের ভিতর স্বভাবতঃই বিদ্যমান—পূর্ব্বেধারণা ছিল মানুষ স্বভাবতঃ পাপী, ও অপরাধী আর বর্ত্তমান মত হইতেছে —মানুষ স্বভাবতঃ দেবতা; তাহার দেবত্বের উপর যে আবরণ পড়িয়াছে তাহা সরিয়া গেলেই তাহার পূর্ণত্ব প্রকটিত হইয়া পড়িবে। এই মহান্ ভাবের ক্ষীণ প্রেরণা হইতেই আমেরিকায় জেলখানার পরিবর্ত্তে এখন হইতেছে সংশোধন-আগার। নব্য সংশোধন নীতি অপরাধীকে ঘৃণা বা অবজ্ঞা না করিয়া তাহাকে সম্মান, ভালবাসা ও প্রেমের দ্বারা সংস্কার করিবার পথে চলিয়াছে। স্বামীজি মানুষের দেবত্ব ফুটাইয়া তুলিতে আত্মার মহিমাই ঘোষণা করিয়াছেন—"Strength. Strength is what the Upanishads speak to me from every page......Strength, it says, strength, oh man, be not weak. Are there no human weaknesses, says man? There are, say the Upanishads, but will more weakness heal them, would you try to wash dirt with dirt? Will sin cure sin, weakness? Strength oh man, Strength, say the Upanishads, stand up and be strong."

অপরাধীর শাস্তির নানা Theory আছে। তদনুসারে পাপ ও

দুষ্কর্ম্মের শাস্তি উদ্যত বজ্রের মত সুদৃঢ় ভাবে দণ্ডায়মান, নিদয় প্রহার করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহে। বিধি ও Ethics বলিতেছে— "চুরি করিও না, ব্যভিচার করিও না।" কিন্তু চুরি ও ব্যভিচার প্রভৃতির ভাব মন হইতে সমূলে উৎপাটিত করিবার কোন উপায় আজ পর্য্যন্ত কোন বিধিই দেখাইতে পারিল না। এই ভাব গুলি সহজাত সংস্কার রূপে আমাদের মনের অজ্ঞাত প্রদেশে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই বহুকাল সঞ্চিত সংস্কার রাশীকে ধীরে ধীরে মনের অজ্ঞাত প্রদেশ হইতে জ্ঞাত প্রদেশে আনয়ন করা প্রয়োজন। এক কথায় সমগ্র অজ্ঞাত মনটীকে জ্ঞাত মনের নিকট জাগাইয়া তুলাই আমূল সংস্কারের এক মাত্র উপায়। তাই স্বামীজী বলিয়াছেন—The great task is to revive the whole man, as it were, in order to make him the complete master of himself.

পাশ্চাত্য দেশের অনেক চিন্তাশীল মনীষীও ধীরে ধীরে এই প্রকারের সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছেন। তাঁহারা অপরাধী, হত্যাকারী প্রভৃতিকে বিশেষ প্রকারের রোগী বলিয়া মনে করেন। রোগীকে হাঁসপাতালে যে সহানুভূতি ও শুশ্রূষা দ্বারা চিকিৎসা করা হয়, কারাগারের অপরাধীদিগকে সেই প্রকারের প্রেম ও সহানুভূতি দ্বারা সংশোধিত করিবার মত দিতেছেন। বিলাতের কারাগার সম্বন্ধীয় কোন এক পুস্তকের ভূমিকায় Brnard Shaw লিখিয়াছেন—

"Why a man who is punished for having an inefficient conscience, should be privilsed to have an inefficient lungs— is a debatable question. If one is sent to prison and other to hospital, why make prison so different from the hospital."

অবজ্ঞা, ঘৃণা বা তাচ্ছিল্য করিয়া কাহারও কোন উপকার করা যায় না। মানুষের দুর্ব্বলতা না দেখাইয়া যদি তাহার দুই একটি গুণ দেখাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে তাহার মনেও বিশ্বাস আসে ও নিজের উপর শ্রদ্ধা জন্মে। প্রকৃত সংস্কারক কাহাকেও ঘৃণা না করিয়া প্রেম ও ভালবাসার দ্বারা মন্দ লোকেরও ভাল দিকটি বিকশিত করিতে

চেষ্টা করেন। মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে উচ্চ-ধারণাই আমাদিগকে অবজ্ঞা ও ঘৃণার হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে।

অপরাধী যখন কেবল আপনার উপরে উদ্যত বেত্রধারী-শাস্তিদাতা, কাহাকেও দেখে তখন সে যে মানুষ এই ভাবটি ভুলিয়া যায়। শাস্তিদাতা অপরাধীর মনুষত্ব অস্বীকার করিয়া আপনাকেও অধোগামী করেন। নিন্দা, অবজ্ঞা বা শাস্তি দ্বারা সংশোধন হইতে পারে না—। প্রেম ও সম্মানের দৃষ্টিতে, fanaticism ও হঠকারিতা পরিত্যাগ করিয়া আমাদের মানুষের প্রতি দৃষ্টিপাতা করা প্রয়োজন।

"Condemn none ; if you can stretch out a helping hand, do so. If you cannot, fold your hands, bless your brothers and let them go their own way . Dragging down and condemning is not the way to work. Never is work accomplished in that way."

অনিবার্য্য মৃত্যু।

(ব্রহ্মচারী ত্যাগচৈতন্য)

এ বিশ্বে সবারি যদি
মরিতেই হবে,
নীরব নিস্পন্দ তবে
কেন পড়ে রবে।
মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে
জগৎ সেবার,
দেও আত্ম বলিদান
আছে শান্তি তায়।
ম'রেও অমর হবে
কি ভাবিছ মিছে,
পিছনে আসিছে মৃত্যু
লেগে যাও কাজে।

আদিনাথ।

(শ্রীলাবণ্যকুমার চক্রবর্ত্তী)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পুঞ্জীকৃত অস্থিরাশির খোঁচা খাইয়া খাইয়া দুইজন পরিচিত লোকের সহিত চলিতে লাগিলাম—একটি এগার বারো বৎসর বয়স্ক কিশোর, অপর আমাদেরই সমবয়স্ক একটি ভদ্রলোক। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ, বাড়ী ময়মনসিংহ, ইনি গ্রেজুয়েট, এক সময়ে হাইস্কুলের হেডমষ্টোরী করিতেন। এখন কোনও বড় জমিদারের ম্যানেজারী পাইয়া বিষয়-কর্ম্মে লিপ্ত হইবার পূর্ব্বে তীর্থ তথা দেশভ্রমণে আসিয়াছেন। আমরা অবিলম্বে তাঁহার ছাত্রত্ব না হইলেও আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইলাম বা তিনিই ভাব ও ভাষার সাহায্যে আমাদের যে এরূপ হওয়া উচিত তাহা বুঝাইয়া দিলেন। বালকটীর সঙ্গে জাহাজেই বিশেষ আলাপ হইয়াছিল। বালকটী বেশ চোথাচাথা। আদিনাথ নিবাসী একটি বারুইর ছেলে। আপন স্বভাবগুণে কোনও কলিকাতার বাবুর স্নেহ বা ভালবাসার পাত্র হইয়া পড়িয়াছে। থাকে কলিকাতায়ই, এখন মা বাপকে দেখিয়া যাইবার জন্য বাড়ী আসিয়াছে। ভাষা একেবারে কলিকাতা অঞ্চলের কথ্যভাষা। চট্টগ্রামের "ন আস্যুম ন আস্যুম" মোটেই নহে।

বালকটী পড়াশুনা করে না, বলিল পৈত্রিক ব্যবসায় (পান বেচার) উন্নতি করিবে। এতে (স্বাধীন ব্যবসায়) তার লজ্জা থাকিবার কোনও কারণ নাই। ইত্যাদি অনেক পাকা এবং মুন্সিয়ানা কথা বলিয়াছিল। তাহার নিকট হইতে যথাসম্ভব স্থানীয় তথ্য অবগত হইলাম। এবং সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইলাম যে পরদিন ভোরে আসিয়া আমাদিগকে লইয়া আদিনাথের অবশ্যদর্শনীয় স্থানগুলি যেন দেখাইতে আলস্য না করে। সে সানন্দে স্বীকৃত হইল এবং "নিশ্চয়

আসিব," বলিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু দুঃখের বিষয় বালকটী আর আসে নাই। একি কলিকাতার শিক্ষার চাল?

আমরা বাবা আদিনাথের বাড়ীতে পৌছিলাম। তখন সন্ধ্যা প্রায় হইয়া আসিয়াছে। পরদিন ভোরে স্নানান্তে দেবাদিদেব দর্শন করিব স্থির করিয়া আস্তানা গাড়িবার ও সারাদিন বিশ্রামপ্রাপ্ত পেটটাকে একটু শ্রম করাইবার অভিপ্রায়ে ব্যস্ত হইলাম। একজন ব্রাহ্মণ বাহিরে আসিলেন, বসিবার একটু স্থান দিয়া তামাকুর হুকুম দিলেন—ভক্তসঙ্গিদ্বয় তামাকুর অর্চ্চনা করিয়া" যেন নবজীবন লাভ করিলেন, অভক্ত আমি নীরস প্রাণ লইয়াই বসিয়া থাকিতে বাধ্য হইলাম। আলাপাদির ফলে জানিলাম যে থাকিবার সাধারণ যাত্রি-নিবাস ও জলমশলা দিবার জন্য একটি লোক পাইব, তাহাকে কিছু দিতে হইবে। আমরা কিন্তু পাণ্ডা ঠাকুরের পাকে আমাদের প্রসাদের স্থান করিবার জন্য কতকটা নিস্ফল প্রয়াস পাইলাম। মূল্য অতি-মাত্রায় বাড়াইয়াও যখন সফলকাম হইতে পারিলাম না তখন চট্টগ্রামের অন্যতম ভূম্যধিকারী এবং আদিনাথ দ্বীপের অপ্রতিদ্বন্দ্বী জমিদার পাগলচিকিৎসক দানশীল এবং বিশ্রুত কীর্ত্তি রায় বাহাদুর প্রসন্নবাবুর কাছারী বাড়ীতে আশ্রয়ের জন্য তল্পীতল্পা সহ ছুটিলাম—প্রায় ১ মাইল দূরে। তখন হাট ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। সূর্য্য-ঠাকুর দিবসের কাজটা গুছাইয়া লইয়াছেন। পাগলচিকিৎসা ব্যপদেশে রায় বাহাদুরের সঙ্গে লেখকের দুইএকবার পত্রবিনিময় ঘটিয়াছিল। ইহাতে এবং পাগলের আত্মীয় বন্ধুগণ প্রমুখাৎ প্রসন্নবাবুর সদাশয়তা পরোপ-কারিতা অমায়িকতা প্রভৃতি সদগুণের যে চিত্র হৃদয়ে অঙ্কিত ছিল তাহাই তাহার কাছারী বাটীর দিকে আমাদিগকে টানিয়া লইল। কিন্তু তখন ভাবিতে পারি নাই যে, কাছারী বাটীটা আর প্রসন্নবাবু নহেন—তার প্রাপ্ত কর্ম্মচারিগণ প্রসন্নবাবু হইতে পারেন না। আমাদের সঙ্গী ম্যানেজার বন্ধুটী 'কাছারীর চার্জ্জে কে আছেন' বলিয়া একজন পরিদর্শক কর্ম্মচারীর মত যখন বক্তব্য সুরু করিলেন 'পাণ্ডারা আমাদিগকে জিজ্ঞাসাটা করিল না' বলিয়া বিষয়টী ফেনাইয়া তুলিলেন, পক্ষান্তরে

স্বয়ং ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীটী তাহার উত্তরে একটু বিদ্রূপের প্রচ্ছন্ন খোঁচা মারিয়া যখন কাছারী বারিন্দায় তাসখেলায় সমাসীন কর্ত্তা পাণ্ডা ঠাকুরকে ডাকিয়া বলিলেন—তখন আমরা হাইস্কুলের হেডমাষ্টার বা ম্যানেজার হইলেও বুঝিতে বাধ্য হইলাম যে ক্ষুধার তীব্র তাড়নার মধ্যেও কতকটা সময় নেহাৎ অযথাই কাটাইতে হইবে, অন্য ফল যাই হউক।

পাণ্ডাঠাকুর আমাদের অনাদরের কথাটা বিশ্বাসই করিতে পারিলেন না। তাঁহার সদগুণ নিচয় ও যাত্রী সমাদরের সুদীর্ঘ ইতিহাস ঠাকুরমার ঝুলি ঝাড়া গল্পের মত ফাঁদিয়া বসিলেন।—প্রমাদ গণিলাম। তারপর আর কি করি আমরাও কড়া-মিঠা করিয়া বন্ধুর সম্মান যথাসম্ভব বজায় রাখিয়া সন্ধির সাদা নিশান উড়াইয়া দিলাম এবং অতি সত্বর সন্ধি স্থাপিত হইল।

প্রসন্নবাবুর ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী যখন সংক্ষেপে জানাইলেন যে তিনি সাহায্যের জন্য লোকও দিতে পারিবেন না, থাকিবার জন্য অতিসাধারণ-বেড়া বিহীন খোলাঘর ছাড়া ঘরও দিতে অসমর্থ তখন মহান্ত ঠাকুরেরই শরণাপন্ন হইতে হইল। সূচনা যেরূপই হউক না কেন অতঃপর কিন্তু মহান্ত ঠাকুরের কৃপায় হাট বাজার সারিয়া আবার আদিনাথের বাড়ীতেই একদিনের গৃহস্থালী পাতিয়া বসিলাম। মহান্ত ঠাকুর না হইলে ভাষা বৈগুণ্যে আমাদের বাজার করা সম্ভবপর হইত না। আদিনাথের ভাষা বাঙ্গালা কিন্তু আমাদের বুঝিবার যো নাই—সে অপূর্ব্ব বাঙ্গলা।

সেদিন অমাবস্যা। গাঢ় অন্ধকার। পর্ব্বতের ঠিক নিম্নে—বহুনিম্নে সমুদ্রতীর, সূচীভেদ্য অন্ধকারে সম্পূর্ণ অদৃশ্য। কেবল সন্মুখস্থ দীর্ঘাকার ঝাউগাছগুলি প্রেতাত্মার মত পরিদৃষ্ট হইতেছিল। গাঢ় অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া চুপটী করিয়া বসিয়া আছি, এবং ক্রমবর্দ্ধমান জোয়ারের মৃদুমন্দ শব্দ শুনিতেছি। হঠাৎকানে একটা অপূর্ব্ব শব্দ আসিল। বোধ হইল যেন একটী অপূর্ব্ব প্রাণী ফুপাইয়া, ফুপাইয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে। ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম এটা বর্দ্ধমান জোয়ারের মধ্যাবস্থার শব্দ। বেগ যতই বাড়ে শব্দ ততই অপূর্ব্ব শুনায়।

তখন সাঁই সাঁই করিয়া বাতাসও বহিতেছিল। শিববাটীস্থ প্রকাণ্ড ঝাউগাছগুলিও যেন জোয়ারের শব্দে স্থির থাকিতে না পারিয়া বাতাসের সঙ্গে যোগদান করিয়া অপূর্ব্ব সঙ্গীত জুড়িয়া দিল। জোয়ারের শব্দ ঝাঁউগাছের শব্দের সহিত মিলিয়া গিয়া এক অপূর্ব্ব শব্দতরঙ্গের সৃষ্টি করিল—সে অশ্রুতপূর্ব্ব শব্দ ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিল। গুরুগম্ভীর শব্দপ্রবাহে শ্রবণযুগল ভরিয়া যাইতেছিল এবং শুনিতেছিলাম অশ্রান্ত অনাহত ধ্বনি "হর হর ব্যোম। হর হর ব্যোম।" আর দেখিতেছিলাম কালভৈরবের বিরাট অন্ধকারের সাকার মূর্ত্তি। সে কাল-রূপ এখনও চোখে লাগিয়া আছে। ভূতনাথ প্রিয় সহচর ভূতদল সহ তাণ্ডবনৃত্য করিতেছেন। লম্ফে ঝম্ফে মেদিনী সত্য সত্যই প্রকম্পিত হইয়া উঠিতেছে। এ উদ্দাম তাণ্ডবনৃত্য থামিল না। উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিল, ভৈরব হুঙ্কারে কাণে তালা লাগিল। ভূতের দল যেন সমুদ্র হইতে পর্ব্বত গাত্রে আবেগে আপতিত হইতেছিল। শব্দ চরমে উঠিয়াছিল এখন একটু নামিয়া পড়িল। এই গভীর নিশিথে উদ্দামতার সহিত যেন একটু গাম্ভীর্য্য মিলিয়া আসিল। ভীতি মধুর ভৈরব হুঙ্কার ক্রমশঃই শান্তপ্রদ গম্ভীর হইয়া চলিল। ভাটা পড়িল। ক্রমশঃই 'শান্তম্' 'শিবম' তারপর প্রাণের সহিত 'অদ্বৈতম্' হইয়া পড়িল—অজ্ঞাতে ঘুমাইয়া পড়িলাম। অতি ভোরেই জাগিয়া গামছা খানিকে ঝুলির আকারে সাজাইয়া জমিদার ও ম্যানেজার বন্ধুদ্বয়কে ঘুমের কোলে রাখিয়াই শঙ্খধরিতে ও ঝিনুক কুড়াইতে সমুদ্রতটে পৌঁছিলাম। তখন জোয়ারের উন্মেষমাত্র। সমুদ্র গর্ভে বহুদূর পর্য্যন্ত চড়া পড়িয়াছে।

শ্রীচরণ দুখানিকে পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা করিয়া ঊষার সমুদ্র বা সমুদ্রে ঊষা দর্শনের সাধ মিটাইয়া এক ঝুলি রকমারি ঝিনুক ও গুটিকার শঙ্খ লইয়া যখন আড্ডায় ফিরিলাম তখন ম্যানেজার বন্ধু বাছাবাছা কয়েকটী গ্রহণ করতঃ আমাকে নেহাৎ অনুগ্রহপূর্ব্বক যখন দাতার আসনে উপবিষ্ট করাইতে চাহিলেন তখন দানমাহাত্ম্যে সত্য সত্যই আমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়াছিল।

মহাদেবর পূজার্চ্চনার জন্য এবং নিজেদের হাটবাজার করিয়া ম্নানান্তে দীর্ঘকাল মহাদেব সন্দর্শন প্রত্যাশায় অতিবাহিত করিতে হইল।—কারণ প্রসন্নবাবুর জনৈক কর্ম্মচারী সস্ত্রীক শুভাগমন করিয়াছিলেন। এই কর্ম্মচারী প্রবরের সঙ্গী ভৃত্যটী পর্য্যন্ত দর্শন কার্য্য সমাধা করিলে পর আমাদের ডাক পড়িল। তখন বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহর। মহান্ত ঠাকুর কৈফিয়তৎ প্রদান করিলেন "কি করি বাবু, যাঁদের মিরাশদারীতে বাবা (আদিনাথ শিবলিঙ্গ) আছেন তাঁহাদের আগে ত আপনাদিগকে স্থানে দিতে পারিনা" ইত্যাদি। লঙ্কেশ্বর রাবণ পূজিত আদিনাথের পৌরাণিক কাহিনীটীর সহিত বর্ত্তমান 'বায়তির' অবস্থা মিলাইয়া একটু হাসিতে বাধ্য হইলাম। যাক—

দর্শন স্পর্শন পূজার্চ্চনা করিলাম। আদিনাথ শিবলিঙ্গ ও অষ্টভূজা দেবী। পাণ্ডাঠাকুরের কাছে নেপাল হইতে আনিতা অষ্টভূজার কাহিনী যাহা শুনিলাম তাহা এক অপূর্ব্ব বিরাট মহাভারত। এস্থানে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব পর নহে। আর আদিনাথের পৌরাণিক কাহিণী অনেক হিন্দুই অবগত আছেন। এই সেই পুরাণ প্রসিদ্ধ মৈনাক পর্ব্বত; যিনি দেবরাজ ইন্দ্রের ভয়ে সমুদ্রগর্ভে ডুব মারিয়া ছিলেন, আবার এই দেবতাদেরই কল্যাণের জন্য যিনি সমুদ্র গর্ভ হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া রাবণেশ্বর এই আদিনাথ শিবকে আটকাইবার সুযোগ দিয়াছিলেন। বৈদ্যনাথ কাহিণীর সহিত আদিনাথ কাহিনীর যথেষ্ট সামঞ্জস্য বিদ্যমান রহিয়াছে। বৈদ্যনাথে রাবণের দীঘি, আর আদিনাথে সমুদ্রে পতিত একটি নদী।

শিবলিঙ্গের শীর্ষদেশে রাবণের রাগের ফল বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের চাপ চিহ্ন ইত্যাদি অনেক হুবহু মিল রহিয়াছে। যাক পুরাতত্ত্ববিদগণ এসব আলোচনা করিবেন। আমি অন্য প্রসঙ্গ ধরিলাম। আদিনাথে প্রাপ্ত হিন্দুর খাদ্য সামুদ্রিক মৎস্যের শেরা "রূপচাঁন ও কারমুনা" খাইতে ভুলি নাই। একটী 'চাঁদা' পাঁচ আনা এবং একটী 'কারমুনা' চারি আনায় ক্রীত হইল। এঞ্চলে জাতিতে যাহাই হোক—এতটা মাছ একটাকা বা পাঁচ সিকার কম হইবে না। ম্যানেজার বন্ধুর

কিন্তু এতেও আশঙ্কা হইয়াছিল—তিনটী প্রাণীর ভূরিভোজন হইবে কি না? আহারের সময় কিন্তু বন্ধুটী অবাক্ হইয়া দেখিলেন যে এক তৃতীয়াংশও চলিল না। তাঁহার অবস্থা বড়ই হাস্যকর হইয়াছিল "ছাড়িতেও কাঁদে প্রাণ, রাখিতে গেলে বিষম দায়।"

আমাদের সঙ্গী জমিদার বন্ধু এই অপূর্ব্ব মৎস্যাহারের কৃপায় দিন কয় পর্য্যন্ত মাছ দেখিলেই যেন বমি করিয়া ফেলিবেন বোধ হইতে। আমি অনেকটা মৎস্যাশী হইলেও শিববাটীস্থ তুলসী বনের কিয়দংশ সিদ্ধ জল খাইয়া নাড়ীভুড়ি ধুইয়া তবে চাঁদা মাছের হাত হইতে নিস্কৃতি লাভ করিয়া ছিলাম। এই মাছের প্রশংসা সর্ব্বতোমুখী, আমাদের মত অপূর্ব্ব দুটী প্রাণীর কিন্তু বিপরীত দশা ঘটিল!

অন্য কথা বলিবার পূর্ব্বে এখানে আদিনাথের ভৌগলিক এবং ঐতিহাসিক সামান্য পরিচয় দেওয়া আবশ্যক মনে হইতেছে। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ১২।১৩ মাইল্ এবং প্রস্থে প্রায় ৫।৭ মাইল হইবে। দক্ষিণদিক ক্রমশঃ ঢালু হইয়া সমুদ্রে গিয়া মিশিয়াছে। উত্তর দিক পাহাড় সঙ্কুল, ফাঁকে ফাঁকে সমতল ভূমি এবং কৃষির উপযোগী জমি। কৃষির জমি কিন্তু দক্ষিণ দিকেই বেশী। অধিবাসী মগ এবং নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু এবং মুসলমান। প্রায় সকলই কৃষিজীবী মগদের অধিকাংশই মৎসজীবী। পাহাড়গুলি হরিণাদি বন্য পশু এবং অন্যান্য হিংস্রজন্তু সমাচ্ছন্ন। জল বায়ু উত্তম—অধিবাসিগণের মোটা-গাটা এবং স্বাস্থ্য সম্পন্ন চেহারাই তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন।

তরীতরকারী পর্য্যপ্ত—চাউল ধান এখনও বাঙ্গলার অন্যান্য স্থানের তুলনায় খুব সস্তা বলিয়া বোধ হইল। আধুনিক সভ্যতার নিদর্শন একটি মাত্র পোষ্ট আফিস এবং থানা। থানার দারোগাবাবুই গবর্ণমেণ্ট পক্ষে সর্ব্বময় কর্ত্তা। ডাকবিলীর ব্যবস্থা সপ্তাহে তিনদিন। কোনও চিকিৎসক বা চিকিৎসালয় নাই—প্রয়োজনও বোধ হয় ততটা নাই। প্রসন্ন বাবুর একটী কর্ম্মচারী হোমিওপ্যাথিক ঔষধ রাখেন দেখিলাম। ইনিই বোধ হয় সেখানকার ধন্বন্তরী।

পৌরাণিক যুগের বহুপরে কয়েক শত বৎসর মাত্র পূর্ব্বে কোনও

মুসলমান জমিদারনন্দন শিকার ব্যপদেশে আদিনাথের জঙ্গলে আসিয়া একটি হরিণ বন্দুকের গুলিতে আহত করেন, কিন্তু জবাই করিতে গিয়া ছুরিতে না কাটায় উহা সন্নিকটবর্ত্তী একটা পাথরে, শান দিতে যান। কিন্তু শানের সঙ্গে ঝিক্ ঝিক্ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠে। ঐদিন রাত্রে জমিদার স্বপ্ন দেখেন তাঁহার পুত্র আদিনাথের গায়ে ছুরিশান্ দিয়াছে। আদিনাথ সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পূর্ব্বাপর ইতিহাস বিবৃত করেন। সয়তান স্বপ্ন দেখাইতেছে বলিয়া মুশলমান জমিদার বার বার ঘুমাইতে নিষ্ফল প্রয়াস পাইলেন, ঘুম আসিবা মাত্রই একই স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। অবশেষে আদিনাথ যখন ভয় প্রদর্শন করিলেন এবং 'পূজা প্রতিষ্ঠা করতঃ তাঁহার প্রচার না করিলে সর্ব্বনাশ হইবে' বলিলেন তখন জমিদার উঠিয়া বসিয়া তাঁহার ছেলেকে জিজ্ঞাসায় হরিণ মারা এবং ছুরি শান দেওয়ার অবিকল গল্প শুনিয়া ভীত ও বিস্মিত হইলেন—এবং পরদিনই জনৈক হিন্দু অভিজ্ঞের নিকট আদিনাথের পৌরাণিক কাহিনী শ্রবণ করিলেন এবং তাঁহার স্বপ্নশ্রুত কাহিনীর সহিত অবিকল মিল দেখিয়া অতীব বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। জমিদার অবিলম্বে শিবলিঙ্গকে তাঁহারই নির্দ্দেশমত সমীপবর্ত্তী একটী টিলার উপর স্থাপিত করাইলেন এবং ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিয়া উপযুক্ত সেবা পূজার বন্দোবস্ত করাইয়া দিলেন। আদিনাথ তখন পর্য্যন্ত লোকালয় বিহীন জঙ্গলে ছিলেন—এই প্রথম লোকালয়ে প্রতিষ্ঠ হইলেন। সেই মুসলমান প্রতিষ্ঠিত বাড়ীই আদিনাথের বর্ত্তমান বাড়ী। যে টিলায় জমিদার নন্দন প্রথম শিবলিঙ্গ প্রাপ্ত হয়েন তাহা এখন জঙ্গলাকীর্ণ। যাক্ ইহা পাণ্ডা এবং অন্যান্য দু একজন স্থানীয় লোক মুখে শ্রুত গল্প, সত্যমিথ্যা আদিনাথ জানেন।

তারপর একসময় বৌদ্ধমন্দির, "ফুঙ্গির" (পুরোহিতের) বাসস্থান "কিয়াঙ্গ" (আশ্রম) দেখিতে বাহির হইলাম। আদিনাথ বাড়ীর সন্নিকটস্থ পশ্চিম প্রান্তবর্ত্তী আদিনাথের পাহাড় শ্রেণীর সর্ব্বোচ্চ শিখরে অবস্থিত একটা মন্দির অতি প্রাচীন বলিয়া বোধ হইল। চারিদিকে চারিটী বৃহদাকার প্রস্তর নির্ম্মিত সিংহ মূর্ত্তি। মন্দির পিরামিডের আকারে ক্রমোন্নত এবং সূক্ষ্ম হইয়া গিয়াছে। এখান হইতে দক্ষিণদিকে

সাগরদৃশ্য অতি চমৎকার। মন্দিরাভ্যন্তরে বুদ্ধদেবের মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত অতীব মনোরম মূর্ত্তি, পশ্চাতে তেমনি সুন্দরী স্ত্রী মূর্ত্তি। মূর্ত্তি দুইটীর অবয়ব হইতে কিছু ভাব সংগ্রহ করিতে পারিলে সুস্পষ্ট দেখিয়াছি—স্ত্রীমূর্ত্তি তৎপত্নী গোপাদেবীর। বুদ্ধদেব ধ্যানমগ্ন, গোপা তাঁহারই চরণযুগলে করুণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তন্ময় চিত্তে দাঁড়াইয়া আছেন। মুখশ্রী গম্ভীর, বিষাদব্যঞ্জক। কি সুন্দর? শিল্পীকেও ধন্যবাদ—এমন সুন্দর মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছেন!!

আমরা, বন্ধুদ্বয়, ষাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলাম, ভাবিয়া দেখিলাম হৃদয়ে বুদ্ধদেবের স্থান বাবা আদিনাথের স্থানের উচ্চে না হউক, একটুও নিম্নে নহে।

তারপর পাহাড় হইতে অবতরণ করিয়া সমতল ভূমিতে দুইটী 'কিয়াঙ্গ' ও ৫।৭ জন 'ফুঙ্গি' দেখিলাম। ফুঙ্গিগণ জাতিতে মগ, বর্ণ উজ্জ্বল গৌর, পরিধানে গেরুয়া বসন, চোখে মুখে বৈরাগ্য ও পবিত্রতার একটা ছায়া সুস্পষ্ট। আদিনাথ বাবার কোনও ব্রাহ্মণ ভক্তের গঞ্জিকা প্রসাদ লব্ধ ঢুলু ঢুলু চোখ দুইটী ও কামকাঞ্চনের ছাপমারা মুখখানির সহিত এই চোখ মুখের কত প্রভেদ। প্রাণে একটা কষ্টের দাগ পড়িল। যেহেতু লেখক ব্রাহ্মণ! থাক—

বুদ্ধদেবের ছোট বড় নানা ধাতুনির্ম্মিত, অনেকগুলি মূর্ত্তি দেখিলাম। একফুট হইতে দশফুট পর্য্যন্ত উচ্চ মূর্ত্তি অতি পরিপাটীর সহিত সংরক্ষিত। শুনিলাম এই সকল মূর্ত্তি সংগ্রহ করিতে সহস্র সহস্র টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। সর্ব্বোচ্চ মূর্ত্তিটী পিত্তল নির্ম্মিত। গৃহগুলি মূল্যবান কাঠের দক্ষ কারিকরের কৃতী-হস্ত সম্পাদিত, শিল্প নৈপুণ্য প্রশংসার যোগ্য। 'মাচাং' গুলি কাষ্ঠ নির্ম্মিত, ভূমিতল হইতে প্রায় ৩ ফুট উর্দ্ধে অবস্থিত। এটী মগ জাতির সাধারণ ফ্যাসান। সামান্য কুড়ে ঘরখানিও ভূমিপৃষ্ঠ হইতে উর্দ্ধে কাঠ বা বাঁশ নির্ম্মিত হইয়া থাকে। শুনিলাম 'ফুঙ্গিগণ' চিরকুমার। স্ত্রীলোকদর্শন স্পর্শনাদি তাঁহাদের পক্ষে একান্ত নিষিদ্ধ। ইঁহারা সন্ন্যাসী জীবনের সম্পূর্ণ কঠোর নিয়মাধীন। কাহারও অতটুকু ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য জন্মিলে পুরোহিতের আসন ছাড়িয়া অন্য দশজন গৃহস্থের

এক জন হইতে হয়। অন্যথা আহারাদির জন্য চিন্তা করিতে হয় না। আশ্রমের সেবকগণ ফুঙ্গির থালা লইয়া মগপল্লীতে বাহির হয় এবং যে যাহা পারে পক্কান্নব্যঞ্জনাদি দিয়া থালা পূর্ণ করিয়া দেয়। প্রত্যেক 'কিয়াঙে'ই মগশিশুগণ এই সকল 'ফুঙ্গিগণের' তত্ত্বাবধানে লেখাপড়া ও চরিত্র গঠনের জন্য প্রেরিত হইয়া থাকে। এখানে বৌদ্ধযুগের নালন্দার স্মৃতি মনে পড়ে, ফুঙ্গি ভিন্ন অন্যান্য মগগণকে অন্ততঃ আদিনাথে মগ-জাতিকে অনেকটা বিলাসী বলিয়া বোধ হইল। স্ত্রীপুরু নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকের মুখেই সিগারেট গুজা আছে, চিম্‌নী-মুখে যেন সর্ব্বদাই ধূম্র বিনির্গত হইতেছে। স্ত্রীলোকগুলি কিন্তু আসাম ও ব্রহ্মদেশের স্ত্রীলোকের মত কর্ম্মঠা। পুরুষগুলি কতকটা নিষ্কর্ম্মা। স্ত্রীলোকের উপর পারিবারিক কাজের নির্ভর করিয়া বেশ আরামে বাবুগিরীতেই দিবসের অধিকাংশ সময় কাটায়। নেশা টেশা করিয়া বেদম ফুর্ত্তি করে। দুই একটি তাড়ির বাগানও আছে। বৌদ্ধদের জাতিবিচার নাই—এখানে কিন্তু দেখিলাম খাদ্য বিচারও নাই। ইহারা আহারে বিহারে দুনিয়ার সামঞ্জই বাদ দেয়। মগ শিশুদের কেহ কেহ ইংরেজী শিক্ষিত হইতেছে। আমাদের সহযাত্রী কিশোর বয়স্ক দুইটী মগ ছাত্র ছিল। ইহাদের বাড়ী আদিনাথ—চট্টগ্রামস্থ হাইস্কুলে পড়ে। ইহাদের ব্যবহার দেখিলাম এবং শুনিলাম—অধিকাংশ মগের ব্যবহারই বিনীত এবং ভদ্র কিন্তু মহান্তের মুখে শুনিয়াছি উত্তেজিত হইলে ইহারা অত্যন্ত রুদ্রমূর্ত্তি ধরিতেও জানে। যাক্, এদিক সেদিক একটু বেড়াইয়া অতঃপর বাসায় ফিরিলাম।

আমার বড় সাধ ছিল বাহির সমুদ্রের তীরে গিয়া বড় বড় জীবন্ত শঙ্খ ধরিব কিন্তু তাহা পূর্ণ হয় নাই। এরূপ বড় শঙ্খ সহজভাবে ধরা যায় কিনা তাতেও সন্দেহ আছে! চট্টগ্রামের একজন বিশিষ্ট ডাক্তার বলিয়াছিলেন বাহির সমুদ্রের তীরে ভোর বেলা গেলে বড় বড় জীবন্ত শঙ্খ দেখিতে পাওয়া যায়। শঙ্খগণ নাকি রৌদ্রে গা ঢালিয়া আরাম করে। সত্য মিথ্যা পরীক্ষার সুযোগ হইল না, বন্ধুগণ পিঠটান দিলেন, আর একা যাওয়ার সাহস বা প্রবৃত্তিও আমার হয় নাই। তবে

আদিনাথের বাড়ীর নিকট হইতে যে সকল ছোট শঙ্খ ধরিয়াছিলাম সে গুলি, চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত জীবন্ত আনিয়াছিলাম—ইচ্ছা করিলে বাড়ী পৌছাইতেও পারিতাম।

কেন জানিনা আদিনাথ স্থানটী আমার পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন হইলেও যেন কেমন পুরাতন ও পূর্ব্ব পরিচিত বলিয়া বোধ হইয়াছিল। পাহাড়, জমি, মাটী সবই যেন চির পরিচিত—বড় ভাল লাগিয়াছিল—বড়ই আপনার বোধ হইয়াছিল। পীর সাহাজলাল শ্রীহট্টের মাটীতে এমেন প্রদেশের মাটীর স্বাদ ও গন্ধ পাইয়া আস্তানা গড়িয়া ছিলেন, আমাকে আদিনাথ ছাড়িতে হইয়াছে—কেবল শরীরের মনপ্রাণটা কিন্তু এখনও আদিনাথের মাটীতে আস্তানা গাড়িয়া পড়িয়া আছে! জানিনা বাবা আবার শরীরটাকে টানিবেন কিনা।

তৃতীয় দিনের ভোর বেলা চট্টগ্রাম ফিরিতে প্রস্তুত হইলাম। তিনটী বন্ধুর মধ্যে আমাকে অপুত্রক জানিয়া একটি পাণ্ডাযুবক পুত্র সন্তানোৎপাদন অব্যর্থ বাবার প্রসাদী একটী কদলী বিল্বপত্র দিয়াছিলেন। ইহা আদিনাথ বাবা যেন পাণ্ডাটীকে দশশালা বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া রাখিয়াছেন। যাহাহউক পাহাড়তলী সার্ভে কেম্প সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বন্ধুটীর তাঁবুর উপরে পুত্রলাভের তীব্র ইচ্ছার আশীর্ব্বাদটী এত অধিক যত্ন ও মনোযোগের সহিত রাখিয়াছিলাম যে সম্ভবতঃ কাকের পেটে পৌছিয়াছে। পুরুষ কাকে ইহা উদরসাৎ করিয়া থাকিলে দ্বিতীয় মান্ধাতার জন্ম লাভ অনিবার্য্য।

যথাসময়ে সেইদিনের পালোয়ান মাঝীর পলোয়ান নৌকা চাপিলাম। আজ সমুদ্র স্থির নহে। পুত্র শোকাতুরের মত তাঁর বক্ষস্থল ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিয়া পড়িয়া যেন ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। আহা উচ্চ শব্দ ভীষণ গর্জ্জনে পরিণত হইতে চলিয়াছে। অযুত ফণা বিস্তার করিয়া অযুত ফণিকুল যেন আদিনাথ বাবার চরণ চুম্বনের জন্য তীরের দিকে উধাও ছুটিয়াছে—একটীর পর আর একটী ক্রমশঃ উচ্চ হইয়া চলিয়াছে। নৌকা কক্স বাজারের দিকে মুখ করিয়া দুলিতে দুলিতে আছড়ী পাছাড়ী খাইয়া চলিয়াছে। এরূপ তরঙ্গে সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত আমাদের প্রাণ দেহের ভিতর

আটুপাটু করিতে লাগিল। কতকটা আনন্দ কতকটা ভয়ভাবনা। ভয়ও হইতেছে—ভালও লাগিতেছে এমনি একটা ভাব। ষ্টীমারের কাছে পৌঁছিলাম। দোলায়মান নৌকা গর্ভ হইতে আবার লটকিয়া পটকিয়া ষ্টীমারে উঠিয়া নির্ভয়ে তরঙ্গলীলা লহরী দেখিতে দেখিতে অল্পক্ষণেই অকূলে পড়িলাম। অনেকগুলি "সাম্পান" (একপ্রকার সামুদ্রিক নৌকাবিশেষ) আছাড়ী পাহাড়ী খাইয়া সমুদ্র বক্ষে ভাসিতেছে—নাবিক ও আরোহীগণ বেশ দিব্যি নিশ্চিন্ত বসিয়া দোল খাইতেছে—আমাদের কিন্তু দেখিয়াই ভয় হইতেছে।

সেদিন সমুদ্রের মধুর শান্তরূপ দেখিয়া দেখিয়া গিয়াছিলাম—আজ ভীষণে মধুরে অপরূপ রূপ দেখিয়া চলিলাম। অপরাহ্নে চট্টগ্রামের এক গাছিয়া টিলা (One tree hill) দৃষ্টিগোচর হইল। ক্রমশঃ সমস্ত সহর একখানি সুন্দর ছবিরমত ভাসিয়া উঠিল। পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতিমত সমুদ্রেরদিকে এবার পশ্চাৎ করিয়া চট্টলার রূপ দর্শনে তন্ময় হইলাম, চট্টলার প্রিয় পুত্র নবীন চন্দ্রের চক্ষে দেখিতে লাগিলামঃ—

"অই মোহন শ্যাম মূরতি—
সজ্জ পল্লববসনে।
সুন্দর অচলব্যূহ ধবল কিরীটীসহ
দেখিতেছে মুখ কান্তি সাগর দর্পণে।
ভাবিনু বা বুঝি করি উন্নত বদন।
দেখিছেন আসে কিনা দীনবান্ধাধন।

(সমাপ্ত)

প্রকৃত মানুষ।

(ব্রহ্মচারী ত্যাগচৈতন্য)

বিপদ আপদে যার নাহি হয় ভয়
রোগ শোক দুঃখ তাপে নির্ভিক হৃদয়
সতত সকল কাজে রহে যার হুঁষ
সেইত ভবের মাঝে প্রকৃত মানুষ।

একান্তে।

(শ্রীনরেশভূষণ দত্ত)

(১)

আমি যারি তরে দিবানিশি কাঁদি
তুমি দেখি শুধু তাই
আমি যাহা চেয়ে, ছুটী দেশে দেশে,
তোমাতেই তাহা পাই
যাহা কিছু আমি শয়নে, স্বপনে,
গেয়ানে, ধেয়ানে, প্রেমে, জাগরনে,
অলসে, বিলাসে, সুখে, সমাধানে,
যেখানেই যাহা পাই
সবই দেখি তুমি ; চাওয়া পাওয়াছলে
তোমারেই শুধু পাই

(২)

আমি যাহা কিছু পাই নাই ভবে,
তারও মাঝে তব ঠাঁই.
যাহা কিছু আমি যাচি নাই কভু
সেথায় গো তুমি তাই
যাহা কিছু আমি মনে প্রাণে, জ্ঞানে,
পারি নাই কভু ধরিতে জীবনে
তারও মাঝে তুমি রয়েছ গোপনে
আমি তাহা দেখি নাই
শুধু অন্ধেরি মত ঘুরিয়াছি কত
পথ নাই দিশা নাই

(৩)

আমি ভাবিয়াছি এ জীবন বুঝি
মিছে হয়ে সব গেল,
এ বুকের মোর আরাধনা,
হাহাকারে ভরে র'ল,
তাহা নয় ওগো নিয়ত গোপনে,
পরশনে তব রেখে গে'ছ মনে,
মুগ্ধ জীবন বেড়ি অযতনে
হাসিটুকু মিশে র'ল,
আমি বুঝি নাই নির্ব্বাক ভয়ে,
কিযে কিযে মোর হ'ল ॥
আমি ভাবিয়াছি চাওয়া পাওয়া বুঝি
সবই মোর ধূলো খেলা
সবই এক মায়া মৃগিকার মত
শত স্বপনের মেলা
সবই বুঝি মোর অন্ধ জীবনে
ধুয়ে মিশে যাবে, ধুলিকণা সনে,
এতটুকু তার রহিবেনা মনে,
সবই ফাঁকা সবই ছলা,
তাহা নয় এযে মহা-জীবনের
বন্ধন-হীন খেলা ॥

(৫)

আমার যে সুখ, এভুবন মাঝে ;
বহুরূপে বহু সাজে ;
নিতি নিতি আমি, নব নব ভাবে,
নব অভিনয় মাঝে।
ভাবিতাম বুঝি সে শুধু কেবল,
পুঞ্জে পুঞ্জে হাসি নিরমল ;

তাহা নয় এযে তব সুকোমল

প্রিয় বাহু পাশ মাঝে

তোমারি সুদূর মন্দির হ'তে

সুমধুর বাঁশী বাজে ॥

(৬)

এত কাল আমি আমার এ হৃদে

স্নেহ দয়া মায়া যত,

আপনার বলি কত না গরবে,

পুষিয়াছি অবিরত ॥

তাহা নয় তুমি একা দেখি এসে

সব দয়া মায়া স্নেহ ঢেকে ব'সে

মহা আকাশের সমীরণে মিশে,

আছ ভাব নিয়ে রত,

বন্দনা গীতি ভক্তি মুকুতি

মিলে মিশে অবিরত ॥

(৭)

আমি ঘুরিয়াছি সারা চরাচরে

মিছামিছি তোমা খুঁজে

মিছা মিছি সব বদ্ধ আগারে

অন্ধেরি মত সেজে ॥

তুমি যে আমার আপনার মনে

আপনার প্রাণে আপনার মনে,

চির-নিভৃত মানস আসনে

রহিয়াছ বর সাজে

আমি দেখি নাই আঁখি পালটিয়ে

শুধু মরিয়াছি খুঁজে ॥

(৮)

অই যে আলোক অসীম ঝাপিয়ে

রাশি রাশি পড়ে ছুটে—

ধেয়ান রঙ্গিণ মায়া রথে চড়ে
ধরণীর বুকে লুটে ;
তাহাদের চল চঞ্চল দোলে,
তব প্রাণখানি শুধু হাসে খেলে,
আমি দেখিনাই ভাবিয়াছি বুঝি,
শুধু শুধু নিতি ফুটে,
তাহা নয় এযে অলোকের মাঝে—
আছ তুমি করপুটে ॥

(৯)

নিতি সাঁজ হ'তে নিবিড় আঁধারে
অবশে রহগো জাগি,
নিত্য নিয়মে চাঁদিমা কিরণে,
অর্ঘ্য লহগো মাগি ॥
নিতি সাঁজ-ফুলে ওষ্ঠে কপোলে,
গরিমার ঝরে পড়িছ বিরলে,
সারা চরাচরে শূন্যে সলিলে
স্নিগ্ধ পরশে লাগি,
নিতি নিতি তুমি বিশ্বেরি দ্বারে
উপহার লও মাগি ॥

(১০)

রাশি রাশি বাজ মাথায় পরিয়ে
গুরু গম্ভীর নাদে
অসীম শূন্যে কালো পাখা মেলি,
মরণ তীব্র স্বাদে
অই ছুটে যায় শত পল্টনে,
শত হুঙ্কার মহা ঝল্‌কানে,
অশীতি লক্ষ মরণ সৈন্যে
প্রলয় কলনাদে,

তারও মাঝে তুমি আছ দেখি তব
অমৃত পারষদে ॥

(১১)

তুমি বাঁধা শুধু নহ মোর প্রাণে,
নহ শুধু মোর মনে,
নহ শুধু বাক্য বিথানে
সখ্যে প্রণয়ে দানে ॥
নহ শুধু তুমি বদ্ধ নিয়মে,
দীক্ষা, শিক্ষা, ধরমে, করমে,
মোক্ষেরি দ্বারে মুক্ত মরমে,
আর্ত্তেরি ক্ষীণ তানে,
মুগ্ধেরি মত ঘুরিছই শুধু
বিশ্বেরি সব টানে ॥

(১২)

জীবনে মরণ পয়োধি ছুটায়ে
জীবন মরণ জুড়ি
মরণের পারে মহা অবসাদে
বাধা বন্ধন ছিড়ি,
কিবে এক মহা অজ্ঞেয় লোকে
এক নিরাবিল নিঝুম আলোকে,
আছো চিরকাল আপনা ঢাকিয়ে
চিৎ অন্তর বেড়ি
স্বর্গের সুর সপ্তক সনে
মর্ত্ত্য শাহানা জুড়ি ॥

'মাতৃ পূজার অবসান'।

(শ্রীব্রজেন্দ্রলাল গোস্বামী)

দেশবাসীর মনে কত আশা—প্রাণে কত টান—হৃদয়ে কত আবেগ—জীবনের কত সার্থকতা যে আজ রাজরাজেশ্বরী হৃদয়েশ্বরী জগন্মাতা নববর্ষের শুভাগমনে তাঁর দুস্থ সন্তানগণের হিত দেখিয়া যাইবেন। পূজার ষোড়শোপচারের চূড়ান্ত হইল! সাত্ত্বিক পূজার মহাধ্যানে, ত্যাগ চন্দনে মাখা সুজাত জবাকুসুমের মত কত উৎকৃষ্ট জীবন পুষ্পাঞ্জলি অর্পিত হইল—সঙ্গে সঙ্গে কত সুকোমল বিল্বপত্রাঞ্জলি মায়ের চরণে অর্পিত হইল—অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মহামায়ার নিকট কত কাতর প্রার্থনা হইল—পূতঃ মন্ত্র সংযোগে আলোচাল আর নৈবেদ্য নিবেদিত হইল—পুণ্য অর্ঘ্য দিয়া, ভীষণ আত্মবলিদ্বারা মায়ের পূজা সমাপ্ত হইল কিন্তু কই মায়ের, সেই অভীষ্ট বরদান কোথায়? যে বর লাভ করিবার জন্য ব্রহ্মাদি দেবতাগণ পর্য্যন্ত ব্যাকুল। জগতের সেই মা যিনি আমাদের বরাভয় প্রদায়িনী—যিনি অভীষ্ট সিদ্ধি-দায়িনী সেই বিশ্বেশ্বরী মা আমাদের বিজয় ঘট শুধু দিয়ে কোথায় লুকাইলেন? পাছে বর দিতে হয় এই লজ্জায় বিজয়া দশমীর পর তিনি সন্তানগণকে মাতৃহারা করিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন? সিদ্ধিপ্রদা দেবী কি বাস্তবিক আমাদের হৃদয়রাজ্য পরিত্যাগ করিলেন? না—তা কিছুতেই নয়। মা কতবার তামসিক পূজার নরবলী পাইয়াছেন—কতবার রাজসিক ব্যাপারে তিনি ছাগ, মেষ প্রভৃতি পশুবলি পাইয়াছেন, তবে এবার বুঝি মার সম্মুখে জীবদান দেওয়া হয় নাই বলিয়া তাঁহার সন্তোষ হয় নাই? এ কথা ত মনে মানে না—প্রাণে বোঝে না। এবার যে মায়ের এই শেষ নবমী তিথি পূজায় কতকত মহান্ আত্মবলির অনুষ্ঠান হইল, ত্যাগের বিজয় ডঙ্কা গভীর নিনাদে বাজিয়া উঠিল—সিংহ বিক্রমে পূর্ণাহুতি প্রদান করা হইল;

নবমীর দিন এই শেষ অর্চ্চনাতে কত আবেগ পূর্ণ দুস্থ সন্তানগণের ক্রন্দনরোল হৃদয়োত্থিত হইল, গভীর আর্ত্তনাদ চারিদিকে বিষাদের ছায়া আনয়ন করিল—এই মহা শেষ দিনে ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া মলিন বদনে আজ মায়ের নিকট শেষ মিনতি করিল।

আরআর বার দুর্গোৎসব হইবে আশায় কি ধনী, কি দরিদ্র, আপামর জন নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া প্রফুল্লিত আননে মায়ের নিকট যায় কিন্তু কি অদৃষ্ট, ভারতের কি হতভাগ্য যে জগন্মাতার সম্মুখেও আজ শতছিন্ন কটিবস্ত্র পরিধানে বিষাদ ভারাবনত বদনে অশ্রুমোচন করিতে হইল! হায় আজ কি দুর্দ্দিন! ভারতের কি সেদিন আর আসিবে না? কোথায় ভারতবাসী বিজয়া দশমীর দিনও মাকে এক বৎসরের জন্য বিসর্জ্জন দিয়া নিরানন্দকে হৃদয়ে স্থান দিত না বরং 'আবার মাকে পাব' বলিয়া আশায় উৎফুল্ল হইয়াই শিরে বিজয় আশীষ ধারণ করিত, কিন্তু দোর্দ্দণ্ড কাল প্রতাপে, অদ্ভুত কালচক্রের কুটীল আবর্ত্তনে আজ সেই ভারতবাসীই ভিখারীর সাজে; অর্থক্লিষ্ট, অশ্রুপূর্ণাকুল লোচনে মায়ের মূর্ত্তির দিকে তাকাইল! মাকে কিছু দিতে পারিল না বলিয়া দুঃখে তাহার হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল—দুই চক্ষু কাঁদিয়া ভাসাইল! হায়রে বিধি! তুই কি আমাদের জন্যই দুঃখকে সৃজন করিয়াছিলি! তাই বটে! আমাদের তেজগৌরবান্বিত মনিষিবৃন্দ ত্রিকালজ্ঞ হইয়া বলিয়াছিলেন 'হে পরবর্ত্তী ভারতের সন্তানগণ! কলিকালে ম্লেচ্ছের রাজত্বকালে ধর্ম্ম পরিভ্রষ্ট হইয়া অশেষ দুঃখ যন্ত্রণাগ্রস্ত হইবে।' ফলতঃ তাঁহাদের সেই অব্যর্থ অভিশাপ আমাদের উপর শেলসম বিদ্ধ হইল! বেদনিন্দুক ম্লেচ্ছগণই আমাদের ধর্ম্মনাশ করিয়া ভারতের সর্ব্বনাশ সাধন করিল। কোথায় সেই আর্য্য মুনি ঋষিগণ! একবার তোমাদের শৌর্য্য পরাক্রম প্রকাশ করিয়া অমিত তেজের পরিচয় দাও!

বিজয়া দশমীর দিন পূজার সব শেষ! মাকে আমরা ধরাধরি করিয়া বিসর্জ্জন দিলাম, নিরুৎসাহে হৃদয় পূর্ণ হইল। আনন্দিত চিত্তে আর কোলাকুলি করিতে পারিলাম না। আশীর্ব্বাদ গ্রহণের নিমিত্ত

গুরুজনদিগকে ভক্তিভরে প্রণাম করিতেও পারিলাম না। হৃদয়ে লাগিল 'আশীর্ব্বাদ চাই না—মঙ্গল আর কামনা করিব না'। যে অভিশাপ আমাদের উপর পতিত, উহাই চিরকালের জন্য বরণ করিয়া লইব। ভ্রাতাকে ফেলিয়া শুধু নিজের শীঘ্র মুক্তি কামনায় একটি প্রার্থনাও করিব না। মরিতে হয় ভাইয়ে ভাইয়ে মিলিয়া অনন্তকোটি নরকে মজিয়া মরিব, দেখি সে মরণে অশান্তির শেষ আছে কিনা?—জাতির প্রতি অভিশাপ দূর হয় কি না?

'আপনারে ল'য়ে বিব্রত থাকিতে
আসে নাই কেহ অবনী 'পরে
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে॥'

এ বিশ্ব-যজ্ঞ ত শুধু একার নয়? আপরকে ঠেলিয়া একজন মুক্তি পাইবে এ কি রকম পূজা! ইহাই কি সনাতন হিন্দুধর্ম্মের রীতি! না—ধর্ম্মের আবর্জ্জনা পূর্ণ নিকৃষ্ট ভাব মাত্র! যে ধর্ম্ম সমগ্র জগৎকে উঠায় সে কেবল একজনকে বাছিয়া উঠায় না। যে প্রকৃত মুক্তিকামী সে নিজের মুক্তির জন্য ব্যস্ত নয়। সাধনায় স্বার্থ নাই, ক্ষুদ্রতা নাই—অপরের প্রতি হিংসা নাই। সুতরাং অহিংসা ধর্ম্মনীতিতে বোঝা যায়, যে মুক্তি আমার ভ্রাতা পায় না—সে মুক্তিধন লইয়া কি আমি বৈকুণ্ঠে এমারত গঠন করিব? পার্শ্বস্থিত আমারই ভাই যখন কাঁদিয়া মরে, তখন কি আমি হাসিতে হাসিতে গোলোকে যাইব? তখন সমবেদনায় হৃদয় যে ফাটিয়া যায়। ভগবৎকৃপায় যদি শক্তি থাকে তবে তার দুঃখ মোচনের নিশ্চয়ই চেষ্টা করিব—তাহার দুঃখ ভুলিয়া নিজের উদ্ধার বা মুক্তির জন্য তিলমাত্র চেষ্টা করিব না—না হয় অন্য ভাইয়ের জন্য আমার শত জন্ম নরক ভোগ হইবে।

এইরূপ উচ্চভাব যে ধর্ম্ম শিক্ষা দেয়, এইরূপ ভ্রাতৃস্নেহ যে জগন্মাতা তাঁহার সন্তানের প্রতি অর্পণ করিয়াছেন, সেই করুণাময়ীর কৃপাপাত্র হইয়া আমরা আজ কি দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছি। যে অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার ভারতে একদিন অন্নাভাব অসম্ভব বলিয়া বোধ হইত, আজ সেই

ভারতে অন্নের জন্য হাহাকার উপস্থিত। বস্ত্রের জন্য ভারতবাসী লজ্জা নিবারণ করিতে না পারিয়া কাঁদিতেছে। ভাইরে! মনুষ্য-জীবনে পাপ প্রবেশ করিয়া যেমন আপাত সুখ প্রদান করিয়া পরিণামে বিষম দগ্ধজ্বালা প্রদান করে; জাতির পক্ষেও সেইরূপ জাতীয়তা পাপকর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইলে পরিণামে তাহার অশেষ দুঃখ নিশ্চিত। প্রথম হইতে কেন আমরা প্রলোভনের দাস হইয়া পাশ্চাত্যের ক্ষণিক মোহে পড়িলাম, আর্য্য-শিক্ষা-দীক্ষা পরিত্যাগ করিয়া অনার্য্য-শিক্ষা-দীক্ষায় নৃত্য করিতে লাগিলাম—নিজের স্বজাতীয়তা পরিহার করিয়া পূর্ণরূপে বিজাতীয়তা অবলম্বন করিলাম? আমরা কি এখন সেই বাঙ্গালী—সেই ভারতবাসী আছি? আমাদের মন কি ম্লেচ্ছ শিক্ষায় দীক্ষিত হয় নাই, ম্লেচ্ছাচার কি আমাদের চরম ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম হইয়া পড়ে নাই? তবে শুধু ক্রন্দন করি কার দোষে? আমরা যে 'জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু', ইচ্ছা করিয়া আগুনে হাত পুড়াইয়া অপরিনামদর্শিতার বিষময় ফল ভুগিতেছি। তাহাতেই আমাদের দুঃখ দুর্দ্দশার বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে।

যে ভারতে একদিন দুর্গোৎসবে আনন্দকোলাহলপূর্ণ হইত, যেখানে একদিন পূজার আগমন বশতঃ নবজাগরণে জাতির প্রাণপ্রতিষ্ঠিত হইত, যেখানে একদিন পূজার সময় নহবতে মানব-জীবন-সংগ্রামের রণভেরী শঙ্খ ঘণ্টার সহিত মঙ্গল রোল করিয়া উঠিত, সেই মহাপুণ্য ক্ষেত্রে জ্যোতির্ম্ময়ধামে পাপের অভিযানে অন্ধকার আসিয়া গ্রাস করিয়া বসিয়াছে। হে জীব! এখনও কি শিক্ষা হয় নাই?—পাপের কি প্রচণ্ড প্রতাপ—রাহুর কি রাক্ষসী ক্ষমতা! নির্ম্মল, অতি শুদ্ধ ভারতের প্রাণ—জাতির বিশিষ্টতাকে পশ্চিমের কোন এক দেশ হইতে রাহু আসিয়া যেন ক্রমশঃ গ্রাস করিয়া বসিয়াছে। পূর্ণিমার চাঁদ কোন্ অভিশাপে যেন রাহুকবলিত হইয়া সর্ব্বস্ব হারাইল। প্রকৃতির এই যে রহস্য তাহা সাধারণ মানব ধারণায় বোঝা দুষ্কর। তবে প্রাণে যে আর সহে না সত্যের অপলাপ দেখিলে কাহার প্রাণ না বিগলিত হয়? তবে আমরা যে একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়াছি, মনের জোর হারাইয়াছি, কি

ক'রে সে শক্তির পুনঃ প্রকাশ করিতে পারিব তা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছি না। এইখানেই আমাদের দুর্ব্বলতা এবং এইকারণেই অদৃষ্টের দোহাই আসিয়া পড়ে। আমরা দুর্ব্বল—আমরা পাপী! কি ঘৃণিত কথা? এরূপ দুর্ব্বল ধারণাতেই আমরা অধিকতর দুর্ব্বল হইয়া পড়িলাম। এ দুর্ব্বলতা ত্যাগ না করলে, গীতায় সেই শ্রীকৃষ্ণের বাণী 'ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে। ক্ষুদ্রং হৃদয় দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ' একথা খাঁটীভাবে না বুঝিলে, মনের জোরে না ধরিলে জাতির ম্রিয়মানতা দূর হইবে না। 'দুর্ব্বলের বল ভগবান্' বলিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না তবে আরও কষ্ট পাইতে হইবে। এখন কায়মন চিত্তে জগন্মাতা স্বরূপিণী গায়ত্রীর ধ্যান-জপে শক্তির আবাহন করিতে হইবে—কুলকুণ্ডলিনীকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে, তবে ত জপবিসর্জ্জনে পূর্ণ আনন্দের অনুভূতি হইবে। জপ না করিয়া—আবাহন ব্যতিরেকে শুষ্কমনে বিসর্জ্জন দিলে নিরানন্দের কারণ হইবেই ত। তবেই চাই শক্তি যার বলে সাধনে জোর ধরিবে, মায়ের আগমনও সুফল হইবে। আমরা যে পূর্ণ শক্তিমান পুরুষদের বংশধর আর্য্যসন্তান সে কথা কি একেবারে ভুল হইয়া গেল না কি? গায়ত্রী কি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি যে ব্রত প্রতিষ্ঠার জন্য এত চীৎকার ধ্বনি করিতে হইবে। এখনও ত ব্রাহ্মণের ছেলে—বেশ মনে আছে পূজার আয়োজন—বিল্বদল, তুলসীপত্র, গন্ধপুষ্প অর্ঘ্য সাজাইয়া পূজার আসনে বসিতে হয়। প্রথমতঃ মনের একাগ্রতা জন্মাইতে হয় তবে ত মায়ের পূজা ঠিক্ হইবে। সস্তায় ফাঁকি দিয়া পুরোহিতদের মত করিলে সিদ্ধিটাও সেইরূপই মিলিবে। যেমন কর্ম্ম করিবে তার ফলও ঠিক্ তদনুরূপই হইবে। এতবড় জানা কথায় যে ভ্রম কেন হয় সেটা একটু আশ্চর্য্য বলে মনে হয়। এই ত আজ দেশের মধ্যে মায়ের ডাকের সাড়া পড়েছে; পূজার আয়োজন ত করতে হবে। মা শীগ্‌গীর আস্‌ছেন আমাদের জন্য ব্যাকুল হয়ে। তিনি যদি শূন্য ঘট শূন্য আসন দেখেন তবে কার হৃদয়ে তিনি অধিষ্ঠান করিবেন? আমরা যে অবোধ ছেলে হ'য়ে পড়েছি শুধু মায়ের পূজার বেলায়। এ দোষটা যে ছাড়তে হবে। আজ নবমীর দিন—মহা আনন্দের দিন। পূজা ত প্রায় শেষ হ'য়ে

এল, এখনও যদি মনে ভাব ভক্তির উদয় না হয় তবে বুঝতে হবে কত পাপই না আমাদের সঞ্চিত আছে ? সে কথা ত ঠিকই। নইলে পূজার দিন প্রাণে মাতোয়ারা হয়ে আনন্দ অনুভব করিব,—বাইরে এসে দশজনের সঙ্গে মিলিত হয়ে মায়ের কাজে লেগে যাব, না আমরা এখনও ভিতর বাটীর অন্তঃপুরে লজ্জায় মুখ লুকায়ে বসে আছি। এটা যে কি প্রকার মানুষিকতা তা বুঝিতে পারা দায়। মা চলে যাচ্ছেন এক বৎসরের মত—তাও তিনি কেঁদে কেঁদে, কেন না তাঁর ছেলে, আমরা কোন কাজ করছি না। বৎসরান্তে তিনি এসে দেখে দুঃখিত হয়ে চলে যাচ্ছেন। আর আমরা এখনও লুকায়ে ; ধিক্ এমন জীবনে! মা যে কেন তবু আমাদের প্রতি দয়া রেখেছেন—ইহাই তাঁর অসীম করুণা! তা না হইলে নিজে কেঁদে সন্তানের মঙ্গল কামনা! তিনি যে আজ চলে যাবেন, ছেলেদের কেউ যে এগোয় না। মনে হয় ছেলেরা নিজেরা ভিন্ন হয়ে মাকেও যেন একঘরে করেছে। ধিক্ সন্তান! তোদের মা'র আজ এই দুর্দ্দশা! ও পাড়ার দশজন প্রতিবেশীরা দেখে তোদের কি বলবে? শত শত ধিক্ দিয়ে যাবে। আমরা যে নিরেট মূঢ়, নইলে দশজনের কটুকথা শুনেও আমাদের ঘেন্না হয় না। তবে যদি ভাই কারও কারও প্রাণে মায়ের বেদনা সমভাবে জেগে থাকে, তবে এস ভাই যাত্রার সময় মায়ের চরণ সমীপে গিয়ে উপস্থিত হই, কোনও প্রকারে রীতিরক্ষা ক'রে এবারকার মত বিসর্জ্জন ক্রিয়া সমাপন ক'রে আসি। হায়রে! এই মাকেই না রামপ্রাদ একদিন পেয়েছিলেন—এই আনন্দময়ীরেই না একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ মানসোপচারে অর্চ্চনা করিয়া জগদ্বাসীকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন? আজ আমরা তাঁহাদেরই আশীর্ব্বাদ নির্ম্মাল্য মস্তকে লয়ে সপ্তকোটি সন্তান মিলে সেই বিশ্বজননীর আবাহনে দাঁড়াইয়াছি,—আমরা অভয়চরণে মাথা দিয়েছি, আমাদের আর ভয় করিবার কি হেতু আছে? মাভৈঃরবে উচ্চকণ্ঠে গান গাহিয়া হৃদয়ের জ্বালা, জাতির দুঃখ দূর করিব।

আজ না সন্ধ্যাকালে মণ্ডপঘরে শেষ আহুতি হইয়া যাইবে, আজই না বছরের মত ধূপ দীপ নিবিয়া যাইবে আর কালই না মণ্ডপ ও বেদী

শূন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকিবে? আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব এত লোক সমাগম বন্ধ হইয়া যাইবে! মঙ্গলগীতির উচ্চরোল দিগন্তে মিশিয়া যাইবে। এস ভাই! মনের মিলনে দশজনে মিশিয়া জন্ম সার্থক করিয়া লই। কাতর প্রাণে মার কাছে প্রার্থনা করিয়া লই আগামীবারে তিনি যেন এসে তাঁর ছেলেদের ঘরে সাম্য, শান্তি ও সুখ বিদ্যমান দেখিতে পান।

আবার কবে সেই প্রাচীন ভাবে স্বার্থ মলিনতা ছেড়ে অকপটতার দ্বার খুলে দিয়ে হৃদয় রাস মন্দিরে, রত্নবেদীর উপরে মাকে কৃষ্ণকালীর সমন্বয় ভাবে দেখিতে পাইব। কত আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকিলাম, কত উদ্দীপনা হৃদয়ে জাগরূক থাকিল—চাতকের মত কত তৃষ্ণা, আবার সেই পবিত্র মন্দাকিনীর সলিল প্রাণভরে পান করিব। চিরসঞ্চিত হৃদয়াবেগ সমস্ত মিটাইব। যতই দিন যায় উচ্ছ্বাস ততই বাড়ে—আকাঙ্ক্ষা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। কিন্তু কই কতদিন পর আবার সেইদিন আসিবে যখন মায়ের প্রফুল্ল হাসি দেখিয়া আমরাও আনন্দে নৃত্য করিতে পারিব—মন খুলিয়া মায়ের মণ্ডপের অঙ্গিনায় নাচিব, গাহিব, আরও কত কি করিব!

সাধনার জোরে, চাই সেদিন দেখিতে—যখন ত্যাগের ধ্বজা মায়ের বিজয়া দশমীর দিন উড়িতে থাকিবে—গীতা, ভাগবত, সমস্বরে সাম্য বেদগাথা গাহিতে থাকিবে—আর অমরগণের পুষ্পবৃষ্টিতে আকাশ পথ ভরিয়া যাইবে। আমরা চাই সেদিন অচিরে দেখিতে যে দিন মায়ের বিসর্জ্জনের সময় দলে দলে লোক উধাও হয়ে জীবন সঙ্গীত গেয়ে গেয়ে বিজয়ঢক্কার পশ্চাৎ ছুটিবে। সেদিন যে ব্যক্তি মাতৃপূজার ঢাক বাজাইবে, তার প্রাণ ভরা ভাবরাশি কত উথলিয়া উঠিবে। আত্মহারা হয়ে সে একদিনের মত মাকে তাঁর সন্তানের তাণ্ডব নৃত্য কৌশল দেখাইবে। মা তা দেখিয়া সুখী হইবেন তিনি জানেন তাঁর সন্তানের কত প্রকার শিক্ষা অন্তর্নিহিত আছে, যাহার আশ্চর্য্য প্রভাব ভস্মাচ্ছাদিতবৎ জড়বিজ্ঞান চক্ষুর অগোচর আছে। অন্তর্যামিনী মা সমস্তই অন্তরালে থাকিয়া জানিতে পারেন।

সম্মুখে যে মহাকাল উপস্থিত, যখন সমস্ত আবরণ খুলে ভারত

আবার অধ্যাত্মিকতার ক্ষমতায় শির উন্নত করে দাঁড়াইবে। জড় এতদিন চেতনের উপর তাণ্ডব নৃত্য করিল—এখন যে চৈতন্য শির উন্নত করে ত্রিলোক স্তম্ভিত করিবে। সমস্ত জড় শক্তিকে পদানত করিবে। মানুষের অজ্ঞানাচ্ছন্নতার পর যেমন একবার চৈতন্য বিকাশ হইলে আর সে অন্ধকূপে পড়ে না, ভারতও তেমনি একটীবার মাথা তুলে দাঁড়াইতে পারিলে আর তাহাকে জব্দ করিয়া রাখিতে পারা যাইবে না। ত্রিভুবনে এমন কোন শক্তি আছে বলে বোধ হয় না যে ভারতের নিজ তাপোবলের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে। এ ভারত নূতন কিছু নয় অতি প্রাচীন, সমস্ত জাতির বাপ দাদা ঠাকুরদা বল্‌লে অত্যুক্তি হবে না। সেই ভারতের—আজ দেখে শুনে ঠেকে, লাঞ্ছনায়—প্রকৃত সঞ্জীবনী শিক্ষা জাতীয় জীবনের সাদৃশ্যে গঠিত হয়ে উঠেছে। এর হাজার লাঞ্ছনা হলেও পতন নেই। সনাতন জাতির এটুকু বিশেষত্ব থাক্‌বেই। তাই বলেছিলাম ভারতের এখন সেই প্রাচীন শিক্ষা দীক্ষার পুরশ্চরণের দ্বারা নূতন খাঁটি সংস্কার তৈয়ার করে সাত্ত্বিকী পূজার আয়োজন অনুষ্ঠান করানর বৃহৎ সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। এই সত্যব্রতের মহা যজ্ঞানুষ্ঠানে হোতা হয়েছেন আজ মহাত্যাগী বীর সাধক পুরুষোত্তম। এই সাধন যজ্ঞেও যদি মাতৃপূজার পূর্ণ সমাপ্তি আর না হয়—এতেও যদি হর-পার্ব্বতীর সিংহাসন না টলে তবে বিশ্বপাতার অশেষ করুণার পরিচয় কোথায় পাওয়া যাইবে? যদি ভগবদ্‌রাজ্যে সাধন তপস্যার ফল থাকে তবে এবার বিশ্বামিত্রের তপঃপ্রভাব গোলোকধাম পর্য্যন্ত পৌঁছিবে। এই জীবন মরণের সংগ্রামে পাপপুণ্যের যুদ্ধক্ষেত্রে ভারতে নারায়ণের সারথ্যে অর্জ্জুন-দেশবাসী পুণ্যরথে আরোহণ করিয়া অহিংসা-ত্যাগ অশ্বের স্থির লাগাম ধরিয়া প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে, অবিদ্যামোহের বিপক্ষে দণ্ডায়মান। 'যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ' যদি এই বাক্য যথার্থ হয় সত্যের যদি চিরজয় হয়ে থাকে তবে জান্‌তে হবে এবারকার মত যুদ্ধে জয় আমাদেরই। সুতরাং এবারকার পূজায় এত আয়োজন, এত চেষ্টা, আন্তরিক প্রার্থনা থাক্‌তে যেন কোন প্রকার ত্রুটি আমাদের না হয়।

নচেৎ আমাদিগকেই ঘরে বসিয়া অশ্রু মুছিতে হইবে। যদি মঙ্গল চাও, যদি দুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তি চাও, যদি চির শান্তি ভিতরে বাহিরে অনুভব করিতে চাও তবে জাতির জীবন সমুদ্রের কর্ণধার যিনি, সেই মহাপুরুষের শরণাগত হও। দুঃখ চিরজীবনের জন্য নিবৃত্ত হয়ে যাবে। ইহাই ভারতের সাধনা—ইহাই আমাদের মুক্তি—ইহাই আমাদের কর্ত্তব্য। সুযোগ একবার ফিরিলে সময় একবার চলিয়া গলে জাতির ভাগ্যে আর সুপ্রভাত আসিবে না। পরে শত আকাশ-কুসুম চিন্তা করিলেও কিছুই কার্য্যে পরিণত করিতে পারিবে না। ইহাই প্রকৃত সুযোগ—ইহাই শ্রেষ্ঠ সাধনা ও পূজার আয়োজন। এই অবসরে নিজ নিজ কর্ত্তব্য সারিয়া বলির জন্য প্রস্তুত হওয়া দরকার। অমৃত পথের যাত্রী আমরা, সংসার ভয় তুচ্ছ করিয়া অতিমানবের মহাকর্ত্তব্য সাধনে জীবন পাত করিয়া ভারতের ইতিহাসে, দেশের কাহিনীতে একটি সরল রেখা টানিয়া যাইব। বেদ উপনিষদের পরলোক মানিয়া ইহকালের কর্ম্ম বীরের মত উদ্‌যাপন করিয়া জয় জয় গীতি গাহিয়া সংসার কোলাহল পরিত্যাগ করিব।

আজি এ যুগের নূতন প্রভায়
উদিছে আলোক গগন বিদরি,
তৃষিত প্রাণের দগ্ধজ্বালায়
ছুটি'ছে মানব লভিতে বারি।

আজি এ শুভ জাগরণ দিনে
জেগেছে সবাই হরষিত মনে,
মঙ্গল ঘটখানি লইতে শিরে
দাঁড়ায়েছে সবে 'মিলনের' তরে।

ভারতের কত সুসন্তানগণ
'অমৃত' লভিতে দিতেছে জীবন,
অপূর্ব্ব 'ত্যাগের' জ্বলন্ত আদর্শ
দেখায়েছে প্রাচীন ভারতবর্ষ।

সত্যের মহিমা পুণ্যের আলোক
সাধনার পথে জাগে কত লোক,
আত্মাহুতিযজ্ঞে আত্মবলিদান
এ সত্য সাধনে চরম নিদান।

সমগ্র জগৎ নিরখি এ শক্তি
করেছে ভারত চরণে প্রণতি,
দীপ্ত ভারত নিজ মহিমায়
গাহিছে মধুর 'মিলন' বীণায়।

মানিও ত্যাগীর মঙ্গল আদেশ
ভুলনা গো কভু 'তোমার স্বদেশ'
করেছেন তিনি যে কর্ম্মপ্রচার
ত্যাগের সাধন সুসাধন সার।

আজিকার রণে ত্যাগই আমাদের অস্ত্র হ'বে। অহিংসাই আমাদের মূল সমরনীতি হ'বে। হিমালয়ের এই উচ্চ শৃঙ্গে মহালয়ার পূজায় আজ স্বার্থের বলি হ'বে; সত্যের ধূপ, দীপ, শতমুখী হইয়া জ্বলিয়া উঠিবে। জ্ঞান সুধাপানে আজ মোহমদিরা পরিত্যক্ত হ'বে। সাধন-সমরে ভারতের গৌরব নিশান উজ্জ্বল আকাশে উড্ডীয়মান হইবে।

পূজার দিন ত চলিয়া গেল! আশাও ফুরাইল! কিন্তু মা! তোমার নিকট শুধু প্রার্থনা করিলাম, মনের আকিঞ্চন মত তোমার উপাসনা করিয়া আত্মতৃপ্তিলাভ করিতে পারিলাম না! অর্থাভাবে তোমার বেশভূষার যোগাড় করিতে পারিলাম না। তোমার ভোগের আয়োজন দূরে থাকুক অর্চ্চনার জন্য একমুষ্টি আতপ তণ্ডুলও সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। অনাহারে, অনিদ্রায় দেখ মা তোমার সন্তানের কি জীর্ণশীর্ণ দেহ, অঙ্গাভরণে মাত্র ছিন্ন কন্থা, রুক্ষ কেশ মস্তকে—নগ্নপদ ভগ্নদেহ। তোমার সন্তান আজ দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া লাঞ্ছিত, বিতাড়িত, নিষ্পেষিত হইতেছে, কিন্তু তুমি এখনও স্থির নয়নে তাদের প্রতি চেয়ে অবস্থা দেখছ আর তোমার ওই ক্ষুদ্র বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা চক্ষু মুছিতেছ আবার

তাদের প্রতি তাকিয়ে আছ। ধন্য মা তুমি! তুমিই আমাদের সুখে দুঃখে, আপদে, বিপদে, বরাভয়দায়িনী। দুঃখ হয় তোমার ঐ সুঠাম অঙ্গে অলঙ্কার ভূষণ কিছুই দিতে পারিলাম না। পূজার উপহার উপকরণও আমার কিছুই নাই। আমি সম্বলহীন কেবল আমার মনটা কেহ কাড়িয়া লইতে পারে নাই। উহাই তোমাকে আমার শ্রেষ্ঠ উপহার দিব। আর, এই কঙ্কালসার শীর্ণদেহের হৃদয়বক্ষ ছিঁড়িয়া আমার সর্ব্বোত্তম বলি প্রদান করিব। ইহা ব্যতীত যে আমার সংসার কুটিরে আছে বলিতে ত কিছুই নাই। মা! শুনেছি শাস্ত্রপুরাণে ভক্তিই তোমার আদরের সামগ্রী,—আমার ত মা ভক্তির লেশ নাই যে তোমাকে তা দিয়ে সন্তুষ্ট করব। সংসারের ত্রিতাপে যে সে কোমল লতিকাটি অঙ্কুরিত হইবা মাত্রই বিনাশ প্রাপ্ত হইল। যত্ন লইবার যোগ্যতাও আমার থাকিল না। আছে কেবল ভক্তিহীন শুষ্ক কঠিন হৃদয় যাহা এতদিনও পুড়িয়া ছাই হইয়া যায় নাই, তাই তোমার উপহারের জন্য রহিয়াছে। নতুবা এ কাঙাল আর কিসের দ্বারা তোমার পূজা করিবে?

যদি জগতে কেউ শিক্ষার্থী থাক, যদি কেউ মায়ের সাত্ত্বিক পূজা দর্শনে অভিলাষী থাক তবে কাঙালের ঘরে এসে দেখে যাও—শিখে যাও—ভারতের ঘরে ঘরে আজ মায়ের পূজা কিরূপ চলিতেছে,—দরিদ্র ভারতবাসী আজ কি বীভৎস ভাবে মায়ের চরণে আত্মবলি দিতেছে! জগৎ! দেখে যাও স্তম্ভিত হ'য়ো না, বিশ্বের দুয়ারে মাতৃপূজার মহাযজ্ঞে জীবনসর্ব্বস্ব কিরূপে অর্পণ করিতে হয়, ভগবানের পদে কি প্রকার অলৌকিক আত্মোৎসর্গ করা হয়, দেশ মাতার জন্য কিরূপ স্বদেশিকতার পরিচয় প্রদান করিতে হয়। ধন্য আমরা ভারতবাসী ধন্য আমাদের দেশ, সমগ্র জগৎ যাঁহার মহিমায় স্তব্ধ হইল সভ্যতার শাসন যাঁহার নিকট পদানত হইল—যাঁহার ইঙ্গিতে পৃথিবী টলিল, পাপভয় যাঁর নিকট অতি তুচ্ছ বোধ হইল—তিনি কে? তাঁর ত্যাগ ধ্বজার ন্যায় দাঁড়ায়ে আমরা মাতৃপূজার বরনির্ম্মাল্য লাভ করিব।

হিন্দু নিরামিষাশী কেন?*

(স্বামী অভেদানন্দ)

ইদানীন্তন সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণ এবং খাদ্য পরীক্ষকেরা মানব-জাতির পক্ষে কোন্ খাদ্য অধিক স্বাস্থ্যকর—এই সমস্যার মীমাংসা করিয়া পাশ্চাত্য দেশ সমূহে সেই খাদ্যের প্রচলনের জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট আছেন। তাঁহাদের চেষ্টার ফলে চিন্তাশীল আমেরিকাবাসীরা নিরামিষাহারের গুণ কিছু কিছু বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং আমিষভোজন ত্যাগ করা শ্রেয়স্কর কিনা এ বিষয় লইয়া বেশ নাড়াচাড়া করিতেছেন। এ ব্যাপার লইয়া এত আন্দোলন এত আগ্রহ ইহার পূর্ব্বে আর কখনও দেখা যায় নাই। প্রাচীন গ্রীক্ দার্শনিকগণের মধ্যে পাইথাগোরাস, প্লেটো, সক্রেটীস্, সেনেকা প্রভৃতি দার্শনিকেরা নিরামিষাহারের গোঁড়া পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তত্যত্র অধিকাংশ লোকই নিরামিষভোজীদের ঘৃণার চক্ষে দেখেন।

পাইথাগোরাস জন্মিবার বহুপূর্ব্বে ভারতবর্ষের হিন্দু দার্শনিকেরা এই সমস্যার সমাধান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের রচিত পুস্তকাদিতে প্রাণিহত্যার এবং মাংসাহারের বিরুদ্ধে সুযুক্তিপূর্ণ এবং বিজ্ঞানসম্মত তর্ক বিতর্ক দৃষ্টিগোচর হয়। অনেক ঐতিহাসিক ও প্রাচ্য বিজ্ঞ-ব্যক্তিগণের এইমত যে, পাইথাগোরাস নিরামিষাহারের গুণাগুণ বিচার সম্বন্ধে হিন্দু দার্শনিকগণের নিকট ঋণী। ঐতিহাসিকযুগের বহুপূর্ব্ব হইতেই হিন্দুরা নিরামিষাহার সমর্থন করিয়া তাহা যথাযথভাবে পালন করিয়া আসিতেছিলেন।

পৃথিবীর মধ্যে কেবলমাত্র ভারতেই নিরামিষাহার বহুশতাব্দী ধরিয়া সাধারণ লোকদিগের মধ্যে পচলিত ছিল। পৃথিবীর মধ্যে হিন্দুজাতিই সর্ব্বপ্রথমে নিরামিষভোজনের নির্দ্দিষ্ট নিয়ম-কানুন সবিশেষ অবগত ছিলেন। চীন, জাপান, শ্যাম এবং সিংহলবাসী প্রভৃতি বিভিন্নজাতিরা

---

* স্বামী অভেদানন্দজীর Why Hindu is a Vegitarian নামক ইংরাজী পুস্তকের বঙ্গানুবাদ।

হিন্দুদিগের নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন যে সামান্য রসনা-তৃপ্তির জন্য প্রাণিহত্যাকরা নিতান্ত নিষ্ঠুরতা ও অমানুষিকতা ও অসাধুতার কার্য্য। প্রাচীন ভারতের বড় বড় চিন্তাশীল ব্যক্তি ও ঋষিগণ নিরামিষাহারের পক্ষ সমর্থন কল্লে বিভিন্ন দিক্ হইতে প্রভূত যুক্তির সমাবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহারা শরীরমধ্যস্থ যন্ত্রাদির গঠন দেখিয়া ও রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা দেখাইয়াছিলেন যে মাংসাহার আমাদিগের শারীরিক সুস্থতা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনে কতটুকু সহায়তা করে।

ভারতের বৈদ্য ও চিকিৎসকেরা ইহা মোটেই পছন্দ করেন না। মাংসভোজনে যে রক্তামাশয়, বাত, যক্ষ্মা ও স্নায়বিক রোগসমূহের উৎপত্তি হইতে পারে, এ বিষয়ে তাঁহারা পাশ্চাত্য চিকিৎসকের সহিত একমত। ভারতীয় বৈদ্যগণ বলেন, যে সমস্ত জন্তু হত্যা করা হয়, তাহারা প্রায়ই রোগগ্রস্ত হয় কারণ তাহাদের যে যে স্থানে রাখা হয় ও যে সব খাদ্য খাইতে দেওয়া হয় তাহা বড়ই অস্বাস্থ্যকর ও রোগোৎপাদনকারী। এবং এই সমস্ত রুগ্ন পশুদিগের মাংস ভক্ষণে শরীর মধ্যে মাংসের সহিত রোগবীজাণু প্রবেশ করে এবং রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে। তাহারা আরও বলেন যে খাদ্যের পরিপুষ্টি হইতেই মাংসের উৎপত্তি সুতরাং ইহার ভিতরও মলমূত্রাদি প্রভৃতি আবর্জ্জনা কিঞ্চিৎপরিমাণে থাকিয়া যায় কারণ হত্যার পূর্ব্বে এই সমস্ত মলমূত্রাদি দেহ হইতে সম্পূর্ণরূপে বাহির হইয়া যায় না। এ সমস্ত ময়লা মধ্যে ক্রেটিন অতিশয় বিষাক্ত। মাংস-রক্তস্থিত ফাইব্রিণ অংশ অতিশয় বৃদ্ধি করিয়া দেহ অস্বাভাবিক উত্তাপের সৃষ্টিকরতঃ মানুষকে অত্যধিক চঞ্চল ও অস্থির করিয়া তুলে এবং পরিণামে ইহাই স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। মাংসাহারীরা সাধারণতঃ এই রোগে ভুগিয়া থাকেন। নিয়মিতরূপে মাংস ভোজন করিলে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন খুব ঘন ঘন হইতে থাকে এবং ইহা অকালে জীবনীশক্তি হ্রাস করিয়া দেয়। শারীরতত্ত্ববিৎ স্যার এভারহার্ড হোম দাঁতের গঠন, পাকস্থলী, কক্ককণিকা ও পাকপ্রণালী পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে মনুষ্যজাতি স্বভাবতঃ নিরামিষাশী মাংসাশী নহে।

(ক্রমশঃ)

জীবাত্মা ও পরমাত্মা।

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী।

কবি রবীন্দ্র গেয়েছেন—

"অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না,
সামনে এসে বস এবার কেউ দেখবে না কেউ বলবে না।"

প্রথম গানটা শুনলুম একটী ভদ্রলোকের মুখে। মনটা ছ্যাৎ করে উঠল। কাকে বলা যাচ্ছে, কে এসে সামনে বসবে, কে লুকিয়ে রয়েছে? কই কাউকেই তো দেখতে পাইনে, আড়ালে কে গেল।

ভাবতে ভাবতে মনে হল একজন আছে বই কি। সে গোপন থেকে একবার উঁকি দিয়ে আবার কোথায় যে গা ঢাকা দেয়, তাই ঠিক পাওয়া যায় না। আমরা যে সেটা বুঝতে পারিনা।

মনে হল আছে বই কি সে? সাড়া এ জীবনে তার অনেকবার পেয়েছি, এখনও পাচ্ছি। কোন একটা অন্যায় কাজ, জেনেছি যে সেটা অন্যায়, যখন করিতে যাই, বুকের মধ্যে তখন কি ভীষণ আঘাত পাই, মনে হয় কে যেন হাতুড়ি দিয়ে পিটছে। সেটা তখন ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করি, কিন্তু সে হাতুড়ি পেটা থামে না। মাথার মধ্যে কি রকম করে, লোকের সামনে বেরুতে পারা কিছুতেই যায় না।

সে কে? কানে কানে অহর্নিশি বলছে সামনে দুটো পথ; নির্ব্বাচন কর, এই বেলা ঠিক কর, এর পর ভুলে চলে গেলে আর তোমার সে ভুল শুধরাবার সময় পাবে না।

মনের মধ্যে সুমতী কুমতীর দ্বন্দ্ব অহর্নিশি চলে; কুমতী বলছে আমি এটা করাই, সুমতী বলছে না তা হবে না। বিবেকানন্দ স্বামী বলছেন, একটা সুধামুখী মন, অর্থাৎ সত্যজ্ঞান, এই পবিত্র আসন এনে দিতে সক্ষম; আর একটা গরলমুখী মন স্বাভাবিক জ্ঞান, এ একেবারেই মিথ্যা। দেবে কোথায়, একেবারে নিচে ঠেলে ফেলে।

সামনে দুটো পথ। সুধামুখী মন অর্থাৎ সত্যজ্ঞান দেখিয়ে দিচ্ছে ওই দেখা যায় কাম্য স্থল। অনন্ত আনন্দ সেখানে, অনন্ত শান্তি সেখানে। গরলমুখী মন ভিন্ন পথ দেখাচ্ছে—এই পথ, এই পথ ধরে চল।

এর নির্দ্দিষ্ট পথ সংসার। সংসার বলতে কি বুঝাচ্ছে? সংসার তো এই জগৎটাই সংসার তো একেই বলে। তবু সংসার বিভিন্ন। সংসার বলতে বুঝাচ্ছে কামনার বস্তু পূর্ণ স্থান। এ সে কামনা নয় যে কামনা সুধামুখী মনের নির্দ্দিষ্ট; এ কামনা অর্থে স্ত্রী পুত্র পরিবার মান যশ। সংসারী চায় এই গুলি। তার কামনা এই খানে। সে এর একটা কিছু হতে বঞ্চিত হলে হাহাকার করে কেঁদে বলে, 'কি করলে ভগবান! আমার কোন সাধই পূর্ণ করলে না, আমায় এমনই করে মেরে রেখে গেলে!'

সুধামুখী মন অন্তর হতে চিৎকার করে বলে, 'কে কাকে মারে, ওরে মূর্খ, হাতে কেউ কাউকে মারিতে পারে না। গরলমুখী মনের দ্বারা চালিত হওয়ার শেষ ফল এই, শেষটা এমনি করে কাঁদতে হয়। কিন্তু আমার কথা কেন শুনলিনিরে মূর্খ। আমি যা দিতে চাইলুম তাই যে আসল জিনিষ, সে যে কখনও হারায় না। সে তো অনিত্য নয়, সে নিত্য বস্তু। তাকে যত ব্যবহার করবে সে যে তত উজ্জ্বল হবে। আমি পথ দেখাতুম, সে পথ কেন দেখলি নে?'

পরমাত্মার কথা এই। জীবাত্মা চায় এখানেই পরিতৃপ্ত হইতে, এখানেই শান্তি লাভ করিতে। এছাড়া আর যে কিছু আছে তাহা সে ধারণায় আনিতে চাহে না, তাই এখানকার একটু কিছু ক্ষতি হইলে সে আছড়ায় আর ভগবানকে ডাকে।

পরমাত্মা বলছে—

"অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না

কিন্তু জীবাত্মা ততক্ষণ হিসাব করছে তার সংসারিক লাভ বা ক্ষতি। লাভ যদি হয়ে থাকে সে ফুলে উঠছে, অহঙ্কারে তার সমান আর কেউ নেই। আর ক্ষতি যদি হয়ে থাকে, সে লুটপুটি খেয়ে

কাঁদছে 'ওগো' আমার কি হল গো। আমি কেন জন্ম নিলুম গো, ভগবান 'আমায় এই করতেই জগতে পাঠালেন গো'।

ভ্রান্ত জীবাত্মা, পরস্পর অবিরত দ্বন্দ্ব করছে। সে বুঝছে, সে জানছে সব মিছে, তবু সে কাঁদে, তবু সে ভাবে আমার জীবনটা বয়ে গেল, আমি আর কখনও উঠতে পারব না।

কিছুতেই সে পরমাত্মার কথা কানে তুলতে পারে না, সে যে সে কথা শুনতে বধির। সে তাকিয়ে দেখতে পারে না, সে যে সে দিকে চাইতে একেবারে অন্ধ। সে যে জড়, তার পাশ ফিরবার তার তাকাবার, তার কান পেতে শুনবার ক্ষমতা যে আদৌ নেই।

দুজনে সমজোট না হলে তো চলছে না। কর্ত্তা বলছেন এবার ৺মাকে আশ্বিন মাসে আনতে হবে; গিন্নি হিসাব করে দেখছে, অনেক লোকসান হয়ে যাচ্ছে, এ বছরটা থাক আসছে বছর দেখা যাবে। কর্ত্তার সুধামুখী মন অর্থাৎ পরমাত্মা প্রস্তাব করছেন ভগবানকে আনবার কিন্তু গিন্নি বলছেন এখন থাক, আমার অনেক কাজ পড়ে আছে। তাঁর আসবার যদি ইচ্ছেই হয়ে থাকে, তিনি যখন পারবেন আসবেন। দুই এক হয়েও বিভিন্ন মত পোষণ করছে কাজেই শূন্য মন্দির তেমনি শূন্যই পড়ে আছে, দেবতা আসতে পারছে না।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কেটে গেল সময় আর হল না—দুই শক্তি এক হল না, দেবতার মন্দির তেমনি খালি, তেমনি হাহাকার সেখানে। ভিক্ষুক দূর হতে আসে মন্দির দেখে এসে দেখে শূন্য মন্দির, দেবতা নাই সে কেঁদে ফিরে যায়।

জীবাত্মা দেখছে আপনার পানে। দেবতা আসলে তার নিজের সেবা হয় কৈ? সে চায় তাই পরমাত্মাকে নিজের কাছে টানতে, নিজের মত দিয়ে তার মতটা ছেয়ে ফেলতে। কিন্তু সে যে নির্ব্বিকার, সে যে অচল তার চোখকে নিচের দিকে নামাতে চায়না। বিভোর প্রাণে সে গেয়ে উঠছে।

"অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না"

জীবাত্মা সংসার যুদ্ধে একদিন শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন তার

পরমাত্মার কথা মনে হয়, সে তার কাছে গিয়ে লুটিয়ে পড়ে, 'দেবতা নিয়ে এসো নইলে দিন আর চলে না'।

পরমাত্মা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠে দেবতার ধ্যান করতে বসে; সেই সময়ে জীবাত্মা আবার সরে পড়ে, ওদিকে তার যে অনেক টানের জিনিষ পড়ে আছে। পরমাত্মা চেয়ে দেখে মিথ্যাধ্যান—দেবতা আসেন নি। দুই বিরুদ্ধবাদীর মতে তিনি এসে দাঁড়াতে পারবেন না জেনে অনেক দূরে সরে গেছেন।

এই জীবাত্মাকে নিয়ে পরমাত্মা এমনি পদে পদে আহত হচ্ছে তবু তাঁকে এই জীবাত্মাকে আলিঙ্গন করে থাকতেই হবে। সে যদি একে ছেড়ে দেয়, তবে একেবারেই নৌকা ডুবি। সে ছাড়েনি বলে এখনও মাঝে মাঝে জীবাত্মার একটু চেতনা আসে, সংসার যুদ্ধে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে এখনও আপনার অস্তিত্ব স্বীকার করে সে। কিন্তু পরমাত্মা যদি ছেড়ে দেয় সে একেবারেই জড় হয়ে যাবে। তাকে আঘাত দিয়ে একটু চেতন দিতে, একটু ভগবানের নাম স্মরণ করিয়ে দিতে যে কেউ থাকবেনা আর, এখনও একটু যা আলোর রেখ সামনে আছে, নিমিষে তা হারিয়ে ফেলবে সে, আর আলো পাবে না, কেবল সীমাহীন অন্ধকারই থেকে যাবে।

ভ্রান্ত জীবাত্মা! তাই বলছি চলরে চল, সুধামুখী মনের বশে চল। সে যখন ডাকছে আকুল প্রাণে 'এস হে, এস হে,' তখন এই হিসাব নিকাশ নিয়ে বসে থাকিস নে। তার সঙ্গে তোর গলা মিশিয়ে তুইও ডাক, 'বস হে, বস হে আমার হৃদয় সিংহাসনে বস হে, বস হে'।

ওরে ভ্রান্ত. মাস যাবে বছর যাবে যেতে যেতে তোর ক্ষণস্থায়ী জীবনটাই কেটে যাবে, তুই দেবতার প্রতিষ্ঠা আর করবি কবে? তোর সিংহাসন যে শূন্য, বসা রে, সেখানে বসা তাকে; পরমাত্মার সঙ্গে গলা মিশিয়ে গান গেয়ে ওঠ—

"অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না,
সামনে এসে বস এবার কেউ দেখবে না কেউ শুনবে না।"

(২)

অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ।

জীবন আমরা দিতে পারিনা কিন্তু নিতে পারি! কথাটায় তাৎপর্য্য আছে।

কি রকম সে?

খুবই সহজ। যেমন আমি। আমি কে, কোথা হতে এসেছি, কার আদেশে এসেছি, আবার কোনখানেই বা চলে যেতে হবে। কথাগুলো ভাবতে গেলে ভারি আশ্চর্য্য বলেই ঠেকে।

কি রকম?

রকম আবার কি? আমি—অর্থাৎ এই দেহের যে সত্বাধিকারী সেই আমি এসেছি কোনখান হতে—এটা কি ভাবতে হবে না? আমি যে চিরকাল এমনই নাই তা তো দেখতে হবে। আমি চিরদিন এমনি বড়, এমনি জ্ঞানবুদ্ধি সম্পন ছিলুম না। ওই যে ছোট ছেলেটী মায়ের কোলে খেলা করছে, আমিও একদিন ওরই মত মায়ের কোলে অমনি করে খেলা করেছি। ওই যে গর্ভবতী স্ত্রীলোকটী, সন্তান ওঁর গর্ভে রয়েছে, নড়ছে, বেশ টের পাচ্ছি। ঐ সন্তান আস্‌ল কোথা হতে? কেমন কোরেই বা বেঁচে রয়েছে ও অতটুকু সঙ্কীর্ণ স্থানের মধ্যে? আমিও একদিন ওই স্থানেই ছিলাম, তার পর অমনি করে মায়ের কোলে খেলেছি।

আজ ভাবছি—কারণ এতদিন ভাবিনি, ভাববার মোটে সময়ই পাই নি আমি কে? কোথা হতেই বা এসেছি, আবার শেষকালে যাবই বা কোথায়?

একটা কোন অদৃশ্য শক্তি জেগে আছেই, যে প্রতিনিয়ত হিসাব করে দেখছে কত লোক জন্মাল কত লোক মরল। তার শান্তিও তো নেই, সে অহোরাত্র সজাগ, সে তাকিয়ে আছে আমাদের পানে, পাছে কিছু হয়।

কি বলছিলেম, হ্যাঁ, সেই জীবনের কথা। আমরা জীবন দিতে পারিনে জীবন নিতে পারি।

আমরা মাছ মাংস খাই ; আমরা শীকার করি, আমরা মাছ ধরি, অনেকের মাছ ধরায়, শীকার করায় যতটা আনন্দ ততটা আর কিছুতেই হয় না।

কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—ওটা কি রকম ? যে জীবন আমরা দিতে পারিনে—সেই জীবন আমরা হরণ করি।

বুদ্ধ বলে গেছেন—অহিংসা পরম ধর্ম্ম। আজ আর এক মহাপুরুষ বুদ্ধের স্থলাভিষিক্ত হয়ে প্রচার করছেন অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ। কথাটা যেমন সত্য—এমন সত্য আর কিছুতেই নেই।

অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ, কথাটা না জানে কে ? ছেলে বুড়ো মেয়ে সবাই জানে অহিংসা পরমোধর্ম্ম। অনেক জায়গায় লেকচারার মহাশয় বলেছেন, অহিংসা পরমোধর্ম্ম। আদিকাল হতে এ পর্য্যন্ত চলে আসছে এই একই কথা অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ।

সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এই। এই আদি—এর পরে আর সব। এই মূল, আর সব এর শাখা প্রশাখা। দেখতে পাই এমন অনেক নির্ব্বোধ লোক আছে যারা কোন দরকার না থাকলেও হাসতে হাসতে পা দিয়ে একটা জীবকে মেরে ফেলে। সে যে চলে গেল তা সেই নিষ্ঠুর ভেবেও দেখে নি। তার যন্ত্রণা সে বুঝতে পারে নি। এই সব নিষ্ঠুরেরাই আবার নিজের মরণের কথা ভেবে শিউরে উঠে। মনে ভাবে—'কি হবে আমার সেই মরণের দিনে, কি ভাবে পরিত্রাণ পাব'।

আমি নিজের কথাও বলছি। অনেক সময় নিজে অসহায় জীবদের পরে অত্যাচার করতেও ছাড়িনি। অসহায় জীবগুলোর আর্ত্তনাদ আমার কানে আসেনি কারণ আমার চিত্ত যে বধীর। আমার চিত্ত যদি বধির না হত, আমি তাদের কথা শুনতে পেতুম। শুনতুম তারাও বলছে, 'যে জীবন তুমি সৃজন করতে পার না, সে জীবন নষ্ট কোর না। যিনি বিনাশ করেন—তিনিই সৃজন করেন। জন্ম মৃত্যু তিনি নিজের হাতে তুলে নেছেন কারণ তাঁর ক্ষমতা অসীম, তিনি অনন্ত। কিন্তু তুমি কে ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ জীব, তোমার কি এমন ক্ষমতা আছে যাহার দ্বারা তুমি আমাদের বিনষ্ট করিতে পার' ?

বলিয়াছি চিত্ত বধীর নাহলে ঠিক এই কথাগুলাই আমি শুনিতে পাইতাম। আমার দৈহিক প্রসাধন আমি করেছি কিন্তু আন্তরিক প্রসাধন আমি করি নি। আমার চোখ নাক কান মুখ প্রভৃতির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে আমি প্রাণপণ চেষ্টা করেছি, কিন্তু অন্তরের সৌন্দর্য্য অন্তর ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে আমি পারি নি।

অন্তর অন্ধ, বধীর। আমরা পূজা করি, অর্চ্চনা করি, তাতে বলি দেই অনেক সময়। মূল, বলি দেবার নিয়ম আছে পূজাতে, কিন্তু সে কি বলি? যে রক্ষক সে কখনই ভক্ষক হইতে পারে না। (?) যাঁহার হাতে আমরা গঠিত হইয়াছি, যিনি আমাদের নিয়ত রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন তিনি কি কখনও আমাদের রক্ত পান করিতে পারেন? কোন্ বাপ মায়ে সন্তানের অহিত কামনা করতে পারে? মা মনে করেন, সন্তান আমার সুখে থাক ভাল থাক, কোন্ বাপ মায়ে প্রার্থনা করেন সন্তান তাঁর মরে যাক। দেবতাও সেই বাপ মা। তাঁরা আমাদের হিতকামনাই করে থাকেন, আমরা তা বুঝতে পারিনে, আমরা সেই তাঁদেরই সামনে তাঁদেরই প্রিয় সন্তান ধরে বলি দেই, তাঁদের রক্তে তাঁদের সিক্ত করে দেই।

পুরাণে বলির নিয়ম আছে। সে বলি কি? বলি বলতে জীব দেহকে বুঝায় না, নিজের মনোবৃত্তিকে বুঝায়। বলি দিতে হবে নিজের মনোবৃত্তিকে। এই প্রকৃত বলি এই বলির কথাই পুরাণে উল্লিখিত। (?)

আমাদের দেহ মধ্যে ছয় রিপু বর্ত্তমান; এরাই বলির উপযুক্ত। এই ছয় রিপু বড় দোর্দ্দণ্ড, এদের দমন করা বড় কঠিন কাজ। তাই পুরাণে উক্ত হয়েছে বলি দেবার কথা। সে বলি এই ছয়টা রিপু এরা প্রবল থাকতে মানুষ যথার্থ মানুষ হয় না, মানুষের ভিতরের মহত্বটা ফুটে উঠতে পায়না। আমরা আমাকে ফুটিয়ে তুলব, কিন্তু রিপু বলি না দিলে তা সম্ভব হতে পারবে না।

রিপু এসেছে আমাদের সঙ্গে, যাবেও ফের আমাদের সঙ্গে, এরা জীবনের সাথী, কাজেই এদের ত্যাগ করতে পারা যায় না। এদের বলি দিতে হবে দেবতার কাছে যেন এরা আমাদের পদানত হয়ে

থাকে, আমরা যা বলব তাই শোনে, কোনও রকমে যেন আমাদের উপর এরা দাসত্ব করতে না পাবে।

আমরা মাছ মারি, মাংস খাই। কেউ কিছু তাতে বললে আমরা বলি 'কই, আমরা তো নিজে মারি না। পরে মেরে এনে দেয় আমরা খাই—কেন না এটা আজন্ম কালের অভ্যাস'।

আজন্ম কালের অভ্যাস হতে পারে। কিন্তু অভ্যাস কি ত্যাগ করা যায় না। ছোট বেলা অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত যা করেছি. বড় হয়েছি জ্ঞান হয়েছে, এখনও যে সেই অজ্ঞান বশে চলতে হবে এমন কোনও কথা নেই। আমরা বড় হয়েছি, জ্ঞান হয়েছে বলেই আমাদের এ অভ্যাস ত্যাগ করা উচিৎ।

আর একটা যুক্তি আমরা নিজে মারিনে পরে মেরে এনে দেয়। কথাটা কি রকম হল? আমরা যদি না খাই কে নিরীহ মৎস্যকুল ধ্বংশ করবে? আমরা খাই বলেই জেলেরা মাছ ধরে আনে। পয়সা আজ কাল শ্রেষ্ঠ জিনিষ। আমরা মাছের বিনিময়ে পয়সা দিব তারা কেন না মাছ আনবে।

তাই বলছি আমরা দিতে জানিনে নিতে জানি আমরা একটী জীবন গড়তে পারি কি? যে জীবনটা চলে যায় আর তাকে ফিরিয়ে আনতে পারিনে তো? তবে কেন এ হিংসা বৃত্তি মনের মধ্যে? আমাদের মুক্তির পথকে আমরাই বন্ধ করেছি নিজের হাতে। অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ এ কথাটা বুঝে ও ভুলে গেছি যে।

কি উপাদানে মাছ মাংস সৃজিত সেটা মনে করলে তার তো মাছ মাংস স্পর্শ করিতেও প্রবৃত্তি আসবে না। সেইটা মনে করে রাখাই যে আমাদের কাজ। আমরা কেন সেইটা ভুলে যাই কেন আমরা মনে করিনে সেই অসহায় জীবনগুলিও যাঁর হাতে সৃজিত আমরাও তাঁর হাতে সৃজিত। আমরা এসেছি এক জায়গা হতে অবার যাবও সেই একই জায়গায়। সেখানে বধ্য ঘাতক সম্পর্ক নেই কারণ আত্মা সবারই সমান ক্ষমতাশালী। আমরা নিজের নিজের কার্য্যবশে জগতে ভিন্ন ভিন্ন দেহ নিয়ে এসেছি, এটা বাইরের পোষাক মাত্র। পোষাকটা ফেললে

আমরা সবাই সমান যে। ছোট পিঁপড়েদের—যার দেহ এতটুকু, চোখের কোনে যে মিলিয়ে যায়, তবু তার আত্মা তো ছোট নয়, সে যে আমারই সমান ক্ষমতাবান; আমার যেটুকু ক্ষমতা আছে, তারও সে ক্ষমতা আছে।

বুঝে রাখাই সার, এইটুকু জেনে রাখাই সার. মনের মধ্যে একটী মাত্র কথা জাগিয়ে রাখিতে হবে, অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ অহিংসা মূলাধার, তার পর আর সব ক্রিয়া কর্ম্ম তার শাখা প্রশাখা মাত্র। যদি আমরা মূলটাকে ধরে রাখি, শাখা প্রশাখা হাতে পাওয়া কষ্ট সাধ্য নয়।

বিভীষণ।

(ব্রহ্মচারী আনন্দ-চৈতন্য)

আকাশে বারিদ করে ভীম গরজন
চঞ্চলা চপলা হানে কুলিশ ভীষণ।
ঘূর্ণি বায়ু বারিধারা সবলে ঘুরায়।
ছিন্নমূল মহীরুহ ভূমিতে লুটায়।
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-তপ্ত মরুময় দেশ
দূর দূরান্তরব্যাপী নাহি তার শেষ
উঠিছে বালুকা স্তম্ভ আকাশ জুড়িয়া
প্রাণ-হর বায়ু গর্জ্জে রহিয়া রহিয়া।

বীর।

(ব্রহ্মচারী ত্যাগচৈতন্য)

নিজেকে করিতে জয় যেই জন পারে
শক্তির তনয় সে যে বীর বলি তারে।
এ দুনিয়া তার কাছে চির পরাজিত
বীর বলে সেই জন হয় গো পূজিত।

মানব জীবনে সদালাপ।

(প্রতিবাদ)

(উদাসী)

গত আষাঢ় মাসের উদ্বোধন মাসিক পত্রে "মানবজীবনে সদালাপ" প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছি। কেবল দুই একটি স্থলে তাঁহার উক্তিতে বিরোধ দেখিয়া সে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্যই কিছু লিখিতে বাধ্য হইলাম। "সৎ"এর অর্থ সম্বন্ধে লেখক বলিতেছেন "যাহা নিত্য, শুদ্ধ, অপরিবর্ত্তনীয়, রূপান্তর রহিত, অসীম আকাশ হইতেও বিশ্বব্যাপী, অগাধ সমুদ্র হইতেও গভীর, তুঙ্গ হিমালয় হইতেও মহান্, চিরবর্ত্তমান পদার্থই সৎ।" একটু পরেই আবার বলিতেছেন "যাহা নিজেই নিজের বিশ্ব আত্মবিকাশের জন্য সৃজন করিয়াছে— আত্মপূর্ণতাই যাহার একমাত্র উদ্দেশ্য সেই অদৃশ্য মহাশক্তিই সৎ; সেই মহাশক্তিই আত্মপূর্ণতা লাভের জন্যই এই সংসারটাকে সৃষ্টি করিয়াছে।"

যিনি নিত্যশুদ্ধ, অপরিবর্ত্তনীয়, ব্যাপক তিনি কি অপূর্ণকাম? লেখক বলিতেছেন, তিনি আত্মবিকাশের জন্য বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। যদি নিজের প্রকাশের জন্য তাঁহাকে অপর বস্তুর অপেক্ষা করিতে হইল তাহা হইলে তিনি বিশ্বব্যাপী কি প্রকারে, আবার তিনি শুদ্ধ ও নিত্যই বা কিরূপে হন? কারণ 'শুদ্ধ' শব্দে সাক্ষী বা দ্রষ্টা, বা সমস্ত কল্যাণ গুণবিশিষ্টকেই বুঝায়। এখানে সতে আত্মবিকাশরূপ অভাব বর্ত্তমান, ও সেই অভাব পরিপূরণের জন্য সৃষ্টি, সৃষ্টির জন্য আবার কামনা ও চেষ্টা প্রভৃতির প্রয়োজন। যাঁহাতে কোন কামনা ও তাহা পরিপূরণের জন্য কোনরূপ চেষ্টাদি বর্ত্তমান তিনি শুদ্ধ হইতেই পারেন না, আর পূর্ব্বোক্ত যুক্তির দ্বারা তিনি নিত্যও নন. কারণ নিত্য বস্তু অপরিনামী, কিন্তু লেখক বলিতেছেন, তিনি আত্মপূর্ণতার জন্য

সৃষ্টি করিয়াছেন। সাধারণতঃ দেখা যায় ক্রিয়া বা action কর্ত্তাতে কোন না কোনরূপে পরিবর্ত্তন আনয়ন করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপে আমরা কুম্ভকারকে গ্রহণ করিতে পারি; কুম্ভকার কোন বস্তু করিতে যাইলে তাঁহাকে তাহার শরীরের ও মনের উপর কোনরূপ পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতেই হইবে। অথবা কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিকে ধরা যাউক; যখন তিনি চিন্তা করেন তখন তাঁহার মনের মধ্যে নানা প্রকার পরিবর্ত্তন আনয়ন করেন। প্রকৃতস্থলে যখন সেই সৎ সৃষ্টি করিলেন—অর্থাৎ সৃজনরূপ কোন ক্রিয়া করিলেন ও এই ক্রিয়া তাঁহার মধ্যে পরিবর্ত্তন আনিল—তিনি পরিবর্ত্তিত হইলেন। তাহা হইলে তিনি অপরিনামী কিসে? সৎ যদি নিত্য শুদ্ধ, অপরিনামী, ব্যাপক হন, তাহা হইলে তিনি পূর্ণকাম; কোনরূপ অভাবই তাঁহাতে সম্ভব হয় না। আরও প্রবন্ধের প্রথমেই লেখক বলিতেছেন যে এই জগৎ নশ্বর পরিবর্ত্তনশীল, ইহার অন্তরালে এক অবিনশ্বর অপরিবর্ত্তনশীল সৎ বর্ত্তমান। দুইটি যখন বিরুদ্ধ ধর্ম্মযুক্ত তখন সৎটি কি প্রকারে জগৎকে অর্থাৎ অসৎকে সৃষ্টি ও অবলম্বন করিয়া আত্মপূর্ণতা লাভ করিতে পারে? বিরুদ্ধ বস্তুর সহিত কখনও কার্য্য কারণ ভাব হইতে পারে না। লেখক বলিয়াছেন আত্মপূর্ণতাই যাহার একমাত্র উদ্দেশ্য সেই অদৃশ্য মহাশক্তিই সৎ। আত্মপূর্ণতা শব্দের অর্থ কি? বীজ যেমন অপূর্ণ অবস্থায় থাকে, পরে মৃত্তিকা হইতে রস ও অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী স্বীয় পুষ্টির জন্য গ্রহণ করিয়া একটি বৃহৎ বৃক্ষাকারে পরিণত হয়, সেইরূপ সৎ প্রথমে অপূর্ণ অবস্থায় বা অব্যক্ত অবস্থায় (Potential State) ছিলেন পরে জগৎ সৃষ্টি করিয়া সেই জগৎকে অবলম্বন করিয়া পূর্ণতা লাভ করিলেন—অথবা তিনি নিত্য পূর্ণ আমরা কেবল অজ্ঞানবশতঃ তাঁহাকে অপূর্ণ বলিয়া মনে করিতেছি; জ্ঞান বিকাশের পর তিনি পূর্ণ এই ভাবে প্রতীতি হইয়া থাকে। এস্থলে অপূর্ণতা কেবল আমাদের অজ্ঞান দৃষ্টিকে অপেক্ষা করে মাত্র। অবশ্য লেখকের ভাষা পূর্ব্বোক্ত অর্থকেই বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু ঐরূপ অর্থ করিলে নানা প্রকার আপত্তি হইতে পারে। প্রথমতঃ যদি বীজের ন্যায় সৎ পূর্ণতা লাভ করেন তাহা হইলে তিনি বিশ্বব্যাপী

নহেন। কারণ বীজ নিজ হইতে ভিন্নবস্তুকে অবলম্বন করিয়াই পূর্ণতা পায়; কিন্তু সৎ যদি তদরিক্ত কোন বস্তুকে অশ্রয় করিয়া পূর্ণতা লাভ করেন, তাহা হইলে তিনি ব্যষ্টি বা সীমাবদ্ধ হইলেন, আর যদি বলেন ঐ বস্তু তদতিরিক্ত নহে তাঁহার মধ্যেই ছিল, তাহা হইলে ত তিনি পূর্ণই রহিলেন। পুনরায় আত্মপূর্ণতার জন্য জগৎ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা রহিল না। দ্বিতীয়তঃ লেখক বলিতেছেন সৎ জগতে নিঃশেষিত নয়, ইহা হইতে পাওয়া যায় তাঁহার 'জগদতিরিক্ত সত্বা আছে। এখন সৎ যাহা বিশ্বব্যাপী তাহার কতকটা অংশ জগৎ হইয়াছে ও কতকটা অন্য অবস্থায় আছে তাহা সম্ভব নহে। ব্যষ্টি বস্তুরই বিভাগ সম্ভব, কিন্তু যিনি বিশ্বব্যাপী অর্থাৎ সর্ব্বতঃ বর্ত্তমান এমন দেশ নাই যে তিনি সেখানে নাই তাঁহার বিভাগ কি করিয়া করা যায়।

অতএব যে কোনরূপ বিকল্প গ্রহণ করিনা কেন, উহা অযৌক্তিকর বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

এতদ্ব্যতীত লেখক উপমা দিতে গিয়া কোনকোন স্থলে ভাষাকে এমন জটিল করিয়া তুলিয়াছেন যে, অর্থের সম্যক বোধের জন্য যথেষ্ট কষ্টকল্পনা করিতে হয়। দার্শনিক প্রবন্ধে ভাষা যাহাতে যথাসম্ভব সরল হয়, তাহার উপর দৃষ্টি রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য। "কি প্রকারে সে সৎ আমাদের মানব জীবনকে আদর্শ আলোকচিত্রে বিভূষিত রূপের মত, নন্দনের রমণীয় উদ্যানের মত, ফলফুল পল্লব শোভিত জ্যোৎস্না-লোকিত সুরভি সমাচ্ছন্ন করে।" নন্দনের উদ্যানটি কি! স্বর্গোদ্যানের নামই ত নন্দনকানন বলিয়া সকলে জানে। উপমা ও উপমেয়ের সহিত যদি কোনরূপ সাদৃশ্য উল্লেখ না করা যায় তাহা হইলে উপমা স্থলটি নির্দ্দোষ হয় না। উদ্যানের সহিত জীবনের তুলনা করা হইয়াছে, ফল ফুল শোভিত জ্যোৎস্নালোকিত বিশেষণটীর সহিত কাহার সাদৃশ্য?

অলমিতি—

সমালোচনা ও পুস্তকপরিচয়।

'পুরাণ-তত্ত্ব'।—"পরীক্ষিতের সময়ে পরাশরের নিকট মৈত্রেয় মুনি বিষ্ণুপুরাণ শিক্ষা করেন। এই সময়ে পূর্ব্ব-মীমাংসা দর্শনের কর্ত্তা জৈমিনি যে সাপভ্রষ্ট ঋষিপুত্র চতুষ্টয়—পক্ষি চতুষ্টয় হইয়া বিন্ধ্যকন্দরে বাস করিতেছিলেন, তাঁহাদের প্রমুখাৎ মার্কণ্ডেয় পুরাণ শ্রবণ করেন। এই উভয় পুরাণই ব্যাসকৃত পুরাণ-সংহিতা বা তজ্জাত অষ্টাদশ পুরাণ হইতে পৃথক্ ভাবে আমাদের মধ্যে আগত। এই উভয়েরই মহাভারত রচনার পরে আমদানি হইয়াছে।

"ব্যাসকৃত মহাভারতে পরীক্ষিতের রাজ্যাভিষেক ও পঞ্চ-পাণ্ডবের মহাপ্রস্থান এ পর্য্যন্ত বর্ণিত থাকাতে, মহাভারতের রচনাও যে পরীক্ষিতের রাজ্যারম্ভের ৪।৫ বৎসরের মধ্যে সমাপ্ত হইয়াছে, তাহা স্পষ্ট জানা যায়। মহাভারত, বিষ্ণু এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণের সময় পূর্ব্বোক্ত ৬৫৩ কল্যব্দের পরে নির্দ্দেশ করিতে হয়।

"মুখে মুখে গ্রন্থ প্রচারের তৃতীয় পরিচয় ৭০০ কল্যব্দের পরে জনমেজয় রাজার রাজত্ব কালে জানা গিয়াছে। তখন বৈশম্পায়ণ উক্ত রাজসভাতে মহাভারত বলেন এবং উগ্রশ্রবা সূত সেখানে সমস্ত শুনিয়া নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি মুনিগণের মধ্যে মহাভারত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

"অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যু, তৎপুত্র পরীক্ষিৎ, তাঁহার পুত্র জনমেজয়; জনমেজয়-নন্দন-শতানীক। শতানীকের অশ্বমেধ যজ্ঞের কালে যে পুত্র হয়, তাহার নাম অধিসোমকৃষ্ণ। তাঁহার রাজত্ব সময়ে ৪র্থবার পুরাণ কথিত হওয়া জানা যায়। তখন মৎস্য-পুরাণ ও বায়ু-পুরাণ কথিত হয়। মৎস্য পুরাণ ৫০ অধ্যায় ও বায়ু পুরাণ ৯৯ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। এই ঘটনা কল্যব্দের অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে ঘটিয়াছে, এইরূপ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ইহার পরে এতাদৃশ মুখে মুখে ভারতে পুরাণ প্রচারের পরিচয় আর পাওয়া যায় না। ইহার কিছু পরে লিখিয়া পুরাণ রক্ষা করার প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল।

"কল্যব্দের সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে নন্দরাজ, মগধ সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়া শূদ্ররাজত্ব প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ভারত পুরাণ লিখিত হইয়া পুস্তকাকারে পরিণত হওয়ার সময় নির্দ্দেশ করিতে হইলে, আমাদিগকে ঐ শূদ্র রাজত্বের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

"শূদ্র রাজারা বৌদ্ধমতের অনুসরণ করাতে ব্রাহ্মণদিগের পূর্ব্বের ন্যায় শাস্ত্র প্রচারের ব্যাঘাত হইয়াছিল। বিশেষতঃ জমদগ্নি, ব্যাস, অশ্বত্থমা প্রভৃতির ন্যায় শক্তি-সম্পন্ন ব্রাহ্মণগণ, শূদ্ররাজ্যে বাস করিতে স্বতঃই অনিচ্ছুক। তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে শ্রুতির বক্তা ও শ্রোতার অভাব ঘটিতেছিল। কথিত আছে—"তদা নন্দপ্রভৃত্যেষ কলির্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি।" নন্দাদি শূদ্র রাজার সময় হইতে কলি বিশিষ্ট প্রকারে প্রভাব বিস্তার করিবে। কলির প্রভাব বৃদ্ধিতেই ব্রাহ্মণদিগের শক্তিহ্রাস ঘটিয়াছে। তাহার ফলে শাস্ত্র লিখিয়া রাখার পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। প্রথমেই অবশ্য শাস্ত্র পুস্তকাকার ধারণ করেন নাই। যাঁহারা নৈমিষারণ্য প্রভৃতি হইতে শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া আসিতেন, তাঁহারা পুত্র ও শিষ্যদিগকে তাহা মুখে মুখে শিক্ষা দান করিতেন। অনেক দিন এই প্রথাই চলিয়াছিল। পরে সেই পুত্র ও শিষ্যগণ স্মৃতির সাহায্যের জন্য ঐ সকল লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই ভাবও কয়েকশত বৎসর চলিয়া থাকিবে। শেষে এমন সময় আসিয়াছিল যে, তখন প্রত্যেক ব্রাহ্মণের গৃহে সমস্ত শাস্ত্র লিখিত হওয়া অসম্ভব বিধায় ব্রাহ্মণ সমিতি নানা গৃহ হইতে শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশের লিপিগুলি সংগ্রহ করিয়া এক একটী পুস্তকাকারে পরিণত করিয়াছিলেন। এইঘটনা ২০০০ কল্যব্দের নিকটবর্ত্তী সময়ে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সহজেই এমন অনুমান করা যায়। তেমন ভাবে পুস্তক সঙ্কলন করিতে করিতে লোমহর্ষণ সূত, উগ্রশ্রবা সূত প্রভৃতির কথিত চারি সংহিতা হইতে উদ্ধৃত এবং নানা গৃহে ভিন্ন ভিন্ন পুরাণ পুস্তক হইয়া দাড়াইল। সংগ্রাহকেরা তাহার শ্লোক সংখ্যা গণনা করিয়া চারি লক্ষ শ্লোক পাইলেন। ব্যাস চারিলক্ষ শ্লোকে অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করিয়াছিলেন

বলিয়া তদবধি প্রচারিত হইয়াছে। আমরা এখন অগ্নি-পুরাণ, দেবীভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ প্রভৃতিতে—কোন্ পুরাণে কত শ্লোক থাকাতে পুরাণের এই চারিলক্ষ শ্লোক পূর্ণ হইয়াছে তৎ সমুদায়ের নির্দ্দেশ দেখিতে পাইতেছি। প্রত্যেক পুরাণের শ্লোক সংখ্যা নির্দ্দেশের পরেই পুরাণ লিখিয়া বিতরণ করিলে যে ফললাভ হইয়া থাকে, তাহাও লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায়—পুরাণ পুস্তকাকার ধারণ করিলে পর ঐ সকল পুস্তকে দানের ফল লেখা হইয়াছে।

"পুরাণের খণ্ড, ভাগ, স্কন্ধ, অধ্যায় প্রভৃতিও ঐ পুস্তক সঙ্কলনের সময়েই রচনা করা হইয়াছে; নতুবা পুরাণ সংহিতাতে বা মুখে পুরাণ বলার সময়ে তাহা হইতে পারে না এবং তেমন পরিচও জানা যায় না। মহাভারতে যে আঠার পর্ব্ব দেখা যায়, তাহাও ব্যাসকৃত নহে; মহাভারতকে যাঁহারা পুস্তকে পরিণত করিয়াছেন তাঁহারাই পর্ব্বাদির বিভাগও করিয়া দিয়াছেন। তাহার একটী উদাহরণ বলা যাইতেছে—

"মহাভারতে আশ্রমবাসিক পর্ব্বে ব্যাস কর্ত্তৃক কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে মৃত বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে স্বর্গ হইতে আনাইয়া প্রদর্শন করার কথা শ্রবণ করিয়া জন্মেজয় রাজা স্বীয় পিতা মৃত-পরীক্ষিতকে দেখিতে চাহিলেন। ব্যাস তাঁহাকে উপস্থাপিত করাইয়া রাজার আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি করিয়াছিলেন। ইহা ত মহাভারত শ্রবণ করার সময়ের ঘটনা, সুতরাং মহাভারতের বহির্ভূত। উগ্রশ্রবা সূত নৈমিষারণ্যে মহাভারতের সঙ্গে এ কথাটিও প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাতে আমরা মহাভারত মধ্যে তাহা পাইতেছি। ব্যাস যদি মহাভারতের অষ্টাদশ পর্ব্ব বাঁধিয়া দিতেন, তাহা হইলে এই প্রসঙ্গটী অষ্টাদশ পর্ব্বের পরে অতিরিক্ত পর্ব্ব বলিয়া পাইতাম। তাহা না হইয়া যখন উক্ত আশ্রম বাসিক পর্ব্বের মধ্যে পাইতেছি, তখন বুঝিতে হইবে—উগ্রশ্রবার কথকতার সময়ে ইহা মহাভারত ভুক্ত হয়। তাহার পরে মহাভারত পুস্তক হওয়ার সময়ে আশ্রমবাসিক পর্ব্বের মধ্যে (যেমন পাওয়া গিয়াছিল) ভুক্ত করা হইয়াছে। এই বৃত্তান্ত দ্বারা সম্পাদিত বলিয়া স্থির করিতে হয়।

এই মীমাংসা হইতে আমরা আর একটী বিষয়ও স্থির করিতে পারি ;—হরিবংশ পর্ব্বকে মহাভারত বলিয়াই বুঝা যায়, কেবল তাহাতে নূতন সংযোগ বিস্তার দেখিয়া সন্দেহ করিতে হয়। সেগুলি বর্জ্জন করিয়া অবশিষ্ট মৌলিক অংশ মহাভারতের উনবিংশ পর্ব্ব বলিয়া প্রকাশ করিতে এই আপত্তি ছিল যে, ব্যাস যাহাকে অষ্টাদশ পর্ব্বে প্রণয়ন করিয়াছেন, আমরা তাহাকে উনবিংশ পর্ব্বে স্বীকার করিতে পারি কিরূপে ? ব্যাস পর্ব্ব-বিভাগ করেন নাই বলিয়া যখন বুঝিতে পারা গেল, তখন আর সেই আপত্তি চলে না। সে যাহাই হউক, বর্ত্তমান সময়ের প্রায় তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারত-পুরাণ পুস্তকাকারে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সেই পুস্তক সমূহের ভাব যে অদ্য পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, এমন নহে। ইতিহাসে জানা যায় উহার কয়েক শত বৎসর পরেই বৌদ্ধেরা আমাদের অধিকাংশ পুঁথি দগ্ধ করিয়া ফেলে।

"এই ঘটনার পরে কুমারিল্ল ভট্টের প্রভাবে সুধন্বা রাজা হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত স্থানের বৌদ্ধদলের বিনাশ সাধন করেন।" ইহা "শঙ্কর-বিজয়" গ্রন্থের কথা। এই বিনাশ ব্যাপার শঙ্করাচার্য্যের প্রায় সম-সাময়িক। সুরাটের সারদা মঠে রক্ষিত শঙ্করাচার্য্য হইতে গদী-প্রাপ্ত বর্ত্তমান স্বামী পর্য্যন্তের যে ধারাবাহিক সময় নির্দ্ধারণ পুস্তক রহিয়াছে, তৎসহ সুধন্বা রাজার তাম্র শাসন এবং নেপাল দেশে প্রচলিত বৌদ্ধ পার্ব্বতীয় বংশাবলী প্রভৃতি মিলাইয়া শঙ্করাচার্য্যের জন্মকাল খৃষ্টের জন্মের ৪৬৯ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া স্থিরিকৃত হইয়াছে। (?) অতএব ২৬০০ কল্যব্দের নিকটবর্ত্তী কালে উক্ত বৌদ্ধ বিনাশ ঘটিয়াছে ধরিতে হয়।

"আমরা বেদবাণী প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা নানা উপদেশ পরিপূর্ণ। মূল্য ১৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান ৫৪।১।এ সারপেনটাইন লেন, কলিকাতা।

বিবেকানন্দ স্মৃতি—কবিতায় স্বামীজির কথা—শ্রীসুরেশ চন্দ্র দাস ও শ্রীমাধব চন্দ্র নাথ লিখিত। মূল্য ছয় আনা।

সংবাদ ও মন্তব্য।

১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ সন্ন্যাসী ভক্তেরা তাঁহার দুর্লক্ষ্য আহ্বানে যেরূপ একে একে জগৎ রঙ্গমঞ্চ হইতে তিরোহিত হইতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল মহাপুরুষগণের পদাঙ্ক অনুসরণকারী গৃহস্থ ভক্তেরাও সংসার হইতে অকালে বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। আজ প্রায় বৎসরাধিকও হয় নাই শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর পরমভক্ত শ্রীযুক্ত ললিত চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গত হইয়াছেন। আবার বিবেকানন্দ ভক্ত শ্রীযুক্ত বরেন্দ্র কৃষ্ণ ঘোষ বিগত ২৫শে জুলাই বোম্বাই হইতে আসিবার কালে ছাতনা ষ্টেসনের নিকটে ট্রেণ হইতে পড়িয়া দেহ রক্ষা করিয়াছেন। এই বাঙ্গালীর কর্ম্মবীর রামকৃষ্ণ মিল এবং বিবেকানন্দ মিলের প্রতিষ্ঠাতা এবং এ দেশের বাণিজ্য সম্পদ বঙ্গলক্ষ্মী মিলের রক্ষাকারী। পুনরায় বিগত ১১ই সেপ্টেম্বর ব্রহ্মানন্দ ভক্ত ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্র নাথ কাঞ্জিলাল হঠাৎ বেরিবেরি রোগে সোমবার বৈকালে বহু অনাথ আতুরকে শোক সাগরে ভাসাইয়া অমরায় গমন করিয়াছেন। দুর্ব্বল জীব আমরা করজোড়ে বলি প্রভু তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

২। শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ জি মহারাজ কাশ্মীরে অমরনাথ দর্শন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন কালে শ্রীনগরে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক আহুত হইয়া কৃষ্ণ-জয়ন্তী (জন্মাষ্টমী) দিবসে "জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণ" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

৩। বিগত ৩রা সেপ্টেম্বর স্বামী নির্গুণানন্দ, ব্রহ্মচারী নগেন্দ্র-নাথ, ও অভয় চৈতন্য জয়নগর গ্রামে দীনকুটীরের বাৎসরিক অধি-বেশনে আহুত হইয়া গমন করেন। স্বামী নির্গুনানন্দ "সেবা" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

৪। আমেরিকার বোষ্টন বেদান্ত কেন্দ্রে, বিগত ২রা জুলাই হইতে ২৪শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত স্বামী পরমানন্দ নিম্নলিখিত বক্তৃতা করেন,—

(১) বংশক্রম ও জন্মান্তর (২) রাজযোগ (৩) কর্ম্মযোগ (৪) ভক্তিযোগ (৫) জ্ঞানযোগ (৬) ভৌতিক বিষয়ে মধ্যস্থতা (৭) ইচ্ছা শক্তি (৮) স্থিরতা লাভের উপায় (৯) আরোগ্য ও ধ্যান (১০) অদৃষ্টের পরিবর্ত্তন সম্ভব কি? (১১) আনন্দ লাভের রহস্য (১২) অলৌকিক অনুভূতি (১৩) অসত্যের উপর আধিপত্য।

৫। কৃষ্ণনগর দরিদ্র ভাণ্ডার কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া স্বামী শুদ্ধানন্দ বিগত ৬ই সেপ্টেম্বর সেখানে গমন করেন। সন্ধ্যাকালে ৬ত্রম্ব টাউন হলে তাঁহার নেতৃত্বে সভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ইঞ্জিনিয়র সুদীর্ঘ বক্তৃতার দ্বারা সভার উদ্বোধন কার্য্য আরম্ভ করিলে স্বামী বাসুদেবানন্দ "সেবা ধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। অতঃপর স্বামী শুদ্ধানন্দ সেবার উপকারিতা, উপযোগীতা এবং সেবকদের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণমিশনের বন্যায় সেবাকার্য্য।

গত জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে ক্রমাগত কয়েকদিন ধরিয়া বৃষ্টির ফলে দ্বারকেশ্বর ও শিলাবতী নদীর ভীষণ বন্যায় বিষ্ণুপুর ও আরামবাগ থানার অন্তর্গত বড়দঙ্গল ইত্যাদি ১৫।১৬ খানি গ্রাম প্লাবিত হওয়ায় বহু গৃহ পড়িয়া যায়। এই সংবাদ পাইয়া মিশন বিষ্ণুপুর থানায় সেবা-কার্য্য আরম্ভ করেন এবং বড়দঙ্গলে সেবক প্রেরণ করেন। কিন্তু হুগলী জেলার রাষ্ট্রীয় শাখা সমিতি বড়দঙ্গলে সমস্ত কার্য্যের ভার লওয়ায় ও বর্ত্তমানে মিশনের সাহায্যের কোন প্রয়োজন নাই, এইরূপ মর্ম্মে পত্র লেখায় মিশন তথায় কোন কার্য্য আরম্ভ করেন নাই। গত ১লা আগষ্ট হইতে পুনরায় দুইদিন মুষলধারে বৃষ্টি হওয়ায় দ্বারকেশ্বর, শিলাবতী ও বেরাই নদীতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বন্যা হয় ও নদীর উভয়কূলবর্ত্তী গ্রাম সমূহের গাছপালা, মানুষ, গরু ইত্যাদি ভাসাইয়া লইয়া যায়। বন্যার প্রকোপ একটু কমিলে নদীতে গরু বাছুর প্রভৃতি গৃহপালিত পশু সমূহের মৃতদেহ ভাসিতে দেখা যায় ও কোন কোন স্থানে মনুষ্যের

মৃত্যু সংবাদও পাওয়া যায়। কোন কোন গ্রামের ধান্যক্ষেত্রের উপর দুই তিন হাত বালির স্তর পড়ায় শস্য সমূহ নষ্ট হইয়াছে। যে সমস্ত গৃহাদি এই বন্যার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছে তাহাও জলে বিশেষরূপে ভিজিয়া যাওয়ায়, বাসের অনুপযোগী হইয়াছে। স্ত্রীপুরুষেরা গৃহহীন, বস্ত্রহীন ও অন্নহীন হইয়া অবস্থান করিতেছে। এইরূপ লোমহর্ষণ সংবাদ ও বড়দঙ্গল প্রভৃতি স্থান হইতে আবেদনপত্র পাইয়া মিশন মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে সেবক প্রেরণ করেন।—মেদিনীপুরের অন্তর্গত চন্দ্রকোণায় একটি, গড়বেতায় দুইটি, বাঁকুড়া জেলায় বিষ্ণুপুর ও রাধানগরে দুইটি, কোতলপুরে দুইটী, তেলাইডিহিতে একটি ও হুগলী জেলায় বড়দঙ্গলে একটি ;—সর্ব্বসমেত আটটি সাহায্য কেন্দ্র খুলিয়াছেন। সপ্তাহে মিশনের প্রায় ছয় শত টাকা খরচ হইতেছে এবং উক্ত কেন্দ্র হইতে সর্ব্বসমেত ১৫০ মণ চাউল ৩২৫ খানি কাপড় ও প্রায় দেড় সহস্র টাকা গৃহ নির্ম্মাণের উপকরণের জন্য বিতরিত হইয়াছে। সেবকগণ সংবাদ দিতেছেন যে, চাউল বস্ত্র ও গৃহনির্ম্মাণের জন্য বিস্তর অর্থের প্রয়োজন হইবে।—সম্প্রতি আমরা ফরিদপুরের কয়েকস্থান হইতে বন্যার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু অর্থাভাব প্রযুক্ত আমরা তথায় বিশেষরূপে কার্য্য করিতে পারিতেছি না। আশাকরি সহৃদয় জনসাধারণ এইরূপ অসহায় বিপন্ন নরনারীকে অর্থ ও বস্ত্রদ্বারা যথাসাধ্য সাহায্য করিতে বিরত হইবেন না।

নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাহায্য সাদরে গৃহীত হইবে :—

(১) প্রেসিডেন্ট, রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় হাওড়া।

(২) সেক্রেটারী, রামকৃষ্ণ মিশন, ১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

(স্বাঃ) সারদানন্দ—

সেক্রেটারী—শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—আমরা উত্তর বঙ্গের ভীষণ জলপ্লাবনে তদন্তের জন্য ৪ঠা অক্টোবর ৬ জন সেবক পাঠাইয়াছি।

কথা প্রসঙ্গে।

(১)

জাপানের নিকটস্থ সমুদ্রে ছোট চিংড়ি মাছের মত এক প্রকার জীব দেখা যায়। ইহাদের গায়ে আলো জ্বলে এবং এই আলোকের উত্তাপ নাই বলিলেই চলে। এক্ষণে আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা এই উত্তাপহীন আলোক একত্রিত করিয়া সাধারণ কাজ কর্ম্মে লাগাইবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা এই আলোকের নাম লুসিফারিন্ (luciferin) আখ্যা দিয়াছেন—যাহা আমাদের দেশে জোনাকার পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্ট হয়। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ই নেউটন হারভে উক্ত লুসিফারিন একীভূত করিবার এক উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সাইপ্রিডিনা (cypridina) নামক এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামুদ্রিক জীব হইতে তিনি এরূপ উজ্জ্বল উত্তাপবিহীন আলোক নিষ্কাসিত করিয়াছেন যে, তাহাতে খপরের কাগজ প্রভৃতি বেশ পড়া যায়। উক্ত জীবগুলিকে জল হইতে তুলিয়াই শুষ্ক করিয়া গুঁড়া করিয়া ফেলিতে হয়। জল হইতে তুলিয়া অপেক্ষা করিলে উহাদের গায়ের লুসিফারিন্ বাতাসের অম্লজানের সহিত মিশিয়া যাইবে এবং উহা কোনও কাজে আসিবে না। লুসিফারিন নিজে আলোক দিতে অসমর্থ। উহা লুসিফারেসের (Luciferase—অম্লজানের সহিত রাসায়নিক মিশ্রণ বিশেষ) সহিত মিশ্রিত হইলে উহা ফসফরেসেন্স (phosphorescence) নামক পদার্থের সৃষ্টি করে। এক্ষণে এই হরিদ্রাবর্ণের গুঁড়া একটী কিঞ্চিৎ জলপূর্ণ পাতলা কাচের বোতলে ছাড়িয়া দিয়া খুব জোরে ঝাঁকাইতে থাকিলে নীল ও কিঞ্চিৎ সবুজবর্ণের আলোক ঐ বোতলের

মধ্যে দেখা যাইবে। উহা হইতে যে আলোক বাহিরে বিকীর্ণ হইয়া পড়িবে, তাহাতে পড়া চলে। ঐ বোতলের মধ্যে তাপমান যন্ত্র কিয়ৎক্ষণ রাখিয়া দেখা যায় যে, উহার উত্তাপ এক ডিগ্রীর সহস্র ভাগের এক ভাগও বর্দ্ধিত হয় নাই। সেই হেতু উহা হইতে শতকরা ৯৯ ভাগ আলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়, বাকী ১ ভাগ মাত্র উত্তাপরূপে বাহির হইয়া যায়। পক্ষান্তরে সাধারণ প্রদীপ হইতে আমরা মাত্র শতকরা ৪ ভাগ আলোক প্রাপ্ত হই এবং বাকী ৯৬ ভাগ উত্তাপরূপে বহির্গত হইয়া যায়।

২

পরমাণু-বিজ্ঞানের সহিত আর এক নূতন জগৎ লোক সমক্ষে প্রতিভাত হইতেছে। 'পরমাণুকেও বিভক্ত করা যাইতে পারে' এই সত্য আবিষ্কারের পর বৈজ্ঞানিকেরা বলিতেছেন যে, আধারের বৃহত্তের উপর শক্তির আধিক্য নির্ভর করে না, অর্থাৎ বড় জিনিষ হইলেই তাহার ভিতর অনেক শক্তি থাকিবে, ইহার কোন অর্থ নাই অণুর ভিতরও অনন্ত শক্তি থাকিতে পারে। পরমাণু পরীক্ষার দ্বারা তাঁহারা অনুমাণ করেন যে, একটী পরমাণু ঠিক একটী ক্ষুদ্রায়তন সূর্য্য। ঠিক সূর্য্যের ন্যায় ইহার ভিতরও অসংখ্য ইলেকট্রন্ কণা (Electron) প্রচণ্ড বেগে আন্দোলিত হইতেছে। একটী পরমাণুকে যদি ১০০ গুণ বৰ্দ্ধিত (magnified) করা যায়, তাহা হইলে তাহার অন্তর্গত প্রতি ইলেকট্রন কণা এক ইঞ্চির ১০০ ভাগের ১ ভাগের সমান হইবে। কাজেকাজেই পরস্পর তাহাদের গতি প্রতিহত হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই, কারণ তাহাদের গতির নিমিত্ত পরমাণুর মধ্যে অপরিমিত অবকাশ আছে। এই গতি হইতেই উত্তাপের সৃষ্টি।

দৃষ্ট পদার্থের মধ্যে রেডিয়াম (Radium) ২,০০০ সহস্র বৎসর ধরিয়া আলোক দিতে সমর্থ। এক পাউণ্ড কয়লার মধ্যে ১০,০০০ উত্তাপ জন্মাইবার কেন্দ্র (calorie) বর্ত্তমান, আর এক পাউণ্ড রেডিয়ামের মধ্যে ১,০০০,০০০,০০০ বৃন্দ গুণ উহা বেশী। তাই বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকের এক সুখ স্বপ্ন যে লক্ষ লক্ষ মণ কয়লা পুড়াইয়া যে সহর আজ আমরা আলোকিত করি, ভবিষ্যতে হয়ত একটী আলপিনের

মাথায় যতটুকু রেডিয়াম ধরে, তাহার দ্বারা কোটী বৎসর ধরিয়া একটী সহরকে আলোকিত করিতে পারা যাইবে।

চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জেরাল্ড বেন্ড (Gerald Wendt) সি, ই, আইরনের সাহায্যে অখণ্ড পরমাণুকে খণ্ডিত করিয়া পাশ্চাত্যের প্রাচীন কুসংস্কার—যে বিভিন্ন ভৌতিক পদার্থের (element) পরমাণু বিভিন্ন ও নিরবয়ব (idivisible)—একেবারে উড়াইয়া দিয়াছেন। একই ভৌতিক পদার্থের অন্তর্গত ইলেকট্রনের সন্নিবেশ পরিবর্তিত করিয়া (transmutation of elements) বিভিন্ন ভৌতিক পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহারা টাঙ্গষ্টেনের (tungsten) পরমাণুর সন্নিবেশ পরিবর্তিত করিয়া হেলিয়াম্ (Helium) নামক ভৌতিক পদার্থে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আবার রেডিয়ামের পরমাণুর সন্নিবেশ পরিবর্তনে সীসকের (Lead) উৎপত্তি হইয়াছে।

দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে গ্রীক দার্শনিকেরা অনুমান করিতেন যে, কঠিন, তরল বা বাষ্পীয় যে কোনও পদার্থই হোক না কেন, উহা বিভিন্ন অতি সূক্ষ্ম নিরবয়ব (indivisible) ক্ষুদ্রতম পরমাণুর (atom) দ্বারা গঠিত। ভারতীয় বৈশেষিক এবং নৈয়ায়িকদেরও ঐ মত। কিন্তু সাংখ্য ও বেদান্ত মতাবলম্বীরা বরাবরই বলিয়া আসিতেছেন যে, অতি সূক্ষ্ম এক আকাশ পদার্থ প্রাণ (Energy) সংযোগ করিয়া এই বিভিন্ন বস্তু সৃষ্টি করিয়াছে। বৈজ্ঞানিক তাঁহার পরীক্ষাগারে যাহার অনুমান করিতেছেন, যোগী তাঁহার সূক্ষ্ম যোগজ দৃষ্টিতে অপরোক্ষভাবে তাহার অনুভব করিয়া থাকেন।

ঈশ্বর তনয় যিশু।

(স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ)

পুষ্পমধ্যে যেমন সহস্রদল পদ্ম, জ্যোতিষ্কমণ্ডলের মধ্যে যেমন সুধাকর চন্দ্র, পশুকুলের মধ্যে যেরূপ পশুরাজ সিংহ, তদ্রূপ মানব জাতির মধ্যে, কখনও কখনও এরূপ পুরুষ জন্মলাভ করেন যাঁহাদের অলৌকিক জীবন ও কার্য্যাবলী তাঁহাদিগকে Super-man মহাপুরুষ বা অবতার প্রভৃতি আখ্যায় ভূষিত করিয়া মানব সাধারণের মধ্যে চিরপূজ্য ও চিরস্মরণীয় করিয়া রাখে। তাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন আমাদেরই মত এই রক্ত মাংসের তনু লইয়া, তাঁহারা বৰ্দ্ধিত হয়েন আমাদেরই মত খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করিয়া, তাঁহারাও জর্জ্জরিত হয়েন আমাদেরই মত এই জরা-ব্যাধির প্রপীড়নে, কিন্তু মানবের এই সাধারণ দৃষ্টির অন্তরালে তাঁহাদের মধ্যে এমন একটী হৃদয় ও মনের অস্তিত্ব বিরাজ করে যাহা জগতের সমগ্র নরনারীর অপরিসীম দুঃখে সদাই কাতর, এবং যে দুঃখের অপনোদন নিমিত্ত তাঁহারা পৃথিবীর সমুদয় বেদনা ভার অনন্ত কালের জন্য ভোগ করিতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহেন। মনের এই অসীম শক্তি ও হৃদয়ের এই অপূর্ব্ব বিশালতার বিষয় স্মরণ করিয়া তাঁহাদের ভক্তগণ তাঁহাদিগকে ঈশ্বরাংশ সম্ভূত Son of God বা ঈশ্বর পুত্র অথবা স্বয়ং ঈশ্বর বলিতেও দ্বিধা বোধ করেন না। আমরা আজ যাঁহার আগামী জন্ম দিবসের Christmas-eve পুণ্য স্মৃতি লইয়া আনন্দোৎসব করিতে যাইতেছি তিনি উক্ত অমানব পুরুষগণের মধ্যে অন্যতম; যিনি অৰ্দ্ধ পৃথিবীর পাপ ভার অদ্যাপিও মোচন করিতেছেন, যাঁহার শক্তি অৰ্দ্ধ পৃথিবী এখনও শাসন করিতেছে। কিঞ্চিৎন্যূন প্রায় দুই সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে, এই দেব-মানব এসিয়া মহাদেশের উত্তর-পশ্চিমাংশে একটী প্রাচীনতম জাতির মধ্যে কোন ক্ষুদ্র সূত্রধার পরিবারে মাতা মেরীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এই মহাপুরুষের আবির্ভাবের পর দীর্ঘ বিংশ শতাব্দী কালগর্ভে নিমজ্জিত

হইয়াছে। ঐ সময়ের মধ্যে কত রাজ্য-বিপ্লব, সমাজ-বিপ্লব ও ধর্ম্ম-বিপ্লব হইয়া গিয়াছে; কত শক্তিমান নরপতি, তীক্ষ্ণবুদ্ধি সৈন্যাধ্যক্ষ খ্যাতনামা ঐতিহাসিক উঠিয়াছে ও ধ্বংস হইয়াছে সেই সঙ্গে মানব মনেরও কত পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। তাই কাল সমুদ্রের উপকূলে দাঁড়াইয়া আমরা এই মহাপুরুষের অস্তিত্ব লইয়া আজ কত সন্দেহ প্রকাশ করিতেছি।

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে ন্যাজারেথ বাসী 'যিশু' নামক কোন ব্যক্তিবিশেষ ছিলেন না তাঁহার জন্ম কর্ম্ম সকলই কাল্পনিক—মিথ্যা। বুদ্ধ ভগবান্ আবির্ভাবের পর যখন তদীয় শিষ্য প্রশিষ্যগণ পৃথিবীর সর্ব্বত্র তাঁহার বাণী ঘোষণ করিবার জন্য বহির্গত হইয়াছিলেন, তখন একদল বৌদ্ধ ভিক্ষু প্রচার কার্য্যে এসিয়া মাইনরে আগমন করেন তাঁহারাই বর্ত্তমান খৃষ্টধর্ম্ম নামক এই নব ধর্ম্মের জন্মদাতা। ইহার অনেক অকাট্য প্রমাণও তাঁহারা দেখাইয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও আমাদের অনুমাত্র ভীত হইবার প্রয়োজন নাই। শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব যদি স্বীকার না করি, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধও যদি অপ্রামাণিক হইয়া যায় তথাপি গীতার অলৌকিক শিক্ষা কোথায় যাইবে? নচিকেতার উপাখ্যান যদি মিথ্যা হয় তথাপি প্রসিদ্ধ কঠোপনিষদের অসীম শক্তি পূর্ণ উপদেশাবলী কোথায় বিলুপ্ত হইবে? তদ্রূপ ভগবান যিশুর অস্তিত্ব যদি বাস্তবিকই কেবল কাল্পনিক ও কবিত্বপূর্ণ হয়, তথাপি তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া শোক তাপহারী ধর্ম্মের যে অপূর্ব্ব বাণী ঘোষিত হইয়াছিল, তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া অপূর্ব্ব শিল্পীর তুলিকা স্পর্শে মানব চরিত্রের যে নিখুঁত ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহার স্মৃতি ধারিত্রী বক্ষ হইতে কখনও মুছিয়া যাইবে না। আমরা দেখিতে পাই সত্যের অনুকরণ করিয়াই মিথ্যার সৃষ্টি। যদি তৎকালে বাস্তবিকই ঐরূপ একজন শক্তিমান মহা-পুরুষের আবির্ভাব না হইয়া থাকে তাহা হইলে শত শত বৎসর ধরিয়া এরূপ একটী ধর্ম্ম-বিশ্বাস কোটী কোটী মানব মনে আধিপত্য বিস্তার করিতেছে কোন শক্তিতে?

যাহা হউক সকলেই দেখিবেন অবতার জীবন কেমন একটী সাধারণ-অসাধারণত্বের, দেব-মানবত্বের মিলন ভূমি, এই দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধভাবের অপূর্ব্ব সম্মিলন অবতার জীবনকে বড়ই মধুর করিয়া তুলে। খৃষ্ট জীবনেও এই সত্য আমরা উজ্জ্বল ভাবে দেখিতে পাইব। খৃষ্ট যখন জন্ম লাভ করিলেন তখন তদ্দেশে হেরড নামক এক নিষ্ঠুর নরপতি রাজত্ব করিতেন। ভবিষ্যদ্বক্তাগণের মুখে তিনি শুনিলেন বেথলেমে একটী শিশু জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি য়াহুদী দিগের ভবিষ্যৎ রাজা। রাজা ভীত হইয়া এই শিশুর অন্বেষণে অনুচর পাঠাইলে সৌভাগ্য বশতঃ যীশুর জনক জননী উহা জানিতে পারিয়া শিশু পুত্রকে লইয়া মিশর দেশে পলায়ন করিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পর পিতা বসুদেব রাজা কংশের ভয়ে নবজাত পুত্রকে লইয়া যেরূপ পলায়ন করিয়াছিলেন—ইহাও অনেকাংশে তদ্রূপ। মিশরে কয়েক বৎসর অবস্থানের পর পিতা-মাতা যীশুকে লইয়া পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার মননিবেশ করিলেন। বর্ত্তমান সময়ের অনুরূপ তখন পল্লীতে পল্লীতে স্কুল পাঠশালার এরূপ বাহুল্য ছিল কিনা বলিতে পারি না, তবে যিশু যে "গ্রীক" 'লাটিন' ও 'হিব্রু' ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা তাঁহার জীবনী পাঠে জানিতে পারি। কিন্তু যিশু-পরিবারের সাংসারিক অবস্থা সেরূপ সচ্ছল না থাকায় তিনি অধিক দিন বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারিলেন না। সুকুমার বয়সেই শিক্ষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৃহ কর্ম্মে মননিবেশ করিতে হইল। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম দ্বাদশ বর্ষ মাত্র। অদ্যাবধি আমাদের দেশে নানা স্থান হইতে নরনারী যেরূপ কাশী, গয়া, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থ স্থান সমূহ দর্শন করিতে যায়—সেই সময় য়াহুদীদেশে 'জারুজালেম' নামক স্থানে অনেকে তীর্থ দর্শন মানসে গমন করিতেন। যীশুর মাতা-পিতা ও পুত্রকে লইয়া তদ্দর্শনে গমন করিলেন। এই স্থানেই যীশুর 'গুরুভাবের' সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ। যীশুকে খ্যাতনামা পণ্ডিতবর্গের সহিত তথায় গভীর শাস্ত্রালাপে নিযুক্ত দেখিয়া যীশুর মাতা-পিতা ও পণ্ডিতবর্গ সকলেই অতিশয় বিস্মিত

হইয়াছিলেন। কিন্তু এ প্রকাশ যেন মেঘবক্ষে বিদ্যুতের মত ক্ষণিক। কেন না আমরা দেখিতে পাই এই ক্ষণিক প্রকাশের পর সুদীর্ঘ অষ্টাদশবর্ষ পুনরায় আত্ম-গোপন। নিজ জীবিকা-অর্জ্জনের জন্য সূত্রধারের কর্ম্মে কঠোর পরিশ্রম করিয়া অতি সাধারণ ভাবেই যীশুর এই দীর্ঘ অষ্টাদশবর্ষ অতিবাহিত হইয়াছিল।

তখন ইউরোপের রাজনৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা অতীব শোচনীয়। চতুর্দ্দিকে অরাজকতা, দুর্ব্বলের উপর প্রবলের ভীষণ অত্যাচার, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাসকগণ কেবল যেন-তেন প্রকারেণ প্রজাবর্গের ধন-দারাপহরণে সদা ব্যস্ত, জনসাধারণের নৈতিক-জীবন তখন পশু-জীবন হইতে কোন অংশে উৎকৃষ্ট নহে, য়াহুদীগণও তখন প্রবল কুসংস্কারাচ্ছন্ন। ধর্ম্মনামধেয় কেবল কতকগুলি নিয়মের অনুগমন-কারী স্বদেশের এইরূপ ভীষণ পতনাবস্থার আবেষ্টনে বেষ্টিত হইয়া আমাদের যীশুও গৃহকর্ম্মে আত্ম-বিস্মৃত। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ, যীশু আর অধিক দিন এরূপ ভাবে জীবন অতিবাহিত করিতে পারিলেন না। শীঘ্রই হৃদয়ে প্রবল বৈরাগ্যের সূচনা হইল, বিষয় তাঁহার নিকট বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল। যে বস্তুর জন্য তাঁহার স্বজাতি ও জ্ঞাতিবর্গ সর্ব্বদাই পাপাচারে রত, যিশুর সেই সমস্ত দ্রব্যে অতি অনিত্য বুদ্ধি আসিয়া তাঁহাকে গৃহকর্ম্মে উদাসীন করিল। যিশু ভাবিলেন—'এই পশুবৎ সাধারণ জীবন হইতে আর কি উৎকৃষ্টতর জীবন নাই? এই পাপময় মর জগৎ ব্যতীত আর কি দ্বিতীয় স্বর্গ রাজ্য নাই? ওগো কে আছ আমায় পথ দেখাও —এই অন্ধকারময় কারাগার হইতে আমায় আলোকের রাজ্যে লইয়া যাও'। তৃষ্ণার জল 'যিলিন জন' নামক এক উচ্চ সাধু পুরুষ আসিয়া তাঁহাকে কৃপা করিলেন। সমুদ্র ঝিনুক স্বাতি নক্ষত্রের দিন পরিমাণ বারি পান করিয়া যেরূপ অনন্ত সাগর গর্ভে ডুবিয়া যায় যীশুও তদ্রূপ সাধু-প্রদত্ত এই অমৃতবিন্দু পান করিয়া চত্বারিংশ দিবস গভীর সাধন-সমুদ্রে নিমগ্ন রহিলেন। ঐ সময়ে প্রবল প্রলোভনসমূহ সাধন পথ হইতে যীশুকে বিচ্যুত করিতে চেষ্টা পাইল; কাম আসিল কুসুমের হস্তে,

লোভ আসিল তাহার সরস রসনা লইয়া—এইরূপে ক্রোধ, মোহ মাৎসর্য্য প্রভৃতি সকল রিপুই আসিল—কিন্তু ব্যর্থ হইল তাহাদের সকল প্রচেষ্টা। যিশু সিদ্ধিলাভ করিলেন—স্বর্গের দ্বার তাঁহার নিকট উন্মুক্ত হইল। গৌতম সিদ্ধিলাভ করিয়া যেরূপ সকল নরনারীকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন—'তোমরা সকলেই চেষ্টা কর, সকলেই 'বুদ্ধত্ব' লাভ করিতে পারিবে—বুদ্ধত্ব কেবল একটী অবস্থা মাত্র—মানব সাধারণের উহাতে সমান অধিকার'—তদ্রূপ ভগবান মেরী তনয় যীশুও সাধনায় সিদ্ধিলাভপূর্ব্বক স্থির থাকিতে পারিলেন না ; যে অমৃতের সন্ধান তিনি পাইলেন, তাহা জগতের জরামরণগ্রস্ত যাবতীয় নরনারী মধ্যে বণ্টন করিবার নিমিত্ত উদ্‌গ্রীব হইলেন। অদূরেই দেখিলেন, দুইজন ধীবর জাল পাতিয়া মৎস্য ধরিতেছে—তিনি তাহাদিগকে বলিলেন—

"Follow me and I will make you fishers of men"

"আমার অনুসরণ কর, আর মৎস্য ধরিতে হইবে না—আমি তোমাদিগকে জাল পাতিয়া মনুষ্য ধরিবার বিদ্যা শিখাইব"। এই সময় হইতে যীশুর গুরুভাব ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। তিনি গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে এই অমৃতের বার্ত্তা বহন করিতে লাগিলেন। একদিন যীশু দেখিলেন, শত শত নরনারী তাঁহার উপদেশামৃত পান করিবার জন্য তাঁহার পশ্চাদনুগমন করিতেছে। তদ্দৃষ্টে তিনি একটী পর্ব্বত শিখরে আরোহণপূর্ব্বক সেই অসংখ্য তৃষিত মানবকুলকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—

"Blessed are the poor in spirit : for their is the kingdom of heaven.

"Blessed are they that mourn : for they shall be comforted.

"Blessed are they that hunger and thirst after rightousness : for they shall be filled.

"Blessed are the pure in heart for they shall see God.

"Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake : for their is the kingdom of heaven.

"Ask, and, it shall be given you. Seek and ye shall find, knock and it shall be opened unto you.

"Lay not up for yourselves treasures upon earth where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal.

"But lay up for yourselves treasures in heaven where neither moth nor rust can corrupt and where thieves do not break through and steal.

"No man can serve two masters:—ye cannot serve God and mamon

"If thy right hand offend thee cut it off and cast it from thee, for it is profitable for thee, that one of thy members should perish and not that thy whole body should be cast into hell."

তাঁহার এই উপদেশাবলীই পরে 'Sermon on the Mount' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

যীশু অভিজাতবর্গকে ঘৃণা করিতেন, গণ্যমান্য শিক্ষিত সম্প্রদায়কে গ্রাহ্য করিতেন না—তিনি জীবনের অবশিষ্ট দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন পতিতদের মধ্যে—সমাজে যাহাদের কোন স্থান নাই, উচ্চাভিমানিগণ পশুবৎ যাহাদিগকে ঘৃণা করে, যাহাদের দুঃখে কেহ সহানুভূতি প্রকাশ করে না, রোদনে কেহ উত্তর দেয় না। ভগবান বুদ্ধের মত এই নীচ অস্পৃশ্যদিগকে স্বীয় অঙ্কে স্থান দিয়া যীশু জগতের সকল নরনারীর হৃদয় চিরকালের নিমিত্ত কিনিয়া লইয়াছেন। বুদ্ধদেব যেরূপ সেই অম্বাপালী নাম্নী বারবনিতার গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া তাহাকে ধন্য করিয়াছিলেন, যীশুও তদ্রূপ একদিন তৃষ্ণার্ত হইয়া মেরী ম্যাগডেলে (Mary Magdaly) নাম্নী জনৈকা পতিতা রমণীকে বলিলেন—"বৎসে! আমার তৃষ্ণা দূর কর—আমি তোমার জীবনের তৃষ্ণা দূর করিব।" এইরূপে পতিতগণের সহিত যীশুর অবাধ সংমিশ্রণ জন্য পুরোহিতকুল তাঁহার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল। তাহারা যীশুর নিকট কোন অভিযোগ করিতে সাহসী না হইয়া একদিন তদীয় শিষ্যবর্গকে অবিমিশ্র ঘৃণার সহিত জিজ্ঞাসা করিল—"কিহে বাপুরা—তোমাদের গুরুদেব ত বেশ লোক! যত পাপী আর পতিতাদের সহিত বন্ধুত্ব!" শিষ্যগণের মুখে ঐ কথা শ্রবণপূর্ব্বক যীশু উত্তর করিলেন—

"They that be whole need not a physician but, they that are sick:—I am not come to call the righteous, but sinners to repentence."

সুস্থ ব্যক্তিদের চিকিৎসার প্রয়োজন নাই—পীড়িতদের জন্যই চিকিৎসকের আবশ্যক—তাই ধার্ম্মিকদিগকে আমি না ডাকিয়া পাপীদিগকেই নিকটে আহ্বান করি। এই সমস্ত অতি সামান্য নগণ্য ব্যক্তিদিগের মধ্য হইতেই যীশু তাঁহার দ্বাদশ জন প্রধান শিষ্যকে বাছিয়া লইয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সমস্ত অবতারগণের লীলার প্রধানতম সহায়কগণ এই সাধারণ মানবের মধ্য হইতেই উঠিয়াছেন। যীশুর সর্ব্বপ্রধান শিষ্যগণ কুলি মালী জেলে, বুদ্ধদেবেরও বেনীয়া, চাষা ভূষা, নাপিত, চৈতন্যদেবেরও তদ্রূপ—শ্রীরামকৃষ্ণেরও প্রধানতম শিষ্যগণ স্কুল কলেজের কতিপয় নগণ্য বালক। যীশুর ভক্তগণের মধ্যে,—পিটার, এ্যানণ্ড্রু, জেমস, জন, ফিলিপ, বারথোলোমিউ, টমাস, ম্যাথু, দ্বিতীয় জেমস, থেডাস, সামন দি ক্যানানিয়ান ও জুডাসই সর্ব্বপ্রধান এবং স্ত্রীভক্তগণের মধ্যে মার্থা, ম্যারী ও পতিতা রমণী ম্যারী মেগডেলের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যীশু—কর্ম্ম, ভক্তি, জ্ঞান ও রাজযোগের মূর্ত্ত বিগ্রহ ছিলেন। গুরুভাবের সময় অনেক যৌগিক বিভূতি তাঁহার মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল। জনৈক কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ব্যক্তির স্পর্শের দ্বারা রোগমুক্তি, জনৈকা বিধবার মৃত পুত্রের জীবন দান ও পাঁচ সহস্র নরনারীকে মাত্র পাঁচটি রুটী ও দুইটি মৎস দ্বারা উদর পূর্ত্তি করিয়া আহার করান, প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এরূপ আরও অসংখ্য অলৌকিক কার্য্য তাঁহার দ্বারা সংসাধিত হইয়াছিল—তাহার উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। তিনি জীবদ্দশাতেই তাঁহার প্রধানতম শিষ্যগণকে লইয়া সঙ্ঘ গঠন করিতে আরম্ভ করেন। উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া তাঁহাদিগকে প্রচারকার্য্যে প্রেরণ করিবার পূর্ব্বে যীশু বলিয়াছেন।

"Provide neither gold, nor silver nor brass in your purses. "Nor scrip for your journey, neither two coats neither shoes nor yet staves."

যে ত্যাগী শ্রেষ্ঠ যীশু আকুমার ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিয়া জগৎ সমক্ষে ত্যাগের উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করিলেন, যিনি একদিন ঘোষণা করিলেন

"Behold the fowls of the air: for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly father feedeth them. Are ye not much better than they? Therefore take no thought, saying what shall we eat? or what shall we drink, or wherewithal shall we be clothed?

আশ্চর্য্যের বিষয় সেই ত্যাগী শিরোমণি-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে আজ ত্যাগের বিন্দুমাত্র চিহ্নও পরিদৃষ্ট হয় না। হায়, কালের কি বিচিত্র গতি।

হিন্দুশাস্ত্র বলেন 'সাধক দ্বৈতভূমি হইতে অদ্বৈতভূমিতে আরোহণ করিয়া পরব্রহ্মের সহিত একত্বানুভব করেন। যীশু ও জ্ঞানের মণি কোঠায় আরোহণ করিয়া বলিয়াছিলেন—'I and my father are one'—'আমি ও আমার পিতা এক' 'ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি' আমাদের এই শাস্ত্র বাক্যের সহিত যিশুর অনুভব সিদ্ধবাক্য সম্পূর্ণ মিলিয়া যায়। এই অদ্বৈত-বাণীই পরিশেষে তাঁহার জীবন নাশের প্রধান কারণ রূপে শত্রু কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। যীশু জানিতে পারিয়াছিলেন, বিপদের ঘন মেঘরাশি তাঁহাকে চতুর্দ্দিক হইতে আবৃত করিতেছে। স্বার্থপর যাজককুল যীশু কর্ত্তৃক তাহাদের সমস্ত প্রশার প্রতিপত্তি বিনষ্ট ও ধর্ম্ম বিশ্বাস আক্রান্ত দেখিয়া ক্রমে তাঁহাকে নানারূপ অপমানিত ও নির্য্যাতিত করিতে লাগিলেন, কিন্তু যীশু তাঁহার উদ্দেশ্য হইতে অনুমাত্র বিচলিত হইলেন না। শেষে যাজককুল স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন, এই পাপিষ্ঠকে একেবারে ধ্বংস করা ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই। যীশুও মৃত্যু অতি সন্নিকটে বুঝিয়া অধিকতর উৎসাহের সহিত প্রচার কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন, তাঁহার একজন প্রিয়তম সন্তানকে বিশ্বাসঘাতক ও শত্রুগণের সহিত ঘোর ষড়যন্ত্রে সংশ্লিষ্ট জানিয়াও তাহাকে ক্ষমা করিলেন, তাঁহার জনৈক শিষ্য একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

"Lord, how oft shall my brother sin against me, and I forgive him? till seven times."

ঈশ্বর তনয় উত্তর করিলেন—

"I say not unto thee, until seven times, but until seventy times seven.

এই বিশ্বাসঘাতককে ক্ষমা করিয়া, যীশু জগৎকে দেখাইলেন—তিনি যাহা উপদেশ করেন, তাহা স্বয়ং অনুষ্ঠান করিতে পশ্চাৎপদ নহেন।

অতঃপর যীশু ইহুদী যাজকগণের, অনুচরবর্গ ও রোমীয় সৈন্যগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া বিচারক সমক্ষে নীত হইলেন। উহার পূর্ব্ব দিবস সান্ধ্য ভোজনে তিনি তাঁহার পুত্রগণকে বলিয়াছিলেন—"বৎসগণ! ইহাই তোমাদের সহিত আমার শেষ ভোজন।" তাঁহার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ, "তিনি পাপকে ক্ষমা, পাপীদের সহিত সুব্যবহার ও নিজকে ঈশ্বর পুত্র বলিয়া প্রচার করেন।" বিচারক জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কি বলেন—আপনি 'Messiah' অর্থাৎ ঈশ্বর পুত্র?" কঠোর প্রাণদণ্ড ধ্রুব জানিয়াও যীশু নির্ভীকভাবে উত্তর করিলেন—'I am' 'হাঁ, আমি ঈশ্বর তনয়'। এই ঘটনা আমাদিগকে সমজাতীয় অন্য একটী ঘটনার বিষয় স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ দেব তখন কাশীপুর উদ্যানে রোগ-শয্যায় শায়িত। দেহাবসানের আর অল্পক্ষণ মাত্র বিলম্ব আছে। নিকটে তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য নরেন্দ্রনাথ শোকার্ত্ত ও সন্দিগ্ধ চিত্তে ভাবিতেছেন—'এখন যদি তিনি বলিতে পারেন—'তিনি ঈশ্বর'—তবে বিশ্বাস করিব।' শ্রীভগবান পুত্রের সন্দেহ দূর করিবার নিমিত্ত অতি ক্ষীণস্বরে বলিলেন—"হাঁ বৎস যে রাম, যে কৃষ্ণ সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ।" যাহা হউক তিনি বধ্যভূমিতে নীত হইয়া হত্যাকারিগণ কর্ত্তৃক অতি নিষ্ঠুর ভাবে নিহত হইলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এইরূপ নৃসংশ অত্যাচারেও তাঁহার সৌম্য মুখ-মণ্ডল এতটুকুও সঙ্কুচিত বা ওষ্ঠদ্বয় হইতে একটীও অভিশাপ উচ্চারিত হইল না বরং তাঁহার হত্যাকারিগণকে ক্ষমা করিয়া তিনি করুণাময় ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন—"Father, forgive them, for they know not what they do" হে পিত! তাহারা অজ্ঞ তাহাদের ক্ষমা কর"।

কথিত আছে হত্যার তিন দিবস পরে যীশু তাঁহার সমাধি হইতে পুনরুত্থিত হইয়াছিলেন। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইল মৃত্যু তাঁহাকে জয় করিতে পারে নাই—তিনিই মৃত্যুকে জয় করিয়াছিলেন।

ভগবান যীশুখ্রীষ্টের জন্ম কর্ম্ম ও ধর্ম্মমত সমূহের সম্যক আলোচনা করা এইরূপ একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসম্ভব। জগতের সমগ্র নরনারী অনন্ত কাল ধরিয়া চেষ্টা করিলেও ভগবানের লীলারহস্য লিখিয়া বা পড়িয়া কখনও শেষ করিতে পারে না। তাই খ্রীষ্টের পরম ভক্ত সেণ্ট জনের বাণীর অনুকরণ করিয়া বলিতে হয়—

And there are also many other things which Jesus did, the which, if they should be written every-one, I suppose that even the world itself could not contain the books that should be written. Amen.

শ্রাবণের ধারা।

(শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র দেওয়ান)

নিখিলের অন্তরের শাশ্বত জিজ্ঞাসা
রহিল রহস্যমগ্ন কভু কোন ভাষা
করিতে মীমাংসা তার দিল না উত্তর।
যেই অজ্ঞাতের দ্বারে নিখিলের কর
আঘাতিল বারবারে, অদ্যাপি খুলেনি
তাহা, চিত্তের পিপাসা অদ্যাপি মিটেনি,
নিখিলের সাথীটীরে পায়নি খুঁজিয়া
শ্রাবণের ধারা তাই পড়ে আঁখি দিয়া।

গুঞ্জরা বক্ষে বেহুলা।

(শ্রী—).

হোম হুতাশনরূপা পবিত্রকারিণী,
অজ্ঞান-তমিস্রনাশা সহস্রাংশু দৃশা,
পতিভক্তি প্রতিভায় করিয়া সঙ্গিনী
দ্বাদশ বর্ষীয়া বালা বিধবার বেশা
কে তুমি কিশোরি সতি ? গুঞ্জরা-সলিলে
ব্যষ্টি-ভূত গত-পতি বক্ষে লয়ে একা
কদলি ভেলক'পরি ভাস অবহেলে ?
সুমেরু হৃদয়-দম হেরি কি নির্ভীকা !
বৈধব্য-সিন্ধুরে অয়ি ! ক্লিষ্ট অনশন—
বক্তে তব ব্যক্তি কিবা সুব্যক্ত-পাবক,—
ভাতিবারে জ্যোতিঃজাল কল্যাণ জনক
উপস্থিত-নারীগণ-ধর্ম্ম প্রণোদন
ভবিষ্য-অনন্ত-যুগ যোষিত জগতে !
"লুপ্ত লৌকিকধর্ম্ম ব্যক্ত করিতে
নারীধর্ম্ম-পবিত্রতা পুনঃ প্রচারিতে
সমাজের পবিত্রতা পুনঃ প্রবর্ত্তিতে
কর্ম্ম-ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য-বিষয় বাড়াতে
নারীধর্ম্ম-স্বরূপের পুনঃ বিশ্লেষণে
বিদূরিতে নর নারী ধ্বান্ত-হৃদি-গত
অভিব্যক্তি স্বীয় সৌর ধ্বান্তঘ্ন কিরণে !
সম্মানিতে পূজনীয়া জননী জাতিরে
সমাজের শীর্ষস্থানে পুনঃ প্রতিষ্ঠিতে
নারী-কম-হৃদি-গ্রন্থি যত্নে ভেদিবারে
কিংবা নারী প্রিয়ধর্ম্মে সংশয় ছেদিতে"

কে তুমি? কিশোরি! হেরি কঠোরতা হেন
উগ্রত্যাগ, উগ্রতপঃ কর আচরণ?
ভুলি খেলা, নিত্যলীলা কর প্রদর্শন?
বহির্মুখা জগতের কর আকর্ষণ
ব্যষ্টি দৃষ্টি, ব্যষ্টি মন সমষ্টি করিয়ে।
জড়, স্থূল, সূক্ষ্ম আদি সমগ্র জগত,
স্বীয় স্বীয় সত্ত্ব আজি সবে সম্মিলিত
হইবারে অন্তর্মুখী সমংসক হ'য়ে।
প্রকৃতির অধিকারে, প্রবৃত্তি শাসন;
কে তুমি ব্রহ্মচারিণী-সুধা-স্বরূপিণী—
যোগ চতুষ্টয় চতুঃ সমুদ্র মন্থনে
গুপ্ত-সুধা-গবেষণা কর উদ্দীপনা?
মৃতপতি বক্ষে লয়ে অমৃত-সন্ধানে,
কোথা বা ধাইছ বল কার সন্নিধানে?
অমৃতের মধুক্রম অমর্ত্তনিদান
নিজে তুমি কর কার পূজা আয়োজন?
নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত তুমি সত্যবতী
কার বা অভাব স্মৃতি করিছ পোষণ?
কেন বা সৌন্দর্য্য সহ সন্দর্শনে সতি!
বদ্ধ প্রায় ভ্রান্ত মনে কর আকিঞ্চন?
মৃত-অমৃত তত্ত্ব বৈষম্য রহিত
শৈশব-স্বভাব সম বুঝি বিস্মৃত;
মৃগনিভ মৃগনাভি প্রায় নাভি স্থিত
সৌরভ গৌরব কিগো ভ্রান্ত অবিদিত।
পুরুষ প্রকৃতি রূপে প্রত্যক্ষ মূরতি
গুঞ্জরা-হৃদয় শোভা কর সম্পাদন
বিকচ-কোরক নিভ উভাক্ষ যেমতি
প্রতিবিম্ব স্ব-স্বরূপে করে প্রদর্শন,—

স্রোতস্বতী শুঞ্জরার স্বচ্ছ-পূতঃ সরে !
কে তোমরা দুইসত্ত্বা এক বৃন্ত-ভূত,
একত্বের সমন্বয় রত পরচারে,
বহুত্বের বাহুপাশে হ'য়ে বন্দিসুত ?
প্রকৃতির পদতলে পুরুষ স্বয়ম্
শ্রুত নিত্য,—নিয়মিত স্বতঃ অবস্থিত !
বৃন্দাবনে কৃষ্ণরূপে পুরুষ পরম
সেবাচ্ছলে শ্রীরাধার-পদ-বিজড়িত !
কিম্বা ভীমা রণভূমে, দৈত্যবধকালে
পরম পুরুষ শিব-নিত্য জ্ঞানময়
অজ্ঞান-অশক্তরূপে পায় শব প্রায়
বিদলত প্রকৃতির শ্যামাপদমূলে।
কিন্তু আজি এই স্থলে এই শুভক্ষণে
কেন লো নিরখি সাধ্বি ! হেন বিপরীত ?
পুরুষ বিকৃত পদ কায় মনঃ-প্রাণে
যত্নে ধরি বক্ষে করি সেবিছ সতত ?
সতী জনোচিত-মৃতপতিসহ, কেন—
নাহি হও সহমৃতা চিরপ্রথা যথা ?
মৃতমধ্যে অমৃতের কিলভ এষণ ?
তৃপ্তচিতে যাহা হেন সম ভোগরতা ?
বিষাদ বা অবসাদ, অথবা শোচনা,
শ্রান্তি, ক্লান্তি, গ্লানিহানা কেন শান্তা স্থিরা ?
অনার্য্যা সঞ্জাত কেন সিন্দুর-বিহীনা ?
পূর্ণ নিরাকারা হেন কেন নির্ব্বিকারা ?
বুঝি তুমি উন্মাদিনী ? তব-উন্মাদনা—
প্রকৃতি-বৈচিত্র্য লুপ্ত করে, গুপ্তভাবে !
"উন্মাদনা-উদ্দীপনা-স্বতঃ-উৎপাদনা"
কেন হয়, হেরি তব পূতঃ অবয়বে ?

উন্মাদনা ওজোরাশি উচ্ছ্বাসিছে কেন
আক্রমিয়া দৃশ্য-বিশ্বে সংক্রামক ভারে ?
সসহায়, লোকালয়-সজীব স্বজন
সন্ন্যাসিয়া সন্ন্যাসিনি ! চিরতরে সবে ;
গতজীব, মৃতকায়, সঙ্গিশব সহ
বিজন-শ্মশান প্রায় অবিচল-মনে
রত যথা যোগিবৃন্দ সমাধি-মগনে !
দীনা, হীনা বেশে কেন ভ্রম অহরহ ?
স্বতঃ জ্ঞানোন্মাদ স্বতঃ শ্মশান বিহারী
জীবাভিষ্ট ইষ্টদেব, ভ্রমেন যেমতি
শ্মশানে শবের সঙ্গ অঙ্গীকার করি—
সমাদরে কলেবরে মাখিয়া বিভূতি !
করি নানা উপাদান অথবা যেমতি
শ্মশান-সহায়-শবে যোগ-অনুষ্ঠান
চিতাদেশে ক্ষিপ্ত বেশে যতি সিদ্ধমতি
সত্য-শুদ্ধ-সদর্শনে করেন ভ্রমণ !
ভ্রষ্ট, দুষ্ট, ক্লিষ্টভাব বিনষ্ট করিয়া,
গন্তব্য-চরম জ্ঞেয় মার্গ বিজ্ঞাপিতে,
প্রবৃত্তির পরিহার কীদৃশ করিয়া,
নিবৃত্তির পরাপূজা নিজে আচরিতে
নাহি হও তুমি বালা !—পতি-সহমৃতা ?
চিতানলে ভস্মীভূতা সাযুজ্যা হইতে
উচ্চতম কার্য্য নীতি পুনঃ শিক্ষা দিতে
কাল রাহু-গ্রস্ত নীতি-সূর্য্যমুক্তি যথা
এখন স্থূল জগতে স্থূল দৃষ্টীভূত
রয়েছ দেদীপ্যমানা বহ্নি-বীর্য্যবৎ !—
তেজস্তাপে সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারিতে,

জ্ঞানেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য-স্থূল কাল নাম-রূপ
অন্নময় কোষ বদ্ধ রয়েছ এখন
প্রাংর্শিতে বিশ্বসুতে দৃশ্য অপরূপ
অপ্রত্যক্ষ গুপ্ত তত্ত্ব প্রত্যক্ষ কারণ॥
আত্মার বিশ্লিষ্টভূত-সংশ্লিষ্ট করিয়া
পঞ্চকোষ-ভূয়োযোগ-সাধন-প্রক্রিয়া
প্রতিরূপ প্রকাশিতে পুনঃ আচরিয়া
অগোচর-ভূত ভূত গোচরে লইয়া ?
কেবা 'কাঁচা' তুমি বেশে একা আত্মা সনে
ব্যক্তাব্যক্ত-গোপন-সন্ধান-খেলা হেন
খেল 'পাকা' তুমি বেশে নির্বিকল্প মনে,
মুক্তামুক্ত-আত্মকোষ লয়ে উপাদান ?
খেলে যথা, সগুণিত মানবের মন
নিত্যসাথী নিত্যবদ্ধ বিকল্পের সনে।
আজ্ঞাচক্র বৃন্দাবনে পুরুষ যেমতি
খেলে, রাসলীলা রঙ্গে প্রকৃতি সংহতি।
ধর্ম্মরত দেবব্রত ইচ্ছামৃত্যুসম
স্বীয়া স্বেচ্ছামৃত্যু তুমি স্বায়ত্ত করিয়া
সেবাধর্ম্মব্রতা শুভ্র ক্ষুদ্র কার্য্যাসম
জীবসেবা-যজ্ঞানলে জীবন আহুতি
দানিবারে আত্মকোষ রেখেছ এখন
পতিসহ চিতানলে ভূতে না মিশিয়া
এ দুঃসাধ্য তপোসিদ্ধলব্ধ সত্য হেন
উপলব্ধি উপলব্ধ নিজে না রাখিয়া।
এ সত্য-অমৃত-তত্ত্ব পদার্থপরম
আস্বাদন করাইতে মধুর আস্বাদ
বিতরিতে বিশ্বজীবে স্বহস্তে স্বয়ম্
এখন শোভিছ বিশ্বে বিশ্বমাত্রাস্পদ।

আব্রহ্ম বিপুলা-প্রাণে উদার হৃদয়
বিশাল ব্যোমবদ্বক্ষ বদান্য প্রবণ
হিমাদ্রি সদৃশ উচ্চ মতি উচ্চাশয়
মহতী মহিমা তব পরিচয়ে হেন।
বিকৃত, গলিত, পুতি পতি শবরূপ
প্রত্যক্ষ-জড়ের সনে দীর্ঘকাল ক্রমে
বিরাজি প্রত্যক্ষ তুমি চিন্ময়ী স্বরূপ
অমানুষী অশরীরী অপূর্ব্ব সঙ্গমে
হইয়াছে অন্তঃসত্ত্বা, জ্ঞানগর্ভে তুমি
ধরিয়াছ বিশ্বভ্রুণ অপার আদরে
হইবারে প্রসবিতা বিশ্বের জননী
সত্য সত্ত্বাময় শিশু প্রসবের তরে।
বিশুদ্ধ-আনন্দ-স্তন্য-পীযূষের পানে
সমগ্র মানবজাতি নিরবধি সবা
জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে পুলকিত প্রাণে
হয়েছে, হতেছে, হবে তৃপ্তপুষ্ট কিবা!
নির্জ্জীব নিষ্ক্রিয় জড়-মৃত-পতি-তব
অমৃত চৈতন্য-নিভা তুমিও নিষ্ক্রিয়া
চিজ্জড়-জড়িত যেন তোমরা উভয়ে
বিটপী ব্রততী যথা হৃদয়ে হৃদয়ে
এ অপূর্ব্ব ওতঃপ্রোতঃ যুগল সঙ্গমে
সক্রিয় সজীব জীব জগৎ জঙ্গমে
তমোগ্রস্ত, সুপ্তভাব করিয়া বিলোপ
সত্ত্বের উদ্ধার পুনঃ কারণে বিক্ষেপ
করিলা তচ্ছাময়িক সৃষ্টি সংস্করণ
নিদ্রালুর চূর্ণি নিদ্রা আঁখি আকর্ষণে
উদ্বোধিলা-করি বিশ্বে নব আবাহন
চৈতন্য-সঞ্চারি-শক্তি দানি সঞ্জীবনে।

মায়ার প্রভাবে যবে চৈতন্য অভাবে
ভগবদ্দেঘাষিত প্রথা যথা অতিক্রমে
যয়ে লভে অনিবার্য্য জড়ের স্বভাবে
সদৃশ্য-সমগ্র-জগজ্জীব যথাক্রমে।
ভগবদ্‌প্রেরিত শক্তি যথা তদীক্ষণে
সুদক্ষ, অধ্যক্ষ রূপে প্রত্যক্ষ হইয়া
লোকচক্ষে, বিশ্ববক্ষে চৈতন্য স্থাপনে
সৃষ্টিলক্ষ্য রক্ষা করে সুচারু চালিয়া।
ভগবদ্ প্রেরিত শক্তি হবে তুমি কিবা ?
দীনা, হীনা, মৌনা বেশ উন্মাদিনী সমা
অপ্রচ্ছন্ন বজ্রনাদে অভিবক্ত কিবা
জয়োল্লাস মুখরিত তোমার মহিমা।
অশরীরী, অমানুষী হবে কেবা তুমি ?
উপলব্ধি বিজ্ঞাপনে স্বতঃ বিশ্বভূমি
অব্যক্ত, অশ্রুত তব আত্ম পরিচয়!
বিশ্রুত, বিক্ষিপ্ত ব্যক্ত করে ক্রমান্বয়!
চম্পক কোরক প্রায় চম্পক নগর
ক্ষুদ্র জনপদ, ক্ষুদ্র জন অধিপতি
ধীর ধর্ম্মমতি বৈশ্যপতি চন্দ্রধর
তদীয় তনয়াতুল্যা ক্ষুদ্রতমা অতি
ক্ষুদ্রবালা! তুমি তাঁর সুষা ক্ষুদ্রতমা!
লক্ষীন্দ্রের জীবনের ক্ষুদ্র সে সাঙ্গিনী
অবস্তা অধিপ ক্ষুদ্র সাহরাজ নামা
পিতৃতব. ক্ষুদ্রতব জননী, জনিনি!
ক্ষুদ্রত্বের বৃত্ত বৃত-বদ্ধ তুমি যেবা
মহতী মহত্ব-ভুক্ত মুক্ত যুক্ত কিবা
খদ্যোজ্জ্যোতি রেণু তুমি পরমাণু ভবা
মহজ্জ্যোতি ভানুসহ অঙ্গীভূত কিবা

কোথা অদ্রি অভ্রভেদি অত্যুচ্চ শিখর
অতল স্পরশী কোথা অব্ধি সুগভীর
বহুব্যবধান মধ্যে বারি বিন্দু তুমি
বহু বিঘ্ন বহু পন্থা কিবা অতিক্রমি
আসিয়াছ সহামৃত সিন্ধু সন্নিধানে।
মিলিয়াছ সান্ত শান্ত অনন্তের সনে
সসীমা হইয়া তুমি অসীমার ধ্যানে
স্বীয়া সত্ত্বা পরাত্মার স্বরূপ সন্ধানে
হইয়াছ রত্নাকরী রত্নাকর প্রাণে
বিশালা, বিপুলা বপু অনন্যা আকারা
ব্যষ্টিস্থূল-সমষ্টির বিরাট চেতনে
লভিয়াছ ; হইয়াছ প্রশান্তা গম্ভীরা !

তুমি।

(ব্রহ্মচারী আনন্দ-চৈতন্য)

নহ তুমি মিথ্যা, ছায়া অন্ধকার
তুমি নিত্য সত্য সদা নির্ব্বিকার,
আনন্দ মঙ্গলময় ;
তোমারি অনন্ত প্রেমোদ্ভাসিত
তোমারি অনন্ত গুণে বিকশিত
প্রেম, প্রীতি বৃত্তিচয়।

পূজার আয়োজন।

(গল্প)

(শ্রীঅজিতনাথ সরকার)

(১)

একদিন বর্ষার এক মেঘাচ্ছন্ন অপরাহ্নে পশ্চিম বঙ্গের একটী ক্ষুদ্র সহরে এক সজ্জিত প্রাসাদে উৎসবের আয়োজন হইয়াছে। উৎসবের হেতু গৃহস্বামীর বাড়ীতে সখের ভোজ। তাঁহার বন্ধু-বান্ধবের অনেকেই এই উৎসবে যোগদান করিয়াছেন; কিন্তু গৃহিণী-সহচরীর সংখ্যাই বেশী। তাঁহাদের সকলেই বেশ আড়ম্বরের সহিত বেশ-ভূষা করিয়া আসিয়াছেন। কোথাও গান, কোথাও সমালোচনা ইত্যাদির বৈঠক বসিয়াছে; গৃহস্বামী বাহিরের ঘরে বসিয়া গল্প-গুজব করিতেছেন। সেখানেও গান-বাজনার আয়োজন, তাস-পাশা, সকল রকম বৈঠকই বসিয়াছে। হঠাৎ বাহিরের দিকে নজর পড়ায় গৃহস্বামী দেখিতে পাইলেন—তিন চারি জন শীর্ণকায় লোক সেই উৎসব-মুখরিতা পুরীরদিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। দেখিয়া বোধ হয় যেন তাহারা কাহাকেও খুঁজিতেছে। লোকগুলার বিষাদ-মলিন-মুখের দিকে চাহিয়া বোধ হয় তাঁহার একটু সহানুভূতি আসিয়া পড়িল,—তাই বাহিরে আসিয়া তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা কি চাও?" তাহাদের মধ্যেই একজন অতি সঙ্কোচের সহিত ক্ষীণস্বরে বলিল;—"আজ্ঞে, এটাকি বিজয়পুরের জমিদার নির্ম্মল বাবুর বাড়ী?"

"হাঁ। তাঁর সঙ্গে কি কিছু দরকার আছে?"

"আজ্ঞে হাঁ—বিশেষ দরকার আছে।"

এই কথা শুনিয়া নির্ম্মলবাবু অতিমাত্র উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন,—"আমারই নাম নির্ম্মলবাবু। আচ্ছা এস"। তার পর তিনি তাহাদের একটী পৃথক ঘরে বসিতে দিয়া বন্ধুদের ঘরে গেলেন; এবং

সেখান হইতে কিছুক্ষণের জন্য বিদায় লইয়া আসিয়া সেই ঘরে বসিলেন। অমনি তাহাদের মধ্যে একজন বলিতে আরম্ভ করিল,—"বাবু! আপনিই আমাদের হরিতারণবাবুর পুত্র? আহা! দেখে বড় খুসী হলাম। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন, আপনি পিতার মত গরীবের মা বাপ হন।"

লোকটার শুভকামনায় বাধা দিয়া তিনি একটু রুক্ষস্বরে বলিলেন,—"তোমাদের যদি কিছু বল্‌বার থাকে শীগ্‌গীর বল; দেখ্‌ছনা—আজ আমি কি রকম ব্যস্ত!"

"আজ্ঞে সেই কথাই ত বল্‌ছি,—আমাদের দুঃখের কথা আপনি ছাড়া আর কাকে বল্‌ব?"

"কি দুঃখ হয়েছে তোমাদের? তার জন্য আমিই বা কি করতে পারি?"

"আপনি সব পারেন। আপনার রাজ্য, আপনি ছাড়া আর কে পারবে? ওরা ত সব চাকর, বাবু, চাকরে কি আর আমাদের সুখ-দুঃখ বুঝতে পারে? সব গেল! আর আমরা বিজয়পুরে বাস করতে পারছি না।"

"কেন তোমাদের উপর কি কোন বিশেষ রকমের অত্যাচার হয়েছে?"

"অত্যাচারের কথা আর কি বল্‌ব—একবার যদি গ্রামে যান, বুঝ্‌তে পারবেন কি কষ্টে আমরা সেখানে বাস কর্‌ছি! আগে ঐ গামে কি সুখের দিনই না গিয়েছে। আহা সেদিন কি আর কখন দেখতে পাব? পূজা হত, বার মাসে তের পার্ব্বণ কিছু আর বাকী থাক্‌ত না। তার জন্য কত আয়োজন কত ধূমধাম; আর আমাদেরই বা কি উৎসাহ ছিল! পূজার দিনে আমাদের কাকেও কি আর ঘরে ভাতের হাঁড়ি চড়াতে হ'ত? একবারে ডোম্‌ চাঁড়াল পর্য্যন্ত বাদ যেত না। এখন ত সেই বিজয়পুরেই বাস করছি,—তবে কেন রোগে, শোকে, অন্নাভাবে মরে গেলেও মুখে জিজ্ঞেস্‌ করবার কেও নাই?" বলিয়া সে তাহাদের অত্যাচারের কথা বর্ণন করিল। অর্থাৎ কর্ম্মচারিগণ

তাহাদের প্রতি কি রকম ব্যবহার দেখায় আর জমিদারের চক্ষেই বা কি রকম ধূলা দিয়ে নিজেরা সমস্ত আত্মসাৎ করে, একথা সমস্তই বলিল। নির্ম্মলবাবু লোকটার এতটা বাক্যাড়ম্বর শুনিবার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না, তাই মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিলেন; কিন্তু শেষের কথাগুলি শুনিয়া তাঁহার অন্তরাত্মা জ্বলিয়া উঠিল। তিনি জোরে একটু ধমক দিয়াই বলিলেন,—"কেন, তোমরা আগে আমায় এসব কথা জানাওনি ?"

লোকটা ভয়ে জড়সড় হইয়া বলিল,—"আজ্ঞে—আমরা আসতে সাহস করিনি; আজ মরিয়া হয়েই এসে পড়েছি! যা দোষ হয়েছে মাপ করুন। এই বলিয়া সে জোড়হাত করিয়া জমিদার বাবুর সম্মুখে বসিয়া পড়িল। তিনি দেখিলেন লোকটার চোখে জল। শুধু তাই নয়, তাহার সঙ্গিদের অবস্থাও কতকটা সেই রকম। এক্ষণে তাঁহার মনটা একটু নরম হইয়া গেল; কিন্তু ভিতরে ভিতরে বিশ্বাস-ঘাতক আম্‌লাদিগকে জব্দ করিবার জেদটা ভয়ানক প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি তাড়াতাড়ি সেই বিকৃত অবস্থা লইয়াই বন্ধুদের ঘরে উপস্থিত হইলেন। বন্ধুরা ত মূর্ত্তি দেখিয়া অবাক। একজন বলিলেন,—"কিহে ব্যাপার কি ? ওরা বোধ হয় কিছু পাবার জন্য এসেছে ? তা—কিছু দিয়ে দিলেই ত সব গোলমাল মিটে যেত। অত চট্‌লে কেন ?" তিনি বলিলেন —"ভাই! আজ আর আমোদটা পোষাচ্ছে না। এই লোক গুলর কাছেই খবর পেলাম যে জমিদারী মহলে বড় গোলমাল বেধেছে; সুতরাং আজই আমায় গ্রামে যেতে হবে।"

"আঁা তাই নাকি ? এযে দেখ্‌ছি একেবারে রামরাজত্ব। "তা যাই বুঝ,—সম্পত্তিটা ত বজায় রাখ্‌তে হবে! নইলে মদের কড়ি যোগাবে কে ? বেশ!—স্বচ্ছন্দে! আজকের সভাটা দেখ্‌ছি নিস্ফল হয়ে' গেল! এই সবেমাত্র গুরুভোজন করে বসেছি, এরই মধ্যে যত আপদ জুটে গেল। স্ফূর্ত্তিটা একেবারেই মাটি হয়ে' গেল দেখ্‌ছি! নাও হে যতীন একটা গান গেয়ে সভাটা ভেঙ্গে দাও।" যতীনবাবু গান ধরিলেন,—

"সভা যখন ভাঙ্গবে তখন শেষের গান কি যাব গেয়ে ?
হয় ত তখন কণ্ঠহারা মুখের পানে রব চেয়ে।
এখন যে সুর লাগেনি বাজবে কি আর সেই রাগিণী,
প্রেমের ব্যথা সোনার তানে সন্ধ্যা গগন ফেল্‌বে ছেয়ে ?"

"বাঃ তোফা ! যতীনের ভাল গলাটা যেমন, গানটাও ঠিক তেমনি বেছে নিয়েছে।" নির্ম্মলবাবুর মনের অবস্থাটা এখন আমোদ উপভোগ করবার মত ছিল না, কিন্তু—সময়ানুসারে গানটা তাঁর বড় মিষ্ট বোধ হইল। সঙ্গে সঙ্গে মনটা যেন একটু উদাস হইয়া গেল। "শেষের গান কি যাব গেয়ে" পদটা যেন তাঁহার একটা নিভৃত স্নায়ুতন্ত্রীতে থাকিয়া থাকিয়া বাজিতে লাগিল।

সভা ভঙ্গের পর ভিতরে গিয়া দেখিলেন স্ত্রী—শোভা তখনও বন্ধুদের বিদায়-উৎসবে ব্যস্ত। কিন্তু হঠাৎ সেখানে গিয়া একটু অস্বাভাবিক ভাবে বলিয়া ফেলিলেন,—"আমি এক্ষুণি দেশে যাব; জিনিষ পত্র একটু গুছিয়ে দাও।" এই কথা শুনিয়া ত সে অবাক হইয়া গেল! কারণ এতদিনের মধ্যে নির্ম্মলবাবু কখন গ্রামে গিয়েছেন সে কথা তাহার মনে পড়িল না; তবে গ্রামে তাঁহাদের বাড়ী ঘর আছে, জমিদারী মহাল আছে, সেখান হইতে মাঝে মাঝে লোকজন, জিনিষ-পত্র ইত্যাদি আসে একথাটা বেশ জানা ছিল নির্ম্মলবাবুর আজিকার বাড়ী যাওয়ার কথাটা সে ঠাট্টা বলিয়াই ধরিয়া লইত, কিন্তু তাঁহার মেজাজের গতিক দেখিয়া সত্যই ধরিয়া লইল। তার পর একটু থামিয়া বলিল,—"কেন, এই বর্ষাকালে সেই নরককুণ্ডে না গেলেই কি চলছে না? হঠাৎ সেখানে এমন কি প্রেমের টান উপস্থিত হল' যে আজই যেতে হবে ?"

"হতে পারে নরককুণ্ড! সে তোমার পক্ষে। তুমি স্বর্গের কুসুম আজন্ম স্বর্গেই ফুটে রয়েছ। আমি ঐ নরককুণ্ডে জন্মেছি, যদি মরতে হয়—ঐ নরকেই মরব। আমার বিশ্বাস এই অপ্সরা আর দেবতার বাসস্থান সহররূপী স্বর্গের চেয়ে নরকের বাতাস আমার কম স্বাস্থ্যকর হবে না! তোমরা জান না—বুঝ্‌তে পার না যে, এই স্বর্গ তৈরী হয়েছে

সেই নরকেরই হৃৎপিণ্ডের রক্ত দিয়ে। যা কিছু পাচ্ছ তোমাদের বিলাস-রূপ মহাযজ্ঞের অনলে আহুতি দিবার জন্য—সবই-সেই নরকের কৃপায়। অথচ দারুণ অবহেলায় আজ সে নরক পুড়ে ছারখার হতে বসেছে; তার রক্তও বুঝি শুকিয়ে এসেছে! ওঃ কি অত্যাচারই না আমি এতদিন করে এসেছি সেই হতভাগ্যদের উপর।" শোভা এ কথা শুনিবার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। সে নিতান্ত অপ্রতিভ হইয়া পড়িল এবং একটা দারুণ অভিমানের বোঝায় মনটাকে ভারী করিয়া তুলিল। কিন্তু তাহা হইলেও সে এই অতর্কিত আঘাতের বেদনা চাপিয়া রাখিয়া কর্ত্তব্য কার্য্য শেষ করিতে লাগিল। নির্ম্মলবাবুও আর কোন কথা না বলিয়া প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। হঠাৎ যেখানে সেখানে যাওয়া তাঁহার চিরদিনের অভ্যাস, কিন্তু কিছুদিন হইতে কোন একটা সামান্য কারণে সেটা একটু বেশী মাত্রায় বাড়িয়া উঠিয়াছে। শোভা এই ভাবান্তরের কারণ নির্ণয় করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু পারে নাই। নির্ম্মল বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেও কাজ চলা রকমের কৈফিয়ৎ দিতেন মাত্র। তিনি উচ্চশিক্ষিত স্বাধীনচেতা যুবক; কোন রকম সাধারণ কারণে বিচলিত হইবার লোক ছিলেন না। তাঁহার সঙ্কল্পও দৃঢ় ছিল, এবং তাহা দেশের কল্যাণে প্রয়োগ করিবার চেষ্টাও মাঝে মাঝে করিতেন। সহরের আবহাওয়ায় এতদিন তিনি বেশ সজীব ও আমোদপ্রিয় ছিলেন; সকল সময় বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে প্রায় নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদ, সভাসমিতি ইত্যাদি দ্বারা দিন কাটাইতেন। কিছুদিন হইতে তিনি যেন একটু চিন্তাশীল ও নির্জ্জনতার পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিলেন। এমন কি কত আদরের স্ত্রী শোভাময়ীর সঙ্গেও বিশেষ ঘনিষ্টতা কমিয়া আসিয়াছিল।

হঠাৎ যেখানে সেখানে যাওয়ার অভ্যাস থাকায় নির্ম্মলবাবুর বাড়ীর তত্ত্বাবধানের বন্দোবস্ত প্রায় হইয়াই থাকিত। আজ তাহারই উপর নির্ভর করিয়া তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন। তারপর ঐ শীর্ণ দেহ লোকগুলার সঙ্গে যখন তিনি রেলওয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন, তখন মনে হইল,—"ওদের খাবার কথা ত কিছু জিজ্ঞাসা করা হয়নি?" মনে

একটু কষ্ট বোধ হইল, কিন্তু আর সময় ছিল না তাই তাড়াতাড়ি করিয়া গাড়িতে উঠিয়া পড়িলেন। ভোর পাঁচটার সময় যখন গ্রামের নিকটবর্ত্তী ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন তখন রাত্রির অনিদ্রা ইত্যাদি কারণে শরীর বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, অথচ এখনও সাত আট মাইল গ্রাম্য রাস্তা অতিক্রম করিলে পর নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছিবেন। সেটা একটা ছোট ষ্টেশন সুতরাং যান-বাহনেরও সুবিধা নাই। এ অবস্থায় তিনি প্রথমতঃ একটু চিন্তিত হইলেন, পরে পদব্রজে যাওয়াই সিদ্ধান্ত করিলেন। নির্ম্মলবাবু যে হঠাৎ এ রকম ভাবে চলিয়া আসিবেন এটা সেই অভিযোগকারীদের কল্পনাতীত ছিল, নতুবা একটা বন্দোবস্ত করিয়া তাহারা আগেই রাখিত। এখন বাবুর অবস্থা দেখিয়া বোধ হয় কতকটা ভয়েও তাহারা নিতান্ত চিন্তিত হইয়া পড়িল। তারপর একজন বলিল,—"বাবু আপনি একটু অপেক্ষা করুন আমরা নিকটে কোন গ্রাম থেকে একটা পাল্কীর যোগাড় দেখি"। "না পাল্কীর দরকার নেই, হেঁটেই যেতে পারব" বলিয়া তিনি চলিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু নির্ম্মলবাবু লক্ষ্য করিলেন, লোকগুলা সমস্ত রাস্তাই কেবল তাঁহারই জন্য ব্যস্ত। নিজেরা যে কাল হইতে অভুক্ত অবস্থায় রহিয়াছে, এবং অধিকতর শ্রান্ত হইয়াছে সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপই নাই। তিনি ভাবিলেন,—"সংসারের গতিই এই রকম; কতকগুল লাঞ্ছিত, অবহেলায় পরিত্যক্ত জীব, অন্য কতকগুলির সেবার জন্য সকল সময় এমন ভাবে প্রস্তুত যে, তার কাছে আপনাদের দুঃখ বেদনা স্থান পায় না। একই সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্ট কি আমরা সকলেই নই? তবে কেন এমন হয়? কেন এরা আপনার হৃৎপিণ্ডের রক্ত-দিয়া আমাদের সেবা করে? কেন এরা আপনার অন্তরের দারুণ ব্যথা কেবল মাত্র দীর্ঘশ্বাসের সান্ত্বনায় চেপে রেখে আমাদের এই বিলাস-বিহ্বল, জাত্যাভিমান-গর্ব্বিত বুদ্ধি ও ঐশ্বর্য্য গরিমা আত্মহারা প্রাণের তুষ্টির জন্য আপনার কথা ভুলিয়া যায়? অথচ আমরা তাদের কি দিতে পারি?—একমাত্র তীব্র ভর্ৎসনা আর ইতর জীবের মত নিষ্ঠুর অবহেলা! ঐ যারা না খেয়ে পেটে কাপড় বেঁধে অসহনীয় গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত,

অগ্রাহ্য করে, যত্ন পূর্ব্বক আমাদের মুখের গ্রাস তৈরী করে—আর আমাদেরই মুখচেয়ে জীবনের শক্তি ক্ষয় করে, তারাই আমাদের কাছে ঘৃণ্য—অস্পৃশ্য জীব কেন? এমন কি অপরাধ করেছে তারা, যার জন্য এত অত্যাচার নীরবে সহ্য করবে? দেশেকি এমন শক্তিমান পুরুষ কেউ নেই—যিনি একবার এই অযথা লাঞ্ছনার কথা বুঝিয়ে এদের মধ্যে প্রতিশোধের আগুণ জ্বালিয়ে দিয়ে, অত্যাচারী সমাজকে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে পারে? বুঝলাম না এক সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টির মধ্যে এত বৈচিত্র্য—অসীম ব্যাবধান কেন? হায়! এইরূপ বিকট অনাচার যেখানে অবাধ গতিতে আপনার প্রভাব বিস্তার করতে পারে তাকে যে করুণাময় ভগবানের রাজ্য বলতে প্রাণে আঘাত লাগে!" এইরূপ নানা রকম দুশ্চিন্তা ও পথশ্রমে শ্রান্ত হইয়া নির্ম্মলবাবু বেলা দশটার সময় গ্রামে উপস্থিত হইলেন। তারপর গ্রামে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে বুক কাঁপিয়া উঠিল। একি! এটা গ্রাম না শ্মশান? চারিদিকে অপরিচ্ছন্ন, কর্দ্দমময় রাস্তাঘাট, ভাঙ্গা ঘরবাড়ী তাঁহার ভিতরে একটা আঁধার নৈরাশ্যের ভাব জাগাইয়া দিল। গ্রামের অধিকাংশ স্থান দেখিয়া মনে হয় যেন, অনেকদিন পূর্ব্বে এখানকার অধিবাসী এস্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। তাঁহাদের নিজের বাড়ীর অবস্থাও বিশেষ ভাল নয়; পূজার দালান ও তৎসংলগ্ন নাট মন্দির অসংস্কৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। অথচ প্রতিবৎসর তিনি মেরামতী খরচের বিলে দস্তুর মত সহি করিয়া আসিয়াছেন তাহা বেশ মনে আছে।

গ্রামের এই অবস্থা দেখিয়া বহুদিনের বাল্য স্মৃতি তাঁহার মনের মধ্যে একটা ক্ষুদ্র তুফান জাগাইয়া তুলিল। সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধে সমস্ত শরীর জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহার জমিদারীর প্রধান কর্ম্মচারী নায়েব বাবুর বাড়ী এই গ্রামেই। তিনি নির্ম্মল বাবুর পিতার সমসাময়িক লোক, কাজেই এ সম্পত্তিটার উপর তাঁহার একটা অভিভাবকীয় সত্ত ছিল। আজ যে অকস্মাৎ জমিদারীর বর্ত্তমান মালিক উপস্থিত হইয়াছেন, এ খবরটা পাইতে বেশী বিলম্ব হইল না।

নায়েব বাবু আসিয়াই মনিবকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য যথাবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু তাঁহার এইরূপ অসম্ভাবিত উপস্থিতির কারণ স্থির করিতে না পারিয়া তাঁহার মুখে একটা দুশ্চিন্তা পূর্ণ কৌতুহলের চিহ্ন বেশ ফুটিয়া উঠিল। যাহারা জমিদারের সঙ্গে ছিল তাঁহাদের প্রতি ক্রূরদৃষ্টি নিক্ষেপ ও তীব্র স্বরে কথা বার্ত্তা দ্বারাও তাঁহার ভিতরের ভাব কতক পরিমাণে প্রকাশ পাইতেছিল। এক্ষণে নায়েব বাবুর এই প্রকার আচরণে নিতান্ত বিরক্ত হইয়াই নির্ম্মলবাবু বলিলেন,—ওদের উপর গরম হবার দরকার নেই নায়েব বাবু! যা বল্‌তে হয় আমায় বলুন, কারণ আমিই সমস্ত অনর্থের একমাত্র কারণ। গ্রামের ও আমার নিজের বাড়ী-ঘরের এরকম অবস্থা কেন? পূজার দালানও ত দেখছি নিতান্ত মলিন দশাগ্রস্ত হয়েছে! পূজা কি আর হয় না? আমার মাহাল থেকে কি এক পয়সাও আদায় হয় না? তবে এমন সম্পত্তি রাখবার দরকার কি?" নায়েব বাবু বয়সে প্রাচীন এবং প্রাচীন কর্ম্মচারী; তাই একটু স্নেহ জড়িত সুরে অভিভাবকতা প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন,—"বাবা, যা আছে সব তোমারি আছে, আমরা ত কেবল রক্ষক! যতদিন এই সম্পত্তির তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত থাকব যথাসাধ্য রক্ষা করে যাব। আজ পর্যন্ত রক্ষা করে এসেছি ত। তবে যে দেশ-কাল পড়েছে, পূর্ব্বের চাল চলন আর বজায় রাখা দায়! অজন্মা ত আছেই তাহা ছাড়া প্রজারা সকল সময় তাদের নির্দ্দিষ্ট দেনাদিতে পারে না। গরীবদের মুখচেয়ে অনেক সময় সেলামিটা আষ্টা ছেড়ে দিতে হয়। কি করব গলায় ত আর ছুরী দিতে পারিনা?"

"বেশ ত আমি ত তা বলছি না; কিন্তু নির্দ্দিষ্ট টাকা পূর্ব্বের মত খরচ হয়, অথচ ঘরবাড়ীর দুর্দ্দশা কেন তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

"দুর্দ্দশা আর কি—তবে কিনা—ঘরে মানুষ না থাক্‌লে তার শ্রীও বেশ থাকে না। আর তোমার বাবা যখন আমার হাতে সব সমর্পণ করে দিয়ে গিয়েছেন—তখন তোমার যাতে দুপয়সা আয় হয় ও সবদিক্ বজায় থাকে সেটা আমায় দেখ্‌তেই হবে। কাজে কাজেই টাকাটা আমি সংযত হাতেই খরচ করি।"

ভিতর হইতে বামাকণ্ঠের উত্তর শুনা গেল,—"আমি সন্ন্যাসিনী—কোন রকম অভ্যর্থনা চাই না।"

"আপনি কি এই মন্দিরেই একা রাত কাটাতে ইচ্ছা করেন?"

"কোন স্থিরতা নাই—তাঁর ইচ্ছা হলে থাক্‌তেও পারি। যেতেও পারি; একার জন্য আমার কোন চিন্তা নেই—আমার সঙ্গী আছে।" বলিয়া আবার গান ধরিলেন,—

"প্রতিদিন আমি হে জীবন স্বামী দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।
তোমার অপার আকাশের তলে বিজনে বিরলে হে—
নম্র হৃদয়ে, নয়নের জলে, দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।"

নির্ম্মলবাবু তন্ময় হইয়া গেলেন—সেই চঞ্চল হৃদয়ের স্তরে স্তরে প্রাণের আবেদন আরও করুণ তানে বাজিয়া উঠিল। ইতি মধ্যে একজন দাসী একটী প্রদীপ হাতে করিয়া সেখানে উপস্থিত হইল; প্রতিদিন পূজার দালানে প্রদীপ দেওয়া তাহার একটা নিত্য কর্ম্ম। কিন্তু আজ সেখানে আসিয়া হঠাৎ বাবুর দিকে দৃষ্টি পড়ায় সসম্ভ্রমে সরিয়া দাঁড়াইল। নির্ম্মল বাবু সেই প্রদীপের স্পষ্টালোকে দেখিলেন,—কি দেখিলেন?—দেখিলেন, আলুলায়িত-কুন্তলা—রক্তাম্বরা—গোধূলি ধূসরা সন্ধ্যাদেবী! দেখিলেন, নীরব-গভীর স্তব্ধতাময় অনন্ত বক্ষে চির সৌন্দর্য্যময়ী প্রকৃতি-প্রতিমা! চক্ষুর সহিত মস্তক অলক্ষ্যে নত হইয়া পড়িল। মহা ঝটিকার পূর্ব্বে শান্ত প্রকৃতির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন—আর বাক্য সরিল না! কিন্তু প্রাণ আকুলি বিকুলি করিয়া উঠিল। এমন সময় শুধু একটা ধ্বনি তাঁহার কাণে আসিল,—"আমি আজ চল্‌লাম, যদি তাঁর ইচ্ছা হয় সময়ান্তরে দেখা হতেও পারে।" নির্ম্মলবাবুর আলোড়িত হৃদয়ের সকল মাধুরী—সকল নিজস্ব হরণ করিয়া সন্ধ্যাদেবী সেই মৌন সাঁঝের ম্লান মাধুরীর সহিত কোথায় মিলাইয়া গেলেন! তাহার ফলে পল্লীসংস্কার, উৎপীড়িতের—ব্যথিতের কাতর প্রার্থনা পড়িয়া রহিল; পর দিন প্রাতঃকালে তিনি সহরে ফিরিলেন। কিন্তু শান্তি পাইলেন না, দিবারাত্র ভাবিতে লাগিলেন,—"কে ইনি? এই কি সেই—?" (ক্রমশঃ)

ভারতীয় আচার্য্যগণ ও সমন্বয়।

(শ্রীরাধিকামোহন অধিকারী)

"* - - every prophet is the creation of his times, created by the past of his race, he, himself, is the creator of the future."

—*Swami Vivekananda.*

প্রাচীন বৈদিক যুগ হইতে বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে যে সকল অমিত প্রভাব ধর্ম্মাচার্য্য যুগে যুগে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া দুষ্কৃতি দমন ও ধর্ম্মসংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা, প্রত্যেকেই সেই "একোমেবাদ্বিতীয়ম্" ভগবানেরই অবতার হইলেও ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে তাঁহাদের অনুসৃত মত, পথ, ভাব ও কর্ম্ম এক নহে। অবশ্য ইহা অবিশংবাদিরূপে সত্য যে, প্রকৃত ধার্ম্মিকের দৃষ্টিতে এই সকল অবতার, মহাপুরুষ ও পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মচার্য্যের অনুসৃত আপাতবিরোধী মত, পথ, ভাব ও কর্ম্ম সকলে ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিক আদর্শ ও প্রত্যক্ষানুভূতির দিক দিয়া এক বর্ণনাতীত সামঞ্জস্যে পূর্ণ। ইতিহাসবেত্তার দৃষ্টিতে ভগবান্ শ্রীমৎ-শঙ্করাচার্য্য জ্ঞানের এবং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তির অবতার হইলেও যদি এতদুভয়কে একস্থানে অধিষ্ঠিত করা যাইত, তাহা হইলে ইঁহাদের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন মতবিরোধ পরিদৃষ্ট হইত না ;—জ্ঞান-ভক্তিকে অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধাবদ্ধ ভাবিয়া শঙ্করগৌরাঙ্গ উভয়ে উভয়কে অভেদ মনে করিয়া প্রগাঢ় প্রেম-ভরে আলিঙ্গন করিতেন! ধর্ম্মাচার্য্যগণের বিভিন্ন মত-পথের বিরোধ-বহ্নি দ্বারা এই যে মানব-সমাজ দগ্ধীভূত হইতেছে, ইহার একমাত্র কারণ, অধিকাংশ লোকই স্ব স্ব উপাস্য ধর্ম্মাচার্য্যকে তাঁহাদের প্রিয় এক একটী মত বিশেষের প্রচারকরূপে নিতান্ত সংকীর্ণ দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন।

পৃথিবীর সকল দেশের সকল যুগের সকল ধর্ম্মাচার্য্যই তুল্যরূপে

মহান্। তাঁহাদের প্রত্যেকের এই বিশ্বজনীন মহত্ত্বকে পরধর্ম্মদ্বেষমূলক "ইষ্টনিষ্ঠা"র 'অজুহাতে' এক একটী ক্ষুদ্রগণ্ডি প্রস্তুত পূর্ব্বক তন্মধ্যে সযত্নে আবদ্ধ করিয়া ঐতিহাসিকের নিকট অতিশয় খর্ব্ব এবং উহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ পরিশেষে উহাকে বিকৃত ও ভয়ানক গোঁড়ামী পরিপূর্ণ করিয়া তোলার জন্য তাঁহাদের প্রত্যেকের অযোগ্য শিষ্য-প্রশিষ্যেরাই সম্পূর্ণ দায়ী।

প্রত্যেক অবতারই তৎসময়োপযোগী যুগধর্ম্মের একনিষ্ঠ প্রচারক, এবং এই হিসাবে তাঁহারা প্রত্যেকেই স্ব স্ব ভাব-সম্পদে মহান্। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কোন ভাব অংশতঃ বা অপূর্ণভাবে অনুষ্ঠান ও প্রচার করেন নাই, প্রত্যেকেই স্ব স্ব ভাব পূর্ণভাবেই অনুষ্ঠান ও প্রচার করিয়া গিয়াছেন ; সুতরাং ইঁহারা প্রত্যেকেই স্ব স্ব কর্ম্মক্ষেত্রে পূর্ণ। ইঁহাদের একজনের স্থান অপরের দ্বারা পূর্ণ হইতে পারে না। শ্রীরামচন্দ্রের স্থান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা, অথবা শ্রীকৃষ্ণের স্থানে শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা এবং শঙ্করের স্থান গৌরাঙ্গের দ্বারা অথবা গৌরাঙ্গের স্থান শঙ্করের দ্বারা পূর্ণ হইতে পারে না। প্রত্যেক অবতারের প্রচারিত প্রত্যেক ভাবই ধর্ম্মজগতের এক একটী অমূল্য সম্পদ্ ; জগৎ যদি ইহাদের কোন একটীকে হারায়, তাহা হইলে তাহাকে একটী অমূল্য সম্পদ্ হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে।

অবতারগণ হিন্দুর সনাতন ধর্ম্মরূপ বিরাট দেহের এক একটী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। হিন্দুধর্ম্ম বলিতে হিন্দুর সকল অবতারকেই এক অখণ্ড সমষ্টিভাবে (Collectively) বুঝাইয়া থাকে ; কোন অবতার বিশেষকে স্বতন্ত্রভাবে লক্ষ্য অথবা কাহারও প্রামাণ্য অস্বীকার করে না। পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগো ধর্ম্মমহাসভায় বলিয়াছেন,—

"All kinds of thought from the high spiritual flight of the Vedanta philosophy, of which the latest discoveries of science seem like echoes, down to the lowest ideas of idolatry, with its multiferious mythology, the agnosticism of the Buddhists and atheism of the Jains, each and all have a place in the Hindu's religion."

যিনি বেদ বেদান্ত দর্শন মতের অনুসরণ করেন তিনিও হিন্দু,—যিনি পুরাতন সংহিতা তন্ত্র মানেন তিনিও হিন্দু; যিনি ভগবানকে নিগুর্ণ ব্রহ্মভাবে বা নিরাকার রূপে উপাসনা করেন তিনিও হিন্দু, যিনি সগুণ ঈশ্বরের উপসক বা মূর্ত্তিপূজক তিনিও হিন্দু, যিনি বুদ্ধের অজ্ঞেয় মতাবলম্বী তিনিও হিন্দু, যিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী তিনিও হিন্দু; যিনি শঙ্করের অদ্বৈতমতাবলম্বী তিনিও হিন্দু, যিনি রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে অথবা মধ্ব-গৌরাঙ্গের দ্বৈতমতে বিশ্বাসী তিনিও হিন্দু।—একমাত্র হিন্দুধর্ম্ম ভিন্ন পৃথিবীর সকল ধর্ম্মই এক একজন ভগবৎ প্রেরিত মহাপুরুষ বা অবতারের কোন একটী মত বাদ ভিত্তির উপর স্থাপিত; কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তি কোন একজন মহাপুরুষের বা অবতারের কোন একটি মতের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, পরন্তু উহার ভিত্তি শত শত ভগবৎ পরায়ণ আর্য্যঋষিগণের গভীর সমাধিলব্ধ বিভিন্ন প্রকারের উপলব্ধ সত্য ও বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন অবতারগণের বিভিন্ন প্রকারে অনুষ্ঠিত ও আচরিত মহান্ সত্যের উপর স্থাপিত। এমন কি, হিন্দুর প্রভাবশালী অবতার শ্রীকৃষ্ণকে পর্য্যন্ত হিন্দুধর্ম্ম হইতে কোন অনিবার্য্য কারণে বাদ দিলেও হিন্দুধর্ম্মের বিরাট দেহ অঙ্গহীন হইবে মাত্র; কিন্তু ইহাতে হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তি বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইবে না। অন্যান্য ধর্ম্ম ভগবানকে লাভ করিবার উপায় রূপে এক একটী মাত্র মত পথ নির্দ্দেশ করিয়াছে। আর হিন্দুধর্ম্ম ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় স্বরূপে শত শত প্রকারের মত-পথ-নাম ও রূপ আবিষ্কার করিয়াছে। হিন্দু ধর্ম্ম বলিতে হিন্দুধর্ম্মোক্ত শত সহস্র প্রকারের মত-পথ নাম ও রূপ সকলকেই সমষ্টিভাবে বুঝাইয়া থাকে। হিন্দুর একেশ্বরবাদ বহুকে স্ব স্ব পৃথকভাবে তথা বহুকে সমষ্টি-ভাবে লইয়া,—হিন্দুর একেশ্বরবাদ সর্ব্বেশ্বরবাদ জ্ঞাপক। পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মের সহিত তুলনায় হিন্দুধর্ম্মের ইহাই সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব।

"আত্মনোমোক্ষায় জগদ্ধিতায় চ" সর্ব্বস্বত্যাগী ব্রহ্মজ্ঞানী বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, ভৃগু, কশ্যপ, গৌতম, বাল্মীকি ও ব্যাস প্রভৃতি ঋষিগণ, ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণা বিদুষী গার্গী, বিশ্ববরা ও গৌতমা প্রভৃতি ঋষিপত্নীগণ,

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, গৌতমবুদ্ধ, কুমারিলভট্ট ও শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি অবতারগণ এবং শত শত ব্রহ্মবিদ্‌গৃহী, ত্যাগী, সন্ন্যাসী, শ্রমণ ও বৈষ্ণব মহাত্মাগণ কর্ত্তৃক প্রচারিত অসংখ্য মতবাদ হিন্দুধর্ম্মে প্রচলিত আছে। এই সকল মতের প্রত্যেকটী লইয়া পৃথক্‌ভাবে এক একটী সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছে; এইরূপ ভাবে সৃষ্ট অসংখ্যসম্প্রদায়ের আবার অসংখ্য শাখা-প্রশাখা সম্প্রদায় আছে। সকল সম্প্রদায়ই সনাতন হিন্দুধর্ম্মরূপ বিরাট সৌধের এক একটী ক্ষুদ্র-বৃহৎ স্তম্ভ। যেমন কোনও সুবৃহৎ অট্টালিকার একটী স্তম্ভ ভূমিসাৎ হইলে সেই স্তম্ভটীর গুরুত্বের অনুপাতে সমগ্র সৌধটীকে ক্ষতিগ্রস্থ করে তেমনি হিন্দুধর্ম্মের কোনও সম্প্রদায় বিনষ্ট হইলে সেই সম্প্রদায়ের গুরুত্বের অনুপাতে হিন্দুধর্ম্মকেও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। পক্ষান্তরে সৌধটীর সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতার জন্য যেরূপ উহার ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেকটী স্তম্ভেরই স্বতন্ত্র অস্তিত্বের উপযোগিতা আছে, তদ্রূপ হিন্দুধর্ম্মের উপর ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়েরই একটা অপ্রতিহত প্রভাব বর্ত্তমান আছে। প্রধানতঃ এই কারণেই প্রত্যেক সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতা বিধানের জন্য একান্ত আবশ্যক।

এই সহস্র ভেদ-বহুল বিবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ জগতে—এই পারাপারহীন মনুষ্য-সমুদ্রের মধ্যে—যেখানে দুইটী সমসাময়িক মানুষকেও সকল বিষয়ে এক ভাবাপন্ন খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর, সেখানে কোন একটী ধর্ম্মমত বিশেষকে পৃথিবীর সকল দেশের সকলকালের সকল মানবের পক্ষে একমাত্র উপযোগী বলিয়া প্রচার করিবার চেষ্টা, একটী মাত্র জামা বালক, যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ সকলের অঙ্গে পরিধান করাইবার বিফলপ্রয়াসের অনুরূপ! বেদ, উপনিষদ্, দর্শন, স্মৃতি, সংহিতা তন্ত্র ও পুরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র যাঁহাকে "অচিন্ত্যোপাধিবিনির্ম্মুক্তমনাদ্যন্তং শুদ্ধং শান্তং নির্গুণং নিরবয়বং নিত্যানন্দং অখণ্ডৈকরসং অদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম" * বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তৎপ্রাপ্তি সাধনে কোন একটী মত বিশেষ দ্বারা সীমাবদ্ধ করিবার প্রয়াস, এই জন্ম-জরা-মৃত্যুপাশাবদ্ধ ক্ষুদ্রশক্তি মানবের পক্ষে একান্ত মাত্র। পরন্তু অনন্ত শক্তির উৎস ভগবানের প্রকাশমূর্ত্তি,

* নিরালম্বোপনিষৎ

নামরূপভাবও যেমন অনন্ত, তাঁহাকে লাভ বা প্রত্যক্ষানুভব করিবার উপায়ও এই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কালের বিভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট মানবের পক্ষে তেমনি অনন্ত প্রকার হওয়াই সম্ভবপর এবং স্বাভাবিক। এই পৃথিবীতে কেহ বা সত্ত্ব, কেহ বা রজঃ এবং কেহ বা তমোভাবাপন্ন,—কেহ বা ঘোর সংসারাসক্ত এবং কেহ বা সংসার-বিরাগী,—কেহ বা জ্ঞানের উচ্চতম শিখরে অধিষ্ঠিত,—কেহ বা জ্ঞান, কেহ বা কর্ম্ম এবং কেহ বা ভক্তিপ্রিয়; এই সকল বিভিন্ন শ্রেণীর প্রকৃতবিশিষ্ট মানবকে এক ভাবাপন্ন করা যেরূপ অসম্ভব, কোন একটী ধর্ম্মমত বিশেষকে সমগ্র মানবজাতির একমাত্র উপযোগী বলিয়া প্রচার করা তদ্রূপ অযৌক্তিক।

দেশকাল পাত্রভেদে বিভিন্ন সম্প্রদায় যেমন বিভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট মানবসমাজের কল্যাণের আকর, সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িকতা তেমন মানব সমাজের অকল্যাণের হেতু। প্রত্যেক সম্প্রদায়ই যখন তদীয় ধর্ম্মমত, পথ ও ভাব প্রভৃতিকে সাক্ষাৎভাবে অনুভব করারূপ মহদুদ্দেশ্য প্রচার করে, তখন উহা মানবের যথার্থই কল্যাণসাধন করিয়া থাকে। কিন্তু যখন কোন সম্প্রদায় আপনার মত, কথা ও ভাব প্রভৃতিকে একমাত্র সত্য বা অন্যের তুলনায় শ্রেষ্ঠ, এবং অপরাপর সম্প্রদায়ের মত, পথ ও ভাবসমূহকে, নিজ ভাবের অনুপাতে কোনটীকে মিথ্যা কোনটীকে ভ্রান্তিপূর্ণ এবং কোনটীকে বা নিকৃষ্ট বলিয়া প্রচার করতঃ সকলকে তদীয় সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করিবার বিফল প্রয়াস পায়, তখনই উহা মানব সমাজের পক্ষে মহা অনর্থের কারণ হইয়া পড়ে। অবশ্য প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ধর্ম্মই তৎসম্প্রদায় ভুক্ত ব্যক্তিগণের স্বধর্ম্ম, এবং এক সম্প্রদায়ের মত-পথ যখন অপর সম্প্রদায় হইতে অল্পাধিক পরিমাণে বা সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন, তখন এক সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম অপর সম্প্রদায়ের নিকট পরধর্ম্ম সন্দেহ নাই। কিন্তু তুমি এক সম্প্রদায় ভুক্ত-বলিয়া তোমার নিকট অপর সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম পরধর্ম্ম হইলেও সেই সম্প্রদায় ভুক্ত ব্যক্তির নিকট তাহার সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম কখনও পরধর্ম্ম নহে। তোমার পক্ষে তোমার সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম যেমন তোমার স্বধর্ম্ম এবং

অপর সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম পরধর্ম্ম, অপর সম্প্রদায়ভুক্ত কোন ব্যক্তির পক্ষেও তাহার সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম তেমন তাহার স্বধর্ম্ম এবং তোমার বা অপর সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম পরধর্ম্ম। মনে কর, তুমি তোমার সম্প্রদায় মতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য বা মধুর ভাবে আরাধনা করিতে আরম্ভ করিলে, অপর কোন ব্যক্তি হয়ত তাহার সম্প্রদায় মতে ভগবতী কালীকে মাতৃভাবে উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হইল, এ স্থলে তোমার ও তাঁহার ধর্ম্ম ও তদনুষ্ঠেয় কার্য্য প্রণালী পরস্পর বিভিন্ন, একের স্বধর্ম্ম অপরের নিকট পরধর্ম্ম; অতএব তোমাদের উভয়ের মধ্যে একের বিরুদ্ধে অন্যের কোন কিছু বলিবার অধিকার নাই, কারণ এইরূপ বলা উভয়ের পক্ষেই অনধিকার চর্চ্চা। তবে মানুষকে যে এই অনধিকার চর্চ্চায় সর্ব্বদা রত থাকিতে দেখা যায়, ইহার কারণ অধিকাংশ লোকই "যেন-তেন-প্রকারেণ" আপনার ভাবে দুনিয়াকে ভাবুক করিয়া তুলিতে চায়, সে হয়ত ধর্ম্মের "ধ"-এর ধারেও পদবিক্ষেপ করে নাই কিন্তু তথাপি সে ইচ্ছাকরে যে এসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকার সকল লোক তাহার ভাবে ভাবুক হইয়া পড়ুক, তাহার ধর্ম্মমতে দীক্ষিত হউক, তাহার অঙ্গুলি হেলনে পরিচালিত হউক! প্রকৃত ধর্ম্ম লাভ করিবার আশায় কায়মনোবাক্যে অতি অল্প লোকই নাম, যশঃ, পাণ্ডিত্য ও স্বার্থসিদ্ধি প্রভৃতির জন্য ধর্ম্ম ধ্বজী 'ভাক্ত' সাজিয়া বসে! প্রকৃত ধার্ম্মিক লোকের সংখ্যা সকল দেশেই অত্যল্প এবং তাঁহাদের মধ্যে কোন মতবিরোধ বা সাম্প্রদায়িকতার ভাব দেখা যায় না। সকল সম্প্রদায়ের নিম্নস্তরের লোকেরা তাহাদের সম্প্রদায়গুলিকে বিরোধ-বিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িকতার প্রেতাবাসে পরিণত করিয়াছে! ধর্ম্মের জন্য ধর্ম্ম-যাজন না করিয়া উহাকে একটা ক্ষুদ্র উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় বলিয়া যাহারা গ্রহণ করিয়াছে, আপন আপন অধিকার অনধিকার বিচার করিবার অবসর তাহাদের থাকিতে পারে না। প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই মহত্ত্ব প্রতিপাদনের প্রয়াস তৎসম্প্রদায় ভুক্ত ব্যক্তিগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু যদি এই মহত্ত্বরূপ স্তম্ভ অপর কোন সম্প্রদায়ের ভস্মরাশির উপর প্রতিষ্ঠিত করা হয়,

তাহা হইলে উহা তাহার নীচত্ব ও ক্ষুদ্রত্বই ঘোষণা করে! মানুষ এই স্বতঃসিদ্ধ বিষয়টীও তলাইয়া দেখে না, সে অপরকে ছোট না করিয়া —আপরের দোষোদ্ঘাটন না করিয়া—অপরকে গালিবর্ষণ না করিয়া আপনাকে বড় করিবার উপায় খুঁজিয়া পায় না; সে মনে করে যে, সে যদি অন্যের ক্ষুদ্রত্বই প্রমাণ করিতে না পারিল, তাহা হইলে সে কিসের শ্রেষ্ঠ? দুঃখের বিষয় যে জগতের অধিকাংশ ধর্ম্ম নিম্নস্তরের কতকগুলি ভণ্ডের হাতে পড়িয়া নানা প্রকারে লাঞ্ছিত হইতেছে এবং যে ধর্ম্ম মানবের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ তাহার পুণ্য নামেও সমাজ হিংসাবিদ্বেষানলে পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইতেছে! পরধর্ম্মবিদ্বেষ, ঈর্ষা, প্রভুত্বলাভ এবং স্বার্থ যদি কোন ধর্ম্মমতের অঙ্গীয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে ধর্ম্ম—সে ধর্ম্মের ঈশ্বরকে বিশ্বাস না করিলেও মানব সমাজের কল্যাণ ভিন্ন অকল্যাণ হইবে না।'

(ক্রমশঃ)

প্রার্থনা।

(কুমারী ফুল্লরাণী সিংহ)

তোমার মন্দির মাঝে হে মোর রাজন্,
নিতুই সাজাই যেন পূজার আসন্।
হে দেবতা, জীবনের শত লক্ষ কাজে,
বরিষ করুণা তব সবাকার মাঝে॥

?তের আদর্শ সমস্যা।

(শ্রীখগেন্দ্রনাথ শিকদার, এম, এ)

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সমস্ত ভারত ব্যাপিয়া যেন একটা জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। আজ ভারতের গণবিগ্রহের মধ্যেও চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হইতেছে; এই বিরাট ভাবোচ্ছ্বাস যুগযুগান্তের ঘাতপ্রতিঘাতের ফলস্বরূপ; ইহা শুধু ক্ষণপ্রভার চঞ্চলহাসির ন্যায় ক্ষণস্থায়ী বা নিরর্থক নয়। কিন্তু ভারতের দুর্দ্দশা আজ নিরীক্ষণ করিলে যুগপৎ ঘৃণা, লজ্জা, ক্রোধে হৃদয় ভরিয়া উঠে। ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আবালবৃদ্ধবণিতার ব্যর্থকরুণ আর্ত্তনাদ দেশমাতৃকার ক্ষুব্ধবক্ষে লুটাইয়া পড়িতেছে। সমস্ত জগত নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে এ দুর্দ্দশা নিরীক্ষণ করিতেছে। অস্থির ভাগীরথীবক্ষে বিপন্ন তীর্থযাত্রীর মত আমরাও আজ লক্ষ্যহীন দিশাহারা হইয়া কোথায় ছুটিয়াছি তা নিজেরাই জানি না। পেটে অন্ন নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই, রোগশোকদীর্ণ আমরা এতদিন কি এক মহানিদ্রায় পড়িয়া বড় অসময়ে সাড়া দিয়াছি; কে আমাদের হাত ধরিয়া এ আঁধার যবনিকা ভেদ করিয়া আলোকের দেশে লইয়া যাইবে?

যে দেশের কবি একদিন ললিতছন্দে ভক্তিভরে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা ভারতভূমির বন্দনাগান করিয়াছিলেন, যে দেশের রত্নসম্ভার সুদূর চীন হইতে আসিরিয়া ব্যাবীলন, ফিনিসিয়া গ্রীশ. রোম ও মিশরের উপকূলবাসী বনিকগণের ব্যবসায়ের সামগ্রী ছিল, যে দেশের—

"Genial climate and a fertile soil coupled with the industry and frugality of the Indian people, rendered them virtually independent of the foreign nations in respect of the necessaries of life." (vide Indian Shipping).

সেই ভারতের সেবকগণের বংশধরগণ আজ এক মুষ্টি অন্নের কাঙ্গাল হইয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! যে দিকে দৃষ্টিপাত কর দেখিবে,

দারিদ্র্য বিকট বদনব্যাদান করিয়া উধাও হইয়া ছুটিয়া আসিতেছে, নৈরাশ্যের কালছায়া পড়িয়া সমগ্র ভারতের মুখশ্রী মলিন হইয়া গিয়াছে। কত মর্ম্মভেদী কাতর ক্রন্দন তথাকথিত পাশ্চাত্যশিক্ষাভিমানিগণের পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িতেছে; প্রতিদানে শুধু তাহাদের উপেক্ষার বিকটহাসি ভগ্নপ্রাণে ব্যর্থক্রোধ জাগাইয়া তুলিতেছে।

বিশ্বনিয়ন্তা ভগবান্ একদিন শ্রীমুখে বলিয়াছিলেন—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মনং সৃজামাহম্॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতান্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

"হে ভারত যখন যখনই ধর্ম্মের হানি এবং অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তখনই আমি আপনাকে সৃষ্টি করি। সাধুদিগের রক্ষার জন্য, দুষ্কর্ম্মকারীদিগের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম্মস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।"

তাই মঙ্গলনিধান ভগবান্ যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া ঘনতমসাবৃত ধরণী মাঝে প্রতিভ্রান্তির সম্মুখে তাঁহার আদর্শের ধ্রুবজ্যোতিঃ তুলিয়া ধরিয়াছেন। আজিও ভগবানের সেই চিরপুরাতন বাণী নূতনছন্দে মধুর মুরজমন্দ্রে ধ্বনিয়া উঠিতেছে; ভাববিহ্বল কবি আজ গাহিতেছেন—

"গৈরিক রঞ্জিত র'বে পতাকা তোমার
হেরিবে যখন, তব পড়িবে স্মরণে,
এ রাজ্য যোগীর নয়, যোগী সন্ন্যাসীর"।
"শুধু বাহুবলে
হিন্দুর হিন্দুত্ব রক্ষা না হ'বে এখন;
চাহি প্রেম, চাহি ত্যাগ। উগ্রক্ষাত্রতেজ
না হয় মিলিত যদি সত্ত্বগুণসনে
যুদ্ধ, রক্তপাত মাত্র হ'বে পরিণাম।"

তাই প্রাচীন বৈদিক যুগ হইতে আজি পর্য্যন্ত প্রতি ঘরে ঘরে ধ্বনিত হইতেছে,—

"এ রাজ্য ভোগীর নয় যোগী সন্ন্যাসীর"।

এই ত্যাগের মহীয়সীশক্তির প্রভাবে—ভারতে আজিও ব্যভিচার আসিয়া তাহার ত্যাগোজ্জ্বল মহিমময় আদর্শকে মলিন করিয়া ফেলিতে পারে নাই।

কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে কতকগুলি কর্ম্মের বন্ধন ছিন্ন করিয়া হাত পা গুটাইয়া নিষ্ক্রিয় হইলেই ত্যাগী হওয়া যায় না। বাস্তবিক যাহার ভিতরের বাসনাস্রোত গুপ্তভাবে অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় সদা নিয়ত প্রবাহিত হইয়াছে তাহাকে ঐ উপাধিভূষিত করিলে শব্দের অপব্যবহার হইবে মাত্র। যে প্রকৃত ত্যাগী সেই প্রকৃত কর্ম্মী। তাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন—

নহি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥

"অর্থাৎ—দেহাভিমানী জীবগণ সম্পূর্ণরূপে সকলকর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারে না। কিন্তু যিনি (কর্ম্ম সফল করিয়াও) কর্ম্মফলত্যাগী, তিনিই ত্যাগী নামে অভিহিত হন"। ইহাই প্রকৃত ত্যাগ এবং এই সনাতন আদর্শই একদিন আর্য্যনিষেবিত ভারত ভূমিকে নিরন্তর উদ্বোধিত রাখিয়া সমস্ত মেদিনীর সম্মুখে তাহার গরিমা যেন শত সহস্র প্রভাকরের ন্যায় সমুদ্ভাসিত রাখিয়াছিল। এখনও ভারতের নবজাগরণের মধ্যে সেই ভাবই লক্ষিত হইতেছে। বর্ত্তমান কর্ম্ম-প্রবাহের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন নামে সেই ত্যাগের আদর্শ ফুটিয়া উঠিতেছে।

জাহ্নবী-যমুনা-শোভিত ভারতবর্ষরূপী সুরম্য তপোবনের সাধকবৃন্দ প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত জড়বিজ্ঞানের বিকট হুঙ্কার এবং অতৃপ্ত ভোগবাসনার পৈশাচিক তাণ্ডব নৃত্যের মাঝে প্রাকৃতিক জগতের রৌদ্রশাসনকে পদদলিত করিয়া জড় শাসনের উপর সেই অতীন্দ্রিয় ত্যাগোজ্জ্বল আদর্শের বিজয় গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ করিতে পারিয়াছেন। মনুষ্যত্বের চরমশান্তিনিলয় যেখানে, যে মহারাজ্যের পূত প্রান্তদেশে অবস্থিত রহিয়া জীবনের সার্থকতা সাধনে সমর্থ হওয়া যায়, সেই ত্যাগধর্ম্মই ভারতের প্রতি অণু-পর

মাণুতে মিশিয়া রহিয়াছে। তাই, উহার লীলাবৈচিত্র্য যুগে যুগে বিভিন্ন কর্ম্মানুষ্ঠানের ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবির কল্পনা-বীণায় সেই সম্মোহনধ্বনি নৃত্য করিয়া বেড়াইয়াছে; সাহিত্যিকের সাহিত্যকাননে কত ত্যাগোজ্জ্বল ছবি ফুটিয়া উঠিতেছে। সাগরাভিসারিণী পতিত পাবনী জাহ্নবীর পূতধারার ন্যায় এই ত্যাগের অমৃতধারা চিরতপ্ত মানব প্রাণ শান্তিরসে নির্মজ্জিত করিতেছে। এ ভারত তপোবনের প্রতি বৃক্ষলতা মর্ম্মর রবে যেন জগতের নিকট ত্যাগেরই অমরগাথা গাহিয়া বেড়াইতেছে। কলকণ্ঠ বিহগনিচয়ের সুমধুর কাকলিধ্বনি অসীম নীলাকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া দূরদূরান্তে সে বার্ত্তা লইয়া ফিরিতেছে। ত্যাগিসন্ন্যাসীর আশ্রয়-স্থলে চিরতুষার মণ্ডিত অভ্রভেদী হিমাদ্রিশিখর প্রকৃতির ভৈরব ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করিয়া যুগযুগান্তর ধরিয়া ভারত সন্তানকে ত্যাগধর্ম্ম শিখাইবার জন্যই যেন সমুন্নত শীর্ষে দাঁড়াইয়া আছে। এই সেই ভারতবর্ষ যেখানে আর্য্যঋষিগণের তপস্যাপূত হিন্দুসভ্যতা আজিও অটল হিমাদ্রির ন্যায় চির প্রতিষ্ঠিত। একদিন তাপস কুলের শান্তিময় তপোবনে যে ব্রতউদ্‌যাপিত হইয়াছিল, যাহার প্রভাবে রুদ্রক্ষাত্রধর্ম্ম সংযত ছিল তাহা আজিও ভারতের রীতিনীতি ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের ভিতর ওতোপ্রোত ভাবে রহিয়াছে। তাপসকুলরবি মহামনা বাল্মিকী যে সঙ্গীতবন্যায় ভারত প্লাবিত করিয়াছিলেন, শুক, সনন্দন যে অনাদি সঙ্গীতে জগতকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, ধর্ম্মপ্রাণ যুধিষ্ঠির ভীষ্ম প্রমুখ মহামতি বৃন্দের ভিতর দিয়া যে ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা আজিও ভারতের দুর্দ্দিনে, দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত ভারতবাসীর প্রতি ঘরে ঘরে নৈরাশ্যের ঘনীভূত অন্ধকার নিরাশ করিয়া বৈদ্যুতিক প্রভায় শোভা পাইতেছে। পর্য্যাপ্ত ভোগায়োজনের মধ্যে দাঁড়াইয়া ভারতের কৃতিসন্তানগণ কম্বুনাদে দিগদিগন্তর মুখরিত করিয়া বলিতেছে—"ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ"। এই ভারতক্ষেত্রেই একদিন পুণ্যস্মৃতি ভগবান গৌতমবুদ্ধ জাগতিক বিষয় ভোগে অসারতা উপলব্ধি করিয়া অনন্তভোগোপকরণ দলিত করিয়া সত্যের অনুসন্ধানে প্রাণপ্রিয় পত্নী ও নবজাত শিশুপুত্র ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহার সার্ব্বজনীন উদারবার্ত্তা আজিও কোটীকণ্ঠে সুদূর

চীন হইতে ল্যাপলাণ্ডের উপকণ্ঠ পর্য্যন্ত নিনাদিত হইতেছে। তেমনি ভাবে আচার্য্যশঙ্কর ব্যভিচার দুষ্ট তান্ত্রিক পূজানুষ্ঠান প্লাবিত ভারতবর্ষে বেদান্তের সার ত্যাগধর্ম্ম প্রচার করিয়া হিন্দুকে উদ্বুদ্ধ করিয়া যে অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন তাহা আজিও অমরঅক্ষরে ভারতেতিহাসে লিখিত রহিয়াছে। খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতকানন মুখরিত করিয়া জয়দেব চণ্ডিদাস উদাত্তকণ্ঠে যে তান ধরিয়াছিলেন তাহাই ত্যাগবিগ্রহ গৌরাঙ্গরূপে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল; তাহার সর্ব্বতো-ভিসারিণী প্রেমবন্যায় ভারতবাসী নবীন উৎসাহে মুখ তুলিয়া চাহিয়াছিল। শুধু তাই নয় মাধবাচার্য্য হইতে মহামতি নানক পর্য্যন্ত সকলেই সেই শাশ্বত ত্যাগধর্ম্মের উদার আদর্শ জগতের সম্মুখে ধরিয়াছেন। এমনি করিয়া জাতীয় জীবনের ভিত্তি সেই ত্যাগধর্ম্ম যুগে যুগে প্রতি মহা-পুরুষের কর্ম্ম ও সাধনার ভিতর ফুটিয়া উঠিতেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সাধুকুলতিলক মহাপ্রাণ যোগী শ্রীরামকৃষ্ণদেবও ভাগীরথীর পুণ্যপ্রবাহনিধৌত দক্ষিণেশ্বরে মাতৃনাম গানে বিভোর হইয়া ভোগমুগ্ধ মানবের নিকট ত্যাগের যে সমুজ্জ্বল ছবি ধরিয়াছেন তাহাতে শুধু ভারত কেন জগতে সর্ব্বত্র একটা বিরাট সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সে বেশীদিনের কথা নয়, যেদিন সন্ন্যাসিকেশরী যুগাচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যসভ্যতার কেন্দ্রভূমি আমেরিকার ধর্ম্মমহাসভায় হিন্দুধর্ম্মের সার্ব্বজনিনতা ও ত্যাগের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া বিজয়মাল্য লইয়া দেশে ফিরিয়াছিলেন তাই এই অমর বার্ত্তা আজিও আমেরিকার উপকূল পর্য্যন্ত ঘোষিত হইতেছে। নিজের ঘরের কথা এতদিন সকলেই ভুলিয়া গিয়াছিল। স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে তাই সত্যসূর্য্যের স্নিগ্ধালোকে দাঁড়াইয়া কৃতিসন্তানগণ উদারস্বরে ত্যাগের অমরগীতি গাহিয়া বেড়াইতেছে। আমাদের পূর্ব্ব পিতামহগণ সংসার ভুলিয়া জনহীন শান্ত তপোবনের স্নিগ্ধশ্যামল অঞ্চলে বসিয়া তন্ময় হৃদয়ে যে গান গাহিয়া গিয়াছেন কত যুগযুগান্তর কাটিয়া গিয়াছে কতবিপ্লব, কত পরিবর্ত্তনে ভারত ধ্বস্ত বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে, তবুও অদ্যাবধি তাহাদের "সে মধুর গানের তান, নিশীথে দূরাগত বাঁশীধ্বনির ন্যায়, তৃষিত

পথভ্রান্ত পথিকের কর্ণে ঝির্ঝরিণীর অস্ফুট কুলকুল গীতির ন্যায় ভারতে সর্ব্বত্র ভাসিয়া বেড়াইতেছে—"; ত্যাগী কেশরী মহাত্মা গান্ধী সমগ্র পাশ্চাত্য জগতের সভ্যতার ভ্রুকুটী ভঙ্গী আত্মার মহীয়সী শক্তির প্রভাবে উপেক্ষা করিয়া জগতে এক বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছেন। যে ত্যাগমন্ত্রের বলে এতদিন ভারত ভারত, সেই ত্যাগই ভারতের জাতীয় জীবনের একমাত্র ভিত্তি। আজি এই মহাপ্রাণ প্রবীন যোগী বিশ্বহিতের উন্মাদনায় অনুপ্রাণিত হইয়া ত্যাগের উত্তুঙ্গ পর্ব্বত চূড়ায় দাঁড়াইয়া আধোবর্ত্তিনী, উচ্ছৃঙ্খলা বসুন্ধরার দিকে চাহিয়া স্নিগ্ধ গম্ভীর নির্ঘোষে শৃঙ্গবাদন পূর্ব্বক তর্জ্জনী হেলাইয়া শান্তির পথ মুক্তির পথ নির্দ্দেশকরিয়া বলিতেছে—"এই ত্যাগ মন্ত্রেই সুপ্ত আত্মশক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিবে।"

আত্মবিশ্বাস হারাইলে এমনি করিয়াই সকলজাতিকে দুঃখদৈন্যের চরমসীমায় পৌছিতে হয়, এমন করিয়াই পরমুখাপেক্ষী হইয়া সাশ্রুনয়নে করুণার ভিখারী হইতে হয়। যে দেশের সনাতন সঙ্গীত "ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ", যে দেশের সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান শতমুখে আত্মার সর্ব্বশক্তিমত্তার কথা ঘোষণা করিতেছে সেই দেশের সন্তানগণ আজ নিজেকে দুর্ব্বল ভাবিয়া আপাত মধুর ভোগ-বাসনার কুহকে পড়িয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছে! আবার সেই ত্যাগের শাশ্বত প্রাণদ আদর্শ জাতীয় জীবনে উদযাপন করিতে হইবে, আত্মবিশ্বাস জাগাইতে হইবে, তবেই সমস্ত দুর্ব্বলতা, দুঃখ দারিদ্র্য আপনা হইতেই চলিয়া যাইবে।'

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ

ভক্ত-কবীর।

(শ্রীমতী—)

কবীর আসেন যবে অবনী মণ্ডলে।
জন্ম কথা তাঁর শুন অদ্ভুত সকলে॥
সরবরে পদ্ম ফুল হয় বিকশিত।
প্রমত্ত বিহগ গায় হইয়া মোহিত॥
সরবর ঘিরে নাচে ময়ূর সকলে।
গুরু গুরু মেঘ ডাকে চপলা উজলে॥
পরম সুন্দর শিশু নামি স্বর্গ হতে।
প্রফুল্ল পদ্মের দলে শুলেন সুখেতে॥
লহর তলাও সরঃ কাশীর নিকটে।
নুরা জোলা পত্নী সহ যায় সেই ঘাটে॥
নিমা জোলানী শিশুরে পাইল দেখিতে।
পুষ্প হ'তে তুলে তাঁরে লইল কোলেতে॥
শিশু কহে "কাশীধামে মোরে নিয়ে চল"
শুনিয়া ভয়েতে দোঁহে হইল বিহ্বল॥
ভুতযোনী ভাবি শিশু দিল ফেলাইয়া।
উর্দ্ধশ্বাসে দুইজনে চলিল ছুটিয়া॥
পাছে পাছে ছুটে শিশু ধরিল তখন।
শিশু বলে "ভয় ত্যাজি শুনহ বচন॥
পালন করহ মোরে হবে পিতামাতা"।
শুনে নুরা নিল কোলে পেয়ে মনব্যথা॥
পরম সুন্দর শিশু কোলেতে তাহার।
জিজ্ঞাসে, জোলানী দিল পরিচয় তাঁর॥
"এ পুত্র আমারে বিধি দিলেন দয়ায়"।
শুনিয়া সকলে বলে কিবা ভাগ্যোদয়॥

ভক্তি মাহাত্ম্যনামক সংস্কৃত গ্রন্থতে।
কবীরের পূর্ব্ব কথা লিখিত তাহাতে॥
পূর্ব্বকালে বেদাভ্যাসে নিরত ব্রাহ্মণ।
শিল্পকার্য্য করি করে স্ত্রীপুত্র পালন॥
সূতা আনিবারে যায় তন্তুবায় ঘরে।
দৈবযোগে সেইদিন ঘেরে তাঁরে জ্বরে॥
তন্তুবায় স্মরি মৃত্যু হইল তাঁহার।
পুত্ররূপে হন তাই জোলার কুমার॥
পূর্ব্ব সংস্কার বশে ব্রহ্মজ্ঞান হয়।
কাশীধামে বস্ত্রবুনে হয়ে তন্তুবায়॥
অদম্য জ্ঞানের তৃষা তাঁহার অন্তরে।
পদ্ম পত্রে বারিসম রহেন সংসারে॥
একদা কবীর চলে বৈষ্ণবের কাছে।
"কে তুই কি চাস্ ওরে" সাধুগণ পুছে॥
রামানন্দ শিষ্য হতে বলিল কামনা।
"ম্লেচ্ছ তুই তোর গুরু দুরন্ত বাসনা"॥
ভগ্ন মনরথে সাধু গৃহেতে ফিরিল।
পুনঃ সন্তগণে মনবেদনা বলিল॥
তাড়াইয়া দিল সবে বেড়ান ঘুরিয়া।
গুরু রামানন্দ কোথা সবারে পুছিয়া॥
এইরূপে বহুদিন বিগত হইল।
একদা বৈষ্ণব কোন কবীরে বলিল॥
"অমুক স্থানেতে রামানন্দ বাস করে।
নিশাশেষে গঙ্গা স্নানে যান তিনি ভোরে॥
বহির্দ্বারে শুয়ে তুই থাকিবি গোপনে।
নাহি জানি রামানন্দ দলিবে চরণে॥
সে কালে যে নাম করিবেন উচ্চারণ।
গুরুমন্ত্র বলে তুই করিস গ্রহণ"॥

কবীর বৈষ্ণব বাক্য শুনিয়া হরিষে।
শয়ন করেন দ্বারে যামিনীর শেষে॥
স্নানার্থে যেমন হন গৃহের বাহির।
দলিত করেন পদে কবীর শরীর॥
গুরুপদ সমাদরে করেন চুম্বন।
রামানন্দ 'রাম-রাম' করে উচ্চারণ॥
"কে তুই" জিজ্ঞাসে সাধু শ্রীগুরু বলিয়া।
"মনরথ পূর্ণ" বলে প্রণাম করিয়া॥
রামানন্দ গঙ্গাস্নানে গমন করিল।
কবীরের বাঞ্ছাপূর্ণ এরূপে হইল॥
বালক কবীর জপে সদা 'রাম-রাম'।
যবন বিধর্ম্মী ভাবি হয় সবে বাম॥
হিন্দুর ছেলেরা চটে রাম নাম শুনে।
যবন হইয়া রাম জপে কি কারণে॥
কণ্ঠী ও তিলক মালা করিল ধারণ।
বৈষ্ণবেরা মহাক্রুদ্ধ বলিল বচন॥
"ম্লেচ্ছাধম্ কি সাহসে কণ্ঠী-মালা পর।
রে দুর্ব্বুদ্ধি! দুষ্ট শিক্ষা কে দিলে বর্ব্বর"॥
"রামানন্দ শিষ্য আমি" কবীর বলিল।
শুনিয়া সকলে মনে বিরক্ত হইল॥
হিন্দু ও যবন তবে দুই দল মিলে।
রামানন্দ কাছে গিয়া জিজ্ঞাসে সকলে॥
ক্রুদ্ধ হয়ে রামানন্দ ডাকিয়া পাঠায়।
কৃতাঞ্জলিপুটে নমি কবীর দাঁড়ায়॥
সবিস্ময়ে রামানন্দ করেন জিজ্ঞাসা।
"কবে শিষ্য করি তোমা বল সত্য ভাষা"॥
কবীর বলেন "গুরু করি নিবেদন।
বহির দ্বারেতে আমি করিয়া শয়ন॥

স্নানার্থে আসিয়া তুমি না দেখি আমারে।
পদেতে দলিয়া প্রভু উঠিলে শিহরে॥
“রাম রাম রাম” শব্দ কর তিনবার।
সেই অবধি রাম নাম জপি অনিবার॥
তুমি গুরু জেনে মন্ত্র করেছি গ্রহণ।
শুনি রামানন্দ শিষ্যে করে আলিঙ্গন॥
হাস্যমুখে আশীর্ব্বাদ করেন কবীরে।
তুমিই প্রধান শিষ্য হ'লে ভক্তিজোরে॥
জীবন সার্থক বৎস পাইয়া তোমায়।
হিন্দু ও যবনে দেখি মিলন বিস্ময়॥

চন্দ্রা ও শ্রীকৃষ্ণ।

(শ্রীসাহাজি)

চন্দ্রা কয়—কৃষ্ণ চন্দ্র!
কি হেতু অধীর এত হে নিঠুর! রাধার লাগিয়া।
হে বঁধু নিলাজ কালা!
রাধা কি এতই ভাল? সুন্দরী সে আমারে জিনিয়া?
কৃষ্ণ কন,—চন্দ্রাবলি!
রূপসী তোমার চেয়ে মিলিবে না জগৎ খুঁজিয়া।
তুমি কও, রসময়!
আমার মনের মত থাক তুমি আমার হইয়া।
রাধা কয়, শ্যামরায়!
তোমার মনের মত ক'রে লও আমারে গড়িয়া।
চন্দ্রা ভাল, রাধা আলো,
রাধানাথ তাই আমি, বাঁধা আছি রাধার লাগিয়া।

প্রকৃত স্বাধীনতা কি ?

(শ্রীনীরেন্দ্রমোহন সেন, বি, এ।)

আজকাল স্বাধীনতার দিন। "স্বাধীনতা, স্বাধীনতা" বলিয়া দেশটা যেন একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। সামাজিক স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, ধর্ম্মে স্বাধীনতা ইত্যাদি যত প্রকারের স্বাধীনতার কথা আমরা জানি, সবই আমরা চাই—এবং এই মুহূর্ত্তে। Ibsen, Benard Law, Oscar Wilde প্রভৃতি ইয়ুরোপীয় এবং সেই ভাবে ভাবিত এ দেশের মনীষিগণ ও যখন স্বাধীনতার ধ্বজা তুলিয়া ধরিয়াছেন, তখন বাক্যেন অলম্। ধাও ধাও, সকলে সেই লোহিতবর্ণ বিজয় পতাকার দিকে—যেমন পতঙ্গ ধায় বহ্নি পানে ; কারণ, ইহাই হইতেছে the highest consummation of life. মুক্তির চরম অবস্থা নির্ব্বাণ.—যাহাদের জীবনের পূর্ণতা এই নির্ব্বাণে তাহাদিগকে আমরা বলি "তথাস্তু", কিন্তু যাহারা এই নির্ব্বাণ চাহে না—চাহে জীবনের ক্রমবিকাশ পূর্ণ মনুষ্যত্ব তাহাদিগকে বলি "তিষ্ঠ ক্ষণকাল"। অন্ধকারে লাফ দেওয়ার একটা মাদকতা আছে বটে কিন্তু নেশা ছুটিলেই বেদনা আরম্ভ হয়। তাই বিবেচক দূরদর্শী যাঁহারা—তাঁহারা ভাবিয়া কাজ করেন ; করিয়া ভাবেন না। আঁধার এইরূপ দুঃসাহসিক, মাদকতাপূর্ণ কার্য্য করিতে পারে তাহারাই যাহাদিগকে "with fear of change perplex করে না"। Rosmerholm এ Ibsen ইহা বেশ সুন্দর ভাবে দেখাইয়াছেন। তাই যাহারা সমাজের কিছু—যাঁহারা সমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—সমাজ যাঁদের প্রাণ, সমাজকে যাঁরা ভাঙ্গিতে পারেন না—তাঁহাদের একটু ভাবিয়া দেখা উচিত যে এই স্বাধীনতাটা কি ? পুরাতনের আদর যদি convention হয়, তবে নূতন ভাবের স্রোতে নিজেকে ভাসিয়া যাইতে দেওয়া—তাহার বশ্যতা স্বীকার করা কি ততোধিক convention নহে ? পুরাতনের

নেশা মানুষের যত সর্ব্বনাশ না করে, নূতনের মোহ তার চাইতে অনেক বেশী অনিষ্টকারী; কারণ নূতনের ভিতর একটা নূতনত্ব আছে, যাহা দেখাইবার জন্য ফ্যাসনদার লোক সর্ব্বদাই ব্যস্ত। মানুষ বাহাদুরী চায় এবং নূতনত্বই ইহার প্রাণ। তাই মানুষ নূতন ঢঙ্গে চলিতে, পোষাক পরিতে, কথা কইতে, লিখ্‌তে চেষ্টা করে; এবং তাহাদের কার্য্যের সমর্থনের জন্য কথায় কথায় Ibsen, Materlinck, Shaw......ইত্যাদি quote করে। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহারা একটুও ভাবিয়া দেখে না যে, "What is sauce for the gander is not sauce for the goose",—যে, ইয়ুরোপ ভারত নহে,—সেখানকার পুরুষগুলি সব সাহেব আর মেয়েগুলি সব মেমসাহেব, আর তারা কথা কয় দোসরা বুলি। তাহাদের সমাজের হাওয়া যে অন্য রকম। তাই তাহাদের যাহা সয়, আমাদের অনেক সময় তাহা সয় না। আচ্ছা, এই চরমপন্থীদিগকে আমার বক্তব্য এই যে, কোন সাহেব কি বাঙ্গালী হইতে কখনও চাহিয়াছে ?

যদি বল—বলবানের দিকে সকলে ধায়, তবে আমার বক্তব্য এই—ভারত যখন খুব শক্তিশালী ছিল, যখন সে সভ্য জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল—তখনও কি গ্রীস কিংবা ইতালী ভারত হইতে চাহিয়াছিল? পরের ধনে পোদ্দারী করার একটা বাহার আছে বটে, কিন্তু শেষ কালে নীলবর্ণ শৃগালের মত পঞ্চত্ব প্রাপ্তির সম্ভাবনাও যথেষ্ট আছে। অতএব সাধু সাবধান!

আমরা অনেক সময়ে ভুলিয়া যাই যে স্বাধীনতা এবং উচ্ছৃঙ্খলতা এক নহে। একটী অপরটীর বিপরীত। আরও বিশদভাবে বলিলে বলা যাইতে পারে যে, উচ্ছৃঙ্খলতার সংযমই হচ্চে প্রকৃত স্বাধীনতা। দেশ-কাল-পাত্রের অপেক্ষা না রাখিয়া মনে যখন যে খেয়াল হয় তখনই তাহা সম্পন্ন করা—ইহাকেই উচ্ছৃঙ্খলতা বলে। ইহা যদি শ্রেয়ঃ হয় তবে চুরি ডাকাতি ইত্যাদি সব কাজই শ্রেয়ঃ। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হিসাবে চুরি, ডাকাতি ন্যায় সঙ্গত, কিন্তু সামাজিক হিসাবে উহা দুষ্ট। আমার টাকার অভাব, অতএব আমি ন্যায়তঃ যেখান

হইতে পারি টাকা আনিতে পারি; ইহা যদি সঙ্গত হয়, তবে যাহার টাকা চুরি করা হয় সেও ন্যায়তঃ বলিতে পারে—"আমার টাকা আমি দিব না; যদি কেহ নিতে আসে তাহাকে আমি যে প্রকারে হউক তাড়াইয়া দিব।" ফলে দেশটা মগের মুল্লুক হইয়া দাঁড়ায়। এই অশান্তি দূর করিবার জন্যই সমাজ;—মানুষের পশুত্ব দূর করিয়া মনুষ্যত্বের বিকাশের জন্যই সমাজের সৃষ্টি। সমাজ বৃহৎ বিদ্যাগার মাত্র। বিদ্যালয়ে পড়িতে হইলে যেমন তাহার নিয়মাবলী মানিয়া চলিতে হয়, গুরু স্বীকার করিতে হয়, তাঁহার কাছে নিজস্ব বিকাইয়া দিতে হয়, প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে হইলেও সেইরূপ। সমাজে থাকিতে হইলে সমাজকে মানিয়া চলিতে হয়; কারণ, একের চাইতে বহু বড়। গুরুর নিকট নিজকে হারাইয়া ফেলিতে পারিলেই যেমন নিজকে পুনঃ পূর্ণভাবে পাওয়া যায়, সেইরূপ সমাজের নিয়মাবলী (যাহাকে চরমপন্থীরা শৃঙ্খল বলেন) মানিয়া চলিতে পারিলেই—নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ সমাজের বৃহৎ স্বার্থের জন্য ত্যাগ করিতে পারিলেই—সমাজের শীর্ষস্থানীয় হওয়া সম্ভব; তখনই সমাজ তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিবে। যদি তিনি প্রকৃত সমাজসংস্কারক হন তবে তিনি কখনও সমাজের ভিত্তি ভাঙ্গিবেন না—উহাকে দৃঢ়তর করিবেন। ভাঙ্গা গড়ার অপেক্ষা কত সহজ। কিছু গড়িতে হইলে সংযমের দরকার। উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিদের সংযম কই? অতএব তাঁহাদের দ্বারা কোন মঙ্গল কার্য্য হওয়া অসম্ভব। আর তাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন যে, তাঁহারা যতই আস্ফালন করুণ না কেন সমাজ তাঁহাদের চোখরাঙ্গানিতে ভয় পায় না। সমাজ জানে, অসংযমী পুরুষ কত দুর্ব্বল—তাই তাহাদিগকে তৃণের মত গণ্য করে। [ব্যক্তিগত স্বাধীনতা চাহিবার পূর্ব্বে আমাদের মনে রাখা উচিত যে, অকৃতজ্ঞতা মহাপাপ। যে সমাজের ক্রোড়ে আমরা লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছি, যে সমাজ পিতা-মাতার ন্যায় আমাদের সর্ব্বদা কল্যাণাকাঙ্ক্ষী তাহাকে গালি দেওয়া, নিন্দা করা; এমন কি পেশিয়া মারার চেষ্টা যে কি ভয়ঙ্কর ingratitude তাহা উদ্ধত ব্যক্তি ছাড়া সকলেই বুঝিতে পারিবেন। হঠাৎ-বাবুরা (upstart) যেমন গরীব বাপ-মা স্বীকার

করিতে কুণ্ঠিত—এমন কি বিদেশীর কাছে অপমানিত করিতে গৌরব অনুভব করে—এই উগ্রপন্থা ব্যক্তিগণ বিদেশের কাছে নিজেদের সমাজ, জাতি, ইতিহাস—এক কথায় বলিতে গেলে নিজত্ব অস্বীকার করিতে লজ্জাবোধ করে না। ময়ূর সাজিয়া পেখম ধরিয়া নাচিতেই বেশী গৌরব অনুভব করে।]

ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ব্যক্তিগত পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিতে হইলে প্রত্যেককে স্কুলের শাসনের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে,—গুরুর নিকট সর্ব্বতোভাবে অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে। আজ্ঞা দিবার উপযুক্ত হইতে হইলে যেমন আজ্ঞা বহন করিবার শক্তি পূর্ব্বে বাড়াইতে হয়, তেমনি সমাজকে চালাইতে হইলে সমাজকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতে হয়। স্বাধীনতা লাভের প্রয়াস পাইবার পূর্ব্বে, পরকে স্বাধীনতা দিবার শক্তি জাগরূক করিতে হইবে। আমরা অধীনস্থ ব্যক্তিকে স্বাধীনতা দিই না, অথচ আমার উপরিস্থ ব্যক্তি কেন আমাকে স্বাধীনতা দিল না, এই বলিয়া আস্ফালন করি বা তাহাকে নিন্দা ও অপদস্থ করিতে চেষ্টা করি;—ইহা কি অবিমৃষ্যকারিতা নহে? শূদ্র-সমাজ উচ্চকণ্ঠে গগন ভেদ করিয়া বলে যে ভগবান্ গুণানুসারে জাতি বিভাগ করিয়াছিলেন, বংশ অনুসারে নহে; অতএব ব্রাহ্মণোচিত গুণ না থাকিলে শুধু গলায় পৈতা ঝুলাইলেই ব্রাহ্মণ হয় না; সুতরাং উপবীত মাত্র ধারী ব্রাহ্মণ শূদ্রদের সঙ্গে একাসনে বসিয়া কেন ভোজন করিবেন না? কিন্তু নমঃশূদ্র যখন বলে যে আজকাল আর জাতি নাই,—অতএব শূদ্র-সমাজ কেন তাহাদের সঙ্গে একাসনে বসিয়া ভোজন করিবে না? তখন শূদ্র-সমাজ বলে যে, তাহারা ক্ষত্রিয় আর নমঃশূদ্র অনার্য্য,—অতএব উভয়ের মধ্যে কোনরূপ আদান-প্রদান চলিতে পারে না।

'স্ত্রী স্বাধীনতার' কথা আজকাল খুব শোনা যায়। যাঁহারা নিজে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিতে চান, অর্থাৎ যাঁহারা সমাজের আচার-পদ্ধতি কিছুই মানিতে চান না, কারণ সেইগুলি শৃঙ্খলের ন্যায় মানুষকে বদ্ধ করিয়া তাহাকে বাড়িতে দেয় না, তাঁহারা সকলকেই পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে ন্যায়তঃ বাধ্য। কাহারও কার্য্যকলাপের উপর তাঁহাদের কোন

না মানায় কোন যুক্তি নাই—আছে কেবল গায়ের জোর। যে ব্যক্তি সমাজ হইতে কোন অনুগ্রহ দাবী গ্রহণ করেন নাই, কেবল তাহার পক্ষেই সমাজকে অগ্রাহ্য করা দোষনীয় নহে। অপরের পক্ষে তাহা কেবল নিন্দনীয় নহে—মহাপাপ। সমাজের রক্ত খাইয়া মানুষ হইব আবার সমাজকেই লাথি মারিব—ইহা হইতে অকৃতজ্ঞতা আর কি হইতে পারে ?

এখন প্রশ্ন হইতে পারে—তবে কি সমাজসংস্কার বলিয়া একটা জিনিষ নাই ? সমাজ যখন হীনবীর্য্য হইয়া পড়ে, যখন তাহার গৌরব নষ্ট হইতে থাকে, তখন কি তাহাতে শক্তিসঞ্চার করিতে হইবে না—তাহার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রয়াস করিতে হইবে না ? উত্তর—নিশ্চয়ই করিতে হইবে। সমাজকে পুনর্জ্জীবিত করিতে হইবে—নষ্টোদ্ধার করিতে হইবে, কিন্তু সে সমাজকে উপড়াইয়া ফেলিয়া তাহার স্থানে অপর একটা কিম্ভুতকিমাকার বিদেশী সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া নহে। পঙ্কোদ্ধার করা শক্ত বলিয়া, দুর্গন্ধযুক্ত পুষ্করিণীর গন্ধ দূর না করিয়া অপর স্থানে পুষ্করিণী খনন করিলেও যেমন জলবায়ু দূষিত থাকিয়াই যায়—সেই স্থান অস্বাস্থ্যকর হইয়া থাকে, সেইরূপ নিজ সমাজের গলদ দূর না করিয়া অপর একটা সমাজ সেই স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিলে কি গলদ নষ্ট হইবে ? বরঞ্চ ভিত্তি দুর্ব্বল থাকার দরুণ নূতন প্রতিষ্ঠিত সমাজ পর্য্যন্ত ধ্বসিয়া পড়িবে। ফলে 'বৈষ্ণবকুল ও তাঁতিকুল—উভয়কুলই নষ্ট হইবে।' আমগাছ পুরাণ হওয়াতে ফল কম হয় বলিয়া সে গাছটা উপড়াইয়া ফেলিয়া তাহার স্থানে বিলাত হইতে আমদানী করা একটা ওক বৃক্ষ রোপণ করিলে যে ফল হওয়া সম্ভব, হিন্দুসমাজ ধ্বংশ করিয়া তাহার স্থানে বিলাতী সমাজ বসাইবার চেষ্টার ফলও তাহাই হইবে। বিলাতি সমাজ বিলাতের পক্ষে ভাল বলিয়া যে ভারতের পক্ষেও ভাল হইবে তাহার কোন প্রমাণ নাই,—বরং ক্ষতিকারক হইবারই যথেষ্ট সম্ভাবনা। আর গলদ কোন্ সমাজে না আছে ? তবে তাহার আকৃতি ভিন্ন ভিন্ন সমাজানুসারে বিভিন্ন প্রকার। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় বলি—"Social evil is like chronic rheumatism drive it

from foot, it goes to head, drive it from head, it goes to some other part; but it is there all the same." বিলাতী সংস্কারকগণ ত আমাদের সমাজের প্রথা অবলম্বন করেন না,—কারণ তাঁহারা জানেন যে, তাঁহাদের সমাজের আদর্শ স্বতন্ত্র। অতএব আমাদের সমাজের আদর্শ যখন স্বতন্ত্র, তখন বিলাতী সমাজের অনুকরণ করিলে সমাজ সংস্কার কি করিয়া হইবে? মাননীয় বিচারপতি মিঃ উডরফ্ সেদিন ঠিক কথা বলিয়াছেন—"If I were an Indian, I would not change my 'Namascara' with the European hand-shake." ইয়ুরোপীয়দের নিকট করমর্দ্দনের ভিতর যত ভাবই থাকুক না কেন, ভারতবাসীর নিকট উহার কোন তাৎপর্য্য নাই। সমাজ-সংস্কারক হইতে হইলে আগে নিজেকে সংস্কার করা প্রয়োজন। কেবল পরশ পাথরই যেমন লোহাকে সোনা করিতে পারে, তেমনি সমাজের যুগানুসারে ২।১ জন ক্ষণজন্মা পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া সমাজের পঙ্ক উদ্ধার করিয়া দিয়া যান। তাঁহারা night grown mushroom reformersদের মত Olympian heightএ বসিয়া জনসাধারণকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া তাঁহাদের উদ্ধারকল্পে আদেশ বাণী প্রচার করেন না। প্রকৃত সংস্কারক হইতে হইলে তাঁহাকে সমাজরূপ বৃহৎ যজ্ঞে নিজের স্বার্থ বলি দিতে হইবে। দ্বেষ, হিংসা, রাগ, অভিমান—এমন কি নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পর্য্যন্ত বলি দিতে হইবে। প্রেমের চাইতে বড় সংস্কারক নাই। যাহাকে সংস্কার করিব, তাহাকে ভাল না বাসিলে, তাহার সুখ-দুঃখে সমবেদনা না জন্মিলে, তাহার প্রাণ কি করিয়া খুঁজিয়া পাইব? আর, যদি প্রাণের নাগাল না পাই, তবে কি কাঠামটাকে সংস্কার করিব? তাই সংস্কার করিতে হইলে নিজের ভিতর প্রেম জাগাইতে হইবে এবং এই প্রেম জাগাইবার জন্যই নিজেকে আহুতি দিতে হবে সমাজের নিকট। প্রকৃত সংস্কারক নিজের প্রাণ দিয়া সমাজের ক্ষতস্থান পূর্ণ করিতে চেষ্টা করেন—সমাজের গলদ দূর করিবার জন্য আহার-নিদ্রা ত্যাগ করেন—দূর হইতে নাসিকা বন্ধ করিয়া থু থু ফেলিতে ফেলিতে আর গালি দিতে দিতে চলিয়া যান না; মেথর হইয়া তিনি ময়লা পরিষ্কার

করেন। পরমহংস রামকৃষ্ণদেব নিজের জীবনদ্বারা ইহা দেখাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু ইহা লইয়া একদিনও আড়ম্বর করেন নাই অথবা সমাজকে গালি দেন নাই। সমাজসংস্কার করিতে যাই আমরা নেতা সাজিয়া,—সেবকভাবে নহে। তাই ক্ষেত্রে নাবিবার পূর্ব্বেই আদেশ জারি করিতে থাকি। যদি সমাজ সে আদেশ গ্রহণ না করে,—আর গ্রহণ কেনই বা করিবে?—তবেই অজস্র সুললিত ভাষায় সমাজকে গালাগালি দিতে থাকি যে, সমাজের কপাল পুড়িয়াছে, নইলে আমার কথায় কর্ণপাত করে না; এহেন সমাজের উদ্ধার চেষ্টা বৃথা—অতএব ক্ষান্ত হওয়াই শ্রেয়ঃ। আমি বিলেত হইতে দেশে ফিরিয়াই সমাজকে আদেশ করি আমাকে গ্রহণ করিতে। যদি সমাজ কেবল এটুকু বলে যে "ভাই তোমাকে আমরা গ্রহণ করিব না কেন? তবে বিদেশে থাকিয়া বাধ্য হইয়া হিন্দুর অখাদ্য কত কিছু খাইয়াছ—একবার একটা প্রায়শ্চিত্ত কর, তবেই আমরা তোমাকে গ্রহণ করিব।" তখনই আমরা সাপের মত গর্জ্জিয়া উঠিয়া সমাজের গায়ে বিষ ঢালিয়া দিতে চেষ্টা করি! সদর্পে বলিয়া উঠি—"সমাজের আব্দার কেন পালিব?—আমরা ত কোন অন্যায় করি নাই; বিদ্যাশিক্ষার্থে বিদেশে গিয়াছিলাম—সমাজ কেন গ্রহণ করিবে না? গ্রহণ না করে ত সমাজকে লাথি দিয়া দূরে সরাইয়া নূতন সমাজ গঠন করিব—ইত্যাদি, ইত্যাদি!" এই সব সংস্কারকদিগের নিকট আমার নিবেদন এই যে, তাঁহারা সমাজের আবদার পালিতে যদি এতই অনিচ্ছুক—তাঁহাদের principle (?) যদি কিছুতেই বিসর্জ্জন দিতে রাজী না হন, তবে তাহারা কোন্‌মুখে স্ত্রী-পুত্রের শত সহস্র আব্দার প্রতিপালন করিতেছেন? যদি বলেন যে, স্ত্রী-পুত্র আপন বস্তু তাহাদের সঙ্গে সমাজের তুলনা হয় না, তবে আমার উত্তর এই যে, সমাজ যখন আপনাদের আপন বস্তু নহে, তখন সমাজই বা কেন অপমানিত হইয়া আপনাকে গ্রহণ করিবে? আপনি যদি সমাজের তোয়াক্কা না রাখেন, তবে সমাজই বা কেন আপনাদের তোয়াক্কা রাখিবে? সমাজ আপনাদের চাইতে অনেক বেশী শক্তিশালী। সমাজ হিমালয়ের ন্যায় যুগযুগান্তর ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—সমুদ্রের ন্যায় অনন্ত কাল ধরিয়া দেশময় ব্যাপিয়া

রহিয়াছে—আপনি বুদ্‌বুদের ন্যায় এক মুহূর্ত্তকাল লম্পঝম্প করিয়া কোথায় বিলীন হইয়া যাইবেন তা কে জানে! আপনার ন্যায় কত বুদ্‌বুদ্‌ এই সমুদ্রগর্ভ হইতে উঠিয়া মুহূর্ত্তকাল মধ্যে খেলিয়া আবার সেই সমুদ্রগর্ভে লীন হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাই সমাজ আপনাদের দাম্ভিকতাপূর্ণ গগনভেদী রবে কর্ণপাত করে না। আপনারা মিছামিছি চেঁচামেচি করিয়া ক্লান্ত হইতেছেন!

প্রকৃত সমাজ-সংস্কারক সমাজের প্রাণ খুঁজিয়া বেড়ায় এবং এই প্রাণের সন্ধান পাইবার জন্য তাহাকে অশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। তিনি সাধারণ ব্যক্তিদের সহিত মহাত্মা গান্ধির ন্যায় তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করেন—সাধারণের সঙ্গে নিজেকে মিশাইয়া দেন—তাহাদের ভাষায় কথা বলেন, তাহাদের খাদ্য খান, তাহাদের সুখ-দুঃখকেই নিজের সুখ-দুঃখ বলিয়া মনে করেন; তাহাদের সঙ্গে নিজে উপবাস করেন, তাহাদের সঙ্গে প্রয়োজন হইলে জেলে পর্য্যন্ত যাইতে প্রস্তুত হন। স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় দ্বাদশ বৎসর পাহাড়ে-পর্ব্বতে-মরুভূমিতে আহার-নিদ্রা পরিহার করিয়া দেশের প্রাণ খুঁজিয়া যিনি ভ্রমণ করিতে পারেন, দরিদ্রকে 'নারায়ণ জ্ঞানে' যিনি সেবা করিতে পারেন—তাহাদের ভিতর যে অনন্ত ব্রহ্মশক্তি গুপ্ত রহিয়াছে, তাহাকে জাগাইবার জন্য অন্ন, বস্ত্র, বিদ্যা, অধ্যাত্মজ্ঞান দিবার জন্য অর্থহীন জনহীন অবস্থায় এই অল্পবয়সে সুদূর আমেরিকা পর্য্যন্ত যাইতে পারেন, এবং যিনি দেশের দুর্দ্দশার কথা ভাবিতে ভাবিতে আমেরিকায় millionaireদের বাড়ীতে সুকোমল দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শুইয়াও কত রাত্র কাঁদিতে কাঁদিতে বালিশ-বিছানা সব ভিজাইয়া দিয়া নীচে মেজের উপর গড়াগড়ি দিয়া কাটাইতে পারেন, কেবল তাঁহারাই দেশের, সমাজের, সংস্কারক হইবার জন্য ভগবান্‌ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হন। তাঁহারা সেবক হইয়া আসেন বলিয়া নায়ক হইয়া পড়েন; আর তাঁহাদের কথায় দেশ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় চলিতে থাকে। স্বামীজীর ন্যায় তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, স্বদেশপ্রেমিক, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের পক্ষে ইহা উপলব্ধি করা সম্ভব যে, প্রত্যেক জাতির যেমন একটা ধর্ম্ম আছে—যাহা ধরিয়া জাতি বাড়ে—তেমনি ভারতেরও একটা ধর্ম্ম আছে, যাহা

ধরিয়া ভারত একসময়ে সভ্যতার চরমসীমায় উঠিয়াছিল এবং যাহা ছাড়িয়া দেওয়ায় ভারতের এত অধঃপতন হইয়াছে। সেই ধর্ম হচ্চে অধ্যাত্মিকতা—যাহা ভারতের প্রাণ। ভারতের দর্শন বলিতেছে যে, যাহা কিছু সত্য সবই ব্রহ্ম এবং এই ব্রহ্ম প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে অধিষ্ঠিত আছেন শক্তি ব্রহ্মেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র—যেমন কিরণ সূর্য্যের প্রকাশ। যিনি 'খোদ কর্ত্তা'র কাছে পৌঁছিতে পারেন, শক্তিও তাঁহার করতলগত হইতে বাধ্য। স্বামীজী আমাদিগকে এই অমোঘবাণী শুনাইয়াছেন—"হে ভারতবাসি—হে চণ্ডাল ভারতবাসি, মূর্খ ভারতবাসি, আমার ভাই—তোমরা ভুলিও না যে তোমাদের ভিতর অনন্ত শক্তি রহিয়াছে। তোমরা দুর্ব্বল নও, বিশ্বাস কর যে তোমরা ইচ্ছা করিলেই সর্ব্বশক্তিমান্ হইতে পার.—তোমরা যে আদ্যাশক্তি ভগবতীর সন্তান—দুর্ব্বলতা কি তোমাদের শোভা পায়? অতএব 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত'।" স্বামীজীর এই অমোঘবাণী ঘরে ঘরে অমৃত ফলাইয়াছে। দেশ নিজের দিকে চাহিতে শিখিয়াছে—নিজের সত্তার সন্ধান পাইয়াছে,—দেশ জাগিয়া উঠিতেছে। স্বামীজী বলিতেন—'একবার বেদান্তসিংহ জাগিলে শৃগাল সব ভয়ে পলাইয়া যাইবে।' এই বার ভারতসিংহ জাগিয়াছে,—এখন মাভৈঃ!

চরমপন্থীরা বলেন যে, 'ধর্ম্ম' 'ধর্ম্ম' করিয়া দেশটা গেল। তাহাদিগকে আমার জিজ্ঞাসা এই—যদি 'ধর্ম্ম ধর্ম্ম' করিলে দেশটা যায়, তবে কি 'ছাড় ছাড়' করিলে দেশটা থাকিবে? তাঁহারা যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক ভারতের ইতিহাস অনুসন্ধান করেন তবে দেখিতে পাইবেন যে, যে যুগে ভারতে ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, যথা—বৈদিক যুগ, বৌদ্ধযুগ ইত্যাদি—সেই সব যুগই ভারতের উন্নতির যুগ। মহাভারত পড়িলে দেখিতে পাই যে, যখনই কুরুদের ভিতর ধর্ম্মভাব কমিয়া যাইতে লাগিল—স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধর্ম্ম খোয়াইল, তখনই ভারত গগন হইতে কীর্ত্তিসূর্য্য অস্তমিত হইল। বৌদ্ধযুগের শেষভাগে যখন ধর্ম্মভাব দেশ হইতে চলিয়া গেল তখনই জাতি দুর্ব্বল হইয়া পড়িল এবং তার ফলস্বরূপ ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমন। আবার মুসলমান যুগেও আমরা দেখিতে পাই যে, যখন রাজপুত, শিখ

এবং মহারাষ্ট্রদের ভিতর ধর্ম্মভাব জাগিল, তখনই দেশে রাণা-প্রতাপ, রাজসিংহ, নানক, গুরুগোবিন্দসিংহ, শিবাজী, বাজিরাও প্রভৃতির মত নেতা জন্মিল—আর দেশ এগিয়ে গেল।

ভবিষ্যৎ আঁকিতে হইলে অতীতের প্রতি দৃষ্টি না রাখিলে চলে না। অনেকদিন ব্যাপী কোন ব্যাধি ঠিক্ করিতে হইলে যেমন চিকিৎসক সেই রোগীর ধাত জানিয়া লন, সমাজ বা দেশ-সংস্কারকেরও সেইরূপ অতীতের দিকে, ইতিহাসের দিকে চাহিয়া ভবিষ্যতের পথ নির্ণয় করিতে হয়। যিনি তাহা না করিয়া বিদেশী সভ্যতার চাক্‌চিক্য দেখিয়া অন্ধ হইয়া সেই বিদেশী সভ্যতানুসারে নিজের দেশকে সভ্য করিতে চেষ্টা করেন, তিনি পতঙ্গের মত আগুণে পুড়িয়া মরিবেন নিশ্চয়ই। যিনি প্রকৃত সমাজসংস্কারক হইতে চাহেন, তিনি দেশকে আগে ভালবাসিতে শিখুন—দেশের জন্য নিজকে বলি দিতে শিখুন—তবে দেশের প্রাণের স্পন্দন শুনিতে পাইবেন,—দেশ তাঁহার ডাকে সাড়া দিবে। তখন আর রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, স্ত্রী-স্বাধীনতা ইত্যাদি বলিয়া গলাবাজি করিতে হইবে না; দেশের মধ্যে প্রাণ সঞ্চারিত হইলে দেশই নিজের অভাব পূরণ করিয়া লইবে। সংস্কারককে প্রথম ও প্রধান সেবক হইতে হ'বে। সেবা করিয়া দেশকে জাগানই তাঁহার ধর্ম্ম, তাঁহার কর্ম্ম, তাঁহার স্বার্থকতা।

সমালোচনা ও পুস্তক পরিচয়।

যুগভেরী—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ও স্বামী বিবেকানন্দজীর বক্তৃতা ও পত্রাবলী হইতে সংগৃহীত। কার্ত্তিকপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের সাহায্য কল্পে, ব্রহ্মচারী মাধবচৈতন্য কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত। মূল্য বিশেষ সংস্করণ—পাঁচ আনা। সাধারণ সংস্করণ—তিন আনা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, কার্ত্তিকপুর, ফরিদপুর।

স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী— শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের অন্যতম প্রিয় অন্তরঙ্গ শিষ্য স্বামী প্রেমানন্দ (বাবুরাম) মহারাজের সেই শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ ভাবঘন সৌম্য মূর্ত্তিখানি আজ বহুদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে অপসৃত হইয়াছে। এখন আছে কেবল তাঁহার সেই প্রীতি ভালবাসা ও অযাচিত করুণার মধুময় স্মৃতি। এই সময়ে ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার প্রাণময়ী ভাষায় লিখিত পত্রাবলী সংগ্রহ ও প্রকাশ করিয়া সর্ব্বসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। পত্রগুলি পাঠ করিতে করিতে সত্য সত্যই তাঁহার সেই প্রেমবিগলিত সৌম্য বদনমণ্ডল, এবং তিনি যেমনিভাবে ভাববিহ্বল হইয়া একদিকে মাতার কোমল-কঠোর ভর্ৎসনা ও অপরদিকে মানবের দুঃখ-কষ্ট ও স্বাভাবিক দুর্ব্বলতার প্রতি সহানুভূতিতে বিগলিত হইয়া অপূর্ব্ব করুণারসে ভাসিতে ভাসিতে সরস প্রাঞ্জল অথচ হৃদয়ের পূর্ণ বিশ্বাসজাত দৃঢ়তা-সমুত্থিত ওজস্বী ভাষায় উপস্থিত ভাবস্তব্ধ ভক্তমণ্ডলীকে উপদেশ করিতেন, সেই ছবি—স্বতঃই মানসপটে ভাসিয়া উঠে। যাঁহারা প্রেম-প্রীতি-ভালবাসার জীবন্ত বিগ্রহ এই অদ্ভুত মহাপুরুষকে দেখিবার ও তাঁহার সঙ্গলাভ করিবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন আমরা তাঁহাদিগকে এই পত্রগুলি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। কারণ, ইহাতে তাঁহারা ইঁহার স্বভাবসিদ্ধ প্রীতি, ভালবাসা, করুণা ও সহানুভূতির কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র লাভ করিয়াও তৃপ্ত হইতে পারিবেন। এতদ্ব্যতীত ইহাতে পাঠক ভক্তি ও কর্ম্ম-জীবনের কঠিন দায়িত্ব এবং ঐ সকলের যথাযথ পালন বিষয়ে হৃদয়স্পর্শী অমূল্য উপদেশ এবং হিংসাদ্বেষ ও স্বার্থ কোলাহলের লীলাক্ষেত্র সংসার-জীবনে শান্তিদায়ক অনেক প্রাণারাম আশার বাণী শুনিতে পাইবেন। পুস্তকখানির মূল্য ॥৵০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, হাটখোলা পোঃ রমনা, ঢাকা।

নীরব ভাষা বা ধাত্রী পান্না—পথিক বর্ণিত—আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতে কবিতার নানা তত্ত্ব কথা আছে। মূল্য আট আনা।

সংবাদ ও মন্তব্য।

১। আগামী ২৫ অগ্রহায়ণ সোমবার, ইং ১১ই ডিসেম্বর, চান্দ্র অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের শুভ সপ্তমী তিথি। উনসপ্ততি বর্ষ পূর্ব্বে ঐ তিথিতে শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের পরমরাধ্যা জননী আমাদিগের প্রতি অনন্ত করুণায় ইহধামে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। ঐ ঘটনার স্মরণার্থ ঐদিবসে বেলুড় মঠে এবং কলিকাতার বাগবাজার-পল্লীস্থ শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর বাটীতে (১নং মুখার্জ্জি লেন) বিশেষ ভজন-পূজাদির অনুষ্ঠান হইবে। পুরুষ-ভক্তগণ ঐদিবস বেলুড় মঠে উপস্থিত হইয়া এবং স্ত্রীভক্তেরা বাগবাজারে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর বাটীতে আগমনপূর্ব্বক মধ্যাহ্নে পূজা দর্শন ও প্রসাদ গ্রহণে ধন্য হইবেন।

২। বিগত ২৫শে সেপ্টেম্বর ব্রঃ নগেন্দ্রনাথ এবং স্বামী বাসুদেবানন্দ জনাই 'বৈদান্তিক সেবক সঙ্ঘে'র নৈশ বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দকে পরিতোষিক বিতরণের জন্য গমন করেন। স্বামী বাসুদেবানন্দ 'সেবা ও শিক্ষা' সম্বন্ধে বক্তৃতা করার পর সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন—বন্যা-কার্য্য।

ইতিপূর্ব্বে সংবাদপত্রে মিশনের কার্য্যাবলী ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। গত ১৩২৫ সালের বন্যা অপেক্ষা এবারের বন্যা বেশী হইলেও জল খুব দ্রুত নামিয়াছে। পরিদর্শনে দেখা গিয়াছে—কোন কোন গ্রাম সম্পূর্ণরূপে ও কোন কোন গ্রাম আংশিক ভাবে জলসাৎ হইয়াছে। বিধ্বস্ত গ্রামের অধিবাসীরা রেল-লাইনের ধারে এবং পুকুরের পাড়ের উঁচু জমিতে যাইয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছে। কেহ কেহ সেখানে কুটির বাঁধিয়া অনেক দিন ছিল—কেহ বা জল কমিতেই গ্রামে আসিয়াছিল। গত বন্যায় আউশধান নষ্ট হইয়াছিল—আমন ডুবিয়াছিল; এবার আমন ডুবিয়াছে—কিন্তু আশুধান্য গৃহে উঠিয়াছিল।

মিশন হইতে প্রথমে গ্রামে তদন্ত করিয়া চাউল বিতরণ করা হয়। এই চাউল বিতরণ করিবার জন্য মিশন চারিটী কেন্দ্র—যথাক্রমে—দুবলহাটি, হাঁসাইগাড়ী, বলিহার ও শৈলগাছিতে খুলিয়াছিলেন। একমাস

চাউল বিতরণ হইবার পর—চাউল সাহায্য দেওয়ার প্রয়োজন না থাকায় চাউল বন্ধ করিয়া—গৃহ নির্ম্মাণের জন্য অর্থ-সাহায্য এবং পরিধানের বস্ত্র বিতরণ করিয়াছেন। তারপর যে সাহায্য পাইলে প্রজাগণের বিশেষ উপকার হইবে—সে সাহায্য সরকার রবিকৃষির বীজ দাদন দিয়া করিতেছেন—এবং কৃষককুলকে তাগাবি দাদন (Agricultural Loan) দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।—এ জন্য মিশনের গৃহ-নির্ম্মাণের সাহায্য এবং বস্ত্র বিতরণ শেষ হইলেই সেবকগণ বন্যাস্থান পরিত্যাগ করিবেন।

মিশনের বন্যা-কার্য্য শীঘ্রই বন্ধ হইবে। এখনও তহবিলে যথেষ্ট অর্থ আছে। সাধারণের সহানুভূতি ও সদহৃদয় দেশবাসীর বদান্যতার জন্য আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া জানাইতেছি যে, উপস্থিত আমরা আর অর্থ বা বস্ত্রের সাহায্য প্রার্থনা করি না।

বন্যা-কার্য্যের হিসাব সাধারণের অবগতির জন্য শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। ইতি

স্বাঃ সারদানন্দ

সেক্রেটারী, রামকৃষ্ণ মিশন।

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন।

আগামী পৌষ মাসে উদ্বোধনের ২৪শ বর্ষ শেষ হইয়া মাঘ মাসে ২৫শ বর্ষ আরম্ভ হইবে। অতএব গ্রাহকগণ যেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক পৌষ মাসের মধ্যে তাঁহাদের দেয় ২৫শ বর্ষের ২॥০ টাকা মণিঅর্ডার করিয়া পাঠান—নচেৎ ভিঃ পিঃতে পত্রিকা লইলে তাঁহাদের ভিঃ পিঃ ও রেজিষ্টারি খরচ অনর্থক বেশী পড়িবে। প্রায়ই ভিঃ পিঃর টাকা এখানে পাইতে দেরী হয় বলিয়া এবং অনেক সময়ে পোষ্ট আফিসের লেখা ভিঃ পিঃ ফরমে নাম অস্পষ্ট থাকাতে গ্রাহকদিগকে পত্রিকা পাঠাইতে অযথা বিলম্ব হয়। এই সব নানা কারণে মণি-অর্ডারে টাকা পাঠাইতে আমরা গ্রাহকদিগকে অনুরোধ করি। ইহাতে উভয় পক্ষেরই সুবিধা হইবে। পত্রাদি ও মণি-অর্ডারের সঙ্গে স্পষ্ট করিয়া গ্রাহক-নম্বর লিখিবেন।

ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ,

কার্য্যাধ্যক্ষ।

নরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণাষ্টকং

(শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়)

নিত্যো বিশুদ্ধো জগতাং ত্বমাদ্যো
হ্যচিন্ত্যোঽব্যয়োঽজস্ত্রিগুণৈঃ সুমুক্তঃ।
হে রামকৃষ্ণ হৃদয়াধিবাস
যাচে ত্বহং তে চরণারবিন্দম্ ॥ ১ ॥

সৃষ্ট্বা হি বিশ্বঞ্চ বিলাসি সর্ব্বম্
স্বলীলয়া হংসি পুনস্ত্বমেব।
হে রামকৃষ্ণ হৃদয়াধিবাস
যাচে ত্বহং তে চরণারবিন্দম্ ॥ ২ ॥

গৃহ্ণাসি রূপং নর-মীনবদ্বৈ
ত্বং দীনবন্ধো জগতো হিতার্থম্।
হে রামকৃষ্ণ হৃদয়াধিবাস
যাচে ত্বহং তে চরণারবিন্দম্ ॥ ৩ ॥

প্রখ্যাত-রূপং ধৃতবানসীতি
শ্রীরামকৃষ্ণস্ত্বধুনা ত্বমেব।
হে রামকৃষ্ণ হৃদয়াধিবাস
যাচে ত্বহং তে চরণারবিন্দম্ ॥ ৪ ॥

ত্যক্তাশ্চ যোষিদ্‌দ্রবিণাস্ত্বয়া বৈ,
সংস্থাপিতো ধর্ম্ম ইহ প্রধানম্।
হে রামকৃষ্ণ স্বদয়াধিবাস
যাচে ত্বহং তে চরণারবিন্দম্॥ ৫॥

ভক্তাশ্চ সর্ব্বে ত্বয়ি যে বিমুক্তা
দীনাতিদীনোঽস্মি ন ভক্তিযুক্তঃ।
হে রামকৃষ্ণ স্বদয়াধিবাস
যাচে ত্বহং তে চরণারবিন্দম্॥ ৬॥

মায়েন্দ্রিয়াসক্ত-গুণাদি-হীনম্
ত্বং মে প্রভুঃ শাধি চ মাং প্রপন্নম্।
হে রামকৃষ্ণ স্বদয়াধিবাস
যাচে ত্বহং তে চরণারবিন্দম্॥ ৭॥

বন্দেচ নিত্যং শুভদং সুহাসম্
জ্ঞান-প্রকাশং ভব-কৃচ্ছ্রনাশম্।
হে রামকৃষ্ণ স্বদয়াধিবাস
যাচে ত্বহং তে চরণারবিন্দম্॥ ৮॥

ওঁ শিবমস্তু ওঁ

কথা-প্রসঙ্গে।

প্রশ্ন হইয়াছে,—বেদ ব্যাসের পূর্ব্বে এবং বেদ-ব্যাস হইতে শঙ্করের মধ্যে কোনও উপনিষদ বা বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যা-কার বা ভাষ্যকার ছিলেন কিনা? শ্রীশঙ্কর বা শ্রীরামানুজ স্বপ্রণোদিত ভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন, না পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণ প্রদর্শিত পথাবলম্বনে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন? এবং এই ব্যাখ্যাদ্বয়ের কোনটী যথার্থ?

* * *

ব্যাস-রচিত ব্রহ্মসূত্র অধ্যয়ন করিয়া দেখা যায় যে, ব্যাসের পূর্ব্বেও বহু প্রাচীন ঋষিরা উপনিষদ বা বেদান্তের পদার্থ লইয়া বহু বিচার করিয়া গিয়াছেন এবং সাধারণ ও গুরুতর বিষয় লইয়া তাঁহাদের মধ্যেও যথেষ্ট মতভেদ ছিল। বাদরায়ণ সূত্রমধ্যে আত্রেয়, আশ্মরথ্য, ঔডুলোমি, কাষ্ণাজিনি, কাশকৃৎস্ন, জৈমিনি এবং বাদরি প্রভৃতি তৎপূর্ব্ব ব্যাখ্যা-কারগণের নামোল্লেখ করিয়াছেন।

* * *

ব্রহ্মসূত্রের ১ম অধ্যায়ে ৪র্থ পাদের ২০শ সূত্রে "আত্মনি বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি," "ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা" প্রভৃতি বৃহদারণ্যক-শ্রুতি পদ মীমাংসায় ব্যাসদেব তৎপূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্য আশ্মরথ্যের ভেদাভেদবাদ উল্লেখ করিয়াছেন। ভামতীকার বাচস্পতি মিশ্র ইহার কিঞ্চিৎ বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যেমন এক অগ্নি হইতে নিঃসৃত স্ফুলিঙ্গ একেবারে অগ্নি হইতে ভেদ নহে,—কারণ অগ্নির ধর্ম্ম তাহাতে বর্ত্তমান আছে; আবার একেবারে অভেদও নহে,—কারণ তাহা হইলে 'ইহা অগ্নি,' 'এইটী স্ফুলিঙ্গ' 'ইহা আর একটী স্ফুলিঙ্গ' এইরূপ নির্দ্দেশ করা যাইত না। পরমাত্মা কারণ—জীবাত্মা কার্য্য এবং ইহা পরমাত্মা হইতে একেবারে পৃথক হইলে পরমাত্মার ধর্ম্ম যে চৈতন্য তাহা জীবে বর্ত্তমান থাকিত না; আর একেবারে অভেদ হইলে প্রতি জীবাত্মার ভেদ এবং জীবাত্মা পরমাত্মার ভেদ নিরূপণ হইত না। জীবাত্মা

যদি পরমাত্মাই হয় তবে ত সে ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ তাহার প্রতি প্রত্যো-পদেশ কি? সেই হেতু জীবাত্মা পরমাত্মায় কোনও অজ্ঞাত কারণে ভেদ ও অভেদ উভয়ই আছে। ইহাই আশ্মরথ্যের ভেদাভেদবাদ। শঙ্করের শারীরক ভাষ্যে ইহা পূর্ব্বপক্ষ।

* * *

পর সূত্রে ঔড়ুলোমির মত আলোচিত হইয়াছে। জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইহা দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতির দ্বারা সঙ্কোচ প্রাপ্ত হইয়াছে। পুনশ্চ উহা পরমাত্মা সহিত অভেদ; কেননা জ্ঞান এবং ধ্যানের দ্বারা সে তাহার সকল কালুষ্য ত্যাগ করিয়া এই দেহাদি উপাধি হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া পরমাত্মার সহিত একত্ব প্রাপ্ত হয়, শ্রুতি ইহা বলিতেছেন, "এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায়, পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে" (ছান্দগ্য, ৮, ১২, ৩); "যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়। তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যং॥" পাঞ্চ-রাত্রিকেরাও ঔড়ুলোমির ব্যাখ্যাই গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারাও বলিয়া থাকেন মুক্তির পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ থাকে, মুক্তির পর সকল ভেদ অপসারিত হয়। ঔড়ুলোমির এই মতের নাম সত্য ভেদাভেদবাদ।

* * *

পরসূত্রে কাশকৃৎস্নের মত ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাঁহার মতে, জীবাত্মার সসীমতার মধ্যে পরমাত্মাই বর্ত্তমান। পরমাত্মাই জীবাত্মা-রূপে প্রতিভাত হইতেছেন মাত্র—বাস্তবিক ভেদ জীবাত্মা পরমাত্মায় নাই। শ্রুতি বলিতেছেন, "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" (ছান্দগ্য ৬, ৩, ২)—ইহাতে পরমাত্মার জীব ভাবে অবস্থানই বলা হইতেছে, জীবাত্মার পৃথক সৃষ্টির উল্লেখ নাই। "সর্ব্বাণি রূপাণি বিচিত্য ধীরো নামানি কৃত্বাভিবদন্যদাস্তে" (তৈত্তিঃ, আরণ্যক ৩, ১২, ৭)—সেই ধীর (পরমাত্মা) সকল নামরূপ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অবস্থান পূর্ব্বক তাহাদিগকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করিয়াছিলেন।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্যগণের প্রদর্শিত জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে স্বজাতীয় বা বিজাতীয় ভেদ এবং উপাধির সত্যতা (স্বগত ভেদ) স্বীকার করিলেই জীবাত্মার পরমাত্মারসহিত একত্ব সিদ্ধ হয় না। আর জীবাত্মা যদি সৃষ্ট বস্তু হয়, তাহার নাশও অবশ্যম্ভাবী ; কাজে কাজেই জীবাত্মার অমৃতত্বও অসিদ্ধ হয়। শ্রুতি অগ্নি ও স্ফুলিঙ্গ, সমুদ্র ও নদীর যে উদাহরণ দিয়াছেন, তাহা অলঙ্কারের দ্বারা জীবাত্মার অনিত্য, কল্পিত উপাধিকে বুঝাইবার জন্য মাত্র।

* * *

কাশকৃৎস্নের এই শুদ্ধাদ্বৈতবাদকেই শ্রীশঙ্কর শ্রুতিসম্মত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং তদুপযোগী বহু শ্রুতিমন্ত্র উদ্ধার ও ব্যাখ্যার দ্বারা এই মত সমর্থন করিয়াছেন। এই শ্রুতিগুলি এত অদ্বৈতপর যে পাঠ মাত্রই তাহার অবগতি হয়। যথা,—"ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা, (বৃ, ২, ৪, ৬)" "সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্, (ছা, ৬. ২, ১,)" "অত্মৈবেদং সর্ব্বং (ছা, ৭, ২৫, ২)" "নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা, (বৃ, ৩, ৭, ২৩)" "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং (মু, ২, ২, ১১)" "নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ (বৃ, ৩, ৮, ১১)।" ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করের ব্যাখ্যা সূত্র সম্মত কিনা এ বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে এবং অনেকে বলিয়াও থাকেন যে শ্রীভাষ্য যথার্থ সূত্রসম্মত, কিন্তু শারীরক ভাষ্য যে শ্রুতিসম্মত এ কথা আধুনিক সকল বিচারককেই স্বীকার করিতে হইবে।

* * *

সূত্রের ৪র্থ অধ্যায়ের ৪র্থ পাদে ৫ম ও ৬ষ্ঠ সূত্রে আত্মার স্বভাব নির্ণয় উপলক্ষে নানা মুনির মত উল্লেখ হইয়াছে। জৈমিনি বলেন জীবের যথার্থ স্বভাব ব্রহ্মেরই তুল্য।—সে স্বভাব কি ? তাহা "স আত্মাপহতপাপ্মা বিজরোবিমৃত্যুর্বিশোকোবিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ (ছান্দগ্য, ৮ ৭, ১)।" কিন্তু পরসূত্রে ঔড়ুলোমি বলিতেছেন, আত্মার স্বভাব একমাত্র চৈতন্য। অপহতপাপ্মাদি মাত্র শব্দবিকল্পজ। এবং ইহা শ্রুতি সম্মতও বটে, "এবং বা অরেঽয়মাত্মানন্তরোঽবাহ্যঃ

কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব" (বৃহ, ৮, ৫, ১৩)। এই ব্যাখ্যা বাদরায়ণ ও শঙ্কর সম্মত।

শঙ্করভাষ্য পাঠ করিতে করিতে আমরা বেদান্ত সূত্রের বৃত্তিকারের উল্লেখ পাই। এই বৃত্তিকার জ্ঞান-কর্ম্ম সমুচ্চয়বাদী ছিলে। আচার্য্য শঙ্কর ইঁহার মত খণ্ডন করিয়াছেন। এবং এই বৃত্তিকার ছাড়া তিনি অপর কোনও ব্যাসপরবর্ত্তী বেদান্ত ব্যাখ্যাকারগণের মত উল্লেখের দ্বারা নিজ মতের প্রাচীনত্ব প্রমাণ বা উহা সমর্থনের চেষ্টা করেন নাই এবং যেহেতু পরবর্ত্তী সম্প্রদায়েরা তাঁহাকে বিশেষ ভাবে কটাক্ষ করিয়াছেন। সূত্রের ১অ, ৩পা, ২৮ সূত্রের ভাষ্যে তিনি আর একজন আচার্য্যের নাম উল্লেখ করিাছেন। ইনি বৈয়াকরণ উপবর্ষ। শঙ্কর ইঁহার শব্দ-বিজ্ঞান খণ্ডন করিয়া স্ফোটবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

* * *

শ্রীরামানুজাচার্য্যের মতে শঙ্কর মত সূত্রসম্মত নয়, কারণ ব্যাস-পরবর্ত্তী আচার্য্যগণের মত তিনি খণ্ডন করিয়াছেন। শুদ্ধাদ্বৈতবাদ যদি ব্যাসসম্মত হইত তাহা হইলে কোনও না কোনও আচার্য্য তদনুযায়ী ব্যাখ্যা করিয়া যাইতেন। সেই হেতু তিনি বৃত্তিকার বোধয়নের নামোল্লেখের সহিত নিজ ভাষ্য আরম্ভ করিতেছেন, "ভগবদ্‌বোধায়নকৃতং বিস্তীর্ণং ব্রহ্মসূত্র বৃত্তিং পূর্ব্বাচার্য্যাঃ সংচিক্ষিপুঃ। তন্মতানুসারেণ সূত্রাক্ষরাণি ব্যাখ্যাস্যন্তে"। বেদার্থ সংগ্রহ নামক গ্রন্থে শ্রীরামানুজ বোধায়ন ছাড়া, টঙ্ক, দ্রমিড়, গুহদেব, কপর্দ্দিন্ এবং ভরুচি, এই সকল বেদান্তাচার্য্যগণের নাম নিজ মত সমর্থনের জন্য উল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে ভাষ্যকার দ্রামিড়াচার্য্য যে শঙ্করপূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন তাহা আমরা ছান্দগ্য উপনিষদের ৩ অ, ১০ খ, ৪র্থ মন্ত্র ভাষ্যের আনন্দ গিরির টিকায় দেখিতে পাই। টিকাকার বলেন যে ভাষ্যে আচার্য্য দমিড়াচার্য্যের উদ্ধিতিই করিয়াছেন মাত্র। এতদ্ব্যতীত সূত্রের ২ অ, ২ পা, ৪২ সূত্রে আচার্য্য ভাগবৎ বা পাঞ্চরাত্র দর্শনের দোষ দর্শন করাইয়াছেন, পক্ষান্তরে রামানুজ উহার সমর্থনই করিয়াছেন। এই হেতু এবং সূত্রার্থের সরল অনুবাদ গ্রহণ

করিলে শ্রীভাষ্য অধিক সূত্র-সম্মত বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু শারীরক ভাষ্য শ্রুতি-সম্মত। কারণ অদ্বৈতপর শ্রুতিসকলের কদর্থ না করিলে দ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় না (যেমন শূদ্রের বেদাধিকার নিরাশ করিতে গিয়া শঙ্কর "শূদ্র" শব্দের কদর্থ করিয়াছেন)। কিন্তু যদি শঙ্করের মায়াবাদ গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে নির্গুণ এবং সগুণ ব্রহ্মপর উভয় শ্রুতিই প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং শ্রুতিরও অযথা কদর্থ করিতে হয় না।

* * *

দ্বৈতবাদীদের আপত্তি—শঙ্করের 'মায়াবাদ' শ্রুতিতে কোনও উল্লেখ নাই এবং প্রাচীন বেদান্তের ব্যাখ্যাকার মহজ্জন কর্তৃক গৃহীত হয় নাই। একথা সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেও, ভারতীয় আধ্যাত্মিক "মনন" জগতে, যে পর্য্যন্ত বিকাশ হইয়াছিল তাহার অধিক আর বিকাশ হইবে না, এ কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। আমাদের বিশ্বাস আধ্যাত্মিক জগতের মনন-বিভাগে শারীরক ভাষ্য, অদ্যাবধি মানব জাতির মানসিক ক্রমবিকাশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্ত।

জ্ঞানী ও ভক্ত।

জ্ঞানী কহে নাই নাই এ জগৎ ভুল,
একমাত্র ব্রহ্ম সত্য সকলের মূল,
ভক্ত কহে সত্য সব নিত্য ভগবান্,
জগৎ জড়ায়ে সেযে সদা বিদ্যমান,
উভয়ের দ্বন্দ্বস্থলে কি বুঝিব তবে,
কোন্ পথ ঠিক, সত্য কে বলিবে ভবে॥
বিবেক "বলিছে মোর উপলব্ধি চাই,
নতুবা এ জ্ঞান, ভক্তি ভুল সব ভাই॥"

ত্যাগচৈতন্য

জীবন্মুক্তি বিবেক। *

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অশঙ্কিতোপসংপ্রাপ্তা গ্রামযাত্রা যথাধ্বগৈঃ।
প্রেক্ষ্যতে তদ্বদেব জ্ঞৈর্ভোগ শ্রীরবলোক্যতে॥ †

(স্থিতি প্রকরণ ২৩।৪২)

পথিকগণ যেরূপ পথে চলিতে চলিতে অচিন্তিতপূর্ব্ব কোনও গ্রামে উপস্থিত হইয়া গ্রামবাসীদিগের লোকযাত্রা-নির্ব্বাহ-প্রণালী দর্শন করে, জ্ঞানিগণ সেইরূপ (প্রারব্ধোপনীত) ভোগের বিচিত্রতাদর্শন করিয়া প্রীত হয়েন।

ভোগকালেও বাসনাযুক্ত ব্যক্তি ও বাসনাহীন ব্যক্তি এতদুভয়ের মধ্যে যে প্রভেদ লক্ষিত হয়, তাহাও বশিষ্ঠদেব বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—

নাপদিম্লানিমায়াতি হেমপদ্মং যথা নিশি
নেহন্তে প্রকৃতাদন্যদ্রমন্তে শিষ্টবর্ত্মনি॥ ‡

(স্থিতি প্রকরণ ৬১।২ —৩)

* "জীবন্মুক্তি বিবেকের অর্দ্ধেক অর্থাৎ ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম অধ্যায় অবশিষ্ট রহিল। অনুবাদ সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছে। নানা কারণে তাহা আর এ পত্রিকায় ছাপা হইবে না। বিদ্যারণ্য মুনির এই পরম উপাদেয় গ্রন্থের অনুবাদের পরিসমাপ্তি ও প্রকাশ বিষয়ে যদি কেহ আগ্রহান্বিত হয়েন তবে অনুগ্রহপূর্ব্বক অনুবাদককে ১৮নং কামাখ্যা লেন, সিটি বেনারাস— এই ঠিকানায় পত্র লিখিবেন। অনুবাদক সম্পূর্ণ গ্রন্থের মুদ্রন ও প্রকাশ বিষয়ে যত্নবান হইবেন।

বশম্বদ—শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

† মূলের পাঠ—"প্রেক্ষ্যন্তে তদ্বদেব জ্ঞৈর্ব্যবহার ময়াঃ ক্রিয়াঃ" "পূর্ব্বশ্লোকের শেষ চরণ ভোগশ্রীরবলোক্যতে" টীকাকার তাহার ব্যাখ্যায় বলিতেছেন "পুত্রধনাদিশ্রী"।

‡ মূলের পাঠঃ—৬১তম সর্গের দ্বিতীয় শ্লোকের শেষ দুই চরণ "নাপদা ম্লানিমায়াস্তিনিশিহেমাম্বুজংযথা" তৃতীয় শ্লোকের প্রথম দুই

স্বর্ণনির্ম্মিত পদ্ম যেরূপ রাত্রিকালেও ম্লান হইয়া যায় না, সেইরূপ (বাসনাহীন ব্যক্তি) * আপৎকালেও বিষণ্ণচিত্ত হন না, এবং উপস্থিত কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিয়া বিষয়ান্তরে রত হন না (অর্থাৎ তাৎকালিক কর্ত্তব্য বিস্মৃত হ'ন না) এবং প্রীতিপূর্ব্বক শিষ্টজনদিগের পন্থাই অবলম্বন করিয়া থাকেন ।

নিত্যমাপূর্ণতামন্তরক্ষুব্ধামিন্দু সুন্দরীম্ ।
আপৎস্বপি ন মুঞ্চন্তি শশিনঃ শীততামিব ॥ †
(স্থিতি প্রকরণ ৬১ ৪-৫)

রাহু কর্ত্তৃক গ্রস্ত হইলেও, কোন গ্রহণকালে চন্দ্র যেরূপ কর্পূরগৌর এবং অভ্যন্তরে অচঞ্চল স্বকীয় মণ্ডলের পূর্ণতা এবং শীতলতা পরিত্যাগ করেন না, বাসনাশূন্য ব্যক্তিও সেইরূপ কোনও বিপদে হৃদয়ের সত্ত্বগুণ সমুজ্জ্বল অক্ষুব্ধতা, অক্ষুদ্রতা ও শীতলতা (শান্তি) পরিত্যাগ করেন না ।

অব্ধিবদ্ধৃতমর্য্যাদা ভবন্তি বিগতাশয়াঃ ‡
(স্থিতি প্রকরণ ৬১।৭ প্রথমার্দ্ধ)

নিয়তিং ন বিমুঞ্চন্তি মহান্তো ভাস্করা ইব ॥
(স্থিতি প্রকরণ ৪৬।২৮ শেষার্দ্ধ)

সমুদ্র যেরূপ কোন অবস্থাতেই আপনার বেলা (জলোচ্ছ্বাসের সীমা) লঙ্ঘন করে না সেইরূপ যাঁহারা সকল বাসনা পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারাও কোনও অবস্থাতে শিষ্ট ব্যবহারের নিয়ম পরিত্যাগ করেন না, এবং সূর্য্য যেমন রাহু দ্বারা বিপন্ন হইলেও, নিয়ত যথা সময়ে

চরণ—"নেহস্তে প্রকৃতাদন্যৎ তেনান্যৎ স্থাবরো যথা" তৃতীয় চরণ "রমন্তে স্বসদাচারৈঃ ।"

* মূলানুসারে কিন্তু এস্থলে রাজস সাত্ত্বিক অর্থাৎ প্রাক্তন কর্ম্মোপাসনা বশতঃ পৃথিবীতে জাত ব্যক্তিগণ এইরূপ বুঝিতে হইবে ।

† মূলের পাঠ—৪র্থ শ্লোকের প্রথম চরণ "নিত্যমাপূর্য্যতাং যাতি সুধায়ামিন্দু সুন্দরীম্" ৫ম শ্লোকের প্রথম দুই চরণ "আপৎস্বপি ন মুঞ্চন্তি শশীবচ্ছীতত্তামিব" ।

‡ মূলের পাঠ —"ভবন্তি ভবতা সমাঃ" ।

উদয়ের ও অস্তগমনের নিয়ম পরিত্যাগ করেন না, সেইরূপ মহাত্মাগণ প্রারব্ধ ভোগ পরিহারের ইচ্ছাও করেন না (অথবা যথাপ্রাপ্ত কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করেন না)'; রাজা জনক সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইয়া এইরূপ ব্যবহারই করিয়াছিলেন—একথা (উপশম প্রকরণের দশম ও একাদশ অধ্যায়ে) দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—

তুষ্ণীমথ চিরং স্থিত্বা জনকো জনজীবিতম্ *।
ব্যুত্থিতশ্চিন্তয়ামাস মনসা শমশালিনা॥ ২০॥

অনন্তর রাজা জনক অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিবার পর ব্যুত্থিত হইয়া শমগুণযুক্তচিত্তে প্রাণিগণের জীবন ধারণের মূলকারণের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

কিমুপাদেয়মস্তীহ যত্নাৎসংসাধয়ামি কিম্। † (২১ শেষার্দ্ধ)
স্বতঃস্থিতস্য শুদ্ধস্য চিতঃ কা মেঽস্তি কল্পনা॥ (২৩ শেষার্দ্ধ)

এই সংসারে গ্রহণযোগ্য বস্তু কি আছে? অর্থাৎ কোন বস্তুই নাই। চেষ্টা করিয়া আমি কোন্ বস্তুলাভ করিব? অর্থাৎ কিছুই নহে। স্বরূপে অবস্থিত শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ আমাতে কি কল্পনা আছে? (অর্থাৎ কিছুই নাই)।

নাভিবাঞ্ছাম্যসংপ্রাপ্তং সম্প্রাপ্তং ন ত্যজাম্যহম্।
স্বস্থ আত্মনি তিষ্ঠামি যন্মমাস্তি তদস্তু মে॥ ২৪॥

আমি অপ্রাপ্তবস্তুর জন্য আকাঙ্ক্ষা করি না, এবং প্রাপ্ত বস্তুকেও পরিত্যাগ করি না। আমি অক্ষুব্ধ আত্মভাবে অবস্থিত আছি। যাহা আমার জন্য প্রারব্ধোপনীত হইবে, আমার তাহাই হউক। অথবা

---

* মূলের পাঠ—"ক্ষণং স্থিত্বা" "পুনঃ সঞ্চিন্তয়ামাস"
টীকাকার মূলের "জনজীবিতাং" ব্যাখ্যা কালে, তৈত্তিরীয় শ্রুতি "যেন জাতানি জীবন্তি" উদ্ধৃত করিয়াছেন।

† মূলের পাঠ (২১ শেষার্দ্ধ) "সংসাধয়াম্যহম", ও ২৩ শেষার্দ্ধ—"সমাহিতস্য শুদ্ধস্য চিতঃ কা নাম মেঽক্ষতিঃ"? টীকাকার সমাহিতস্য শব্দের ব্যাখ্যায় বলিতেছেন—দেহের চলন ও অচলন উভয় অবস্থাতেই তুল্যরূপে অবস্থিত। 'চিতঃ'—চিন্মাত্র স্বভাব আমার।

আমার যে নিরতিশয়ানন্দরূপে আভ্যন্তর স্বরূপ, তাহাই আমার থাকুক, বাহ্য কিছুই প্রয়োজন নাই।

ইতি সঞ্চিন্ত্য জনকো যথাপ্রাপ্তিক্রিয়ামসৌ।
অসক্তঃ * কর্ত্তুমুত্তস্থৌ দিনং দিনপতির্যথা ॥ ১১শ অধ্যায়। ১॥

রাজা জনকও এইরূপ চিন্তা করিয়া সূর্য্য যেরূপ অনাসক্তভাবে জগতের দিবস সম্পাদন করিতে উত্থিত হয়েন, সেইরূপ অনাসক্তভাবে উপস্থিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনের নিমিত্ত গাত্রোত্থান করিলেন।

ভবিষ্যন্নানুসন্ধত্তে নাতীতং চিন্তয়ত্যসৌ
বর্ত্তমাননিমেষন্তু হসন্নেবানুবর্ত্ততে ॥ ১২শ অধ্যায়। ৫। †

ভবিষ্যতে (রাজা জনক) কি ঘটিবে তাহার অনুসন্ধান করেন না এবং যাহা অতীত হইয়াছে তাহারও স্মরণ করেন না। যেন হাসিতে হাসিতে অর্থাৎ কেবল সানন্দচিত্তে বর্ত্তমান মুহূর্ত্তেরই অনুসরণ করেন।

অতএব এই প্রকারে বাসনা ক্ষয় করিলে পূর্ব্ব-বর্ণিত জীবন্মুক্তিলাভ হয়, ইহাই সিদ্ধ হইল।

ইতি শ্রীমদ্বিদ্যারণ্য প্রণীত জীবন্মুক্তিবিবেকে বাসনাক্ষয় নিরূপণ নামক দ্বিতীয় প্রকরণ সমাপ্ত।

* অসক্তবাদের ব্যাখ্যায় টীকাকার লিখিতেছেন :—'কর্তৃত্বাভিমান ভোক্তৃতাভিমানরূপ আসক্তিরহিত।'

† টীকাকারের ব্যাখ্যা এই শ্লোকে বাসনাক্ষয়ের ফল উক্ত হইয়াছে—বাসনা অর্থাৎ সংস্কার বশতঃই লোকে অতীত ভবিষ্যতের অনুসন্ধান করিয়া থাকে। সেই হেতু অতীতকালে যাহারা অনিষ্ট করিয়াছে তাহার প্রতি দ্বেষ, এবং ভবিষ্যতে যাহা হইতে আনুকূল্য পাওয়া যাইবে তাহার প্রতি আসক্তি জন্মে, এবং তাহা হইতে প্রবৃত্তি জন্মে, এইরূপ অনর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা ঘটে। কেবলমাত্র বর্ত্তমানের দর্শন বলিলে অপ্রিয়েরও অনুসন্ধান বুঝায় না—কেন না (দর্শক) দুঃখকে উপেক্ষা করিতে শিখিয়াছেন। এইরূপ।

পূজার আয়োজন।

(গল্প)

(শ্রীঅজিতনাথ সরকার)

(২)

"বর্ষিযার রিমিঝিমি অবসানের সঙ্গে দেয়ার গুরুগম্ভীর গর্জ্জন নিস্তেজ হইয়াছে! প্রকৃতির সুশ্যাম মাধুরিমা মাখা নবীন ও সজীব কান্তি প্রাণ মন্দিরের শূন্য ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া যেন চেতনার অগোচরে অপ্রার্থীতের অজানা প্রার্থনা মিটাইয়া দিতেছে! দারুণ জ্বালা—অশান্তি দিবারাত্র যেন সংসারের সকল সুখ পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিতেছে; এমন সময় ঐ আড়ম্বরহীন—মূল্যহীন শুধু কতকগুলা গাছ পাথর আর বৃক্ষ-লতার রূপের মোহ চক্ষে কি অঞ্জন ঢালিয়া দিল যে, পলক-হীন নয়ন তার কাছে নীরবে বাঁধা দিল? আমাদের এত বুদ্ধি, এত চিন্তা, এত শক্তিকে পরাজিত করিয়া চিরদিনই কি তবে ঐ রাজ্যের বিজয় পতাকাই উড়িতে থাকিবে? কেন এমন হয়? কেহ কি ইহার সদুত্তর দিতে পারে না? যে, প্রকৃতির কত কল্পনাতীত অসীম শক্তিকে আপন আবাসে বাঁধিতে সমর্থ হইয়াছে—সেও ত' দেখি বাহিরে আসিয়া আমারই মত শক্তিহারা দিশেহারা হইয়া মুগ্ধ প্রাণে আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে! কেন এমন হয়? এই চির মুক্ত অথচ চিরগোপন—চির হাস্যময় অথচ চিরগম্ভীর—চিরস্থির আবার চির-চঞ্চল অজ্ঞেয় রাজ্যের কোথায় কি শক্তি লুক্কায়িত আছে, যাহার অন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না? এই মহান্ ঐশ্বর্য্য পূর্ণ রাজ্যের রাজাই বা কে? কে সেই অনন্ত মহিমাময়? যাঁহার বিশাল রাজ্যের এক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ক্ষুদ্রতম অংশে কত সংখ্যাতীত প্রহেলিকাময় জীব লীলার সৃষ্টি হইয়া নিমিষে কোথায় মিলাইয়া যাইতেছে? না কিছুই বুঝিলাম না! কে তুমি গো অন্তরালের রাজা!

কে তুমি গো অসীম সাম্রাজ্যের অসীম অধীশ্বর! তোমায় কি কখনও দেখা যায় না?"

"ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র—কীটানুকীট মহা পারাবারের অন্ত কেমন করিয়া পাইবে?"

উত্তর শুনিয়া বক্তা কাঁপিয়া উঠিল। পরে ভাবিল,—"তুমিও কথা কও? নতুবা কে এই উত্তর দাতা?" ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল, কিছুই দেখিতে পাইল না।

আবার চিন্তা—চিন্তার পর চিন্তা—পুঞ্জীভূত চিন্তার অদম্য চাপ মস্তিষ্ক প্রপীড়িত করিয়া তুলিল, তবুও বিরাম নাই; আবার বলিল— "ওঃ! কেবলই রহস্য! দুর্জ্ঞেয় প্রহেলিকা কেন আমার পিছনে পিছনে দিবারাত্র ছুটিতে থাকে? কিছুই যে বুঝিলাম না!" বলিয়া সেই প্রিয়দর্শন যুবক সেখান হইতে উঠিয়া ধীরে ধীরে বেড়াইতে লাগিল। স্নিগ্ধ প্রভাতানিল প্রস্ফুটিত পুষ্প-বাথিকা হইতে মনোহর গন্ধ হরণ করিয়া আনিয়া যেন তাঁহার সুকোমল অঙ্গে স্নেহের স্পর্শ বুলাইতে লাগিল— তিনি একটু প্রকৃতস্থ হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে কোন নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে সুমিষ্ট স্বর তাঁহার মনোযোগ আবার আকর্ষণ করিল। তিনি স্বর লক্ষ্য করিয়া আরও নিকটবর্ত্তী হইলে শুনিতে পাইলেন, কোন স্ত্রীলোক অতি ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে—করুণ স্বরে গাইতেছে,—

"প্রলয় পয়োধিজলে ধৃতবানসি, বেদং,
বিহিত বহিত্র চরিত্রমখেদং,—
কেশবধৃতমীন-শরীরজয়জগদীশহরে।"

"আহা কি মধুর! এমন ত কখন শুনিনি! এ স্তোত্র ত কতদিন কত ওস্তাদের গলায় শুনেছি—কিন্তু এত ভাল লেগেছিল বলে' ত মনে হয় না! আজ সেই চিরপরিচিত 'জয়দেব' কবির বন্দনা গান আমায় এমন শান্তি কি করে' দিল? কে এই গায়িকা?" বলিয়া তিনি আরও সরিয়া গেলেন এবং দেখিতে পাইলেন—একটী ক্ষুদ্র ঝরণার পাশে বসিয়া একটী স্ত্রীলোক ঐ স্তোত্রের আবৃত্তি করিতেছেন। একি দেখিলেন! প্রথমে বিশ্বাস হইল না—আবার ভাল করিয়া দেখিলেন।

গায়িকা স্নানান্তে পূর্ব্বাস্যে বসিয়া ভক্তি-উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে—তন্ময়চিত্তে বন্দনা গান গাহিতেছেন। যুবকের মাথা ঘুরিতে লাগিল—তিনি বসিয়া পড়িলেন এবং একটু স্থির ভাবে দেখিলেন যে, গায়িকা সন্ন্যাসিনী! তাঁহার পরনে গেরুয়া, মস্তকের সদ্যস্নাত কেশরাশি অবিন্যস্ত ভাবে পিঠের উপর এলাইয়া পড়িয়াছে। একে তাঁহার তপ্ত-কাঞ্চনোজ্জ্বল-বর্ণ—তাহার সঙ্গে মিশিয়াছে, রক্ত-রাগ-রঞ্জিত-গেরুয়া—আর প্রভাত-তপনের রক্তিমাভ তরুণ-রশ্মি! যুবক দেখিলেন,—আলোক সাগরের সঙ্গে রূপসাগরের কি অপূর্ব্ব মিলন! প্রাতঃসূর্য্যের স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তির সঙ্গে অঙ্গ দীপ্তির কি আশ্চর্য্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা! সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি প্রভাত সঙ্গীত মুখরিতা বীণা-ধ্বনি জিনিয়া বন্দনা গীতি কি প্রাণমাতান মাধুর্য্য-ময়ী! তিনি সেই স্থানের বৃক্ষান্তরাল হইতে সেই অদৃষ্ট-পূর্ব্ব সম্মিলন প্রাণ ভরিয়া দেখিতে লাগিলেন—চিন্তা করিতে লাগিলেন: কঠিন জড়োপাসকের বিশুষ্ক হৃদয় পূর্ব্বেই কি জানি এক আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল,—আর আজ? আজ সেই সম্মিলনের প্রয়াগ-ক্ষেত্রে সব শক্তি গলিয়া তরল হইয়া গেল। তাঁহার আজন্ম স্বাধীন প্রাণ ক্রমে ক্রমে অজ্ঞাত ভাবে কোন অদৃশ্য মহাশক্তির নিকট আত্মবিক্রয় করিয়া বসিল! ভাবিলেন,—"মরি মরি! ব্রহ্মচর্য্যের কি মহিমাময় জ্যোতিঃ। রিক্ততার কি পরিপূর্ণ সন্তোষ! আজন্ম বিলাস-বর্দ্ধিত চির আদরের সুকোমল দেহে ঐ সৌন্দর্য্য কোথায়? রত্নপূর্ণ কুবেরের পুরীতে ঐ ভিখারিণীর নিঃসম্বলতার সম্পদ কোথায়? আমার সর্ব্বতোমুখী পরিপূর্ণতা আজ উহার কাছে অপূর্ণতার দৈন্যে মলিন হইয়া যাইতেছে কেন? কি ধন আছে ঐ ভাণ্ডারে? কে গো তুমি গৌরবময়ি! তোমার শুধু মলিন গেরুয়া আর ভস্মাচ্ছাদিত দীপ্তি যে আমার অতুল সম্পদকে উপহাস করিতেছে! কি পরশমণি লুকিয়ে রেখেছ তুমি?"

তার পর সেই সন্ন্যাসিনী আপনার সম্বল, একটী পাতা দিয়া ঢাকা ছোট পুঁটুলি—বোধ হয় কিছু ফলমূল লইয়া সেস্থান হইতে উঠিলেন, এবং যেখানে পূর্ব্বোক্ত যুবক বসিয়াছিলেন, সেই দিকে আসিতে আরম্ভ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটী গানও ধরিলেন,—

"হরি তোমাতে আমাতে শুধু মুখেরি কথাতে হবে কিগো পরিচয় ?
আমার ষোলআনা প্রাণ, সংসারেতে টান, লোক দেখান ডাকি।
কোথা দয়াময় !"

ইহারই মধ্যে তিনি যুবকের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং গান বন্ধ করিয়া একটু দূরে দাঁড়াইলেন। যুবকও তাঁহাকে দেখিয়া চকিতের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তারাপর সন্ন্যাসিনীই প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলেন, —"আপনি এখানে ?" যুবক যেন আবেগ-বিহ্বল হইয়া ঈষৎ কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন,—

"আপনি কি আমায় চিনেন ?" "হাঁ—আপনিই একটু আগে পাহাড়ের ঐ দিক্‌টায় বসেছিলেন না ?" "হতে পারে—হাঁ বোধ হয় আমিই ছিলাম।"

"এখন কি আপনি বেশ সুস্থ ? তখন যেন আপনাকে একটু অপ্রকৃতিস্থ বলে বোধ হয়েছিল। আমি ঐদিকে কিছু ফুলের সন্ধানে গিয়েছিলাম,—তারপর—বোধ হয় আপনার মনে থাকতে পারে—আমি আড়াল থেকে একটা কথার জবাব দিয়েছিলাম। কথাটা বলে কিছু অন্যায় করেছি কিনা জানি না"।

"হাঁ আমার বেশ মনে আছে—আপনিই সেই উত্তর দিয়েছিলেন ?" বলিয়া যুবক সন্ন্যাসিনীর পানে জিজ্ঞাসুভাবে অবাক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। সন্ন্যাসিনী আর কিছু না বলিয়া একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানের দিকে চলিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকেও আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। একটী ক্ষুদ্র পথ নিঃশব্দে অতিক্রম করিয়া তাঁহারা অপেক্ষাকৃত একটু খোলামাঠে আসিলেন। সেখানে সন্ন্যাসিনীর আসন ইত্যাদি আরও কয়েকটী নিতান্ত আবশ্যকীয় দ্রব্য একটী বটগাছের গোড়ায় রাখা ছিল ; কাজেই এই পর্য্যন্ত আসিয়া তিনি একটা ছোট পাথরের উপর বসিয়া পড়িলেন এবং তাঁহার নির্দ্দেশ-অনুসারে যুবকও বসিলেন। আবার কথা আরম্ভ হইল।

যু—"আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, উত্তর দিবেন কি ?"

স—"উত্তর দিব না কেন ? আপনি বলুন—যথাসাধ্য উত্তর নিশ্চয়ই

দিব, কিন্তু তার পূর্ব্বে আমার অনুরোধ আপনি কিছু খান। আপনাকে বড় ক্লান্ত বলে বোধ হচ্ছে। আমার কাছে ফলমূল আছে, কিছু দিব কি?"

যু—"না—আমি কিছু খাব না। কেবলমাত্র কথাটার জবাব পেলেই—"

স—"কেন জবাব পেলেই কি আপনার খাওয়ার কাজ হয়ে যাবে?"

যু—"না—তানয়—তবে এত সকালে খাবার কিছু দরকার নেই। আর আমি এখন কিছু বেশী দূর থেকে আসিনি যাতে ক্লান্ত হয়ে পড়ব!"

স—"বেশ তবে, বলুন কি কথার জবাব চান?"

যু—আপনি কখন কি 'বক্রেশ্বর'* বলে একটা ছোট পীঠ স্থানে গিয়াছেন?"

স—"আমাদের যাওয়া আসার কিছু ঠিক নেই—ভগবান্ যখন যেখানে নিয়ে যান সেই খানেই যাই। হয় ত গিয়ে থাকব।"

যু—"তারপর—আপনি অসন্তুষ্ট হবেন না, আর একটা কথা বলি,—আপনি কি কখন বীরভূম জেলার উত্তর পূর্ব্ব সীমায় বিজয়পুর নামে একটা গ্রামে গিয়েছেন? আজ অল্প দিন হ'ল, সেখানে একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমাদেরই চণ্ডীমণ্ডপে একজন সন্ন্যাসিনীকে অতি অল্পক্ষণের জন্য দেখেছিলাম। অবশ্য তাঁর চেহারার বিষয়টা ঠিক বলা যায় না, কারণ তখন প্রায় রাত্রি হয়ে' এসেছিল। কিন্তু আমার মনে হয়, তাঁর সঙ্গে যেন আপনার চেহারার মিল আছে।"

সন্ন্যাসিনী একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"আগেই ত বলেছি আমাদের কিছু স্থিরতা নাই—মালিক যখন যেখানে নিয়ে যান সেই-খানেই যাই।"

যু—"আচ্ছা—আপনার পরিচয় কি কিছু জানতে পারি না?"

স—"সন্ন্যাসিনীর আর পরিচয় কি? ওই অসীম ভূমণ্ডল—পর্ব্বত—অরণ্য সবই তার বাড়ী আর সকলেই তার আপনার জন!"

* বীরভূম জেলার অন্তর্গত। এখানে উষ্ণপ্রস্রবণ ইত্যাদি আছে সংপ্রতি পীঠস্থান বলিয়া খ্যাত।

এই কথা বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন—একটী ক্ষুদ্র দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সহিত "দয়াময়" নামটী অতি অস্পষ্টভাবে উচ্চারিত হইল; সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডল আরক্তিম ও চোখের পাতা যেন ভিজিয়া আসিল। তিনি আর অপেক্ষা করিলেন না, নিমিষে সেস্থান হইতে অদৃশ্য হইলেন। যুবকও একটু বিস্মিত হইয়া বিমর্ষভাবে সেস্থান ত্যাগ করিলেন। সমস্ত পথ বিপুল উৎকণ্ঠার রুদ্ধবেগ তাঁহার মনের ভিতরটা তোলপাড় করিতে লাগিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—"কে এই সন্ন্যাসিনী? কে এই প্রহেলিকাময়ী? ইনিই কি সেই বক্রেশ্বর মেলার ভৈরবী দেবী? ইনিই কি সেই বিজয়পুরের শূন্য পূজা-মন্দিরের ভিখারিণী—গোধূলি-ধূসরা সন্ধ্যাদেবী? হাঁ সেই বৈ কি? সেই বেশভূষা,—সেই কণ্ঠস্বর,—রিক্ততার মাঝে সন্তোষের সেই পরিপূর্ণ অমূল্য সম্পদ,—ঐশ্বর্য্য-মদ-গর্ব্বিত অযাচিত অনুগ্রহ দানে উপেক্ষার সেই অতুলনীয় তেজোগরিমা,—সবই ত সেই! কিন্তু কে এই ভিখারিণী—কে এই সম্পদের রাণী? ওগো কে তুমি [illegible] রাজেশ্বরী! তোমার পরিচয় কি কখনই পাব না? আর কতদিন তুমি আমায় তোমার ইচ্ছার দাস করে' শি[illegible]র মত ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াবে?"

(ক্রমশঃ)

মুক্তি

সবাই খুঁজিছে মুক্তি—
　　　মুক্তি কাকে কয়
বাসনা বিলয়ে মুক্তি
　　　জানিহ নিশ্চয়।

ত্যাগচৈতন্য

স্বামি প্রেমানন্দের উপদেশ। *

(বেলুড় মঠের ব্রহ্মচারীদিগের প্রতি)

[সময়—শুক্রবার ৫ই ডিসেম্বর, ১৯১৫, রাত্রি ৮ ঘটিকা।

স্থান—বেলুড় মঠ।]

"শ্রীশ্রীঠাকুরের মতন পবিত্র লোক জগতে এ পর্য্যন্ত জন্মান নি। অপবিত্র লোক্‌কে তিনি ছুঁতে পারতেন না, কেউ ছুঁলে, আঁ—ক্‌ ক'রে চেঁচিয়ে উঠ্‌তেন। পবিত্রতাই ধর্ম্ম—পবিত্রতাই শক্তি। তিনি পবিত্র-ঘন-মূর্ত্তি ছিলেন। তোরা সব তাঁর আদর্শ সাম্নে রেখে মনকে পবিত্র ক'রে ফেল। মনেতে যখনই কাম-কাঞ্চন, দ্বেষ-হিংসা, স্বার্থপরতা, ঢোক্‌বার চেষ্টা করবে, তখনই ঠাকুর-স্বামীজিকে স্মরণ করে, খুব রোক্‌ ক'রে ঐ সব অপবিত্রতাগুলোকে দূর্ দূর্ ক'রে তাড়িয়ে দিবি। মনের দরজার কাছে জ্ঞান প্রহরীকে সর্ব্বদা বসিয়ে রাখ্‌বি—খবরদার, অপবিত্র ভাব যেন মনেতে ঢুক্‌তে না পারে। এই রকম ক'রে জীবনটা গ'ড়ে ফ্যাল দিকি, দেখ্‌বি, তোদের ভেতর কি অনন্ত শক্তি রয়েছে! "Blessed art the pure in heart for they shall see God."

* * * *

"ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা তো অনেকে দিচ্ছে আর পুঁথিতেও লিখ্‌ছে, কিন্তু ক'টা লোক তা নিচ্ছে? প্রাণের ভিতরে না বিঁধে গেলে কেউ নেয় কি?' জীবন দিয়ে দেখিয়ে দাও, তবে লোকে তোদের কথা শুন্‌বে। আমি জীবন চাই—জ্বলন্ত জীবন। তোদের মুখ বন্ধ হোক্‌, কাজ কথা বলুক। কথা না ব'লে, কাজে দেখা, তোরা কার সন্তান! মা ব্রহ্মময়ীর বেটা,—ঠাকুর স্বামীজির সন্তান তোরা, পার্থিব নাম যশ তোদের হাক্‌ থু হ'য়ে যাক্‌—লোকে ভাল বল্‌বে কি মন্দ বলবে সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে হৃদয়-মনকে পবিত্র ক'রে তাতে মাকে ও

* ২০ বর্ষ একাদশ সংখ্যার পর। জনৈক ব্রহ্মচারীর ডাইরী হইতে।

ঠাকুরকে বসিয়ে তাঁদের যন্ত্রস্বরূপ হ'য়ে নীরবে মন-মুখ এক ক'রে কাজ ক'রে যা। এটা (মঠ) হৈ হৈ করবার যায়গা নয়, প্রকৃত মানুষ তৈ'রী করবার জন্যেই স্বামীজি গ'ড়ে গেছেন। ধর্ম্মহীন, চরিত্রহীন শুধু পুঁথিগত বিদ্যায় মানুষ তৈ'রী হয় না। এখান থেকে শিক্ষা শেষ করে যারা পাশ হ'বে, তারাই জগতে চরিত্রবান, আদর্শ পুরুষ।

* * * *

"ঠাকুর যখন দেহ রাখ্‌লেন, আমাদের জন্য কি রেখে গেছ্‌লেন? কিছুই না—একরকম 'গাছতলায় ক'টা ছোঁড়াকে বসিয়ে রেখে গেছ্‌লেন। স্বামীজি কি সে সময়ে অবতার ব'লে প্রচার কর্ত্তে পারেন না? তিনি বল্লেন, "বক্তৃতা না দিয়ে, জীবন দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে তিনি অবতার কি না।"

* * * *

"প্রত্যেক অবতারই পূর্ণ হ'য়ে আসেন। যে যেটি দরকার সেই রকমেই তাঁকে প্রচার কর্ত্তে হয়। খাঁটি সোনায় গড়ন হয় না, তাই ঠাকুর নিজে প্রচার কর্ত্তে পারেন নি। খুব উচ্চ আধার দেখে স্বামীজিকে শিক্ষা দিয়ে, ঐ প্রচার ভার তাঁকে দিয়ে গেছ্‌লেন কই রামলাল দাদা (?)কে তো আমাদের দেখবার ভার দিয়ে যান নি

* * * *

"নরেনকে (স্বামিজি) এতো ভাল বাসতেন ব'লে, অনেকে বলিত, "আপনিও জড় ভরতের মতন 'নরেন' ভেবে ভেবে [illegible] যাবেন শেষে।' ঠাকুর বল্লেন, 'কই! আমি কি [illegible] ভাবি, ও অমুকের ছেলে, অমুক যায়গায় [illegible], বিয়ে আছে, [illegible] বাজাতে পারে?—সাক্ষাৎ শিব, জীব শিক্ষার জন্য [illegible] এসেছেন, মা আমায় দেখিয়ে দিয়েছেন। ওদের খাওয়ালে [illegible] সাধু ভোজনের ফল হয়।'

* * * *

"ঠাকুর আমাদের 'চৈতন্য চরিতামৃত', 'চৈতন্য চন্দ্রোদয়' এই সব ভক্তিগ্রন্থ পড়্‌তে উৎসাহ দিতেন; কিন্তু আবার মাঝে মাঝে বল্‌তেন,

'ও সব এক ঘেঁয়ে।' ঠাকুরকে যদি না দেখ্‌তুমি, শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা কি বুঝতে পারতুম্? ঐ সব লোচ্চামিগুলোকে মনে কর্ত্তুম, 'তেজীয়সাং না দোষায়।'" ভাগ্যিস্‌ তাঁর কৃপা পাই, তবে তো ঐ সব ঠিক ঠিক বুঝি। অপবিত্র গৃহস্থ-লোকেরা রাসলীলার কি বোঝে? তাদের কাছে ওসব বক্তৃতা দিতে নেই। যারা সম্পূর্ণ পবিত্র-লোক তারাই ঐসব শু'নবার অধিকারী, অপবিত্র লোকে শুনলে তাদের অমঙ্গল হয়। তোদের শ্রীকৃষ্ণ বুঝি শুধু বাঁশি হাতে ক'রে সারাদিন, সারা জীবন ধিতিং ধিতিং করে নেচেছিলেন? ভক্ত হ'লেই কি খালি বাঁশি হাতে-করা কৃষ্ণকে ভাবতে ও তাঁর নাচ দেখ্‌তে হবে? ও কি ও! ঠাকুর ওসব এক ঘেঁয়ে ভাব ভাল বাসতেন না। ডাকাতে ভক্তির উপমা দিতেন। একজন নিজে বৈষ্ণব, জীব হিংসা করেন না পরম ভক্ত, কিন্তু অর্জুন, প্রহ্লাদ ও দ্রৌপদী এই তিন জনের উপর খড়্গহস্ত; সে গল্প শুনেছিস তো?

* * *

"ঠাকুরের পবিত্রতার কথা জানিস তো? লুকিয়ে তাঁর বিছানায় টাকা গুঁজে রাখ্‌লে, দেখেছি কাছাকাছি গিয়ে আর বিছানায় বস্‌তে পাচ্ছেন না! আর সেই আপিমের দরুন পথ ভুলে যাওয়া! এ সব কি আর সাধারণ মানুষের ধারণা হয়? আমরা তাঁর আদর্শ জীবন দেখেছি বলেই তো তোদের জোর করে বলতে পাচ্ছি। যত অবতার এ পর্য্যন্ত এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ঠাকুরই শ্রেষ্ঠ, আমার মনে হয়—এতে আমাকে গোঁড়াই বল্ আর যাই বল্। তাঁদের তো আর চোখে দেখিনি, বইয়ে পড়ামাত্র, যাঁকে চাক্ষুষ দেখেছি, এক সঙ্গে থেকেছি, তাঁর ভাব যত impressed হয়, বইএ প'ড়ে কি আর তত হয়! আমি কাহাকেও নিন্দা কচ্ছি না। তাঁরা সকলেই আমার মাথার মণি। * *

* * *

"গৌরাঙ্গের একঘেঁয়ে সেই ভক্তি, শঙ্করের জ্ঞান, বুদ্ধের হৃদয়। এবার ঠাকুরের তা নয় বাবা,—একাধারে জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম— 'যত মত তত পথ'। তবে জ্ঞানের প্রকৃত অধিকারী খুব কম ব'লে, "রামকৃষ্ণ" কথামৃতে ভক্তির কথাই বেশী। সকল ধর্ম্মের, সকল সম্প্রদায়ের

লোক্‌কেই বল্‌ছেন—'এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও—চন্দন কাঠের পর তাঁবার খনী, তারপর রূপোর খনী, তারপরসোণা হীরে ইত্যাদি। খালি এগিয়ে যাও—ধর্ম্মরাজ্যের ইতি নেই। সাকার, নিরাকার, সগুণ, নির্গুণ—যার যা পথ, যার যা রুচি।' একনিষ্ঠার সহিত সেইটে ধরে এগিয়ে যাও—কেবল এগিয়ে যাও। পথ নিয়ে গোল ক'রো না—লক্ষ্যের দিকে এগোও। সেখানে একবার জো সো ক'রে পৌঁছুলে আর গোল থাকবে না।

*　　*　　*

"ঠাকুরের সব ভাব নিতে পাল্লে না ব'লে * * দল বেঁধে গেল। ঠাকুর বলতেন গেঁড়ে ডোবায় দল বাঁধে—তোরা, খবর্দ্দার খবরদার, "দল" বাঁধিস নি, তা' হ'লে 'ঠাকুরের ভাব আর থাকবে না,'—এখন এ দল কি বুঝলি? যেমন একদল বলছে, "পুতুল পূজো ক'রো না, গঙ্গাস্নানে এত ভক্তির প্রয়োজন কি? ও তো hydrogen আর oxygen, ও কুসংস্কার সব ছুড়ে ফেল।" আর একদল বলছে, "নিরাকার সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করাই ঠিক, নিগুর্ণ ব্রহ্ম ব'লে কিছু নেই।" কেউ বলছে 'যিশু খৃষ্টকে ভজনা করা ছাড়া আর উপায় নেই;" ইত্যাদি ইত্যাদি এ'কেই বলে "দল।" তবে যে যেমন আধার নিয়ে এসেছ, মহাসাগরবৎ ঠাকুরের কাছে সে সেইটুকুই পাবে। ক্ষুদ্র আধার নিয়ে এসে সকল পথ দিয়ে গেলে ভাব হারাতে পারে; একটা মত নিয়ে মন মুখ এক ক'রে তাতে দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত খালি এগিয়ে যাও আর অন্য মতের প্রতি কটাক্ষপাত ক'রো না।

"সন্ন্যাসী"

(শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়)

সেদিন সে এক মধুর সাঁজে
ঢোল কাঁসরের বাদ্যি বাজে
সন্ন্যাসী এক বসল্ এসে ক্ষুদ্রতোয়া বাপীর তটে।
কুলায় তখন ফিরছে পাখী
দিনের আলো মুদ্‌ছে আঁখি
রাখাল বালক গাভী সাথে ফিরতেছিল সবে গোঠে
গ্রামের বধ নদীর নীরে
গাগ্‌রী তাহার পূর্ণ করে
—ফিরছে মুখে মধুর হেসে সঙ্গিনীদের সাথে।
ঘোম্‌টা ঢাকা মুখখানি তার
দেখ্‌বে আশায় একটী বার
গ্রামের যত দুষ্টছেলে দাঁড়িয়েছিল যাবার পথে।
সন্ন্যাসী তা'র সরল প্রাণে
আছে মগন গভীর ধ্যানে
গণ্ড বা'হি শ্রাবণ ধারে ঝরে অশ্রুধার।
বিশ্বচিন্তা কল্যাণ করে
কিম্বা তাহার নিজেরি তরে
মুখে বলে 'কোথা তুমি প্রেম পারাবার'॥
সহসা পশিল কাণে রুনুঝুনু
ব্রজ রাজ বুঝি বাজাওল বেনু
আকুল করিয়া উদাস প্রাণ।
ভুলিয়া গেল সে তন্ত্রমন্ত্র
বাজিল তাহার হৃদয় যন্ত্র
শিহরিল যোগী, ভাঙ্গিল ধ্যান॥

চাহে যোগী আঁখি মেলি
পথ দিয়া যায় চলি
 সুরূপা সুবেশা এক অনিন্দ্য সুন্দরী।
মরাল গমনে চলে
হেসে হেসে কথা বলে
 ভাবে মনে যোগীবর 'কেবা এই নারী'?
ক্ষীণ হ'ল ধ্যান ধারা
দেখে নারী মনোহরা
 প্রতি পদক্ষেপে তার হৃদয় দলিয়া যায়।
কম্বল লোটা চিম্‌টে কাঁথা
নদীর তীরে রেখে সেথা
 সন্ন্যাসী সেই নারীর সাথে পিছু পিছু ধায়॥
সুন্দরী তার সাথীর সাথে
গল্প করি সোজা পথে
 উত্তরিল আসি তার নিজ নিকেতন।
ভাবে মনে যোগীবর
'কি করবে এর পর'
 বসিয়া পড়িল যেন সংজ্ঞাহীন অচেতন॥
গৃহ স্বামী আসি হেরে
অতিথি বসিয়া দ্বারে
 সসম্ভ্রমে লয়ে তারে কক্ষে দেয় স্থান।
বলে 'প্রভু ক্ষমা কর
রোষ তব পরিহর
 না জেনে করেছি আমি তব অসম্মান'॥
চরণ ধোওয়ায়ে করে
বসাল পালঙ্ক পরে
 পদধূলি লয় তার নিজশিরে তুলিয়া।

করিল যে কি যতন
যেন দেব "নারায়ণ"
এসেছে তাঁহারি দ্বারে যোগীরূপ ধরিয়া ॥

এতেক করিয়া পরে
গৃহ স্বামী ভক্তিভরে
অতিথি চরণ ধরি করে তাঁরে নিবেদন।

'আজি এ মধুর সাঁজে
পবিত্র যোগীর সাজে
বলদেব, কিবা হেতু মম গৃহে আগমন' ॥

'কি আর বলিব আমি
শুন তবে গৃহ স্বামী
মম কথা প্রকাশিতে না সরে বচন।

'আসিয়াছি তব দ্বারে
পাপ আঁখি তৃপ্ত তরে
অতৃপ্ত বাসনা মোর করিতে মোচন ॥

'রমণী তোমার অতি
সুরূপা সুবেশা সতি
বাপীকূলে দেখি তারে বিধেছে নয়ন।

'পুনঃ নব সাজে তারে
হেরিব সে সুন্দরীরে
আকুল আবেগ মোর করহ পূরণ' ॥

গৃহ স্বামী ভাবে মনে
চাহি যোগী মুখ পানে
ভয়ভক্তি এক সাথে গণিল প্রমাদ।

অতিথি বিমুখ হলে
যাইবে সে রসাতলে
কি হবে তাহার গতি বিষম বিপদ ॥

ভাবিল সে "নারায়ণ"
ছল করে মম মন
চাহে শুধু দেখিবারে পত্নীরে আমার'।
এতেক ভাবিয়া তিনি
পত্নীরে ডাকিয়া আনি
বলে 'যোগী পূরাইব বাসনা তোমার ॥

'কর ছল মূঢ় জনে ?
ধর্ম্ম সার এজীবনে
ধর্ম্মহেতু আজি মম অতিথি সৎকার।
'কেবা হয় কার নারী ?
সব তিনি সব তাঁরি
আজ রাতে পতি তুমি পত্নার আমার' ॥

বলে তারে যোগীবর
রুদ্ধ করি গৃহদ্বার
'দাঁড়াও সম্মুখে নারী লজ্জাপরিহরি।'
রমণী হৃদয় ভরি
কায়মনে স্বামী স্মরি
দাঁড়ায়ে রহিল যেন জগৎ ঈশ্বরী ॥

সন্ন্যাসী একে একে
দেহের সকলি দেখে
বলে, 'মাগো মাথা হতে দাও কাঁটা খুলি'।
রমণী তায় ধীরে ধীরে
মাথা হতে কাঁটাটীরে
বিস্ময়ে লাগিলা দিতে সাধু হাতে তুলি ॥

সন্ন্যাসী কাঁটাটীরে
রাখি স্বীয় আঁখিপরে
বলিতে লাগিল 'আঁখি! জান তুমি কতছল।

'তব তরে আজ মোর
হৃদয় শ্মশান ঘোর
আজি পাবি এর তুই সমুচিত প্রতিফল ॥
'রাজা হয়ে ভিখারী
তব সম কে অরি
ঘুরাইলি মিছামিছি রূপের তৃষায়।
'রজ্জুভ্রমে সর্প ধরি
পচা মড়া বক্ষে করি
রণমুখী নদী-পার রূপের নেশায় ॥
'সন্ন্যাস লইনু আমি
বাপীতটে দিবা যামি
বাঁধিনু বসতি তথা শান্তির আশায়।
'পথ দিয়া যায় নারী
পোড়া আঁখি তায় হেরি
নাচায়ে তুলিল মোর আকুল হিয়ায় ॥
'বুঝ মন, নয়ন তোমার
ভাব এরে হৃদয়ের সার ?
"ভেবে দেখ কত তোরে নাচায় নয়ন" ।
'আজিকে তোমার শেষ
যাহা ছিল অবশেষ
সম্মুখ সমরে তোমা করিব নিধন'
ইহা বলি যোগীবর
কাঁটা লয়ে আঁখিপর
বিঁধিল সজোরে তার দুই বাহু তুলিয়া।
গৃহ স্বামী আসি হেরে
নাহি আর যোগী ঘরে
কাহার রুধিরে গেছে গৃহতল ভরিয়া ॥

ত্যাগের পথে।

(শ্রীলাবণ্যকুমার চক্রবর্ত্তী।)

ভারতের জলবায়ু, আকাশ-ভূতল বেদান্ত-যুগের ত্যাগের পূত মন্ত্রে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল, বেদান্তকেশরীর গম্ভীর হুঙ্কারে মানব প্রাণের মোহ-জড়তা অপসরণ করিয়াছিল, ত্যাগের পাঞ্চজন্য-নিনাদে ভোগাসুর পাতালে তলাইয়া গিয়াছিল, পবিত্র যজ্ঞধূমলব্ধ ত্যাগের গন্ধ গন্ধবহ দিক্‌দিগন্তে বিকীরণ করিয়াছিল, ত্যাগসূর্য্য স্বমহিমায় ভারতাকাশে সমুদিত থাকিয়া সহস্ররশ্মিতে দশদিশি সমুজ্জ্বল করিয়াছিলেন। ভারতের অস্থিমজ্জা দেহপ্রাণে কেবল একটীসুর—একটী অপূর্ব্ব সুললিত স্বর তালমান লয়যোগে বাজিতেছিল—"ত্যাগ—ত্যাগ"।

কালক্রমে এই ত্যাগভাস্কর ভারতাকাশে ভোগনিশার কৃষ্ণমেঘ দেখাদিল—দেখিতে দেখিতে মেঘ কাটিয়া গেল—আবার মেঘ করিল—আবার মেঘ কাটিল! অন্ধকার আসিল—ভারতগগন কুজ্ঝটিকা সমাচ্ছন্ন হইল—আবার সূর্য্যালোকে—হাস্যোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কখন বা বিদ্যুচ্ছটা মেঘের কোলে হাসিয়া গেল—কখন বা চন্দ্রমা কিরণে ভারতগগন সমুদ্ভাসিত হইল। কখনবা মেরুজ্যোতিঃ অন্ধকারে পথ-প্রদর্শক হইল। এরূপে আলো-আঁধার উত্থান-পতনের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে ভারত এবং সঙ্গে সঙ্গে জগৎ এমন এক অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইল যাহার সহিত পূর্ব্বাবস্থা সমূহের তুলনায় আকাশ পাতাল পার্থক্য। এমন বিরাট পতন, এমন ভয়াবহ অন্ধকার ভারত বোধ হয় আর কখনও প্রত্যক্ষ করে নাই।

কে জানে কেমন করিয়া কার ইচ্ছায় কোন অজানা অচেনা দেশ হইতে ভারতে কি এক অজানা অচেনা ভাবের নেশা আসিয়া প্রবেশ করিল। ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, খেয়ালে হেলায় জানিয়া বুঝিয়া, বুঝিয়া না বুঝিয়া, কেমন ভাবে এ অদ্ভুত ভাব ভারতসন্তানকে ধীরে ধীরে

পাইয়া বসিল। কেহ বা আপাত মধুর স্বাদের নেশায় বিভোর চিত্তে এ ভাব-মদিরা সাদরে বরণ করিয়া লইল। কেহ বা দেখি দেখি, বুঝি বুঝি করিতে করিতে মদিরা সাগরে ডুবিয়া গেল। কেহ বা ডুবি ডুবি ভাসি ভাসি করিয়া ডুবিতে-ভাসিতে লাগিল। ভাবের তরঙ্গ বাড়িয়া চলিল। ভারত ভোগাসুরের কুহক-সাগরে ডুবিয়া গেল। সম্মোহন মন্ত্রে সমগ্র ভারত অভিভূত হইয়া পড়িল। নেশায় নেশায় কালনিশা ভারতাকাশ ছাইয়া ফেলিল। নিষিদ্ধ ফল খাইয়া আদম-ইভ যোগভ্রষ্ট হইল। অন্ধকারে জগৎ গ্রাস করিয়া ফেলিল। বিরাটমোহ—সূচীভেদ্য অন্ধকার—মিশরীয় অন্ধকার! মানবগণ মোহাভিভূত!! ভারতের আকাশ, ভারতের বাতাস পূতিগন্ধে পর্য্যুসিত হইল। ভারতের দিব্য প্রাণস্পন্দন থামিয়া গেল। আর ভূতাবিষ্ট মৃতদেহের ভিতর হইতে উঠিল—এক পৈশাচিক তাণ্ডব নৃত্য—! পিশাচকুলের দিঙ্মণ্ডল ব্যাপী অট্টহাস্য!!

জগতের যতই দুরবস্থা হউক না কেন—তখনও এমন অল্প সংখ্যক দেবমানব থাকেন, যাঁহারা কাল প্রভাব সম্পূর্ণ অতিক্রম করিতে না পারিলেও একেবারে সংজ্ঞাহীন হন না; তাঁহারা সভয়ে দেখিলেন ভূত প্রেত দানা দৈত্যাদির উদ্দাম নর্ত্তনে, বিকট ভৈরব ভীষণ হুঙ্কারে মেদিনী প্রকম্পিত, দুর্ব্বিসহ পাপভার নিপীড়িতা ধরিত্রী বেপথুমানা। এ দৃশ্য দর্শনে তাঁহাদের ঈষৎ উন্মীলিত নেত্র নিমীলিত হইল—হৃৎপিণ্ড যেন শতধা বিদীর্ণ হইয়া গেল—রুদ্ধকণ্ঠে 'ত্রাহি ত্রাহি' ডাক ছাড়িয়া বলিতে লাগিলেন—"কোথা আছ তুমি জগতের ঠাকুর! তোমার আশ্রিতা ধরিত্রীর দশা দেখিয়া যাও" ঠাকুরের কাছে আর্ত্তের আর্ত্তনাদ পৌঁছিল। বৈকুণ্ঠের সিংহাসন টলিল।

"পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

ভগবদ্গীতোক্ত এই আশ্বাসবাণী আবার সফল হইতে চলিল।

ঘোর সুষুপ্তিমগ্ন জীবকুল হঠাৎ কি ভাবের আবেশে, সুখস্বপ্নের ঘোরে, অর্দ্ধজাগ্রদাবস্থায় দেখিল—কালনিশার ঘোর কাটিয়া গিয়াছে—

ঊষার অপূর্ব্ব মাধুরী জগৎময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে—আর পূর্ব্বাকাশে অরুণদেব নবানুরাগে সমুদিত।

কেহ কেহ জাগিতে জাগিতে আবার ঘুমাইয়া পড়িল। কেহ বা উঠিতে উঠিতে বসিতে বসিতে আবার শুইয়া পড়িল। কেহ বা তন্দ্রাগ্রস্ত অর্দ্ধ-নিদ্রিত অবস্থায় আলো-আঁধারের কুহেলিকা ভেদ করিতে না পারিয়া ঘুমের নেশায় আবার টলিতে লাগিল। যাহারা চিরচক্ষুষ্মান ও যাহারা ঘুমের ঘোর সম্পূর্ণ কাটিতে পারিলেন—তাঁহারা সবিস্ময়ে সানন্দে দেখিলেন—এক অপূর্ব্ব আলোক-তরঙ্গ যেন জমাট বাঁধিয়া জগতের চারদিকে অগ্রসর হইতেছে—আর তাহারই শির্ষোপরি এক জ্যোতির্ম্ময় বিরাট পুরুষপ্রবর বসিয়া—মুখশ্রী করুণামণ্ডিত, হস্তযুগল বরাভয়যুক্ত! ভোগ নিশার অবসান—এবং ত্যাগ দিবার আগমন বার্ত্তা—দিব্যকণ্ঠে বিঘোষিত হইতেছে। এ দৃশ্য দর্শনে এবং অপূর্ব্ববাণী শ্রবণে তাঁহারা আনন্দোৎফুল্ল হৃদয়ে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। তাঁহারা এই বিরাট মহামহিমময় পুরুষপ্রবরকে চিনিলেন—তাঁহার চরণতলে মস্তক বিলুণ্ঠিত করিলেন—হৃদয়ের পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিলেন—স্বাগতঃ।

এ চির বাঞ্ছিত অভ্যুদয়-বার্ত্তা—এ অপূর্ব্ব "সূর্যকোটি প্রতিকাশং চন্দ্রকোটি সুশীতলম্" ভাগ্যবানকে, চক্ষুষ্মান শ্রবনাবলোকনকরিল। জগৎ-জোড়া জাগরণের সাড়া পড়িল। কেন্দ্রীভূত পাখীর ঝাঁকে হঠাৎ ঢিল পড়িলে পক্ষিগণ যেমন কলরব করিয়া ইতস্ততঃ উড়িয়া ধায়, শীতক্লিষ্ট প্রাণিকুল রৌদ্রতাপে ফুরফুরে হইয়া যেমন আনন্দে ছুটিয়া বেড়ায়, ভোগক্লিষ্ট প্রাণিসঙ্ঘ তেমনি আনন্দোদ্বেলিত হৃদয়ে উধাও ছুটিল। প্রথম উড়িতে শিখিয়া পক্ষিশাবক কেমন উড়িতে উড়িতে পড়িয়া যায়, পড়িতে পড়িতে আবার উড়িতে চায়, তেমনি জীবকুল উঠিতে উঠিতে পড়িতে পড়িতে ছুটিয়া চলিল। কেহ ছুটিল জানিয়া শুনিয়া, শক্তি সামর্থ্য গন্তব্য পথ পরিষ্কার বুঝিয়া দেখিয়া স্থিরে ধীরে দিব্যানন্দে স্থির লক্ষ্যাভিমুখে দেবমানবের পরিষ্কার অঙ্গুলি সঙ্কেতে। কেহ ছুটিল অন্যজন ছুটিয়াছে বলিয়া, সাড়ামাত্র প্রাপ্ত হইয়া; রাম ছুটিয়াছে, শ্যাম ছুটিয়াছে সুতরাং ছুটিতেই হইবে এই ভাবিয়া। তীব্র ক্ষুধায় আহার্য্য-

প্রাপ্ত হইয়াও কেহ উদরের সহনোপযোগী করিয়া ধীর শান্তিতে আহারে ব্রতী হইল—আর কেহ পেটের ক্ষমতার দিকে না চাহিয়াই দুইহাতে উদরপূর্ত্তি করিতে লাগিল। ফলও অনুরূপ হইল। পথে অপথে কুপথে বিপথে ছুটাছুটির ধুম পড়িল। পতন উত্থান সফলতা বিফলতা নিয়া এক বিরাট যাত্রা সুরু হইল। চক্রী তাঁহার চক্র জগতের উপর দিয়া চালাইয়া দিয়া লীলায়ত তরঙ্গোপরি সমাসীন হইয়া আপনার লীলা বৈচিত্র্যে আপনি মুগ্ধ হইয়া যুগচক্র পরিচালন করিয়া চলিলেন।

চক্ষুষ্মান দেখিল—এতসব বিশৃঙ্খলার মধ্যেও শৃঙ্খলার এক অব্যাহত স্রোত অন্তঃসলিলা ফল্গুপ্রবাহের মত প্রবাহিত হইতেছে। সর্ব্ববিধ অসামঞ্জস্য ও আপাত বিবদমান ভাবপ্রবাহ নিয়া ভারত সত্যসত্যই ত্যাগের পথে আসিয়া দাঁড়াইতেছে, শক্তিকেন্দ্র হইতে শক্তিলাভ করিয়া জগৎকে ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষা দিবার জন্য। প্রাচ্যভাব প্রতীচ্যের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিবে—আর কেন্দ্র হইবে ভারতবর্ষ। ইহা বিধাতার অখণ্ডনীয় বিধি।

ভারতের এই বর্ত্তমান অবস্থা আরও একটু স্থূলভাবে পর্য্যালোচনা করার প্রয়োজন। দেখা যায় এইযে অভিনব চিন্তা-তরঙ্গ, অপূর্ব্ব বৈচিত্র্য, অপ্রত্যাশিত চাঞ্চল্য বা উত্তেজনা ভারতের বক্ষ দিয়া খরস্রোতে প্রবাহিত, তাহাও ত্যাগ ও ভোগের ঘাতপ্রতিঘাত সঞ্জাত। সকলের মূলেই ত্যাগের দৃষ্ট বা অদৃষ্ট অব্যাহত অপ্রতিদ্বন্দ্বী স্রোত আর উপরে বিক্ষোভ। জলের সহিত বায়ুর সংঘর্ষজাত তরঙ্গের পর তরঙ্গের মত ওগুলি ত্যাগভোগের সংঘর্ষজাত। দীর্ঘকালের অভ্যাসের সহিত চিরপুরাতন হইলেও স্থূলদৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নূতন প্রতীয়মান ভাবের সংঘর্ষে এবম্বিধ বিক্ষোভ অনিবার্য্য। ফলে আজ প্রধানতঃ তিনশ্রেণীর মানবের চিন্তা ও কার্য্যপ্রণালী সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শ্রেণীবিভাগ করিলে এইরূপ দাঁড়ায়—ত্যাগী ও ত্যাগাদার্শী, ত্যাগভোগের সমন্বয়বাদী এবং ভোগী ত আছেনই—আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

এখন ত্যাগী ও ত্যাগাদর্শীর আলোচনা সংক্ষেপতঃ প্রথমেই করা যাক্। দেখা যায় এই জন্মগত ত্যাগরত্নের অধিকারিগণের দৃষ্টি পরিস্কার, লক্ষ্য স্থির, শক্তি অটুট, গতি মন্থর উত্তেজনাবৰ্জ্জিত কিন্তু অপ্রতিহত। জগন্মঙ্গলের জন্য ইঁহাদের আবির্ভাব। তাঁহারা জানেন "যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি"। তাঁহারা "বহুজনহিতায় বহুজন সুখায়" প্রাণ পাত করিতে প্রস্তুত। পতিতের জন্য 'লাখ নরকে' যাইতে অকুণ্ঠিত। তাঁহারা যুগতরঙ্গের শীর্ষদেশে সমাসীন মহাপুরুষের অব্যর্থ বাণী শোনেন—অঙ্গুলিসঙ্কেতে অবিচলিত শ্রদ্ধার সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া আপন আপন নির্দ্দিষ্ট কাজ নিখুঁতভাবে সুসম্পন্ন করিয়া যান্। তাঁহাদের "মিশন" তাঁহারা পরিষ্কার জানেন এবং পূর্ণ হইলে নরদেহ ছাড়িয়া অমরধামে প্রস্থান করেন। ইঁহারা কল্পান্তের সিদ্ধঋষি, অবতারলীলার সাহায্য ও বিকাশের জন্য নরদেহ ধারণ করেন। তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ, কেবল লোককল্যাণে যুগপ্রয়োজনে শরীর ধারণ করেন মাত্র। যুগ প্রবর্ত্তকের অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বাক্য ও ভাব ইহাদেরই দেহপ্রাণ ও কার্য্যাদি আশ্রয় করিয়া যে লীলাতরঙ্গ ও আবর্ত্তের সৃষ্টি করে, জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে বহু মানব অধিকারানুযায়ী ইহারই অল্পবিস্তর গ্রহণ করতঃ বৈচিত্র্যপূর্ণ যুগপ্রবাহ পরিবর্দ্ধিত করে। এই নিত্যসিদ্ধ আধিকারিক পুরুষগণের অনুষ্ঠিত কার্য্যে ভুল ভ্রান্তি থাকেনা, থাকিতে পারে না। শাস্ত্র-বাক্যের সহিতও ইঁহাদের অমিল হয় না—কারণ শাস্ত্রানুমোদিত পন্থাই যুগাবতার তাঁহাদের জন্য সরল সহজ করিয়া উপস্থাপিত করেন। ইঁহাদের বিরাট্ প্রাণ মহামায়ার ঐশ্বর্য্য বা ভীতি প্রদর্শনেও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না বরং লক্ষ্যের দিকে অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হইতে থাকে,—কারণ তাঁহাদের আদর্শ যিনি—তিনি—মায়াতীত মায়াধীশ।

তদেতর জীবগণ যাঁহারা চক্ষুষ্মান, কৃপাধিকারী, ভাগ্যবান—তাঁহারা এই আদর্শ কর্ম্মীদের পদাঙ্কানুসরণে ধীরে, কিন্তু অকম্পিতপদে ত্যাগের বিরাট আদর্শাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন। তাঁহারা জানেন, সঙ্কল্প বিকল্প বলিয়া তাঁহাদের নিজস্ব কিছুই নাই। তাহারা আজ্ঞাবাহী ভৃত্য

মাত্র। তাহারা ভাগ্যবলে মহাজনের কৃপা প্রাপ্ত হইয়াছেন—মহাজন কিনিয়া লইয়াছেন। বিচারবুদ্ধি খাটাইতে খাটাইতে বুঝিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, তাঁহাদের যে কোনও চিন্তা বা তৎফললব্ধ চেষ্টা, ঐ সকল মহাপুরুষগণের চিন্তা বা কার্য্যপ্রণালী অতিক্রম করিতে পারে না। তাই তাঁহারা আত্মসমর্পণ করিয়া 'শ্রীগুরু' বলিয়া লক্ষ্যাভিমুখে অকূল সাগরে পাড়ি ধরিয়াছেন। অসীম সাগরের আকুল উচ্ছ্বাসের ভিতর দিয়া বাদাম তুলিয়া তরী বাহিয়া চলিয়াছেন—সম্পূর্ণ নির্ভীক ভাবে। মকর, হাঙ্গর, তরঙ্গভীষণ, ডুবো পাহাড়, কিছুই তাঁহাদের হৃদয়ে ভয়োৎপাদন করিতে পারিতেছে না—কারণ তাঁহারা 'অভীঃ' মন্ত্রের দুর্ভেদ্য কবচে আবৃত। 'অভীঃ' মন্ত্রের প্রচারক তাঁহাদের অন্তরে বাহিরে বিরাজমান। তিনিই তাহাদিগকে অভয়বাণী শুনাইয়া সর্ব্ববিধ ভয় বিঘ্নের পরপারে লিয়া চলিয়াছেন। মোহ শত মোহনীয় আবরণে সজ্জিত হইয়া তাঁহাদের কাছে নূতন ভাব প্রচার করিতে নবীন বার্ত্তা শুনাইতেছে—তাঁহারা উপেক্ষার হাসি হাসিয়া আপন গন্তব্যপথে চলিয়াছেন। তাঁহারই ঠিক বুঝিয়াছেন—ঠিক ধরিয়াছেন "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।" (ক্রমশঃ)

দরশন আশা

বরষের পর বরষ চলিল
দরশ মিলিল কই
নিরাশ পরাণ হরষে আজিকে
নাচিয়া উঠিল কই
ভেবেছিনু তাঁর দরশে পরশে
সরস হইব সই
এবে দেখি হায় দিন বয়ে যায়
কিছু না নিরাশ বই॥

ত্যাগচৈতন্য

ভারতীয় আচার্য্যগণ ও সমন্বয়।

(শ্রীরাধিকামোহন অধিকারী)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ইহুদী, পার্শী, খৃষ্টান, মুসলমান ও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদের সন্তানেরা তাহাদের ধর্ম্ম-জীবনে পদবিক্ষেপ করিলেই এক একটী প্রণালীবদ্ধ নিয়ম ধর্ম্মের চরমোন্নতির জন্য নির্দ্ধারিত দেখিতে পায়। কিন্তু কোন হিন্দু-সন্তান ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া হিন্দুধর্ম্ম অনুশীলনে অভিলাষ করিলে শত শত আপাতবিরোধী এবং স্থূলদৃষ্টিতে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ধর্ম্মমত ও পথ যুগপৎ তাহার চক্ষের সম্মুখে উত্থিত হয়। সে দেখিতে পায়,—সনাতন হিন্দুশাস্ত্রে প্রধানতঃ ত্রয়োত্রিংশ কোটী দেবদেবী এবং যাগযজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানমাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে,--বেদান্তোপনিষদ্ সমূহে নির্গুণ ব্রহ্ম মুখ্যতঃ অদ্বৈত মতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে,—সাংখ্য, পাতঞ্জল ও বৈশেষিক প্রভৃতি ষড়্দর্শন শাস্ত্র-কারগণ প্রকৃতি-পুরুষ, ধ্যান, যোগ, সগুণ, নির্গুণ ও সাকার নিরাকার প্রভৃতি দুর্ব্বোধ তত্ত্বের বিচার দ্বারা স্ব স্ব মত প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছে,—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, বিষ্ণু, গরুড় প্রভৃতি এক একটী পুরাণ শাস্ত্রে এক একটী দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে,—হিন্দুর প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ, ভাগবত ও সংহিতা সমূহে তেত্রিশকোটী দেবদেবী এবং উক্ত দেবদেবী সকলে বিশ্বাসী অসংখ্য ধার্ম্মিক মহাপুরুষ ধর্ম্মজীবনের মহামহিমান্বিত আদর্শ নয়ন-সমক্ষে ধারণ করিতেছে। সে আরও দেখিতে পায় যে, অবতারগণের মধ্যে আদর্শ পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গীতোক্ত ধর্ম্ম, বিশ্বপ্রেমিক ভগবান্ বুদ্ধের নিরীশ্বরবাদ মূলক নির্ব্বাণতত্ত্ব, জ্ঞানমূর্ত্তি ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ, ভগবান অনন্ত অবতার ভক্তিরমূর্ত্তি রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, প্রেমাবতার গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রভৃতি শত শত ধর্ম্মমত ও উহাদের অসংখ্য শাখা প্রশাখা আপাত

তে বিরোধ ও অসামঞ্জস্য পূর্ণ হইয়াও কোটি কোটি হিন্দু সন্তানের ধর্ম্মবিশ্বাস চরিতার্থ করিতেছে। এইসকল পর্য্যালোচন করিয়া ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশলাভেচ্ছু হিন্দুসন্তান স্পষ্ট জানিতে পারে যে প্রাচীন কালের বেদ উপনিষদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া অবতারগণের প্রচারিত ভগবানকে প্রত্যক্ষানুভব অথবা মানবের সার্ব্বজনীন আদর্শ ধর্ম্ম ও নীতিকে জীবনে পরিণত করিবার উপায় পর্য্যন্ত, সকল ধর্ম্মমতই স্ব স্ব প্রধান, আপাত দৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী ও অসামঞ্জস্য-পূর্ণ। এক সম্প্রদায় বলিতেছে, "ব্রহ্মাই দেবদেবীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ," আর এক সম্প্রদায় বলিতেছে, "ওটা মিথ্যা কথা, বিষ্ণুই দেবদেবীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ," অপর সম্প্রদায় আবার বলিতেছে, "তোমাদের ব্রহ্মাবিষ্ণু উভয়েই নিকৃষ্ট, মহেশ্বরই দেবদেবীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ"! এইরূপে অসংখ্য দেবদেবীর এক একজনকে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে নিম্নশ্রেণীর দেবদেবীপূজক বলিয়া নিন্দা করিতেছে! নিরাকারবাদী সাকারবাদীকে বলিতেছে, "বিশ্বশক্তি সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের পুতুল গড়িয়া পূজা করা মানুষের পক্ষে পাগলামী." আবার সাকারবাদী নিরাকারবাদীকে বলিতেছে, "আকারবিশিষ্ট জীবের পক্ষে নিরাকার ব্রহ্মের ধারণা করিতে যাওয়াই বাতুলতা!" একসম্প্রদায় বলিতেছে, "কলৌ কালী" আর এক সম্প্রদায় বলিতেছে, "না ওটা কথাই নয়, "কলৌ শিবঃ", আবার অপর সম্প্রদায় বলিতেছে "তোমাদের ও কোন নামই ঠিক নয়, হরির্নামৈব কেবলম্—কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা!" অধিকন্তু কেবল ভগবানের নাম ও প্রকাশমূর্ত্তি লইয়াই যে কেবল মতভেদ তাহা নহে, পরন্তু তাঁহাকে লাভ করিবার অথবা ধর্ম্ম ও নীতিকে জীবনে পরিণত করিবার উপায়, জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি, যোগ, উপাসনা, ধ্যান, ধারণা, ও আসন প্রভৃতি লইয়াও সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে তুমুল বাদানুবাদ চলিতেছে। এমন কি যে আচার, শৌচ, পদ্ধতি, খাদ্য ও বেশভূষা, প্রভৃতি খুঁটিনাটি বিষয়গুলির বিভিন্নতা ধর্ম্ম-জগতে বিভিন্ন দেশকাল পাত্র ও শারীরধর্ম্মগত তাহা লইয়াও অনেক সম্প্রদায় গোঁড়ামীতে প্রমত্ত! আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সকল সম্প্রদায়ই

তাহাদের স্ব স্ব মত-পথের সত্য প্রমাণার্থে হিন্দুশাস্ত্ররূপ সুধাসমুদ্র মন্থন করিয়া আপন আপন মত-পথানুকূল শ্লোকবাক্য সুধা উদ্ধৃত করিয়া থাকে! হিন্দুধর্ম্মের এই মতভেদ, বৈচিত্র্যপূর্ণ বিরোধ, অসামঞ্জস্যরূপ অরণ্যের মধ্যে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মলাভেচ্ছু হিন্দুসন্তান হয় দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া ধর্ম্মলাভেচ্ছা একেবারে পরিহার করে, আর না হয় কোন এক সম্প্রদায় বিশেষের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ধর্ম্মের পবিত্র নামে অল্লাধিক পরিমাণে সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামিতে প্রমত্ত হয়। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে হিন্দুধর্ম্মোক্ত অসংখ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কেনও ধর্ম্মকে ধর্ম্মের দিক দিয়া দেখিলে সকল সম্প্রদায়ের বিভিন্নতার মধ্যে—এই আপাত প্রতীয়মান ভেদ বহুত্বের মধ্যেও সামঞ্জস্য ও ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার মধ্য হইতে এই মহান্ সমন্বয় তত্ত্ব আবিষ্কার করা, বহুত্বের মধ্যে একত্ব অনুভব করা সহজসাধ্য নয়। সমগ্র জগতের ধর্ম্মেতিহাসে একমাত্র ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসকেই সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের যথার্থ অনুষ্ঠাতা ও প্রচারকরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুরক্ত ভক্তেরা তাঁহাকে বড় করিবার উদ্দেশ্যেই যে এ কথা বলেন, তাহা নহে; পরন্তু জগতের ধর্ম্মেতিহাস একবাক্যে ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করে। কোন ধর্ম্মাচার্য্যের প্রশংসা বা নিন্দা অথবা কাহাকেও ছোট বড় করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য নয়; তাঁহারা সকল ধর্ম্মাচার্য্যের মাহাত্ম্যেই সমানভাবে বিশ্বাসী এবং সকল ধর্ম্মাচার্য্যের সকল মতকেই তাঁহারা অভ্রান্ত সত্য বলিয়া মনে করেন এবং আরও অন্তরের সহিত বিশ্বাস করেন যে, প্রত্যেক অবতারই যুগোপযোগী ধর্ম্ম-সংস্থাপনরূপ এক মহান্ আদর্শ এবং একই [illegible] দেশ কাল পাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রচার করিবার উদ্দেশে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এক এক যুগের এক এক দেশকালপাত্র তদুপযোগী এক একজন অবতারের আবশ্যকতা আনয়ন করিয়াছে এবং প্রত্যেক অবতারের ধর্ম্ম তদীয় শিষ্যপ্রশিষ্যগণ কর্ত্তৃক কালক্রমে [illegible] ধারণ করায় এবং তাহার ফলে নানা কারণে অধর্ম্মের প্রভাব বৃদ্ধি হওয়ায় "ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায়" তৎপরবর্ত্তী অবতার পরম্পরা অবতীর্ণ

হইয়াছেন। সকল অবতারের নাম, রূপ, মত, পথ, ভাব ইত্যাদি এক উদ্দেশ্যমূলক হইলেও যে বাহ্যদৃষ্টিতে সমান নহে তাহার প্রধান কারণ একএক অবতার একএক যুগের একএক প্রকৃতিবিশিষ্ট মানবের, পরিত্রাণের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমরা স্থূলভাবে হিন্দুর ধর্ম্মেতিহাস আলোচনা করিয়া এই সকল বিষয়ের যথার্থ প্রদর্শন করিতে প্রয়াস পাইব।

বেদ সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ। ইহা কোন ব্যক্তিবিশেষ দ্বারা রচিত হয় নাই। ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ঋষিগণের গভীর সমাধিলব্ধ আধ্যাত্মিক সত্যের প্রত্যক্ষানুভূতি সূত্রাকারে নিবদ্ধ হইয়া বেদ নামক অপৌরুষেয় ধর্ম্মগ্রন্থের সৃষ্টি হইয়াছে। বেদে ত্রয়বিংশতী দেবদেবীর মাহাত্ম্য মূলতঃ স্ব স্ব প্রধানরূপে বর্ণিত হইলেও প্রত্যেক দেবদেবীকে সর্ব্বদেবদেবীরূপে এবং সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের নিয়ন্তা এক অদ্বিতীয় ভগবান্‌কে সর্ব্বদেবদেবীর প্রকাশ মূর্ত্তিরূপে বন্দনা করিয়াছেন। মোটের উপর হিন্দুধর্ম্মের বিশ্বজনীন ভাব "বহুত্বের মধ্যে একত্ব" সনাতন বেদশাস্ত্রে বিশেষরূপে পরিস্ফুট। এতদ্ব্যতীত বেদে যাগ যজ্ঞাদি সকাম কর্ম্মকাণ্ড এবং জ্ঞান মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত আছে।

বৈদিকধর্ম্ম মূলতঃ এক হইলেও কালক্রমে বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে, এবং ভগবান্ বাদরায়ণ ব্যাস কর্ত্তৃক উহা চতুর্ভাগে বিভক্ত হইলে উহার শাখা-প্রশাখা আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। সমলক্ষ্যমূলক হইলেও এইরূপে বেদধর্ম্মের মধ্যে নানা মুনির নানা মতে ভেদের সৃষ্টি হয়। ষড়ঙ্গ বেদালোচনা করিতে যাইয়া ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্বান্বেষী কতিপয় ঋষি দেখিতে পাইলেন যে, সমগ্র বেদশাস্ত্রে ব্রহ্ম, আত্মা ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি বিষয়ক বিচার বিশেষরূপে পরিস্ফুট নহে, তাঁহারা বেদের এই ভাবগুলি বিশদভাবে পরিস্ফুট করিবার উদ্দেশ্যে উপনিষদ্ সমূহ রচনা করিয়াছেন।(?) সমগ্র বেদের সারভাগ লইয়া রচিত হইয়াছে বলিয়া উপনিষদের অপরনাম বেদান্ত। (?) নাদবিন্দু, ব্রহ্মবিন্দু, কঠ, কেন, ঈশ, অমৃতবিন্দু, মুণ্ডক ও গোপালতাপনী প্রভৃতি সকল উপনিষদই দ্বৈতবাদ

হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্বৈতবাদে যাইয়া পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছে; এইরূপে উপনিষদ্ সমূহে দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের এক আশ্চর্য্য সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। বেদোক্ত দেবদেবীগণ যে এক অদ্বিতীয় ভগবানেরই প্রকাশ-মূর্ত্তি তাহা "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি" প্রভৃতি বেদবাক্যে বিশেষরূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। মহর্ষি বেদব্যাস বলেন, "অসীম শক্তিমান্ সৌভরি প্রভৃতি মহর্ষিরা যখন শরীরব্যূহ পরিগ্রহ করিতে পারেন, তখন দেবতা-দিগেরও যুগপৎ বহুরূপে আবির্ভূত হওয়া এবং ঐরূপে তাঁহাদের বিগ্রহ-ধারণ করা অসম্ভব হইতে পারে না (মহাভারত)।" বেদবেদান্ত হিন্দুর সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সাধারণ মিলনভূমি; কারণ হিন্দুধর্ম্মোক্ত প্রত্যেক সম্প্রদায়ই বেদবেদান্তের সমগ্র বা অংশবিশেষের প্রামাণ্য স্বীকার করে, এবং হিন্দু-ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত থাকিতে চাহিলে সকল সম্প্রদায়ই এইরূপ করিতে বাধ্য। পক্ষান্তরে হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া কেন, পৃথিবীর যাবতীয় সম্প্রদায়ের ধর্ম্মরত্নরাজি এই পারাপার হীন অতলস্পর্শ মহাসমুদ্র সদৃশ বেদবেদান্তের মধ্যে নিহিত দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মসূত্র সমগ্র বেদশাস্ত্রের এক সামান্য অংশ বিশেষ। এই ব্রহ্মসূত্রের একএকটী সূত্রার্থের প্রধানত ত্রিবিধ ভাষ্য হইয়াছে। শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব, বল্লভ, নীলকণ্ঠ, বিজ্ঞানভিক্ষু, ও নিম্বার্ক প্রভৃতি ধর্ম্মাচার্য্যগণ ব্রহ্মসূত্রের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। একই সূত্রের পরস্পর এতগুলি বিরোধী ভাব কেমন করিয়া স্থান পাইতে পারে, তাহা ভাবিয়া বিংশশতাব্দীর বিশ্ববিদ্যালয়ের অতি বড় পণ্ডিতকেও বিস্ময়ে বাঙ্নিষ্পত্তিশূন্য হইয়া থাকিতে হয়। অস্মদ্দেশীয় যে সকল পাশ্চাত্য শিক্ষিতাভিমানী ব্যক্তি তথাকথিত পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অনুকরণে হিন্দুর এই অমূল্য সম্পদ্ বেদশাস্ত্রকে "প্রাচীন কালের কৃষকের গীতি" বলিয়া অবজ্ঞা করেন তাঁহারা কেবল এই এক ব্রহ্মসূত্রের ত্রিবিধ ভাষ্যের দ্বারা তাঁহাদের অতলস্পর্শ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বিষয় একবার ভাবিয়া দেখুন এবং যাঁহারা সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় অসম্ভব বলিয়া মনে করেন তাঁহারা এই ব্রহ্মসূত্রের সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় তত্ত্বের বিষয় একবার চিন্তা করুন।

বেদবেদান্তে পৃথিবীর যাবতীয় আধ্যাত্মিক ভাবসম্পদ্ নিহিত থাকিলেও ভগবচ্ছক্তির জীবন্ত দার্শনিক দৃষ্টান্তের অভাব পরিলক্ষিত

হয়। এই অভাব পূরণার্থ ঐতিহাসিকগণ প্রথমতঃ ভগবান শ্রীরামচন্দ্র এবং দ্বিতীয়তঃ শ্রীকৃষ্ণকে বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অবতাররূপে অবতীর্ণ দেখিতে পান। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের, লীলা ধর্ম্মজগতের সুমহান্ জীবন্ত আদর্শ। ইঁহাদের অনির্ব্বচনীয় মহিমময় ভাবপূর্ণ লীলাদর্শের নিকট বেদবেদান্তও অবনত মস্তক। ইঁহাদের পুণ্য জীবনী আলোচনা করিলে পরমকারুণিক ভগবান্ সম্বন্ধে মানুষের সর্ব্বপ্রকার উচ্চ ধারণাও নিম্নস্তরের বলিয়া অনুমিত হয়। বেদবেদান্তের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সকলশ্রেণীর মানবের বোধগম্য নহে, কাজেই উহার দ্বারা লোকশিক্ষা হইতে পারে না, কিন্তু ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের জীবন্ত আদর্শ লোকশিক্ষার বিজয় বৈজয়ন্তীরূপে যুগযুগান্তর হইতে সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুসন্তানের ধর্ম্মশিক্ষা পূরণ করিতেছে।

বেদে কর্ম্ম ও জ্ঞানের সামঞ্জস্য নাই। কর্ম্মের দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক অনিত্য সুখ এবং জ্ঞান দ্বারা মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। গীতা উক্ত ধর্ম্মকর্ম্মের জ্ঞান পরত্ব দ্বারা কর্ম্ম ও জ্ঞানের বিরোধ নষ্ট করিয়াছেন। গীতা হিন্দুর প্রায় সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের উপরই অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে। খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদের নিকট যেমন বাইবেল, মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীদের নিকট যেমন কোরাণ এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীদের নিকট যেমন ত্রিপিটক, হিন্দুর নিকট গীতা তেমনই আদরের সামগ্রী। জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি, দ্বৈত ও অদ্বৈত প্রভৃতি সকল ধর্ম্মমত ও পথের সমন্বয় সাধন ও মাহাত্ম্যকীর্ত্তন গীতার বিশেষত্ব।

অনুভব।

(শ্রীমধুসূদন মজুমদার)

সারাটী জীবনের কোলাহলে যে সুর বেজে উঠে, সেটাই সত্য। সে আপনিই বেজে উঠে, কারো মুখপানে তাকায়ে রয় না। তবে সেটা বাজ্‌বার মত স্থান ও সময় হওয়া চাই। তাই একদিন কণ্ঠ হতে একটা সুর বের হয়েছিল "তোমায় আমায় দেখা হল কোন্ দিবসের মাঝখানে।" সে সময়টা দিবসের একটা লগন লয়ে ফুটে উঠে। সেত নিত্য ফুটে উঠে না! আবার অপর দিকে বলি তার ত লগন অলগন নেই। সে ত নিতাই ফুটে রয়েছে—ওরে সাধক তাকে খুঁজে নে! তাকে বালুর মাঝে মুক্তার মত চিনে নে! তবেই তুমি শ্রেষ্ঠ হবে—ধনী হবে।

শৈশবে যখন দুই কচি ঠোঁটের পাশ দিয়ে খোলা চখের হাসির সনে এক আদি রাগিণী নিয়ে সুর বেজে উঠে, সে সুরটা বুঝা বড় দায়—কিন্তু প্রাণের পরতে পরতে গিয়ে বেজে থাকে। বালকের অমিয় মাখা কথাগুলো যেন প্রাণে একটা চিরপুরাতন অথচ নবীন খবর এনে দেয়। যেন কত পুরাতন বীণার তারে ঘা পড়েছে! বহুদিনের অচেনা তারটী তখন বেজে উঠে; আর প্রাণ থেকে তারের ঝঙ্কারের সনে কে যেন গেয়ে উঠে—ব্রহ্ম আনন্দ রূপামৃতম্।

আবার এমনি করে জোয়ার মুখে ভরপূর চ'খের জলের সনে, ফুলিতে ফুলিতে একটা ঘসামাজা অথচ কোমল তারের রব প্রাণকে ছাপিয়া অপর আধারে মিশিতে চায়—তখন বলি প্রেমের বিকাশ! সে বিকাশ সত্যিকার বিকাশ কিনা কে বলিবে? সে বিকাশের পরিণাম কতদূর কে বলিবে? সে কারো পরশ পেয়ে ফুটে না! সে ত দীর্ঘ পথের সহযাত্রী কাকেও পায় নাই! কুয়াসার মলিন জ্যোতিঃ নিয়ে কার পানে—কোন্ অচীনের পানে সে আজ ছুটেছে?

কোন্ শান্ত প্রেমিককে আলিঙ্গনে বাঁধিয়া রাখিতে আপন হারা হয়েছে? তা—কে বলিবে? ঐ দেখ আজ শান্ত সুনির্ম্মল কল্লোপরির বিন্দুকণাটুকুও কোন্ ব্যগ্রতায় মিশে গিয়েছে। হাতে একটী বীণাযন্ত্র, পরনে রক্তপট্ট বস্ত্র—আর তার সনে কোন্ অচিন্ অজানাকে পাবার একটা উন্মত্ততা। ওগো, তোমরা তাকে বেঁধে রেখ না! তার এ যাত্রা বিফল হবার নয়! সে ত কাজের চাপে এদিক সেদিক পিষিত হয়ে রইতে চায় না! প্রাণ যে মানে না—মন যে উতালা হয়ে উঠে! তার সনে প্রাণ চায় মিশিয়ে থাকি।

কে যেন আমার কানের তলে বীণা বাজায়ে বলে গেল "ওগো উতাল, রাত্রি এসে যথায় মেশে দিনের পারাবারে, তোমায় আমায় দেখা হল সেই মোহানার ধারে।" তবে সত্যই তুমি মিলনের লগনেই প্রকটিত! তুমি বিচ্ছেদ প্রাণে একটা আবেগ—আকাঙ্ক্ষাই টেনে আন। আর মিলনে তুমি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর—মিলনে তুমি চির নবীন—চির সত্য—অখণ্ড—অব্যয়।

সারাটী জীবন যখন তরী বেয়ে বেয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলুম, কি এক অজানা লক্ষ্যে পথ না পেয়ে ঘুরে ঘুরে কার্ পানে ছুটে যাচ্ছিলুম, চোখে কাপড় বাঁধা, আকাশে এমন মেঘ করে এল যে আর পথ চিনবার যো নেই—তখন তোমার আপন টানের মাঝে গা ভাসিয়ে দিলুম—দেখলুম উজান বেয়ে যাওয়া একটা বাতুলতা মাত্র। যখনই ভুলে যাই তুমি আমার মাঝি নও—হাল ধরে বস নাই, তখনই আমি ঘুরপাকে চাকার মত ঘুরি। তাই আজ তোমার টানে—তোমার বিশাল সমুদ্র স্রোতে ভেসে যাচ্ছি। আমার নিজের তরণী বাওয়া বা হাতে হালধরা ত কোন দরকার হচ্ছে না! কারণ আমি যে তোমার যাত্রী। নিবিড় কালিমাচ্ছন্ন শত তারা খচিতা স্নিগ্ধ আলোকসমন্বিতা সৌম্য মধুরা রজনী কার পানে চেয়ে ধীরে ধীরে বিশাল জ্যোৎস্নামণ্ডিত চিরনবশোভিত দীপ্ত শশাঙ্ক পরশে আপনাকে প্রকাশ করে ফেলে। যেন একটা কুহকের আবরণ তাকে ঘিরে রেখেছিল। সচিনের পরশে তা দূর হয়ে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে।

এমনি করে তোমার বেদনার মলিন ডালা মাথায় নিয়ে যখন চরণ স্মৃতি লক্ষ্য করে বুকচেপে বেদনা সহ্য করতে ছিলেম, তখন—হে প্রেমিক! তখন তোমার অসীম প্রেমপরশের ভেতর দিয়ে দেখা দিয়েছ—তাই গাইতেছিলেম "সেই খানেতে সাদা কালোয় মিশে গেছে আঁধার আলোয়।" সেখানে আমার প্রাণে তোমার পরশে যে দাগ পড়েছিল, হে প্রিয়তম, তোমার সনে মিশে এক উজ্জ্বল আলোয় পরিণত হয়েছে। যাকে দুঃখ বলে, দানবলে যাকে বুকে চেপে রেখেছি—আজ চিরনবীনের পরশে সেটাও অমৃত হয়ে উঠেছে। সেখানে ত আমি বলে কিছুই নেই! সেখানে কেবল তুমি, তুমি। সেখানে যখন আমি বলে অনুভব করব, তখনই আমার তোমার বিচ্ছেদ। আর যখন আমিই তুমি, তুমিই আমি বলে অনুভব করব—সেটাই সত্য—সেটাই বাস্তব—সেটাই মধুময় অনুভব।

আমি এমন করে তোমার শীতল নীরে ডুব দিয়েছি। হে প্রেমিক! তুমি বই আর ত কিছু দেখ ছি না। চাইনে ঐশ্বর্য্য—চাইনে মান—চাইনে ধন—চাই—তোমায়—আর চাই তোমার অখণ্ড প্রেম। ওগো বন্ধু! এমন করে যেন তোমার অখণ্ড প্রেমে ডুবে থাকতে পারি। আমায় এমন করে ডুবে থাকতে দাও। ওগো প্রেমিক, তোমার শীতলনীরে এক বাঁশীর সুর আমার কানে পরিচিতের মত বেজে উঠেছে। এ ধ্বনি ত নূতন নয়—এ ধ্বনি নিত্যের—এ যে সেই আদিসুর! যে সুর মহান্ ঋষিরা তপঃসাধনে প্রথম সিদ্ধির দিনে গাহিয়াছিলেন "ওঁ"! কিন্তু তবুও আমার প্রাণ বীণায় তোমার স্বর তেমনটী করে বেজে উঠে নাই। তুমি যদি আপন হাতে মাতায়ে না দাও তাহলে সে যে মূক হয়ে রবে! তুমি যদি উপলব্ধির মত প্রেম, বুঝ বার মত শক্তি না দাও, তাহলে সে অচল! তাই বুঝি নাই—যদিও তুমি নানামুখে গেয়েছ—তাই তোমায় দেখি নাই—যদিও এদিকে সেদিক রয়েছ!

তুমিই আমার হৃদয়াসনে শক্ত হয়ে বসে রয়েছ। তাই প্রভু যখন তোমার নিকষ পাথারে আমার স্বর্ণটুকু—যে টুকু তুমি দান করেছ—কষে দেখ লেম। দেখ লেম এটি সত্যিকার দাগ। এ যে অমৃতের

রেখা—খাঁটীশোনা! ওগো এই সংসারে যত লোক আপন হারা হয়ে কাজ করছে, তাদের জানায়ে দাও যে তারা যেন সোনার রঙটী খাটী রেখে কষ্‌তে আসে। তা না হলে শেষের দিনে যখন তুমি কষ্‌তে বস্‌বে, তখন যে তার আপন গৌরব ফুটে উঠ্‌বে না। প্রভু এমন করে প্রাণের কোণে বসে আমার সোনাটুকু কষে দেখ। তা শেষের দিনে নয়—প্রতি ঘণ্টায় নয়—প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসের সনে—যেন তোমার পরশ অনুভব হয়।

আশ্বাস

(শ্রীকরুণাশেখর দত্ত)

কালো মেঘ আসে যখন
পাস্ কেন মন এত ভয়?
গগন যদি ঢাকে মেঘে
ধরে' থাকিস্ চরণদ্বয়।

তুই কেন মন অবিশ্বাসী
তোর কেন মন এত ভীতি?
মায়া তোরে বাঁধ্'বে যখন
গেয়ো মন তাঁর জয় গীতি।

আস্‌বে যবে শমন ধেয়ে
বাঁধ্'বে দৃঢ় বাঁধনেতে,
তাঁর পদ পূজা কো'রো
শান্তি পাবে মরণেতে।

ভক্ত-কবীর ।

শ্রীমতী—

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বসন বয়ন করি বিক্রয় করিয়া।
উদর ভরেন মাতা পুত্রেতে মিলিয়া॥
কবীর পরমভক্ত দয়ালু হৃদয়।
দীন ও দরিদ্র দুঃখে বিগলিত হয়॥
বসন বিক্রয় তরে চলেন হাটেতে।
বৃদ্ধ এক পথে কাঁদে দারুণ শীতেতে॥
কাতরে বসনখানি চাহে সকাতরে।
দেখিয়া তাহার দুঃখ বাজিল অন্তরে।
বস্ত্রখানি দেন তারে অম্লান বদনে।
অন্নতরে আছে মাতা বসিয়া ভবনে॥
রিক্তহস্তে চলিলেন কবীর গৃহেতে।
দেখেন প্রস্তুত অন্ন রয়েছে থালাতে
বিস্মিত কবীর মাকে করেন জিজ্ঞাসা।
"সংসার চালালে কিসে কহ সত্য ভাষা॥
সংস্থান ছিল না কিছু গৃহেতে তোমার।
কোথা অন্ন পেলে মাতা কহ সমাচার" ॥
"সে কিরে কবীর," কন পুত্রেরে জননী।
"লোক হস্তে অর্থ দিয়ে পাঠালে আপনি"
আশ্চর্য্য কবীর শুনি মায়ের বচন।
ভাবে গদগদ মার বন্দিল চরণে॥
"জননী তুমিই ধন্য সার্থক জীবন।
হেরিলে ভক্তবৎসল প্রভু ভগবান॥

ভগবান অর্থদান করেছেন যাহা।
প্রাণভরে বিতরণ কর দীনে তাহা" ॥
দীনজনে ধনদান করেন জননী।
চারিদিকে রাষ্ট্র শব্দ হইল অমনি ॥
'কবীর বড়ই দাতা যে যায় সে পায়।
কেহ বৃথা নাহি ফেরে নৈরাশ্যে তথায়' ॥
ধাইল বিস্তর লোক এই কথা শুনে ॥
পূর্ণিত কবীর গৃহ যত দীন জনে ॥
বিষম বিপদ দেখি অন্তর অস্থির।
অন্যস্থানে এক মনে ভাবেন কবীর ॥
'অন্ন-বস্ত্র হীন দীন গৃহে কিছু নাই।
এত লোক মনস্তুষ্টি কিসে হবে তাই' ॥
প্রাণভরে ইষ্টদেবে করেন স্মরণ।
শ্রীরাম কবীররূপ ধরিয়া তখন ॥
অতিথি গণেরে ধনে করিলা সন্তোষ।
বিদায় হইল সবে হয়ে পরিতোষ ॥
চিন্তিত কবীর চলে গৃহে আপনার।
আশ্চর্য্য ঘটনা শুনে আনন্দ অপার ॥
প্রাণভরি ভগবানে ডাকেন আনন্দে।
নৃপতি সভাতে চলে একদা সচ্ছন্দে ॥
সহসা হইয়া ব্যস্ত অঞ্জলি ভরিয়া।
পূর্ব্বমুখে দেন জল কাতর হইয়া ॥
পাগল ভাবিয়া হাস্য করেন নৃপতি।
কবীর নির্ভয়ে কন "শুনহ ভূপতি ॥
জগন্নাথ পুরীধামে পূজক ব্রাহ্মণ।
গরম ভাতেতে তার পুড়িল চরণ ॥
তাতেই শীতল জল ঢালি তাঁর পায়ে"।
শুনিয়া কবীর বাক্য কৌতূহল হয়ে ॥

পুরীধামে চর পাঠালেন শীঘ্রগতি।
সত্য কথা সপ্রমাণ করেন নৃপতি॥
কবীর সিদ্ধপুরুষ জানিলা রাজন্।
ভগৎকুটীরে তাঁ'র উপনীত হন॥
কবীর রাজারে হেরি আনন্দ অন্তরে
সসব্যস্তে আবাহন করে জোড় করে
"কৃতার্থ কিঙ্কর আজি আগমনে তব
আদেশ করহ প্রভু বল কি করিব"।
অপ্রতিভ নরপতি করি আলিঙ্গন।
বলে "অপরাধ ক্ষম ওহে মহাজন॥
না জানিয়া উপহাস করেছি তোমায়
কিসে সুখি হও তুমি বলহ আমায়॥
ধন রত্ন যাহা চাও দিব হে তোমারে
কবীর সহাস্য মুখে বলেন রাজারে॥
জীবন মরণ মম তুল্য জ্ঞান হয়।
"জীবিকা নির্ব্বাহ জন্য ধনে বাঞ্ছা নয়
আমি মূর্খ এই ছার জীবনের তরে।
লালায়িত নহি ভূপ বলিনু তোমারে
ক্ষুধাতুর দীন হীন অর্থের কারণ।
দ্বারে দ্বারে লালায়িত করিছে ভ্রমণ
তাহাদের অর্থদান করহ নৃপতি।
মহা পুণ্য হবে বিভু হইবেন প্রীতি"
নরপতি হৃষ্টচিত্তে গেলেন প্রাসাদে
ঘোষণা করেন রাজ্যে পরম আহ্লাদে
'কবীর আমার অতি প্রিয় বন্ধু হয়'

স্বামী ব্রহ্মানন্দের বাল্য জীবনের স্মৃতি।

(শ্রীপঞ্চানন ঘোষ*)

যেদেশে বা বংশে কোনও মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন সেই দেশ ও বংশ পবিত্র হইয়া থাকে। মহাপুরুষগণ সকল সময়ে ও সকল স্থানে আবির্ভূত হন না। কদাচিৎ কখনও তাঁহারা আবির্ভূত হন। তাঁহাদের জন্ম-মৃত্যু নাই, যখন পৃথিবীতে কোনও মহৎকার্য্য সাধনের আরম্ভ হয় তখনই তাঁহাদের আবির্ভাব হয় এবং কার্য্যাবসানে তিরোভাব ঘটিয়া থাকে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ উপযুক্ত সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে অনন্ত কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

২৪ পরগণার বসিরহাট সব্‌ডিবিসনের অন্তর্গত শীকরা একটী প্রাচীন গ্রাম। আদিশূর রাজার আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের পঞ্চসহচরের মধ্যে মকরন্দ ঘোষই প্রধান ছিলেন। এই মকরন্দ ঘোষ হইতে অধস্তন সপ্তমপুরুষ সদানন্দ ঘোষ আকৃণা হইতে শীকরা গ্রামে আসিয়া বাস করেন। এইজন্য ইঁহারা আকৃণার ঘোষ নামে বিখ্যাত। সদানন্দ হইতে অধস্তন তৃতীয় পুরুষ মনোহর ঘোষের পঞ্চ পুত্র ছিলেন; তন্মধ্যে মধ্যম হরিশ্চন্দ্র ঘোষের মধ্যম পুত্র আনন্দমোহন ঘোষ বা হারাণচন্দ্র ঘোষ তৎকালে একজন বিখ্যাত লোক ছিলেন। জমীদার এবং ধনী বলিয়া তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। এই আনন্দমোহন ঘোষের প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে ব্রহ্মানন্দস্বামী জন্মগ্রহণ করেন। বসীরহাটের নিকটবর্ত্তী ট্যাঁটরা গ্রামের ভবানীচরণ তাঁহার মাতামহ ছিলেন।

ব্রহ্মানন্দের বাল্যনাম রাখাল। জীবদ্দশায় তিনি রাখাল মহারাজ নামেও বিখ্যাত ছিলেন। রাখাল জন্মগ্রহণ করিলে আনন্দমোহন যারপরনাই আনন্দিত হন। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্যারীমোহন ঘোষ ও কনিষ্ঠ শ্রীমোহন ঘোষ বালকের অনুপম রূপলাবণ্য দর্শনে

---

* ইনি মহারাজের একজন বাল্য সহচর ছিলেন।

পরম প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। বালকের ভবিষ্যৎ যে কত উজ্জ্বল তাঁহারা বালকের এই শিশু-জীবনেই উপলব্ধি করেন। আনন্দ-মোহন ঘোষের বিস্তৃত জমীদারী ছিল, তাহার উপর তাঁহার লবণের ও সরিষার বিপুল কারবার ছিল ; এই ব্যবসায়ে তাঁহারা যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন।

প্রবাদ ছিল যে, তাঁহারা কিছু গুপ্ত ধন পাইয়াছিলেন ; বোধ হয় কারবারে তাঁহাদের অসম্ভব উন্নতি দর্শনে লোকে এই প্রবাদ রটাইয়া থাকিবে।

রাখালের বয়স যখন পঞ্চমবৎসর তখন তাঁহার মাতা এককালে ৪টী সন্তান প্রসব করেন। সন্তানগণ ভূমিষ্ঠ হওয়ার অল্পকাল পরেই প্রাণ-ত্যাগ করে। শেষে মাতাও মৃত্যুমুখে পতিত হন। আনন্দমোহন ২য় বার দার পরিগ্রহ করেন। এক্ষণে রাখালের প্রতিপালনের ভার তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নীর উপর পতিত হইল। রাখালের মূর্ত্তি অতি সুন্দর ছিল। সেই সৌম্য ও কোমল মূর্ত্তি যে একবার দেখিত সে ভুলিতে পারিত না। এদিকে শরীরেও বিপুল সামর্থ্য ছিল। সমবয়স্ক বালকগণ কেহই তাঁহাকে আঁটিতে পারিত না। এইরূপে যখন শারীরিক শক্তির সহিত মানসিক শক্তির বিকাশ হইতেছিল, সেই শুভমুহূর্ত্তে আনন্দমোহন রাখালের হাতে খড়ি দিয়া বাটীতে শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। এইরূপে রাখালের বাল্যশিক্ষার সূত্রপাত হইল।

কিছুদিন গত হইলে আনন্দমোহনের বিশেষ যত্নে রাখালের এবং গ্রামবাসী অনাথ বালকগণের শিক্ষার জন্য একটী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। প্রসন্ন সরকার নামক একব্যক্তি এই বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। রাখাল অসাধারণ মেধাশক্তিসম্পন্ন ছিলেন ; তাঁহার মধ্যে কি যেন এক অনন্যদুর্লভ আকর্ষণী শক্তি ছিল যাহাতে সকলকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিতেন। রাখালের মোহিনী শক্তির নিকট গুরুমহাশয়ের বালক শাসনের প্রধান যন্ত্র বেত্রদণ্ড ত্যাগ করিতে হইল। তিনি রাখালের গুণের একান্ত বশীভূত হইয়া পড়িলেন। পড়াশুনায় বালকের অসাধারণ যত্ন দেখিয়া আনন্দমোহন যারপর নাই সন্তোষ লাভ করিলেন। প্রত্যেক

পরীক্ষায় রাখাল প্রথমস্থান অধিকার করিতে লাগিল। দৈহিক বলেও রাখাল সকলকে ছাপাইয়া উঠিলেন। সমবয়স্ক যে কোনও বালককে তিনি কৌশলসহকারে এমন ভাবে বেষ্টন করিয়া মাথায় ঘুরাইয়া উপরে তুলিতেন যে, যে দেখিত সেই ব্যক্তিই তাঁহার দৈহিক বলের প্রশংসা করিতেন। চুকপাটী ও নাদন খেলার প্রতি তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ লক্ষিত হইত। তখন লোকে এখনকার মত ফুটবল, ব্যাটবল ও ক্রিকেট খেলার প্রতি অনুরক্ত হয় নাই।

বাল্যকাল হইতে দেবদেবীর প্রতি রাখালের যারপর নাই ভক্তি লক্ষিত হইত। শীকরা গ্রামে বহুকাল হইতে ঘটস্থাপিতা এক কালী মাতার বিগ্রহ আছেন। রাখাল এই কালী মন্দিরে ও তন্নিকটবর্ত্তী বোধনতলায় অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। কখনও বা বালকগণ সহ মাটীর কালী মূর্ত্তি স্বহস্তে নির্ম্মাণ করিয়া পূজায় প্রবৃত্ত হইতেন। এই সময় কখনও তিনি পুরোহিত হইয়া পূজা করিতেন, কেহ বা কলার বা কচুর বেলা লইয়া বলি দিত, কখনও বা তিনি কামার হইয়া বলি দিতেন, সঙ্গাদের মধ্যে কেহ পুরোহিতের আসন গ্রহণ করিতেন।

রাখালের পিতা শাক্তছিলেন। প্রতিবৎসর ইঁহাদের সুবৃহৎ দালানে দুর্গা পূজা হইতে। পূজার সময় পুরোহিতের পশ্চাদ্বর্ত্তী আসন গ্রহণ করিয়া ধ্যান মগ্ন যোগীর ন্যায় উপবিষ্ট থাকিতেন। রাত্রিতে যখন আরতি হইত বালক তখন দণ্ডায়মান হইয়া একাগ্রচিত্তে আরতি দর্শন করিতেন। বাল্যকাল হইতেই বালকের ভক্তির উৎস শতধারে প্রবাহিত দেখিতে পাওয়া যায়।

সঙ্গীতেও রাখালের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। দরগা বলিয়া গ্রামের দক্ষিণে মাঠে একটী দরগাছিল; একটী তাল গাছ, কাঁঠাল গাছ, কতকগুলি খেজুর গাছ এবং আরও কয়েকটী গাছ একত্রিত হইয়া স্থানটীকে অতিমনরম করিতেছিল। নিকটবর্ত্তী মাঠ হইতে এই স্থানটী অনেক উচ্চ। রাখাল এই স্থানে সঙ্গিগণ সহ গান করিতে যাইতেন। গানের মধ্যে শ্যামাবিষয়ের সঙ্গীত

তাঁহার অতি প্রিয় ছিল। তিনি তন্ময় হইয়া যখন সঙ্গীত করিতেন তখন বাহ্য জগৎ তাঁহার নিকট হইতে সরিয়া যাইত—যেন কোন স্বপ্ন রাজ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার বিমল সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেন। মুখে স্বর্গীয় জ্যোতিঃ ও প্রীতি ফুটিয়া উঠিত। উপরে অনন্ত আকাশ, সম্মুখে দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ আর এই ক্ষুদ্র কুঞ্জে বসিয়া বালকের মধুর স্বরে শ্যামা সঙ্গীত কীর্ত্তন, কি মধুর, কি উদার। দ্বাদশ বৎসর বয়সে রাখাল শিক্ষা লাভার্থ কলিকাতায় আসিলেন এবং তাঁহার পিতা তাঁহাকে শিক্ষালাভার্থ ট্রেনিং একাডমীতে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। রাখাল উক্ত স্কুলে মনোযোগের সহিত ইংরেজী শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

অভিলাষ।

(শ্রীঈশ্বর)

অন্ধ নয়ন প্রভু খুলে দাও একবার
বারেক হেরিব তোমা চাহিনাক বার বার।
তোমারে পেয়েছে যারা কত কি না বলে তারা
শুনি বড় ইচ্ছা হয় দেখি তোমা একবার।
তুমি নাকি ভালবাস ডাকিলেই কাছে এস,
প্রীতিভরা আঁখি দুটি ফুটায়ে প্রেমের হাস;
শোক তাপিত জনে আছে ব্যথা যত মনে,
নিমেষে শীতল কর, ঘুচাইয়ে ভব ভার।
এত যদি প্রেম তব, ভুগিতেছি কেন সব
হাহাকার এত ভয়, জগত জুড়িয়া রয়।
তব ভালবাসা কি গো এতই ক্ষুদ্র ওগো,
না ডাকিলে কাছে এসে দেয় না শান্তির ধার
অন্তর সংশয় মম ; আপনার তোমা সম
কেহ কি নাহিক আর জগতে আমার ?
আপনার জন কিগো এতই নিঠুর ওগো—
প্রাণ তার কাঁদে যে গো প্রিয়ই যে তার সার
অবোধ সন্তান যে, মাতাকে ভুলিয়া সে
ধূলো কাদা মাখি গায়, খেলা মত্ত আছে হায়,
হাসে কাঁদে খেলা মাঝে অদ্ভুত নব সাজে
মা কি তারে ধুয়ে পুঁছে দেয় না চুম্বন ভার।

শ্রীবরেন্দ্র কৃষ্ণ ঘোষ।

(শ্রী—

আজ কয়েক দিন পূর্ব্বে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সংসারের আর একটি সুসন্তান অন্তর্হিত হইয়াছে। গত ২৫শে জুলাই; মাত্র ৪৭ বৎসর বয়সে যে গুরুতর কর্ম্মভার সম্পন্ন করিয়া বরেন্দ্র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলোকে প্রস্থান করিলেন তাহা একমাত্র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শক্তিমন্ত পুরুষেই সম্ভব। আমরা তাহার জন্য শোক করিব না—কিন্তু বরেন্দ্রের অবর্ত্তমানে সমগ্র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরিবার যে কিরূপ ক্ষতিগ্রস্থ তাহার পরিমান এখনও হয় নাই।

কলিকাতার উত্তর বিভাগের অন্তর্গত শ্যামপুকুরের ঘোষ বংশে বরেন্দ্রকৃষ্ণের জন্ম। বরেন্দ্রের পিতা স্বনামধন্য ৺কালিপদ ঘোষ। ইনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের একজন পার্শ্বচর ছিলেন। ইং ১৮৮৪ সালের প্রথম ভাগে ঠাকুরের চরণে প্রথম উপস্থিত হন। এবং নভেম্বর মাসে তাঁহাকে নিজ আলয়ে আনিয়া কৃতার্থ হন। কথিত আছে, যে ঘরে তাঁহাকে উপবেশন করান হয় সেই ঘরে দেব দেবীর কএক খানি সুবৃহৎ তৈলচিত্র বর্ত্তমান ছিল। ঠাকুর সেগুলি দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হন ও ভাবে তন্ময় হইয়া তাঁহাদের স্তব গান করিতে থাকেন। দেখিতে দেখিতে মূর্ত্তিগুলি যেন জীবন্ত প্রতীয়মান হয়। ৺কালীপদ বাবু স্বর্গীয় গিরীশচন্দ্র ঘোষের, অভিন্ন হৃদয়বন্ধু ছিলেন এবং দুই জনেই বিশেষ ভাবে তাঁর অহেতুকী করুণা লাভ করেন। ইং ১৮৮৫ সালে ঠাকুর যখন ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া চিকিৎসার্থে শ্যামপুকুরে বাস করিতে ছিলেন, সে সময়ের সেই স্মরনীয় ৺কালী পূজার দিনে কালিপদ বাবুর বাটি হইতে প্রস্তুত সুজির পায়সই প্রভুর সেবার প্রধান উপকরণ হয়। এবং ভগবান বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক সুজাতা নিবেদিত পরমান্ন গ্রহণের ন্যায় ভক্ত বৎসল ঠাকুরও সেই পায়স গ্রহণ করেন।

উহার পুণ্যময় স্মৃতি আজিও কালীবাবুর বংশধরগণ সংরক্ষণ করিয়া আসিতেছেন। বস্তুতঃ কালিপদ বাবুর আবাস ভূমি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পল্লীর নিকট একটি পুণ্যময় তীর্থ।

ইং ১৮৭৫ সালে বরেন্দ্রকৃষ্ণের জন্ম হয়। বাল্যকালে তাঁহার লেখা পড়া তাদৃশ হয় নাই। ইংরাজী স্কুলের সেকেণ্ড ক্লাস অবধি পড়িয়া ছিলেন। ইহাও ঠাকুরের লীলা বলিয়া মনে হয়। কারণ তিনি নিজে চাল-কলা বাঁধা বিদ্যা শিখেন নাই এবং বরেন্দ্রের জীবনে দেখাইলেন যে চাল কলা বাঁধার পক্ষেও আমাদের বর্ত্তমান প্রণালীর বিদ্যাভ্যাস প্রকৃষ্ট উপায় নয়। ভবিষ্যৎ জীবনে বরেন্দ্র যে রূপ আধুনিক ও উন্নত প্রণালীতে ব্যবসা বাণিজ্যাদি করিয়া ছিলেন এবং তৎসংক্রান্ত ইংরাজী ভাষা, আইন ও অর্থনীতি সম্বন্ধে যে রূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন তাহা বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অতি উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষেও নিতান্ত বিস্ময়কর।

বাল্যকালে লেখা পড়ায় তাদৃশ যত্ন না থাকিলেও বরেন্দ্রের প্রকৃতি অতিশয় শান্ত ও সুশীল ছিল। এরূপ অবস্থায় সাধারণ বালকের ন্যায় আদৌ দুরন্ত স্বভাব ছিল না। ১২।১৩ বৎসর বয়স কালে মাত্র কএক জন সমবয়স্কের সহায়তায় তিনি "কমল" পাঠাগার স্থাপন করেন। এবং উহা বহুদিন যাবৎ জীবিত থাকিয়া পল্লীবাসীর উপকার সাধন করিয়াছিল।

ইং ১৮৮৯ সালে সার্দ্ধ ১৫ বৎসর বয়সে বরেন্দ্র জন ডিকিন্সন কোংর বিস্তৃত কাগজের আপিসে প্রথম নিযুক্ত হন। ইহার এক বৎসর পরে তিনি প্রথম বোম্বাই রওনা হন। কিন্তু সেখানে পীড়িত হইয়া তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হয়। ইং ১৮৯২ সালে পুনঃ তিনি দ্বিতীয় বার বোম্বাই যান. সেই সময় হইতেই তাঁহার প্রকৃত কর্ম্ম জীবনের সূত্রপাত হয়। কোম্পানির নিম্নতম কর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়া, কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় বলে তিনি অতি সত্বরই আপিসের সকল প্রকার কার্য্যই আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ইং ১৮৯৬ সালে বোম্বায়ের মাল বিক্রয়ের কর্ত্তার পদপান। এবং ১৯০৫ সালে কোম্পানির নিখিল ভারতীয়

কর্ম্মচারিবৃন্দের সর্ব্বময় কর্ত্তা রূপে নিয়োজিত হন। এত অল্পসময়ের মধ্যে তিনি কোম্পানির কার্য্যে এতদূর সুদক্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, বিলাতের কর্তৃপক্ষেরা প্রায়ই তাঁহাকে বিশেষ ভাবে সম্মান করিতেন।

ইং ১৯০৮ সালে শ্রীরামকৃষ্ণ মিলের প্রতিষ্ঠান হয়। ইহাই বরেন্দ্রের জীবনের মহত্তম কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয়। সহায়-সম্বল হীন একজন প্রবাসী বাঙ্গালীর পক্ষে ভারতবর্ষের প্রধান ব্যবসা কেন্দ্র সুদূর আমেদাবাদে যাইয়া কাপড়ের কল করিবার কল্পনা করা যে কতবড় নির্ভীক উদ্যমশীলতার পরিচায়ক তাহা কর্ম্মী মাত্রেই স্বীকার করিবেন। বরেন্দ্র ধনীর সন্তান ছিলেন না। তাঁহার নিজের আর্থিক অবস্থাও তেমন ছিল না। এবং তাঁহার সহকারী আর যে দুইজন ছিলেন তাঁহারা বরেন্দ্রের অনুগত ভিন্ন আর কিছুই না, তাঁহারই ন্যায় নিঃসম্বল ও তুলার কাজ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তথায় যে দিন হইতে শ্রীরাম-কৃষ্ণমিল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেই দিন হইতেই উহা অভাবনীয় সাফল্য লাভ করিয়াছে।

শ্রীবিবেকানন্দ মিল স্থাপিত হয় ইং ১৯১৪ সালে। ইহা শ্রীরামকৃষ্ণ মিল অপেক্ষা আয়তনে বড়। বস্তুতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মিল স্থাপনের সময় মূলধনের অভাবে তাঁহার সঙ্কল্পের যে অংশটুকু অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছিল—ইহা তাহাই।

ইহা ব্যতীত তিনি বোম্বাই নগরে আরও কয়েকটি লিমিটেড কোম্পানি ও প্রাইভেট কোম্পানি স্থাপন করেন।

ইং ১৯০৯ সালে উইওহ্যাম লইড, আমদানি রপ্তানি ইত্যাদি সওদাগরি কার্য্যের জন্য স্থাপিত হয়। ইং ১৯১০ সালে ইণ্ডিয়ান ফাইনেন্স করপোরেশন এক প্রকার ব্যাঙ্কের কাজ আরম্ভ করেন এবং ইং ১৯১৫ সালে মার্চ্চেণ্টস্ ব্যাঙ্ক সংস্থাপিত করেন। প্রাইভেট কোম্পানির মধ্যে মণিলাল বাবু ভাই অন্যতম ছিল। এ সকলগুলিই তাহার নিজের কর্তৃতাধীনে থাকিত ও তাঁহাকেই পরিচালনের ব্যবস্থা করিতে হইত। ইং ১৯১৫ সালে কলিকাতায় বঙ্গলক্ষ্মী মিলের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়ে; সেই সময় বরেন্দ্র কিছুদিনের জন্য ম্যানেজিং এজেণ্ট নিযুক্ত হন

এবং তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিয়া ইহার অবস্থার পরিবর্ত্তন করেন। ইদানীং কলিকাতায় আরও দুএকটি কোম্পানির ডিরেক্টর মনোনীত হইয়াছিলেন।

দেশাত্মবোধে প্রবুদ্ধ হইয়া এইরূপ প্রচণ্ডভাবে যখন তিনি ব্যস্ত ছিলেন তখন জন ডিকিন্সন কোম্পানির দায়িত্ব পূর্ণ গুরুতর কর্ম্মভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত ছিল। তাহাতে কোনও প্রকার ক্রটি বা শিথিলতা প্রদর্শন করা দূরে থাকুক্ তিনি স্বীয় কর্ত্তব্যগুলি এরূপ সুচারুভাবে সুসম্পন্ন করিতেন যে ১৯২০ সালে যখন তিনি তাঁহাদের কার্য্যে ইস্তফা দিবার প্রস্তাব করেন, সে সময়ে যদিও তাঁহারা উহা গ্রাহ্য করিতে বাধ্য হন তথাপি অচিরেই কোম্পানি নিজেদের ভুল বুঝিতে পারেন এবং বিশেষ ভাবে পদোন্নতির প্রলোভন দেখাইয়া বরেন্দ্রকে পুনরানয়ন করিবার প্রয়াস পান।

আমরা উপরে যে বিচিত্র কর্ম্মাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলাম ইহা একটি অল্পপরিসর জীবনের পক্ষে যথেষ্ট সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ ব্যবসা-ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর দুর্ণাম ব্যতীত সুনাম নাই। নিঃস্বম্বল ও সুদূর প্রবাসী একজন বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা শ্লাঘার বিষয় বটে। কিন্তু ভারতের অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী মহলে এরূপ কর্ম্মী হয়তো বিরল নয়। তাঁহাদের তুলনায় বরেন্দ্রের কর্ম্মাবলী ততোদূর গরিমামণ্ডিত বিবেচিত না হইলেও তাঁহার কার্য্য প্রণালীতে একটি বিশিষ্টতা ছিল। তিনি সকল কাজই ত্যাগের ভিতর দিয়া করিয়াছিলেন। আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবল উদ্যম অথবা অর্থ-সংস্থানের প্রচণ্ড মাদকতার ছায়া বরেন্দ্রকৃষ্ণের জীবনে কখনও প্রতিফলিত হয় নাই। একমাত্র শ্রীশ্রীগুরুদেবের কর্ম্ম জানিয়া তিনি সকল কর্ত্তব্য পালন করিয়া গিয়াছেন।

বরেন্দ্রকৃষ্ণ একেবারে কর্ত্তৃত্বাভিমান শূন্য ছিলেন। তাঁহার কৃত-কর্ম্মের কোনও সম্পর্কে এতটুকুও আত্মাভিমান রাখেন নাই। তিনি সর্ব্বদা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেন "যে কাজ নিজে বুঝিয়া করিতে গিয়াছি তাহাই বিগড়াইয়াছে।" বাস্তবিকই তিনি যে সকল উপাদান লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেন তাহা সাধারণের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব।

যে সকল লোকের উপর অপরে কোনই আস্থা স্থাপন করিতে পারে না, তাঁহারাই বরেন্দ্রের প্রধান সহায়। অথচ যখনই কোনও কার্য্য সফলতা লাভ করিত, তিনি কর্ত্তৃত্বাভিমান শূন্য হইয়া তাঁহাদের গুণকীর্ত্তন করিতে থাকিতেন! হয়তো সে সম্পর্কে তাঁহার নিজের নামও প্রকাশ হইত না। নূতন ব্যবসায় পত্তনে তাঁহার নামটী সকলের শেষে এবং সকল চুক্তিপত্রে তাঁর স্বার্থটুকু সকলের পশ্চাতে পড়িয়া থাকিত যখনই কোনও দুস্থ ব্যবসায়ী নিরুপায় হইয়া তাহার সাহায্যপ্রার্থী হইতেন তখনই তিনি একটি নূতন ব্যবসায় পত্তন করিতেন। এবং ইহাতে যদিও তাঁহার নিজের অর্থ ও সামর্থ্য অকাতরে ব্যয়িত হইত কিন্তু শেষ লভ্যাংশের ব্যবস্থার ভার নির্ভর করিত সাহায্যগ্রহীতার উদারতার উপর। ফলে লোকসান ছাড়া লাভের মুখ দেখা তাঁহার ভাগ্যে অনেক সময় ঘটিয়া উঠিত না। এরূপ ঘটনা তাঁহার জীবনে বিরল ছিল না। বরঞ্চ তাঁহার ব্যবসায় প্রণালীর ইহাই মূলসূত্র ছিল। তিনি সকল ব্যবসাতেই যে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন তাহা নয়। কিন্তু সকল সফলতা ব্যর্থতার মধ্য দিয়া একটি জিনিষ সর্ব্বদাই ফুটিয়া উঠিত—সেটি বরেন্দ্রের চিরন্তন নিঃস্বার্থপরতা; জানি না এরূপ সহৃদয়তার সদ্ভাব লইয়া কয়জন ব্যবসায়ী কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন! এবং তাঁহাদের কয়জনে ব্যবসায়ের উচ্চসৌধ এরূপ অনাবিল পরার্থপরতার ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করিয়াছেন!

আমরা বরেন্দ্রকৃষ্ণের অভিমানশূন্য পরার্থপরতার পূর্ণ পরিণতি দেখিতে পাই, তাঁহার দৈনন্দিন সাংসারিক জীবনে। অর্থের বিশেষ অসদ্ভাব না থাকিলে অনেকে দান করেন এবং সামর্থ্যের দ্বারাও কেহ কেহ লোক সেবা করেন। কিন্তু ঐকান্তিক আন্তরিকতার সহিত এ দুইয়ের আশ্চর্য্য সমাবেশ আমরা বরেন্দ্রের জীবনে যেরূপ দেখিয়াছি তেমন আর বড় একটা দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না! দারিদ্র্য-রোগের উপস্থিত মত ব্যবস্থা করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না, পরন্তু উত্তম বৈদ্যের ন্যায় তিনি নিজ হস্তে ঔষধ মাড়িয়া রোগীকে খাওয়াইয়া এবং তাহার রোগ উপশম হইল ইহা দেখিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইতে

পারিতেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার প্রকৃত কর্মক্ষেত্র ছিল অনন্যোপায় দুস্থ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মধ্যে; যাহারা অতি ভীষণ দুঃখদারিদ্র্যগুলি লোকচক্ষুর অন্তরালে তাঁহাদের অন্তঃপুর মধ্যে পুঞ্জীভূত করিয়া রাখিতে বাধ্য হন। বরেন্দ্র তাঁহাদের শুধু গোপনে অর্থ সাহায্য করিয়া নিরস্ত হইতেন না। যাহাতে স্থায়ী ভাবে তাঁহাদের অভাব মোচন হয় তজ্জন্য প্রাণপণে চেষ্টিত হইতেন। তাঁহাদের বালকগণের শিক্ষার ব্যবস্থা অথবা চাকরি জোগাড় করিয়া দিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইতেন। নিজের আপিসগুলিতে সঙ্কুলান না হইলে অন্যের নিকট সুপারিশ করিতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। এবং এজন্য অনেক সময় তাঁহাকে অপমানিতও হইতে হইয়াছে! অর্থ সাহায্য সম্বন্ধে তিনি একেবারে বিচারশূন্য ছিলেন। পাত্রাপাত্রের কোনও ভেদাভেদ করিতেন না অতি হীন স্বেচ্ছাচারী লম্পট পতিতা নারী হইতে আরম্ভ করিয়া অনাথ গৃহস্থ বিধবা ও দুস্থ দূর আত্মীয় কুটুম্ব সকলেই বরেন্দ্রের অকৃত্রিম আন্তরিকতার সমান অধিকারী ছিলেন। বস্তুতঃ যে যত হীন, যত অসহায় তাঁহার করুণ হৃদয় যেন তাহাকে ততো বেশী প্রগাঢ় ভাবে বেষ্টন করিয়া ধরিত। জগতে তাঁহার বিরাগভাজন কেহ ছিল না। অনেক সময়ে অনেকে তাঁহার যথেষ্ট অহিতাচরণ করিয়াছে কিন্তু ইহাদের প্রত্যেককেই তিনি অবশেষে নিজগুণে জয় করিয়াছিলেন। এবং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার যখন অবস্থান্তরে পড়িয়া তাঁহারই নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইতেন, বরেন্দ্র যথাসাধ্য তাঁহাদের হিতসাধন করিতে ত্রুটি করিতেন না। তাহার অর্থ সাহায্য যে কেবল নীরবে ও গোপনে সমাধা হইত তাহা নয়, গ্রহীতাকেও তিনি কোনও রূপে সঙ্কোচ বোধ করিতে দিতেন না। ঋণ বলিয়াই অনেক সময় তাঁহার দান কার্য্য সম্পন্ন হইত।

সংসারের দুঃখ দৈন্যের সম্মুখে বরেন্দ্র সহজেই অভিভূত হইয়া পড়িতেন; ব্যথা বেদনার সন্ধান পাইলে তিনি যেন আত্মহারা হইয়া তাহার প্রতিকারার্থে ছুটিতেন। বিরাম, বিশ্রাম অথবা শারীরিক কষ্ট কিছুই মনে থাকিত না। অনাহারে অনিদ্রায় স্বহস্তে রোগীর পরিচর্য্যা

করা তাহার জীবনের একটি ব্রত ছিল। এবং সে পরিচর্য্যায় কত কোমলতাইনা তিনি ঢালিতে পারিতেন। সহরবাসীর মৃতদেহ সৎকারে স্কন্ধপ্রদান করিতেও তিনি সময় বা সামর্থ্যের কখনও আভাব বোধ করিতেন না। সংসারের সকল প্রকার বাদবিসম্বাদের মধ্যস্থতা করা তাঁহার একটি নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মছিল। ব্যবসায়ী ব্যবসায়ীর বিরোধ, বন্ধু বান্ধবের আত্মবিচ্ছেদ, এমন কি গার্হস্থ্য কলহ প্রভৃতি সকল প্রকার মনোমালিন্যের অবসান করিবার জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্ট করিতেন। এ জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট সময় ও অর্থ ব্যয়ও সময় সময় করিতে হইত; কিন্তু তাহাতেও তাঁহার উৎসাহের হ্রাস ছিল না।

বস্তুতঃ কর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া যে ক্ষুদ্র সংসারটি স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার সকল অভাব অভিযোগ গুলিই তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া লইতেন। অতি ক্ষুদ্র বলিয়া একটিও অবহেলা করিতেন না। বৃহৎ হইলেও পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিতেন না। এমন কি উহার সঙ্গত অসঙ্গত আবদারগুলি রক্ষা করাও তাঁহার আনন্দপূর্ণ কর্ত্তব্যের মধ্যে ছিল। তাঁহার বোম্বায়ের আবাসগৃহ যেন সত্যই পান্থনিবাস ছিল। বোম্বাইবিহারী অতি অল্প বাঙ্গালীই তাঁহার গৃহে আতিথ্য স্বীকার করেন নাই। শিক্ষার্থী ও ব্যবসায়ী বিলাতযাত্রী হইতে বৃদ্ধ বৃদ্ধা সম্বলিত সুবৃহৎ তীর্থযাত্রীর দল সকলেই তাঁহার দ্বারা সমাদরে গৃহীত হইত। তাঁহার বাসা গৃহটী স্বল্প পরিসর ছিল এবং বোম্বাই প্রদেশে চাকর বাকরের সুবিধাও সব সময় ঘটিত না। তথাপি অতিথিবর্গের সুখ সচ্ছন্দতার কোনও প্রকার অন্তরায় ঘটিত না। অনেক সময় তিনি স্বহস্তেই তাঁহাদের রসনাতৃপ্তিকর ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেন। আর একটি জিনিষ অতিথিবর্গ তাঁহার নিকট উপভোগ করিতেন যাহা অন্যত্র দুর্লভ। সেটি তাঁহার সরস হাস্য তরঙ্গের প্রবল প্রবাহ। বাস্তবিকই তাঁহার ন্যায় সরস হাস্যরসিক বড় সুলভ নয়। তিনি পার্শ্বস্থ বন্ধুবর্গকে অনবরত মাতাইয়া রাখিতে পারিতেন। অতি গম্ভীর প্রকৃতির লোকও তাঁহার হাস্য তরঙ্গের সংক্রমণ প্রতিহত করিতে পারিতেন

না। অতি অল্পকাল সহবাসে অত্যন্ত গুরুভারাক্রান্ত হৃদয় হইতে তিনি ব্যথা বেদনার বোঝা সহজেই মুছিয়া তুলিয়া লইতে পারিতেন। এই উপলক্ষ্যে তাঁহার অভিনব চরিত্রের আর একটী কথা ক্ষুদ্র হইলেও আমরা এখানে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। সেটি তাঁহার বিলাসিতার কথা। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার বেশ-ভূষার একটা পারিপাট্য লক্ষ্যিত হইত। এজন্য তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেব কৌতুকচ্ছলে তাঁহাকে "বাবু" বলিয়াই ডাকিতেন। ইংরাজীতে যাহাকে "ফঁপ" বলে তাঁহার বেশ বিন্যাস অনেকটা সেই ভাবেরই ছিল। তাঁহার বন্ধু বান্ধবের মধ্যে অনেকেরই তিনি এ সম্বন্ধে আদর্শস্বরূপ ছিলেন। কিন্তু তাঁহার এ বিলাস বিভবের আড়ম্বর আমাদের চক্ষে প্রচ্ছন্ন অভিনয় বলিয়াই বোধ হইত। বিলাসিতার এই ক্ষীণ আবরণের অন্তরালে যে কি প্রচণ্ড কর্ম্মশক্তি ও ত্যাগের প্রতিমূর্ত্তি তিনি লুকাইয়া রাখিতেন তাহা অল্প লোকের চক্ষে ধরা পড়িত।

বীরভক্ত ৺কালিপদ ঘোষের তনয় বরেন্দ্রকৃষ্ণ যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরণে আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন ইহাতে আশ্চর্য্যজনক কিছুই নাই অথবা স্বীয় অধ্যবসায় ও কার্য্যকুশলতার বলে ব্যবসার উচ্চতম শীর্ষে আরোহন করিয়াছিলেন ইহাতেও এমন বিচিত্রতা কিছুই নাই। কিন্তু তিনি যেরূপ ভাবে আপনাকে নিঃশেষ করিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরণে ঢালিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব, ইহাই তাঁহার মহত্ব। সংসারের সুখ সম্ভোগ, আত্মপ্রতিষ্ঠা যশ মান ইত্যাদি সকল প্রকার মোহবন্ধনের হাত এড়াইয়া সন্ন্যাসিসুলভ ত্যাগ বরণ করিতে পারিয়াছিলেন ইহাই তাঁহার কৃতিত্ব। এবং কামনারহিত অভিমান শূন্য কর্ম্মের দ্বারা বিশ্বজনীন প্রেমের সাধনা করিয়া গিয়াছেন ইহাই জগতের আদর্শস্থান। জানি না তাঁহার অন্য ভজন পূজন কি ছিল, জানি না তিনি ধ্যান ধারণার কোন ধার ধারিতেন কি না। কিন্তু সেই বিরাট পুরুষের স্বরূপ বিশ্বমানবের যে ঐকান্তিক আন্তরিক সেবা করিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা সংসারে বিরল। কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা তিনি রাখেন নাই, প্রত্যুপকারের প্রত্যাশাও কাহারও নিকট করেন নাই। পাছে

কর্তৃত্বাভিমানের ছায়া মাত্রও তাঁহাকে স্পর্শ করে এই ভয়েই তিনি সদা সশঙ্কিত থাকিতেন। এই জন্যই তিনি বোম্বাই হইতে প্রত্যাগত হইয়া সর্ব্বদা অলক্ষ্য নিয়মে সন্ন্যাসর মঠে যাইতেন এবং তথায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ চরণে বিশ্বস্তকর্ম্মচারীর ন্যায় কৃতকর্ম্মের হিসাব নিকাশ "হাত নাগৎ" মিটাইয়া তবে গৃহে প্রবিষ্ট হইতেন।

ধন্য সাতনাভূমি! তোমারই পুণ্যময় বক্ষে এই অমূল্য নাটকের শেষ অঙ্ক অভিনীত হইয়াছিলেন। বরেন্দ্রের দুইটী প্রধান কর্ম্মকেন্দ্রের মধ্যস্থানে অবস্থিত হইয়া তুমিই সেই ভক্ত ভগবানের অপূর্ব্ব সমাবেশ দেখিয়াছিলে। পাছে অন্তিম শয্যার পার্শ্বে আত্মীয় বান্ধবগণের শোকোচ্ছ্বাস কোমলপ্রাণ বরেন্দ্রের অসহ্য হইয়া তাহার চিত্তবিভ্রম ঘটায় ও পরমার্থ কার্য্যে ব্যাঘাত জন্মায়, তাই অনন্ত কৌশলীর কৌশলে তোমারই অজানা তটে এই অভূতপূর্ব্ব লীলার আয়োজন হইয়াছিল। ধন্য সাতনার ঘনশ্যামল বিটপি সঙ্কুল বনাস্থল! তোমারই পটে ভক্তবৎসল ঠাকুর তাঁহার ভুবন ভুলান মদনমোহন রূপের ছটা বিস্তার করিয়া বরেন্দ্রের কর্ম্মাবসান মুহূর্ত্তের জন্য উন্মুক্ত হৃদয়ে অপেক্ষা করিয়াছিলেন। দ্রুত কর্ম্ম স্রোতে ভাসমান বরেন্দ্র আসিয়া শুভমুহূর্ত্তে যখন সেই অপরূপ রূপ মাধুরীতে নেত্রপাত করিয়াছিলেন, কে জানিবে তাঁহার মন তখন কি ভাবের লহরীতে মাতিয়া উঠিয়াছিল। ভক্ত তাহার ইষ্টের সাক্ষাৎ পাইয়াছে, সাধক তাঁহার রূপ ঐশ্বর্য্যের আস্বাদ পাইয়াছে, সেবক তাঁহার অভয় চরণে স্থান পাইয়াছে, তাহার বিবরণ আমরা কেমন করিয়া বলিব। আর ধন্য তুমি দয়াল ঠাকুর। এমনই করিয়া তুমি ভক্ত-বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলে। তোমার চিরকুমার সুকুমার বরেন্দ্রকে তুমিই শান্তিময় ক্রোড়ে তুলিয়া বড় সাধনার শুভ বুধবারের মাহেন্দ্রক্ষণের জন্য বসিয়াছিলে। ধীরে ধীরে তাঁহার সকল ব্যথা মুছাইয়াছ, ধীরে ধীরে তাঁহার সকল বন্ধন মোচন করিয়াছ, ধীরে ধীরে তাঁহার সকল কলিগুলি ফুটাইয়া তুলিয়া ত্রিদিবের অমৃত ধারায় মন প্রাণ ভরিয়া দিয়াছ। আর শত ধন্য তোমরা সাতনাবাসী যাঁহারা এ লীলার সহায়তা ও প্রত্যক্ষ করিয়াছ।

মহারাজের একটী স্মৃতি।

(শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী)

একদিন আমিও ডাক্তার কাঞ্জিলাল সন্ধ্যার সময় মঠে গিয়াছি। ঐ রাত্রে মঠে ছিলাম। আরও ৪।৫টী ভক্ত মঠে উপস্থিত ছিল। রাখাল মহারাজ আমাকে "চক্রবর্ত্তী" বলিয়া ডাকিতেন। ঐ [illegible] আমরা মঠের পশ্চিম বারন্দায় বসিয়া আছি। রাখাল মহারাজ পশ্চিমাংশে—বেঞ্চের উপর বসিয়াছেন। আমায় দেখিয়াই বলিলেন "চক্রবর্ত্তি! তুমি ঠাকুর ও স্বামীজির কত সব গান বাঁধিয়াছ; কৈ আমার কোন গান বাঁধ নাই?" আমি বলিলাম, আপনার নামেরও একটা গান তৈয়িরি করেছি—তবে সব কলি এখন মনে নাই। তিনি বলিলেন—"যা মনে আছে তাই গেয়ে ফেলো।" আমি গাইলাম :—

কে তুমি রাখাল রাজ সাজিয়ে নরের সাজে
গোলোক আসন ছাড়ি এসেছ গুরুর কাজে।
সরল বালক মতি—মায়ামুক্ত মহাযতি,
বাল গোপাল মূরতি—অন্তরে সদা বিরাজে।

গানের এইটুকু মাত্র মনে ছিল। মহারাজ শুনিয়া বালকের মত "বেশ্" "বেশ্" বলিলেন। আরও বলিলেন, "হবে না? [illegible] কেমন গুরুর চেলা!!" উপস্থিত ভক্তেরা তাঁহার কথায় খুব হাসিতে লাগিলেন। ঐ গানের অন্য কলি দুটী পাঠকবর্গকে অবগত করান যাইতেছে।

বাহিরে বালক হাস, ভিতরে ব্রহ্মবিকাশ
কে চিনিতে পারে তোমা—চেনা নাহি দিলে নিজে
তব পদে করি নতি, মাগিছে গুরু ভকতি,
গুরুদত্ত মন্ত্র যেন নিয়ত হৃদয়ে বাজে॥

কৌপীন পঞ্চক *

(শ্রীঅশ্বিনীকুমার বসু)

১

শোক দুঃখে অবিচল, ভিক্ষান্নেই তুষ্ট,
বেদান্ত শাস্ত্রেতে চিত্ত সতত আকৃষ্ট ;
বসন ভূষণ হীন, সদা শুদ্ধ মন,
এ হেন কৌপীনধারী চির ভাগ্যবান ।

২

আশ্রয়ের স্থান যাঁর মাত্রতরুতল,
আহরিতে ভোগ্য বস্তু হস্তই সম্বল ;
ছিন্ন কন্থা তুল্য দৃষ্টি বিলাসে যে জন,
এ হেন কৌপীনধারী চির ভাগ্যবান ।

৩

ইন্দ্রিয় সকল যাঁর শান্ত সদা রয়,
আত্ম-হ্লাদানন্দে নিত্য আনন্দ লভয় ;
ব্রহ্ম সুখে দিবানিশি রমে যাঁর মন,
এ হেন কৌপীনধারী চির ভাগ্যবান ।

৪

আত্মা মাঝে পরমাত্মা করি দরশন,
স্ব ইচ্ছায় ইন্দ্রিয়েরে করেন চালন ;
আদি অন্ত মধ্য নাহি ভাবে যাঁর মন,
এ হেন কৌপীনধারী চির ভাগ্যবান ।

৫

ব্রহ্ম নাম সুধা সদা ক্ষরে মুখে যাঁর,
"আমি ব্রহ্ম" বলি চিন্তা করয়ে অন্তর ;
ভিক্ষান্ন আহার করি ভ্রমে সর্ব্ব স্থান
এ হেন কৌপীনধারী চির ভাগ্যবান ।

* শঙ্করাচার্য্যের "কৌপীন পঞ্চকের" পদ্যানুবাদ

সমালোচনা ও পুস্তক পরিচয়।

পরমহংসদেব—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত—মূল্য ১৲ প্রাপ্তিস্থান উদ্বোধন কার্য্যালয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের বৈচিত্র্যলীলা লিখিতে গেলে রামায়ণ-মহাভারতও ক্ষুদ্র গ্রন্থ হইয়া যায়। তাঁহার অভূতপূর্ব্ব জীবনেতিহাসের বিবৃতি এখনও অসমাপ্ত রহিয়াছে। জানিনা কবে তাঁহার কৃপায় বেদ-ব্যাসের ন্যায় মনীষী আসিয়া ভক্তজনের এ আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিবেন। আমরা এক্ষণে যাহা তাঁহার সম্বন্ধে প্রাপ্ত হই, তাহা মাত্র তাঁহার সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তগণের, যিনি যে ভাবে তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়াছেন তাহারই এক একটী ভাবের সংক্ষিপ্ত বিবৃতি মাত্র। সেই সরল-ব্রাহ্মণের সাধনেতিহাস এত জটিল যে, স্বামীবিবেকানন্দের মত মহামানবও এক্ষেত্রে নামিতে সাহস পান নাই। তাঁহাকে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন-চরিত লিখিতে বলায় তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি কি শেষে শিব গড়িতে বাঁদর গড়িব।"

কিন্তু ভগবানের ভক্ত তাই বলিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। সে ভাগবতীলীলার যতটুকু পায় ততটুকুতেই তাহার আনন্দ ও সাধনের সহায় হইয়া থাকে। ভক্ত শুধু আত্মতৃপ্ত নয়—সে নিজে যে আনন্দ-উৎসের সন্ধান পায়, দশজনকে ডাকিয়া সে আবার সে আনন্দের ভাগী করিবার জন্য সন্ধান বলিয়া দেয়; সেই প্রচেষ্টার ফল "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ" ও "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত" ইত্যাদি। দীন-দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে কিন্তু এ সকল গ্রন্থ অতি ব্যয়-সাধ্য। গ্রন্থকার শ্রীশ্রীঠাকুর সম্বন্ধে নিজের অভিজ্ঞতা এবং "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ" ও "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত" এই দুএর সাহায্যে, দরিদ্রের সে অভাব এই গ্রন্থের দ্বারা কতক দূর করিয়াছেন—কামকাঞ্চন বিষদুষ্ট সমাজ ইহার দ্বারা কতকটা নির্বিষ হইবে সন্দেহ নাই।

সাধন-সমর বা দেবীমাহাত্ম্য (দ্বিতীয় খণ্ড)—শ্রীপ্যারীমোহন দত্তকর্ত্তৃক প্রকাশিত মূল্য ২৲ টাকা। ইহাতে রূপকে দেবীলীলা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। মানব মনে সদাসত্তের সংগ্রাম যাহা

অহর্নিশি চলিয়াছে, তাহাই দেবাসুর-সংগ্রামের মধ্য দিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং এই সাধন সমরে বিজয় লাভেরও উৎকৃষ্ট পন্থা দেখান হইয়াছে।

সংবাদ ও মন্তব্য।

১। আগমী ২৫শে পৌষ, ৯ই জানুয়ারী, মঙ্গলবার কৃষ্ণা সপ্তমী, শ্রীশ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণ পূজ্যপাদ শিষ্য শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দের একোষষ্ঠীতম জন্মোৎসব বেলুড় মঠে সম্পাদিত হইবে। দরিদ্রনারায়ণ সেবা ইহার প্রধান অঙ্গ। ভক্তগণের উপস্থিতি ও সাহায্য বাঞ্ছনীয়।

২। বিগত ১৭ই নবেম্বর বাঁকুড়ার মেমরিয়াল হলে স্বামী বাসুদেবানন্দ "ধর্ম্মজীবনে বেদান্ত" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় সস্ত্রীক সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

৩। খুলনা সেবাশ্রমের প্রথম বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে স্বামী নির্গুণানন্দ ও রামেশ্বরানন্দ সেখানে গিয়া সেবাধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ করিয়াছেন।

৪। বিগত ১২ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার সন্ধ্যাকালে শ্রীমৎ স্বামী প্রকাশানন্দ মহারাজ "টাকাডা" নামক জাহাজে কলিকাতার আউট্র্যাম ঘাটে পদার্পণ করেন। ইনি আজ ১৭ বৎসর পরে আমেরিকায় অক্লান্ত পরিশ্রমে বেদান্ত প্রচার করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। ক্যালিফোর্ণীয়ার অন্তঃপাতী সান ফ্রান্সিস্কো নগরীতে যে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের "হিন্দু টেম্পল" নামক মঠ আছে, শ্রীমৎ ত্রিগুণাতীতানন্দ স্বামী মহারাজের মহাসমাধির পর, ইনিই সেখানকার বর্ত্তমান ধর্ম্মাচার্য্যরূপে নিযুক্ত আছেন। ইঁহার সহিত ঠাকুরের তুলাগু দেশীয় ভক্ত ব্রহ্মচারী গুরুদাস এবং মিস্ ফক্স ভগ্নিদ্বয় ভারত-ভূমি দর্শনে আগমন করিয়াছেন।

রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, বৃন্দাবন।

বৃন্দাবন হিন্দুগণের পরম পবিত্র তীর্থ। তথায় প্রতিবৎসর বহুলক্ষ যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই গরীব। সুতরাং বিদেশে হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িলে ইহাদিগকে কিরূপ বিপন্ন হইতে হয় তাহা সহজেই অনুমেয়। ঐরূপ অবস্থায় রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাশ্রম তাহাদিগকে কিরূপ যত্ন ও সেবাশুশ্রূষা করিয়া থাকে, তাহা জনসাধারণের অবিদিত নহে। গত চৌদ্দ বৎসর যাবৎ উক্ত সেবাশ্রম জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে এই সেবাকার্য্য করিয়া আসিতেছে। দুঃখের বিষয়, এই বৃহৎ অনুষ্ঠানের উপযোগী অর্থ-সাহায্য সেবাশ্রম সকল সময় প্রাপ্ত হয় নাই। ফলে বর্ত্তমানে উহার ১৫০০৲ টাকা দেনা হইয়া গিয়াছে। এজন্য আমরা বৃন্দাবন সেবাশ্রমের স্থিতিকল্পে সহৃদয় জনসাধারণের নিকট ভিক্ষাপাত্র হস্তে উপস্থিত হইতেছি। আমাদের বিশ্বাস, পরদুঃখ-কাতর বঙ্গ জনকজননীর নিকট আমাদের এই প্রার্থনা নিষ্ফল হইবে না। আশ্রমের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ সাহায্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় গৃহীত হইবে এবং তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে।

(১) প্রেসিডেণ্ট, রামকৃষ্ণ মিশন বেলুড় পোষ্ট, হাওড়া জেলা।

(২) অনারারী সেক্রেটারী, রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, বৃন্দাবন পোষ্ট, মথুরা জেলা।

নিবেদক—

সারদানন্দ,

সেক্রেটারী রামকৃষ্ণ মিশন।

রামকৃষ্ণমিশন বয়ন-শিক্ষালয় বেলুড়।

অন্নের ব্যবস্থা না করিতে পারিলে ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির ধর্ম্ম হওয়া অসম্ভব। অতএব তাহাদের নিমিত্ত অন্নাগমের নূতন উপায় প্রদর্শন করা সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য।

এখন উদ্দেশ্য এই যে, এ মঠটীকে ধীরে ধীরে একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করিত হইবে, এবং তাহার মধ্যে দার্শনিক চর্চ্চা ও ধর্ম্মচর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে একটী পূর্ণ "টেক্‌নিক্যাল ইনষ্টিটিউট" থাকিবে।

শ্রীশ্রীস্বামিজীর উক্ত বাক্যানুসারে প্রায় তিন বৎসর যাবৎ শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণ মিশনের প্রধানকেন্দ্র বেলুড়ে একটী বয়ন-শিক্ষালয় স্থাপিত হইয়াছে। এখানে বিনাবেতনে নানাপ্রকার ব্যবহারোপযোগী বস্ত্রাদি—কাপড়, গামছা, চাদর, তোয়ালে, জীণ, টুইল প্রভৃতি বুনিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। এ পর্য্যন্ত দেশ বিদেশ হইতে আগত যে সকল ছাত্র এখানে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছে তন্মধ্যে নয় দশ জন স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক স্বাধীনভাবে তাঁত চালাইতেছে ও বয়ন-শিক্ষা দিতেছে। আপাততঃ এখানে চারিখানি তাঁত ও আটখানি চরকা ব্যবহৃত হইতেছে। নিকটবর্ত্তী সূতাকলের কর্ত্তৃপক্ষগণ একার্য্যে সাময়িক সূতা ও তুলার দ্বারা সাহায্য করিয়া বিশেষ সহানুভূতি করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত অনেক ভদ্রমহোদয়গণ চরকা ও অর্থ সাহায্য করিয়াছেন।

দেশ-বিদেশের ছাত্রগণ বয়ন শিক্ষা লাভ করিতে উৎসুক হইয়া আসিলেও এবং আবেদন-পত্র দিলেও আমরা অর্থাভাব ও স্থানাভাব বশতঃ তাহাদের কোন প্রকার বন্দোবস্ত করিতে ও বয়ন শিক্ষার অন্যান্য অঙ্গসমূহ সুসম্পন্ন করিতে পারিতেছি না। অধুনা ছাত্রদের সুবিধার জন্য মঠের নিকটবর্ত্তী একটী বাটীভাড়া লওয়া হইয়াছে। স্থানীয় মুষ্টিভিক্ষার দ্বারা ইহাদের ব্যয়ভার কতকাংশে নির্ব্বাহিত হইতেছে। যাহাতে উল্লিখিত উদ্দেশ্য ক্রমশঃ সাধিত হয় তজ্জন্য সর্ব্ব-সাধারণের বিশেষ সহানুভূতি প্রার্থনীয়।